মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
রচনাসমগ্র

তৃতীয় খণ্ড

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীঅলোক রায়
শ্রীঅরুণকুমার বসু
শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র
শ্রীমতী মালিনী ভট্টাচার্য
শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্তী
শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ

শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

মূল্য : ১৬০ টাকা

ISBN 81-86908-66-8 (Set)
ISBN 81-86908-76-5

প্রকাশক

সচিব, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা-৭০০ ০২০

মুদ্রাকর

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১২

সূচি : তৃতীয় খণ্ড

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
সচিব
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
সংস্কৃতি অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

শ্রীমতী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী
শ্রীসুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী
শ্রীঅংশু শূর
শ্রীনিমাই ঘোষ

তথ্যসংগ্রহে সহায়তা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্র
বয়েজ ওন লাইব্রেরি
বাগবাজাব রিডিং লাইব্রেবি
রামমোহন লাইব্রেরি
চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
হিরণ লাইব্রেরি
শ্রীমতী স্বাতী দাসসরকার
শ্রীঅশোক উপাধ্যায়
শ্রীসন্দীপ দত্ত
শ্রীগৌতম ঘোষ

সম্পাদনা সহায়তা

শ্রীনৃপেন্দ্র সাহা
শ্রীনন্দদুলাল সেনগুপ্ত
শ্রীমতী ঈশানী মৈত্র
শ্রীঅমলকুমার রায়
শ্রীমতী অপর্ণা দাশ
শ্রীমুক্তিরাম মাইতি
শ্রীশ্যামল মৈত্র

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্রের তৃতীয় খণ্ড অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। একুশ মাসের মধ্যেই অন্যান্য খণ্ডের মতো তৃতীয় খণ্ডেরও দ্বিতীয় সংস্করণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টির জনপ্রিয়তা ও মহার্ঘতার সুনিশ্চিত পরিচায়ক। কালজয়ী এই লেখকের রচনাবলি এতকাল ক্রেতা-পাঠকের কাছে সহজলভ্য ছিল না। প্রকাশের পর সেগুলির দ্রুত প্রচারে প্রকাশক হিসাবে বাংলা আকাদেমির উদ্যোগ কৃতার্থ হল।

বর্তমান মুদ্রণে পূর্বতন মুদ্রণের কিছু অসংগতি ও ত্রুটি যথাসম্ভব দূরীভূত হয়েছে। মুদ্রিত গ্রন্থগুলির পাঠের ক্ষেত্রে বাংলা আকাদেমি সম্মত বানানবিধি অনুসরণ করে সেই পাঠ-কে অধিকতর নির্ভুল করার চেষ্টা হয়েছে। ইতিমধ্যে লেখকপুত্র শ্রীসুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ পরিশ্রমী উদ্যোগে 'বউ' পর্যায়ভুক্ত আরও তিনটি অগ্রন্থিত গল্প পুরাতন পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সেই গল্প তিনটি রচনাসমগ্রেব শেষ খণ্ডে যুক্ত করা হবে। এ ছাড়া 'বউ' গ্রন্থেব চারটি গল্পের পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত পাঠের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলি গ্রন্থপবিচয় অংশে তৌলবিচার করে দেখানো হয়েছে। এই সঙ্গে সর্বতোভাবে প্রকাশনার সৌষ্ঠব ও উন্নতমান অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

আশা করি বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরাগী জনসাধারণের কাছে অনুরূপ সমাদর লাভ করবে।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
সচিব

নিবেদন

বাংলা সাহিত্যের এক অলোকসামান্য পুরুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আটচল্লিশ বছরের অকাল-নিমীলিত জীবন ও আটাশ বছরের সৃষ্টিকালের মধ্যে তিনি রেখে গেছেন বিপুল দান হিসেবে ৩৯টি উপন্যাস, ২৬০-এর কিছুবেশি ছোটোগল্প এবং বেশকিছু কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও ছোটোদের উপযোগী রচনা। মৃত্যুর চারদশক পরেও এই ব্যতিক্রমী ও বিস্ময়সৃষ্টিকারী লেখক আমাদের সাহিত্যে ও মননে অনিবার্যভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন। স্রষ্টা মাত্রেই কিছু পরিমাণে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। কিন্তু মানিকের স্বাতন্ত্র্য ও গভীরতার রহস্যভেদ ও অনুসন্ধান আজও বোধ করি অসমাপ্ত। কল্লোলের কুলবর্ধন বলে তাঁকে দাবি করা হলেও তাঁর সাহিত্যে অতিরিক্ত যা ছিল তা হল অতিআধুনিকের প্রতিবাদ থেকে নাস্তিক্যের বিদ্রোহে উত্তরণ। যুগ-ব্যাধি তাঁর সাহিত্যের শরীরের আয়তক্ষেত্রে নির্মম নিরাভরণ অথচ রহস্যময় রূপে ছড়িয়ে আছে। পারিবারিক আনুকূল্যের মসৃণজীবনের পথ ত্যাগ করে শুধুই সাহিত্যের জন্য যে অনিশ্চিত জীবন তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন, দুরারোগ্য ব্যাধি দারিদ্র্য সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও তার কক্ষপথের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের কেন্দ্রে ছিল সাহিত্যসাধনা। সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি সংলগ্ন যে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবন, তার ইতিবৃত্ত রচনায় মানিক-সাহিত্য অপরিহার্য।

এই ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধেই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসমগ্র প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। পাঠক-মনের সামনে থেকেও দৃষ্টির অগোচরে থেকে যাবে তাঁর রচনাবলি—এ কাম্য নয়। মানিক-সাহিত্যের সামগ্রিক সংকলন আজও অসম্পূর্ণ। মানিক-সাহিত্যচর্চা, বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে গবেষণা বেশকিছু হলেও মানিকের যাবতীয় রচনার সুসম্পাদিত পাঠ থেকে পাঠকসমাজ বঞ্চিতই রয়েছেন। এর আগে গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড সাধ্যমতো একপ্রস্থ রচনাবলি প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু দীর্ঘদিন তা বাজারলভ্য ছিল না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং লেখক-পরিবার ও গ্রন্থালয়-কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সমগ্র মানিক-রচনাবলি নতুন করে প্রকাশের পথে বাধা দূর হয়েছে। সকল পক্ষের ঐকমত্যে এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে বাংলা আকাদেমির উপর। কাজটি সহজসাধ্য নয়।

লেখকের ভগ্নস্বাস্থ্য, গৃহিণীপনার অভাব, বারবার বাসস্থান-পরিবর্তন, প্রথম যুগের প্রকাশকদের অন্যমনস্কতা ইত্যাদি কারণে যাবতীয় পাণ্ডুলিপি, প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম সংস্করণের প্রকাশ-সময় ইত্যাদি সংগ্রহ করা সহজ নয়। তবে শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় . ডায়েরি ও চিঠিপত্র' গ্রন্থ প্রকাশ করে প্রামাণ্য তথ্যসংগ্রহের কাজ অনেকটাই সহজ করে দিয়েছেন। লেখকের পরিবারের পক্ষ থেকে দুর্লভ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আকাদেমির অভিলেখাগারে প্রদান করার ফলেও কিছুকিছু পাঠনির্ণয়ে অভাবনীয় সুবিধা ঘটেছে। কাজে হাত দিয়ে দেখা যাচ্ছে কিছু রচনা এখনও অসংকলিত রয়েছে, বহু তথ্য সন্ধান করতে হচ্ছে, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ, গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লেখকের সংশোধন-পরিমার্জন-পরিবর্তন ইত্যাদি পর্যালোচনা করে কৌতূহল-সৃষ্টিকারী বহু বিষয় পাওয়া যাচ্ছে। বাংলা আকাদেমি এই দুরূহ অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পাদনের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করেছে এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে যথাসম্ভব প্রথম প্রকাশের ক্রম অনুসারে দশখণ্ডে এই রচনাসমগ্র প্রকাশে ব্রতী হয়েছে।

মানিক-পরিবারের সর্বাঙ্গীণ সহায়তা, সম্পাদকমণ্ডলীর শ্রম ও দক্ষতায় মানিক-সাহিত্যের এক আদর্শ-পাঠ পাঠকসমাজের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। বহু নতুন তথ্য, দুষ্প্রাপ্য দলিল এবং লেখকের বিভিন্ন সময়ের স্বল্পপরিচিত ছবি, পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ রচনাসমগ্রের আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়েছে। গ্রন্থপরিচয় ও পরিশিষ্ট অংশ এই রচনাবলির অন্যতম সম্পদ। বানানের সমতাবিধানের প্রয়োজনে বাংলা আকাদেমির বানানবিধি এবং যুক্তাক্ষরের স্বচ্ছতা-প্রয়াস অনুসৃত হয়েছে। প্রকাশনসৌষ্ঠব ও সম্পাদনার উন্নতমান অক্ষুণ্ণ রেখে দাম যথাসম্ভব পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের সহায়তার ফলেই এটা সম্ভব হল। এই প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে যাঁরা জড়িত রয়েছেন তাঁদের সকলের কাছেই বাংলা আকাদেমি কৃতজ্ঞ। প্রথম দুটি খণ্ড প্রকাশের পরে সমস্ত মহল থেকেই প্রশংসা পাওয়া গেছে। তৃতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হল সময়সূচি রক্ষা করেই। ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক প্রচেষ্টাও করা হয়েছে।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

সচিব

জন্ম : ১৯ মে ১৯০৮ মৃত্যু : ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬

বউ

দোকানির বউ

সরলাব পায়ে সব সময় মল থাকে। মল বাজাইয়া হাঁটে সরলা,—ঝমর ঝমর ! চুপিচুপি নিঃশব্দে হাঁটিবার দরকার হইলেও মল সরলা খুলিয়া ফেলে না, উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া শক্ত করিয়া পায়ের মাংসপেশিতে আটকাইয়া দেয়—মল আর বাজে না। প্রথম প্রথম শম্ভু এ খবর রাখিত না, ভাবিত বউ আশেপাশে আসিয়া পৌঁছানোর আগে আসিবে মলের আওয়াজের সংকেত—পিছন হইতে মোটর আসিবার আগে যেমন হর্নের শব্দ আসে। ক-বার বিপদে পড়িয়া বউয়ের মলের উপর শম্ভুর নির্ভর টুটিয়া গিয়াছে।

ঘোষপাড়ার প্রধানতম পথটার ধারে একখানা বড়ো টিনের ঘরের সামনের খানিকটা অংশে বাঁশেব মাচার উপব শম্ভুর দোকান। মাটিব হাঁড়ি, গামলা, কেরোসিন কাঠের তক্তাব চৌকো চৌকো খোপ, ছোটোবড়ো বারকোশ, চটের বস্তা ইত্যাদি আধাবে রক্ষিত জিনিসপত্রের মাঝখানে শম্ভুব বসিবার ও পয়সা বাখিবার ছোটো চৌকি ; হাত ও লোহার হাতা বাড়াইয়া এখানে বসিয়াই শম্ভু অধিকাংশ জিনিসেব নাগাল পায়। পিছনে প্রায় এক মানুষ উঁচু পাঁচসাবি কাঠেব তাক। সাবু, বার্লি ও দানাদার চিনি রাখিবার জন্য এক পাশে কাচ বসানো হলদে রঙের টিন, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি দামি মশলার নানা আকারের পাত্র, লণ্ঠনের চিমনি, দেশলাইয়ের প্যাকেট, কাপড়-কাচা গায়ে-মাখা সাবান, জুতার কালি, লজেনচুস এবং মুদিখানা ও মনিহাবি দোকানেব আরও অনেক বিক্রেয় পদার্থের সমাবেশে তাকগুলি ঠাসা। তাকের তিন হাত পিছনে শম্ভুর শয়নঘরের মাটিলেপা চাঁচের বেড়ার দেয়াল। তাক আর এই দেয়ালেব সমান্তরাল রক্ষণাবেক্ষণে যে সরু আবছা অন্ধকার গলিটুকুর সৃষ্টি হইয়াছে, শম্ভুর সেটা অন্দবে যাতাযাত করাব পথ। সরলা বউ মানুষ, অন্দরেই তাব থাকার কথা, কিন্তু সরলা মাঝে মাঝে কবে কী, পায়ের মল উপবে ঠেলিয়া দিয়া চুপিচুপি তাকের জিনিসের ফাঁকে চোখ পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, স্বামীর দোকানদারি দেখে এবং খদ্দেরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শোনে। বাড়িতে শম্ভু খুব নিরীহ শান্ত প্রকৃতির চুপচাপ মানুষ, কিন্তু দোকানে বসিয়া খদ্দেরের সঙ্গে তাকে কথা বলিতে ও হাসি-তামাশা করিতে দেখিয়া সবলা অবাক মানে। মানুষ বুঝিয়া এমন সব হাসির কথা বলে শম্ভু যে তাকের আড়ালে সবলার হাসি চাপিতে প্রাণ বাহির হইয়া যায়। ক্রেতারা যদি পুরুষ হয় তবেই শম্ভুব ব্যবহারে এ বকম মজা লাগে সরলার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শম্ভুর দোকানে শুধু পুরুষেবাই জিনিস কিনিতে আসে না।

বেচাকেনা শেষ হওয়া পর্যন্ত সবলা অপেক্ষা করে, তারপর পায়ের মলগুলি আলগা করিয়া দেয় এবং মাটিতে লাথি মাবার মতো জোরে জোরে পা ফেলিয়া ঝমর ঝমর মল বাজাইয়া অন্দরে যায়। শম্ভুও ভিতরে আসে। একটু পরেই। দেখিতে পায় উনান নিবিযা আছে, ভাত-ডালের হাঁড়ি গড়াগড়ি দিতেছে উঠানে, আর স্বয়ং সবলা গড়াইতেছে বোয়াকে। অন্য দুর্লক্ষণগুলি শম্ভু তেমন গুরুতর মনে করে না ; ঘবে তিন পুরুষের পালঙ্কে প্রশস্ত সুখশয্যা থাকিতে রোয়াকে ছেঁড়া মাদুরে কালা, কানা, বোবা ও বিকৃতমুখী সরলাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াই সে কাবু হইয়া যায়। তারপর অনেকক্ষণ তাকে ওজন করিয়া কথা বলিতে ও সোহাগ জানাইতে হয়। একটা মানুষের একটু হাসা ও একটা মানুষকে একটু হাসানোর মধ্যে যে দোষের কিছুই নাই আর একটা মানুষ যে কেন তা বুঝিতে পারে না বলিয়া অনেক আপশোশ করিতে হয়, আর অজস্র পরিমাণে খরচ করিতে হয় দোকানে বিক্রির জন্য রাখা লজেনচুস। সরলা একেবারে লজেনচুস খাওয়ার রাক্ষসী, তাও যদি কম

দামি লজেনচুস খাইয়া তার সাধ মিটিত : পয়সায় যে লজেনচুস শম্ভু দুটির বেশি বিক্রি করে না, কেউ চার পয়সার কিনিলেও একটি ফাউ দেয় না, সেইগুলি সরলার গোগ্রাসে গেলা চাই।

তারপর সরলার কানাত্ব কালাত্ব ও বোবাত্ব ঘোচে এবং রাগের আগুন নিবিয়া যায়। তবে একটা উদাস-উদাস অবহেলার ভাব, কথায় কথায় অভিমান করিয়া কাঁদো কাঁদো হওয়া, এ সমস্তের ওষুধ হিসাবে দরকার হয় একখানা শাড়ি, দামি নয়, সাধারণ একখানা শাড়ি, ডুরে হইলেই ভালো।

এক বছর মোটে দোকান করিয়াছে শম্ভু, এর মধ্যে এমনিভাবে এবং এই ধরনের অন্যভাবে সরলা সাতখানা শাড়ি আদায় করিয়াছে। সাধারণ কম দামি শাড়ি—ডুরে হইলেই ভালো।

তবু, বছরের শেষাশেষি চৈত্র মাসের কয়েক তারিখে, অকারণে শম্ভু তাকে আর একখানা ডুরে শাড়ি কিনিয়া দিল। বলিল অবশ্য যে ভালোবাসিয়া দিয়াছে, একটু বাড়াবাড়ি রকমের ব্যগ্রতার সঙ্গে বাড়াবাড়ি রকম স্পষ্ট করিয়াই বলিল, কিন্তু বিনা দোষে সাতবার জরিমানা আদায়কারিণী বউকে এ রকম কেউ কি দেয় ? যাই হোক, শাড়ি পাইয়া এত খুশি হইল সরলা যে আর এক দণ্ডও স্বামীর বাড়িতে থাকিতে পারিল না, বেড়ার ও পাশে শ্বশুরবাড়িতে গিয়া হাজির হইল। শম্ভুর বাড়িটা আসলে আস্ত একটা বাড়ি নয়, একটা বাড়ির এক টুকরা অংশ মাত্র,—তিন ভাগের এক ভাগ। দোকানঘর ও শয়নঘরে ভাগ করা বড়ো ঘরখানা, উত্তরের ভিটায় আর একখানা খুব ছোটো ঘর, তার পাশে রান্নার একটি চালা আর শয়নঘরের কোণ হইতে রান্নার চালাটার কোণ পর্যন্ত মোটা শক্ত ডবল চাঁচের বেড়া দিয়া ভাগ করা তিনকোনা এক টুকরা উঠান। শম্ভুরা তিন ভাই কিনা, তাই বছরখানেক আগে এই রকম ভাবে পৈতৃক বাড়িটা ভাগ করা হইয়াছে, বেড়ার এ পাশে শম্ভুর এক ভাগ এবং ও পাশে অন্য দু-ভায়ের বাকি দু-ভাগ। এ পাশে শম্ভু আর সরলা থাকে, ও পাশে একত্র থাকে শম্ভুর দাদা দীননাথ ও ছোটোভাই বৈদ্যনাথ, তাদের বউ আর ছেলেমেয়ে, শম্ভুর বিধবা মা আর মাসি এবং শম্ভুর দুটি বোন। এ ভাবে শুধু বউটিকে লইয়া বাড়ির উঠানে বেড়া দিয়া ভিন্ন হওয়াব জন্য শম্ভুকে ভয়ানক স্বার্থপর মনে হইলেও আসল কারণটা কিন্তু তা নয়। এক বছর আগে শম্ভু ছিল বেকার, সরলার দোকানদার বাবা বিষ্ণুচরণ তখন অবিকল এই রকমভাবে ভিন্ন হওয়ার শর্তে জামাইকে দোকান করার টাকা দিয়াছিল। সুতরাং বলিতে হয়, স্বামীকে ভেড়া বানাইয়া নয়, বর্তমান সুখ ও স্বাধীনতাটুকু সরলা তার বাপের টাকাতেই কিনিয়াছে !

কী সুখ সরলার, কী স্বাধীনতা ! বেড়ার ও পাশে যাদের কাছে সে ছিল একটা বেকার লোকের বউ, বেড়ার এ পাশে এখন তাদের শোনাইয়া ঝমর ঝমর মল বাজাইয়া হাঁটিতে তার কী গর্ব, কী গৌরব ! দোকানটা ভালোই চলিতেছে শম্ভুর, ওদের টানাটানির সংসারের তুলনায় তার কী সচ্ছলতা ! একটু মুখভার করিলে তার ডুরে শাড়ি আসে, না করিলেও আসে।

সরলার পরনে নূতন ডুরে শাড়িখানা দেখিয়া বেড়ার ও পাশের অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করিল। তার মধ্যে সবচেয়ে কড়া হইল ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা বড়ো জা কালীর মন্তব্য। শীর্ণ মুখে ঈর্ষা বিকীর্ণ করিয়া বলিল, নাচনেউলি সেজে গুরুজনদের সামনে আসতে তোর লজ্জা করে না মেজো বউ ? যা যা নাচ দেখিয়ে ভোলাগে যা স্বামীকে।

ছোটো জা ক্ষেন্তির মাথায় একটু ছিট আছে কিন্তু ঈর্ষা নাই। সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, ঝমঝম যা মল বাজে সারাদিন, মেজদি নিশ্চয় দিনরাত্তির নাচে, দিদি। পান খাবে মেজদি ?

হঠাৎ ভাসুরের আবির্ভাব ঘটায় লম্বা ঘোমটা টানিয়া সরলা একটু মাথা নাড়িল। দীননাথ গম্ভীর গলায় বলিল, মেজোবউ কেন এসেছে পুঁটি ?

বিবাহের তিন মাসেব মধ্যে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত কাঠির মতো সরু পুঁটি বলিল, এমনি।

এমনি আসবার দরকার !—বলিয়া দীননাথ সরিয়া গেল। সরলা ঘোমটা খুলিল এবং বৈদ্যনাথ আসিয়া পড়ায় ক্ষেন্তি টানিল ঘোমটা। বৈদ্যনাথ একটু রসিক মানুষ, শম্ভু কেবল দোকানে বসিয়া বাছা বাছা খদ্দেরের সঙ্গে রসিকতা করে, বৈদ্যনাথ সময়-অসময় মানুষ-অমানুষ বাছে না। সম্ভবত রাত্রে তাব রসিকতায় চাপিয়া চাপিয়া হাসিতে হয় বলিয়া ক্ষেন্তির মাথায় যখন-তখন কারণে অকারণে খিলখিল করিয়া হাসিয়া ওঠার ছিট দেখা দিয়াছে। সে আসিয়াই বলিল, মেজো বউঠান যে সেজেগুজে ! কী সৌভাগ্য ! কী সৌভাগ্য ! কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, অ্যাঁ ? ও পুঁটি, দে দে বসতে দে, ছুটে একটা দামি আসন নিয়ে আয় গে ছিনাথবাবুর বাড়ি থেকে।

এই রকম করে সকলে সরলার সঙ্গে। কেবল শম্ভুর মা বড়ো ঘরের দাওয়ার কোণে বসিয়া নিঃশব্দে নির্বিকার চিত্তে মালা জপিয়া যায় ; সরলা সামনে আসিয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিলেও চাহিয়া দেখে না। সরলা পায়ে হাত দিতে গেলে শুধু বলে, নতুন কাপড় পরে ছুঁয়ো না বাছা।

সরলার দাঁতগুলি একটু বড়ো বড়ো। সাধারণত কোনো সময়েই সেগুলি সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে না। কুড়ি মিনিট শ্বশুববাড়ি কাটাইয়া বাড়ি ফেরার সময় দেখা গেল তার অধর ও ওষ্ঠে আজ নিবিড় মিলন হইয়াছে।

ভিন্ন হওয়ার আগে ওরা সরলাকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিত। উঠানে বেড়া ওঠার আগে সরলা ছিল ভারী রোগা ও দুর্বল, কাজ করিত বেশি, খাইত কম, বকুনি শুনিয়া শুনিয়া ঝালাপালা কান দুটিতে শম্ভুও কখনও মিষ্টি কথা ঢালিত না।

এক বছব একা থাকিয়া সরলার শবীরটি হইযাছে নিটোল, মনটি ভরিয়া উঠিয়াছে সুখ ও শান্তিতে। রানিব মতো আছে সবলা, রান্না ছাড়া কোনো কাজই একরকম তাকে করিতে হয় না, পাড়ার একটি দুঃখী বিধবা কাজগুলি কবিয়া দিয়া যায়। দোকান করার জন্য তার বাবা যত টাকা শম্ভুকে দিবে বলিয়াছিল, সব এখনও দেয় নাই, অল্পে অল্পে দিয়া দোকানের উন্নতি করার সাহায্য করিতেছে। মাসে একবার কবিয়া আসিয়া দোকানের মজুত মালপত্র ও বেচাকেনার হিসাব দেখিয়া যায়। প্রত্যেকবার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে ইতিমধ্যে শম্ভুর পত্নীপ্রেমে সাময়িক ভাটাও কখনও পড়িয়াছিল কি না। বড়ো সন্দেহপ্রবণ লোকটা, বড়ো অবিশ্বাসী,—নয় তো মেয়ের আহ্লাদে গদ্গদ ভাব আর ডুরে শাড়ির বহর দেখিবার পর ও কথাটা আর জিজ্ঞাসা কবিয়া জানিবার চেষ্টা করিত না।

দুঃখ যদি সরলাব কিছু থাকে সেটা তার এই পরম কল্যাণকর একা থাকিবার দুঃখ। বেড়ার ও ধারে অশান্তি-ভরা মস্ত সংসারটির কলরব দিনরাত্রি তার কানে আসে, ছোটোবড়ো ঘটনাগুলির ঘটিয়া চলা এ বাড়িতে বসিয়াই সে অনুসরণ করিতে পারে ; ছেলেমেয়েগুলি কখনও কাঁদে ক্ষুধায় আর কখনও কাঁদে মার খাইয়া, বড়ো জা কখনও কারণে অকারণে চেঁচায়, ছোটো জা কখনও খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ধমক শোনে, ছোটো দেবর কখনও কাশে খোঁচা দিয়া ঠাট্টা করে, কবে কে আত্মীয়স্বজন আসে যায়। বেড়ার এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত সরলা স্থানে স্থানে কয়েক জোড়া ফুটা করিয়াছে, সরিয়া সরিয়া এই ফুটাগুলিতে চোখ পাতিয়া সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়। ওই আবর্তের মধ্যে কিছুক্ষণ পাক খাইয়া আসিতে বড়ো ইচ্ছা হয় সরলার।

নিজের বাড়ি আসিয়া সে ডুরে শাড়ি ছাড়িল না, রান্নার আয়োজন করিল না ; একবার শম্ভুর দোকানদারি দেখিয়া আসিয়া ছটফট করিতে লাগিল। বিকালে তার বাবা আসিবে, বাপের সঙ্গে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি চলিয়া যাইবে কি না তাই ভাবিতে লাগিল সরলা। কত কথা মনে

আসে, আলস্যের প্রশ্রয়ে অবাধ্য মনে। শম্ভু বেকার ছিল তাই আগে সকলে তাকে দিত যন্ত্রণা, ভিন্ন হইয়া আছে বলিয়া এখন সকলে তার সঙ্গে ব্যবহার করে খারাপ। বেড়াটা ভাঙিয়া আবার ভাঙা বাড়ি দুটাকে এক করিয়া দিলে ওরা কি তাকে খাতির করিবে না ? তার স্বামী এখন রোজগার করে, ভবিষ্যতে আরও অনেক বেশি করিবে, এই সমস্ত ভাবিয়া ? তবে মুশকিল এই, এখন যদি দোকানের আয়ে ওরা ভাগ বসায় দোকানের উন্নতি হইবে না, এমন একদিন কখনও আসিবে না যেদিন লোহার সিন্দুকে টাকা রাখিতে হইবে শম্ভুকে। যত ডুরে শাড়ি সে আদায় করুক আর লজেনচুস খাক, দোকানের আয়ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব তো সরলা জানে। তিন পুরুষের পালঙ্কে গিয়া সে শুইয়া পড়ে। কত দিন পরে ও বাড়ির সকলের ভয় ভালোবাসা ও সমীহ কিনিবার মতো অবস্থা তার হইবে হিসাব করিয়া উঠিতে না পারিয়া বড়ো কষ্ট হয় সরলার।

অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া গিয়া অভ্যাস মতো সরলা একবার বেড়ার মাঝখানের ফুটায় চোখ পাতিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, ও বাড়িতে বড়ো ঘরের দাওয়ায় বসিয়া শম্ভু সকলের সঙ্গে কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে শম্ভুকে সে বেড়ার ওদিকে দেখিতে পায়। এতে সরলা আশ্চর্য হয় না, সে পরের মেয়ে সে যখন যায়, শম্ভুও মাঝে মাঝে যাইবে বইকী! সরলার কাছে বিস্ময়কর মনে হয় শম্ভুর সঙ্গে সকলের ব্যবহার। ভিন্ন হওয়ার জন্য রাগ করা দূরে থাক কেউ যেন একটু বিরক্ত পর্যন্ত হয় নাই শম্ভুর উপর। বেড়া ডিঙানো মাত্র ও পাশের মানুষগুলির সঙ্গে শম্ভু যেন এক হইয়া মিশিয়া যায়, এতটুকু বাধা পায় না। পুঁটি এক গ্লাস জল আনিয়া দিল শম্ভুকে। সকলের সঙ্গে কী আলোচনা শম্ভু করিতেছে সরলা বুঝিতে পারিল না ; মন দিয়া সকলে তার কথা শুনিতে লাগিল আর খুশি হইয়া কী যেন বলাবলি করিতে লাগিল নিজেদের মধ্যে। শম্ভু উঠিয়া আসিবার পরেও ওদের মধ্যে আলোচনা চলিতে লাগিল। সরলা অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, তার স্বামীর যোগ আছে অথচ তার জানা নাই এমন কী গুরুতর ব্যাপার থাকিতে পারে যে এত পরামর্শ দরকার হয় ? জিজ্ঞাসা করিতে শম্ভু বলিল, ও কিছু না। জমিজমা ভাগবাঁটোয়ারার কথা হচ্ছিল। আমার ভাগটা বেচে ফেলব ভাবছি কি না।

কেন, বেচবে কেন ?

শম্ভু মুখভার করিয়া বলিল, তুমি জান না, না ? কবে থেকে বলছি তেল নুন বেচে লাভ নেই একদম, বাজারে একটা মনিহারি দোকান করব,—তাতে টাকা লাগবে না ? কোথায় পাব টাকা, জমি না বেচলে ?

সরলা বলিল, জমির থেকেও আয় তো হচ্ছে ?

দোকানে বেশি হবে।

সরলা চিন্তিত হইয়া বলিল, কবে খুলবে বাজারে দোকান ?

পয়লা বোশেখ খুলব ভাবছি, এখন আমার অদেষ্ট।

প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিয়া মুখের সামনে তুড়ি দিল শম্ভু, মাথা নাড়িল, বাঁকা হইয়া বসিল। বলিল, তোমার বাবা বলেছিল সব সুদ্ধ ছশো টাকা দেবে দোকান করতে, দোকান খোলার জন্যে একশো দিয়ে বাকি টাকা আটকে দিলে। এক বছরে আর মোটে দুশো দিয়েচে তারপর—এমনি করলে দোকান চালাতে পারে মানুষ ? দোকান করতেও একসঙ্গে টাকা চাই।

মনে মনে একটা জটিল হিসাব করিয়া সরলা বলিল, বাবা তো আসবে আজ, বাবাকে বলব ?

শম্ভু বিষণ্ণ মুখে বলিল, বলে কী হবে ? বিশ-ত্রিশটাকার বেশি একসঙ্গে দেবে না।

আমি বললে নিয্যস দেবে, বলিয়া সরলা একগাল হাসিল।

তারপর বউকে লজেনচুস দিল শম্ভু, কালো গালে অদৃশ্য রং আনিল আর ফিসফিস করিয়া নিজের গোপন মতলবের কথা বলিতে লাগিল। মার হাতে কিছু টাকা আছে শম্ভুর, সব ছেলের চেয়ে

শম্ভুকেই তার মা বেশি ভালোবাসে তা তো জানে সরলা, ওই টাকাটা বাগানোর ফিকিরে আছে শম্ভু, নয়তো এত বেশি ও বাড়িতে যাওয়ার তার কী দরকার ! বাজারে মস্ত দোকান খুলিবে শম্ভু, এবার আর দোকানদারি নয়, রীতিমতো ব্যাবসাদারি,—বাবাকে বাকি টাকাটা একসঙ্গে দিবার কথা বলিতে সরলা যেন না ভোলে। দুর্গা দুর্গা। না, এ বেলা আর রাঁধিবার দরকার নাই। ফলার-টলার করিলেই চলিবে। আহা, গরমে সরলার বাঁধিতে কষ্ট হইবে যে।

সরলা জানে হিসাবে ভুল হইতেছে, বাটখারা লাভের দিকে না-ঝুঁকিবার সম্ভাবনা আছে, তবু স্বামীর সঙ্গে আর বেশি দোকানদাবি করা ভালো নয়। বাপের টাকায় স্বামীকে কিনিয়া রাখিয়াছে এক বছর, এবার তাকে মুক্তি দেওয়াই ভালো, তাতে যা হয় হইবে। একদিন তো নিজেকে কোনো রকম রক্ষাকবচ ছাড়াই স্বামীর হাতে সমর্পণ করিতে হইবে তার। তা ছাড়া এক বছর ধরিয়া স্বামী তাকে যে রকম ভালোবাসিয়াছে সেটা শুধু নিজের মনের খুঁতখুঁতানিব জন্য ফাঁকি মনে করা উচিত নয়। অবশ্য, পেটে যে সন্তানটা আসিয়াছে সেটা জন্মগ্রহণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেই সবচেয়ে ভালো হইত, এতদিন একসঙ্গে বাস করিয়া সরলার কি আর জানিতে বাকি আছে নিজের ছেলের মুখ দেখিলে শম্ভুর পাকা শক্ত মনটা কী রকম কাঁচা আর নরম হইয়া যাইবে। তবে ছেলেটার জন্মিতে এখনও অনেক দেরি। তার আগে জমি বেচিয়া বাজাবে মনিহারি দোকান খুলিয়া বসিলে শম্ভু ভাবিবে সব কীর্তি তার একার, কারও কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার কিছু নাই। আগেকার কথা মনে করিয়া সরলা অবশ্য ভাবিয়া উঠিতে পারে না কৃতজ্ঞতার কতখানি দাম আছে শম্ভুর কাছে। বাজারে মনিহারি দোকান খুলিয়া দু-একবছরের মধ্যে এমন অবস্থা যদি হয় শম্ভুর যে মাঝখানের বেড়াটা ভাঙিয়া সরলা নির্ভয়ে এবং সুখে-শান্তিতে, একরকম বাড়ির কর্ত্রীর মতোই সকলের সঙ্গে বাস করিতে পারে, হয়তো অকৃতজ্ঞ পাষাণের মতো শম্ভু নিজেই তাকে দাবাইয়া রাখিবে। তবু, ভবিষ্যতেও সে তার বশে থাকিতে পারে এ রকম একটু সম্ভাবনা যখন দেখা গিয়াছে এবারে হাল ছাড়িয়া দেখাই ভালো যে কী হয়।

সরলার সন্দেহপ্রবণ অবিশ্বাসী বাবা মেয়ের অনুরোধ শুনিয়া প্রথমটা একটু ভড়কাইয়া গেল। একসঙ্গে তিনশো টাকা ! জামাইকে আর একটি পয়সা না দিবার কথাই সে ভাবিতেছিল। দোকান যেমন চলিতেছে শম্ভুর, তাতে দুজন মানুষের খাইয়া-পরিয়া থাকা চলে, বড়োলোকের মতো না হোক গরিবের মতো চলে। জামাইকে বড়োলোক করিয়া দিবার ভার তো সে গ্রহণ করে নাই। মোট ছশো টাকা অবশ্য সে দিবে বলিয়াছিল, তবে সংসারে কত সময় মানুষ অমন কত কথা বলে, সব কি আর চোখকান বুজিয়া অক্ষরে অক্ষরে পালন করা উচিত, না তাই মানুষ পারে ? অবস্থা বুঝিয়া করিতে হয় ব্যবস্থা। তাছাড়া, বাজারে মনিহারি দোকান খোলার মতো দুর্বুদ্ধি যদি শম্ভু করিয়া থাকে—

কাঁদিয়া-কাটিয়া সরলা অনর্থ করিতে থাকে, কত কষ্টে বাপের কাছ হইতে টাকাটা সে আদায় করিয়া দিতেছে, শম্ভুকে তা বোঝানোর জন্য যতটা দরকার ছিল তার চেয়ে বেশি কাঁদাকাটা করে। দেবে বলেছিলে এখন দেবে না বলছ বাবা ?—বলিতে বলিতে দুঃখে অভিমানে বুকটাই যেন ফাটিয়া যাইবে সরলার। একসঙ্গে তিনশো টাকা দেওয়া সরলার বাবার পক্ষে সহজ নয়, তবু একবেলা মেয়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া সে হার মানিল। ছেলে তার আছে তিনটা কিন্তু আর মেয়ে নাই। সরলা তার একমাত্র মা-মরা ছোটো মেয়ে। কোথায় দোকান করিবে, কী রকম দোকান খুলিবে, কত টাকার জিনিস রাখিবে দোকানে আর কত টাকা পুঁজি রাখিবে হাতে, শম্ভুকে এ সব অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সরলার বাবা গম্ভীর চিন্তিত মুখে বিদায় হইয়া গেল।

সরলা বলিল, দেখলে ?

শম্ভু যথোচিতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইল। স্বামীদের যেভাবে স্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত ঠিক সে ভাবে নয়, নম্রভাবে, সবিনয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে। এই সময় বেড়ার ও পাশে হঠাৎ শোনা গেল, ছোটোবউ ক্ষেন্তির খিলখিল হাসি। বেড়ার ফুটায় সে চোখ পাতিয়া ছিল নাকি এতক্ষণ, তাদের আলাপ শুনিতেছিল ? রান্নাব চালাটার পিছন দিয়া ঘুরিয়া সরলা চোখের নিমেষে ও বাড়িতে গিয়া হাজির হইল। বৈদ্যনাথ ক্ষেন্তি আর বাড়ির কুকুরটা ছাড়া উঠান নির্জন। উঠানের বেড়া আর ধানের মরাইটার মাঝখানে দাঁড়াইয়া রসিক বৈদ্যনাথ স্ত্রীর সঙ্গে রসিকতা করিতেছিল।

সবাই কোথা গেছে লো ছোটোবউ ?

কাছে আসিযা ক্ষেন্তি ফিসফিস করিয়া বলিল, ঘরে।

সেটা সম্ভব। চৈত্রের দুপুরে ঘরের বাহিরে কড়া রোদ, গরম বাতাস। কিন্তু এদের দুজনের কি ঘর নাই ? এখানে এরা কী করিতেছে এ সময় ? হাসাহাসি ? নিজের বাড়িতে ফিরিয়া বারান্দা ছাড়িয়া এবার সরলা ও শম্ভু ঘরে গেল। তিন পুরুষের পুরানো পালঙ্কে (ভিন্ন হওয়ার সময় ভাইদের কবল হইতে শম্ভু সেটা কী কৌশলে বাগাইয়াছিল আজও সরলা তাহা বুঝিতে পারে না) শুইয়া সরলা চোখ বুজিল, শম্ভু বসিয়া বসিয়া টানিতে লাগিল তামাক। নিজেই তামাক সাজে কি না শম্ভু, এত বেশি তামাক দেয় যে তামাক শেষ হইতে হইতে দুপুরে এবং রাত্রে দু-বেলাই সরলার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। আজ দেখা গেল সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হয় বাপেব সঙ্গে সমস্ত সকালবেলাটা লড়াই করিয়া না হয় বৈদ্যনাথ ও ক্ষেন্তিকে ধানের মরাইয়ের আড়ালে রোদে দাঁড়াইয়া হাসাহাসি করিতে দেখিয়া সরলা বোধ হয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

দিন সাতেক পরে শম্ভু সকাল বেলা সরলার বাবার কাছ হইতে টাকা আনিবার জন্য রওনা হইয়া গেল। গেল ও বাড়ি হইয়া। দোকানে নূতন মাল আনা সে কিছুদিন আগেই বন্ধ করিয়াছিল, অনেক জিনিস ফুরাইয়া গিয়াছে, অনেক খদ্দের ফিরিয়া যায়। মনিহারি দোকানে যে সব জিনিস রাখা চলিবে না,—চাল ডাল মশলাপাতি, সে সব শেষ হইয়া যাওয়াই ভালো। তাই আজকাল একটা দিনের জন্যও দোকানটা সে বন্ধ রাখিতে চায় না। বৈদ্যনাথ আসিয়া দোকানে বসিবে। বেকার রসিক বৈদ্যনাথ। শম্ভুর যে ছোটো ভাই এবং যে দুপুর রোদে উঠানে ধানের মরাইয়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া বউয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করে। শম্ভুও একদিন বেকার ছিল, বউও ছিল শম্ভুর—ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়ার মতো হাড্ডিসার হোক, বউ বউ। ক্ষেন্তিই বা এমন কী রূপসি পরির মতো ? ওর মাথায় বরং ছিট আছে, এক বছর আগেকার সরলার মতো কম খাইয়া বেশি খাটিতে খাটিতেও কারণের চেয়ে অকারণেও বেশি খিলখিল করিয়া হাসে। বেকার অবস্থায় একবারও নয়, দোকানদার হওয়ার পর শম্ভুকে কয়েকবার হাসাহাসি করিতে দেখিয়াছে সরলা, কিন্তু সে অন্য একজনের সঙ্গে। তারপর শম্ভু বউকে কিনিয়া দিয়াছে ডুরে শাড়ি। অন্য অনেকের সঙ্গেই বৈদ্যনাথ হাসাহাসি করে, ক্ষেন্তিকে কিন্তু কখনও কিছু কিনিয়া দেয় না। কী করিয়া দিবে ? পয়সা নাই যে ! দু-ভায়ের মধ্যে প্রভেদটা কী আশ্চর্যজনক ! নামে নামে পর্যন্ত শুধু 'নাথ'-এর মিল, ওটা বাদ দিলে একজন শম্ভু অন্যজন বৈদ্য !

মল না বাজাইয়া দোকানে তাকের আড়ালে দাঁড়াইয়া সরলা বৈদ্যনাথের অনভ্যস্ত দোকানদারি দেখে। মালপত্রের অভাবে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লক্ষ্মীছাড়া মনে হয় দোকানটা।

কদিন হইতে মনটা ভালো ছিল না সরলার, উঁচু দাঁত দুটি অনেক সময় ঢাকা পড়িয়া যাইতেছিল। পাকা দোকানির মেয়ে সে, কাঁচা দোকানির বউ, তার কেবল মনে হইতেছিল ভুল হইয়াছে, ভুল হইয়াছে, শুধু লোকসান নয়, একেবারে সে দেউলিয়া হইয়া যাইবে এবার। কিছুদিন হইতে কী রকম যেন হইয়া উঠিয়াছে পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা তার ; সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না,

তবু চোখকান বুজিয়া এই সব না-বোঝা অবস্থা ও ঘটনাগুলিকে পরিণতির দিকে চলিতে সাহায্য করিতেছে। আজকাল শম্ভু ঘনঘন ও বাড়িতে যাওয়া-আসা শুরু করিয়াছে, ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছে, সেটা না হয় জমিজমার ভাগবাঁটোয়ারাব জন্যই হইল, শম্ভুর সঙ্গে ও বাড়ির সকলের ব্যবহার ? ও বাড়িতে কি শুধু দেবদেবী বাস করে যে, এক বছর ধরিয়া এমনভাবে ভিন্ন হইয়া থাকিযা জমিজমার ভাগবাঁটোয়ারা করিতে গেলেও শম্ভুব সঙ্গে ওরা সকলে পরমাত্মীয়ের মতো ব্যবহার করিবে ? তাছাড়া এখানকার দোকান তুলিযা দিয়া বাজারে দোকান খুলিতেছে শম্ভু, সে জন্য ও বাড়িতে একটা উত্তেজনাব প্রবাহ আসিবে কেন ? ওদের কী আসিয়া যায় ? বেড়ার ফুটায় চোখ রাখিয়া সরলা স্পষ্ট বুঝিতে পারে ও বাড়ির বয়স্ক মানুষগুলির কী যেন হইয়াছে, অদূরভবিষ্যতে বিবাহ উপনয়নের মতো বড়ো রকম একটা ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে বাড়ির লোকগুলি যেমন করে, ওরাও করিতেছে অবিকল তেমনই। হইতে পাবে শম্ভুর বাজারে দোকান খোলার একই সময়ে ওদের সংসারেও একটা বড়ো ব্যাপার ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে, তবে সেটা যে কী ব্যাপার তা সরলা জানিতে পারিতেছে না কেন ? বেড়ার ও পাশে যা ঘটিবে, সকলে গোপন না করিলে সরলার কাছে তো তা গোপন থাকার কথা নয়। আর, সরলাব কাছে সকলে যা গোপন করিবে, তাব পক্ষে সেটা কি কখনও শুভকর হইতে পারে ?

শুধু টাকা আদায়েব চেষ্টা করার বদলে বাপের সঙ্গে এ সব বিষয়ে পরামর্শ না কবার জন্য সরলার দুঃখ হয়। মেয়েমানুষ সে, এত লোকের ষড়যন্ত্র সে কি সামলাইয়া চলিতে পারে ? চক্রান্তটা বুঝিতে পারিলেও বরং আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া দেখিত, একটা বুদ্ধি খাটানো চলিত। সে যে অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছে, স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে। সে যে ঠিক করিয়াছে এবার হাল ছাড়িয়া দেওযাই ভালো ! মেয়েমানুষ সে, বউ মানুষ সে, তার কি উচিত এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া রাখা যাহাতে তার বিরুদ্ধে সকলের চুপিচুপি চক্রান্ত করিতে হয় ?

দোকানে খদ্দের নাই দেখিয়া এক সময় সে বৈদ্যনাথকে ভিতরে ডাকিল।

আচ্ছা ঠাকুরপো, ও তোমাদের বাড়ি গিয়ে কী সব বলত বলো তো ?

রসিক বৈদ্যনাথ বলিল, তা জান না মেজোবউঠান ? তোমার নিন্দে করত—তুমি নাকি দাদার এক কান ধরে ওঠাও, আর এক কান ধরে বসাও। কানের ব্যথায়—

সরলা রাগিয়া বলিল, চাষার মতোন কথাবার্তা হয়েছে তোমার বাপু, এদিকে এক পয়সা রোজগার নাই, কথা শুনলে গা জ্বলে মানুষের। বিক্রির পয়সা থেকে আজ কত গাপ করবে তুমিই জান !

কদিন আগে ধানের মরাইয়েব আড়ালে বউয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করার পুবস্কার পাইয়া বৈদ্যনাথ দোকানে গিয়া বসিল। সরলা গালে হাত দিয়া রোয়াকে বসিয়া ভাবিতে লাগিল ভবিষ্যতের কথা। বড়ো ভাই উকিলের মুহুরি, পাত্র নিজে একটা পাস দিবার দু-ক্লাস নীচে পর্যন্ত পড়িয়া একটা আড়তে হিসাব লেখার কাজ করে, এত সব দেখিয়া তার বাবা শম্ভুর সঙ্গে তার বিবাহ দিয়াছিল, তার দাঁত-উঁচু কালো মেয়েকে। নাই বা দিত ? পাশের গাঁয়ের জগৎ নামে যে লোকটি জমি চাষ করিয়া খায় তার সঙ্গে দিলেই হইত ? সে লোকটা এমনিই বশে থাকিত সরলার, আর অদৃষ্টে থাকিলে তাহাকে দিয়া আস্তে আস্তে অবস্থা* উন্নতি করিয়া এমন দিন হয়তো সে আনিতে পারিত যখন ডুরে শাড়িটি পরিয়া মল বাজাইয়া সে ঘুরিয়া বেড়াইত, না করিত সংসারের কাজ, না শুনিত কারও বকুনি। দোকানদারের দাঁত-উঁচু কালো মেয়ের মুখ্যু চাষা স্বামীই ভালো। লেখাপড়া শিখিয়া পরের আড়তে যে কাজ করে আর পরের টাকায় দোকানি হয়, তার মতো পাজি বজ্জাত লোক—

পরদিন অনেক বেলায় শম্ভু ফিরিয়া আসা মাত্র সরলা টের পাইল, যে লোকটা কাল বাড়ি ছাড়িয়া গিয়াছিল অবিকল সেই লোকটাই ফিরিয়া আসে নাই। গিয়াছিল দম আটকানো অবস্থায়,

ফিরিয়া আসিয়াছে হাঁফ ছাড়িয়া। শম্ভু একবার একটা মামলায় পড়িয়াছিল, রায় প্রকাশের দিন সে যেমন অবস্থায় কোর্টে গিয়াছিল আর স্বপক্ষে রায় শুনিয়া যেমন অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছিল, এবার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া-আসা তার সঙ্গে মেলে।

টাকা পেলে ? সরলা জিজ্ঞাসা করিল।

শম্ভু একগাল হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ পেয়েছি।

সব ?

সব। পাখাটা কই ? বাতাস করো না একটু।

সরলা হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল, ওই যে পাখা বেড়ার গায়ে। হ্যাঁগো, দাদা কিছু বলল না এই টাকার ব্যাপার নিয়ে ? বিয়ের সময় তোমাকে চারশো টাকা পণ দেওয়া নিয়ে বাবার সঙ্গে যে কাণ্ডটা বেঁধেছিল দাদার !

শম্ভুর মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল, কড়াদৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, ঘেমে-টেমে এলাম এই রোদে, পাখাটা পর্যন্ত এনে দিতে পার না তুমি হাতে ? অন্য কেউ হলে বাতাস করত নিজে থেকে, বলতেও হত না।

সরলা হাসিয়া বলিল, ছোটোবউ করে, ঠাকুরপো ওকে খুব হাসায় কি না সেই জন্যে।

পাখাটা আনিয়া সরলা স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিল বটে, বাতাসে শম্ভু কিন্তু ঠান্ডা হইল না। ভিতরে ভিতরে সে যে গরম হইয়াই আছে সেটা বুঝা যাইতে লাগিল তার মুখের ভাবে ও তাকানোর রকমে। সরলা আনমনে বলিতে লাগিল, আহা, আমার মাথার যত চুল তত বচ্ছর পরমায়ু হোক ছোটোবউয়ের !

কেন ?

কাল রাত্তিরে দুঃস্বপন দেখলাম যে। হাসতে হাসতে ছোটোবউটা যেন মরে গেছে বুক ফেটে। আগুন লাগুক আমার পোড়া স্বপন দেখায় !

শম্ভু রাগিয়া বলিল, ইয়ার্কি জুড়েছ নাকি আমার সঙ্গে, অ্যাঁ ? ভালো হবে না বলছি। ঘেমে-টেমে এলাম আমি—

বকুনি শুনিয়া সরলা অভিমান করিয়া পাখা ফেলিয়া রোয়াকে গিয়া ছেঁড়া মাদুরে শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া তেল মাখিতে মাখিতে শম্ভু বলিল, রাগ হল নাকি ? রাগবার মতো কী তোমাকে বলেছি শুনি ?

সরলা জবাব না দেওয়ায় গামছা কাঁধে সে স্নান করিতে চলিয়া গেল পুকুরে। চলন্ত স্বামীকে দেখিতে দেখিতে চৈত্রের রোদে চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল সরলার ! ডুরে শাড়ি নয়, লজেনচুস নয়, সোহাগ নয়, মিষ্টি কথা নয়, শুধু সে রাগ করিয়াছে নাকি জিজ্ঞাসা করিয়া স্নান করিতে চলিয়া যাওয়া ! একদিনে এমন অধঃপতন হইয়াছে শম্ভুর ? কে জানে স্নান করিয়া আসিয়া খাইতে বসিয়া ডাল পোড়া-লাগার জন্য সরলাকে হয়তো আজ সে গালাগালি পর্যন্ত দিয়া বসিবে ! সব কথা খুলিয়া বলিয়া বাবার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কী ভুলই সে করিয়াছে।

ডাল পোড়া-লাগার জন্য শম্ভু কিছু বলিল না, বরং মুখভার করিয়া না থাকার জন্য একবার অনুরোধই করিল সরলাকে। সরলা সজল সুরে বলিল, বকলে কেন ? শম্ভু বলিল, না বকিনি। ঘেমে-টেমে এলাম কিনা—

খাওয়ার পর সরলাই আজ তাকে তামাক সাজিয়া দিল। সাজিয়া দিল, ফুঁ দিয়া তামাক ধরাইয়া দিল না। আয়নার সামনে সে অভিনয় করিয়া দেখিয়াছে যে ফুঁ দিবার সময় বড়ো বিশ্রী দেখায় তার মুখখানা। শম্ভু নিজেই তামাক ধরাইয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত টানিতে আরম্ভ করিল। সরলা বলিল, ঠাকুরপো যা বিক্রি-সিক্রি করেছে, হিসাব নিয়ো।

শম্ভু বলিল, নেব।

সরলা বলিল, রাখালবাবুর বাড়ি আধমন চাল নিয়েছে, ছিনাথ উকিলের বাড়ি আড়াই সের মুগের ডাল, আড়াই পো মিছরি আর গায়ে মাখা একটা সাবান, তাছাড়া খুচরো জিনিস অনেক বিক্রি হয়েছে। ভাঁড়ে কবে ঠাকুরপো অনেকটা তেল বাড়ি নিয়ে গেছে কাল, আর আজ নিয়ে গেছে কতগুলো লেবেঞ্চুস, আর কীসেব যেন একটা কৌটো, অত নামটাম জানি না বাপু আমি, জিজ্ঞেস কোরো।

শম্ভু বলিল, আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবেখন।

তারপর এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িল। সরলা একবার ও বাড়িতে গেল। কেহ তাহাকে আসিতেও বলে না, বসিতেও বলে না, তবে এতদিনে এটা তার সহ্য হইয়া গিয়াছে। বড়ো জা কালী শুইয়া আছে, ক্ষেন্তি সেলাই করিতেছে কাঁথা, বৈদ্যনাথ ঘুমে অচেতন। শাশুড়ি উবু হইয়া বসিয়া মালা জপিয়া চলিয়াছে, কাছে চুপচাপ বসিয়া আছে পুঁটি। ভাসুর এ সময় কাজে যায়, নামমাত্র ঘোমটা দিয়া অনেকটা স্বাধীনভাবেই সরলা খানিকক্ষণ এ ঘরে খানিকক্ষণ ও ঘরে বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিল। ক্ষেন্তির কাছেই সে বসিল বেশিক্ষণ· ফিসফিস করিয়া আবোল-তাবোল কতকগুলি কথা বলিল ক্ষেন্তি, একবার খিলখিল করিয়া হাসিল, আসল কথা একটিও আদায় করা গেল না তার কাছে। বাড়ি আসিয়া পালঙ্কে উঠিয়া সরলা বসিয়া রহিল। টাঙানো বাঁশে সাজানো জামাকাপড়গুলি জোর বাতাসে দুলিতেছে, ওর মধ্যে সরলার ডুবে শাড়ি দুখানাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশি। আর দৃষ্টি আকর্ষণ করে শম্ভুর ঘাড়ের কাছে লোমভরা মস্ত জন্মচিহ্নটি। কাত হইয়া শুইয়া আছে শম্ভু, চওড়া পিঠে শয্যায় বিছানো পাটির ছাপ। সরলা বিছানায় উঠিবাব পর সে পাশ ফিরিয়াছে, সরলার দিকে নয়, ওদিকে। কে জানে এটা তাব ভাগ্যেরই ইঙ্গিত কি না ! এ রকম কত ইঙ্গিত ভাগ্য মানুষকে আগেভাগে করিয়া রাখে। শম্ভুর সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে সোনারপুরে তার জন্য খুব ভালো একটি পাত্র দেখিতে বাহির হওযার সময় তার বাবা চৌকাঠে হোঁচট খাইয়াছিল, আগের বারের ছেলেটা তার পেটেব মধ্যেই যেদিন মরিয়া গিয়াছিল তার আগের রাত্রে একটা প্যাঁচা ঘরের পিছনে আমগাছটায় ডাকিয়া ডাকিয়া ভয়ে তাহাকে আধমরা করিয়া দিয়াছিল।—সরলা হঠাৎ শক্ত হইয়া যায়, লম্বাটে হইয়া যায তাব মুখখানা। বেড়ার গায়ে ঠিক এমনি সময় একটা টিকটিকিও যে ডাকিয়া উঠিল আজ ? মাগো, না জানি কী আছে সরলার কপালে !

বিকালে ঘুম ভাঙিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আগের বারের সাজা তামাক টানার সুখটা মনে কবিয়া শম্ভু বলিল, দাও না, এক ছিলিম তামাক সেজে দাও না!

সরলা বলিল, তুমি সেজে নাও।

শম্ভু গভীর উদারতা বোধ করিতেছিল, জেলখানার কয়েদি যেন নিজের বাড়িতে তিন পুরুষের পুরানো পালঙ্কে প্রথম ঘুম দিয়া উঠিয়াছে। নিজেই তামাক সাজিয়া সে গিয়া দোকান খুলিল, কাঠের ছোটো চৌকিটিতে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল। পাড়ার দুঃখী মেয়েটি আসিয়া বাসন মাজিয়া রান্নাঘর লেপিয়া জল তুলিয়া দিয়া গেল। ও বাড়ির দুপুরের স্তব্ধতা ধীরে ধীরে ঘুচিয়া যাইতে লাগিল। বেলা পড়িয়া গেল, সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সরলা গা ধুইল না, রান্নার আয়োজন করিল না, খানিকক্ষণ ছটফট করিতে লাগিল অন্দরে 'আর খানিকক্ষণ ফাঁকে চোখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে লাগিল দোকানে তাকের আড়ালে। সন্ধ্যার পর দীননাথ কাজ হইতে ফিরিয়া বাড়ি ঢোকার আগে আসিল শম্ভুর দোকানে। উপস্থিত খদ্দেরটি চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিল, টাকা পেয়েছিস ?

হাঁ, বাড়ি যান আমি যাচ্ছি।

এখানেই বসি না, বসে কথাবার্তা কই ?

না, না, এখানে নয়, আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি সব শোনে।

দীননাথ এ বগলের নথিপত্র ও বগলে চালান করিয়া বলিল, বাড়িতে ছেলেপিলেগুলো বড্ড জ্বালায়। বউমা এলে মলের আওয়াজে— ?

সরলার মল যে সব সময় বাজে না এ কথা বুঝাইয়া বলিতে সে যে কেমন লোকের মেয়ে এ বিষয়ে একটা মন্তব্য কবিযা দীননাথ বাড়ি গেল। খানিক পরে দোকান বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া শম্ভু গেল অন্দরে। ত্রিকোণ উঠানের এক কোণে এক বছর আগে সরলার স্বহস্তে রোপিত তুলসীগাছটার তলায় শুধু একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে নিবুনিবু অবস্থায়, আর কোথাও আলো নাই। বেড়া ডিঙাইয়া ও বাড়ির আলো খানিকটা শোবার ঘরের চালে আসিয়া পড়িয়াছে ! ঘরে গিয়া একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া সরলা যে খাটে শুইয়া আছে শম্ভু তাহাও দেখিয়া লইল, একটা বিড়িও ধরাইয়া লইল। তারপর সরলাকে একবার ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া গেল ও বাড়িতে।

তখন উঠিয়া বসিল সরলা। এ বাড়িতে এক বছর রানির মতো যে মল বাজাইয়া সে হাঁটিয়া বেড়াইয়াছে আজ প্রথম সেই মলগুলি খুলিয়া ফেলিল। এমন হালকা মনে হইতে লাগিল পা দুটিকে সরলার ! লঘুপদে সে নামিয়া গেল উঠানে। বেড়ার ফুটায় চোখ দিয়া বুঝিতে পারিল ও বাড়ির একমাত্র কালি-পড়া লণ্ঠনটি জ্বলিতেছে বড়ো ঘবে এবং ও ঘরেই আসর বসিয়াছে তিন ভাইয়েব, দরজার কাছে বসিয়া আছে কালী আর ভিতরে তার শাশুড়ির শরীরটা রহিয়াছে আড়ালে, শুধু দেখা যাইতেছে মালা-জপ-রত হাত। রান্নাব চালাটার পিছন দিয়া ঘুরিয়াই বেড়ার ও পাশে ও বাড়ির উঠানের একটা প্রান্ত পাওয়া যায়। সরলা সেদিকে গেল না, একেবারে নামিয়া গেল ও বাড়ির রান্নাঘর ও তার লাগাও ক্ষেন্তির ঘরের পিছনে ঝোপঝাড়ের মধ্যে। কী অন্ধকার চারিদিক। ভয়ে সরলার বুক টিপটিপ করিতেছিল। ছিটাল পার হওয়ার সময়ে পায়ে একটা মাছের কাঁটা ফুটিল। কিন্তু কী করিবে সরলা ? ভয় করা আর মাছের কাঁটা ফোটাকে গ্রাহ্য করিলে তার চলিবে কেন ? একা মেয়েমানুষ সে, এতগুলি লোক তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র জুড়িয়াছে, রচনা কবিতেছে ফাঁদ। কীসেব ভয় এখন, কীসের কাঁটা ফোটা ! আর যা হয় হোক, অন্ধকারে এভাবে বনে জঙ্গলে আব ছিটালে হাঁটাব জন্য কিছু যেন তার নাগাল না পায়, পেটের ছেলেটা এবারও যেন তার মরিয়া না যায় জন্ম নেওযাব আগেই। এলোচুলে সে ঘরের বাহির হয় নাই, একটি চুল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখে কামড় দিয়া তবে উঠানে নামিয়াছে, এই যা ভরসা সরলার।

বড়োঘরের পিছনে কয়েকটা কলাগাছ আছে, ঘরেব দুটো জানালাও আছে এদিকে। উঁচু ভিটাব ঘর, জানালাগুলিও বেড়ার অনেক উঁচুতে। এত কষ্টে এখানে আসিয়া জানালার নাগাল না পাইয়া সরলার কান্না আসিতে লাগিল। তবে জানালার পাশে পাতা চৌকিতেই বোধ হয় তিন ভাই বসিয়াছে, ওদের কথাগুলি বেশ শোনা যায়, শুধু বোঝা যায না পুঁটি কালী শাশুড়ি ওদের মন্তব্য। কান্না এবং ঘরেব ভিতরের দৃশ্যটা দেখিবার প্রবল ইচ্ছা দমন করিয়া সরলা কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

শম্ভুর গলা : ক-বার তো বললাম, এই সোজা হিসেবটা তোর মাথায় ঢোকে না বদ্যি ? আমার দোকানে যা মনিহারি জিনিস আছে তার দাম একশোর বেশিই হবে, ধরলাম একশো। মাল না কেনার জন্যে হাতে জমেছে একশো দু-পাঁচটাকা,—ধরলাম একশো। আর শ্বশুরমশায় দিয়েছে তিনশো। এই হল পাঁচশো, আমার ভাগ। তুই আর দাদা পাঁচশো করে দিলে হবে দেড় হাজার। হাজার টাকায় দোকান হবে ; হাতে থাকবে পাঁচশো।

হাসি চাপিতে ক্ষেন্তির মুখের কাপড় গোঁজার আওয়াজ। দীননাথের গলা : বউমা ! বেহায়াপনা কোরো না বউমা।

কী জানিস শম্ভু, বড়ো বউয়ের সব গয়না বেচে আর কুড়িয়ে বাড়িয়ে আমি না হয় পাঁচশো দিলাম, বদ্যি অত টাকা কোথা পাবে ? ছোটোবউমার গয়না বেচলে তো অত টাকা হবে না।

বৈদ্যনাথের গলা : দু-তিনেক হয়তো ঢের : তবে আমার বিয়ের আংটি বেচলে—

শম্ভুর গলা : থাম বাপু তুই, সব সময় খালি ফাজলামি তোর।

দীননাথের গলা : যেমন স্বভাব হয়েছে তোর তেমনি স্বভাব হয়েছে ছোটোবউমার।

শম্ভুর গলা : যাক, যাক। কাজের কথা হোক। বদ্যি তবে আড়াইশো দিক, লাভের আমরা যা ভাগ পাব ও পাবে তার অদ্দেক। ভাগাভাগির কথা বলছি এই জন্যে, আগে থেকে এ সব কথা ঠিক করে না রাখলে পরে আবার হয়তো গোল বাধবে। যে যত দেবে তার তত ভাগ, বাস, সোজা কথা ; সব গন্ডগোল মিটে গেল।

একটু স্তব্ধতা। তারপর দীননাথের গলা : তবে আমিও একটা পষ্ট কথা বলি তোকে শম্ভু। তুই যে পাঁচশো টাকা দিবি—

শম্ভুর গলা : পাঁচশো নগদ নয়, একশো টাকার জিনিস, চারশো নগদ।

দীননাথের গলা : বেশ। চারশোই আমাদের একবার তুই দেখা। গয়নাগাঁটি বেচে ফেলবার পর শেষে যে তুই বলবি—

শম্ভুর গলা (ক্রুদ্ধ) : আমাকে বুঝি বিশ্বাস হয় না আপনার ? ভাবছেন আমি ভাঁওতা দিয়ে—

চার-পাঁচটি গলার প্রতিবাদ। শম্ভুর গলা (আরও ক্রুদ্ধ) : সকলকে সমান সমান ভাগ দিতে চাচ্ছি কিনা তাই আমাকে অবিশ্বাস ! আমি যেন একা গিয়ে দোকান করতে পারি না ! পাঁচশো টাকা নিয়ে যদি দোকান খুলি আমি, এক বছরে হাজার টাকা লাভ করব, না আসতে চাও তোমরা নাই আসবে ! চাই না তোমাদের টাকা।

কোলাহল, কলহ, কড়া কথা, মধ্যস্থের গোলমাল থামানোর চেষ্টা। খানিকক্ষণ বাজে ব্যক্তিগত কথা। আবার ঝগড়া বাধিবার উপক্রম।

তারপর শম্ভুর গলা : বেশ, কাল সকালে টাকা দেখাব।

দীননাথের গলা : গজেন স্যাকরার সঙ্গে কথা কয়ে এসেছি, সাড়ে ঊনত্রিশ দর দেবে বলেছে। কাল কাজে না গিয়ে গয়নাগুলোর ব্যবস্থা করব। যা লোকসানটাই হবে ! এমনি সোনা হয় আলাদা কথা, তৈরি গয়না বেচার মতো মহাপাপ আর নাই। বউমা বুঝি রাঁধেনি আজ ? এখানেই তবে তুই খেয়ে যা শম্ভু। ও পুঁটি, ঠাঁই করে দে তো আমাদের।

বাক্সে টাকাগুলি রাখিয়াছিল শম্ভু, কোথায় যে গেল সে টাকা ! টাকার শোকে এবং ও বাড়ির সকলের কাছে লজ্জায় শম্ভু পাগলের মতো চুল ছিঁড়িতে লাগিল।

সরলা সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিল, কী আর করবে বল ? অদেষ্টের ওপর তো হাত নেই মানুষের ! আমি ঘুমোচ্ছি, ঘরের দরজা খোলা, আর তুমি ও বাড়িতে গিয়ে বসে রইলে রাত দশটা পর্যন্ত ! আর ওই তো বাস্‌কো ! শাবলের এক চাড়েই হয় তো ভেঙে গেছে। আমারই বা কী ঘুম, একবার টের পেলাম না !

দুচোখে সন্দেহ ভরিয়া চাহিয়া শম্ভু বলিল, টের পেয়েছ কি না পেয়েছ—

সরলা তাড়াতাড়ি বলিল, এমন কোরো না লক্ষ্মী। যেমন দোকান করছিলে তেমনি করো এখন, বাবাকে বলে আর কিছু টাকা—

আর কী টাকা দেবে তোমার বাবা !

সহজে কি দেবে ? আমি কাঁদাকাটা করলে—

ঝমর ঝমর মল বাজাইয়া গিয়া সরলা স্বামীকে এক বাটি মুড়ি ও খানিকটা গুড় আনিয়া দিল। সস্নেহে বলিল, খাও। না খেলে কি টাকা ফিরে পাবে ? বাবা টাকা যদি নাই দেয়,—দেবে ঠিক, যদির কথা বলছি—আমি গয়না বেচে তোমায় টাকা দেব।

কেরানির বউ

সরসীর মুখখানি তেমন সুশ্রী নয় ! বোঁচা নাক, ঢেউ তোলা কপাল, ছোটো ছোটো কটা চোখ। গায়ের রং তার খুবই ফরসা, কিন্তু কেমন যেন পালিশ নাই। দেখিলে ভিজা স্যাঁতসেঁতে মেঝের কথা মনে পড়িয়া যায়।

সরসীর গড়ন কিন্তু চমৎকার। বাঙালি গৃহস্থ সংসারের মেয়ে, ডাল আর কুমড়ার ছেঁচকি দিয়া ভাত খাইয়া যারা বড়ো হয়, একটা বিশেষ বয়সে মাত্র তাদের একটুখানি যৌবনের সঞ্চার হইয়া থাকে, বাকি সময়ের সবটাই অসামঞ্জস্য। সে হিসাবে সরসী বাস্তবিকই অসাধারণ। তার শরীরের মতো শরীর সচরাচর চোখে পড়ে না। ঘোমটা দিয়া থাকিলে কবিকে সে অনায়াসে মুগ্ধ করিতে পারে। একটু নিচুদরের ব্রহ্মচারীর মনে ঘোমটা খুলিয়া তার মুখখানি দেখিবার সাধ জাগা আশ্চর্য নয়।

ঘটনাটা নিছক মাতৃমূলক। সরসীর মার অনেক বয়স হইয়াছে, চল্লিশের কম নয় ; কিন্তু এখনও তার শরীরের বাঁধুনি দেখিলে আপনাব বিস্ময় বোধ হয় এবং তিনি লজ্জা পান।

তেরো বছর বয়সে সরসী টের পায় যে অহংকার করার মতো গায়ের রং তো তার আছেই, কিন্তু আসল রূপ তার গায়ের রঙে নয়, অস্থিমাংসের বিন্যাসে। টের পাইবার পর সরসীব কাপড় পরার ভঙ্গি দেখিয়া সকলে অবাক !

ও কী লো ? ও আবার কী ঢং ?

ঢং আবার কোথায় দেখলে ?

ও কী কাপড় পরার ছিরি তোর ? সং সেজেছিস কেন ?

বেশ করেছি। তোমার কী।

মুখে আগুন মেয়ের !... যাসনে,. সং সেজে ঢং করে পাড়া বেড়াতে তুই যাসনে সরি ! মেরে পিঠেব চামড়া তুলে ফেলব।

পাড়া বেড়ানোর শখ সরসীর আপনা হইতেই গেল।

একদিন বাড়ি ফিরিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া তার কী কান্না !

কী হয়েছে লো ?

সরসী বলিতে পারে না। অনেক চেষ্টায় একটু আভাস দিল। বাকিটুকু মা জেরা করিয়া জানিয়া নিলেন।

জানিয়া মাথায় যেন তার বাজ পড়িল। এ কী সর্বনাশ !

রাগের মাথায় মেয়ের পিঠেই গুমগুম করিয়া কয়েকটা কিল বসাইয়া দিলেন। বলিলেন, সেইকালে বারণ করেছিলাম সারা দুপুর টো টো করে ঘুরে বেড়াসনে সরি, বেড়াসনে। হল তো এবার ? মুখে চুনকালি না দিয়ে ছাড়বি, তুই কী সেই মেয়ে !

সরসী খুব কাঁদিল। রাত্রে ভাত খাইল না। দারুণ অভিমানে ভাবিতে লাগিল, মা আমাকেই মারল কেন ? আমার কী দোষ ?

সংসারের অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, কিন্তু এ ব্যাপারটা তার কাছে চূড়ান্ত রকমের রূঢ় ঠেকিল। তার কোনোই অপরাধ নাই ; সুবলদার মতলব বুঝিতে পারা মাত্র তার হাতে কামড়াইয়া দিয়া পলাইয়া আসিয়াছে সে এত ভালো মেয়ে। তবু তাকেই মার খাইতে হইল ! সকলের ভাব দেখিয়া বোঝা গেল সেই একটা অপকর্ম করিয়াছে, দোষ আগাগোড়া তারই !

সুবলের কী শাস্তি হয় দেখিবার জন্য সরসী ব্যগ্র হইয়া রহিল, কিন্তু সুবলের কিছুই হইল না। সুবলের বাবাকে ব্যাপারটা জানাইয়া দিবার পরামর্শ পর্যন্ত মার যুক্তিতর্কে বাতিল হইয়া গেল। সরসীর প্রতিই শাসনের অবধি রহিল না। আপনজন যেই বাড়ি আসিল সকলের কাছে একবার করিয়া ব্যাপারটার ইতিহাস বলিয়া তাকে লজ্জা দেওয়া হইতে লাগিল। এ বাড়িতে দুজনকে চুপিচুপি কথা বলিতে দেখিলেই সরসী বুঝিতে পারে, তার কথাই আলোচিত হইতেছে। নিদারুণ কড়াকড়ির মধ্যে পড়িয়া কয়েক দিনের মধ্যেই সরসী হাঁপাইয়া উঠিল।

সময়ে শাসনও একটু শিথিল হইল, সরসীরও সহ্য হইয়া গেল, কিন্তু মনে মনে সে এমন ভীরু হইয়া পড়িল বলিবার নয়।

ছেলেবেলা হইতে চেনা ছেলেরা বাড়িতে আসিলে একা তাদের সঙ্গে কথা বলিতে সরসীর ভয় করিতে লাগিল। লোকে দোষ দিবে, ভাবিবে, কী জানি মনে ওর কী আছে ! একা পাশের বাড়ি যাওয়ার সাহস পর্যন্ত সে হারাইয়া ফেলিল। দুপুরবেলা সে মার কাছে শুইয়া থাকে, ঘুম আসে না, অন্যঘরে গিয়া একটু একা থাকিতে ইচ্ছা করে, তবু সে শুইয়া থাকে। কোথায় গিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলে সে যদি বলে যে বাড়িতেই ছিল, পাশের ঘরে ছিল, কোথাও যায় নাই, মা হয়তো সে কথা বিশ্বাস করিবে না।

সংসারের আর সমস্ত মেয়ের মতো সে নয়, কুমারীধর্ম বজায় রাখার জন্য তার ওদের মতো যথেষ্ট ও প্রাণপণ চেষ্টা নাই ; সকলের মনে এমনই একটা ধারণা জন্মিয়াছে জানিয়া সরসী দিবারাত্রি সজ্ঞানে নিজের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল।

সকলের চুরি চুরি খেলার মধ্যে চুরি না করিয়াও বেচারি হইয়া রহিল চোর।

উপদেশ শুনিল : মেয়েমানুষের জীবনে আর কাজ কী মা ? চান্দিকে পুরুষ গুন্ডা হাঁ করে আছে, পা পিছলে না ওদের খপ্পরে পড়তে হয়,—বাস্ এইটুকু সামলে চলা।

ছড়া শুনিল : পুড়ল মেয়ে উড়ল ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই !

শুনিয়া শুনিয়া সরসীর ভয় বাড়িয়া গেল। সংসারের নারী-সংক্রান্ত নিয়মগুলি এখন সে মোটামুটি বুঝিতে পারে। ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে যে খারাপ হওয়াটাই প্রত্যেক মেয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ; মেয়েদের খারাপ না হওয়াটাই আশ্চর্য। এই আশ্চর্য কাজটা করাই নারী জীবনের একমাত্র তপস্যা।

সাবধানী হইতে হইতে সরসী ক্রমে ক্রমে অতি সাবধানী হইয়া গেল। ভালো হইয়া থাকাটা তার কাছে আর ব্যক্তিগত ভালোমন্দ বিবেচনার অন্তর্গত হইয়া রহিল না। সকলে চায় শুধু এই জন্যই নারীধর্ম পালন করিয়া যাওয়ার জন্য নিজেকে সে বিশেষভাবে প্রস্তুত করিয়া নিল।

তারপর, ষোলো বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার কয়েক মাস আগে রাসবিহারীর সঙ্গে সরসীর বিবাহ হইয়া গেল।

বলা বাহুল্য, রাসবিহারী কেরানি।

বলা বাহুল্য এই জন্য যে সরসী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের মেয়ে, বরাবর গাঁয়ে থাকার জন্য খানিকটা গেঁয়ো আর কথামালা পড়া বিদ্যা' লুকাইয়া নভেল পড়ার জন্য একটু শহুরে, অসামান্য অঙ্গসৌষ্ঠবের জন্য তার শুধু স্বাস্থ্য ভালো এবং গায়ের রঙের জন্য সে একটু মূল্যবতী। কেরানি ছাড়া এ সব মেয়ের বর হয় না। রাসবিহারীর মাহিনা যে এখন একশোর কাছে এবং একদিন দুশোর কাছে পৌঁছানোর সম্ভাবনা আছে, সে শুধু সরসীর ওই রংটুকুর কল্যাণে।

রাসবিহারীর সাইজ মাঝারি, চেহারা মাঝারি, বিদ্যা মাঝারি, বুদ্ধি মাঝারি। যাকে বলে মধ্যবর্তী, তাই। সরসীকেও সে মাঝারি নিয়মে ভালোবাসিল, কখনও মাথায় তুলিল, কখনও বুকে নিল, কখনও

পায়ের নীচে চাপিয়া রাখিল। বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যে রাগের মাথায় দুই-একবার চড়-চাপড়টা দিতে যেমন কসুব করিল না, ন-ভরি সোনার একছড়া হার এবং মধ্যে মধ্যে ভালো কাপড়ও তেমনই কিনিয়া দিল।

রাসবিহারী আর তার দাদা বনবিহারী এক বাড়িতেই বাস করিতেছিল। মাসের পয়লা তারিখে রাসবিহারী বরাবর মাহিনার তিনের চারি অংশ দাদার হাতে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছে, বিবাহের বৎসর দুই পরে সেটা কমাইয়া কমাইয়া অর্ধেক করিয়া আনায় বনবিহারী তাকে পৃথক করিয়া দিল।

পটলডাঙায় একটা বাড়ির দোতলায় একখানা শয়নঘর, একটি রান্নাঘর ও খানিকটা বারান্দা ভাড়া নিয়া রাসবিহারী উঠিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিল !

সরসীকে বলিল, সংসার চালাতে পারবে তো ?

সরসী বলিল, ওমা ! তা আর পারব না ?

বলিয়া বিবাহের পর এই প্রথম হাসিমুখে যাচিয়া দুই হাতে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্বামীকে চুম্বন করিল।

স্বাধীনতার, বেশি নয়, অল্প একটু স্বাধীনতার লোভে সরসীর খুশির সীমা ছিল না। স্বামী তো তাহার আপিস যাইবে ? সে বাড়িতে থাকিবে,—একা ! একেবারে একা ! চাকবেব চোখের সামনে কলতলায় স্নান করিলে কেহ তাকে গাল দিবে না, দুইবেলা পাশের বাড়ি গেলে কেহ জানিবে না, খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক দেখিলে আর রাস্তার অজানা, অচেনা, ভয়ংকর ও রহস্যময় লোকদের নিজেকে দেখাইলে কেহ কিছু মনে করিতে আসিবে না।

বনবিহারীর স্ত্রী চারটি সন্তান প্রসব করিয়া আর অজস্র পানদোক্তা খাইয়া শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে, রাসবিহারীদের যাওয়ার দিন সে স্বামীকে বলিল, যাই বল বাবু, বাঁচলাম।

এবং একসময় রাসবিহারীকে একান্তে ডাকিয়া দিয়া বলিল :

তোমার ভালোর জন্যই বলা।

রাসবিহারী কৌতূহল প্রকাশ করিলে এদিক-ওদিক চাহিয়া নিচু গলায়··

বউকে একটু সামলে চলো।

কেন ?

কেমন যেন বাড়াবাড়ি। সেদিন রাখাল এসেছিল জানো, নীচে আমি খাবার-টাবার করছি, বললাম, ও ছোটোবউ, বাড়িতে একটা লোক এসেছে, দুটো কথাবার্তা বলো গে, একা একা চুপ করে বসে থাকবে ? তা ছোটোবউ—কী জবাব দিলে শুনবে ? বললে, পারব না দিদি, আমার লজ্জা করছে ! আমার ভাইয়ের,—বয়েস এখনও ওর আঠারো পোরেনি, ভগবান সাক্ষী—আমার ভাইয়ের কাছে ওর লজ্জা কী বল তো ?

রাসবিহারী বলিল, কী জানি।

অথচ আড়াল থেকে নুকিয়ে নুকিয়ে দেখার কামাই নেই। কী তাকানি, যেন গিলে খাবে।

রাসবিহারী বলিল, তা তোমার ভাইকে দেখলে দোষ কী ?

বনবিহারীর স্ত্রী একটু হাসিল। অনেক পানদোক্তা খাওয়ার জন্য মুখের হাসি পর্যন্ত তার ঝাঁঝালো।

বলিল, তারপর শোনো। এদিকে ছাতে কাপড়টি মেলে দিয়ে আসতে বললে যায় না, বলে চাদ্দিক থেকে তাকায় দিদি, আমি যাব না। আমি মরি সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে, ভাবি, আহা ছেলেমানুষ, না যায় না যাক, পাড়ার লোকগুলোও তো পোড়ারমুখো নয় কম। ওমা, এদিকে দুপুরবেলা চোখ বুজিছি কি বুঝিনি, অমনি তুড়ুক করে ছাতে গিয়ে হাজির !

রাসবিহারী বলিল, ছাতে গিয়ে কী করে ?

কে জানে বাবু কী করে। কে খোঁজ নিতে যায় ? একদিন মাত্র দেখেছি, মাথার কাপড় ফেলে, চুল এলো করে মহারানি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

চুল শুকোচ্ছিলো হয়তো।

হবে। কিন্তু লুকিয়ে যাবার দরকার ! যাব না বলে সরমের কাঁদুনি গাইবার দরকার !

সরসীর কৌতূহল প্রচণ্ড। বাড়ির কোথাও গোপনে কিছু ঘটিবার যো নাই। রাত্রে বনবিহারী কতক্ষণ হুঁকা টানে, বড়োবউ তাকে কী বলে না বলে, কী নিয়া মধ্যে মধ্যে তাদের বচসা হয়, এ সব খবরও সরসী অনেক রাখে। আড়ালে দাঁড়াইয়া বড়োবউয়ের কথাগুলি শুনিতে সে বাকি রাখিল না। তখনকার মতো সরসী চুপ করিয়া রহিল। বড়োবউ চুল বাঁধিয়া দিতে চাহিলে বিনা আপত্তিতে চুল বাঁধিল, সিঁদুর পরানোর পর যথানিয়মে তাকে প্রণামও করিল। জিনিসপত্র অধিকাংশই সকালে সরানো হইয়াছিল, বিকালে গাড়ি ডাকিয়া বাকি জিনিস উঠাইয়া রাসবিহারী যখন শেষবারের মতো নীচে গিয়া তার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তখন মুখখানা ভয়ানক গম্ভীর করিয়া সরসী বড়োবউকে বলিল, সকালবেলা ওঁকে কী বলেছিলে দিদি ?

কাকে ? ঠাকুরপোকে ? কই, কিছু বলিনি তো !

তোমার মুখে কুঠ হবে।

কী বললি ?

বললাম তোমার মুখে কুঠ হবে। কুঠ কাকে বলে জান না ? কুষ্ঠব্যাধি।

কার মুখে কুঠ হবে ভগবান দেখছেন। আমি তোর গুরুজন, আমাকে তুই—

আ মরি মরি, কী গুরুজন ! মুখে আগুন তোমার মতো গুরুজনের ! বানিয়ে বানিয়ে কথা শুনিয়ে স্বামীর মন ভারী করে দিতে একটু বাধে না, তুমি আবার গুরুজন কীসের ? পাবে পাবে, এর ফল তুমি পাবে। যে মুখে আমার নামে মিথ্যে করে লাগিয়েছ সে মুখে যদি পোকা না পড়ে তো চন্দ্রসূর্য আর উঠবে না দিদি, ভগবানের সৃষ্টি লোপ পেয়ে যাবে। আমি যদি সতী হই তো— ভাবাবেগে সরসী কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু বলিতে ছাড়িল না,—আমি যদি সতী হই তো আমার যতটুকু অনিষ্ট তুমি করলে ভগবান তোমাকে তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেবেন। অঙ্গ তোমার খসে খসে পড়বে দিদি, পচে যাবে, গলে যাবে— ভাসুরঠাকুর দূর দূর করে তোমাকে বাড়ি থেকে দেবেন খেদিয়ে !

সরসী যে এমন করিয়া বলিতে জানে বড়োবউয়ের তা জানা ছিল না। হেলে সাপকে কেউটের মতো ফোঁস ফোঁস করিতে দেখিয়া সে এমন অবাক হইয়া গেল যে ভালোমতো একটা জবাবও দিতে পারিল না। চোখ মুছিয়া গাড়ি চাপিয়া সরসী বিজয় গর্বে চলিয়া গেল। মুখ দিয়া উপরোক্ত কথাগুলি স্রোতের মতো অবাধে বাহির করিয়া দিতে পারিয়া নিজেকে তার খুব উচ্চশ্রেণির আদর্শ স্ত্রী বলিয়া মনে হইতেছিল।

নূতন বাড়িতে আসিয়া সরসী সংসার গুছাইয়া বসিল। শোবার ঘরখানা রাস্তার ঠিক উপরে। রাস্তার ও পাশে সামনের বাড়ি হইতে ঘরের ভিতরটা সব দেখা যায়। জানালার আগাগোড়া সরসী পর্দা টাঙাইয়া দিল। রাসবিহারীকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল—পর্দা সরিয়ো না বাবু, ও বাড়ি থেকে দেখা যায়। ঘরটা একটু অন্ধকার হল,—কী করব !

রাসবিহারী ভাবিল, বড়োবউয়ের কথাটা মিথ্যা নয়। সরসীর একটু বাড়াবাড়ি আছে।

কাল তারা হোটেলের ভাত আনিয়া খাইয়াছিল। ঘর গুছানো ও জানালার পর্দা-টাঙানোর হিড়িকে এ বেলাও সরসী রাঁধিতে পারে নাই। রাসবিহারীকে আপিসের বেলা হইলে সরসী বলিল, হোটেলে খেয়ে তুমি আপিস চলে যাও, আমি এক ফাঁকে দুটি ভাতে ভাত ফুটিয়ে নেব।

রাসবিহারী মনে মনে বিরক্ত হইয়া জামা গায়ে দিল। ঘরের দেয়ালে একটু ফুটা থাকার আশঙ্কার কাছে স্বামীর খাওয়া চুলোয় যায়, সব সময় এ গভীর ভালোবাসা হজম করা শক্ত।

তবু, বাহিরে যাওয়ার আগে রাসবিহারী বলিয়া গেল, ছাতে উঠো না।

সরসী বলিল, না।

বলিয়া তৎক্ষণাৎ আবার জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কাপড় শুকোতে দেব কোথায় ?

দিয়ো, ছাতেই দিয়ো। দিয়ে চট করে নেমে আসবে।

আচ্ছা।

এ সব অপমান সরসীর গায়ে লাগে না। অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। খোলা ছাদের চারিদিকে প্রলোভন, চারিদিকে বিস্ময়, চারিদিকে রহস্য। স্বামী তো বারণ করিবেই। কিছু মন্দ ভাবিয়া নয়, তার মঙ্গলের জন্যই বারণ করা।

রাসবিহারী বাহিব হইয়া যাওয়ার পাঁচ মিনিট পরে সরসী ছাদে উঠিল। ভাবিল, এক মিনিট, এক মিনিট শুধু চারিদিকে চোখ বুলিয়ে আসব।

কিন্তু এক মিনিটে চোখ বুলানো যায় না।

ইটের স্তূপ জড়ো করিয়া মানুষ এই শহর গড়িয়াছে, চারিদিকে সীমাহীন সংখ্যাহীন মানুষেব আস্তানা, কোনোদিকে শেষ নাই, কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই, নীড়ে নীড়ে একটা বিস্ময়কর জমজমাট আলিঙ্গন, ছাদে ছাদে আলিসায় কার্নিশে একটা অবিশ্বাস্য মিলন। এই বিপুলতার বিস্ময় অনুভব করিতেই সরসীর আধঘণ্টা কাটিয়া গেল, কোনো একটি বিশেষ বাড়িকে বিশেষভাবে দেখিবাব অবসব এই সময়ের মধ্যে সে পাইল না,—এ তো তার চেনা শহর, সে বাড়ির ছাদ হইতে সকলকে লুকাইয়া,—না সকলকে লুকাইয়া নয়, অত সাবধানতা সত্ত্বেও বড়োবউ টের পাইয়াছিল,—এই শহরকেই সে দেখিয়াছে, কিন্তু নতুন বাড়ির নতুন ছাদে মাথার কাপড় পায়েব নীচে শুকনো শ্যাওলায় লুটাইয়া মলিন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নির্ভয় নিশ্চিন্ত পর্যবেক্ষণের সবটুকুই আজ অভিনব।

মাথার উপরে সূর্য আগুন ঢালিতেছে, ছাদের কোথায় এক টুকরা ভাঙা কাচ পড়িয়াছিল, সরসীর পা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, কোমরে কোনোমতে কাপড় আঁটা আছে কিন্তু দেহের ঊর্ধ্বাংশ একেবারে অনাবৃত, সরসীর খেয়াল নাই। আকাশে একটা চিলের সকাতর চিৎকারে সবসী শিহরিয়া উঠিল। হৃদয়ে আজ তার আনন্দের উত্তেজনার বান ডাকিয়াছে, সে উন্মাদিনী। তার বহুদিনের দেযাল-চাপা দুর্বল প্রাণে খোলা ছাদের এই সকরুণ দুঃসাহস, মানুষকে ভয় না কবার এই প্রথম সংক্ষিপ্ত উপলব্ধি, বুকের চামড়ায় পিঠের চামড়ায় পৃথিবীর গরম বাতাস আর আকাশের রূঢ় রৌদ্র লাগানোব উগ্র ব্যাকুল উল্লাস তার সহ্য হইতেছে না। তার ইচ্ছা হইতেছে, অর্ধাঙ্গের কার্পাস তুলার বাঁধনটা টানিয়া খুলিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, দিয়া পাগলের মতো সমস্ত ছাদে খানিকক্ষণ ছুটাছুটি করে।

আর চেঁচায়। গলা ফাটাইয়া প্রাণপণে চেঁচায় ! সে যে ঘরেব বউ, সে যে বোবা অসহায় ভীরু স্ত্রীলোক সব ভুলিয়া বুকে যত শব্দ সঞ্চিত হইয়া আছে সমস্ত বাহিরে ছড়াইয়া দেয়। অথবা আলিসা ডিঙাইয়া নীচে লাফাইয়া পড়ে।

হ্যাঁ, শূন্যে পড়িবার সময়টুকু উন্মত্ত উল্লাসে হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে প্রকাশ্য রাস্তার ধারে ওই শক্ত রোয়াকটিতে আছড়াইয়া পড়িলে ভালো হয়। মাথাটা গুঁড়া হইয়া যাইবে কিন্তু শরীরে তার কিছু হইবে না। তার এই কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙে স্থানে স্থানে রক্ত লাগিবে রাস্তার লোক ভিড় করিয়া তার অপরূপ দেহের অপূর্ব অপমৃত্যু চাহিয়া দেখিবে।

কোথায় লজ্জা, কোথায় সংকোচ ! কে জানিবে এই দেহের মধ্যে যে বাস করিতেছিল নিজেকে লুকাইয়া লুকাইয়া সে দিন কাটাইয়াছে, আঠারো বছরের বালকের ভয়ে অবশ হইয়া গিয়াছে, স্বামী ভিন্ন জগতের আর একটি পুরুষের দিকে চোখ তুলিয়াও চাহিতে সাহস পায় নাই ? কে অনুমান

করিতে পারিবে সকলের সামনে আত্মোন্মোচনের তার আর দ্বিতীয় পথ ছিল না বলিয়া, আঘাতের ভয়, অপমৃত্যুর ভয়ের চেয়ে সকলের সামনে মরিবার ভয় প্রবলতর ছিল বলিয়া, সে এ কাজ করিতে পারিয়াছে ? নিজের অনন্ত দুর্বলতার বিরুদ্ধে এ শুধু তার একটা তীব্র প্রতিবাদ, আপনার প্রতি তার এই শেষ প্রতিশোধ।

স্বামীর সাহায্য ছাড়া, সমাজের চাবুকের সাহায্য ছাড়া কোনোমতেই সে খাঁটি থাকিতে পারিত না, নিজেকে এমনই একটা কদর্য জীব বলিয়া চিনিয়াছিল তাই সে নিজেকে এমন ভয়ানক মার মারিয়াছে, এ কথাটাও কি কারও একবার মনে হইবে না ?

দুই হাত শক্ত করিয়া মুঠা করিয়া সরসী এখন আপন মনে বিড়বিড় করিতেছে, তার মুখের দুই কোণে সূক্ষ্ম ফেনা দেখা দিয়াছে। হঠাৎ একসময় হাঁটু ভাঙিয়া সে ছাদের উপর বসিয়া পড়িল। দুই করতল সজোরে ছাদে ঘষিতে ঘষিতে সে জোরে জোরে বলিতে লাগিল--

বেশ, বেশ, বেশ ! আমার খুশি ! আমার খুশি আ—মা—র খু—শি !

তারপর শূন্যের উপর ঝাঁঝিয়া উঠিয়া শূন্যকেই সম্বোধন করিয়া আবার বলিল, হল তো ?

তাকে ঘিরিয়া সমস্ত জগৎ কলরব করিতেছে, সমস্ত জগৎ একবাক্যে তাকে ছি ছি করিতেছে, তার কথা কেহ শুনিবে না, তার কোনো মুহূর্তের আত্মজয়ের দাম দিবে না, তাকে ঠাসিয়া চাপিয়া ধরিয়া থাকিয়া তারই কটা চামড়ার স্বেদে তারই যৌবনের উত্তাপে তাকে সিদ্ধ করিবে।

সরসীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। লুটানো আঁচল তুলিয়া নিজেকে সে আবৃত করিয়া নিল। ঘষিয়া ঘষিয়া চোখ শুষ্ক করিয়া উত্তরাভিমুখী হইয়া আলিসায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হিস্টিরিয়ার ফিটের পর যেমন সমস্ত জগৎ একেবারে স্তব্ধ হইয়া যায়, মুখে একটা ধাতব স্বাদ লাগিয়া থাকে, সরসী কানের কাছে তার নিজের রক্তের কোলাহল তেমনইভাবে অকস্মাৎ থামিয়া গিয়াছে, জিভে কটু স্বাদ লাগিয়া আছে।

এখন আর তার কোনো উত্তেজনা নাই। সে একটু বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। তার মনে হইতেছে, এমন একটা কাজ সে করিয়া বসিয়াছে সাধারণ কোনো মেয়ে যা করে না। কাজটা তার ন্যায়সংগত হয় নাই।

রাসবিহারীর আদেশ অমান্য করিয়া ছাদে বেড়ানোর জন্য সরসীর কোনো আপশোশ নাই, স্বামীর ছোটোবড়ো অনেক আদেশই অমান্য করিতে হয়, নাহিলে টিকা অসম্ভব, কিন্তু তারও অতিরিক্ত কিছু সে কি করিয়া বসে নাই ? নিজেকে তবে কলুষিত, অপবিত্র মনে হইতেছে কেন ?

ভাবিতে ভাবিতে সরসী নীচে নামিয়া গেল। ছাদের নীচেকার ছায়ায় গিয়া দাঁড়ানো মাত্র তার যেন অর্ধেক গ্লানি কাটিয়া গেল। জানালার পর্দা টাঙানোর জন্য ঘরের আলো স্তিমিত হইয়া আছে, বাতাসের মৃদু স্যাঁতসেঁতে ভাব এখনও শুকাইয়া যায় নাই, সরসীর চোখে মুখে আর সর্বাঙ্গে অল্প অল্প স্নিগ্ধতা সিঞ্চিত হইতে লাগিল।

ঘরের অসমাপ্ত কাজগুলি ঠিক যেন তারই প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া আছে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সরসী চারিদিকে সস্নেহে দৃষ্টি বুলাইতে লাগিল। কত কাজ তার, কত অফুরন্ত কর্তব্য ! তার কি নিশ্বাস ফেলিবার সময় আছে ? সংসারে কী হয় আর কী হয় না, তাই নিয়া মাথা ঘামানোর অবসর সে পাইবে কোথায় ? স্বামী হোটেলে খাইয়া আপিস গিয়াছে, এ বেলার মধ্যে সমস্ত কাজ তার সরিয়া রাখিতে হইবে, ও বেলা দুটি রাঁধিয়া না দিলে চলিবে কেন ? হোটেলের ভাতে পেট ভরানোর জন্য সে তো তাকে ভাতকাপড় দিয়া পুষিতেছে না।

সরসী অবিলম্বে কাজে ব্যাপৃত হইয়া গেল। নোড়া আনিয়া দেয়ালে পেরেক ঠুকিয়া কোনাকুনি একটা দড়ি টাঙাইয়া নিল, জড়ো করা পরনের কাপড়গুলি একটি একটি করিয়া কুঁচাইয়া রাখিল, তাকে খবরের কাগজ বিছাইয়া তেলের শিশি, জুতার বুরুশ, রাসবিহারীর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম,

তার নিজের মুখে মাখার পাউডার, পায়ে দেওয়ার আলতা, সিঁথিতে দেওয়ার সিঁদুর সমস্ত টুকিটাকি জিনিস গুছাইয়া তুলিয়া রাখিল।

চুল বাঁধার যন্ত্রপাতিগুলি সাজাইয়া রাখার সময় একটু হাসিয়া ভাবিল, ও ফিরে আসার আগে চুল বাঁধার সময় পাব তো ? খাবারটা করেই চট করে একটু সাবান মেখে গা ধুয়ে নিয়ে বেঁধে ফেলব চুলটা,—যে নোংরাই দেখে গ্যাছে !

চুলগুলি মুখে আসিয়া পড়িতেছিল, দুই হাতে চুলের গোছা ধরিয়া খালি ঘরে একটা অনাবশ্যক অপচয়িত মনোরম ভঙ্গির সঙ্গে সরসী এলোখোঁপা বাঁধিয়া নিল।

এবার কোন কাজটা আগে করিবে ?

বাক্সোগুলি ও কোণে রাখা চলিবে না, এদিকে সরাইয়া আনিতে হইবে, জলের কুঁজোটা যেখানে আছে সেইখানে :

জলের কুঁজো ! সরসীর দু চোখ চকচক করিয়া উঠিল। কী তৃষ্ণাই তার পাইযাছে !

হাতের কাছে গেলাস ছিল, দেখিতে পাইল না। উবু হইয়া বসিয়া দুই হাতে কুঁজোটা তুলিয়া ধরিয়া সে গলায় জল ঢালিতে লাগিল। খানিক পেটে গেল, বাকিটাতে তার বুকের কাপড় ভিজিয়া গেল।

কী তৃষ্ণাই সরসীর পাইয়াছিল।

সাহিত্যিকের বউ

সাহিত্যিক? শেষ পর্যন্ত একজন দেশপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের সঙ্গেই তার বিবাহ হইবে নাকি ?—এই বিস্ময় বিবাহের আগে কতদিন অমলাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল ঠিক করিয়া বলা সহজ নহে ; মোটামুটি তিন মাস। কারণ, স্বনামধন্য সাহিত্যিক সূর্যকান্তের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হওয়ার মাস তিনেক পরেই শুভবিবাহটি সম্পন্ন হইয়াছিল।

ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত স্কুলে পড়িয়া তারপর বাড়িতে লেখাপড়া, গানবাজনা, সেলাই-ফোঁড়াই, সংসারের কাজকর্ম, ঝগড়াঝাঁটির কৌশল ইত্যাদি শিখিতে শিখিতে যে সব মেয়ে আত্মীয়স্বজনের সতর্ক পাহারা ও অসতর্ক রক্ষণাবেক্ষণে বড়ো হয়, অমলা তাদের একজন। অতএব বলাই বাহুল্য যে লাইব্রেরি মারফত বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে অমলার ভালোরকম পরিচয়ই ছিল। প্রথমে লুকাইয়া আরম্ভ করিয়া তারপর ঘরের কোণ আশ্রয় করার মতো বয়স হওয়ার পর হইতে প্রকাশ্যভাবেই সে সপ্তাহে চার-পাঁচখানা গল্প-উপন্যাসের বই ও মাসে তিন-চারখানা মাসিকপত্র নিয়মিতভাবে পড়িয়া আসিতেছে। প্রকৃতপক্ষে, স্কুল ছাড়িবার পর বাড়িতে তার পড়াটা দাঁড়াইয়াছে এই এবং লেখাটা দাঁড়াইয়াছে চিঠি লেখা। সূর্যকান্তের লেখা পাঁচখানা উপন্যাস, তিনখানা গল্প সঞ্চয়ন ও একখানা নাটক সে তার সঙ্গে ভদ্রলোকের বিবাহের প্রস্তাব হওয়ার অনেক আগেই পড়িয়া ফেলিয়াছিল। তখন কী সে জানিত হৃদয়ের ভাবপ্রবণতাগুলিকে পরম উপভোগ্যভাবে উদ্‌বেলিত করিয়া রাখা, কখনও-কাঁদানো কখনও-হাসানো এই কাহিনিগুলির জন্মদাতা একদিন স্বয়ং তিনটি বন্ধুর সঙ্গে তাকে দেখিতে আসিবে এবং দেখিয়া পছন্দ করিয়া যাইবে!

বড়ো খাপছাড়া মনে হইয়াছিল ব্যাপারটা অমলার। সাহিত্যিকরা, বিশেষত সূর্যকান্তের মতো সাহিত্যিকরা, কী রকম রামশ্যামের মতো জীবনসঙ্গিনী খুঁজিয়া নেয় ? তার মতো পর্দানশিন সাধারণ মেয়েকে (সাধারণ মেয়ে অবশ্য সে নয় কিন্তু একদিন খানিকক্ষণ শুধু চোখে দেখিয়া, কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া, সেলাইয়ের কাজের একটু নমুনা দেখিয়া, আর একখানা গানের সিকি অংশ শুনিয়া তার কী পরিচয় ওরা পাইয়াছিল শুনি ?) পছন্দ করে ? এ জগতে পুরুষ ও নারীর প্রেম তো একরকম ওরাই ঘটায় এবং শেষ পর্যন্ত মিলন হোক আর বিচ্ছেদ হোক—ওদের ঘটানো প্রেমের অগ্রগতির কাহিনি পড়িতে পড়িতেই তো যতটুকু মন কেমন করা সম্ভব ততটুকু মন কেমন করে মানুষের ? কয়েকটি ছোটোগল্প ছাড়া সূর্যকান্তের কোন লেখাটি সে পড়িতে পারিয়াছিল যার মধ্যে দু-একজোড়া নরনারীর জটিল সম্পর্ক তাকে দুশ্চিন্তা, আবেগ ও সহানুভূতিতে পরবর্তী বইখানা পড়িতে আরম্ভ করা পর্যন্ত অন্যমনা ও চঞ্চলা করিয়া রাখে নাই ? সেই সূর্যকান্ত এ কী করিতে চলিয়াছে ? একটা শ্বাসরোধী অসাধারণ ঘটনার ভিতর দিয়া প্রথম পরিচয় এবং কতগুলি জটিল ও বিস্ময়কর অবস্থার মধ্যস্থতায় প্রেমের জন্ম হইয়া না হোক, অন্ততপক্ষে জানাশোনা মেয়েদের মধ্যে একজনকে খুব সাধারণভাবেই একটু ভালোবাসিয়া তারপর তাকে বিবাহ করা তো উচিত ছিল সূর্যকান্তের ? তার বদলে একটা অজানা-অচেনা মেয়েকে সে গ্রহণ করিতেছে কোন যুক্তিতে ? জীবনে এ অসামঞ্জস্য সে বরদাস্ত করিবে কী করিয়া। ওর বইগুলিতে কত স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ভালোবাসিতে পারে নাই, জীবনটা তাদের ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। নিজের বেলাও সে রকম কিছু ঘটিতে পারে—এ ভয় সূর্যকান্তের নাই ?

এ সব গভীর সমস্যার কথা ভাবিবার সময় অমলা পাইয়াছিল তিন মাস। তিন মাসে উনিশ বছরের একটি মেয়ে যে কত চিন্তা আর কল্পনায় মনটা ঠাসিয়া ফেলিতে পারে, কত রোমাঞ্চকর

রোমান্স অনুভব করিতে পারে, উনিশ বছরেব মেয়েরাই তা জানে। একটা কথা অমলা বেশি করিয়া ভাবিত : প্রেম-সংক্রান্ত বিরাট ব্যাপার কিছু একটা যদি সূর্যকান্তের জীবনে নাই ঘটিয়া থাকে—ও সব বিষয়ে এমন গভীর ও নিখুঁত জ্ঞান সে পাইল কোথায়, আর ও রকম কিছু ঘটিয়া থাকিলে বিবাহে তার রুচি আসিল কোথা হইতে ? কোনো সময় অমলার মনে হইত নিজের বুক ভাঙিবার রোমাঞ্চকর অপূর্ব ইতিহাস যদি সূর্যকান্ত ভুলিয়া গিয়া থাকে, এত দুর্বল যদি তার হৃদয়ের একনিষ্ঠতা হয় যে ইতিমধ্যে ভাঙা বুকটা আবার লাগিয়া গিয়া থাকে জোড়া, মানুষ হিসাবে লোকটা তবে কী অশ্রদ্ধেয় ! ছি ছি, শেষ পর্যন্ত এমন একটা স্বামী তার অদৃষ্টে ছিল যে ভালোবাসে, কিন্তু ভুলিয়া যায় ? আবার অন্য সময় অমলার মনে হইত, সূর্যকান্তের হৃদয়ে হয়তো কখনও ভালোবাসার ছাপ পড়ে নাই, আসলে লোকটা খুব জ্ঞানী আর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বলিয়া অন্য লোকের জীবনের ঘটনা ও মানসিক বিপর্যয় দেখিয়া-শুনিয়া অনুমান ও কল্পনা করিয়া নরনারীর হৃদয়-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাগুলি সে আহরণ করিয়াছে। ভালোবাসিলে দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি অনিবার্য, এ কথা জানে বলিয়াই বোধ হয় ভালো না বাসিয়া বিবাহ করাটা সে মনে করিয়াছে ভালো ? তা যদি হয়, অমলা ভাবিত, তাতেও ওকে শ্রদ্ধা সে করিতে পারিবে না। দুঃখ পাইবে বলিয়া যে ভালোবাসে না, সে আবার মানুষ না কি ! একেবারে অপদার্থ জীব ! আবার সময় সময় অমলার মনে হইত, নিজের ভালোবাসার নির্মম পরিণতির স্মৃতি ভুলিতে পারিতেছে না বলিয়া অসহ্য মনোবেদনার তাড়নাতেই সূর্যকান্ত এই খাপছাড়া কাণ্ডটা করিতেছে ! অমলা কি জানে না ও রকম অবস্থায় কত লোকে কত কী অদ্ভুত কাণ্ড করে ? কেউ মদ খাইয়া গোল্লায় যায় (সূর্যকান্তের 'দিবাস্বপ্ন', 'ঘরের বাহিরে পথ' প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য), কেউ সন্ন্যাসী হয়, কেউ হাজার হাজার লোকের সর্বনাশ করিয়া যশ ও টাকা করে (নাম মনে নাই), কেউ আত্মহত্যা করে (মাগো !)। সূর্যকান্ত একটা বিবাহ করিবে তা আর বেশি কী ? এই কথাগুলি ভাবিবার সময় ভাবী স্বামীর জন্য বড়ো মমতা হইত অমলার। নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে সে বলিত, আহা, আমি কি ওকে এতটুকু শান্তি দিতে পারব ?

যত পরিবর্তনশীল এলোমেলো কল্পনাই মনে আসুক এ কথা কিন্তু অমলা কখনও ভুলিত না যে সাধারণ উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, চাকুরে, ব্যাবসাদাব বা ওই ধরনের কারও সঙ্গে তার বিবাহ হইবে না, স্বামী সে পাইবে অসামান্য ; দেশসুদ্ধ লোক যার নাম জানে, দেশসুদ্ধ লোক যার লেখা পড়িয়া হাসে কাঁদে।

প্রায় ত্রিশ বছর বয়স সূর্যকান্তের। ঠিক সুপুরুষ তাকে বলা যায় না, তবে চেহারায় একটা দুর্বোধ্য ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, একটা আশ্চর্য আকর্ষণ আছে। কথাবার্তা-চলাফেরায় সে খুব ধীর ও শান্ত—অনেকটা বৃহৎ সংসারের আকণ্ঠ-সংসারী বড়োকর্তাদের মতো। কারও সঙ্গে কথা বলিবার সময় সে এমনভাবে নিরপেক্ষ নিরুত্তেজ হাসি হাসে যে মনে হয় আলাপি লোকটির মতো অসংখ্য লোকের সঙ্গে ইতিপূর্বেই তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে এবং যে কথাগুলি লোকটি বলিতেছে কতবার যে এ সব কথা সে শুনিয়াছে তার সংখ্যা হয় না। কেবল মানুষ নয়, জগতে কিছুই যেন সূর্যকান্তের কাছে মৌলিক নয়, কিছুই তাকে আশ্চর্য করিতে পারে না, পুরানো জুতার মতো হইয়া গিয়াছে—মানুষ, ঘটনা, বস্তু, বাস্তবতা, কল্পনা ও জীবনের খুঁটিনাটি ;—তার অভিজ্ঞতায় এমন বেমালুম খাপ খায় যে ফোসকা পড়া দূরে থাক—অস্পষ্ট একটু মচমচ শব্দ পর্যন্ত যেন করে না। যা কিছু আছে জীবনে সমস্তের সমালোচনা করিয়া দাম কষা হইয়া গিয়াছে—আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যথা-বেদনা আনন্দ-উচ্ছ্বাস আবেগ-কল্পনা সমস্ত হইয়া আসিয়াছে নিয়ন্ত্রিত : নালিশও নাই, কৃতজ্ঞতাও নাই। বাহুল্যবর্জিত একটা আরাম বোধ করা ছাড়া বাঁচিয়া থাকার আর কোনো অর্থ সে যেন খুঁজিয়া পায় না। পাকা সাঁতারুর মতো সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সে সাঁতার কাটে জীবনসমুদ্রে, প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়িয়া ফেনিল আবর্ত সৃষ্টি করে না।

জীবনসমুদ্র ? অমলা তো একেবারে থতোমতো খাইয়া গেল। এ যে গুমোটের দিঘি ! এ কী শান্ত, ঠান্ডা মানুষ ! ভাব কই, তীব্রতা কই, উচ্ছ্বাস কই? অন্যমনস্কতা, ছেলেমানুষি, খাপছাড়া চালচলন, রহস্যময় প্রকৃতির ছোটোবড়ো অভিব্যক্তি—এ সব কোথায় গেল ? মানুষের মধ্যে সে যে একজন অত্যাশ্চর্য মানুষ—দিনে-রাত্রে কখনও একটিবারও এ পরিচয় সে দেয় না। সাধারণ মানুষের মধ্যেও বরং যতটুকু প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, চরিত্রগত মৌলিকতা থাকে, তাও যেন তার নাই। তার অসাধারণত্ব যেন এই যে সাধারণ মানুষের চেয়েও সে সাধারণ। গম্ভীর নয়, বেশি কথাও বলে না। বেশভূষার দিকে বাড়াবাড়ি নজর নাই, অবহেলাও করে না। সুখসুবিধা যতখানি পাওয়ার কথা না পাইলে কারণ জানিতে চায়, বেশি পাইলে খুশি হয়, অতিরিক্ত উদারতাও দেখায় না, স্বার্থপরের মতো ব্যবহারও করে না। ক্ষুধা পাইলে খায়, ঘুম পাইলে ঘুমায়, রাগ হইলে রাগে, হাসি পাইলে হাসে, ব্যথা পাইলে ব্যথিত হয়,—এই কী অমলার কল্পনার সেই আত্মভোলা রহস্যময় মানুষ ? এ সব সাধারণ ব্যাপারে শুধু নয়, বউয়ের সঙ্গে পর্যন্ত সে হাসে, গল্প করে, বউকে রাগাইয়া মজা দেখে, বউকে আদর করে, স্নেহ জানায়—একেবারে সহজ স্বাভাবিকভাবে, আর দশজন বাজে লোকের মতো, একটা অপূর্ব ও অসাধারণ সম্পর্ক তাদের মধ্যে যেন সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে না : আঙুলে আঙুলে ঠেকিলে দুজনের যাতে রোমাঞ্চ হয়, চোখে চোখে চাহিয়া মুহূর্তে তারা যাতে আবিষ্কার করিতে পারে পরস্পরের নব নব পরিচয়, যাতে শুধু অফুরন্ত শিহরন।

গোড়ার একদিনের কথা—যখন পর্যন্ত স্বামীর প্রকৃতির এ রকম স্পষ্ট পরিচয় অমলা পায় নাই—অমলার মনে গাঁথা হইয়া আছে। বিকালে কোনো কাগজের বিপন্ন সম্পাদক জরুরি তাগিদ দিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যার পর শোবার ঘরে সূর্যকান্ত লিখিতে বসিয়াছিল গল্প। বাড়িতে অনেক লোক : বিবাহ উপলক্ষে আসিয়া অনেক আত্মীয়স্বজন তখনও ফিরিয়া যায় নাই ! কত যে বাধা পড়িতে লাগিল লেখায় বলা যায় না। এ অকারণে ডাকে, সে কী দরকারি কথা জিজ্ঞাসা করে, ছেলেরা হট্টগোল করে ঘরের সামনে বারান্দায়, রান্নাঘরে ডাল সম্ভার দিবার সময় হাঁচিতে হাঁচিতে বেদম হইয়া আসে সূর্যকান্ত। ঘরে আসিয়া দেখিয়া যাইতে না পারিলেও অমলা টের পাইয়াছিল স্বামী তার লিখিতে বসিয়াছে। ঘরে গিয়া স্বনামধন্য লেখক সূর্যকান্তকে প্রথমবার লিখনরত অবস্থায় দেখিবার জন্য মনটা ছটফট করিতেছিল অমলার এবং এ কথা ভাবিয়া মনটা তার ক্ষোভে ভরিয়া গিয়াছিল যে এই হাঁকাহাঁকি গন্ডগোলের মধ্যে এক লাইনও সে কি লিখিতে পারিতেছে ? বাড়ির লোকের কি এটুকু কাণ্ডজ্ঞান নাই ? তার যদি অধিকার থাকিত, সকলকে ধমকাইয়া সে আর কিছু রাখিত না। সূর্যকান্ত লিখিতে বসিলে সমস্ত বাড়িটা তো হইয়া যাইবে স্তব্ধ—পা টিপিয়া হাঁটিবে সকলে, কথা বলিবে ফিসফিস করিয়া, ডালে সম্ভার পর্যন্ত দেওয়া হইবে না। তা নয়, আজই যেন গোলমাল বাড়িয়া গিয়াছে বাড়িতে—এ কী অবিবেচনা সকলের, ছি !

রাত সাড়ে দশটার সময় সে যখন ঘরে গেল, সূর্যকান্ত তখনও লিখিতেছে। টেবিলে সাত আটখানা লেখা কাগজ দেখিয়া অমলা অবাক হইয়া গিয়াছিল। অত বাধা ও গোলমালের মধ্যেও সূর্যকান্ত তবে লিখিতে পারে ? তা ছাড়া, কত সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া সে ঘরে আসিয়াছে, লিখিতে লিখিতে তবু তো সে টের পাইল ! এবার সূর্যকান্তের বিরুদ্ধেই অমলার মনটা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

বাস্, আজ এই পর্যন্ত, বলিয়া কলম রাখিয়া দুহাত উঁচু করিয়া বিশ্রী ভঙ্গিতে তুলিয়াছিল হাই। তারপর হাসিমুখে কাছে ডাকিয়াছিল অমলাকে। বিষণ্ণমুখে অমলা গিয়া টেবিল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিয়াছিল, আচ্ছা আপনি কী করে লেখেন ?

গলার আওয়াজে তার কৌতূহল ছিল এত কম, আর বলার ভঙ্গিতে ছিল এত বেশি অবহেলা—যে মনে হইয়াছিল সে বুঝি জিজ্ঞাসা করিতেছে সূর্যকান্তের মতো লোক যে লিখিতে পারে

এটা সম্ভব হইল কী করিয়া ? সূর্যকান্ত বুঝিতে পারিয়াছিল কিনা বলা যায় না, চেয়ার ঘুরাইয়া বসিয়া সে ধরিয়াছিল অমলার একখানা হাত, তারপর তাকেও বসাইয়াছিল নিজের চেয়ারে। সাহিত্যিক বলিয়া অবশ্য নয়, নতুন বউ টেবিল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ও রকম একটা প্রশ্ন করিলে প্রথম নিঃশব্দ জবাবটা এ ভাবে না দিয়া কোন স্বামী পারে ? তারপর একটু হাসিয়াছিল সূর্যকান্ত, বলিয়াছিল, তুমি যেমন করে লেখ ঠিক তেমনি করে, কাগজের ওপর কলম দিয়ে। কিন্তু অমলারাণী, আর কতদিন আমায় আপনি বলবে ?

অমলা অস্ফুটস্বরে বলিয়াছিল, বারণ তো করোনি আগে।

কেন করিনি জান ? তুমি নিজে থেকে বলো কিনা দেখছিলাম। কেন বলোনি বলো তো ?

লজ্জা করে না বুঝি ? অভিমান হয় না বুঝি ?

যে অধিকার হইতে স্বামী তাকে এক সপ্তাহ বঞ্চিত করিয়া বাখিয়াছিল, অধিকাব পাওয়ামাত্র লজ্জাও থাকে নাই অমলার, অভিমানও থাকে নাই। সে ভাবিতেছিল, ঠিক দিয়েছি তো জবাবটা ? এমন অবস্থায় এ রকম জবাব তো দিতে হয় ? না, আর কিছু বললে ভালো হত ? আচ্ছা, এ কথা বলব, তুমি কী বুঝবে তোমাকে তুমি বলতে বলোনি বলে কী গভীর ব্যথা লেগেছিল আমার মনে ? মুখের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে ! আর কিছু না বলে মুখ নিচু কবাই বোধ হয় ভালো এবার।

সূর্যকান্ত সত্যসত্যই কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অমলার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, মুখের মৃদু লালিমার মধ্যে সে যেন পরিমাণ করিতে চাহিয়াছিল তার লজ্জা ও অভিমানের। বই লিখিবার সময় যত বড়ো মনস্তত্ত্ববিদ হোক সূর্যকান্ত, অমলাকে সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। স্বামীর সঙ্গে তাড়াতাড়ি ভাব জমানোব জন্য অমলার ঔৎসুক্য তার কাছে অল্পে অল্পে ধবা পড়িতেছিল বটে, কিন্তু ভাব জমানোটাই যে তার অধীরতার কারণ, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নয়—তাও বেশ বোঝা যাইতেছিল। ঠিক ভাবপ্রবণতা যেন নয়, কী যেন অমলা জানিতে ও বুঝিতে চায় তার সম্বন্ধে, সব সময়ে কী যেন একটা বিস্ময়কর কিছু সে প্রত্যাশা করে তার কাছে। এমন নাটকীয় ধরনে কথা বলে অমলা ! কথার পিছনে প্রকৃত নাটক থাকে না অথচ একেবারেই। হৃদয়াবেগ ও মস্তিষ্ক মিশিয়া যেন তৈরি হয় তার ব্যবহার ও মুখের শব্দগুলি। কাঁচাপাকা আমের মতো নতুন বউকে সূর্যকান্তের লাগিতেছে মিষ্টি আর টক। তার দোষ ছিল না, ওইরকম ব্যবহারই করিতেছিল অমলা ! তিন মাস ধরিয়া তপস্যার মতো সে যে ভাবিয়াছে কী, কী কারণে সূর্যকান্তের মতো লোক তার মতো মেয়েকে এমন সাধারণভাবে বিবাহ করে, এখন বিবাহের পর সে জানিবার চেষ্টা করিবে না সেই কাবণগুলির মধ্যে কোনটা তার স্বামীর বেলা প্রযোজ্য ? তিন মাসের গভীর গবেষণা তার বিফলে যাইবে ?

তবে ও বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয়ের ইচ্ছাটা তার ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছিল। তার মনে হইতেছিল, অতীত জীবনে যত বিপর্যয় সূযকান্তের হৃদয়ে ঘটিয়া থাক, সে কথা আজ না ভাবাই ভালো। তাকে লইয়া একটা নতুন অধ্যায় আরম্ভ হোক সূর্যকান্তের জীবনে। আপনা হইতে সে তুমি বলিতে আরম্ভ করে কিনা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল সূর্যকান্ত ! হয়তো আপনা হইতে সে তাকে ভালোবাসিতে আরম্ভ করে কিনা দেখিবার জন্যও সে অপেক্ষা করিয়া আছে ? হায় অমলার অবোধ স্বামী! এত বড়ো সাহিত্যিক তুমি, তোমাকে ভালো না বাসিয়া কি অমলা পারে ? এইসব ভাবিয়া ক্রমে ক্রমে অমলা নিজেকে ও স্বামীকে মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিল সূর্যকান্তেরই একখানা বইয়ের এক জোড়া নবদম্পতির মতো। যদিও বইয়ের ওরা দুজনে, শঙ্কর ও সরযূ, প্রায় তিন বছর ধরিয়া অনেক ভুল-বোঝা, কলহ-বিবাদ ও বাধা-বিপত্তির পর একেবারে শেষ পরিচ্ছেদে নবদম্পতি হইয়াছিল, কিন্তু তাতে কী আসিয়া যায় ? তেমন বৈচিত্র্যময় তিনটা বছর কাটাইবার পর তাদেরও মিলন হইয়াছে এটা কল্পনা করা এমন কী কঠিন ? অন্তত সূর্যকান্তের পক্ষে একটুও কঠিন নয়— সেই তো লিখিয়াছে বইটা।

অমলা (এখন সরযূ) তাই ধীরে ধীরে গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল সূর্যকান্তের (এখন শঙ্কর), 'স্মৃতির কাতরতা মেশানো অবর্ণনীয় পুলকের স্বপ্ন' ঘনাইয়া আসিয়াছিল তার দুটি অর্ধনিমীলিত চোখে, 'তিন বছর যে কণ্ঠস্বরে লুকানো ছিল গোপন অশ্রুর সজল সুর তাতে প্রথম মোহকরী আনন্দের আভাস মিশিলে যেমন শোনায়' তেমনই কণ্ঠস্বরে সে বলিয়াছিল—হ্যাঁ গো, তুমি কি কখনও ভাবতে পেরেছিলে তুমি আর আমি কোনোদিন এত কাছাকাছি আসতে পারব ?

যে সব গহনা দাবি করা হইয়াছিল বিবাহের সময়, আজ অমলার হাতে তার অতিরিক্ত একজোড়া ব্রেসলেট ছিল। সূর্যকান্ত জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল ও গহনাটি কে দিয়াছে। অবাক হইয়া সে বলিয়াছিল, তার মানে ?

অমলা বলিয়াছিল, আমার মনে হচ্ছে কতকাল যেন ভাগ্য আমাদের জোর করে তফাত করে রেখেছিল। আরও দু-একবছর দেরি করে যদি আমাদের বিয়ে হত, তাহলে হয়তো আমি—

সূর্যকান্তের মুখ দেখিয়া অমলা থামিয়া গিয়াছিল। এ তো অভিমান নয়, সত্যই বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতেছিল তার, আবেগে সে নিশ্বাস ফেলিতেছিল ছোটো ছোটো। মধ্যবিত্ত সংসারের অনভিজ্ঞ, কোমলমনা, ছেলেমানুষ মেয়ে, জীবনে প্রথমবার একজনের সঙ্গে পাকা প্রেমিকের মতো ব্যবহার করিতে গেলে বইপড়া বিদ্যায় কুলাইবে কেন ! আবেগ, উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস ও হঠাৎ একেবারে জন্মের মতো কথা বন্ধ করিয়া সূর্যকান্তের বুকে মুখ লুকাইয়া ফেলিতে যাওয়ার মতো যে গভীর লজ্জা এখন অমলার আসিয়াছিল, তার কোনোটাই বানানো নয়।

সূর্যকান্ত ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিল, তোমার বয়স কত বলো তো ?

উনিশ বছর।

বিয়ের আগে শুনেছিলাম ষোলো চলছে। তোমার নাকি বাড়ন্ত গড়ন।

এ কী অচিন্তিত আঘাত ! আশ্বিনের রাত্রি, আকাশে হয়তো জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি—পরশু সন্ধ্যায় সূর্যকান্তের এক বন্ধুর বউ যে একরাশি ফুল দিয়াছিল, ঘর ভরিয়া সেই বাসিফুলের গন্ধ। শুধু তাই নয়। প্যাডে সূর্যকান্তের অসমাপ্ত গল্পটির শেষ কয়েকটা লাইন অমলা আড়চোখে পড়িয়া ফেলিয়াছিল,—অবনী নামে কে যেন অনুপমা নামে কার ছদ্মবেশ-পরানো গোপন ভালোবাসা জানিতে পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, বিবর্ণ পাংশু হইয়া আসিয়াছে তার মুখ, আর অনুপমার অনুপম চোখ দুটিতে দীপশিখার মতো দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে বিদ্রোহ— প্রথার বিরুদ্ধে, দুর্বলতার বিরুদ্ধে, কে জানে আরও কীসের বিরুদ্ধে ! এমন সময়, অবনী ও অনুপমার ও রকম উত্তেজনাময় মুহূর্তগুলির কথা লিখিতে লিখিতে, বউকে বুকে লইয়া এ কী রূঢ় বাস্তব মন্তব্য সূর্যকান্তের ! সম্বন্ধ করার সময় দুবছর কী আড়াই বছর বয়স ভাঁড়াইয়াছিল তার বাপ-মা, এই কি সে কথা তুলিবার সময় ?

অবনী ও অনুপমার গল্পটা পরে অমলা অনেকবার পড়িয়াছে। সেদিন যেখানে সূর্যকান্ত লেখা বন্ধ করিয়াছিল, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া প্রত্যেকবার অমলার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আর ও পর্যন্ত লিখিয়া সেদিন রাত্রে সূর্যকান্ত অমন নিরুত্তেজ আবেগহীন অবস্থায় কী করিয়াছিল ? কী প্রবঞ্চক সূর্যকান্ত !

আজকাল স্বামীর প্রবঞ্চনাকে অমলা মাঝে মাঝে আত্মসংযম বলিয়া চিনিতে শিখিয়াছে। এটাও সে জানিয়াছে যে সূর্যকান্ত সবদিক দিয়া যতই সাধারণ হোক—বাস্তব জীবনে, কী যেন আছে লোকটার মধ্যে, অপূর্ব ও অদ্ভুত, যার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায় না, প্রমাণ করা যায় না, গ্রহণও করা যায় না। সাফল্যলাভ করিবার আগে প্রতিভাবানের প্রতিভা যেমন থাকিয়াও থাকে না, সেই রকম একটা অস্তিত্বহীন বিপুল ব্যক্তিত্ব যেন সূর্যকান্তের থাকিয়াও নাই—অন্তত অমলার কাছে। তাই, মাঝে মাঝে

বিনয়ে তার হৃদয়টা কেন এতখানি ভরিয়া আসে যে সূর্যকান্তের কাছে মাথা নত করিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, সে ভালো বুঝিতে পারে না। বশ মানিতে সাধ হয় অমলার। স্বামী তার স্বপ্ন ভাঙিয়া দেয়, কল্পনাস্রোত বুদ্ধ করে, আশা অপূর্ণ রাখে, নিজেও যথোচিতভাবে ভালোবাসে না, তাকেও বাসিতে দেয় না—তবু !

আজকাল—মানে বিবাহের মাস আষ্টেক পরে—বসন্তের শেষে যখন গ্রীষ্ম শুরু হইয়াছে—গরমে অমলার ঘনঘন পিপাসা পায়—সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু সূর্যকান্তের অবাস্তব কবিত্বময় ভালোবাসার জন্য তার যে পিপাসা সব সময় জাগিয়া থাকে, গ্রীষ্ম তার কারণ নয়, সেটা স্বাভাবিকও নয়। একদিন, একটা দিনের জন্যও সূর্যকান্ত যদি উচ্ছৃঙখল হইয়া উঠিত !—যদি আবোলতাবোল কথা বলিত অমলাকে, আবেগে অদ্ভুত ব্যবহার কবিত, পাগলের মতো, মাতালের মতো এমন ভালোবাসিত তাকে—যে বাস্তব জগৎটা আড়াল হইয়া যাইত প্রেমের রঙিন পর্দায় ! কিন্তু সূর্যকান্ত এক মিনিটের জন্যও আত্মবিস্মৃত হইতে জানে না। এমন কী অমলা নিজেই যদি একটু বাড়াবাড়ি উচ্ছ্বাস আরম্ভ করিয়া দেয়, সৃষ্টি করিয়া লইতে চায় একটি মোহকরী কাব্যময় পরিবেষ্টনী, সূর্যকান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলে, এ সব ছ্যাবলামি শিখলে কোথায় ?

রাগের মাথায় অমলা বলে, তোমার কাছ থেকে শিখেছি, তোমার বই থেকে।

সূর্যকান্ত বলে, তোমাকে যখন দেখতে গিয়েছিলাম, বিয়ের আগে, মনে হয়েছিল তুমি বুঝি খুব সাদাসিধে সরল—এ সব পাকামি জানো না। তুমি যা শিখেছ অমল, আমার কোনো বইয়ে তা নেই। যদি কখনও লিখে থাকি, ঠাট্টা করে খোঁচা দিয়ে লিখেছি ; এ রকম কবিত্ব যারা করে তাদের যে মাথার ব্যারাম থাকে তাই দেখাবার জন্য।

সূর্যকান্তের লেখার সমালোচকরা এ কথা শুনিলে তাকে মিথ্যাবাদী বলিত, অমলা রুদ্ধশ্বাসে শুধু বলে, ভালোবাসা বুঝি মাথার ব্যারাম ?

ভালোবাসার তুমি কী বোঝ শুনি ?

অমলা স্তব্ধ হইয়া যায়। রাগে অভিমানে প্রথমে তার মনে হয় এর চেয়ে মরিয়া যাওয়াও ভালো। ভালোবাসার কিছু বোঝে না সে ? বেশ, চুলোয় যাক ভালোবাসা ! সে বুঝিতে চায় না। সে কী চায় তা তো সূর্যকান্ত বোঝে ? হোক এ সব তার ছ্যাবলামি, কী দোষ আছে এতে, কী ক্ষতি আছে ? তার সঙ্গে এই ছ্যাবলামিতে সূর্যকান্ত একটু যোগ দিলে কি বাড়ির ছাদটা ধসিয়া পড়িবে, না পুলিশে ধরিয়া তাদের জেলে পুরিবে ? ক্ষতি তো কিছু নাইই, বরং লাভ আছে অনেক—এই সব মনান্তর ও মনঃকষ্টগুলি ঘটিবে না। অকারণে কেন এ রকম করে সূর্যকান্ত তার সঙ্গে ? কী সুখটা তার হয়, বউকে এত কষ্ট দিয়া ? অমলার কান্না আসে। কুঁজোটা হাতখানেক সরাইয়া রাখা, টেবিল গুছানো, বই ও কাগজপত্রগুলি একটু ভিন্নভাবে সাজানো, এই ধরনের খুঁটিনাটি কাজ করিতে করিতে সে চোখের জল ফেলিতে থাকে। সূর্যকান্ত যে দেখিতে পাইতেছে যে সে কাঁদিতেছে, তাতে অমলার সন্দেহ থাকে না।

সূর্যকান্ত বলে, এক গ্লাস জল দাও তো।

অমলা কাচের গ্লাসে জল দিলে এক চুমুক পান করিয়া হাসিয়া বলে, তুমি জল দিলে আমার মনে হওয়া উচিত—জল খাচ্ছি না, সুধা পান করছি, না অমলা ?

ঠাট্টা ! সে কাঁদিতেছে দেখিয়াও এমন রূঢ় পরিহাস ! বিছানায় আছড়াইয়া পড়িয়া এবার অমলা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে। আছড়াইয়া পড়ার ধাক্কায় সূর্যকান্তের হাত হইতে গ্লাসটা পড়িয়া গিয়া বিছানা ভাসিয়া যায়। গ্লাসটা তুলিয়া সরাইয়া রাখিবার পর মনে হয় অমলার চোখের জলেই বিছানাটা এমনভাবে ভিজিয়াছে।

সূর্যকান্ত বিব্রত হইয়া বলে, তোমার সঙ্গে পেরে উঠলাম না অমল, সোজা সহজ জীবনে তুমি খালি বিকার টেনে আনছ। এই বয়সে এ রকম হস্ত কেন তোমার ? অনর্থক দুঃখ তৈরি করো কেন ?

কী হয়েছে তোমার, ছেলে মরেছে, না স্বামী তোমায় ত্যাগ করেছে ? খেতে পরতে পাচ্ছ না তুমি ? সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা সইছে না তোমার ? দিব্যি হেসে খেলে মনের আনন্দে দিন কাটাবে তুমি, তা নয়, সব সময় একটা কৃত্রিম ব্যথায় ব্যথিত হয়ে আছ। বিয়েব আগে আর কারও সঙ্গে তোমার ভাব হয়ে থাকলেও বরং ব্যাপাবটা বুঝতে পারতাম। তাও তো নয়। তোমার যত ব্যথা বেদনা সব আমাকে নিয়েই। কেন বলো তো ? তোমাকে আমি অবহেলা করি, আদর-যত্ন করি না ? আজ তোমাকে হাসাবার কত চেষ্টা করলাম তুমি হাসলে না, রাগাবার চেষ্টা করলাম রাগলে না, বললাম এসো দুজনে একটু ব্যাগাটেলি খেলি, তাব বদলে তুমি—

উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে অমলা উঠিয়া বসে, অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা গুঁজিয়া দেয় স্বামীর পায়ের মধ্যে, বলে, আমায় মাপ করো, মাপ করো। আমি তোমাব উপযুক্ত নই।

সূর্যকান্ত বলে, এই তো ! এই দ্যাখো আবার কী আরম্ভ করলে !

এই ধরনের দাম্পত্যালাপের যখন ইতি হয় এবং উত্তেজনা কিছু জুড়াইয়া আসে, অমলার মনের মধ্যে তখন যে সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়া গজরায় ও গুমরায়—তার মধ্যে প্রধান হইয়া থাকে অভিমান। দুরন্ত অভিমানকে জয় করিয়া তাকে ঘুম পাড়াইতে একেবারে হযরান হইয়া যায় ঘুমের পরিরা। সকালে থাকে বিষাদ। সংসারের কাজ করিতে করিতে সে অন্যমনা হইয়া যায়। বড়ো জা, বিধবা ননদ, দুটি দেবর এবং আরও যারা বাড়িতে থাকে পরীক্ষকের দৃষ্টিতে সকলে মুখের দিকে তাকায় অমলার, মেয়েরা ফিসফিস করিয়া নিজেদের মধ্যে তার কথা আলোচনা করে। তাবপর সূর্যকান্ত আপিসে চলিয়া গেলে নিজের অজ্ঞাতেই এমন ব্যবহার করে অমলা, বাড়িতে যেন আর মানুষ নাই, বাড়ি খালি হইয়া গিয়াছে।

দেবর চন্দ্রকান্ত বলে, মাথা ধরেছে মেজোবউদি ?

কই না।

তবে দয়া করে শুয়ে না থেকে একবার শুনে এসো দিকি দিদি ডাকছে কেন ? এমন সময় মানুষ শোয় !

তখন অমলার মনে পড়ে আজ তার রান্নার পালা ছিল. কিন্তু রান্না সে করে নাই। তাব জন্য হয়তো হেঁসেল আগলাইযা একজন বসিয়া আছে। হায়, যে স্বামী পদে পদে অপমান করে, আপিস যাওয়াব সময় যার জামার বোতাম লাগাইতে কাঁপা গলায় 'কী করে সাবা দুপুব কাটাব ?' বলার জন্য যার পরিহাসের আঘাতে আজই তাকে বিছানা আশ্রয় করিতে হইযাছে, দশটা হইতে বেলা একটা পর্যন্ত সেই স্বামীর কথাই ভাবিয়াছে বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া।—কী করা যায় এখন ? সকলের কাছে কী কৈফিয়ত দেওয়া যায় শুইয়া থাকার ?

অমলা হঠাৎ কাতরকণ্ঠে বলে, শরীরটা বড়ো খারাপ লাগছে, আমি আজ খাব না।

উপবাসী হৃদয়ের কাণ্ডকারখানায় দিনটা অমলার উপবাসে কাটে। বিকালের দিকে ক্রমবর্ধনশীল উত্তেজনায় সে হইয়া থাকে বোমার মতো উচ্ছ্বাসের বিস্ফোরক। সূর্যকান্ত বাড়ি আসিলেই বলে, শোনো, ওগো শোনো, কাছে এসো না ? এইখানে এসে শোনো ! এক মাসের ছুটি নেবে ? কোথাও নিয়ে যাবে আমাকে ? যেখানে হোক, যেদিকে দুচোখ যায় চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি। শুধু তুমি আর আমি, আর কেউ নয়। যাবে ? বলো না, যাবে ? তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে অপর্ণার মতো আমি তোমাকে শেষবার জিজ্ঞেস করব—

আপিস ফেরত ঘর্মাক্ত সূর্যকান্ত গলা হইতে অমলার হাতের বাঁধন ধীরে ধীরে খুলিয়া দেয়। তারপর খোলে জামা।

জিজ্ঞাসা করে, অপর্ণা কে ?

ওমা, ভুলে গেছ ? তোমার অপর্ণা গো !

আমার অপর্ণা ?

তোমার রামধনু বইয়ের। যে বলেছে, মেয়েদের জীবনের একমাত্র ব্রত হওয়া উচিত একজনকে ভালোবাসা, সে রাজা হোক, পথের ভিখারি হোক—

ও, সেই অপর্ণা ?—জুতা জামা খুলিয়া সূর্যকান্ত তফাতে চেয়ারে বসে। গম্ভীর চিন্তিত মুখে অমলার মুখের ভাব দেখিতে দেখিতে বলে, সামনের শনিবার ছুটি নিয়ে তোমাকে বাপের বাড়ি রেখে আসব কিছুদিনের জন্য।

স্তম্ভিত অমলা বলে, কেন ?

এখানে থাকলে তুমি খেপে যাবে।

এ আঘাতে অমলার উচ্ছ্বাসের বোমা ফাটিয়া যায়, কান্নার বিস্ফোরণে। সূর্যকান্ত নিষ্ঠুর নয়, মিনিটখানেকের মধ্যে তার ঘামে-ভেজা বুকখানা অমলার চোখের জল আরও ভিজাইয়া দিতে থাকে। বড়ো ম্লান দেখায় সূর্যকান্তের মুখখানা।

স্ত্রীকে নার্ভ টনিক খাওয়ানোর বদলে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি পাঠানোই সূর্যকান্ত ভালো মনে করিল। এখানে থাকিয়াই সে নার্ভ টনিক খাইতে পারিবে শুধু এই ভয়ে নয়। অমলা অনেকদিন বাপ মাকে দেখে নাই। কুমারী জীবনের আবহাওয়ায় কিছুদিন বাস করিয়া আসিলে হয়তো বিবাহিত জীবন যাপনের কৌশলগুলি সে কিছু কিছু আয়ত্ত করিতে পারিবে। উনিশটা বছর অমলা সেখানে ছিল, সবগুলি বছর বোধ হয় সঙ্গে আনিতে পারে নাই, তাই এ রকম ছেলেমানুষি করে। তাছাড়া একটু বিচ্ছেদ ভালো। বিরহের তাপে ওর প্রেমের অস্বাভাবিকতার বীজাণুগুলি একটু নিস্তেজ হইতেও পারে।

যাইতে রাজি হইল বটে অমলা, সে জন্য কাণ্ড করিল কম নয়। রাজি হওয়ার রাত্রে অনেকক্ষণ গুম খাইয়া থাকিয়া বলিল, আমাকে সইতে পারছ না বলে পাঠিয়ে দিচ্ছ না তো ?

না গো, না।

আমার জন্য তোমার মন কেমন করবে ?

করবে না ? তুমি বুঝি ভাব তোমাকে আমি ভালোবাসি না ? একা একা বিশ্রী লাগবে অমল।

শুধু বিশ্রী লাগিবে ! অমলা জোর দিয়া বলিল, একা একা আমি মরে যাব।

এক মাস বাপের বাড়িতে থাকিয়া অমলা ফিরিয়া আসিল। মরিয়া যাইতে অবশ্য সে পারিত, কারণ সেখানে দিন সাতেক সে খুব জ্বরে ভুগিয়াছিল। আশ্চর্য জ্বর। একশো এক ডিগ্রিতে পৌঁছিলেই অমলা বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকিতে শুরু করিত (সজ্ঞানে) এবং তার চারটি বউদির মধ্যে ছোটোজনকে চুপিচুপি জানাইয়া দিত যে জীবনটা তার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ছোটোবউদি বলিত ছোটোদাদাকে এবং দুই ননদকে। জ্বরের সাত দিনে বাড়ির বিশেষ আদরের ছোটো মেয়েটির জীবনের ব্যর্থতার সাত রকম দুর্বোধ্য কাহিনি শুনিয়া বাড়িসুদ্ধ লোক এমন দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছিল বলিবার নয়। জ্বর সারিবার পর সকলের প্রতিনিধি হিসাবে বাড়ির বড়োবউ কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল অমলাকে। লোক ভালো নয় অমলার শ্বশুরবাড়ির সকলে ? কী করে অমলাকে তারা ? বকে ? গঞ্জনা দেয় ? খাইতে দেয় না ? খাটাইয়া মারে ? এমনি মারে ? তা যদি না হয় তবে সূর্যকান্ত বুঝি—

প্রশ্নগুলির জবাব শুনিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের দুশ্চিন্তা পরিণত হইয়াছিল অবাক হওয়ায়। কী জন্য তবে জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে তার ? কত খুঁজিয়া সূর্যকান্তের মতো জামাই তারা সংগ্রহ করিয়াছে

অমলার জন্য ! পণই যে দিয়াছে যোলোশো টাকা ! বাড়িসুদ্ধ লোক যদি বাড়িরই একটি মেয়ের জীবন ব্যর্থ হওয়ার মতো বৃহৎ ব্যাপার সম্বন্ধে ধাঁধায় পড়িয়া যায়, মেয়েটির বিপদের সীমা থাকে না। সকলের ব্যবহার চিন্তায় ফেলিয়া দেয় তাকে। তার মনে হয়, তবে কি সেই ভুল করিয়াছে ? সত্যই কি তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনাগুলি অকথ্য রকমের উদ্ভট মানসিক রোগ ?

অমলাব প্রতিহত উন্মাদনা, পৃথিবীতে আকাশকুসুমের বাগান কবার অপূর্ণ কামনা ও বিবাহিত জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা—সূর্যকান্তেব কাছ হইতে সরিয়া আসিবার কয়েকদিন পর হইতেই তাব মনে কাজ করিতেছিল। তা ছাড়া, বইয়ের যদি প্রভাব থাকে বাস্তবতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবঞ্চিত কল্পনাপ্রবণ মনে, বই যারা লেখে তাদের কি প্রভাব নাই ? কাছে থাকিবার সময় স্বামীকে তার সাধারণ মানুষের মতো মনে হইত বলিয়া, স্বনামধন্য সাহিত্যিক বলিযা চেনা যাইত না বলিয়া, যে আপশোশ ছিল অমলার মনে, সাতদিন জ্বরে ভুগিবাব সময় ছাডা এখানে যেন সে আপশোশ ধীরে ধীরে উপিয়া যাইতেছিল। মনে হইতেছিল, ও রকম সাধারণত্ব কি মানুষ মাত্রেরই থাকে না ? ভুল দিকে সে স্বামীর অসাধারণত্ব খুঁজিয়া মবিযাছিল। অনেক বিষয়ে অসামান্য ছিল বইকী সূর্যকান্ত ! তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অসীম জ্ঞান, উদ্দেশ্য বুঝিয়া মানুষের ভালোমন্দ কাজের বিচার করা, কোলাহলভবা সংসারেব বাস্তবতাব মধ্যে থাকিযাও অমন সুন্দর সব গল্প-উপন্যাস রচনা কবা, এ সব কি অসাধারণত্ব নয় ? সাবাদিন আপিস কবিয়া রাত্রি দশটা-এগাবোটা পর্যন্ত লেখাব পব এক-একদিন কি বড়ো শান্ত মনে হইত না সূর্যকান্তকে ? সেই শ্রান্তিকেই কোনোদিন অবহেলা, কোনোদিন সংসারেব চিন্তা, কোনোদিন মানুষটার নির্জীবতা মনে করিয়া সে কি নিজের রাগ দুঃখ অভিমানের পাহাড় সৃষ্টি করিত না, রোমাঞ্চকর ভালোবাসাব খেলা চাহিয়া শেষে মনোবেদনায শুরু করিত না কান্না ? রামধনুর অপর্ণাব মতো লাখ লাখ মেয়েকেও সে সৃষ্টি করে ও রকম শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায়—সেও কি ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে বলিয়া বউয়েব সঙ্গে ছাদে গিযা মুগ্ধ ও বিহ্বল হইতে পারে ? ঘুমানোর সুযোগ দেওযার বদলে কথা বলিয়া অভিমান করিয়া কাঁদিয়া বাত দুটো পর্যন্ত সে তাকে জাগাইয়া রাখিত।

এই ধরনের অনেক কথা ভাবিযাছিল অমলা এক মাস ধরিযা—সূর্যকান্তের ব্যক্তিত্ব, সহজ স্বাভাবিক ব্যবহাব ও উপদেশগুলি তলে তলে কাজ কবিতেছিল এবং জ্বরের টনিক একটু শান্ত করিয়া দিয়াছিল অমলাকে। জ্বরেব পব কিছুদিন একটু চুপচাপ শান্তিতে থাকিতে কে না চায ? তাই শুধু রোগা হইযাই নয়, একটু বদলাইয়া অমলা এবাব স্বামীগৃহে ফিরিয়া আসিল।

সূর্যকান্ত বলিল, এমন বোগা হয়ে গেছ!

জ্বরে ভুগলাম যে ?

জবাবটা খাপছাড়া মনে হইল সূর্যকান্তের। 'রোগা হব না ? এক মাস তোমাকে ছেড়ে—' এ রকম একটা জবাব সে প্রত্যাশা করিতেছিল। যাই হোক, সোজা কথার সোজা জবাব দিতে যদি অমলা শিখিয়া থাকে, ভালোই। তাতে ক্ষুণ্ণ হওযাব কিছু নাই।

অমলা বলিল, তুমিও বোগা হয়ে গেছ।

সূর্যকান্ত বলিল, হব না? একমাস তোমাকে ছেড়ে থেকেছি একা একা।

এ জবাবটা খাপছাড়া মনে হইল অমলার। 'রোগা হয়েছি ? কদিন যা খাটতে হয়েছে অমলা—' এইরকম একটা জবাব সে প্রত্যাশা করিতেছিল। যাই হোক, সাধারণ কথার মিষ্টি জবাব দিতে যদি সূর্যকান্ত শিখিয়া থাকে, ভালোই। তাতে পুলকিত হওয়ার কিছু নাই।

এই হইল তাদের প্রথম দেখা, অপরাহ্ণে এবং অল্পক্ষণের জন্য। রাত্রে যখন আবার দেখা হইল, চাঁদটা পৃথিবীর অপর পিঠে জ্যোৎস্না ঢালিতেছিল। একটু অস্থির ও উন্মনাভাবে সূর্যকান্ত ঘরে পায়চারি করিতেছিল। আকাশ-ঢাকা মেঘগুলি এমন গুমোট রচনা করিয়াছে যে ফ্যানটা প্রাণপণে

ঘুরিয়াও ভালোমতো বাতাস সৃষ্টি করিতে পারিতেছিল না। শুধু টেবিলে খোলা প্যাডটার পাতাগুলিকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।

অমলা নালিশ করিল, সন্ধে থেকে মেঘ করেছে, এখনও বিষ্টি নামল না, নামলে বাঁচি।

মেঘ করেছে নাকি ?

টের পাওনি ? কবার যে বিদ্যুৎ চমকাল, মেঘ ডাকল ?

সূর্যকান্ত এক নতুন দৃষ্টিতে অমলাকে দেখিতেছিল, পরীক্ষার সময় ছেলেদের প্রথম প্রশ্নপত্র দেখার মতো। তারপর একটা প্রশ্নেরও জবাব-না-জানা ছেলের মতো সে বলিল, সন্ধ্যা থেকে গল্প লিখবার চেষ্টা করছিলাম অমল।

সত্যি ? নতুন গল্প ! দেখি তো কতটা লিখলে?—অমলা তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে গেল, কাগজ-চাপাটার তলে একটিও লেখা কাগজ না দেখিয়া সে আশ্চর্য হইয়া গেল। প্যাডটার প্রথম পাতায় শুধু হেডিং, সূর্যকান্তের নাম আর পাঁচ-ছলাইন লেখা।

সন্ধ্যা থেকে শুধু এইটুকু লিখেছ !

সূর্যকান্ত ধপাস করিয়া বিছানায় বসিয়া বলিল, না, অনেক লিখেছি। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটাতে পাবে।

অমলা সবিস্ময়ে বলিল, ওমা, ছেঁড়া কাগজে যে ভর্তি ! সব আজকে লিখে লিখে ছিঁড়েছ ?

সায় দিয়া সূর্যকান্ত একটা হাই তুলিল। শ্রান্তি? অমলা তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বলিল, ঘুম পেয়েছে? ঘুমোও তবে। দাঁড়াও বালিশটা ঠিক করে দি।

সূর্যকান্ত বলিল, না, ঘুমোব না। এক মাসের মধ্যে এক লাইন লিখতে পারলাম না—ঘুমোব ! শুধু আজ ? কতদিন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা এমনিভাবে ভর্তি করেছি তার ঠিক নেই। তুমি আমাকে কী করে দিয়ে গিয়েছ তুমিই জানো, লিখতে বসতেও আর ইচ্ছে করে না, বসলেও মন বসে না, জোর করে যা লিখি সব ছিঁড়ে ফেলে দিই ! উপন্যাসের ইনস্টলমেন্টটা পর্যন্ত লিখে দিতে পারিনি।

সূর্যকান্তের বিষণ্ণ মুখ দেখিলে কষ্ট হয়। অমলার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতেছিল, দুচোখ বড়ো বড়ো করিয়া সে চাহিয়া রহিল। বিবাহিত জীবনের এই পরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বাপের বাড়ি হইতে সংগ্রহ করিয়া আনা সহজ ও শান্ত ভাবটুকু অমলার ঘুচিয়া যাইতেছিল। এ ঘরের আবহাওয়ায় সে একা যত বিদ্যুৎ ঠাসিয়া রাখিয়া গিয়াছিল তার দেহমন যেন আবার তাহা শুষিয়া লইতেছে। তবু এবার হয়তো একটু সংযত থাকিতে পারিত অমলা, হয়তো সূর্যকান্ত যে রকম চাহিয়াছিল সেই রকম হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে পারিত—সূর্যকান্ত যদি এমন ভাব না দেখাইত আজ, এমনভাবে কথা না বলিত। তার সুদীর্ঘ কুমারী জীবনের শেষ ক-মাসের কল্পনার মতো হইয়া উঠিয়াছে যে সূর্যকান্ত আজ ! আঙুল চালাইয়া চালাইয়া চুল এলোমেলো করিয়া দেওয়ায় কী বন্যই আজ তাকে দেখাইতেছে ! চোখের চাহনিতে যেন বিপন্নতার সঙ্গে মিশিয়া আছে বিদ্রোহ, কথা বলিবার ভঙ্গিতে যেন শোনা যাইতেছে পরাজিত ক্ষুব্ধ আত্মার নালিশ, বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছে হঠাৎ উঠিয়া ভয়ানক কিছু করিবার এটা ভূমিকা মাত্র। তাছাড়া, তারই জন্য একমাস সূর্যকান্ত কিছুই লিখিতে পারে নাই ! প্রথম দীর্ঘ বিরহ আসিবামাত্র স্বামী তার বুঝিতে পারিয়াছে, কী ভয়ানক ভালোই সে বাসিয়া ফেলিয়াছে তার বউকে ! অমলা শিহরিয়া ওঠে, তার রোমাঞ্চ হয়।

গদগদ কণ্ঠে সে বলিল, আমার জন্য ? আমার জন্য এক মাস তুমি লিখতে পারনি ?

সূর্যকান্ত তার হাত চাপিয়া ধরিল। এত জোরে ধরিল যে চুড়িগুলি প্রায় কাটিয়া বসিয়া গেল অমলার হাতে। গলা আবেগে কাঁপাইয়া সূর্যকান্ত বলিল, কার জন্য তবে ? তুমি আমায় পাগল করে দিয়েছ অমল, আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছ। কতবার ইচ্ছে হয়েছে ছুটে গিয়ে তোমাকে দেখে আসি। কেন যাইনি জানো ? বিরহের যাতনা কত তীব্র হতে পারে তাই দেখবার জন্য। আমার

রামধনু বইয়ের অপর্ণাকে মনে আছে তোমার ? ভালোবাসা বাড়ানোর জন্য সে থেকে থেকে নিজেই বিরহ সৃষ্টি করে নিত। আমিও ভাবছিলাম—

একটি মুখর হিরো ও প্রায় নির্বাক হিরোইন—শুধু এই দুটি চরিত্র লইয়া নাটকের যেন অভিনয় চলিতে থাকে ঘরে,—রাত দুটা পর্যন্ত। প্রথম অঙ্ক শেষ হওয়ার আগেই অমলার সবটুকু উত্তেজনা নিস্তেজ হইয়া আসে, জাগে ভয়, মুখ হয় বিবর্ণ। এ কী ব্যাপার ? সত্যসত্যই পাগল হইয়া গিয়াছে নাকি সূর্যকান্ত ? এ সব সে কী বলিতেছে, কী করিতেছে ? ক্রমে ক্রমে শ্রান্তি বোধ করে অমলা, তার ঘুম পায়। কিন্তু ঘুমানোর উপায় নাই। তার আট মাসের প্রতিহত উচ্ছ্বাস স্বামী আজ সুদে-আসলে ফিরাইয়া দিতেছে, গ্রহণ না করিয়া তার উপায় কী ? কখনও প্রচণ্ড ও কঠিন, কখনও মৃদু ও কোমল ভালোবাসার বন্যা আনিয়া দিতেছে স্বামী, যা সে চাহিয়া আসিয়াছে চিরকাল, আজ এ বন্যায় ভাসিয়া না গেলে কি চলে ? মাগো, এমন হইল কেন সূর্যকান্ত, কীসে এমন পরিবর্তন আসিল তার ?

রাত দুটোর সময় বোধ হয় তার মুখ দেখিয়া দয়া হইল সূর্যকান্তের। হঠাৎ, মোটরের ব্রেক কষার মতো, সে থামিয়া গেল। অমলা মরার মতো জিজ্ঞাসা করিল, আমি এসেছি, এবার তো লিখতে পারবে ?

সূর্যকান্ত আনমনে জবাব দিল, আমি ভাবছি অমল, কথা কোয়ো না। তোমার কথা ভাবছি। পাশে শুয়ে আছ তুমি, তবু তুমি যেন কত দূরে, কত সমুদ্র, কত মরুভূমি পার হয়ে কুয়াশার আড়ালে তুমি যেন লুকিয়ে আছ, মনকে বাহন করে আমি তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। বাধা দিয়ো না, কথা কোয়ো না।

বিষের ওষুধ নাকি বিষ। তবু, স্ত্রী প্রকৃতির অস্বাভাবিকতাটুকু স্বাভাবিক করিয়া আনার জন্য সূর্যকান্তের এই অভিনব চিকিৎসাকে সমর্থন করা যায় না। আসলে, দোষ তো তারও কম নয়। প্রথম বয়সে ভাবপ্রবণতা, কবিত্ব ও রোমান্সের পিপাসা, হৃদয়ে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের বাহুল্য, অধিকাংশ ছেলেমেয়েরই কমবেশি থাকে। এদিকে সূর্যকান্ত হইয়া গিয়াছে বুড়া। বয়সে না হোক, মনের হিসাবে। শুধু নিজের জীবনে নয়, পরের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন করিয়া সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে স্তূপাকার, লিখিতে বসিয়া শুধু পুরুষের নয়, মেয়েদেরও অসংখ্য বিভিন্ন অনুভূতি উপভোগ করিয়াছে বহুবার। ধরিতে গেলে ইতিপূর্বেই অনেকবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে সূর্যকান্তের, কখনও সে হইয়াছে বউ, কখনও বর ; সে একাই একজোড়া স্বামী-স্ত্রী সাজিয়া নানাভাবে নানারকম সংসার স্থাপন করিয়াছে। অমলা তার কোন পক্ষের বউ বলা যায় না ! তবু অমলার কল্পনাকে পর্যন্ত স্তম্ভিত করিয়া দেওয়ার মতো ছেলেমানুষি অবাস্তব কল্পনা, জীবনকে কাব্যময় ও নাটকীয় করিয়া তুলিবার পিপাসা—এক কথায়, অনুভূতির জগতে বৈশাখী ঝড় ও বাসন্তী বায়ুর বিপরীত বিপর্যয় ঘটাইবার কামনা আজও সূর্যকান্তের আছে—তবে সেই সঙ্গে আছে ওই পিপাসা বা কামনাকে গোপন করিয়া রাখার অভ্যাস ও কোনো জীবন্ত রক্তমাংসের রমণীর সঙ্গে ও সমস্তের আদান-প্রদানের অক্ষমতা। জীবনটা মানুষের যতখানি গল্প-উপন্যাস হওয়া দরকার, নিজের গল্প-উপন্যাসে সূর্যকান্তের তা বহুগুণ বেশি হয়। লেখার সময় ছাড়া সে তাই হইয়া থাকে ভোঁতা, চায় শান্তি ও সহজ স্বাভাবিক জীবন। প্রতিভাবান সাহিত্যিকরা এ রকম হয় কিনা জানি না, তবে যে সব লেখকের বই পড়িয়া শুধু অমলার মতো মেয়েদের বুকটা ধড়ফড় করে, তারা অবিকল এই রকম বা এই ধরনেরই অন্য-রকম হয়।

বাস্তব জীবনের সাধারণ কাজগুলি সূর্যকান্ত সাধারণভাবেই করে, সাধারণ সমস্যার মীমাংসা করে সাধারণ বুদ্ধি খাটাইয়া, তাতে কাজও হয়, সমস্যাও মেটে। অমলার জ্বর হইলে সে ডাক্তার

ডাকিত সন্দেহ নাই, কিন্তু জ্বর সাধারণ অসুখ। অমলার হৃদয়-মনের অস্বাভাবিক উত্তাপ তো জ্বর নয়। এই অসুখের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে সূর্যকান্তের সাধারণ বুদ্ধি গুলাইয়া গেল। সে ভুলিয়া গেল যে বিষে যদিও বিষ ক্ষয় হয়, হিস্টিরিয়া হিস্টিরিয়ায় সারে না—কারণ হিস্টিরিয়া বিষ নয়।

কয়েক দিনের মধ্যে অমলা শুকাইয়া গেল। এ তো আর বই পড়া নয়, কল্পনা করা নয়, স্বপ্ন দেখা নয়, নিজের হৃদয়োচ্ছ্বাসকে কোনো রকমে বাহির করিয়া দেওয়া নয় ! অন্য একজনের হৃদয়কে বহিয়া বেড়ানো—প্রত্যেক দিন উত্তেজনার মদ খাইয়া নেশায় জ্ঞান হারানো। স্বামীর আক্রমণের আকস্মিকতায় প্রথম রাত্রে অমলা ভয় পাইয়া গিয়াছিল, এখন আব ভয় হয় না, বুকটা ফাটিয়া যাইতে চায়, মাথার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খল আবর্তনের সৃষ্টি হয়, চোখের সামনে সমস্ত ঝাপসা হইয়া আসে। এক-একসময় চিৎকার করিয়া হাসিয়া অথবা কাঁদিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয়। এক-একসময় ঘরের জিনিসপত্র ভাঙিয়া ছারখার কবিয়া দিবার অথবা সূর্যকান্তের বুকটা আঁচড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিবার অদম্য প্রেরণা জাগে। সূর্যকান্তেব আদরে তার দম আটকাইয়া আসে, কথা শুনিতে শুনিতে দুই কানের মধ্যে ঝমঝম আওয়াজ হয়, হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া সে চুপ করিলে চারিদিকের স্তব্ধতা মনেব মধ্যে আছড়াইতে থাকে।

ফিসফিস করিয়া বলে, আলো নিভিয়ে দাও, আলো নিভিয়ে দাও !

সূর্যকান্ত বলে, আলো ? কোথায় আলো অমলা ? জ্যোৎস্নাকে আলো বোলো না।

একটু ঝিমায় অমলা।

লিখবে না আজ ?

লেখা ? একটু হাসে সূর্যকান্ত, কার জন্য লিখব ? মনের পাতায় লিখছি, মুখে তোমাকে শোনাচ্ছি। আর কী দরকার লিখে ?

মাথাটা কেমন ঘুরছে, কী রকম একটা কষ্ট হচ্ছে।

এবার হঠাৎ যেন সূর্যকান্ত চোখের পলকে আগেকাব সূর্যকান্ত হইয়া যায। এক গ্লাস জল গড়াইয়া সে অমলাকে দেয়, ভিজা হাত বুলাইয়া দেয় তার কপালে ও ঘাড়ে। শুধু বলে শোও। তাবপর আলো নিভাইয়া সেও আসিযা শুইয়া পড়ে ! বলে, কী কষ্ট হচ্ছে অমলা ?

কী জানি, বুঝতে পারছি না।

কেবল কষ্ট নয়, অনেক কিছুই সে বুঝিতে পাবে না ! বারুদ-ফুরানো তুবড়িব মতো হঠাৎ সূর্যকান্ত নিভিয়া গেল কেন ? রামধনুব মোহিতের মতো বিপুল দুর্বোধ্য প্রেম একমুহূর্তে কী করিয়া হইয়া গেল এমন মৃদু কোমল স্নেহ ? গভীর বিষাদ ও অবসাদ বোধ করে অমলা, তাব ঘুম আসে না। একসময় মৃদুস্বরে সূর্যকান্ত তাকে ডাকে। ঘুমের ভান করিয়া সে জবাব দেয় না। তামাশা ? সূর্যকান্ত কি তামাশা জুড়িয়াছে তাব সঙ্গে ? এতদিন ধরিয়া এ রকম তামাশা করিবার মানুষ তো সে নয় ! তাছাড়া, কারও তামাশা কি এমন উতলা করিয়া তুলিতে পারে একজনকে ? প্রথম দু-একদিন কেমন খাপছাড়া মনে হইয়াছিল স্বামীর এই অভিনব পরিবর্তন, এখনও মাঝে মাঝে সব যেন কেমন বেসুরো কৃত্রিম মনে হয়—কিন্তু বাকি সময় ? তখন যে আশ্চর্য ব্যাকুলতা সে দেখায়, যে অভূতপূর্ব ভাব ফুটিয়া থাকে তার মুখে চোখে, তা কি কখনও বানানো হইতে পারে ? কথা বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া সে যখন শুধু চাহিয়া থাকে ; শুধু ভাবে, আর মোহগ্রস্ত বিহুল মানুষের মতো দুটি হাত বাড়াইয়া তাকে স্পর্শ করামাত্র চমকাইয়া ওঠে এবং ভীরু শিশুর মতো তাকে জড়াইয়া ধরে, তখনও সে অভিনয় করিতেছে এ কী ভাবা যায় ! অথচ এদিকে তার একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা অমলার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সূর্যকান্ত তাকে বলিয়াছিল সে বাপের বাড়ি যাওয়ার পর মাসিকের উপন্যাসটির ইনস্টলমেন্ট পর্যন্ত সে লিখিয়া দিতে পারে নাই। কদিন আগে, সে আপিস চলিয়া গেলে বারোটার ডাকে মাসিকপত্রটি আসিয়াছিল : তাতে ছিল উপন্যাসটির দশ পাতা ইনস্টলমেন্ট।

কৈফিয়ত অবশ্য সে একটা দিয়াছিল, সে নাকি এ মাসের কথা বলে নাই, বলিয়াছিল আগামী মাসের কথা। এ সংখ্যার লেখা তো সে কবে লিখিয়া দিয়াছে, অমলার বাপের বাড়ি যাওয়ার অনেক আগে।

অন্তত দুমাস আগে লেখা দিতে হয় অমল, নইলে ওরা সময় পাবে কেন ছাপবার ?

তবু অমলার মনের খটকা যায় নাই। দুমাস আগে হোক চার মাস আগে হোক, পাঠাইয়া দেওয়ার আগে সূর্যকান্তের কোন লেখাটা সে পড়িয়া ফ্যালে নাই ? এ লেখা সে লিখিল কখন ?

আপিসে লিখেছিলাম। দশ-বারোদিন একদম কাজ ছিল না, সেই সময়। এডিটর তাগিদ দিচ্ছিল তাই আর তোমাকে পড়তে দিইনি।

তবু মিথ্যাটা এ সব কৈফিয়তের খোলসে সম্পূর্ণ ঢাকা যায় নাই। অমলার মনের প্রতিবাদ এ সব না মানিয়া একটা বিস্বাদ ব্যথায় পরিণত হইয়া আজও তার মনে বাসা বাঁধিয়া আছে। আছে গোপনে। সূর্যকান্তের এখনকার নতুন ধরনের ভালোবাসারও সেখানে প্রবেশাধিকার নাই !

লেখা সূর্যকান্ত ছাড়িয়া দিয়াছে। বাড়িতেও লেখে না, আপিসেও লেখে না। বাপের বাড়ি গিয়া নয়, এখানে আসিয়া অমলা তার লেখার ক্ষমতা হরণ করিয়াছে। অমলাকে অজস্র পরিমাণে দেওয়ার জন্য নিজের মধ্যে সে যে উচ্ছ্বাসের কারখানা বসাইয়াছে এবং কারখানা চালানোর জন্য মজুর ভাড়া করিয়াছে---বই লেখার কৃত্রিম খাদ্যে পরিতুষ্ট মনের চাপ-পড়া পাগলামিগুলিকে, সেই কারখানাতে এখন সবসময় সে কর্তৃত্ব খাটাইতে পারে না। অমলাকে দেওয়ার জন্য ছাড়া অন্য কাজে খাটাইতে গেলে মজুররা ধর্মঘট করে, কারখানা বন্ধ করার কথা ভাবিলে আরম্ভ করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িকভাবে একটু একটু মদ খাইতে আরম্ভ করিয়া যারা নেশার দাস হইয়া পড়ে, তাদের মতো অবস্থা হইয়াছে সূর্যকান্তের। অমলার সঙ্গ ছাড়া আর কিছু তার ভালো লাগে না— আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কর্তব্যপালন। শয়নঘরের বাহিরে সে আগের চেয়েও গম্ভীর হইয়া থাকে, মানুষের সঙ্গে তার ব্যবহারকে সে আরও সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিয়া রাখে—মনে হয় সে যেন সবসময় প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া চলিতেছে আর বোধ করিতেছে দারুণ অস্বস্তি। সাহিত্যিক বন্ধুরা জানিতে চায় সে তার এক নম্বর এপিকটা লিখিতেছে কি না, সম্পাদকরা প্রকারান্তরে জানাইয়া দেয় এ রকম অন্যায় ব্যবহার সহ্য করা কঠিন, সাধারণ বন্ধুরা উপদেশ দেয় চেঞ্জে যাওয়ার, বাড়ির লোকে চেষ্টা করে আদর যত্ন স্নেহ মমতা সহানুভূতি প্রভৃতির পরিমাণটা বাড়াইবার। বাইশ বছর বয়সে যা করা চলিত, ত্রিশ বছর বয়সে তাই করিতে চাহিয়া চারিদিকে সূর্যকান্ত বিশৃঙ্খলা আনিয়া দেয়। ক্রমে ক্রমে তার মনে হয় অমলার চিকিৎসার জন্য নয় — ওই ছুতা করিয়া নিজের দাবাইয়া রাখা মানসিক বিকারগুলিকে সে সতেজে আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ দিয়াছে। অমলার পাগলামি সারানো নয়, এ তার নিজেরই পাগল হওয়ার ইচ্ছা মেটানো। তা না হইলে, এ সব অমলার সহ্য হইতেছে না দেখিয়াও সে কি থামিয়া যাইত না ? সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া আনিত না তাদের সঙ্গ ? এ ভাবে সে তো ওকে নির্যাতন করিতে চায় নাই ! ওকে শুধু সে বুঝাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, ও যে নাটকীয় প্রেম চাহিত সেটা কত তুচ্ছ, কত হালকা, কতদূর হাস্যকর ! সে তো শুধু থিয়েটার করিতে চাহিয়াছিল কদিন, তার নিজের গৃহের সিমেন্টের রঙ্গমঞ্চে সাধারণ বাস্তব জীবনের বিরুদ্ধে দৃশ্যপটের আবেষ্টনীতে অমলার উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা লইয়া রচিত একটা শিক্ষাপ্রদ নাটকের অভিনয় ; এখন তার কাছেই সে অভিনয় এত বড়ো সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে কোনোমতেই যবনিকা সে আর ফেলিতে পারিতেছে না।

দিন কাটে। এক মাসের ছুটি নেয় সূর্যকান্ত, আপিস বিরক্তিকর। অমলার চোখের নীচেকার কালিমার ছাপ গাঢ় হইতে থাকে, কোনো কারণে কোনো দিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিলে মনে হয় চোখে যেন তার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সংসারের কাজ আছে, সকলের সঙ্গে মেলামেশা আছে, সংসারের দৈনন্দিন সুখদুঃখ হাসিকান্নার ভাগ নেওয়া আছে। শ্রান্ত, বিষণ্ণ ও অন্যমনস্কভাবে এ সব সে করিয়া

যায়। রান্নাঘরে রাঁধিবার সময়ও সে যেন থাকে তার নিজের ঘরে, কল চালাইয়া সেজো ননদের ছেলের জামা সেলাই করিবার সময় সে যেন কণ্ঠলগ্না হইয়া থাকে সূর্যকান্তের। শান্ত ও স্নিগ্ধ একটু রূপ ছিল অমলার আর ছিল তেলমাখা পাথরের বাটির মতো একটু ভোঁতা লাবণ্য, এখন তাব রূপ হইয়াছে দৃষ্টিকে আকর্ষণ করা মুখভঙ্গির তীক্ষ্ণ তেজি মৌলিকতা, লাবণ্য হইয়াছে সদ্য শাণ দেওয়া সিসার ছুরির পালিশ। মেজাজ, বুদ্ধিবিবেচনা, আত্মসংযম, চিন্তা ও কল্পনা, সুনিদ্রা এ সব বড়ো অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে অমলার। হঠাৎ সামান্য কারণে সে এত রাগিযা যায় যে অন্তত আরও একটা বছরের পুরানো বউ যদি সে হইত, না খাইয়া শুইয়া থাকার বদলে বাড়িঘর মাথায় না তুলিয়া কখনই ছাড়িত না। ভাবনাগুলি তার এমন এলোমেলো হইয়াছে যে সব সময় কী ভাবিতেছে তাও সে বুঝিতে পারে না ; স্টিমারে চাপিয়া কবে সে একবার ঢাকা গিয়াছিল, আর কাল সেজো ননদ যে বড়ো জার ছেলের দুধটুকু নিজের ছেলেকে খাওয়াইয়া দিয়াছিল, আর পরশু রাত্রে সূর্যকান্ত যে তার উনিশ বছর বয়সের একটা ভুলের কাহিনি শোনাইয়াছিল, আর....! তবু এ সমস্ত খিচুড়ি পাকানো চিন্তার মধ্যে আসল চিন্তার খেইটা না হয় নাই খুঁজিয়া পাওয়া গেল, বাড়ির যে দাসীটা আঁচল পাতিযা ঘুমাইয়া আছে ওর মাথায় এক ঘটি জল ঢালিয়া দিবার সাধটা কোন দেশি সাধ ? আর আজ রাত্রে বিধবা বড়ো ননদের সঙ্গে শোয়ার সাধ ? চুপিচুপি সদব দরজা খুলিয়া পালাইয়া যাওয়ার সাধ ? কলের ছুঁচটার নীচে একটা আঙুল দিয়া নিজেকে কেন্দ্র করিয়া বাড়িতে একটা হইচই গন্ডগোল সৃষ্টি করার সাধ ? আচ্ছা, কাল যখন সিঁড়ি দিয়া নামার সময় পা পিছলাইয়া গিয়াছিল, রেলিং ধরিযা সামলাইয়া না নিলে কী হইত ? খুব কী লাগিত গড়াইয়া গড়াইয়া নীচে পড়িয়া গেলে, হাত ভাঙিত, মাথা ফাটিত, একেবারে সে অজ্ঞান হইয়া যাইত ? কী করিত সকলে ? সূর্যকান্ত কী করিত ?—দ্যাখো ! সেজো ননদের ছেলের জামার কোনখানটা সে সেলাই করিয়া ফেলিযাছে। মরেও না সেজো ননদটা।

এক মাস ছুটি নিয়াছে সূর্যকান্ত। কিন্তু দুপুরে অমলা ঘরে যায় না। সূর্যকান্তও তাকে ডাকে না। আপিস না করার আলস্য সে অমলা কাছে না থাকার মুক্তির সঙ্গে মিশাইয়া উপভোগ করে। বেশি বেলায় বেশি খাওয়ার জন্য একটু অম্বলের জ্বালাও সে ভোগ করে। চোখ দিয়া দ্যাখে কড়িকাঠ, কান দিয়া শোনে ওদিকের ঘরে অমলার কল-চালানোর ক্ষীণ শব্দ, হৃদয় দিয়া অনুভব করে ভোঁতা একটা গ্লানি, আর মন দিয়া ভাবে আজই পোস্ট অফিস হইতে শ-তিনেক টাকা তুলিয়া বিকালের কোনো একটা গাড়িতে কোথাও বেড়াইতে গেলে কেমন হয়। বিকালের গাড়িতে, অন্তত বাত্রি ন-টার আগের কোনো গাড়িতে। অমলা ঘরে আসার আগেই যে গাড়িটা ছাড়িয়া যায়। কোন অমলা ? তার মনের, না ও ঘরে কল চালাইয়া যে সেজো ননদের ছেলের জামা সেলাই করিতেছে, যে ঘরে আসিলে এতটুকু ঘরে কোটি বসন্ত আর কোটি প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন মুহূর্তগুলি ঘনাইয়া আসিবে ? ঠিক বুঝিতে পারে না সূর্যকান্ত। মনের অমলাকে সাথী করিয়া বিকালের গাড়িতে পালানো যায়, কিন্তু তাতে কি ও ঘরের অমলার জন্য মন কেমন করা কমিবে ?

ছুটি নেওয়ার চার-পাঁচদিন পরে বিকাল বেলা সূর্যকান্ত একখানা চিঠি লিখিতেছিল, অর্ধেক লিখিয়া চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কার উপরে রাগ করিয়াই সে যেন উঠিয়া পড়িল। সহজ ভাষায় পরিষ্কার করিয়া কেবল দরকারি কথাগুলি লিখিয়া একখানা চিঠি লেখার ক্ষমতাও যদি তার লোপ পাইয়া থাকে, এবার তবে একটা ব্যবস্থা করা দরকার। জামা গায়ে দিতে দিতে সূর্যকান্তের রাগ কমিয়া আসিল। কার উপরে রাগ করিবে ? চিঠি লিখিতে বসিয়া সে যদি ভাবিতে আরম্ভ করে যে আজ রাত্রে অমলার সঙ্গে প্রথমেই কীভাবে একটা নতুন ধরনের মধুর কলহ আরম্ভ করা সম্ভব, গুরুতর বিষয়ের বৈষয়িক চিঠি সে লিখিবে কী করিয়া ? জুতা পায়ে দিয়া, কাপড় বদলাইয়া সূর্যকান্ত ঘরের বাহিরে আসিল। বারান্দায় স্টোভ জ্বালিয়া বৈকালিক চা-জলখাবারের আয়োজন হইতেছে। মেঘলা রঙের শাড়ি পরিয়া অমলা বেলিতেছে লুচি। শুধু বাড়ির মেয়েদের ও ছোটো ছোটো

ছেলেমেয়েদের মধ্যে অমলার স্বাভাবিক তুচ্ছ অসংযমটুকু কী রহস্যময় ! একটু দাঁড়াইল সূর্যকান্ত। অমলার সেজো ননদ বলিল, বেরিয়ে যাচ্ছ নাকি দাদা ? খেয়ে যাও, আগে চা করে দিচ্ছি তোমাকে। কেটলিতে জল আনো দিকি মেজো বউদি ? যা লুচি ভাজা হয়েছে ওতেই দাদার হয়ে যাবে।

সূর্যকান্ত বলিল, এখন কিছু খাব না। খিদে নেই। সময় নেই।

তখন উঠিয়া আসিয়া অমলা ঘরে ঢুকিল। বক্তব্য আছে। এ বাড়িতে আধ-পুরানো বউদের প্রথমে নিজে সকলের চোখের আড়ালে গিয়া—তারপর স্বামীকে ইশারায় কাছে ডাকিয়া কথা বলা নিয়ম। এখন ইশারার দরকার ছিল না। সূর্যকান্তও ঘরে গেল।

অমলা বলিল, বাইরে থেকে চা খেয়ে এসো না কিন্তু। আমিও এখন চা খাব না, তুমি ফিরে এলে নিজে চা করে দেব, তারপর এক পেয়ালা থেকে দুজনে একসঙ্গে চা খাব, কেমন ? এমনি করে খাব—

এ মন্দ পরামর্শ নয়। গালে গাল ঠেকাইয়া একসঙ্গে দুজনে চায়ের কাপে চুমুক হয়তো তারা দিতে পারিবে। কিন্তু কেন ? গালে গাল ঠেকানো আব চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার ব্যাপার দুটো পৃথক করিয়া রাখিলে দোষ কী ?

আজ আমি ফিবব না অমল।

ফিরিবে না ! রাত্রে বাড়ি ফিবিবে না ! কোথায় থাকিবে সূর্যকান্ত সমস্ত রাত ? কেন ? বন্ধুর বাড়িতে [illegible] থাকিবে কেন ? নিমন্ত্রণ আছে, খাওয়া শেষ হইতে অনেক রাত্রি হইয়া যাইবে, তাই ? হোক বাত্রি, ট্যাক্সি করিয়া যেন সে ফিরিয়া আসে। একদিন না হয় ট্যাক্সি ভাড়া বাবদ দেড়টাকা-দুটাকা খবচই হইবে ! অমলার অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি চোখে বিঁধিতে থাকে সূর্যকান্তের, মাথাটা যেন ঘুবিয়া ওঠে।

তবে যাব না অমল।

সেই ভালো। কী হবে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে ?

তাই তো বটে ! তাব চেয়ে অমলাব সঙ্গে এক কাপে চা খাওয়া ঢেব বেশি উপভোগ্য। কিন্তু কীভাবে ওর সঙ্গে আজ সে মধুব কলহটা আবম্ভ কবিবে ? কীভাবে আজ সে নতুন একটা বৈচিত্র্য আনিবে তাদের প্রেমাভিনয়ে ? বেশি জটিল হইলে, বেশি আর্টিস্টিক হইলে অমলা আবার বুঝিতে পারে না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলে যে সে তাব উপযুক্ত বউ নয়, তা[illegible] মরাই ভালো। ফেনা ভালোবাসে অমলা, শুধু ফেনা। তাব মতো সাধাবণ অল্পশিক্ষিতা ঘবের কোনায় বাড়িয়া ওঠা মেয়ে যা কিছু বুঝিতে, অনুভব কবিতে ও উপভোগ করিতে পাবে তারই ফেনা। ওব জন্য জলকে সোডা ওয়াটারের মতো, সিদ্ধির শরবতকে মদেব মতো ফেনিল করিয়া তুলিতে হয় তাকে। নতুবা তাদেব নাটক জমে না। নাটক না জমিলে অমলাব মতো তাবও মনে হয় জীবনটা বৃথা হইয়া গেল, বাঁচিয়া থাকার কোনো মানে রহিল না।

বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে নয়, পবদিন থিয়েটার দেখিতে গেল সূর্যকান্ত। অমলা ও বাড়ির অন্য মেয়েরাও অবশ্য সঙ্গে গেল। থিয়েটারে তাই দুজনের মধ্যে দু-একবার দৃষ্টিবিনিময় ছাড়া কথাবার্তা কিছুই হইল না। রাত তিনটায় বাড়ি ফিরিয়া নিদ্রাতুর দুজনে দু-একটি কথা বলিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন সূর্যকান্ত বাড়িতেই রহিল বটে কিন্তু আগের রাত্রে বাহিরের আসল নাটক দেখিয়া আসার জনাই সম্ভবত সেদিন রাত্রে ঘরোয়া নাটক তাদের তেমন জমিল না, দারুণ অস্বস্তি মনে লইয়া দুজনে সে রাত্রে ঘুমাইল। পরদিন অমলার সেজো ননদকে স্বামীর কাছে রাখিয়া আসিতে সূর্যকান্ত চলিয়া গেল পাটনা। কাজটা অমলার দেবর করিতে পারিত—তাই ঠিক ছিল আগে, শুধু দিন তিনেক

তার কলেজ কামাই হইত। তিনদিন তাকে ছাড়িয়া থাকার চেয়ে ভাইয়ের তিনদিন কলেজ কামাই হওয়াকে সূর্যকান্ত যে বড়ো মনে করিল এতে কী মর্মান্তিক আঘাতই অমলার মনে লাগিল ! তাও, ভাগনের সঙ্গে যখন সেজো ননদকে পাঠানো চলিত, সেজো ননদের স্বামীকেও যখন লেখা চলিত যে, আসিয়া লইয়া যাও। ভাগনে অবশ্য খুব ছেলেমানুষ, সেজো ননদের স্বামী অবশ্য অনেক চেষ্টা করিয়াও ছুটি পায় নাই—তবু মনে আঘাত লাগা তো এ সব যুক্তি মানে না ! তারপর তিনদিন পরে যখন অমলার বদলে অমলার দেবরের নামে একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি আসিল সূর্যকান্তের যে, এখানে ওখানে, সে একটু বেড়াইবে এবং ফিরিতে তার দেরি হইবে, অমলার চোখে পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল স্বামী তাকে ত্যাগ করিয়াছে। হঠাৎ তাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া একবার যেমন ত্যাগ করিয়াছিল, এবার নিজে বোনের শ্বশুরবাড়ি গিয়া আবার তেমনই ত্যাগ করিয়াছে। কেবল সেবার এখানে ফেরামাত্র স্বামীকে সে ফিরিয়া পাইয়াছিল, এবার স্বামী তার ফিরিয়া আসিলেও তাকে আর সে ফিরিয়া পাইবে না। অনুপযুক্তা বউটাকে জীবন হইতে ছাঁটিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্য না থাকিলে এত লোক থাকিতে সে কেন যাচিয়া পাটনা যাইতে চাহিবে, তার সজল চোখের বারণ মানিবে না ? হায়, একখানা চিঠিও যে সে লিখিল না অমলাকে !

তিন-চারদিন পরেই আগ্রা হইতে চিঠি আসিল বটে, বেশ বড়ো চিঠি, ফুলস্ক্যাপ কাগজের প্রায় একপাতা। কাগজ দেখিয়া আর 'কল্যাণীয়াসু' সম্বোধন দেখিয়াই অমলা বুঝিতে পারিল এ চিঠি চিঠিই নয়, পরিত্যক্তা স্ত্রীর সঙ্গে এ শুধু সূর্যকান্তের ভদ্রতা। কী লিখিয়াছে সূর্যকান্ত ? কিছুই নয় ! অমলাকে সে একটা ভ্রমণ-কাহিনি পাঠাইয়া দিয়াছে। শুধু গোড়ায় একটা অর্থহীন কৈফিয়ত দিয়াছে হঠাৎ তার বেড়ানোর শখ জাগিল কেন এবং শেষে লিখিয়াছে অমলাকে সাবধানে থাকিতে, সময়মতো খাওয়া-দাওয়া করিতে, শরীরের দিকে নজর রাখিতে, বাড়ি ফিরিয়া সে যদি অমলাকে বেশ মোটাসোটা দ্যাখে তবে তার কত আনন্দ হইবে—এই কথা। তারপর ভালোবাসা জানাইয়াই ইতি এবং সে যে শুধু অমলারই এই মিথ্যা ঘোষণা।

ঘরে খিল দিয়া চিঠি পড়িয়াছিল অমলা, পাঁচ ঘণ্টা পরে সে খিল খুলিল। পাংশু বিবর্ণ তার মুখ, চোখ দুটি লাল। অসুখের কথা সকলে বিশ্বাস করিল, কেবল অমলার ছোটো ননদ, যার বিবাহের বয়স হইয়াছে এবং সূর্যকান্তের মতো সাহিত্যিকদের উপন্যাস পড়িয়া যার আজকাল বুক ধড়ফড় করে, সে শুধু বলিল—বিরহ নাকি বউদি ? চিঠি তো এল আজ। দাও না চিঠিখানা লক্ষ্মী বউদি ভাই, দেখি দাদা কী লিখেছে। সারাদিন ধরে পড়লে চিঠি, খেলে না দেলে না—

বিরহ ? ও সব তুচ্ছ মৃদু বেদনা বোধ করিবার শক্তি অমলার আর ছিল না। আর কী তার সন্দেহ আছে যে সূর্যকান্তের হঠাৎ পাটনা যাওয়া ও এত দেরি করিয়া বাড়ি ফেরা তাকে ত্যাগ করারই ভূমিকা ? রামধনুর অপর্ণাকে তার সাধারণ অনুপযুক্ত স্বামী যে কারণে ত্যাগ করিয়াছিল, তার ঠিক উলটা কারণে। নিজের বিবাহিত জীবনকে ও বিবাহিত জীবনের বাছা বাছা ছোটোবড়ো ঘটনাকে অমলা তার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে খাপ খাওয়ায়। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় সূর্যকান্ত তাকে বিবাহ করিয়াছিল, তাই গতবার বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া পর্যন্ত তাকে সে ভালোবাসে নাই, তার বুকে ভালোবাসা জাগাইবার চেষ্টাও করে নাই, বরং বাধাই দিয়াছে। অমলার ভালোবাসা তখন সে চাহিত না, আর একজনের স্মৃতি (উনিশ বছর বয়সে একটা ছেলেমানুষি ভুল করার কাহিনিতে সে যার নাম করিয়াছিল তারই স্মৃতি কি না কে জানে !) বুকে পুষিয়া রাখিয়াছিল, নিজেকে ধরা দেয় নাই। অথবা সে অপেক্ষা করিতেছিল যে তাকে জয় করিয়া অমলা নিজের উপযুক্ততার প্রমাণ দিবে : মাঝে মাঝে দেখা হইয়া নয়, দিবারাত্রি একসঙ্গে বাস করিয়াও যদি তার বুকে ভালোবাসা না জাগাইতে পারে, কোন গুণে তবে সে তার মতো দেশবিখ্যাত সাহিত্যিকের বউ হইয়া থাকিবে ? তারপর তাকে বাপের বাড়ি পাঠানোর নামে ত্যাগ করিয়া বুঝি একটু মায়া হইয়াছিল সূর্যকান্তের, ভাবিয়াছিল সবদিক দিয়া

নিজেকে অমলার কাছে সঁপিয়া দিয়া একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে অমলা তাকে বাঁধিতে পারে কি না। তাও যখন সে পারিল না, তখন আর পাটনা যাওয়ার ছলে তাকে ত্যাগ করা ছাড়া কী উপায় ছিল সূর্যকান্তের।

অন্য কোথাও পাঠাইয়া দিয়া ত্যাগ হয়তো সে করিবে না, এখানে থাকিতে দিবে। আগের মতো থাকিতে দিবে, গাম্ভীর্য ও সহজ ব্যবহারের ব্যবধান রচিয়া। মৃদু একটু স্নেহমমতা সে পাইবে, আর কিছুই নয়। এ জীবনে একটি রাত্রিও আর অমলার আসিবে না স্বামীর যখন সে নাগাল পাইবে, স্বামী যখন তাকে ভালোবাসিবে।

আগে, বাপের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিবার আগে, অনুরূপ অবস্থায় পড়িলে এইসব কথা হয়তো অমলার মনে আসিত কিন্তু আসিত কল্পনার রথে। হাজার সে বিচলিত হোক তার নারী-মস্তিষ্কের স্বভাব ও অপরিবর্তনীয় হিসাব করার প্রবৃত্তি, যা বাস্তবতা ও বাস্তব লাভ-লোকসানের হিসাব ছাড়া আর কিছুই মানে না, তাকে কখনও ভুলিতে দিত না যে তার এইসব উদ্ভট বিশ্লেষণ সাংসারিক রীতিনীতির বিরুদ্ধ, এ তার পাগলামি, তার নারীজীবনের প্রকৃত সার্থকতাগুলির একটাও এইসব কারণে আসিতে বাধা পাইবে না। বরং এই উপলক্ষে একটা নতুন ধরনের মান-অভিমানের পালা গাহিয়া আরও সে নিবিড়ভাবে বাঁধিতে পারিবে তার স্বামীকে। কিন্তু অস্বাভাবিক ও মারাত্মক ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে তার আত্মরক্ষার এই স্বাভাবিক ব্রহ্মাস্ত্রটি সূর্যকান্ত অব্যবহার্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। যা ছিল অমলার শুধু কল্পনা ও হৃদয়োচ্ছ্বাস, কয়েক বছরের মধ্যে সংসারের ঢের বেশি গুরুতর ও ঢের বেশি প্রিয়তর ভাবনাচিন্তার তলে যা কোথায় তলাইয়া যাইত, নিজের অপরিমেয় অস্থায়ী পাগলামি দিয়া সূর্যকান্ত তাকেই অমলার কাছে দিয়া গিয়াছে সত্য ও বাস্তবতার রূপ। জীবনে নভেলি আবহাওয়া থাকে না জানিত বলিয়াই নিজের জীবনকে একটু নভেলি করার জন্য অমলার অদম্য পিপাসা জাগিয়াছিল, বিশেষত সে যখন মনে করিয়াছিল যে সূর্যকান্তের মতো নামকরা সাহিত্যিকের সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় জীবনটাকে ও রকম করার একটা দুষ্প্রাপ্য ও বিশিষ্ট সুযোগ পাইয়াছে। জীবনটা কাব্যময় করার সুযোগ, কাব্যকে জীবন করার নয়। অমলা তো সামান্যা স্ত্রীলোক, কাব্য ও জীবনের এই পার্থক্য জানা থাকে বলিয়াই কবি পর্যন্ত এ জগতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সূর্যকান্ত সব ভন্ডুল করিয়া দিয়া গিয়াছে। কবিত্ব করিতে গিয়া স্বামীর কাছে প্রশ্রয় না পাইয়া আগে কাঁদিয়াও সে সুখ পাইত, কারণ তাও ছিল এক ধরনের কাব্য। বাহুল্য কল্পনা ব্যাহত হইয়া বাহুল্য ব্যথা আসিয়া জীবনকে অমলার করিয়া তুলিত রসালো। এখন বাহুল্য ঘুচিয়াছে, রস হইয়াছে বিষ। একটা বোঝাপড়া যদি করিয়া যাইত সূর্যকান্ত, ভাবিবার একটা নতুন খোরাক যদি সে দিয়া যাইত অমলাকে ! শুধু এইটুকু যদি অমলা কোনো রকমে ভুলিতে পারিত যে ইদানীং সূর্যকান্ত যখন তাকে অজস্র পরিমাণে স্বর্গের সুধা আনিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাকে সে সহ্য করিতে পারিত না, কাছে যাইতে ভয় করিত। হায় ভগবান! সাধে কী স্বামী তার হাল ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে।

সময়ে স্নানাহার হয় না, রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, জীবনের গোড়াটাই যেন আলগা হইয়া গিয়াছে অমলার। কথা বলিতে কষ্ট হয়। মানুষ কাছে থাকিলে বোধ হয় বিরক্তি। হোক। কেউ কিছু বলিতে সাহস পায় না, এ বিরহিনী উন্মাদিনীকে কে ঘাঁটাইবে ? নিজের মনে থাকে অমলা, অনেকটা স্বাধীনভাবেই নিজের মনের বিকারকে ব্যবহার করে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন শহর হইতে সূর্যকান্তের চিঠি আসে, কখনও অমলার নামে—কখনও বাড়ির অন্য কারও নামে। প্রত্যেকটি চিঠি অমলাকে আঘাত করে। অমলার বিকৃত জগতে যা কিছু দামি সে সব কোনো কথাই চিঠিতে থাকে না, শুধু বাজে অবান্তর কথা। সূর্যকান্তের কাছে অমলার তুচ্ছতাই শুধু প্রমাণ করে চিঠিগুলি, আত্মগ্লানির আলোড়ন তুলিয়া দেয় মনে। একদিন প্রায় সমস্ত রাত জাগিয়া অমলা একখানা চিঠি লেখে সূর্যকান্তকে, আর একবার সে তাকে সুযোগ দিক, আর একটিবার, এবার যদি অমলা তার উপযুক্ত

জীবনসঙ্গিনী হইতে না পারে তবে বিষ খাইয়া হোক, গলায় দড়ি দিয়া হোক ইত্যাদি। দশ দিন পরে মাদ্রাজ হইতে এ চিঠির জবাব আসিল। অমলার চিঠি পাইয়া সূর্যকান্ত নাকি খুব খুশি হইয়াছে, তবে ও সব আবোলতাবোল কথা কী ভাবিতে আছে, ছি ! অমলা যে তার উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী নয় এ ধারণা তার কোথা হইতে আসিল ভাবিয়া সেই মাদ্রাজের একটা হোটেলের ঘরে বসিয়া সূর্যকান্ত এমন অবাক হইয়া যাইতেছে যে—

এদিকে আরও একমাসের ছুটির দবখাস্ত করিয়াছে সূর্যকান্ত। আরও কিছুদিন বেড়াইয়া বাড়ি ফিরিবে। অমলা যেন খুব সাবধানে থাকে, কেমন ?

হাসিতে হাসিতে দম আটকাইয়া আসে অমলার, মুখ দিয়া ফেনা বাহির হয়, হাত-পা ছুঁড়িবার ভঙ্গি দেখিয়া ভয় হয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বুঝি খসিয়া চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িবে। পালিয়ে পালিয়ে কতকাল বেড়াবে ঠাকুরঝি—বলে, আর ধনুকের মতো বাঁকা হইয়া অমলা হাসে। ব্লাউজের বোতামগুলি পটপট করিয়া ছিঁড়িয়া যায় বলিয়া রাগে অমলা ব্লাউজটাই ছিঁড়িয়া ফেলিযা দেয়, গায়ে আঁচলটুকু পর্যন্ত রাখিতে চায় না। বড়ো জা চেঁচায়, ছোটো ননদ কাঁদে, দেবর মাথায় ঘটি ঘটি জল ঢালে, ঠাকুর-দেবতার নাম করিয়া পিসি যে কী বলে বোঝা যায় না, বাকি সকলে যা করে অথবা বলে—তার কোনো মানে থাকে না। শেষে সকলে মিলিয়া চাপিয়া ধরে অমলাকে, অমলাও বড়ো জার হাতে কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দেয়। অতি কষ্টে কামড় ছাড়াইয়া দিবাব পর এত জোরে তার দাঁতে দাঁত লাগিয়া যায় যে শরীরের আর কোথাও বোধ হয় একটুও শক্তি অবশিষ্ট থাকে না, সমস্ত শরীর শিথিল হইয়া যায়।

এই প্রথমবার। দ্বিতীয়বার হয়—জরুরি টেলিগ্রাম পাইয়া সূযর্কান্ত ফিরিয়া আসিবামাত্র। তবে এবার হাসি দিয়া আরম্ভ হয় না, আরম্ভ হয় কলহে। কার হুকুমে সূর্যকান্ত ফিবিয়া আসিল বলিযা অমলা কলহ আবম্ভ করে, চিৎকার করিয়া গালাগালি দেয, মুখে ফেনা তোলে, হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে ধনুকের মতো বাঁকিয়া যায়, তারপব দাঁতে দাঁত লাগাইয়া হইয়া যায় শিথিল।

এবার সকলে ব্যস্ত হয় কম। এমন কী অমলার মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে তাকে এ বাড়িতে গছানোর জন্য বড়ো জা তার বাপ-দাদার নিন্দাও করে।

সূর্যকান্ত বলে, তিন বছর বয়েস যখন ভাঁড়িয়েছিল, এ রোগেব কথা গোপন কববে তা আর বেশি কী। অ্যাদ্দিন হয়নি কেন তাই আশ্চর্য।

কথাগুলি অমলা শুনিতে পায় না। রাত্রে সে তাই চুপিচুপি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করে, সত্যি বলছ তোমার মন কেমন করত ? কেন তবে ফেলে পালিয়ে গেলে আমাকে ? পাটনা থেকে কেন ফিরে এলে না ?

কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে কী হইবে ? হিস্টিরিয়া ভাবপ্রবণতা নয়, ও একটা রোগ।

বিপত্নীকের বউ

প্রতিমার বাবা নেহাত গরিব নন, প্রতিমাকেও দেখিতে নেহাত খাবাপ বলা যায় না। আরও কিছুদিন চেষ্টা করিলে বিবাহের অভিজ্ঞতাবিহীন ভালো একটি কুমার বর তার জন্য অবশ্যই জোগাড় করা যাইত। তবু বিপত্নীক রমেশের হাতে তাকে সমর্পণ করাই বাপ-মা ভালো মনে করিলেন। একবার বিবাহ হইয়াছিল এবং বছর ছয়েক বয়সের একটি ছেলে আছে, এ দুটি খুঁত ছাড়া পাত্র হিসাবে রমেশের তুলনা হয় না। মোটে একত্রিশ বছর বয়স, দেখিতে খুবই সুপরুষ, তিনশো টাকা মাহিনার সরকারি চাকরি। উচ্চশিক্ষা, নম্রস্বভাব, সদ্‌বংশের গৌবব এ সবের অভাবও রমেশের নাই। এমন পাত্র হাতছাড়া করিবে কে ?

রমেশ নিজেই মেয়ে দেখিতে গিয়াছিল, বিবাহের আগে প্রতিমাও সুতরাং তাকে দেখিয়াছিল। দোজবরে শুনিয়া অবধি অদেখা ভাবী বরটির প্রতি প্রতিমার মনে যতখানি বিতৃষ্ণা আসিয়াছিল, রমেশের সুন্দর চেহারা দেখিয়া তা কমিয়া যাওয়াই ছিল উচিত। তা কিন্তু গেল না। বিরুদ্ধভাবটা যেন বাড়িয়াই গিয়াছিল। এ পর্যন্ত মনের বিরূপভাবটা ছিল একটি কাল্পনিক ব্যক্তির উপর, অতএব সেটা তেমন জোরালো হইয়া উঠিতে পারে নাই। রমেশকে দেখিবার পর, সে অসাধারণ রূপবান পুরুষ বলিয়াই, আব একটি মেয়ে যে চাব-পাঁচবছর ধরিয়া তাকে ভোগ দখল করিয়াছিল, এ ব্যাপারটা প্রতিমাব মনে ভয়ানক অশ্লীল হইয়া উঠিল। এর কারণটা জটিল। রমেশের আব কোনো পরিচয় তো সে তখনও পায নাই, শুধু বাহিরটা দেখিয়াছিল। আগের স্ত্রীর সঙ্গে বাহিবের এই রূপ সংক্রান্ত সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক কল্পনা করা প্রতিমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভাবী বরের কথা ভাবিতে গেলেই লোকটা তার মনে উদিত হইত দেদীপ্যমান কামনার মতো ঈষৎ স্থূলাঙ্গী এক রমণীর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায়। বিতৃষ্ণায় প্রতিমার পবিত্র কুমারী দেহে কাঁটা দিয়া উঠিত।

স্বামীর সম্বন্ধে প্রতিমার এই অশুচিবোধ অনেকটা কাটিয়া গেল, স্বামীগৃহে মৃতা সতীনের একখানা বড়ো ফটো দেখিযা। না, সে রকম মূর্তি বউটার ছিল না যাকে দেখিলেই টের পাওযা যায় রূপবান স্বামীকে ক্লেদাক্ত বাহুতে দিবাবাত্রি বাঁধিয়া রাখা ছাড়া আর কিছু সে জানে না। গোলগাল হাসিহাসি মুখখানা, ভাসাভাসা চোখে সরল শান্ত দৃষ্টি, কোলে বছর দুয়েকের একটি ছেলে,—নড়িয়া যাওয়ায় ফটোতে মুখখানা ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। কাপড় পরিবার ভঙ্গি, দাঁড়ানোর ভঙ্গি সব মিলিয়া প্রমাণ কবিতেছে বউটি ছিল নেহাত গোবেচারি, ভালোমানুষ। রমেশের বউ বলিয়া যেন ভাবাই যায় না।

ফটোখানা প্রতিমা দেখিল দ্বিতীয়বার স্বামীগৃহে গিয়া প্রথম দিন দুপুরবেলা, রাত্রে রমেশের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই। বিবাহের পর প্রথম দফায় যে কদিন তাদের দেখাশোনা হইয়াছিল তার মধ্যে রমেশ একেবারেই স্ত্রীর কাছে ঘেঁষিবার চেষ্টা করে নাই তাই রক্ষা, সুন্দর স্বামীটির উপর যে নিবিড় ঘৃণার ভাব প্রতিমার মনে তখন ছিল, একটা সে কেলেঙ্কারি করিয়া বসিতে পারিত। এবার মানসীর ফটোখানা দেখিয়া মন একটু সুস্থ হওয়ায় রাত্রে রমেশ আলাপ করিবার চেষ্টা করিলে দু-চারটে প্রশ্নের জবাব দিতে প্রতিমা কার্পণ্য করিল না। রমেশের মৃদুকণ্ঠ, শান্তভাব ও উদাসীনের মতো কথা বলিবার ভঙ্গি ভালোই লাগিল প্রতিমার। কে জানে কী ভাবিতেছে লোকটা ?—একেবারে অন্যমনস্ক ! ভাবিতেও তাহা হইলে জানে ? রং-করা সং-এর মতো চেহারাটাই সর্বস্ব নয় ? গালে ওই দাগটা কীসের ? আহা, দাড়ি কামাইতে গিয়া গালটা এতখানি কাটিয়া ফেলিয়াছে !

রাত বাড়ে, প্রতিমার ঘুম পায়, শয়নের কথা রমেশ কিছুই বলে না। খাটের এক প্রান্তে সে এবং অপর প্রান্তে প্রতিমা পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকে তো বসিয়াই থাকে। কী রকম মানুষ ? প্রতিমা যে রকম ভাবিয়াছিল সে রকম তো নয় ! একটু যেন রহস্যের আবরণ আছে চারিদিকে। রমেশ এক সময় বলিল, আগে থেকে এ সব বলে নেওয়াই ভালো, কী বলো ? তুমি তাহলে আমাকে বুঝতে পারবে, আমিও তোমাকে বুঝতে পারব।

কী সব বলিয়া নেওয়া ভালো ? কিছুই বুঝিতে পারিল না। তবু ঘাড় কাত করিয়া সে সায় দিল। শোনাই যাক স্বামীর প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণটা কী রকম হয় !

রমেশ বলিল, কেন আবার বিয়ে করলাম বলি। সহজে করতাম না। পাঁচ বছর একজনের সঙ্গে ঘরকন্না করে আবার আরেক জনের সঙ্গে,—তুমি নিশ্চয় আমাকে অশ্রদ্ধা করছ। করছ না ?

প্রতিমা ভদ্রতা করিয়া বলিল, না। তা কেন করব ?

রমেশ বলিল, করছ বইকী। সব শুনলে কিন্তু তোমার মায়াই হবে। হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে ও যখন মরে গেল, শোকে আমি যেন কীরকম হয়ে গেলাম। বেঁচে থাকতে কখনও ভাবিনি এতখানি আঘাত পাব। সময়ে মনটা সুস্থ হবে ভেবেছিলাম, তাও হল না। কোনো কাজে মন বসে না, মানুষের সঙ্গ ভালো লাগে না, কর্তব্যগুলি না করলে নয় তাই করে যাই, কিন্তু কী যে কষ্ট হয় তা কী বলব। কতদিকে আমার কত রকম দায়িত্ব আছে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারবে, আর কারও ওপর যে ও সব ভার দেব সে উপায়ও আমার নেই, আমি না দেখলে চারিদিকে অনিষ্ট ঘটবে। অথচ আমার মনের অবস্থা এ রকম যে হাত-পা ছেড়ে ভেসে যেতে ইচ্ছে করে বেশি। আগে বাড়িতে সকলের ছিল হাসিখুশির ভাব, এখন আমি মনমরা হয়ে থাকি বলে কেউ আর প্রাণ খুলে হাসতে পারে না, বাড়িতে কেমন একটা নিরানন্দের ভাব ঘনিয়ে এসেছে। মেজাজটাও গিয়েছে বিগড়ে, কথায় কথায় ধমকে উঠি, সে জন্যও বাড়িসুদ্ধ লোক কেমন ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। ছেলেটা পর্যন্ত সহজে আমার কাছে ঘেঁষতে চায় না। প্রথমে অত খেয়াল করিনি, তারপর কিছুদিন আগে টের পেলাম আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে যে সুন্দর জীবনটা গড়ে তুলেছিলাম, আমার অবহেলায় তা ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছে। বড়ো অনুতাপ হল। আমার একার শোক আর দশজনের জীবনে ছায়া ফেলবে এ তো উচিত নয় ? এমন যদি হত যে সংসারে আমার কোনো কর্তব্য নেই, মনের অবস্থা আমার যেমন হোক কারও তাতে কিছু আসে যায় না, তাহলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু তা যখন নয়, শোক দুঃখ ভুলে আবার আমাকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে। তাই ভেবে চিন্তে আবার তোমাকে—

এমন করিয়া বুঝাইয়া বলিলে শিশুও বুঝিতে পারে। প্রতিমা বুঝিতে পারিল, বিবাহ উপলক্ষে রমেশ যে ফ্যাশন করিয়া চুল ছাঁটিয়াছে, গোঁপ-দাড়ি কামাইয়া মুখখানা চকচকে করিয়াছে ও সব কিছু নয়। হাতকাটা ছোটো শার্টটি পরায় ওকে যতই কলেজের ছেলের মতো দেখাক, আড়ালের মনটি সংসারি, হিসাবি, সতর্ক, উচ্ছ্বাস ভাবপ্রবণতা কল্পনা প্রভৃতির বদলে সুবিবেচনায় ঠাসা। প্রথমা স্ত্রীকে ভুলিবার জন্য নয়, ভোলা প্রয়োজন বলিয়া আবার সে বিবাহ করিয়াছে। পাঁচ বছর যার সঙ্গে ঘরকন্না করিয়াছিল তার জন্য শোক করিতে করিতে জীবনটা কাটাইয়া দিবারই প্রবল বাসনা, কিন্তু কী করিবে, আর দশজনের মুখ চাহিয়া শোকটা কমানো অপরিহার্য একটা কর্তব্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং এ তো জানা কথাই যে রমেশ বিশেষরূপে কর্তব্যপরায়ণ।

কিন্তু তাকে করিতে হইবে কী ? ভিজা ন্যাকড়ায় শ্লেটের লেখা মোছার মতো রসালো ভালোবাসায় স্বামীর মনের স্মৃতিরেখা মুছিয়া দিতে হইবে ? ঘুমের ঘোরটা প্রতিমার কাটিয়া যায়। রমেশের গম্ভীর বিষণ্ণ মুখখানা এক নজর দেখিয়া সে ভাবিতে থাকে যে, এ সব কথা তাকে বলিবার কী প্রয়োজন ছিল, এ কোন দেশি বোঝাপড়া ! তা'র যেটুকু রূপযৌবন আর মানুষ ভোলানোর ক্ষমতা আছে তার এককণা কী সে বাপের বাড়ি ফেলিয়া আসিয়াছে ? আস্ত মানুষটা সে আসিয়া হাজির,

যে দরকারেই লাগাও বাধা দিতে বসিবে না। কে জানে রমেশ ভাবিয়া রাখিয়াছে কিনা যে মেয়েদের একটা গোপন রিজার্ভ ফান্ড থাকে স্নেহ মমতা ও মাধুর্য-রচনা শক্তির, আগে হইতে বলিয়া রাখিলে ওখান হইতে প্রয়োজন মতো আমদানি করিয়া বিশেষ অবস্থায় বিশেষ একটি মানুষের শোকের তপস্যা মেয়েরা ভঙ্গ করিতে পারে।

এও প্রতিমা বুঝিতে পারে না যে দশজনের মুখ চাহিয়া প্রথমা স্ত্রীকে ভুলিবার জন্য দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছে বলিয়া অশ্রদ্ধার বদলে তার মায়া হওয়া উচিত কেন। আত্মীয়স্বজন, দায়িত্ব, কর্তব্য এইসব যাকে শোক ভুলাইতে পারে নাই, একটি স্ত্রী পাওয়া মাত্র সে আনন্দে ডগমগ হইয়া আবার বাঁচিয়া থাকার স্বাদ পাইতে আরম্ভ করিবে, এ তো শ্রদ্ধা জাগানোর মতো কথা নয় ! স্ত্রীর প্রয়োজনে দ্বিতীয়বার স্ত্রী গ্রহণ করার চেয়ে এ ঢের বেশি মানসিক দুর্বলতার পরিচয় !

আরও অনেক কথা রমেশ সে রাত্রে বলিয়া গেল , রাত তিনটার আগে তারা ঘুমাইল না। বাড়ির লোকে টের পাইয়া ভারী খুশি। এ পর্যন্ত নববধূর সঙ্গে সে ভালো করিয়া কথা পর্যন্ত বলে নাই জানিয়া সকলে চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বাড়িতে অনেক লোক, অনেক কাজ, অনেক বৈচিত্র্য। হৃদয়ে হৃদয়ে রকমারি স্নেহের ফাঁদ পাতা আছে। প্রতিমাকে আটক করিবার চেষ্টার কেহ কসুর করিল না। বউকে যে কোনো বাড়িতে এত খাতির করে প্রতিমার সে ধারণা ছিল না। সকলের কাছেই সে যেন অশেষরূপে মূল্যবান। কাজ তাহাকে করিতে দেওয়া হয় না, সংসারের গোলমাল হইতে তাহাকে তফাতে তফাতে রাখা হয়। রমেশের শৌখিন সেবাটুকু ছাড়া প্রতিমার কোনো কর্তব্য নাই। দিনরাত্রে সব সময় সে যাতে স্বামীসন্দর্শনের সুযোগ পায় বাড়ির ছেলেবুড়ো যেন তারই ষড়যন্ত্র করিয়া মরে। প্রতিমার বুঝিতে বাকি থাকে না সকলে কী চায়। এক বছর আগে মরিয়া যে বউ আজও এ গৃহের জড়বস্তুতে ও বিভিন্ন চেতনায় অক্ষয় অমর হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাড়াতাড়ি তাকে দূর করিয়া দিতে হইবে। সে যে বিপুল ফাঁকটা রাখিয়া গিয়াছে শীঘ্র ভরাট হইয়া ওঠা চাই। রান্না খাওয়া প্রভৃতি নিত্যকার তুচ্ছ সাংসারিক কাজে নিজেকে একবিন্দু ক্ষয় করিবার প্রয়োজন প্রতিমার নাই, যা কিছু তার আছে একমনে সব সে ব্যয় করুক মৃতা সতীনের শূন্য সিংহাসনে আত্মাভিষেকের আয়োজনে। হাসি গল্পে-গানে-বাজনায় উথলিয়া উঠিয়া রমেশকে সে ভাসাইয়া লইয়া যাক, তার ভাঙা বুক জোড়া লাগিয়া দেখা দিক আনন্দ, উৎসাহ, প্রণয়ের প্রাচুর্য। হাসি চাই, হাসি ! অম্লান, অপর্যাপ্ত হাসি !

হাসি প্রতিমার আসে না, মাধুর্য শুকাইয়া ওঠে। এমন ছিল নাকি তার সতীন, এই ক্ষুদ্র পারিবারিক সাম্রাজ্যে এত বড়ো প্রাতঃস্মরণীয়া সম্রাজ্ঞী ? রমেশ হইতে বাড়ির দাসীটির মন পর্যন্ত এমনভাবে সে জুড়িয়াছিল ? এমন অসহ্য বেদনা সে রাখিয়া গিয়াছে যে মুক্তিলাভের জন্য বাড়িসুদ্ধ লোক এতখানি পাগল ? সকলে যত ব্যাকুল হইয়া নীরবে তাহাকে প্রার্থনা জানায়, ভুলাও ভুলাও, সে মায়াবিনীকে ভুলাইয়া দেও, প্রতিমার তত মনে পড়ে সতীনকে। কী মন্ত্র না জানি জানিত সেই গোলগাল মুখওলা বউটি !

ননদ নন্দা বলে, কেন মুখভার করে আছ, বউদি ভাই ? বাপের বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে ? বলো তো আজকে তোমার যাবার ব্যবস্থা করে দিই, দুদিন থেকে মন ভালো করে এসো। তোমার শুকনো মুখ দেখলে আমাদের যে তাকে মনে পড়ে বউদি ? বাপের অসুখ শুনেও তাকে আমরা পাঠাইনি, দুদিন ধরে চোখের জল ফেলেছিল। তাই না আমাদের এমন শাস্তি দিয়ে চলে গেল !

এ আরেকটা দিক। প্রতিমা মুখভার করিলে তার কথা সকলের মনে পড়িয়া যায়, প্রতিমা হাসিলে সকলে অবাক হইয়া বলে, ওমা এ যে অবিকল সেই আবাগির হাসি গো ? নানা লোকে মৃতা

সতীনটির সঙ্গে প্রতিমার নানারকম সাদৃশ্য আবিষ্কার করে। পিছন হইতে দেখিলে প্রতিমার চলন যে তার মতো দেখায় এটা আবিষ্কার করে ছোটোবউ বিমলা। তার বালা আর তার চুড়ি যে আশ্চর্য রকম মানাইয়াছে প্রতিমার হাতে, এটা আবিষ্কার করে আরেক ননদ মন্দা। বিধবা একজন পিসি থাকেন বাড়িতে, তার আবিষ্কারগুলি আরও ব্যাপক ও গুরুতর। প্রখর দৃষ্টিতে তিনি প্রতিমার প্রত্যেকটি অঙ্গ নিরীক্ষণ করেন, বলেন, ও মন্দা, ও নন্দা দ্যাখ্‌সে। বউয়ের চিবুক দ্যাখ, গলা দ্যাখ, ছুঁচোলো কনুই দ্যাখ ! বাঁকাও দিকি বউ হাতখানা ?—দেখলি নন্দা, ও মন্দা দেখলি !

কোমরের বঙ্কিম ভঙ্গি, আলতা-পরা পায়ের গোড়ালি, ভ্রু আর কানের মাঝখানের অংশটা সব প্রতিমা সেই একজনের কাছে ধার করিয়াছে ! সমগ্রভাবে দেখিলে প্রতিমা অবশ্য অন্যরকম, সে ছিল দিব্যি মোটাসোটা রাজরানির মতো জমকালো, প্রতিমা ক্ষীণাঙ্গী। তবু পিসির মতো শ্যেনদৃষ্টিতে প্রতিমার দেহটা নানা অংশে ভাগ করিয়া একবার সকলে মিলাইয়া দ্যাখো তো সেই হতভাগির যে ছবি স্মৃতিপটে আঁকা আছে তার সঙ্গে ! রমেশ যে এত মেয়ের মধ্যে প্রতিমাকেই পছন্দ করিয়াছে, সে কী এমনি ? এই মিলের জন্য।

একদিন প্রতিমার হাত হইতে পান লইবার সময় রমেশ বলিল, জানো নতুন বউ, তোমার আঙুলগুলি ঠিক তার মতো।

আঙুলগুলি পর্যন্ত তার মতো ? রাগে প্রতিমার মন জ্বালা করিয়া উঠিল। রমেশের স্মৃতিময় আবেগকে রূঢ় আঘাত করিবার জন্য না-বোঝার ভান করিয়া বলিল, কার মতো গো ? আর কেউ আছে নাকি তোমার, ভালোবাসার কেউ ?

রমেশ চমক ভাঙিয়া বলিল, কী বলছ ? ছি ! তোমার দিদির কথা বলছি।

আমার দিদিকে তুমি আবার দেখলে কোথায় ? বিয়ের সময় সে তো আসেনি !

সে নয়।—মানসী। তোমার নখগুলি যেমন ডগার দিকে ঢেউ তোলানো, মানসীরও এমনি ছিল।

এবার প্রতিমা মুখের কৌতুকোচ্ছলতার ছাপ মুছিয়া ফেলিল, বলিল, তোমার আগেকার বউ ? তাঁর নাম বুঝি মানসী ছিল ?

রমেশ যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল।

তুমি জানতে না ? অ্যাদ্দিন এসেছ এখানে, তার নামটাও শুনে রাখোনি ?

প্রতিমা ম্লানমুখে বলিল, কে বলবে বলো ? দিদির কথা কেউ আমাকে কিছু বলে না।

রমেশ সাগ্রহে বলিল, শুনবে নতুন বউ ? শুনবে তার কথা ?

শুনব, বলো।

মানসীর কথা বলিতে বলিতে রমেশের গলা ধরিয়া আসে। প্রতিমার অপরিমিত ঈর্ষা হয়। মনে হয়, এ বাড়ির সকলে তার সঙ্গে এক আশ্চর্য পরিহাস জুড়িয়াছে। মানসীকে ভুলিবার ছলে তাকে আনিয়া মানসীকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে তার মধ্যে। তার মৌলিকতা অচল এ বাড়িতে, সে মানসীরই নূতন রূপ,—অচিন্ত্য অব্যক্ত দেবতার প্রতিকৃতির মতো সেও সকলের নিরাকার ব্যাপক শোকের জীবন্ত প্রতিমা ! মানসীর সঙ্গে সে সব দিক দিয়াই পৃথক, তবু মিলের তাই অন্ত নাই। ব্যথার পূজা নিবেদন করার জন্য সকলে তাকে মানসীর প্রতিনিধির মতো খাড়া করিয়া দিয়াছে !

একদিন প্রতিমা স্বামীকে বলিল, খোকা কোথায় আছে ?

রমেশ বলিল, বড়োপিসির ওখানে।

আনবে না তাকে ?

তুমি বললেই আনব !

প্রতিমা অবাক হইয়া বলিল, আমার বলার জন্যই কি অপেক্ষা করছিলে ? তোমাদের ব্যবহারে আমি সত্যি থ বনে যাচ্ছি। কাউকে একদিন খোকার কথা বলতে পর্যন্ত শুনলাম না এসে থেকে। কেন তা বুঝিনে কিছু।

রমেশ বলিল, আমি বারণ করে দিয়েছিলাম নতুন বউ। এখানে তোমার মন-টন বসলে তারপর—

খোকার দিকে মন দেবার সময় পাব ? কী চমৎকার বোঝ তোমরা মানুষের মন !

দুদিন পরেই খোকা আসিল। বেশ মোটাসোটা লম্বাচওড়া ছেলে, কোলে করা কষ্টকর। তবু সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে দেখিয়া কোনোরকমে প্রতিমা তাকে একবার কোলে করিল। বড়ো লজ্জা করিতে লাগিল প্রতিমার। প্রসব না করিয়াই সে এত বড়ো ছেলের মা ? খোকাও নতুন লোকের কোলে উঠিয়া কাঠ হইয়া রহিল। পরের বাড়ির ছেলের সঙ্গে ভাব করার মতো করিয়া ছেলেকে যদি প্রতিমা আপন করিবার সুযোগ পাইত, মাতাপুত্রের প্রথম মিলনটা হয়তো এমন নীরস হইত না। কিন্তু সে যে মা এবং নতুন বউ, হাসি আর ছেলেমানুষি কথা দিয়া শুরু করিয়া দূর হইতে ধীরে ধীরে কাছে আগাইবার উপায় তো তার নাই, ছেলে কাছে আসিলে প্রথমেই বুকে জাপটাইয়া ধরিয়া আধঘোমটার ফাঁকে তাকে চুমু খাওয়া চাই।

ছেলে তো আসিল, একটু মায়াও ওর দিকে প্রতিমার পড়িল, কিন্তু মৃতা সতীনের ছেলেও কম বিপজ্জনক পদার্থ নয়। একটা কঠিন সমস্যার মতো। আদর যত্ন ভালোবাসা সব সতর্কভাবে হিসাব করিয়া দিতে হয়, কম হইলে লোকে ভাবিবে, সতীনের ছেলে বলিয়া অবহেলা করিতেছে ; বেশি হইলে ভাবিবে, সব লোক-দেখানো। আঠারো বছর বয়সের ভাবপ্রবণ মনে এ ধরনের সতর্কতা বজায় রাখিয়া চলা কঠিন। হিসাবও সব সময় ঠিক হয় না : প্রাত্যহিক জীবনে পদে পদে এমনি অভিনয় করিয়া চলিবার মতো প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সে পাইবে কোথায়। ছেলেকে ভাত খাওয়াইতে বসিয়া প্রতিমা যদি একটু সময়ের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া যায়, চমক ভাঙিয়া সভয়ে সে চারিদিক লক্ষ করে, কেহ তাকে বিমনা দেখিয়াছে কিনা। খোকার অসংখ্য শিশুসুলভ অন্যায় আবদার প্রতিমার অসংখ্য বিপদ। কী করিবে প্রতিমা ভাবিয়া পায় না। আবদার রাখিলে খোকার ক্ষতি, তাতে নিন্দা হয়। না রাখিলে খোকা কাঁদে, তাতেও নিন্দা হয়, ভরা পেটে খোকার হাতে সন্দেশ দিয়া প্রতিমা শুনিতে পায়, শাশুড়ি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছেন, ওর সে বিবেচনা কোত্থেকে হবে নন্দা যে বলছিস ? নাড়ির টান তো নেই।

পরদিন ভরা পেটে আবার সন্দেশের জন্য খোকা কাঁদে। প্রতিমা তাকে কাঁদায়, সন্দেশ দেয় না। মুখভার করিয়া পিসিমা আসিয়া খোকাকে কোলে নেন, ভাঁড়ার খুলিয়া খোকাকে সন্দেশ দেন, তারপর করেন স্থানত্যাগ। প্রতিমার মুখ লাল হইয়া যায়।

খোকাকে উপলক্ষ করিয়া প্রতিমা ধীরে ধীরে টের পাইতে থাকে, অতিরিক্ত স্নেহ যত্নের তলে তলে তার প্রতি একটা বিদ্বেষের ভাবও সকলের আছে। এ বাড়ির মনগুলি যতক্ষণ তাকে টনিকের মতো ব্যবহার করিতে পারে ততক্ষণ কৃতজ্ঞ ও স্নেহশীল হইয়া থাকে কিন্তু যখনই প্রতিমার একটি বিশিষ্ট অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ সচেতন হইয়া ওঠে যাহা এ বাড়িতে কারও কোনো কাজে লাগিবার নয়, প্রতিমাকে তখন সে আঘাত করে। তখন সে প্রতিমার সমালোচক।

দিন কাটে কিন্তু এর ব্যতিক্রম হয় না। প্রতিমার ঘোমটা কমিতে থাকে, চলাফেরায় স্বাধীনতা বাড়ে, সুখ-সুবিধার অতিরিক্ত কতগুলি ব্যবস্থা হয়, মানসীর সঙ্গে প্রতিমার মিল খুঁজিবার উৎসাহে সকলের ভাটা পড়ে, তবু না হয় প্রতিমার ব্যবহার কৃত্রিমতাহীন, না দেয় কেহ তাহাকে বাঁচিবার জন্য একটি সহজ স্বাভাবিক জগৎ। আর একজনকে তার আসনে পাঁচ বছর বধূজীবনের বিচিত্র তপস্যায় ব্যাপৃত ছিল প্রতিমার জীবনকে এই সত্য অপ্রতিহতভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। একবার এক মাসের জন্য

বাপের বাড়ি ঘুরিয়া আসিল। খোকাকে সঙ্গে না আনা উচিত হইয়াছে কিনা ভাবিয়াই মাসটা কাটিল প্রতিমার। বাপেব বাড়িতেও মন খুলিয়া সকলের সঙ্গে সে মিশিতে পারিল না। একটা অদ্ভুত জ্বালাভরা আনন্দ উপভোগের জন্য সত্যমিথ্যা জড়াইয়া প্রাণপণে শ্বশুরবাড়ির নিন্দা করিল এবং সে জন্য বিষণ্ণ ও উন্মনা হইয়া রহিল। কে কী ভাবিবে তাই ভাবিয়া ভাবিয়া কাজ করার অভ্যাসটা প্রায় স্থায়ী হইয়া গিয়াছিল, বাপের বাড়িতেও নিজের তাহার চলাফেরা অনেকটা পরের ভাবনাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল, বিবাহের পর যেমন হয় প্রতিমা তেমনই হইয়াছে,—পর হইয়া গিয়াছে। প্রতিমা আর সে প্রতিমা নাই !

তবু, সব প্রতিমার সহ্য হইত রমেশকে যদি সে ভালোবাসিতে পারিত। ঘৃণার ভাব কোন কালে মুছিয়া গিয়াছিল, শ্রদ্ধা আসিতেও দেবি হয় নাই। রূপে গুণে মানুষটা অসাধারণ, সরল সহজ ব্যবহার, গাম্ভীর্যের অন্তরালে অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, রাগি কিন্তু সুবিবেচক। এ ধবনের পুরুষের সাহচর্য মেয়েদের কাছে সবচেয়ে প্রীতিকর, এদেরই তারা স্বেচ্ছাদাসী। স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যপালনে রমেশ খুব যে বেশি ত্রুটি করে তা নয়, তবু স্বর্গীয়া সতীনের বিরুদ্ধে প্রতিমার অকথ্য ঈর্ষা দাম্পত্য জীবনের সহজলভ্য সুখের পথেও কাঁটা দেয়। মানসীকে একেবারে ভুলিয়া যাওয়া রমেশের পক্ষে এখনও সম্ভব নয়, আজও সে অন্য মনে তার কথা ভাবে, কণ্ঠলগ্না প্রতিমাকে অতিক্রম করিয়া আজও সে তারই কণ্ঠবেষ্টন করিতে যায়, যে কোথাও নাই। এক-একদিন রমেশের চুম্বন পর্যন্ত অসমাপ্ত থাকিয়া যায়, প্রতিমা স্পষ্ট অনুভব করে দড়ি ছিঁড়িবার মতো স্বামীর বাহুবন্ধন হঠাৎ শিথিল হইয়া গেল, নিভিয়া গেল চুম্বনের আবেগ। তা যাক, তাও হয়তো প্রতিমা গ্রাহ্য করিত না। হয়তো এই জন্যই সে স্বামীর মন জয় করিবার তপস্যা তীব্রতম করিয়া তুলিল, একটা মৃতা রমণীর কাছে হার মানিবার অপমান এ বয়সে সহ্য হয় না। কিন্তু জয় করিতেই অনেক বাধা, অনেক লজ্জাকব বেদনাদায়ক অন্তবায়। রমেশকে যখন সে মুগ্ধ করে, অতীতের দিক হইতে তার দৃষ্টি যখন সে ফিরাইয়া আনে নিজের দিকে, রমেশের প্রীতিপূর্ণ ভাষা ও মোহস্নিগ্ধ চাহনি আনন্দের বদলে তাকে যেন অকথ্য লজ্জা দেয়। সে যেন অনুভব করে এ ভাষা উচ্চারিত, এ চাহনি পুরাতন। যে কথা মানসীকে বলিত, যে চোখে মানসীকে দেখিত আজ সেই কথা সেই দৃষ্টিই রমেশ তাকে নিবেদন করিতেছে। এ সব পুরানো অভিনয়, অভ্যস্ত প্রণয়। রমেশের জীবনে স্তব্ধ নিশুতি রাত্রে এ সব বহুবার ঘটিয়া গিয়াছে। পুনবাবৃত্তি আর প্রতিধ্বনি। আর কিছু নয়।

আর জয় করিবার সাধ থাকে না, রমেশকে ক্ষুব্ধ করিযা প্রতিমা সরিয়া যায়। ভিতরে কে যেন শরমে মাথা হেঁট করিয়াছে। ক্ষোভে প্রতিমার চোখে জল আসে, ছবিতে দেখা একটি নারীর প্রতিহিংসার অন্ত থাকে না। কত সাধ ছিল প্রতিমার, কত কল্পনা ছিল, সব পর্যবসিত হইয়াছে এক বিপন্ন বিস্বাদ আত্মনিয়োগে—কর্তব্যেও নয়, খেলাতেও নয়, জীবনযাপনের অপরিচ্ছন্ন প্রয়োজনে।

এ রকম সময়ে স্বামীর প্রতি প্রতিমার সেই গোড়ার দিকের ঘৃণার ভাবটা পর্যন্ত কিছুক্ষণের জন্য ফিরিয়া আসে। এত যদি অবিস্মরণীয় প্রেম তার মানসীর জন্য, এ কী অপদার্থ সে যে প্রতিমাকে সাময়িকভাবেও তার ভালো লাগিল ? একজনের স্মৃতিপূজায় আত্মহারা অবস্থাতেও আর একজন যাকে মুগ্ধ করিতে পারে, শ্রদ্ধা কবিবার মতো কী আছে তার মধ্যে ?

রমেশ জিজ্ঞাসা করে, এখানে তোমার মন টিকছে না কেন প্রতিমা ?

প্রতিমা পালটা প্রশ্ন করে, আমার মনের খবর তোমাকে কে দিল ?

অন্য লোকের দিতে হবে কেন, আমি নিজে টের পাই না ? মন খুলে যেন মিশতে পারছ না, কেমন ফুর্তি নেই। কেউ কিছু বলে না তো তোমাকে ? আদরযত্ন করে তো সকলে ?

প্রতিমা হাসে, মাগো, তা আর করে না ! আদরযত্নর চোটে হাঁপিয়ে উঠলাম : আমায় নিয়েই তো মেতে আছে সবাই।

রমেশ বলে, তুমি সবাইকে নিয়ে ও রকম মাততে পারলে বেশ হত ! আমি তাই চেয়েছিলাম।

প্রতিমার ইচ্ছা হয় একবার জিজ্ঞাসা করে, আমার মন বসছে না বলছ, আমাকে কেন মনে ধরছে না তোমার ? শুধু ভদ্রতা না করে ভালোবাসা দিয়ে দ্যাখো না মন বসে কিনা আমার !

সমস্ত বাড়িতে মানসীর স্মৃতিচিহ্ন ছড়ানো, সেগুলি প্রতিমাকে পীড়ন করে। খান তিনেক বাঁধানো ফটোই আছে মানসীর। একখানা তার শয়নঘরে, একখানা রমেশ যে ঘরে কাজ করে সেখানে, আর একখানা শাশুড়ির ঘরে। ফটোর মানসীকে দেখিয়া যদিও মনে হয় না শখ ও শৌখিনতার তার কোনো বিশেষত্ব ছিল, হাতের যে রাশি রাশি শিল্পকর্ম রাখিয়া গিয়াছে সেগুলি অবাক করিয়া দেয়। পাঁচ বছরে নানা কাজের ফাঁকে এত বাজে কাজের সময় সে পাইত কখন ? বাড়ির অর্ধেকের বেশি আসবাবও নাকি তারই পছন্দ করিয়া কেনা। গান জানিত না, তবু শখ করিয়া সে অর্গান কিনাইয়াছিল, তাই বাজাইয়া আজ প্রতিমাকে গান গাহিতে হয়। মানসীর ড্রেসিং টেবিলে তার প্রসাধন, মানসীর কয়েকটি বাছা বাছা গহনা তার আভরণ, মানসীর ব্যবহৃত খাটে তার শয়ন। মানসীর জামাকাপড়ে বোঝাই বাক্‌সো-প্যাটরায় বাড়ি বোঝাই। আরও কত অসংখ্য খুঁটিনাটি সে যে রাখিয়া গিয়াছে !

বধূত্বের নতুনত্ব কমিয়া আসিলে মানসীর গয়না কখানা প্রতিমা খুলিয়া রাখিল। সকলে তা লক্ষ করিল, শাশুড়ি খুঁতখুঁত করিলেন তবে বিশেষ কেহ কিছু বলিল না। কিন্তু কয়েকটি গহনা খুলিয়া রাখিলে কী হইবে ! ব্যবহার্য, অব্যবহার্য পদার্থ যত কিছু মানসী রাখিয়া গিয়াছে চারিদিকে, প্রকট হইয়া থাকা নিবারণ করিবে কে ? মনের স্মৃতি, বাহিরের স্মৃতিচিহ্ন এ বাড়িতে সে মৃতা রমণীকে অমরত্ব দিয়াছে।

নন্দা বলে, জানো বউদি, ওই যে আলমারিটা সাফ করে বাজে জিনিস রাখছ, ওটা ছিল তার শখের সামগ্রী। ওপরের তাকে ঠাকুর-দেবতার মূর্তি সাজিয়ে রাখত, রোজ সকালে উঠে প্রণাম করত।

ঠাকুর-দেবতারা গেল কোথায় ভাই ?

কে জানে দাদা কোথায় রেখেছে। মূর্তিগুলোর ওপরে দাদা বড্ড রেগে গিয়েছিল সে স্বর্গে যাবার পর।

প্রতিমা বলে, সেই থেকে তোমার দাদার স্বভাবটা রাগী হয়ে গেছে, তাই না ভাই ?

নন্দা বলে, কেন, দাদা রাগারাগি করেছে নাকি তোমার সঙ্গে ?

প্রতিমা হাসিয়া তার গাল টিপিয়া দেয়, বলে বিয়ে হলে বুঝবে বরের রাগারাগিও কত মিষ্টি—শুধু মিষ্টি ব্যবহারের চেয়ে। একদিনও যদি রাগারাগি না হয় তবে বুঝবে বরের মনে কিছু গোলমাল আছে।

মৃতার জন্য স্বামীর মনের গোলমাল চিরস্থায়ী হইবে এ কথা প্রতিমা যে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিয়াছিল সেটা আশ্চর্য নয়। স্বামী ভিন্ন যে কুলবধূর জীবনে দ্বিতীয় পুরুষের পদার্পণ ঘটে না, তার সরলতা অনিন্দ্য, সে বিশ্বাসী। বিবাহের পরেই স্বামীর ভালোবাসার শুরুকে সে অনায়াসে ভালোবাসার চরম অভিব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতে থাকে। প্রেমের পরবর্তী অগ্রগতি তার জীবনের অফুরন্ত বিস্ময়। মানসীর স্মৃতিতে রমেশকে মশগুল দেখিয়া কোন জ্ঞান আর অভিজ্ঞতায় প্রতিমা ভাবিতে পারিত মৃত্যু মৃত্যুই, স্মৃতি কর্পূরধর্মী, জীবনে জীবিত ও জীবিতাদের আকর্ষণই সবচেয়ে জোরালো, যাকে মনে করিলে কষ্ট হয়, চিরকাল কেহ তাহাকে মনে করে না ? ঈর্ষায় প্রতিমা যে মনের দল মেলিয়া ধরিল না তাতে রমেশের কাছে তার একটি রহস্যময় আবরণ রহিয়া গেল, তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছোটোবড়ো প্রকাশ রমেশকে তার সম্বন্ধে যত সচেতন করিয়া তুলিতে লাগিল, এই রহস্যের অনুভূতি তার মনের গোলমালের তত বেশি জোরালো প্রতিষেধক হইয়া উঠিতে লাগিল।

বছর ঘুরিয়া আসিতে আসিতে জন্মিয়া গেল কত অভ্যাস, সৃষ্টি হইল কত অভিনব রসাস্বাদ। মানসীর শূন্যস্থান পূর্ণ করাব জন্য আসিয়া থাক, প্রতিমা তো একটি নিজস্ব জগৎ সঙ্গে আনিয়াছে। মানসীর ফাঁকটাতে খাপে খাপে তাকে বসানো অসম্ভব ! কোথাও প্রতিমা আঁটে না, কোথাও সে ছোটো হয়। মানসীব সঙ্গে তার যত বিবোধ, যত পার্থক্য সব দিনে দিনে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। প্রতিমার দোষগুণ যে বিরক্তি ও ভালো-লাগা সৃষ্টি করে তাব অভিনবত্ব বিচলিত করিয়া করিয়া সকলকে শেষে আর বিচলিত করে না, প্রতিমার দোষগুণকে প্রতিমার দোষগুণের মতো করিযাই সকলের মানিতে হয়। তাছাড়া মানসীর মতো করিয়া পাইতে চাহিলে প্রতিমাকে কেহ পায় না, মানুষকে পাইতে চাহিয়া না পাইলে ভালো লাগিবার কথা নয়। অথচ প্রতিমার স্বকীয় আকর্ষণকে স্বীকার করিয়া কাছে গেলে বড়ো সুন্দব একটি হৃদয়ের পরিচয় মেলে।

যেভাবে মানসীর সঙ্গে সকলের অচ্ছেদ্য বন্ধনগুলি সৃষ্টি হইয়াছিল, সেইভাবেই প্রতিমাও সকলকে বাঁধিতে ও বাঁধা পড়িতে থাকে। খোকা 'মা' বলিয়া ডাকিলে প্রতিমার আর একটা বিশ্রী অস্বস্তিকব অনুভূতি জাগে না, মোটামুটি ভালোই লাগে, যদিও ছেলেটার জন্য তার যে মায়া তাকে বাৎসল্য বলা যায় না। শাশুড়ি ননদ জা এদের সঙ্গে বাড়ির বউয়েব যে সম্পর্ক আধখানা মন দিয়াই সুষ্ঠুভাবে তা বজায় রাখিতে পারা যায, প্রতিমা সেটা দিতে পারে।

সবই যেন একরকম সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া আসে, শুধু রমেশকে প্রতিমা নিজের জীবনে মানাইয়া লইতে পারে না। প্রথম যেদিন সে বুঝিতে পারে, শীতের কুয়াশা কাটিবার মতো রমেশের মন হইতে মানসীর শোক কাটিয়া যাইতেছে, তার ঈর্ষাতুর মনে সেদিন আনন্দের পরিবর্তে গভীব বিষাদ ঘনাইয়া আসে। কেমন সে লজ্জা পায়। মনে হয়, নিজের তারুণ্য দিয়া এতকাল একটা অপবিত্র ব্রত পালন করিতেছিল, উদ্‌যাপনের দিন আসিয়াছে।

তা তো সে করে নাই ? কতদিন মানসীর ফটোর সামনে দাঁড়াইয়া হিংসায় জ্বলিতে জ্বলিতে তার সাধ গিয়াছে ফটোখানা জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, যেখানে যা কিছু স্মৃতিচিহ্ন আছে সে মায়াবিনীর, ভাঙিয়া সব গুঁড়া করিয়া দেয়, কিন্তু যাচিয়া বমেশের মন হইতে তাকে সরাইযা দিবার চেষ্টা সে আর কতটুকু করিযাছে ?

দেবীপক্ষে প্রতিমার বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহের বাত্রি একদিন ঘুরিয়া আসিল। গোপনে বমেশ সেদিন ফুল আর সোনার উপহার কিনিয়া আনিল। গম্ভীর চাপা লোকটিব মধ্যে একটা সুগভীর উত্তেজনা, আজিকার বিশিষ্ট রাত্রিটিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিবার উৎসুক প্রত্যাশা সবই প্রতিমাব কাছে ধরা পডিয়া গেল। খুশি হইতে পারিল না। বোধ করিল মৃদু একটা বিস্ময়, একটা গ্লানিকর অস্বস্তি।

কী ভাবিয়া রমেশের আনা ফুলের মালা একটি প্রতিমা মানসীর ফটো বেষ্টন করিয়া টাঙাইয়া দিল। দীর্ঘকালের তীব্র উত্তপ্ত ঈর্ষায় প্রতিমার মন জুড়িয়া ওব স্থায়ী স্থানলাভ ঘটিয়াছে। ওর কথা ভাবিতে ভাবিতে এমন হইয়াছে প্রতিমার যে, নিজের বিবাহ রাত্রেও ওকে ভুলিবার তার উপায় নাই। এমনই আশ্চর্য যোগাযোগ যে প্রতিমাকে চুম্বন করিয়া মুখ তুলিতেই মানসীর ফটোর দিকে রমেশের চোখ পড়িল। সে বলিল, ওর ফটোতেও মালা দিয়েছ ? তুমি তো বড়ো ভালো প্রতিমা ?

প্রতিমা অনুভব করিল, তীক্ষ্ণধার ছুরির ফলায় দড়ি কাটিবার মতো মানসীর স্মৃতি ক-মাস আগেও রমেশের যে বাহুবন্ধন শিথিল করিয়া দিত, জীবন্ত সাপের মতো সেই বাহু দুটি আরও জোরে আজ তাকে জড়াইয়া ধরিতেছে। রমেশের যে চুম্বন ছিল, শুধু ওষ্ঠের স্পর্শ, আজ তা প্রেমের আবেগে অনির্বচনীয়।

সহসা প্রতিমা কাতর হইয়া বলিল, ছাড়ো ছাড়ো, শিগগির ছাড়ো আমায় !

কী হল ?—রমেশ ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল।

দম আটকে গেল আমাব। ছাড়ো।

স্বামীকে ঠেলিযা দিয়া প্রতিমা খাট হইতে নামিযা গেল। ঘরে পর্যন্ত থাকিল না। বিদ্যুতের আলো মানসীর ফটোর কাচে প্রতিফলিত হইয়া চোখে লাগিতেছিল, প্রতিমার মনে হইয়াছিল সে যেন মানসীর তীব্রোজ্জ্বল ভর্ৎসনার দৃষ্টি।

প্রতিমা ছাদে পালাইয়া গেল। ছাদ ছাড়া বউদেব আর তো যাওযার স্থান নাই। অপরিবর্তনীয আকাশ ছাদের উপরে, তাবার আলো মেশানো অপরিবর্তনীয় রাত্রির অন্ধকার চারিদিকে। দুঃখে প্রতিমার কান্না আসিতে লাগিল। ভুলিয়া গিয়াছে ? এমন মন তাব স্বামীর যে এর মধ্যে মানসীকে ভুলিয়া গিয়াছে, তার মনোরাজ্যেব সেই সর্বময়ী সম্রাজ্ঞীকে ?

তেজি বউ

সুমতির একটা মস্ত দোষ ছিল—তেজ। দেখিতে শুনিতে ভালোই মেয়েটা, কাজেকর্মেও কম পটু নয়, দবকার হইলে মুখ বুজিয়া উদয়াস্ত খাটিয়া যাইতে পারে, স্নেহ মমতা করার ক্ষমতাটাও সাধারণ বাঙালি মেয়ের চেয়ে তার কোনো অংশে কম নয়,—খারাপ কেবল তার অস্বাভাবিক তেজটা। কারও এতটুকু অন্যায় সে সহিতে পারে না, তুচ্ছ অপরাধ মার্জনা করে অপরাধীকে অপবাধের তুলনায় তিন গুণ শাস্তি দিয়া, কারও কাছে মাথা নিচু করিতে তার মাথা কাটা যায়। হুকুম দিবাব অধিকাব যার আছে তার কথা সবই সে শোনে—যতক্ষণ কথাগুলি হুকুম না হয়। যত জোর হুকুম, তত বড়ো অবাধ্য সুমতি।

সবচেয়ে বিপদের কথা, কোনো বিষয়ে কারও বাড়াবাড়ি সুমতি সহ্য করিতে পারে না—গায়ে পড়িয়া তেজ দেখায়। বাঙালি ঘবেব বউ, তাব গায়ে পড়িয়া তেজ দেখানোব মানেই গুরুজনকে অপমান করা, সমবয়সিদের সঙ্গে ঝগড়া করা আর ছোটোদের মারিয়া গাল দিয়া ভূত ছাড়াইযা দেওযা।

দুঃখের বিষয়, সংসারে বাড়াবাড়ি করার বাড়াবাড়িটাই স্বাভাবিক। এমন মানুষ কে আছে যে জীবনে অনেক বিষয়ে বঞ্চিত হয না ? অনেক বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াটা কয়েকটা বিষযেব বাড়াবাড়ি দিয়া পরিপূরণ করার চেষ্টা না কবাটা রীতিমতো সাধনা-সাপেক্ষ। সংসারেব লোক সাধনার ধার ধারে বা ইচ্ছা করিলেই ধারিতে পারে এ রকম একটা ধারণা সাধু মহাত্মারা পোষণ কবেন বটে, কিন্তু কথাটা সত্য নয়।

সুমতির তাই পদে পদে বিপদ। বিবাহের আগে গুরুজনদেব মান না রাখিযা, সমবয়সিদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আর ছোটোদের বকিয়া মারিয়া ক্রমাগত হাঙ্গামার সৃষ্টি করা যদি বা চলে, বিবাহের পর শ্বশুরবাড়িতে এ সব চলিবে কেন ? প্রথম বছর দুই সুমতি প্রাণপণে তেজটা দমন করিয়া রাখিয়াছিল—দু-একবার সকলকে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ করার বেশি ভয়ানক কিছু করে নাই। অবস্থা বিপাকের কৃত্রিম সংযম আর প্রকৃতিগত স্বাভাবিক তেজেব লড়াইয়ে সংযমটা ক্ষয় পাইতে পাইতে নিঃশেষ হইযা আসায় এখন সে পড়িয়াছে মুশকিলে। শাশুড়িকে একদিন বেলুনি নিয়া মারিতে উঠিইয়া ছাড়িয়াছে,—প্রথমবার বলিয়া শাশুড়ি মারিতে উঠিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, একেবারে মারিয়া বসেন নাই। কিন্তু কতকাল না মারিয়া থাকিতে পারিবেন ? একে মেয়েমানুষ, তায শাশুড়ি—ধৈর্যেব সীমা তার স্বভাবতই সংকীর্ণ।

এতখানি তেজ সুমতি কোথা হইতে পাইল বলা কঠিন। তার বাবা সদানন্দ অতি নিরীহ গোবেচারি মানুষ,—কখন মানুষকে চটাইয়া বসেন এই ভয়েই সর্বদা শশব্যস্ত। মা চিররুগ্‌ণ—রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া মেজাজটা তার বিগড়াইয়া গিয়াছে বটে, বলা নাই কওয়া নাই হঠাৎ রাগিয়া কাঁদিয়া মাথা-কপাল কুটিয়া যখন তখন অনর্থ বাধান বটে, কিন্তু সেটা তেজের লক্ষণ নয়। মানুষটা আসলে ভয়ানক ভীরু। বড়ো ভাই দুজনে কুড়ি-বাইশবছর বয়স হইতে কেরানি,—তাদের তেজ থাকার প্রশ্নই ওঠে না। বোনেরা সব অতিরিক্ত লজ্জাশরম আর ভাবপ্রবণতায় ঠাসা,—চারজনেই অমানুষিক সহিষ্ণুতার বর্মে গা ঢাকা দিয়া স্বামীপুত্রের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে।

এদের মধ্যে সুমতির আবির্ভাব প্রকৃতির কোন নিয়মে ঘটিল বলা যায় না,—কোন নিয়মের ব্যতিক্রমে ঘটিল তাও বলা যায় না। আগাগোড়া সবটাই দুর্বোধ্য রহস্যে ঢাকা। লজ্জাশরম ও ভাবপ্রবণতা কিছু কম হওয়া আশ্চর্য নয়, প্রকৃতিতে কিছু অসহিষ্ণুতার আমদানিও বোধগম্য

ব্যাপাব, কিন্তু স্বামীপুত্রেব জন্য জীবন উৎসর্গ করার মধ্যে এতখানি তেজ বজায় রাখা যেমন খাপছাড়া তেমনই অবিশ্বাস্য।

পুত্র সুমতির মোটে একটি, এখনও দু-বছর পূর্ণ হয় নাই। আর একটি যে কয়েক মাসের মধ্যে আসিয়া পড়িবে, আসিয়া পড়িবাব আগে সে পুত্র অথবা কন্যা তা নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে সুমতি আশা করে এটিও পুত্রই হইবে, দুটি পুত্রের পর একটি কন্যা হইলে মা হওয়াব আনন্দে একদিন সে কী পবিমাণ গর্বই না মিশাইতে পাবিবে !

এ সব ভবিষ্যতের কথা, আপাতত প্রথমটির মতো দ্বিতীয়টিকেও বাপের বাড়িতে গিয়া ভূমিষ্ঠ করার সাধটা সুমতির অত্যন্ত প্রবল হইয়া ওঠায় একটা ভাবী গোলমালের সৃষ্টি হইল।

শাশুড়ি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, বাপের বাড়ি যেতে হবে না। এই না সেদিন এলে বাপের বাড়ি থেকে ?

সুমতি যুক্তি দিয়া বলিল, সে তো গিয়েছিলাম ছোড়দাব বিয়েতে—তাও তো সাতটা দিনও থাকতে পেলাম না।

মেজাজটা শাশুড়ির ভালো ছিল না। সকালে খোকাকে দুধ খাওয়ানোব সময় খোকা ভয়ানক চিৎকার জুড়িয়া দেওয়ায় শাশুড়ি বিশেষ কোনো অসন্তোষ বা বিবক্তি বোধ না কবিয়াও নিছক শাশুড়িত্ব খাটানোর জন্যই একবার বলিয়াছিলেন, না কাঁদিয়ে দুধটুকু পর্যন্ত খাওযাতে পার না বাছা !

আগে হইলে সুমতি চুপ কবিয়া থাকিত, আজকাল সংযম ক্ষয হইয়া আসায মুখ তুলিয়া বলিয়া বসিয়াছিল, দুধ খাওযাবার সময ছেলেপিলে একটু কাঁদে

কাঁদে না তোমার মাথা— বড়ো তো মুখ হয়েছে তোমাব বউমা আজকাল ?

মুখ হওয়া হওয়ি কী, যা বলেছি মিথ্যে তো বলিনি।

আমি মিথ্যে বলেছি ? আমি মিথ্যে বলি ? তুমি আমায় মিথ্যেবাদী বললে !

বাগে শাশুড়িব কণ্ঠ ক্ষণকালেব জন্য রুদ্ধ হইযা গিয়াছিল, আবও জোবালো আওয়াজ বাহিব হইবাব জন্য। কিন্তু সুমতিব অপূর্বদৃষ্ট মুখভঙ্গি, তীব্রদৃষ্টি আর চালচলন দেখিয়া আওয়াজটা আর বাহির হইতে পাবে নাই। ছেলেকে দুধ খাওয়ানো বন্ধ করিয়া সুমতি ধীব স্থিব শান্তভাবে উঠিযা দাঁড়াইযাছিল, ছেলেকে শান্ত কবিযা শাশুড়িব দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিযাছিল, আপনাকে মিথ্যেবাদী বলিনি, বলেছি দুধ খাওয়াবাব সময ছেলেপিলে একটু কাঁদে: কান্না থামিযে দিলাম, না কাঁদিয়ে খাওযান তো দুধ ?

প্রথমটা থতোমতো খাইয়া শাশুড়ি অবশ্য বলিযাছিলেন, তোমাব হুকুমে নাকি ? এবং তারপর একটা প্রচণ্ড হইচই বাধাইযা দিয়াছিলেন যে মোহনলাল সুমতিকে বকিয়া আব কিছু বাখে নাই।

স্বামীর অন্যায় বকুনিতে সুমতি অভিমান করিয়া সাবাদিন কিছু খায় নাই, তবু শাশুড়ির মেজাজটা খারাপ হইয়া আছে। মোহনলালেব বকুনি শুনিতে শুনিতে সুমতি যদি অন্তত একবারও ফোঁস করিয়া উঠিত, শাশুড়িব হযতো মেজাজটা এত খাবাপ হইযা থাকিত না। অকাবণে শাশুড়িকে তেজ দেখাইয়া স্বামীর বকুনি বউ চুপচাপ হজম করিলে শাশুড়িব সেটা ভালো লাগে না, মেজাজ বিগড়াইযা থাকে।

ফের মুখের ওপর কথা বলছ ? বললাম বাপের বাড়ি যেতে হবে না, বাস্ ফুরিয়ে গেল, অত কথা কীসের ? মোটে সাত দিনেব জন্যে গিয়েছিলাম ! সাত দিনের জন্যে যে যেতে দিয়েছিলাম এই তোমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি, তা জেনে রেখো।

সুমতির নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইয়া উঠিল।

গুরুজনের কি চোদ্দোপুরুষ তুলে কথা বলা উচিত মা ?

শাশুড়ির মেজাজ আরও খারাপ হইয়া গেল।

গুরুজন ! গুরুজন বলে কী মানিাই কর ! আর বকতে পারি না বাছা তোমার সঙ্গে, বলে দিলাম যেতে পাবে না—পাবে না, পাবে না, পাবে না।

রাত্রে সুমতি পেট ভরিয়া খাইয়া ঘরে গেল। মোহনলাল আশা করিতেছিল সে একটু কাঁদিবে। গা ঘেঁষিয়া বসিয়া শাশুড়ির ছেলেমানুষিতে উত্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করার ভঙ্গিতে একটু হাসিয়া সুমতি বলিল, কী অন্যায় দ্যাখো তো মার ! এ সময় বাপের বাড়ি না গেলে চলে ? আমায় নেবার জন্য বাবা চিঠি লিখেছেন, মা পষ্ট বলে দিলেন যেতে দেবেন না। কালকেই চিঠির জবাব লেখা হবে—সকালে মাকে তুমি একটু বুঝিয়ে বোলো, কেমন ?

সুমতি একটু কাঁদিলে, বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়া পায়ে না পড়ুক অন্তত বুকে মুখ লুকাইয়া আত্মসমর্পণ করিলে, মোহনলাল তা করিত। বুঝাইয়া বলা কেন, স্পষ্ট করিয়াই বলিত যে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হোক। সুমতির তেজ দেখিয়া সে রাগ করিয়া বলিল, আমি বলতে টলতে পারব না।

পারবে না ? বেশ।

বেশ মানে ? তোমার যখন ইচ্ছা হবে তখনই বাপের বাড়ি যেতে দিতে হবে নাকি ?

সুমতি সরিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, যখন ইচ্ছা বাপের বাড়ি আবার কবে গেলাম ?

সুতরাং মোহনলাল রাগ করিয়া বলিল, বাপের বাড়ি যাওয়া না যাওয়ার মালিক তুমি নাকি ? যখন পাঠানো হবে যাবে, যখন পাঠানো হবে না যাবে না। অত মেজাজ দেখাচ্ছ কীসের ? বাড়ির বউ না তুমি ?

বউ না হলে এমন অদৃষ্ট হয়। যেতে দেবে না ?

না।

কেন দেবে না ?

আমার খুশি।

এতক্ষণ সুমতি তেজটা চাপিয়া রাখিয়াছিল, আর পারিল না। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইতে লাগিল।

হাড়িমুচিরাও তোমাদের মতো বউয়ের ওপর খুশি খাটায় না, তাদেরও দয়ামায়া আছে। তোমরা ভদ্দরলোক কিনা—

ঘুমন্ত খোকার পাশে আছড়াইয়া পড়িয়া চোখ বুজিয়া সে অসমাপ্ত কথাটা শেষ করিল অন্য কথা দিয়া, প্রতিজ্ঞা করার মতো করিয়া।

আমি যাবই এবার।

মোহনলাল রাগে আগুন হইয়া বলিল, মা যদিবা যেতে দেন, আমি দেব না। তোমার মতো বেয়াদব নচ্ছার মাগিকে ধরে চাবকানো উচিত।

সুমতি চোখ মেলিয়া বলিল, একমাসের মধ্যে যদি আমি বাপের বাড়ি না যাই, চাবুক কেন আমায় ধরে তুমি জুতিয়ো।

এত কাণ্ড ঘটিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। শাশুড়ির কাছে একটু নম্র হইয়া থাকিলে আর মাথা নিচু করিয়া আবদার ধরিলে প্রথমটা অরাজি হইলেও শেষ পর্যন্ত শাশুড়ি রাজি হইয়া যাইতেন। মোহনলালের কাছে একটু কাঁদিলেই কাজটা হইয়া যাইত। অপরপক্ষে, শাশুড়ি একটু মিষ্টিমুখে যদি বলিতেন যে এবার সুমতির বাপের বাড়ি না যাওয়াই ভালো, সুমতি ক্ষুণ্ণ হোক, রাগ করুক, বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিত না। এমন কী শাশুড়ির সঙ্গে কলহ করিয়া ঘরে যাওয়ার পর মোহনলাল যদি শুধু বলিত, মা যখন মানা করেছেন, এবার বাপের বাড়ি নাইবা গেলে ?—সুমতি হয়তো ফোঁস ফোঁস করিয়া একটু কাঁদিয়া বলিত, আচ্ছা। বাপের বাড়ি যাওয়ার সমস্যার চমৎকার মীমাংসা হইয়া যাইত। সুমতির তেজের জন্য সব গোলমাল হইয়া গেল।

এখান হইতে কর্তৃপক্ষের চিঠি গেল, এবার বউমাকে পাঠানো হইবে না, পাঠানো সম্ভব নয়, অনেক কারণ আছে। সুমতি নিজে বাবার কাছে লিখিয়া দিল, যত শীঘ্র সম্ভব কাহাকেও পাঠাইয়া যেন তাহাকে লইয়া যাওয়া হয়।

সদানন্দ অনেক বুঝাইয়া মেয়েব কাছে লম্বা চিঠি লিখিলেন। কেউ যখন তাকে পাঠাইতে ইচ্ছুক নন, তাকে নেওয়ার জন্য বাড়াবাড়ি করা কি উচিত ?

এ চিঠির এমন একটা জবাব সুমতি লিখিয়া দিল যে ভদ্রলোক স্বয়ং তিন দিনের ছুটি নিয়া মেয়ের শ্বশুরবাড়ি আসিয়া হাজির হইলেন। বুক তখন তার ঢিপঢিপ করিতেছে, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। মেয়েকে নেওযার জন্য প্রায় সজল চোখে কত যে কাকুতিমিনতি করিলেন, অন্ত হয় না। কিন্তু সুমতিব শাশুড়ি গোঁ ছাড়িলেন না, ঘাড় নাড়িয়া কেবলই বলিতে লাগিলেন, না বেয়াই না, এবার বউমাকে পাঠাতে পারব না।

কাকুতিমিনতিতে মন গলার বদলে শেষ পর্যন্ত শাশুড়িকে রাগিয়া উঠিবার উপক্রম কবিতে দেখিয়া ভয়ে ভয়ে সদানন্দ চুপ করিয়া গেলেন। সদানন্দ নিজে আসিযা এভাবে বলিলে অন্য অবস্থায় শাশুড়ির মন হয়তো গলিয়া যাইত, বাপের বাড়ি যাওয়া নিয়া প্রথমবার সুমতির সঙ্গে যে ঝগড়া হইয়াছিল তাও হয়তো তিনি আর মনে বাখিতেন না, কিন্তু ইতিমধ্যে সুমতি আবও অনেকবার তেজ দেখাইয়া বসিয়াছে। যেমন তেমন তেজ নয়, গা পুড়িয়া জ্বালা করাব মতো তেজ।

সু.-ি বলিল, আমি তোমার সঙ্গেই চলে যাব বাবা, আমায় নিয়ে চলো।

সদানন্দ মেয়েকে বুঝাইলেন। এ রকম অবস্থায় যত বকম উপাযে মেয়েকে বোঝানো সম্ভব, তাব একটাও বাদ দিলেন না। কিন্তু এ তো বোঝাব কথা নয়, কথাটা তেজেব। সুমতিব মুখে সেই এককথা, আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমায় নিয়ে চলো।

শেষে সদানন্দেব মতো নিবীহ গোবেচারি মা-ুষটা পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এরা পাঠাবে না, তবু তুই যাবি কী রকম ? আমি নিযে যেতে পারব না। এদের বুঝিয়ে শুনিয়ে বাজি কবতে পারিস, আমায চিঠি লিখিস, এসে নিযে যাব। যাবার জন্য এত পাগলামিই বা কেন তোর ? পবে না হয় যাস ?

সদানন্দ ফিরিযা গেলেন। এবাব নিজেব তেজেব আগুনে সুমতি নিজেই পুড়িতে লাগিল। শারীরিক অবস্থাটা তার এতখানি মানসিক তেজ সহ্য কবিবার ম-ো ছিল না, এ অবস্থায় মনটা যত শান্ত আর নিস্তেজ থাকে ততই ভালো। হাত-পাগুলি দেখিতে দে-‌.ত কাঠির মতো সরু হইয়া গেল, শুষ্ক শীর্ণ মুখে কেবল জ্বলজ্বল কবিতে লাগিল দুটি চোখ। কথা কমিয়া গেল, খাওয়া কমিয়া গেল, আলস্য কমিয়া গেল—নিজের মনে নীরবে যতটা পাবে কাজে অকাজে আত্মনিযোগ করিয়া আব যতটা পারে কোনো কাজ না কবিযা সে ছটফট করিতে লাগিল। তারপর সে এক মাস সময়ের মধ্যে বাপের বাড়ি না যাইতে পাবিলে চাবুকের বদলে স্বামীব জুতা খাইতে বাজি হইয়াছিল, সেই সময়টা প্রায় কাবার হইয়া আসায়, একদিন শেষবাত্রে কিছু টাকা আঁচলে বাঁধিয়া একাই বাপের বাড়ি রওনা হইযা গেল।

এ একটা মফস্বলে- শহব। বাপের বাড়িটাও মফস্বলের একটা শহরেই। কিন্তু সোজাসুজি যোগ না থাকায় কলিকাতা হইয়া যাইতে একটু সময় লাগে।

সুমতিব আরও অনেক বেশি সময় লাগিল। কারণ কলিকাতায় পৌঁছাইয়া বাপের বাড়ি যাওয়ার বদলে তাকে যাইতে হইল মেয়েদের একটা হাসপাতালে। খবব পাইয়া সদানন্দও আসিলেন, মোহনলালও আসিল এবং মোহনলাল বিনা বাক্যব্যয়ে মেয়েকে বাপের বাড়ি লইয়া যাইবার অনুমতিও সদানন্দকে দিয়া দিল। কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তার একমাস তাকে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে দিলেন না।

একমাস পরে বাপের বাড়ি গিয়া তিন মাস পরে অনেকটা সুস্থ হইয়া সুমতি স্বামীগৃহে আসিল। আর কোনো পরিবর্তন হোক না হোক, সুমতির একটা পরিবর্তন স্পষ্টভাবেই ধরা পড়িয়া গেল। দেখা গেল, তার সবটুকু তেজ কর্পূরের মতো উবিয়া গিয়াছে।

কুষ্ঠরোগীর বউ

কোনো নৈসর্গিক কারণ থাকে কিনা ভগবান জানেন, মাঝে মাঝে মানুষের কথা আশ্চর্য রকম ফলিয়া যায়। সমবেত ইচ্ছাশক্তির মর্যাদা দিবার জন্যও ভগবান বিনিদ্র রজনী যাপন করেন না, মানুষের মর্মাহত অভিশাপের অর্থও জ্বালাময় অক্ষমতা ঘোষণা করার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। তবু মাঝে মাঝে প্রতিফল ফলিয়া যায়, বিষাক্ত এবং ভীষণ !

এ কথা কে না জানে যে পরের টাকা ঘরে আনার নাম অর্থোপার্জন এবং এ কাজটা বড়ো স্কেলে করিতে পারার নাম বড়োলোক হওয়া ? পকেট হইতে চুপিচুপি হারাইয়া গিয়া যেটি পথের ধারে আবর্জনার তলে আত্মগোপন করিয়া থাকে সেটি ছাড়া নারীর মতো মালিকহীন টাকাও পৃথিবীতে নাই। কম এবং বেশি অর্থোপার্জনের উপায় তাই একেবারে নির্ধাবিত হইয়া আছে, কপালের ঘাম আর মস্তিষ্কের শয়তানি। কারও ক্ষতি না করিয়া জগতে নিরীহ ও সাধারণ হইয়া বাঁচিতে চাও, কপালের পাঁচশো ফোঁটা ঘামের বিনিময়ে একটি মুদ্রা উপার্জন কব : সকলে পিঠ চাপড়াইয়া আশীর্বাদ করিবে। কিন্তু বড়োলোক যদি হইতে চাও মানুষকে ঠকাও, সকলের সর্বনাশ কর। তোমার জন্মগ্রহণের আগে পৃথিবীর সমস্ত টাকা মানুষ নিজেদেব মধ্যে ভাগ করিয়া দখল করিয়া আছে। ছলেবলে কৌশলে যেভাবে পার তাহাদের সিন্দুক খালি করিয়া নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমাও। মানুষ পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অভিশাপ দিবে।

ধনী হওয়ার এ ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নাই।

সুতরাং বলিতে হয় যতীনের বাবা অনন্যোপায় হইয়াই অনেকগুলি মানুষের সর্বনাশ করিয়া কিছু টাকা করিয়াছিল। সকলের উপকার করিয়া টাকা করিবার উপায় থাকিলে এমন কাজ সে কখনও করিত না। তাই, জীবনের আনাচেকানাচে তাহার যে অভিশাপ ও ঈর্ষার বোঝা জমা হইয়াছিল সে জন্য তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দায়ি করা চলে না। তবু সংসারে চিরকাল পুণ্যেব জয় এবং পাপের পরাজয় হইয়া থাকে এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন বাপের জমা-করা টাকাগুলি হাতে পাইয়া ভালো করিয়া ভোগ করিতে পারার আগেই মাত্র আটাশ বছর বয়সে যতীনেব হাতে কুষ্ঠরোগের আবির্ভাব ঘটিল !

লোকে যা বলিয়াছিল অবিকল তাই। একেবারে কুষ্ঠব্যাধি।

মহাশ্বেতা একদিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল : তোমার আঙুলে কী হয়েছে ?

কী জানি। একটা ফুসকুড়ির মতো উঠেছিল।

মহাশ্বেতা আঙুলটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল : ফুসকুড়ি নয়। চারদিকটা লাল হয়েছে।

আঙুলটা কেমন অসাড় অসাড় লাগছে শ্বেতা।

একটু টিনচার আইডিন লাগিয়ে দেব ? নয়তো বলো একটা চুমো খেয়ে দিচ্ছি, এক চুমোতে সেরে যাবে।

আঙুলটা চুম্বন করিয়া মহাশ্বেতা হাসিল।

পুরুষ মানুষের আঙুল তো নয়, উর্বশী মেনকার কাছ থেকে যেন ধার করেছ। বাবা, মানুষের আঙুলের রং পর্যন্ত এমন টুকটুকে হয় ! রক্ত যেন ফেটে পড়ছে !

আঙুলটি যে হাতে লাগানো ছিল স্বামীর সেই হাতটি মহাশ্বেতা নিজের গলায় জড়াইয়া দিল। জীবনে যে কথা সে বহুবার বলিয়াছে আজ আর একবার সেই কথাই বলিল।

এ তোমার ভারী অন্যায় তা জানো ? তুমি অ্যাতো সুন্দর বলেই তো আমার ধাঁধা লাগে ! তোমাকে ভালোবাসি, না, তোমার চেহারাকে ভালোবাসি বুঝতে পারি না। শুধু কি তাই গো ? হুঁ, তবে আর ভাবনা কী ছিল ! দিনরাত কী রকম ভাবনায়-ভাবনায় থাকি তোমার হলে টের পেতে। ঈর্ষায় জ্বলে মরি যে !

তারপর আরও কিছুকাল বোঝা গেল না। শুধু আঙুল নয়, যতীনের হাতে দু-তিন জায়গায় তামার পয়সার মতো গোলাকার কয়েকটা তামাটে দাগ যখন দেখা দিল, তখনও নয়। মহাশ্বেতার শুধু মনে হইল, যতীনেব শরীরটা বুঝি ভালো যাইতেছে না, গায়ের রংটা তাহার রক্ত খারাপ হওয়ার জন্য কী রকম নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। একটা টনিক খাওয়া দরকার।

দ্যাখো, তুমি একটা টনিক খাও।

টনিক খেয়ে কী হবে ?

আহা, খাও না। শরীরটা যদি একটু সারে !

যতীন টনিক খাইল। কিন্তু টনিকে এ ব্যাধির কিছু হইবাব নয়। ক্রমে আরও কয়েকটা আঙুলে তাহাব ফুসকুড়ি দেখা দিল। শরীরেব চামড়া আরও কর্কশ, আবও মরা মরা দেখাইতে লাগিল। চোখের কোল এবং ঠোঁট কেমন একটা অস্বাস্থ্যকর মৃত মাংসের রূপ লইয়া অল্প অল্প ফুলিয়া উঠিল। স্পর্শ অনুভব করিবার শক্তি তাহার ক্ষীণ হইয়া আসিল। চিমটি কাটিলে তাহার যেন আর তেমন ব্যথা বোধ হয় না। দিবারাত্রি একটা ভোঁতা অস্বাস্থ্যকর অনুভূতি তাহাকে বিষণ্ণ ও খিটখিটে করিয়া রাখিল। এবং সকলের আগে যে আঙুলেব ছোটো একটি ফুসকুড়িকে মহাশ্বেতা চুম্বন করিয়া টিনচার আইডিন লাগাইয়া দিয়াছিল সেই আঙুলেই তাহার পচন ধরিল প্রথম।

ষোলো টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন : আপনাকে বলতে সংকোচ বোধ করছি। আপনার কুষ্ঠ হয়েছে।

বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন : টাইপটা খাবাপ। একেবারে সেরে উঠতে সময় নেবে।

সেবে তাহলে যাবে ডাক্তারবাবু ?

যাবে না ? ভয় পান কেন ? বোগ যখন হয়েছে সারতেও পারে নিশ্চয।

এমন করিয়া ডাক্তাব কথাগুলি বলিলেন, আশ্বাস দিবার চেষ্টাটা তাহার এত বেশি সুস্পষ্ট হইয়া রহিল যে কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যতীনেব এ মহাব্যাধি কখনও সারিবে না।

একশো টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন : যতটা সম্ভব লোকালাইজড্ করে রাখা ছাড়া উপায় নেই। তাব বেশি এখন কিছু করা অসম্ভব। জানেন তো রোগটা ছোঁয়াচে সাবধানে থাকবেন। আপনাকে তো বলাই বাহুল্য যে ছেলেমেয়ে হওয়াটা...বোঝেন না ?

বোঝে না ? যতীন বোঝে, মহাশ্বেতা বোঝে। কিন্তু ছ-মাস আগে যদি এই বোঝাটা বোঝা যাইত !

মহাশ্বেতা যেন মরিয়া গিয়াছে। অন্যায় অসংগত অপঘাতে অকথ্য যন্ত্রণা পাইয়া সদ্য সদ্য মরিয়া গিয়াছে। বিমূঢ় আতঙ্কে বিহ্বলের মতো হইয়া সে বলিল : তোমার কুষ্ঠ হয়েছে ? ও ভগবান, কুষ্ঠ !

যতীন তখনও মরে নাই, মরিতেছিল। সাধারণ কথার সুর তাল লয় মান সমস্ত বাদ দিয়া সে বলিল : কী পাপে আমার এমন হল শ্বেতা ?

তোমার পাপ হবে কেন গো ? আমার কপাল।

নিজের বাড়িতে আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে যতীন হইয়া রহিল অস্পৃশ্য। গৃহের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইবার সাধ থাকিলে বাধা অবশ্য কেহই তাহাকে দিতে পারিত না। কিন্তু সে গোপনতা খুঁজিয়া লইল। বাড়ির একটা অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া সেখানে নিজেকে সে নির্বাসিত ও বন্দী করিয়া রাখিল। মহাশ্বেতা

ছাড়া আর কাহারও সেদিকে যাইবার হুকুম রহিল না। বন্ধুবান্ধব দেখা করিতে আসিয়া বাহির হইতে ফিরিয়া গেল, সামনাসামনি মৌখিক সহানুভূতি জানাইবার চেষ্টা করিয়া আত্মীয়স্বজন হইয়া গেল ব্যর্থ। যতীন নিজের পচনধরা দেহকে কারও চোখের সামনে বাহির করিতে রাজি হইল না। নিজের ঘরে সে রেডিয়ো বসাইল, স্তূপাকার বই আনিয়া জমা করিল, ফোন বসাইয়া বাড়ির অন্য অংশ এবং বাহিরের জগতের সঙ্গে একটা অস্পষ্ট চাপা শব্দের সংযোগ স্থাপিত করিয়া লইল। জীবনযাপনের প্রথায় আকস্মিক পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের সীমা পরিসীমা রহিল না।

পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বর্জন করিলেও মহাশ্বেতাকে সে কিন্তু ছাড়িতে পারিল না। নিকটতম আত্মীয়ের দৃষ্টিকে পর্যন্ত পরিহার করিয়া বাঁচিয়া থাকার মতো মনের জোর সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিল বলা যায় না কিন্তু মহাশ্বেতার সম্বন্ধে সে শিশুর মতোই দুর্বলচিত্ত হইয়া রহিল। আপনার সংক্রামক ব্যাধিটিকে আপনার দেহের মধ্যেই সংহত করিয়া রাখিয়া মৃত্যু পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়া চিতার আগুনে ভস্ম করিয়া ফেলিবার যে অনমনীয় প্রতিজ্ঞা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিল, মনে হইল, মহাশ্বেতাকে সে বুঝি তাহার সেই আত্ম-প্রতিশ্রুতির অন্তর্গত করে নাই। আত্মীয় পর সকলের জন্য সাবধান হইতে গিয়া মহাশ্বেতার বিপদের কথাটা সে ভুলিয়া গিয়াছে। জীবনটা এতকাল ভাগাভাগি করিয়া আসিয়াছে বলিয়া দেহের এই কদর্য রোগের ভাগটাও মহাশ্বেতাকে যদি আজ গ্রহণ করিতে হয়, তাহার যেন কিছুই বলিবার নাই।

স্ত্রীকে সে সর্বদা কাছে ডাকে, সব সময় কাছে রাখিতে চেষ্টা করে। কাছে বসিয়া মহাশ্বেতা তার সঙ্গে কথা বলুক, তাকে বই পড়িয়া শোনাক। রেডিয়োতে ভালো একটা গান বাজিতেছে, পাশাপাশি বসিয়া গানটা না শুনিলে একা যতীনের শুনিতে ভালো লাগে না। ফোনে সে কার সঙ্গে কথা বলিবে নম্বরটা খুঁজিয়া বাহির করিয়া কানেকশন লইয়া রিসিভারটা মহাশ্বেতা তাহার হাতে তুলিয়া দিক। আর তা না হয়তো সে শুধু কাছে বসিয়া থাক, যতীন তাহাকে দেখিবে।

মহাশ্বেতা এ সব করে। খানিকটা কল বনিয়া-যাওয়া মানুষের মতো যতীনের নবজাগ্রত সমস্ত খেয়ালের কাছে সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যতীন যা বলে নির্বিকার চিত্তে সে তাহাই পালন করিয়া যায়। যতীনের ইচ্ছাকে কখনও সংশোধিত অথবা পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা করে না। তাহার নিরবচ্ছিন্ন স্বামীর কথা শুনিয়া চলিবার রকম দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না তাহার নিজেরও স্নানাহারের প্রয়োজন আছে, সুস্থ মানুষের সঙ্গলাভের প্রয়োজন আছে, কিছুক্ষণ আপন মনে একা থাকিবার প্রয়োজন আছে। যতীন খেয়াল করিয়া ছুটি দিলে সে খাইতে যায়, যতীন মনে করাইয়া দিলে বিকালে তাহার একটু বাগানে বেড়ানো হয়। তা না হইলে নিজের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া যতীনের পরিবর্তনশীল ইচ্ছাকে অক্লান্ত তৎপরতার সহিত তৃপ্ত করিয়া চলে।

অথচ যাচিয়া সে কিছুই করে না। যতীনের দরকারি সুখসুবিধাগুলির জন্য ধরাবাঁধা যে সব নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে সেগুলি যথারীতি পালিত হয় কিনা এ বিষয়ে সে নজর রাখে কিন্তু যতীনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার জন্য, যতীনকে তাহার নিজের খেয়ালে সৃষ্টি করিয়া লওয়া আনন্দের অতিরিক্ত কিছু দিবার জন্য, স্বকপোলকল্পিত কোনো উপায় দিন ও রাত্রির চব্বিশটা ঘণ্টার মধ্যে মহাশ্বেতা একটিও আবিষ্কার করে না।

তাহাদের সহযোগ রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে।

জীবনে তাহাদের একটি সমবেত গতি ছিল। জীবনের পথে পাশাপাশি চলিবার কতগুলি রীতি ছিল। সে গতিও এখন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সে সব রীতিও গেছে বদলাইয়া। পুরানো ভালোবাসা, পুরানো প্রীতি, পুরানো কৌতুক নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইয়াছে। বিবাহের চার বছর পরে পরস্পরের সঙ্গে আবার তাহাদের একটি নবতর সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। পূর্বতন বোঝাপড়াগুলি আগাগোড়া বদলাইয়া ফেলিতে হইয়াছে।

প্রথম দিকে যে মুহ্যমান অবস্থাটি তাহাদের আসিয়াছিল সেটুকু কাটিয়া যাওয়ার আগে আপনা হইতে এমন কতগুলি পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে—যাহা খেয়াল করিবার অবসরও তাহাদের থাকে নাই। চিকিৎসাব বিপুল আয়োজনেব সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া রোগী ও সুস্থ মানুষের শয্যা গিয়াছে পৃথক হইয়া। কথা বলিবাব সময় শুধু হাসিয়া কথা বলিবার প্রয়োজন সম্পূর্ণ বাতিল হইয়া গিয়াছে। যার নাম দাম্পত্যালাপ এবং যাহা নয়টির মধ্যে প্রায় সবগুলি উপভোগ্য রসেই সমৃদ্ধ দুটি পৃথক শয্যার মাঝে চিড খাইয়া তাহা নিঃশব্দে মবিয়া গিয়াছে। দিবাবাত্রির মধ্যে একটি চুম্বনও আজ আব পৃথিবীর কোথাও অবশিষ্ট নাই। চোখেচোখে যে ভাষায় তাহারা কথা বলিত সে ভাষা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। সবটুকু নয়। এখন চোখের দৃষ্টিতে একটি বিহ্বল শঙ্কিত প্রশ্ন তাহারা ফুটাইয়া তুলিতে পারে। চোখেচোখে চাহিয়া এখন তাহাবা শুধু দেখিতে পায় একটা অবিশ্বাস্য অপ্রকাশিত বেদনা এই জিজ্ঞাসায় পবিণত হইয়া আছে : এ কী হল ?

মহাশ্বেতা দিনরাত বোধ হয় এই কথাটাই ভাবে। তাহার ঠোঁট দুটি পরস্পরকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া অহরহ কঠিন হইয়া থাকে, ছোটো ছোটো নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এক-একসময় সে শুধু বেশি বাতাসের প্রয়োজনে জোবে নিশ্বাস গ্রহণ কবে। দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায়, অদৃষ্টকে অভিশাপ দিবার মতো শোনায়।

যতীন অনুযোগ করিয়া বলে : দিনরাত তুমি অমন কর কেন ?

মহাশ্বেতা ঠোঁট নাড়িয়া উচ্চারণ করে : কেমন করি ? কিছু কবি না তো !

যতীন হঠাৎ কাঁদোকাঁদো হইয়া বলে : এমনিতেই আমি মরে আছি, তারপব তুমিও যদি আমার মনে কষ্ট দাও—

যতীন ভুলিয়া যায়। ভুলিযা গিয়া সে মহাশ্বেতার হাত চাপিয়া ধবে। প্রথম দিকে তাহার ঘায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা হইত, আজকাল আলো ও বাতাস লাগাইবাব জন্য খুলিয়া বাখা হয়। ডাক্তার দিনে পাঁচ-ছয়বার ধুইয়া যতক্ষণ সম্ভব বোদে ঘাগুলি মেলিয়া বাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ব্যান্ডেজ শুধু বাত্রির জন্য।

মহাশ্বেতা তাহার তিনটা চামড়া-তোলা ফাটিয়া যাওয়া আঙুলের দিকে চাহিয়া থাকে। আঙুলগুলি তাহার হাতে লাগিয়া আছে বলিয়া বারেকেব জন্যেও সে শিহরিয়া ওঠে না। মনে হয় যতীন অনুরোধ করিলে তাহাব হাতে কনুইয়ের অল্প নীচে টাকার মতো চওড়া যে ক্ষতটি ছোটো ছোটো রক্তাভ গোটায় উর্বব হইয়া আছে, মহাশ্বেতা সেখানে চুম্বন কবিতে পারে।

যতীন হাত সবাইয়া লয। রাগ করিয়া বলে : তুমি আমায় ঘেন্না করছ শ্বেতা ?

মহাশ্বেতা এ কথা অনুমোদন করিবার সুরে রাগিয়া বলে : কখন আবাব ঘেন্না কবলাম ? ,

তবে অমন করে তাকাও কেন ?

কেমন করে তাকাই ?

এ রকম অবস্থায় এ ধরনের পালটা প্রশ্ন মানুষের সহ্য হয় ? যতীন উঠিয়া বারান্দায় গিয়া বেলা বারোটার কড়া রোদে পাতিয়া-রাখা ইজিচেয়ারটিতে কাত হইয়া এলাইয়া পড়ে। বৈশাখী সূর্যের এ অম্লান কিরণ ভালোমানুষের হয়তো পাঁচ মিনিটের বেশি সহ্য হয় না, কিন্তু যতীনের অনুভব শক্তি ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সেই রোদে নিজেকে মেলিয়া রাখিয়া পড়িয়া থাকে। রোদ সরিয়া গেলে ইজিচেয়ারটাও সে সরাইয়া লইয়া যায়। ডাক্তারের কাছে সে সূর্যালোকের মধ্যে অদৃশ্য আলোর গুণের কথা শুনিয়াছে। সে আলোককে যতীন প্রাণপণে কাজে লাগায়। অপচয় করিতে পারে না।

খানিক পরে ডাকিয়া বলে : এদিকে শোনো শ্বেতা।

মহাশ্বেতা আসিলে বলে : এইখানে বোসো।

মহাশ্বেতা যতীনের কাছে ছায়ায় বসে। নিকটবর্তী রোদের ঝাঁঝে তাহার ঘর্মাক্ত দেহ শুকাইয়া উঠিয়া জ্বালা করিতে থাকে। কিন্তু সে উঠিয়া যায় না। জ্যোতির্ময়ী পতিব্রতার মতো স্বামীর কাছে বসিয়া ঝিমায়।

যতীন বলে : আমার তেষ্টা পেয়েছে।

মহাশ্বেতা তাহাকে জল আনিয়া দেয়।

যতীন বলে : আমার আর একটা বালিশ চাই।

মহাশ্বেতা তাহাকে আর একটা বালিশ আনিয়া দেয়।

যতীন বলে : এনে দিলেই হল বুঝি ? মাথার নীচে দিয়ে দাও !

মহাশ্বেতা বালিশটা তাহার মাথার নীচে দিয়া দেয়।

যতীন রুক্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলে : কী ভাবছ শুনি ?

মহাশ্বেতা বলে : কী ভাবব ?

বৈশাখী দুপুরটি গুমোটে জমিয়া ওঠে।

রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া মহাশ্বেতা দেখিতে পায় যতীন তার বিছানায় উঠিয়া আসিয়াছে। দেখিয়া মহাশ্বেতা চোখ বোজে। সারারাত্রি আর সে চোখ খোলে না।

এ জগতে সবই যখন ভঙ্গুর, মনুষ্যত্বের ভঙ্গুরতায় বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই ! মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বভাবও ভাঙে গড়ে। আজ যে রাজা ছিল কাল সে ভিখারি হইলে যদি বা এটুকু বোঝা যায় যে লোকটা চিরকাল ভিখারি ছিল না, তার বেশি আর কিছুই বোঝা যায় না।

সংকীর্ণ কারাগারে নিজের বিষাক্ত চিন্তার সঙ্গে দিবারাত্রি আবদ্ধ থাকিয়া যতীন দিনের পর দিন অমানুষ হইয়া উঠিতে লাগিল। বীভৎস রোগটা তাহার না কমিয়া বাড়িয়াই চলিল, তার সুশ্রী রমণীয় চেহারা কুৎসিত হইয়া গেল। বাহিরের এই কদর্যতা তাহার ভিতরেও ছাপ মারিয়া দিল। তার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা একত্র থাকাও মুহ্যমানা মহাশ্বেতার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। মেজাজটা যতীনের একেবারে বিগড়াইয়া গিয়াছে। মাথায় রক্ত চলাচলের মধ্যে তাহার কী গোল বাধিয়াছে বলা যায় না, চোখ দুটি মেজাজের সঙ্গে মানাইয়া দিবারাত্রি আরক্ত হইয়া আছে। গলার আওয়াজ তাহার চাপা ও কর্কশ হইয়া উঠিয়াছে, মাথার চুলগুলি অর্ধেকের বেশি উঠিয়া গিয়া পাতলা হইয়া আসিয়াছে। নাকের রংটা তাহার তামাটে হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মুখের ও দেহের মাংস দেখিলে মনে হয় কত কালের বাসি হইয়া ভিতর হইতে পচন ধরিয়া গাঁজিয়া উঠিয়াছে। কোণঠাসা হিংস্র জন্তুর মতো উগ্র ভীতিকর ব্যবহারে মহাশ্বেতাকে সে সর্বদার জন্য সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে শুরু করিয়াছে।

মানুষের স্তরে আর যে তাহার স্থান নাই যতীন তাহা বুঝিতে পারে। মানুষের শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসা পাওয়ার আশা এ জীবনের মতো তাহার ঘুচিয়া গিয়াছে। সে কাছে আসিতে দেয় না বলিয়া কেহ তাহার খোঁজখবর নেয় না। এই আত্মপ্রবঞ্চনাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে সে রাজি নয়। মহাশ্বেতার নির্বাক ও নির্বিকার আত্মসমর্পণকে সে অসাধারণ ঘৃণার অস্বাভাবিক প্রকাশ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে। মানুষকে দিবার যতীনের আর কিছুই নাই। সে তাই মানুষের উপর রাগিয়াছে। সে তাই স্বার্থপর হইতে শিখিয়াছে। ব্যথা পাইয়াছে বলিয়া কাহাকেও ব্যথা দিতে সে কুণ্ঠিত নয়।

নাগাল সে পায় শুধু মহাশ্বেতার। মহাশ্বেতাকেই তাহার ব্যাধি ও ব্যাধিগ্রস্ত মনের ভার বহন করিতে হয়।

সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তার অবসন্ন শিথিল ভাবটাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। মনে হয়, আত্মরক্ষার ঘুমন্ত প্রবৃত্তিগুলি আর তাহার ঘুমাইয়া নাই। এবার সে একটু বাঁচিবার চেষ্টা করিবে। চিরটাকাল সহমরণে যাইবে না।

যতীনকে সে বলে : কোথাও যাবে ?

যতীন বলে : না।

সমুদ্রের জল লাগালে হয়তো কমত।

যতীন কুটিল সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলে : কমত ? তোমাব মাথা হত ! ডাক্তার ও কথা বলেনি।

মহাশ্বেতা রাগ করিয়া বলে : ডাক্তারের কথা শুনে তো সবই হচ্ছে।

খানিক পরে সে আবার বলে : ঠাকুব দেবতার কাছে একবাব হত্যা দিয়ে দেখলে হত। হয়তো প্রত্যাদেশ-টেশ কিছু পেতে।

যতীন আরক্ত চোখে মহাশ্বেতার সুস্থ সবল দেহটির দিকে চাহিয়া থাকে।

নিজের ছেলে খেয়ে ঠাকুর দেবতাব অত ভক্তি কেন ? প্রত্যাদেশ ! তোমার মতো পাপিষ্ঠার স্বামীকে ঠাকুব প্রত্যাদেশ দেন না।

ব্যাপারটা মাসখানেকের পুরানো। যতীন ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনিয়াছে। কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায় সে বিশ্বাস করে নাই। মহাশ্বেতাকে সন্দেহ কবিযাছে, সন্দেহটা মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে করিতে নিজের তাহাতে প্রত্যয জন্মাইয়াছে এবং উগ্র উত্তেজনায একটা পুরা দিন পাগল হইয়া থাকিয়াছে।

মহাশ্বেতা কিছু প্রকাশ করে না। জেবাব জবাবে এমন সব কথা বলে যে যতীন বিশ্বাস কবিতে পাবে না। জোড়াতালি দিবার চেষ্টাটা তাহার ধরা পড়িয়া যায়। তাছাড়া মহাশ্বেতা এমন এমন ভাব দেখায যেন এটা সম্পূর্ণভাবে তাহাবই ব্যক্তিগত জীবনেব ঘটনা। এমনও যদি হয যে এ ব্যাপারে তাহার হাত ছিল, দৈবেব চেয়ে সেই বেশি দাযি, বলিবার অধিকাব যতীনের নাই। সে তাহাব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা তুলিয়া অনর্থক উদ্‌বিগ্ন হইতেছে। মহাশ্বেতার কপালে দুঃখ ছিল, সব দিক দিযা বঞ্চিত হওযাব বিধিলিপি ছিল, সে দুঃখ পাইয়াছে, বঞ্চিত হইযাছে। যতীনের কী ? সে কেন ব্যস্ত হয ?

তাব স্বামী বলিয়া যতীন দেবতার প্রত্যাদেশও পাইবে না এ কথাটা মহাশ্বেতাব সহ্য হয় না। সে বলে : ছেলে ছেলে কবে তো মরছ। গুনে জেনেছ ছেলে ?

যতীনেব চোখে প্রত্যাদেশকারীর দৃষ্টি ফুটিয়া ওঠে।

ছেলে নয় ? ওবা যে বলল ছেলে ?

আমার চেয়ে ওবা যে বেশি জানে !

যতীন তখন আব কিছু বলে না। চুপচাপ ভাবিতে থাকে। পবদিন দুপুবে যতীনেব রোদটুকু হরণ করিয়া আকাশ ভরিয়া মেঘ জমিলে মহাশ্বেতাকে কাছে, খুব কাছে আহ্বান কবে। বাহিরে ব্যাকুল বর্ষণ শুরু হইলে হঠাৎ সে বহুদিনের ভুলিয়া যাওয়া অভিমানের সুরে বলে : মেয়েব বুঝি দাম নেই ?

মহাশ্বেতা অবাক হইয়া বলে : তুমি এখনও সে কথা ভাবছ ?

যতীন বলে : কী কবেছিলে ? গলা টিপে তুমি তাকে মারতে পারনি শ্বেতা। না, তাও পেরেছিলে ?

মহাশ্বেতা বলে : আবোল-তাবোল কথার কত জবাব দেব ? যা বোঝো না তাই নিয়ে কেবল বকবক করবে। বেঁচে থাকলে কত দুঃখ পেত ভেবে আমি মন ঠান্ডা করেছি। তুমি পার না ?—কী বৃষ্টিটাই নাবল। দেখি একটু !

মহাশ্বেতা উঠিয়া গিয়া জানালায় দাঁড়ায়। বাহিরে অবিশ্রান্ত জল পড়ে আর ঘরে যতীন অবিরত গাল দেয়। মহাশ্বেতা চোখ দিয়া বর্ষা দ্যাখে আর কান দিয়া স্বামীর কথা শোনে। যতীন যখন বলিতে থাকে যে এ কাজ যে মেয়েমানুষ করিতে পারে সে যে আর কোনো অন্যায় করিতে পারে না, এ কথা স্বয়ং ভগবান তাহাকে বলিলেও সে বিশ্বাস করিবে না, তখন মহাশ্বেতা একটু হাসে।

একদিন তাহাদের এই কথোপকথন হইয়াছিল :

কী পাপে আমার এমন হল শ্বেতা ?

তোমার পাপ কেন হবে ? আমার কপাল।

আজ কথা বলিবার ধারা উলটিয়া গিয়াছে। যতীন আজ প্রাণপণে চেঁচাইয়া বলে : তোমাব পাপে আমার এমন দশা হয়েছে, ছেলেখেকো রাক্ষসি। তুমি মরতে পারনি ? না, সাধ-আহ্লাদ এখনও মেটেনি ? এখনও বুঝি একজন খুব ভালোবাসছে ?

এই সন্দেহটাই এখন যতীনের আক্রমণ করার প্রধান অস্ত্রে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মহাশ্বেতার মুখ দেখিলে কারও এ কথা মনে হওয়া উচিত নয় যে সে সুখে আছে। যতীনের দেখিবার ভঙ্গি ভিন্ন। মহাশ্বেতার মুখের ম্লানিমা তার চোখে রূপৈশ্বর্যের মতো লাগে, ওর চোখের ফাঁকা দৃষ্টি যে আজকাল শ্রান্তিতে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে সেটা তার মনে হয় পরিতৃপ্তি। ওর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা যতীনের কাছে হইয়া উঠিয়াছে সাজসজ্জা। তার দৃষ্টির আড়ালে ওর নেপথ্য জীবনটির পরিসর বাড়াইয়া তোলা যতীনের কাছে গভীর সন্দেহের ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাকে একা ফেলিয়া সমস্ত দুপুবটা সে কাটায় কোথায় ? অন্যঘরে বিশ্রাম করে ? যতীন বিশ্বাস করে না। বিশ্রামেব জন্য অন্যঘরেরই যদি তাব প্রয়োজন যতীনের পাশের ঘরখানা কী দোষ করিয়াছে ? নির্জন দুপুরে নীচের তলায় কোনার একটা ঘর ছাড়া ওর বিশ্রাম করা হয় না, বাহির হইতে যে ঘরে সকলেব অগোচরে মানুষ আসা যাওয়া করিতে পারে ?

অত বোকা নই আমি, বুঝলে ?

পালটা প্রশ্ন করার অভ্যাসটা মহাশ্বেতার এখনও একেবারে যায় নাই। সে বলে : তোমাকে বোকা কে বলেছে ?

যতীন গোঁ ধরিয়া বলে : ও সব চলবে না। আমার বাড়িতে বসে ও সব তোমার চলবে না, এই তোমাকে আমি বলে দিলাম ! এখনও মরিনি আমি !

কী সব বলছ ?

বলছি তোমার মাথা আর আমার মুন্ডু। ওরে বাপরে, চাদ্দিক দিয়ে আমাব একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেল যে !

যতীন হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। মহাশ্বেতা ছবির মতো দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার বিকৃত ক্রন্দন চাহিয়া দ্যাখে। যতীনের আকুলতা যত তীব্র হইয়া ওঠে সে যেন ততই শান্ত হইয়া যায়। ধীবে ধীবে সন্তর্পণে তাহার চোখে পলক পড়ে, ঘরের দেওয়ালে ঝাপসা ছবিগুলি মন্থরগতিতে তাহাব চারিদিকে পাক খায়। বাহিরের শব্দগুলি তাহার কানে আসিয়া বাজিতে থাকে, সে একটু একটু করিয়া তাহা অনুভব করে। তাহার মনে হয়, কে যেন কোথায় কাঁদিতেছে।

পাগলামি মহাশ্বেতারও আসিয়াছে বইকী। তাহা অপরিহার্য। সাধারণ অবস্থায় মানুষ যাহা করে না সে সব করার নাম পাগলামি। সাধারণ অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে যাহার জীবন, ও সব তাহাকে করিতে হয়। মস্তিষ্কের কতগুলি অভিনব অভ্যাস জন্মিয়া যায়। বন্ধুকে কারও মনে হয় শত্রু, প্রিয়কে কারও মনে হয় অপ্রিয়, জীবনকে কারও মনে হয় সীমান্তোলিত কৌতুক। দুঃখ দেখিলে কেহ কাঁদিয়াই মরিয়া যায়, কেহ উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবে বিকালে চা পান করা হয় নাই বলিয়া মাথাটা ঝিমঝিম করিতেছে, আকাশে কী আশ্চর্য একটা পাখি উড়িয়া গেল ?

মহাশ্বেতা রাত্রে এ ঘরে থাকে না। পাশের ঘরে সে বিছানা পাতে।

যতীন প্রশ্ন করে, কেন ? সে মুখে কিছু বলে না, ঘরে ঢুকিয়া খিল তুলিয়া দিয়া সমস্ত রাত্রি জবাবটা সুস্পষ্ট করিয়া রাখে। যতীন রুদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বলে : রিভলবারে গুলি ভরে রাখলাম। কাল সকালে ঘর থেকে বেরুলেই তোমাকে গুলি করব।

বলে : এ অপমান সহ্য হয় না শ্বেতা ! তুমি আমাকে এমন করে ঘেন্না করবে ?

এ ঘরে নিঃসঙ্গ পবিত্যক্ত যতীন জাগিয়া থাকে, ও ঘরে মহাশ্বেতা শূন্য বিছানায় নিস্পন্দ অনুসন্ধানে জীবনের অবলম্বন খোঁজে। কত কথা সে ভাবিবার চেষ্টা করে কিন্তু ভাবিতে পারে না, কত কথা বুঝিবাব চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারে না ; সব গোলমাল হইয়া যায়। কুমারী জীবনের স্মৃতি একটা অচিন্তনীয় অনুভূতির মতো মস্তিষ্কের বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, বিবাহের পর যে চারটা বছর যতীন সুস্থ ছিল, সুবূপ ছিল, সে সময়েব কথাটা ভাবিতে আরম্ভ করা মাত্র মহাশ্বেতার চিন্তাশক্তি অসাড় হইয়া যায। জীবনের সেই আদিম নিষ্পাপ উৎসব হইতে সে একেবারে উপস্থিত হয় যতীনের গলিত দেহ ও বিকৃত জীবনকে কেন্দ্র কবা পচা ভাপসানো জীবনে, যেখানে একটি নবজাত শিশু, একটি পবিপুষ্ট বিস্ময়, জন্মিয়া মবিয়া যায়। বারবার জন্মিয়া বারবার মরিয়া যায়।

যতীনেব মনে যত আলো ছিল সব নিভিয়া গিয়াছে। গাঢ় অন্ধকারে তাহার মনে এককালীন হাস্যকর কত কুসংস্কারের যে জন্ম হইয়াছে, সংখ্যা হয় না। কয়েক দিন ভাবিযাই প্রত্যাদেশে তাহার অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে। দেবতা একদিন যার কাছে ছিল অলস কল্পনা, ধর্ম ছিল বার্ধক্যেব ক্ষতিপূরণ, জ্ঞান ছিল অনমনীয় যুক্তি, আজ সে আশা কবিতে আরম্ভ করিয়াছে দেবতার যদি দয়া হয়, হয়তো আবাব সুস্থ হইয়া ওঠার পথ দেবতাই তাহাকে বলিয়া দিবেন।

কিন্তু কোন দেবতা ? তারকেশ্বব, বৈদ্যনাথ, কামাখ্যা, কোথায তাহাব প্রত্যাদেশ আসিবে ?

যতীন নিজে ভাবিয়া ঠিক করিতে পাবে না। মহাশ্বেতাকে সে পবামর্শ করিতে ডাকে। কোথায় গিয়ে হত্যে দেওয়া ভালো শ্বেতা ?

মহাশ্বেতা সবচেয়ে দূরবর্তী একটি পীঠস্থানেব নাম স্মরণ করিবাব চেষ্টা কবিয়া বলে : কামাখ্যায় যাও।

আমি যাব ? যতীন স্তম্ভিত হইযা যায : এ অবস্থায আমি কী করে যাব ?

মহাশ্বেতা বলে : কে যাবে তবে ?

কেন তুমি যাবে। স্বামীব অসুখ হলে স্ত্রী গিয়েই হত্যে দেয, প্রত্যাদেশ নিয়ে আসে। মহাশ্বেতা বলে : আমি ? আমি গেলে প্রত্যাদেশ পাব না। ঠাকুব-দেবতায় আমার বিশ্বাস নেই।

বিশ্বাস নেই যতীনের অবিশ্বাস্য মনে হয়।

একফোঁটাও নয়। হত্যে দেবার কথা ভাবলে আমাব হাসি আসে।

যতীন রাগিযা ওঠে।

তা পাবে না ? হাসি তো পাবেই ! হাসি নিয়েই যে মেতে আছ। এদিকে স্বামী মরছে, ওদিকে আর একজনের সঙ্গে হাসির হর্‌রা চলছে। আমি কিছু বুঝি না ভেবেছ !

মহাশ্বেতা বলে : কার সঙ্গে হাসির হব্‌রা চলছে ?

তাই যদি জানব, তুমি তবে এখনও এ বাড়িতে আছ কী করে ? যতীন পচন-ধরা নাক দিয়া সশব্দে নিশ্বাস গ্রহণ করে, গলিত আঙুলগুলি মহাশ্বেতার চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া আর্তনাদের মতো বলিতে থাকে : ভেবো না, ভেবো না, তোমারও হবে ! আমার চেয়ে আরও ভয়ানক হবে। এত পাপ কারও সয় না !

হিংস্র ক্রোধের বশে যতীন আঙুলের ক্ষতগুলি মহাশ্বেতার হাতে জোরে জোরে ঘষিয়া দেয়। আগুন দিয়া আগুন ধরানোর মতো সংক্রামক ব্যাধিটাকে সে যেন মহাশ্বেতার দেহে চালান করিয়া দিয়াছে এমনি একটা উগ্র আনন্দে অভিভূত হইয়া বলে : ধরল বলে, তোমাকেও ধরল বলে ! আমাকে ঘেন্না করার শাস্তি তোমার জুটল বলে। আর দেরি নেই।

এই অভিশাপ দেওয়ার পর মহাশ্বেতা যতীনকে এক রকম ত্যাগ করিল। সেবা সে প্রায় বন্ধ করিয়া আনিয়াছিল, এবার কাছে আসাও কমাইয়া দিল। সকালে একবার যদি কিছুক্ষণের জন্য আসিয়া যতীনকে সে দেখিয়া যায়, সারাদিন আর তাহার দেখা মেলে না। রাত্রে শোয়ার আগে একবার শুধু উঁকি দিয়া যায়। মুহূর্তের জন্য। পরিহাসের মতো।

যতীন খেপিয়া উঠিয়া মহাশ্বেতাকে শেষ পর্যন্ত বাড়ি হইতেই তাড়াইয়া দিত কী না বলা যায় না, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে সে নিজেই প্রত্যাদেশ আনিতে কামাখ্যায় চলিয়া গেল। যতীনের পীড়াপীড়িতে, ক্রুদ্ধ আদেশ ও সকরুণ মিনতিতে, মহাশ্বেতা সঙ্গে যাইতে রাজি হইয়াছিল, কিন্তু যাত্রা করার সময় তাহাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। যতীনের এক পিসি বলিল : মহাশ্বেতা কালীঘাটে গিযাছে। যতীনের চাকরকে সঙ্গে করিয়া যতীনের মোটরে, এই খানিক আগে মহাশ্বেতা কালীঘাটে চলিয়া গিয়াছে।

গোড়াপত্তন কালীঘাটেই হইযাছিল। মহাশ্বেতা যে যতীনকে বলিয়াছিল, ঠাকুর দেবতায় সে বিশ্বাস করে না এ কথাটা তাহার সত্য নয় ! সত্য হইলে যতীনের কামাখ্যা যাওয়ার দিন অত টাকা খরচ করিয়া সে পূজা দিত না, একধামা পয়সা ভিখারিদের বিতরণ করিত না।

এ কাজটা মহাশ্বেতা নিজেই করিয়াছিল। মন্দিরে ঢুকিবার পথে দুদিকে সারি দিয়া ভিখারি বসিয়াছিল। চাকর আর মোটরচালকের হাতে পয়সার ধামাটা তুলিয়া দিয়া আগে আগে চলিতে চলিতে মহাশ্বেতা দুদিকে মুঠা মুঠা পয়সা বিলাইয়াছিল। সে হইয়াছিল এক মহাসমারোহের ব্যাপার। শুধু ভিখারি নয়, ভিক্ষা দেওয়া দেখিতে রাস্তায় লোক জমা হইয়া গিয়াছিল অনেক।

ভিখারিদের মধ্যে কুষ্ঠরোগীও ছিল বইকী ! হাতে পায়ে কারও ছিল চট বাঁধা, কারও নাক গলিয়া গিয়া একটা গহ্বরে পরিণত হইযাছিল, কারও সমস্ত মুখের ফাঁপানো মাংস বড়ো বড়ো গোটায় ভরিয়াছিল, কারও কবজির কাছ হইতে দুটি হাত বহুকাল আগে খসিয়া গিয়া ঘা শুকাইয়া হইযাছিল মসৃণ। এদের পয়সা দিবার সময় মহাশ্বেতার একটি মুষ্টিতে কুলায় নাই ! এদের দিয়া এক ধামা পয়সায় কুলানো যায় নাই।

বাড়ি ফিরিয়া সেই দিন বিকালে মহাশ্বেতা কুষ্ঠাশ্রম খুলিয়াছে।

চাকর সেদিন পথ হইতে পাঁচজন ভিখারিকে ধরিয়া আনিয়াছিল। তাদের মধ্যে দুজন হাজার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের লোভেও এখানে থাকিতে রাজি হয় নাই। বাকি তিনজন সেই হইতে আরাম করিয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে। খায়-দায়-ঘুমায় আর মহাশ্বেতাকে ক্ষণে ক্ষণে ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করায়, আর তাদের কাজ নাই। সাত দিনের মধ্যে মহাশ্বেতার আশ্রমবাসীদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে একুশ জন।

আত্মীয়স্বজন সকলকে সে ভিন্ন বাড়িতে স্থানান্তরিত করিয়াছে। মাহিনা-করা কয়েক জন চাকর দাসী মেথর আর বাড়ি-ভরা কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে সে এখানে বাস করে একা। সকালে বিকালে এদের দেখিয়া যাওয়ার জন্য সে একজন ডাক্তার ঠিক করিয়াছে। দুজন অভিজ্ঞ নার্সের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।

ডাক্তার বলিয়াছে : এখানে আপনাকে কুষ্ঠাশ্রম খুলতে দেবে না।

কেন ?

শহরের মাঝখানে এ ধরনের আশ্রম কি খুলতে দেয় ?

মহাশ্বেতা আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছে : ওরা তো শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি বাড়ির মধ্যে ভরে বিপদ আরও কমিয়েছি।

ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিয়াছে : তবু দেবে না। তবে কী জানেন, এ সব হল সৎকাজ। সহজে কেউ বাধা দিতে চায় না। পাড়ার লোকে নালিশ করবে, সে নালিশের তদ্‌বির হবে, তারপর

আপনার কাছে নোটিশ আসবে। তখনও দুমাস আপনি চুপ করে থাকতে পারবেন। ফের আর একটা নোটিশ এলে তখন ধীরে সুস্থে সরিয়ে নেবাব ব্যবস্থা করবেন।

ডাক্তারেব এত কথার জবাবে মহাশ্বেতা বলিয়াছে : কুষ্ঠ কী ভয়ানক রোগ ডাক্তারবাবু !

ডাক্তাব তাহাব বিপুল অভিজ্ঞতায় আবার অল্প একটু হাসিয়াছে · এ রকম কত রোগ সংসারে আছে ! মানুষকে একেবারে নষ্ট করে দেয়, বংশের রক্তধারার সঙ্গে পুরুষানুক্রমে মিশে থাকে এমন রোগ একটা নয়, মিসেস দত্ত।

বংশ ! পুরুষানুক্রম ! কে জানে ডাক্তাব কতখানি টের পাইযাছিল ? যতীন শুধু সন্দেহ করিয়া খেপিয়া উঠিয়াছিল, ভাবিয়াছিল তাকেই মহাশ্বেতা বঞ্চনা কবিযাছে। ডাক্তাব জানিয়াও নির্বিকার হইয়া আছে। হয়তো মনে মনে ডাক্তার সমর্থনও করে। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে একটু পার্থক্য থাকিবেই।

নার্স ঠিক হওয়ার আগেই যতীন ফিবিয়া আসিল। সে ঠিক প্রত্যাদেশ পায নাই, কেমন একটা স্বপ্ন দেখিয়াছে যে কুণ্ড হইতে একটি সাদা ফুল আনিয়া মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে সে নীরোগ হইতে পারে। বাড়ি ফেরার আগেই যতীন মাদুলি ধাবণ করিয়াছে।

বাড়ির ব্যাপার দেখিয়া তাহার চমক লাগিযা গেল।

এ সব কী করেছ শ্বেতা ?

মহাশ্বেতার মন অনেকটা শান্ত হইয়া আসায বুদ্ধিটাও তাহার বেশ পবিষ্কার ছিল। সে বলিল : তোমার কল্যাণের জন্যই কবেছি। কালীঘাটে একজন সন্ন্যাসীর দেখা পেলাম, অমন তেজালো সন্ন্যাসী আমি কখনও দেখিনি। চোখ যেন আগুনের মতো আলো দিচ্ছে। তিনি বললেন : কুষ্ঠাশ্রম কর, তোর স্বামী ভালো হয়ে যাবে।

মাদুলি ধাবণের প্রভাব তখনও যতীনের মনে প্রবল হইয়া আছে। সে অভিভূত হইয়া বলিল : সত্যি ?

তোমার কাছে মিছে বলছি ? তুমি সে সন্ন্যাসীকে দ্যাখোনি। দেখলে তোমাব শরীবে কাঁটা দিয়ে উঠত। আমাকে কথাগুলি বলে কোনদিকে যে চলে গেলেন কিছুই বুঝতে পারলাম না।

যতীন আপশোশ কবিয়া বলিল : একটা ওষুধ-টষুধ যদি চেয়ে নিতে শ্বেতা !

বাড়ির যে অংশ যতীনেব ছিল সে আবার সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ কবিল। মাদুলি আর সন্ন্যাসীর ভরসায় মেজাজটা সে অনেকখানি নরম করিয়াই রাখিল।

কিন্তু মহাশ্বেতা কাছে ভেড়ে না। কামাখ্যা যাওয়ার আগে যেমন ছিল তেমনই দূরে দূবে থাকে ! কুষ্ঠাশ্রম লইয়া সে মাতিয়া উঠিয়াছে। একুশটি অধিবাসীব সংখ্যা পঁচিশে পৌঁছিলে তার যেন আনন্দেব সীমা থাকে না। দিবাবাত্রি সে পথে-কুড়ানো এই বিকৃত গলিত মানুষগুলির সেবা করে। মায়ের মতো তাহার মমতা, মায়ের মতো তাহার সেবা। এই পঁচিশটি অসুস্থ পচা পাঁজব দিয়া যেন তাহার বুক তৈরি হইয়াছে, তাব হৃদয়ের সবটুকু উষ্ণতা ওরা পায়।

যতীন একদিন কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল : তুমি খালি ওদের সেবা কর শ্বেতা। আমার দিকে তাকিয়েও দেখ না।

মহাশ্বেতা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু বলিতে পারিল না।

সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালোবাসিত, ঘৃণা করিত পথের কুষ্ঠরোগীদের। স্বামীকে আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠরোগাক্রান্তগুলিকে ভালোবাসে।

এতে জটিল মনোবিজ্ঞান নাই। সহজ বুদ্ধির অনায়াসবোধ্য কথা।

মহাশ্বেতা দেবী তো নয় ? সে শুধু কুষ্ঠরোগীর বউ।

পূজারির বউ

বাহিরে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে অবলুপ্ত পৃথিবীকে এত রাত্রে শুধু কয়েকটি রহস্যময় শব্দের সাহায্যে চিনিতে হয়। কাদম্বিনীর চোখে ঘুম নাই। বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কান পাতিয়া সে রাত্রির প্রত্যেকটি দুর্বোধ্য ভাষা শুনিতে থাকে।

ঝিঁঝির শব্দ এমনই একটানা বিরামহীন যে থাকিয়া থাকিয়া আপনা হইতে তাহার শুনিবার অনুভূতি বিরাম নেয়। চেষ্টা করিয়াও আর যেন ডাক শোনা যায় না। ঘরের পিছনে নিমগাছটার পাতায় সহসা বাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যায়, শুকনো আমপাতাগুলি উঠানের এক পাশ হইতে অন্য পাশে উড়িয়া যাওয়ার সময় যেন তাহারা প্রতিধ্বনি করে। দূরে শিয়াল ডাকিয়া ওঠে। তাদের আর্তকণ্ঠ নীরব হইবার পর বহুক্ষণ অবধি গ্রামের কুকুরগুলির চিৎকার থামিতে চায় না। কাছেই কোথায় একটা প্যাঁচা বীভৎস চিৎকারে রাত্রিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য কদর্য করিয়া তোলে। খানিক পরে অদূরে বড়ো রাস্তায় গোরুর গাড়ির চাকার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ ওঠে, গোরুর গলার বাঁধা ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যায়।

এবং অতি অকস্মাৎ রাত্রির এইসব নিজস্ব শব্দকে ছাপাইয়া উঠিয়া, কাদম্বিনীর সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ তুলিয়া দিয়া, প্রতিবেশী রমেশ হাজরার কচি ছেলেটা কাঁদিয়া ওঠে।

কাদম্বিনী থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে, তার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে, সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া যায়। রমেশ হাজরার বউ ছেলেমানুষ, তার ঘুম ভাঙিতে দেরি হয়। ছেলেটা অনেকক্ষণ কাঁদে। শুনিতে শুনিতে কাদম্বিনীর মাথার মধ্যে তার চেতনা নির্ভরহীন হইয়া যায়। একটা অদ্ভুত সমতলতার অনুভূতি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়া তাকে একপাশে ঠলাইয়া ফেলিয়া দিতে চায়। কাদম্বিনী সভয়ে চৌকির প্রান্ত দুই হাতে প্রাণপণে চাপিয়া ধরে।

প্রকৃতপক্ষে রমেশ হাজরার ছেলেটার কান্না শুনিবার আশঙ্কাতেই বাসন্তী অমাবস্যার রাত্রিটি কাদম্বিনীর কাছে বিনিদ্র ও শব্দময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। রমেশের বউ ছেলে হওয়ার সময় এখানে ছিল না। বাপের বাড়ি গিয়াছিল। মাসখানেক আগে চার মাসের ছেলে কোলে সে ফিরিয়া আসিয়াছে। তার কয়েকদিন পরেই তার ছেলের কান্না কাদম্বিনী গভীর রাত্রে প্রথম শুনিতে পায়।

আপনার অসহ্য মনোবেদনা নিয়া কাদম্বিনী সেদিন ঘরের বাহিরে রোয়াকে মাদুর পাতিয়া নিঝুম হইয়া পড়িয়াছিল। গুরুপদ অনেক বলিয়াও তাহাকে ঘরের মধ্যে নিতে পারে নাই। শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া খানিকক্ষণ তামাক টানিয়া কাদম্বিনীর পাশে বসিয়া ঝিমাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

এমন সময় রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে মাটির প্রাচীরের ও পাশে শোনা গিয়াছিল ক্ষীণকণ্ঠের কান্না।

কাদম্বিনী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আতঙ্কে উত্তেজনায় দিশেহারার মতো স্বামীকে সজোরে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

ওগো, খোকা কাঁদছে। শুনছ ? ওগো তুমি শুনছ !

গুরুপদ বলিয়াছিল, রমেশের ছেলে কাঁদছে কাদু। অমন কোরো না। ভয় কী।

কাদম্বিনী অনেকক্ষণ তার কথা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। বিস্ফারিত চোখে দু-বাড়ির মাঝখানে প্রাচীরটার পাশে আনারস গাছের ঝোপের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বারবার শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিল, ওগো না, আমার খোকা কাঁদছে। আমি স্পষ্ট শুনছি আমার খোকার গলা,—ওই ঝোপের মধ্যে কাঁদছে। ওই শোনো, শুনছ ? আমার খোকার গলা নয় ?

তারপর হঠাৎ উন্মাদিনীর মতো উঠানে নামিয়া গিয়া সে আনারসের ঝোপটার দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল। গুরুপদ তাকে ধরিয়া রাখে। সহজে কী তাকে আটকানো গিয়াছিল। নিরুদ্দেশের দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া খোকা তার উঠানের পাশে ঝোপের মধ্যে কান্না আরম্ভ করিয়াছে মনে করিয়া শোকাতুরা শীর্ণা মেয়েটির দেহে কোথা হইতে বিস্ময়কর শক্তির সঞ্চার হইযাছিল কে জানে।

ছাড়ো, নিয়ে আসি। ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দাও। নদীর ধার থেকে খোকা আমার এতদূর এগিয়ে এসেছে, এইটুকু ও তো আসতে পারবে না।

ছাড়া পাওয়ার জন্য বেশিক্ষণ স্বামীর সঙ্গে সে যুঝিতে পারে নাই। সহসা মূর্ছিতা হইয়া গুরুপদর বুকে এলাইয়া পড়িয়াছিল। সেই তার প্রথম মূর্ছা। শেষ রাত্রির আগে সে মূর্ছা আর ভাঙে নাই।

রমেশ হাজরার বউকেই ছেলে কোলে উঠিয়া আসিয়া কাদম্বিনীর সেবা করিতে হইয়াছিল। অচৈতন্য স্ত্রীর শিয়রের কাছে বিছানায় পা গুটাইয়া বসিয়া ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে শোয়াইয়া তাকে হাতের চুড়ি বাজাইয়া পাখা নাড়িতে দেখিযা গুরুপদর কী মনে হইয়াছিল বলা কঠিন। ঘরের আলোটা যে শুধু তার চোখেই নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল এটা ঠিক।

গ্রামের জমিদার মহীপতি বসাক। গুরুপদ তার পিতার আমলে প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরের পূজারি। মন্দিরে রাধাশ্যামের মূর্তি আছে। মূর্তির সৌন্দর্য অপরূপ। নিকষ কালো পাথর কুঁদিয়া এ মিলন মূর্তি কোন শিল্পী গড়িয়াছিল আজ তাহা জানা যায় না। কিন্তু তার প্রতিভা বিগ্রহের মধ্যে আজও বাঁচিয়া আছে। দিনের পর দিন পাথরের দেবতা গুরুপদর চিত্তহরণ করিতেছিল। মন্দিরে যথারীতি পূজা ও আরতি করিয়া, ভোগ দিয়া তার সাধ মিটিত না। মন্দিরের দুয়ার বন্ধ করিয়া যখন তার বাড়ি যাওয়ার অবকাশ, টাকার বিনিময়ে দেবসেবার সাময়িক বিরতি, তখনও অনেক সময় সে বহুক্ষণ ধরিয়া বিগ্রহের সামনে চুপচাপ বসিয়া থাকিত। হৃদয়ানন্দের বিনিময়ে দেবতাকে বিনামন্ত্রে বিনা গন্ধ-পুষ্পে বিনা ধূপ-চন্দনে পূজা করিত।

পরদিন মন্দিরে যাইতে তার দেরি হইয়া গিযাছিল। মহীপতির বিধবা বোন ভাবিনী একটু পূজা-পাগলা। জাতিতে তাঁতিনি বলিয়া বিগ্রহের কাছে ঘেঁষিবার অধিকার তার ছিল না। মন্দিরের একটা চাবি কিন্তু সে আঁচলে বাঁধিযা নিযা বেড়াইত। বিগ্রহকে সেও বোধ হয় ভালোবাসিযাছিল। কাছে না যাইতে পাক মধ্যে মধ্যে মন্দিরের দুযার খুলিযা চুরি করি' দূর হইতে রাধাশ্যামকে দেখিবার সাধ সে দমন করিতে পারিত না। ভোরে মন্দিরে আসিযা গুরুপদর প্রত্যাশায় বসিযা থাকিতে থাকিতে সেদিন সে এমনই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইযা উঠিযাছিল যে দেরি হওযায় কৈফিযতটা আগাগোড়া শুনিয়াও প্রথমে তার একবিন্দু সহানুভূতি হয নাই।

পূজা শেষ হইলে কিন্তু বলিযাছিল, কথাটা ভালো নয় ঠাকুরমশায়, দুটো শোক মনে পুষে রেখেছে, তারপর ভারী মাসে মূর্ছাটা হল। শুনে থেকে মনটা কেমন করছে। আপনি এক কাজ করুন, কাদুদিদির নামে সংকল্প করে দুটো ফুল দেবতার পায়ে ছুঁইয়ে সঙ্গে নে যান। কাদুদিদির কপালে ঠেকিয়ে তুলে রাখবেন।

কাদুর কোল শূন্য হইয়া যাওযা বন্ধ করার জন্য, কাদুকে শান্তি দিবার জন্য, দেবতার সাহায্য গুরুপদ অনেকবারই চাহিয়াছিল। দেবতা তাহার কামনা পূর্ণ করেন নাই। তবু, ভাবিনীর কথায় গুরুপদ ব্যাকুল আগ্রহে পুনরায় মনের কামনা নিবেদন করিয়া দেবতার পায়ে ফুল ছোঁয়াইয়া নিয়া গিয়াছিল।

মনে মনে কোনো দেবতাকেই কাদম্বিনী আর ভালোবাসিত না। ঘর-খালি-করা, কোল-খালি-করা, বুক-খালি-করা শোক যাঁরা দেন তাদের কাদম্বিনী ভালোবাসিবে কেমন করিয়া ? তবু, ফুল পাইয়া তাহার উপকার কম হয় নাই। বিকালের দিকে উঠিয়া সে গুরুপদকে খাইতে দিয়াছিল, ও পাড়ার কানুর মার সঙ্গে আস্তে আস্তে অনেকক্ষণ গল্প করিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় গা ধুইয়া কিছুক্ষণ

আহ্নিক করিতেও বসিয়াছিল। রাত্রে সকাল সকাল শুইয়া সেই যে ঘুমাইয়াছিল, সমস্ত রাত্রি একবারও তার ঘুম ভাঙে নাই।

তারপর কয়েকদিন তার নিস্তেজ শান্ত ভাবটি বজায় ছিল। পাশের গ্রামে গুরুপদর এক মাসি থাকিত, গুরুপদ নিজে গিয়া মাসিকে সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিল। দু-বেলা রান্নার কাজকর্ম মাসিই করিত, কিন্তু গো-সেবা, স্বামী-সেবা আর ঘর দুয়ার সাফ করার কাজে কাদম্বিনী তাকে হাত দিতে দিত না। মাঝে মাঝে পুকুরঘাটে গিযা সে বাসন মাজিত। কলসি ভরিয়া জলও আনিত। বাগান দিয়া যাওয়া আসার সময় চকিত সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দুপাশে চাহিয়া দেখিত। তার যেন মনে হইত বাড়ির আনাচেকানাচে, বাগানের গাছের আড়ালে তার হারানো ছেলে দুটিকে সে হঠাৎ এক সময় দেখিতে পাইবে।

মাসি বলিত— ভারী কাজ নাই বা করলে বউমা ? পোড়া গতর নিয়ে আমি তবে রয়েছি কী জন্যে ! টুকিটাকি কাজ করতে চাও করো আর নয় বসে বসে কাঁথা সেলাই করে যাও। কম কাঁথা চাই কি ! শেষে দেখো কাঁথার জন্যে কত ভুগতে হয়। ক্ষেমির মেয়ে হবার আগে ওকে কত বললাম, বললাম, ও ক্ষেমি, শুযে বসে দিন কাটাসনে মা, এই বেলা যখানা পারিস সেলাই করে নে। তা মেয়ে কথা শুনলে না,—ওমা অমন হু হু করে কেঁদে উঠলে কেন বউমা ? কেঁদো না বাছা, কেঁদো না, কাঁদতে নেই। অমঙ্গল হয়।

কাদম্বিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল, কাঁথা দিয়ে কী হবে মাসিমা ? কাঁথায় কে শোবে ? কাঁথা যে আমার একবারও পুরোনো হতে পেল না মাসিমা ?

মাসি অবশ্য তাকে যথারীতি আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়াছিল, কিন্তু কাদম্বিনীর আশ্বাস পাওযার অবস্থা নয়। চোখের সামনে সূর্য ওঠে, চোখের সামনে অস্ত যায়। জগতের সর্বোত্তম বিষয় সূর্যের উদয়াস্তে মানুষ বিশ্বাস করে। দু-দুবার কাদম্বিনীর জীবনের সমস্ত অবলম্বন তারই মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিয়াছে, আসিবার সম্ভাবনা পার হইযা যাইবার পর, অনেক তৃষ্ণাতুর দিবারাত্রি যাপনের শেষে, অকালে। দুবারই তার চোখের সামনে জীবনের আনন্দ তার চোখের পলকে অস্ত গিয়াছে। উদয়াস্তের এই একত্র সমাবেশেই কাদম্বিনী বিশ্বাস করে। সে বুঝিয়াছে ছেলে তার বাঁচিবে না। ছেলের জন্যে তপস্যা করিয়া অসময়ে সে মাতৃত্বের বর পাইয়াছে। তার মাতৃত্ব আসিবে, সন্তান থাকিবে না, এ কী আর কাদম্বিনীর বুঝিতে বাকি আছে।

তারপর এক সময় রমেশের ছেলের একটানা কান্নার মাঝে মাঝে বিরাম পড়িতে লাগিল। খানিক পরে কান্না একেবারেই থামিয়া গেল। এতক্ষণে তার মায়ের ঘুম ভাঙিযাছে।

কাদম্বিনীর জগতে আর লেশমাত্র শব্দ রহিল না। আপনার চিন্তার মধ্যে ডুবিয়া যাওযার স্তব্ধতা তার চারিদিকে ঘেরিয়া আসিল। মধ্যে মধ্যে কেবল গুরুপদর নিশ্বাস ফেলিবার শব্দ তাকে ক্ষণিকের জন্য সচেতন করিয়া দিতে লাগিল।

বসন্তকালের জোরালো বাতাস এক জানালা দিয়া ঘরে ঢুকিয়া অন্য জানালা দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। কাদম্বিনীর মনে হইল, অনেকক্ষণ ধরিয়া তার শীত করিতেছিল। আঁচলটা সে ভালো করিয়া গায়ে জড়াইয়া নিল। রমেশ হাজরার ছেলে আজ রাত্রে আবার কখন কাঁদিয়া উঠিবে ঠিক নাই। কয়েকদিন আগে প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়াও ছেলেটাকে কাদম্বিনী মধ্যরাত্রে একবারের বেশি কাঁদিতে শোনে নাই। তবু প্রতি মুহূর্তেই কাদম্বিনী তার কান্না শুনিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ঘুমের ঘোরে গুরুপদ পাশ ফিরিয়া শুইল। বাহিরে নিমগাছের ডালে প্যাঁচাটা আবার কর্কশ স্বরে ডাকিয়া উঠিল। হঠাৎ স্বামীর উপর কাদম্বিনীর অভিমানের সীমা রহিল না। দুটি সন্তানকে বিসর্জন দিয়া প্রতিরাত্রে মানুষ কেমন করিয়া এমন শান্তভাবে ঘুমাইতে পারে সে ভাবিয়া পাইল না। তার মনে হইল, গুরুপদ হয়তো কোনোদিন দুঃস্বপ্নও দেখে না। হয়তো ওর ঘুমের দেশেও তার খোকারা

আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যও উঁকি দিয়া যায় নাই। হয়তো সোনার জ্যোতি ভরা সুখের স্বপ্ন ওর চোখে মুখে হাসি ফুটাইয়া রাখিয়াছে।

কাদম্বিনীব বুকের মধ্যে জ্বালা করিতে লাগিল। এতকাল স্বামীকে সে দেবতার মতোই পূজা করিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেকটি সজ্ঞান মুহূর্তে স্বামীব সুখসুবিধার চিন্তায় ব্যয় কবিয়াছে। স্বামীর মুখের দিকে চাহিযাই তার দুর্বিষহ মর্মবেদনা যেন নিমেষে লঘু হইয়া আসিয়াছে। ধার্মিক সংযত দেবপূজক স্বামীব ভালোবাসা পাইয়া চিবদিন সে নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছে। তার বারো বৎসরব্যাপী বিবাহিত জীবনে একদিনেব জন্য স্বামীব প্রতি সমালোচনাব ভাব তার মনে জাগে নাই। তবু আজ কাদম্বিনী সহসা তাব প্রতি তীব্র বিদ্বেষ অনুভব কবিল। তার কণ্টকশয্যায় সুখনিদ্রায় নিদ্রিত মানুষটার উপর অশ্রদ্ধায় তাব মন পূর্ণ হইয়া গেল।

তার এই সংস্কাব-বিবুদ্ধ অভূতপূর্ব মানসিক বিদ্রোহকে বাধা দিবার কোনো চেষ্টাই সে করিল না। দিনেব আলোয় সুস্থ মনে যে চিন্তাব ছায়াপাত হইলে সে শিহরিয়া উঠিত, এখন বাত্রির অন্ধকারে সেই চিন্তাকেই তাব উদ্‌বেগমথিত মন সযত্নে পোষণ করিয়া রাখিল। গুবুপদকে তার মনে হইল নির্মম, স্বার্থপব। মনে হইল, যে দুঃখ ভগবানেব দান বলিয়া এতদিন সে জানিযা রাখিযাছিল ভগবান তাহা দেন নাই, গুবুপদই তাব জীবনে বারবাব এই সর্বনাশ আনিযা দিযাছে। দুবাব তাকে শেলাঘাত কবিযাও গুবুপদব সাধ মিটে নাই, পুনবায় সেই একই অভিনয়ের আয়োজন কবিযাছে।

শয্যা ছাড়িয়া কাদম্বিনী মেঝেতে নামিযা গেল। দুহাতেব কনুই মেঝেতে স্থাপন কবিয়া করতলে মুখ বাখিয়া সে যেন একটা শাবীবিক যন্ত্রণাই সহ্য কবিবাব চেষ্টা কবিতে লাগিল। এইখানে, এই কঠিন মেঝের উপবে বিছানা পাতিয়া তাব ছেলে দুটিকে সে শোয়াইযা রাখিত, চৌকিতে গুবুপদ করিত শাস্ত্রপাঠ। কাজে তার মন বসিত না, দশ মিনিট পবপর ঘুমন্ত ছেলেকে না দেখিযা গিয়া সে স্থির থাকিতে পাবিত না, ঘুম ভাঙিয়া কখন ছেলে তাব কাঁদিয়া ওঠে শুনিবার জন্য সাবাক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। শাস্ত্র পাঠান্তে গুবুপদ যাইত মন্দিবে। মন্দির হইতে ফিরিয়া বমেশ হাজরাব সঙ্গে বসিত দাবা অনেক বাত অবধি হয় মন্দিরে বসিয়া থাকিযা নয কাবও বাড়ি আড্ডা দিযা বাড়ি আসিত। তার ছেলের প্রাপ্য সময ব্যয কবিযা যে খাদ্য সে প্রস্তুত করিয়া রাখিত তাই আহার করিয়া এমনই নিশ্চিন্ত গভীব নিদ্রায় বাত কাটাইযা দিত।

তাব ছেলে মবিযা গেলে তাকে সান্ত্বনা দিত গুবুপদ। নিজের দু-ফোঁটা লোক-দেখানো চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া তাকে বুঝাইত, উপদেশ দিত, তাব চোখেব জলও মুছিযা দিবার চেষ্টা কবিত। ছেলেব মবণে এতটুকু দুঃখ হইলে এ কী গুবুপদ পারিত ?

এই স্মৃতিই কাদম্বিনীব চিত্তকে দহন করিতে লাগিল সবচেযে বেশি। তার মতো তাব স্বামীও যদি পুত্রশোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিত, আজ যদি সে স্বামীব শোকাতুর মূর্তি কল্পনায় আনিতে পারিত, মনেব জ্বালা বোধ হয তার অনেকখানি জুড়াইয়া যাইত। কিন্তু সন্তানকে নদীতীবে বিসর্জন দিযা আসিবাব পবেও গুবুপদকে বাবেকেব তবে আত্মহারা হইতে দেখিয়াছিল বলিয়া কাদম্বিনী স্মরণ করিতে পাবিল না। তাব মনেব মধ্যে গুরুপদ মাযামমতাহীন অত্যাচারীর রূপ গ্রহণ করিয়া রহিল।

কাদম্বিনী ধীরে ধীবে উঠিযা বসিল। গুরুপদর ঘুমন্ত মুখখানি একবার দেখিবার ইচ্ছা সে দমন করিতে পারিতেছিল না। কুলুঙ্গির উপব দিয়াশলাই ছিল। কাদম্বিনী প্রদীপ জ্বালিল।

আলো প্রথমে তার চোখে সহিল না। দুচোখ টনটন করিয়া উঠিল। সে চোখ বন্ধ করিয়া দিল। বাতাসে প্রদীপ নিভিযা যাওযাব উপক্রম করিতেছিল। কাদম্বিনীর রুদ্ধ চোখের পাতায় আলোর রক্তিম সংবাদ এমনই একটা বিরক্তিকর চাঞ্চল্য হইয়া রহিল যে, তার মনের জ্বালা আরও বাড়িয়া গেল। চোখ মেলিয়া স্বামীর বারো বছরের দেখা মুখে এই আলোতে যে কী দেখিতে কী দেখিবে ভাবিয়া তার একটু ভয়ও যেন করিতে লাগিল।

চোখ মেলিয়া চাহিবার পরেও কিছুক্ষণ কাদম্বিনীর এ ভয় কাটিয়া গেল না। ঘরের চারিদিকে সে তাকাইয়া দেখিল, কিন্তু যার মুখ দেখিবার জন্য প্রদীপ জ্বালিয়াছিল তার দিকে সহসা দৃষ্টিপাত করিতে পারিল না। ঘরের কোণে কাঠের সিন্দুকটার উপর কাদম্বিনী ছেলেকে দুধ খাওয়াইবার পিতলের ঝিনুকটি তুলিয়া রাখিয়াছিল। ব্যবহারের অভাবে ঝিনুকটি মলিন হইয়া গিয়াছে। শোকাচ্ছন্ন এই জড় বস্তুটিকে আজ যেন কাদম্বিনী প্রথম আবিষ্কার করিল এমনিভাবে অনেকক্ষণ সে ঝিনুকটির দিকে চাহিয়া রহিল। তার বুকের মধ্যে স্বামীর বিরুদ্ধে মর্মাহত অভিযোগ আবার যেন নতুন করিয়া উথলিয়া উঠিল। গুরুপদ এমনই পাষাণ যে ওই ঝিনুকটি ছাড়া তার খোকাদের একটি জিনিস ঘরে রাখিতে দেয় নাই। সে পাগলামি করে বলিয়া, খোকার কাঁথা, খোকার বিছানা-বালিশ বুকে চাপিয়া ভগবানের কাছে তারস্বরে মৃত্যু প্রার্থনা করে বলিয়া, সব গুরুপদ নদীতে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছে।

দুটি আরক্ত চোখে একটা অশুভ জ্যোতি নিয়া প্রদীপ উঁচু করিয়া ধরিয়া কাদম্বিনী সমালোচক শত্রুর মতো গুরুপদর মুখের দিকে চাহিয়া স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়া রহিল। স্বামীর মুখ সে দেখিল না, দেখিল শুধু আপনার দৃষ্টির বিকার। তার মনে হইল, ঘুমন্ত মানুষটার মুখে রেখায় রেখায় তার স্বার্থপর অত্যাচারী প্রকৃতি রূপ নিয়াছে। তাকে নিয়া খেলা করিবার কৌতুককর সাধ মুখের ভাবে সুস্পষ্ট ফুটিয়া আছে।

কাদম্বিনীর হাত হইতে প্রদীপটা পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল। প্রদীপের তেল চলকাইয়া তার হাত বাহিয়া বাহুমূল পর্যন্ত গড়াইয়া আসিল। স্বামীর মুখে আপনার বিভ্রান্ত চিত্তের আবিষ্কার তাহাকে মরণাধিক যন্ত্রণা দিতেছিল, তবু সে তেমনইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পৃথিবীতে তার বাঁচিয়া থাকার একমাত্র অবলম্বনকে অন্ধ আবেগের সঙ্গে ভাঙিয়া দিতে লাগিল।

বুঝিতে তাহার আর বাকি রহিল না যে, বাকি জীবনটা তাহার এমনিভাবে কাটিবে। এক মাসের মধ্যে শূন্য কোল তাহার আবার ভরিয়া উঠিবে, ছয় মাসের মধ্যে কোল খালি করিয়া ছেলেকে তাহার গুরুপদ নদীতীরে রাখিয়া আসিবে। মেঝেতে লুটাইয়া মনের সাধে ধুলা মাখিয়া কাঁদিবার অবসরও সে পাইবে না। তার চোখ মুছাইয়া তার গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া গুরুপদ তাকে এই শয্যায় তুলিয়া লইবে। নদীতীরে পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য তার খোকাদের প্রত্যাবর্তন সে রহিত করিতে পারিবে না।

কাদম্বিনীর মনে তার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনেব এই ভয়ংকর ছবি ক্রমে ক্রমে এমনই স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে গুরুপদর মুখ তার চোখের সম্মুখ হইতে মুছিয়া গেল। নিজেকে সে দেখিতে পাইল এই ঘরের মৃত্যুশীতল আবহাওয়ায় স্বামীর বক্ষলগ্না পুত্রহন্ত্রী রাক্ষসীর রূপে। শিশুর ক্রন্দনে মুখরিত রাত্রিতে সে এক একটি শিশুকে আহ্বান করিয়া আনিতেছে আর গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতেছে।

জীবনে আর তার কাজ নাই, উদ্দেশ্য নাই। কাদম্বিনী সরিয়া আসিয়া পিলসুজের উপর প্রদীপ নামাইয়া রাখিল। রমেশের ছেলের কান্নাকে উপলক্ষ করিয়া পরপর অনেকগুলি রাত্রি সে আপনার মৃত সন্তান দুটির সাহচর্যে কাটাইয়াছে, তবু বাঁচিবার একটা ক্ষীণ সাধ গতরাত্রিতেও তার মধ্যে ছিল। এবার ছেলেটি তার বাঁচিতেও পারে এ আশা সে একেবারে ছাড়িতে পারে নাই। আজ আর আশা করিবারও তার সাহস রহিল না। ছেলে হয়তো তার বাঁচিতেও পারে। ভগবানের রাজ্যে অনেক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আর ভাগ্য পরীক্ষার শক্তি কাদম্বিনী নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যদি না বাঁচে ? পলকে পলকে হারানোর ভয় বুকে পুষিয়া ছ-মাস এক বছর মানুষ করার পর যদি মরিয়া যায় ? বাঁচিয়া থাকিয়া কাদম্বিনী তাহা সহ্য করিবে কেমন করিয়া ?

সিন্দুকের উপর পিতলের ঝিনুকটির দিকে শেষবারের মতো তাকাইয়া লইয়া কাদম্বিনী ফুঁ দিয়া প্রদীপ নিভাইয়া দিল। গুরুপদর দিকে চাহিবার সাধ আর তাহার ছিল না। স্বামীর সান্নিধ্য তার কাছে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। তার বারো বছরের ঘরকন্না, তার বারো বছরের স্বামী-পূজা আর তার বারো

বছরের সুখ-দুঃখের স্মৃতি-ভরা এই নীড় অতিক্রম করিয়া সে যেন কোনো সুদূরতম অর্ধচেতনার দেশে চলিয়া গিয়াছিল, যেখানে আপনার অসহায় একাকিত্বের অনুভূতি ছাড়া মানুষের আর কোনো জ্ঞানই থাকে না। পূর্ণ চেতনার বাস্তব জগতে বহুবার পরিত্যক্ত ইচ্ছায় মানুষ যেখানে চালিত হয়।

মন্দিরের চাবি গুরুপদ কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখিত। চাবিটি হাতে নিয়া দুয়ার খুলিয়া কাদম্বিনী বাহিরে চলিয়া গেল। উঠানে দাঁড়াইয়া একবার শুধু সে ক্ষণিকের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর আগাইয়া গিয়া সদরের দরজা খুলিয়া রাস্তায় নামিয়া গেল।

এ পাড়ায় মানুষ ভিড় করিয়া নীড় বাঁধিয়াছে। রাস্তার দুপাশে স্তব্ধ নিঝুম গৃহগুলি একটির পর একটি অতিক্রম করিয়া যাওয়ার সময় কাদম্বিনীর কান্না আসিতে লাগিল। এই সব গৃহের অধিবাসী প্রত্যেকটি পরিবারকে সে চেনে। কোনো বাড়িতে তার মতো অভিশপ্ত একটি নারীকে খুঁজিয়া বাহির করা যাইবে না। পুত্রশোক এ পাড়ায় অজ্ঞাত নয়, হয়তো কোনো বাড়ির অন্ধকার কক্ষে পুত্রশোকাতুরা জননী এখন অশ্রুপাত করিতেছে। কিন্তু তার ছেলের মতো অজ্ঞাত কারণে, ঈশ্বরের দুর্বোধ্য অভিশাপে কার ছেলে আজ পর্যন্ত মরিয়া গিয়াছে ? গর্ভে সন্তান আসিলে ওদের মধ্যে তার মতো কোন অভাগিনী জানিতে পারিয়াছে, সুস্থ সবল সন্তান তাহার একদিন তারই কোলে সহসা শুকাইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিনের মধ্যে ধনুকের মতো বাঁকিয়া মরিয়া যাইবে ?

মন্দিরের সামনে প্রকাণ্ড দিঘি। দিঘির জলে অমাবস্যা রাত্রির উজ্জ্বলতর তারাগুলি ঝিকঝিক করিতেছে। মন্দিরের সোপানে দাঁড়াইয়া কাদম্বিনী কিছুক্ষণ অভিভূতের মতো দিঘির বিস্তারিত শান্তির দিকে চাহিয়া রহিল। তার মনে হইল, মরিবার মতো প্রয়োজন ছাড়া এ দিঘিকে যেন ব্যবহার করিতে নাই। অপরাধ হয়।

মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া কাদম্বিনী ভিতরে প্রবেশ করিল। মন্দিরের কোথায় কোন বস্তু রাখা হয় কিছুই তার অজানা ছিল না। অন্ধকারে অল্প একটু হাতড়াইযাই পিতলের সবচেয়ে বড়ো কলসিটি কাদম্বিনী আবিষ্কার করিতে পারিল।

কলসিতে জল ভরা ছিল। কাত করিয়া কাদম্বিনী জল ঢালিয়া ফেলিল। কলসি কাঁখে তুলিয়া আন্দাজে রাধাশ্যামের মূর্তির দিকে মুখ করিয়া সে মনে মনে বলিল, তুমি আমার দুটি ছেলে চুরি করেছ। আমি শুধু তোমার একটি কলসি নিলাম। তোমার ক্ষমা চাই না।

রাজার বউ

কুড়ি বছর বয়স হইতে যামিনী রানি।

যামিনীর স্বামী ভূপতির বাজ্য কিন্তু একটা বড়ো জমিদারি মাত্র। বছরে লাখ দেড়েক টাকাব বেশি আয় হয় না। ভূপতি রাজা শুধু উপাধির জোরে। যামিনীও সুতরাং অভিধান সম্মত আসল রাজার রানি নয়। উপাধির রানি। রাজার বউ।

ভূপতিরা মোটে তি- পুরুষের রাজা।

কলিকাতায় অনেকগুলি অপ্রশস্ত গলি আছে। তাদের একটার মধ্যে মাঝারি সাইজের দোতলা একটি লাল বাড়িতে ভবশঙ্কর রায় নামক এক ব্যক্তি মাসিক আড়াই শত টাকা উপার্জনে বৃহৎ পবিবারের ভরণপোষণ করিয়া বাস করে। সন্ধ্যাব পর বন্ধুদের তাসেব মজলিশে তার মুখে তার পূর্ব পুরুষদের প্রায় ভারতবর্ষেরই সমান একটি জমিদারির কথা শোনা যায়। গল্পের এই তাল জমিদাবির তিলটি ভূপতির বর্তমান সাম্রাজ্য।

ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল ভূপতির প্রপিতামহ মহীপতির আমলে। মহীপতি ছিল ভবশঙ্করেব শেষ জমিদার—পূর্বপুরুষের প্রধান নাযেব। নিজেকে সে বলিত দেওয়ান কিন্তু কর্তা ডাকিতেন নায়েব মশাই বলিয়া ! সেই রাগেই কিনা বলা যায় না তলে তলে কী ষড়যন্ত্রই যে মহীপতি করিল, জমিদাবি অর্ধেক গেল বিক্রি হইয়া আর অর্ধেক আসিল তাহার কবলে। ভূপতির পিতামহ যদুপতির আমলে বিক্রীত অর্ধেকটা আবার ফিরিয়া আসিল, জমিদাবির প্রচুর শ্রীবৃদ্ধি হইল এবং মবিবাব তিন বছব আগে সে হইয়া গেল রাজা যদুপতি রায় চৌধুরি (সরকার), অবন্তীপুর রাজ-এস্টেট।

তার ছেলে গণপতির শেষ বয়সে একটা সাধ জাগিল যে শুধু রাজা নয়, সে মহারাজ হইবে। বংশানুক্রমে অগ্রগতি প্রয়োজন এমনই একটা কর্তব্যবুদ্ধির প্রেরণা বোধ হয় তাহার আসিয়াছিল। জমিদারি হইতে তখন বেশ আয় হইত। মহারাজা হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় গণপতি এত টাকা ঢালিয়া দিয়া গেল যে তাহাতে জমিদারি কিনিলে ছেলেকে হয়তো সে রাজার উপযুক্ত একটা ছোটোখাটো রাজ্য দিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু বাড়ানোর পরিবর্তে রাজ্যকে সে ছোটোই করিয়া দিয়া গেল।

তার ফলে মুশকিল হইয়াছে ভূপতির। জমিদারির আয়ে রাজা সাজিয়া থাকা সহজ ব্যাপার নয়। আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে বত্রিশ বছর বয়সেই ভূপতিব মাথায় একটু টাক দেখা দিয়াছে।

যামিনীর বিবাহের সময় টাকটা অবশ্য ছিল গণপতির মাথায়। ভূপতি তখন তেইশ বছরের যুবক। মাথা ভরা নিকষ কালো চুলে সে তখন চাকরের সাহায্যে সযত্নে সিঁথিই কাটিত।

যামিনী রূপসি। রাজার বউ বলিয়া সে রূপসি নয়, রূপসি বলিয়া রাজার বউ।

সকল রূপের মতো যামিনীর রূপও ঐতিহাসিক। রূপের ইতিহাস ব্যাপারটা এই রকম। চারপুরুষ আগে যে দরিদ্র বংশের প্রত্যেকটি নরনারীর গায়ের রং ছিল সাঁওতালদের মতো কালো এবং চেহারা ছিল চীনাদের মতো কুৎসিত, চারপুরুষ ধরিয়া সে বংশের সিন্দুক যদি টাকায় ভরা থাকে তবে দেখা যায় চারপুরুষেই বংশের কালিমা নিঃশেষে মুছিয়া গিয়া রূপ ও শ্রীর স্তূপ জমিয়া গিয়াছে। যামিনী রাজার মেয়ে নয় কিন্তু বনেদি ঘরের মেয়ে, অনেক পুরুষ ধরিয়া তাদের লোহার সিন্দুকে অনেক টাকা। অনেক পুরুষের জমা করা রূপ তাই যামিনীকে রূপকথার রাজকুমারীর বাস্তব প্রতিনিধির মতো সুন্দরী করিয়াছে। পার্থিব তিলোত্তমার মতো বহুকাল ধরিয়া বহু বিভিন্ন রূপসির রূপ

তার মধ্যে সঞ্চিত হইযাছে। তার বঙ্কিম ভ্রূ হইতে পায়ের গোলাপি নখর পর্যন্ত বিচিত্র রূপরেখা ও বিমিশ্র বর্ণ-লালিত্যের সমাবেশ।

বিবাহের পূর্বে রানি হওয়ার আশীর্বাদ যামিনী অনেক শুনিয়াছিল। কিন্তু রানিত্ব মানুষের ঠিক কী ধবনের অস্তিত্ব সে বিষয়ে কোনো জ্ঞান না থাকায় রানি হওয়ার স্বপ্নও সে দেখিত না, একদিন যে তাকে সত্যসত্যই রানি হইতে হইবে এ ধারণাও রাখিত না। রাজবধূ হইয়া প্রথম বছরটা তাব তাই একটু বিহ্বলতা ও ভয়ের মধ্যে কাটিয়া গিয়াছিল।

ধরনধাবণ চালচলন কিছুই তার শিখিতে বাকি ছিল না। বনেদি মুনশিয়ানার সঙ্গে জটিল জীবনকে ঠিকমতো বুনিয়া চলিবার শিক্ষা তাহাব জন্মগত। কিন্তু হাজার বনেদি ঘরের মেয়ে হোক, রাজরাজড়ার বাড়িতে ঠিক রক্তমাংসের মানুষই থাকে কিনা এ বিষয়ে তার মনে একটা সংশয় বরাবর থাকিয়া গিয়াছিল। তার কুমারী জীবনের রাজারা সকলেই ছিল উপকথা রামায়ণ ও ইতিহাসের অন্তর্গত। অবন্তীপুর রাজ এস্টেটের রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব এ কথা যেদিন সে শুনিযাছিল সেদিন তার কল্পনায় ভাসিযা আসিয়াছিল রহস্যস্তব্ধ মর্মর প্রাসাদ, ময়ূর ও হবিণভবা পুষ্পবন, চামব-সেবিত স্বর্ণ সিংহাসন, এবং একদল বিচিত্র উজ্জ্বল বেশধারী গম্ভীর সমুন্নত নরনারী।

আব কোমরে তরোয়াল-ঝোলানো উষ্ণীষধাবী অশ্বাবোহী একজন রাজকুমার!

অবন্তীপুরে পা দিয়া এ কল্পনাকে সে আবার তাহার মনের কল্পলোকে গুছাইয়া তুলিয়া রাখিল বটে, অল্প অল্প ভয় তবু তাব মনে রহিয়া গেল। বউবানির পদমর্যাদা কী, তাকে কী বলিতে ও কী করিতে হয়, কোথায় সরলতার সীমা টানিযা তাকে কতখানি অভিনয় করিয়া চলিতে হয়—এ সব জানা না থাকায় প্রথম বছরটা তার দুর্ভাবনাব মধ্যে কাটিয়া গিযাছিল।

স্বামীকে সে বাববার জিজ্ঞাসা কবিত,—দোষ করছি না তো? ভুল হচ্ছে না তো আমার?

ভূপতি বলিত—না গো না, দোষও তোমাব হচ্ছে না ভুলও তুমি করছ না। সবাই শতমুখে তোমার প্রশংসা কবছে।

ত্রুটি হলে বোলো। শুধবে দিয়ো। শিখিয়ে নিয়ো।

তোমাব কিছুই শেখবার নেই, মিনি।

যামিনী ভাবিত, তাই হবে। এ কথা হয়তো মিথ্যা নয়; আমি অনর্থক বিচলিত হই, ভাবি। রাত্রিটা সে বেশ আত্মপ্রসাদ উপভোগ কবিযা কাটাইযা দিত। কিন্তু পরদিন চারিদিকে জীবনের অরাজক সমাবোহে আবাব সে অস্বস্তি বোধ করিতে আরম্ভ করিত।

তাব এই অস্বস্তিকব ভীরুতার কিন্তু কোনোরকম কটু অভিব্যক্তি ছিল না। তার প্রকৃতির একটি অপরূপ নম্রতার মতোই ইহা প্রকাশ পাইত। পাড়ার এমনই একটি অ-বনেদি মেয়েদের আবেষ্টনীর মধ্যে যামিনীকে মানুষ হইতে হইয়াছিল যে নিজের অজ্ঞাতেই তার মধ্যে একটা অহংকার প্রশ্রয় পাইয়াছিল। না বুঝিয়া সে তার চেয়ে ছোটোঘরের মেয়েদের মনে ব্যথা দিয়া বসিত। তাদের অভিমান আন্দাজ করিতে পারিলে মনে মনে হাসিয়া ভাবিত, ছোটো মনে ছোটো মানেটাই এসেছে আগে। আমি হলে এই নিয়ে রাগ করে নিজেকে ছোটো করে ফেলতে লজ্জায় মরে যেতাম। তার কথার ব্যবহারে এই অহংকারটুকু বাড়ির লোক ছাড়া আর সকলেরই চোখে পড়িত। অবন্তীপুরে আসিয়া নববধূসুলভ লজ্জা ও সংকোচের তলে এটুকু চাপা পড়িয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু গর্ব লয় পাইলেই স্বভাবের একটি মসৃণ ও মার্জিত মাধুর্য মানুষের সঞ্চিত হইয়া যায় না। কেবল এই সংস্কারটুকু হইলে তার রূপে সকলে অবাক হইয়া যাইত, তার গুণের প্রশংসা করিত এবং তার প্রাপ্য ভালোবাসাও সে পাইত। তবে যে রকম পাইয়াছে সে রকম পাইত না। কিন্তু আপনার মৃদু ভীরুতায় সে এমনই মিষ্টি হইয়া উঠিল যে বিনা চেষ্টাতেই সে সকলের চিত্তকে সাধারণ জয় করার একস্তর উর্ধ্বে যে জয় করা আছে

তাহাই করিয়া ফেলিল। তাদের চেয়ে সামান্য একটু বড়ো বাড়িতে তাদের চেয়ে সামান্য একটু বেশি বড়োলোক পরিবারে আসিয়া শুধু একটি রাজা শব্দকে সমীহ করিয়াই নিজের জন্য পরের বুকে অনির্বচনীয় প্রীতি জাগাইবার দুর্লভ রমণীয়তা যামিনীর অভ্যাস হইয়া গেল।

বিজিত চিত্তগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অপরাজেয় ছিল গণপতির স্ত্রী নগেন্দ্রবালার চিত্ত। সে ছিল মোটা আর ঝাঁঝালো, কুইন এলিজাবেথের মতো দুর্ধর্ষ। স্বামী পুত্রকে বশে রাখিতে সে ভালোবাসিত। দাসদাসী ও আশ্রিত পরিজনের প্রতি শাসনের তাহার অন্ত ছিল না। নিজেকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত সংসারটাকে পাক খাওয়াইতে না পারিলে তাহার সুখ হইত না। অধিকারের সীমার মধ্যে নিজেকে সে এত বড়ো করিয়া রাখিত যে তার পায়ে তেল দিয়া দিয়া কোনোরকমে তাহার অনুমতি সংগ্রহ করিতে পারিলে বাড়ির যে কেহ যে কোনো অন্যায় করিতে পারিত।

বউয়ের রূপ দেখিয়া নগেন্দ্রবালা প্রথমে একটু চটিয়াছিল। তাহার এই ঈর্ষাতুর রাগ প্রথম দিকে কিছু কিছু প্রকাশ করিতেও তাহার বাকি থাকে নাই। গোল বাধিত দেবপূজা উপলক্ষে। চিরদিন সকলের উপর প্রভুত্ব করিয়া একটি বৃহত্তর মহত্তর শক্তির কাছে মাথা নত করার জন্য নগেন্দ্রবালার নারী-হৃদয়ের চিরন্তন দুর্বলতা অতৃপ্ত থাকিয়া গিয়াছিল। বেশি বয়সে গৃহদেবতার প্রতি ভক্তি তার তাই উথলিয়া উঠিয়াছিল। দেবতার ভোগ ও আরতি তাহার জীবনে একটা মহা সমারোহের ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। বাড়ির বউকেও সে এইদিকে টানিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। যামিনীর ইহাতে মুশকিলের সীমা থাকে নাই। তার বাপের বাড়িতেও দোল দুর্গোৎসব হয়, কিন্তু নিত্যপূজার ব্যবস্থা সেখানে নাই। পূজাপার্বণের উৎসবের দিকটার সঙ্গেই তাহার পরিচয় ছিল বেশি, ঠাকুরপূজায় ফুল বেলপাতা কোশাকুশি আর নৈবেদ্য লাগে এবং কাঁসরঘণ্টা বাজাইয়া মন্ত্র পড়িতে হয় এর বেশি জ্ঞান তাহার ছিল না। কিন্তু নগেন্দ্রবালার দাবি নিষ্করুণ। এ বাড়ির যে বধূ, ভবিষ্যতের রাজরানি, ঠাকুরপূজা যদি সে না শিখিয়া থাকে আর সব শিক্ষাই জীবনে তার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। না, অবন্তীপুরের রাজপরিবারে নাস্তিকতা চলিবে না।

সে কী বউমা, সে কী কথা ? ঠাকুরসেবা না শিখলে মেয়েমানুষ স্বামীসেবার কী জানবে ? আসনের কোনদিকে কোশাকুশি রাখতে হয় তাও কি তুমি শেখোনি বাছা ? আর আতপচালের নৈবিদ্যি কি অমনি চ্যাপটা করে করতে হয় ?

নগেন্দ্রবালা এমনই করিয়া বলিত, আঘাত ও লজ্জা দিয়া।

সে আরও বলিত—না, ভাড়া করা লোকের কাজ এ সব নয়। দেবতার কাছে বড়োলোকি চলবে না। পরকে দিয়ে স্বামীসেবা হয় না, ঠাকুরের সেবা হবে পরকে দিয়ে ! সব করতে হবে নিজেকে। মেঝে ধোয়ার কাজ পর্যন্ত।

যামিনীর হইত ভয়, চোখে আসিত জল। নগেন্দ্রবালা পাইত তৃপ্তি।

কিন্তু রূপেগুণে যে বড়ো, তার নিরীহ আনুগত্য যদি আন্তরিক হয়, বকিয়া যদি তার চোখে জল আনিয়া দেওয়া যায়, নিজস্ব একটা দামি সম্পত্তির মতো ক্রমে ক্রমে তার প্রতি মায়া জন্মে। দেবসেবায় অনভিজ্ঞতা নগেন্দ্রবালার কাছে গুরুতর অপরাধ। কিন্তু নিজেকে শাশুড়ির ভীরু ও উৎসুক শিষ্যা করিয়া নিজের এ অপরাধকেও যামিনী লঘু করিয়া দিল।

তাহাকে বকিবার ক্ষমতা নগেন্দ্রবালার আর রহিল না। বউকে সে ভালোবাসিয়া ফেলিল।

স্বামীর সঙ্গে যামিনীর যে সম্পর্কটি স্থাপিত হইল তাহা অতুলনীয়। যামিনীকে ভূপতি তাহার সুস্থ মনের নিবিড় কামনা দিয়া জড়াইয়া ধরিল। নারীকে ভালোবাসিবার জন্য মানুষের দেহমনে যতগুলি ধর্ম আছে তার সবগুলি দিয়া অপ্রমেয় আবেগের সঙ্গে যামিনীকে সে ভালোবাসিল। সে পড়া

ছাড়িয়া দিল। মাসে এক বোতল মাত্র শ্যামপেন খাওয়াও সে ছাড়িয়াছে দেখিয়া গণপতি কিছু বলিল না। নগেন্দ্রবালা একটু ঈর্ষা বোধ করিয়াছিল, কিন্তু সেও বউয়ের জন্য ছেলের পড়া ছাড়িয়া দেওয়ায় বাধা দিল না। ভাবিল, তাই হোক, বউ নিয়ে মেতে এ বয়সটা ভালোয় ভালোয় পার হয়ে যাক।

যামিনী প্রথম যেবার বেশিদিনের জন্য অবন্তীপুর আসিল তখন শরৎকাল। শুক্লপক্ষের কয়েকটা রাত্রিতে আকাশের ওই পুরানো চাঁদটির কাছ হইতে এমন জ্যোৎস্নাই পৃথিবীতে ভাসিয়া আসে যে দেখিলে মানুষের মন কেমন করে। এমনই জ্যোৎস্না উঠিলে অনেক রাত্রে নিদ্রিত রাজপুরীর নিশীথ রহস্যকে অতিক্রম করিয়া ভূপতি আর যামিনী উঠিত ছাদে। আলিসা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া তাহারা পৃথিবীকে দেখিত। এদিকে আধাশহর আধাগ্রামখানি নিঃসাড়ে ঘুমাইয়া আছে। হয়তো শুধুই দেখা যায় একটি আধভেজানো জানালায় নিঃসঙ্গ একটি আলো। যামিনী ভাবিত, ওখানে হয়তো তাদেরই মতো ভালোবাসার জাগরণ এখনও আলো জ্বালিয়া রাখিয়াছে। ওদিকে দিঘির জলে থাকিত সোনালি রঙের চমকিত চাঞ্চল্য। দিঘির ওই তীর দিয়া দুপাশে গাছের সারি বসানো নির্জন পথটি কোথায় কতদূরে চলিয়া গিয়াছে।

যামিনী স্বামীর বুক ঘেঁষিয়া আসিত। ওই স্তব্ধ পথটি ধরিয়া পৃথিবী ছাড়িয়া গ্রহতারার কোনো একটা জগতে চলিয়া যাওয়া যায় এমনই একটা কথা ভাবিয়াই সে বোধ হয় ভূপতির দুটি হাত দিয়া নিজেকে বাঁধিয়া ফেলিত।

বলিত—পৃথিবী কতকাল আগে সৃষ্টি হয়েছিল বলো না।

পৃথিবী কতকাল ধরিয়া এমন সুন্দর এমন অপার্থিব হইয়া আছে এই ছিল যামিনীর জিজ্ঞাসা। এমনই স্তিমিত জ্যোতির্ময়ী রাত্রে ভূপতির উদাত্ত প্রেমকে অনুভব করিতে করিতে সে প্রায়ই এই ধরনের প্রশ্ন করিত। ভূপতি ইহার জবাব দিত তাহার কানে কানে। বলিত—অনেক দিন আগে গো, অনেক দিন আগে। কোটি বছর আগে। প্রথমে সব অন্ধকার ছিল, তারপর ভগবান বললেন, আলো হোক, অমনই আলো হল। তিনি তারপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেন। শুনিয়া নিজেকে যামিনীর এত বেশি ছেলেমানুষ মনে হইত যে সে অসহায়ের মতো প্রশ্ন করিত, আচ্ছা সত্যি ভগবান আছেন ?

বিকালে চাকর গালিচা রাখিয়া গিয়াছে। বিছাইয়া ভূপতি তাহাতে বসিত। তাহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইত যামিনী। যামিনীর মুখে পড়িত জ্যোৎস্না আর ভূপতির মুখের পিছনে থাকিত আকাশের পটভূমিকা। ব্যাকুল অন্বেষণের দৃষ্টিতে তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। পরস্পরের মুখের সঙ্গে তাহাদের পরিচয়ের যেন শেষ নাই, কোনোদিন এ রহস্য তারা যেন বুঝিবে না। যামিনী পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিত, ভূপতি চুল সরাইয়া তাহার কপোলে আবৃত অংশটুকু আবিষ্কার করিত। যামিনী চিবুক ধরিয়া স্বামীর মুখ উঁচু করিয়া সে মুখে ফেলিত জ্যোৎস্না। যামিনীর ঘুম আসিলে তাহার অর্ধনিমীলিত চোখের গাঢ় অতল রহস্যকে ভূপতি চুম্বন করিত, যামিনী তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিত বুকে !

আঠারো বছরের কচি মেয়ে সে, সে বলিত—জানো আমি এখন মরে যেতে পারি। হালকা হাসি তামাশা তাদের বিশেষ ছিল না। তারা খেলা করিত কম। অতর্কিতে যামিনীর খোঁপা যে ভূপতি কখনও খুলিয়া দিত না এমন নয়, নিদ্রিত স্বামীর কপালে বড়ো করিয়া সিন্দুরের ফোঁটাও যে যামিনী আঁকিত না তাও নয়, কিন্তু ভূপতির টেরি নষ্ট না করিয়া খোঁপা খোলার প্রতিশোধ যামিনীর লওয়া হইত না। ঘুম ভাঙিয়া যামিনীর আঁচলে কপালের সিন্দূর ভূপতির মোছা হইত না। তাদের সহিত অকালমরণ ঘটিত। তারা বুঝিতেও পারিত না কখন তারা গভীর অলৌকিক ভাবাবেগে আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া গিয়াছে। যে বয়সে প্রেম বহির্বস্তুকেই আশ্রয় করিয়া থাকে বেশি, প্রেমকে লইয়া দুজন মানুষ যে বয়সে শিশুর মতো অর্থহীন খেলা খেলে, ধরা দেওয়ার চেয়ে পলাইয়া বেড়ানোই যখন বেশি

মজার ব্যাপার, পূর্ণপরিণত বয়স্ক মানুষের মতো তখন তারা সাগরেব মতো অতল উদ্‌বেলিত ভালোবাসার বিপজ্জনক বস্তুর অভিনয় করিয়া চলিত।

বিপজ্জনক এই জন্য। মনের পরিণতি তাদের কারও হয় নাই। মনেপ্রাণে ছেলেমানুষ ছাড়া তারা আর কিছুই ছিল না। যে অভিজ্ঞতার স্তূপ সাবের মতো মানুষের মনকে উর্বরা করে, বৃহৎ আবেগকে ধারণক্ষম করে, সে অভিজ্ঞতা তাদের জোটে নাই। বেদনাদায়ক মর্মান্তিক প্রেমের আতিশয্যকে সহ্য করিবাব জন্য মনের শক্ত হওয়া দরকার, শক্তি থাকা দরকার। এদের মন সে ভাবে শক্ত হইবার সুযোগও পায় নাই, সে রকম শক্তিও তাদের ছিল না। অথচ তাদের একজন রাজার ছেলে আর একজন বনেদি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। ওই বয়সেই তারা গম্ভীব হইতে জানিত, জীবনকে একটা গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া মনে কবিত, পাকা সাজিতে পারিত।

খোলা ছাদে জোৎস্নালোকে তাদের প্রেম যত অলৌকিক হোক সেটাও বয়সেব নয়। কিন্তু তাদের উপায় ছিল না ! জীবন তাদের হালকা হইতে শেখায় নাই, অথচ জীবনের কোনো গুরুভার আনন্দ ও বেদনাকে বহন করিবার উপযুক্তও করে নাই। পরস্পরের মুখে যখন তাদের হাসি ফুটাইয়া রাখা উচিত ছিল তখন তারা তাই স্তব্ধ বিস্ময়ে পরস্পরের ওষ্ঠে অনুচ্চাবিত ভাষা শুনিত, যখন তাদের লুকোচুরি খেলার কথা তারা তখন আত্মহারা পুলকবেদনায় পরস্পরের আরও কাছে ঘেঁষিয়া আসিত।

দুটি লিরিক কবিতা পরস্পরেব আশ্রয়ে হইয়া উঠিত মহাকাব্য। জীবনকাব্যের ধরাবাঁধা ছন্দ ও নিয়মাধীন কাব্যরূপের হিসাবে যাহা অসঙ্গতি, যাহা অনিয়ম।

যামিনীর বিবাহের তিন বছর পরে অবন্তীপুর রাজবাড়িতে দুটি বিশেষ ঘটনা ঘটিল, গণপতিব মৃত্যু ও ভূপতির পুত্রলাভ। একমাসের মধ্যে নগেন্দ্রবালা হইল বাজমাতা, ভূপতি হইল রাজা আর যামিনী হইল রানি ও ছেলের মা।

রানিত্ব যামিনী এমনিই পাইল, কিন্তু ছেলে তত সহজে মিলিল না। ব্যাপাব এমনই দাঁড়াইয়াছিল যে তার এবং তাব ছেলের বাঁচিবার কথা নয়। কলিকাতার তিনজন বড়ো বড়ো ডাক্তাব কী এক অদ্ভুত উপায়ে তাদেব দুজনকে বাঁচাইয়া দিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে কানের কাছে এ কথাও বলিয়া গেলেন যে এই প্রথম এবং এই শেষ। যামিনীর আর ছেলেমেয়ে হইবে না।

না হোক রাজবংশটি রক্ষা পাইয়াছে। ছেলেটা শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে ভূপতির আব একবার বিবাহ না করিলেও চলিবে।

বংশরক্ষা পাওয়ার সান্ত্বনাটি নগেন্দ্রবালার এবং অন্যান্য সকলের, ভূপতির আবার বিবাহ করিতে হইবে না এ আশ্বাস যামিনীর নিজস্ব, আর কারও নয়।

ভূপতির মনোভাব সঠিক জানিবার উপায় ছিল না। রাজা হওয়ার আগেই সে একটু একটু করিয়া বদলাইয়া যাইতেছিল। রাজা হইয়া সে আরও বদলাইয়া গেল।

না, শ্যামপেন অথবা নারী নয়। রাজা হইলেই যে ও সব আপদ আসিয়া জুটিবে এমন কোনো কথা নাই। ভূপতির পরিবর্তন কাব্যের প্রতিশোধ।

কেবল অন্তরের আশ্রয় করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। যামিনীর সঙ্গে সীমাতোলিত ভালোবাসার খেলা খেলিতে খেলিতে ভূপতি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে বাহিরে আশ্রয় খুঁজিতেছিল। আশ্রয়ের অভাবও ছিল না তার, যামিনীর জন্য এতদিন বরং সে ইহাকে চলিতেছিল এড়াইয়া। যামিনীর মতো বউ পাইলে হৃদয়ের অনেক প্রয়োজন মিটিয়া যায়, কিন্তু জীবনের দাবি থামে না। ভূপতির কাছে সংসারের দাবি ছিল বিপুল। তার জন্ম মুহূর্তে রাজবাড়ির শতাধিক নরনারী ও দেড়

লাখ টাকা আয়ের জমিদারির ভবিষ্যৎ ভাব তাহাকেই বাহক বলিয়া দাবি করিয়াছিল। শৈশব হইতে জীবন তাহার বাহিরের সমারোহে ভারাক্রান্ত। তার কাব্যের কোনোদিন শেষ থাকে নাই।

সন্তানের আবির্ভাবে যামিনী ও তাহাব মধ্যে যে সাময়িক ছেদ পড়িল সেই সুযোগে ভূপতি তার নিজস্ব জগৎটি তৈরি করিয়া লইল। গণপতির মৃত্যুতে জমিদাবির সমস্ত ভার লইতে হওয়ায় অপরিহার্য কর্তব্যের খাতিরে এই জগৎ তার কায়েমি হইয়া গেল। যামিনীব কাছে কোনো কৈফিয়ত দেওয়ারও প্রয়োজন রহিল না।

অনাবশ্যক উৎসাহেব সঙ্গে সে তার জমিদারি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। আজ এই বন্ধুর সঙ্গে শিকারে গেল, কাল অমুক গ্রামে বসাইল মেলা, পরশু এক বড়ো রাজকর্মচারীর সম্মানে মস্ত একটা ভোজ দিল। গণপতিব সে পবের যুগেব মানুষ, ঘবে-বাহিরে অনেকগুলি সংস্কার সাধনেও তার খুব উৎসাহ দেখা গেল।

মবিতে মরিতে বাঁচিয়া ওঠার ধাক্কায় আব এক ছেলে পাওয়ার আহ্লাদে যামিনী প্রথমটা বেশ ভুলিয়া রহিল। ভূপতিব তখন কিছুকালেব জন্য—তাব প্রয়োজনও ছিল না, সুতরাং সে অভাবও বোধ করিল না। কাঁচা বুকে পাকা ভালোবাসা পুষিযা রাখিতে রাখিতে সেও হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, সেও অন্য আশ্রয় খুঁজিতেছিল।

কিন্তু বেশি দিনেব জন্য নয়। ছয় মাসেব মধ্যেই তার শরীর সুস্থ হইয়া উঠিল। মাতৃত্ব লাভেব অতিরেকও আসিল কমিয়া। ছেলে এক বকম সেই আঁতুব হইতেই তার ছিল না। সে রাজার ছেলে বাজপুত্র। তাব সুস্থ ও সবল দুধমা ও ঘুমপাড়ানো মাসিপিসি ভাড়া করা হইযাছে। শখ করিয়া ছেলেকে কখনও যদি যামিনী কোলে নেয়, সেটা বাহুল্য মাত্র। প্রয়োজন নয়।

তা হোক সে জন্য যামিনীব বিশেষ কোনো আপশোশ ছিল না। সে কলম-পেষা কেরানিব বউ নয় যে ছেলে মানুষ কবার ঝামেলা তাহাকে সহিতে হইবে এবং সেই বিরক্তি দিয়াই আপনাব স্বর্গ সৃষ্টি কবিয়া লইবে। বড়োলোকেব ছেলেবা এমনিভাবেই মানুষ হয। এ প্রথাকে যামিনী অনুমোদন করে। তা ছাড়া ছেলেকে লইযা সাবাদিন মাতিযা থাকিলে তার যদি চলিত, এ যদি তাব কাম্য হইত যে সন্তানেব পিছনে নিজেকে সে ঢালিয়া দিবে, বাধা দিবার কেউ ছিল না। নগেন্দ্রবালা হয়তো একটু খুঁতখুঁত কবিত, ভূপতি হযতো একটু বিবক্ত হইত, কিন্তু বাঁচিয়া থাকিবার উপাযেব মতো ছেলেকে আঁকড়াইয়া ধবিবার প্রয়োজন হইলে এই সামান্য বাধা যামিনীকে ঠেকাইতে পারিত না। ছেলেকে সে অমন করিয়া চাহিল না। চাহিল ভূপতিকে।

তার দিনগুলিকে একেবারে অচল করিয়া দিবাব মতো দূরেই যে ভূপতি বসিয়া গিয়াছে এটা বুঝিতে যামিনীর সময লাগিল। কিন্তু বুঝিল সে ভালো কবিয়াই। কারণ যে অসহ্য প্রেমকে এড়াইয়া ভূপতি কাজ আর অকাজ দিয়া জীবনটা ভরিয়া রাখিতে পারিল, সেই প্রেম ছাড়া যামিনীর আর কোনো অবলম্বন ছিল না।

ব্যাকুল উন্মাদনাময় ভালোবাসা বহিয়া বহিয়া তার হৃদয় শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া যাক, ভূপতির সান্নিধ্য সহিতে না পারিয়া মাঝে মাঝে তার ছুটিয়া পালাইতে ইচ্ছা হোক, কবিতা লিখিবার পর কবি যেমন মরিয়া যায় রাত্রি প্রভাতের পর সারাদিন সে তেমনিভাবে মরিয়া থাকে, ভূপতিকে সে চোখের আড়াল করিতে পারিবে না। সে নারী, সে বন্দিনী, তার মুক্তি নাই ; তার কামনার বিবর্তন চিরদিনের জন্য অসম্ভব হইয়া গিয়াছে।

সে একবার ভালোবাসিয়াছে, প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়া পর্যন্ত মুহূর্তের বিরাম না দিয়া সে ভালোবাসিবে।

অথচ সাধারণ হিসাবে ধরিলে ভূপতি যে তাকে বিশেষ অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তা বলা যায় না। প্রাথমিক মিলনোচ্ছ্বাস কমিয়া আসিলে যে কোনো সুখী দম্পতির পরস্পরের প্রতি যে পরিমাণ স্বাভাবিক উদাসীনতা আসে, ভূপতির তার বেশি আসে নাই। বাড়ি থাকিলে এবং কাজ না থাকিলে যামিনীর সঙ্গই সে খুঁজিয়া লইত। বিদায় নেওয়ার সময় যামিনী তাকে আরও একটু থাকিতে বলিলে খুশি হইয়াই সে আর একটু তার কাছে থাকিত। যামিনী অনুরোধ কবিলে মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় কর্তব্যকে অবহেলা করিতেও তাহার বাধিত না। বিনিদ্র যামিনীব সঙ্গে সমানে সে রাত জাগিত না বটে, কিন্তু রাত্রি দশটার মধ্যেই ঘরে আসিত, যামিনীব সঙ্গে গল্প করিত, তাকে আদর করিত, ভালোবাসিত। শান্তিপ্রিয় সুখী দম্পতির শান্ত স্বামীর চেয়ে হয়তো এ সব সে বেশিই করিত।

কিন্তু গোড়াতে তাদের কিনা সুখী দম্পতির সম্পর্ক ছিল না, ভূপতিকে তাই যামিনীর আগাগোড়া স্তিমিত, অন্যমনস্ক, সুদূর মনে হইত। তার বুক করিত জ্বালা। তার চোখে আসিত জল। স্বামীর নিশ্বাসের শব্দটি কান পাতিয়া শুনিয়া শিহরিয়া সে নিজের মৃত্যু কামনা করিত।

এবং এমনই অপরিবর্তনীয় এই পৃথিবী আর আকাশের গ্রহতারার বিবর্তন যে প্রতি পূর্ণিমা ও পূর্ণিমার আগে-পিছে কতগুলি রাত্রি জ্যোৎস্নায় আলো হইয়া থাকিত। অবন্তীপুর রাজ-এস্টেটের রাজার বউ তখন বিছানায় উঠিয়া বসিত। ব্যাকুল হইয়া ভাবিত, আমার সবই আছে, কিন্তু কী নাই ?

স্তরে স্তরে সাজানো তার জীবন, তার রাজ্য আছে, রাজা আছে, প্রেমিক আছে, ছেলে আছে, শতাধিক হৃদয়ের প্রীতি আছে, অতীত ভবিষ্যৎ সবই আছে, পরকাল পর্যন্ত। তবু কী চায় সে ? স্বামীর ঘুম ভাঙাইয়া একবার ছাদে যাইতে চায় ? শুধু এই কামনা তার ? এইটুকু পাইলেই সে পরিতৃপ্ত হইয়া যাইবে।

যামিনী স্বামীর গায়ে হাত রাখিত। কিন্তু তাকে ঠেলিয়া তুলিতে পারিত না। তাব কান্না আসিত। তার সীমাহীন দুঃসহ প্রেমের মতো ক্রন্দনবেগে সে কাঁপিযা কাঁপিয়া উঠিত।

সকালে বলিত—কাল এমন সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছিল।

ভূপতি বলিত—দেখেছি। রাত্রে একবার উঠেছিলাম।

যামিনী তখন হাই তুলিয়া বলিত—জানো গো, কাল রাতে আমার ভালো ঘুম হয়নি।

ভূপতি বলিত—আমায় ডাকলে না কেন ? গল্প করে তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দিতাম।

গল্প ? হায় ভগবান, রাত জাগিয়া গল্প ! যামিনীর মনের ভাবটা হইত এই রকম।

সংসারে রাজার বউকে কম কর্তব্য পালন করিতে হয় না। যামিনীরও অনেক কাজ ছিল। গণপতির মৃত্যুর পর নগেন্দ্রবালা অল্পে অল্পে রানিত্বের বোঝা বউয়েব কাঁধে নামাইয়া দিতেছিল। ইহলোকে কর্তৃত্ব করিবার সাধ বোধ হয় তাব মিটিয়াছিল, এবার পরলোককে আয়ত্ত না করিলেই নয়। এই চেষ্টা করিতে করিতে বছর দুই পরে সে ওইখানে চলিয়া গেল। যামিনীর কাজের আর অন্ত রহিল না।

বিচিত্র সে কাজ। ঠাকুরের নৈবেদ্য সাজানো ছাড়া নিজের হাতে কিছুই করিবার নাই, চারিদিকে শুধু নজর রাখা, হুকুম দেওয়া, আর এর নালিশ, ওর তোষামোদ, তার প্রার্থনা শোনা। রাজ সিংহাসনের যেমন একদিনের জন্যও রাজহীন হওয়া চলে না, রাজ-অন্তঃপুরেরও তেমনই অহরহ কেন্দ্র চাই। যামিনীর কিছুই ভালো লাগিত না, কিন্তু সে ছিল নিরুপায়। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিকে চাহিয়া নয়, নিজের প্রয়োজনেই রাজ-সংসার তাকে ঘিরিয়া পাক খাইতে লাগিল।

তারপর ছিল প্রসাধন। দুজন দাসীর সাহায্যেও প্রত্যেক দিন প্রসাধনে যামিনীর অনেক সময় লাগিয়া যাইত। গন্ধতেলে খোঁপা বাঁধিলেই শুধু চলিত না, চুলে তেল বেশি না পড়ে আবার কমও না হয় এটা খেয়াল রাখিয়া একটু একটু করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তেল মাখিতে হইত। চোখে অদৃশ্য কাজল-পরানোর কাজটা এমন সূক্ষ্ম যে বিস্তারিত ভূমিকা না করিয়া দাসী তুলি তুলিতে সাহস পাইত

না। দুধের সর-ভিজানো জলে চার-পাঁচবার মুখ ভিজাইতে, বাহুতে চন্দন মাখাইয়া মুছিয়া তুলিতে, পায়ে আলতা পরিতে এবং এমনই সব আরও অনেক কিছু করিতে আকাশের কত উঁচুর সূর্যটি গাছের শিয়রে নামিয়া যাইত !

এত পদ্ধতি নিয়ম, অভ্যাসও যামিনীব ছিল। কিন্তু এখন তার বিরক্তির সীমা থাকিত না। ভিতরে ভিতরে মানুষ যখন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া যাইতেছে, বাহিরে তখন এত ঢং কেন ?

খোকা এখন একটু বড়ো হইয়াছিল। দুধমা ও মাসিপিসির ব্যূহ অনেকটা ভাঙিয়া গিয়াছিল। যামিনীর ছেলে আবার ক্রমে ক্রমে সরিয়া আসিতেছিল যামিনীরই কাছে। তার হাসিকান্নার মাকে তার প্রয়োজন হইতেছিল। বাশি রাশি পুতুল লইয়া একা সে খেলিবে না, যামিনীর যোগ দেওয়া চাই। খেলায় শ্রান্তি আসিলে যামিনীব কোলে বসিয়াই সে গম্ভীর মুখে উদাসীন চোখে ছড়ানো পুতুলগুলির দিকে চাহিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে ঘুমাইয়া পড়িবে। মা চাহিয়া না দেখিলে বাগানে সে ছুটাছুটি করিবে না। মার পিঠ ছাড়া আর কারও পিঠে সে আচমকা ঝাঁপাইয়া পড়িবে না, মা তোষামোদ না করিলে দুধ তাকে কেহ খাওয়াইতে পারিবে না। দুপুর রাতে ঘুম ভাঙিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলে যামিনী উঠিয়া তার কাছে না গেলে কান্না তার থামিবে না। শিশুর চেয়ে স্বার্থপর জীব জগতে নাই। ওদেব মানুষের মূল্য যাচাই নির্ভুল। এই বৃহৎ সংসারে কোন মানুষটার দাম সকলের চেয়ে বেশি কারও বলিয়া দিবার অপেক্ষা না রাখিয়া খোকা নিজেই তাহা স্থিব করিয়া লইয়াছিল।

যামিনীব মন্দ লাগিত না। আবও বেশি ভালো যাতে লাগে সে জন্য প্রাণপণ চেষ্টাও সে করিত। কিন্তু অনেক দেরি হইয়া গিয়াছে। স্বামীর উত্তাল ভালোবাসার জন্য তীব্র অপূরণীয় ক্ষুধা তার অস্তিত্বের স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন ধর্মে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এখন আর তাকে বদলানো যায় না. বিকৃত করা চলে না। স্বামীব অনায়ত্ত স্পর্শকে শুধু কল্পনায় অনুভব করিয়া তার চলিতে পারে কিন্তু তার বদলে খোকাকে বুকে চাপিযা সাধ মেটানো যায় না।

কল্পনাকে যামিনী বিস্ময়কব পটুতার সঙ্গে ব্যবহাব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নিজেকে সে যেন দুটি ভাগে ভাগ কবিয়া ফেলিয়াছিল। এক ভাগ দিয়া সে তাহার সাধাবণ জীবনটা যাপন করিয়া যাইত, রানি সাজিয়া থাকিত, স্ত্রী ও মাতার কর্তব্য পালন করিত, দৈনন্দিন জীবনের ছোটোবড়ো সুখ-দুঃখের নিজস্ব অংশটি গ্রহণ কবিত। অনা ভাগ দিয়া সে কবিত কল্পনা। নিয়মে বাঁধা সচল জীবনের আড়ালে অবসর রচনা কবিয়া লইয়া আপনার অচল জীবনকে মনে মনে সে গতি দিত। তাব সর্বাঙ্গ উত্তপ্ত হইয়া উঠিত. চোখে ফুটিয়া উঠিত উজ্জ্বল অপার্থিব জ্যোতি, একটা উত্তেজিত উল্লাসে তার রক্তের গতি চঞ্চল হইয়া উঠিত। কোথায় পড়িয়া থাকিত এই রাজবাড়ি আর রাজা আর রাজপুত্র, দিনের পর দিন ধবিয়া নিঃসঙ্গ বিরহী মুহূর্তগুলিতে তিল তিল করিয়া সৃজিত বাস্তবধর্মী কল্পলোকে যামিনীর বিবাহের প্রথম বৎসরটির বারংবার আবর্তন চলিত।

জ্যোৎস্নারাতে যামিনী একাই উঠিত গিয়া ছাদে।

প্রথমে আলিসা ঘেঁষিয়া সে নিঝুম হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। হয়তো বা কোনোদিন প্রথমদিকে তার দু-চোখ জলে ভরিয়া আসিত। ঘুমন্ত স্বামীকে, নিস্তেজ বাস্তব জীবনকে সদ্য সদ্য পিছনে ফেলিয়া আসিয়া সহসা সে কল্পনাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিতে পারিত না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আকাশপাতাল ভাবিত। তার বিরহবিধুর জগতে জাগিয়া থাকিত শুধু কাছের একটি নিঃসঙ্গ বটগাছ, দূরের একটি আলো, আকাশের একক চাঁদ। আজও দু-সারি গাছের মাঝখানে সেই জনহীন পথটি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কোনো কোনো দিন ওই পথটির সংকেতও যামিনীর কাছে ভাষার মতো সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত। পথের গোড়া হইতে শুরু করিয়া ধীরে ধীরে সে দৃষ্টিকে লইয়া যাইত দূরের অস্পষ্টতায়, থামিত সেইখানে। শঙ্কিত সন্দেহে ওইখানে সে অনেকক্ষণ থামিয়া থাকিত।

তারপর একসময় শুরু হইত তার কল্পনা। ভূপতিব একটি অবিচ্ছিন্ন নিবিড় আলিঙ্গন তাকে ঘিরিয়া নামিয়া আসিত, তার শ্বাসরোধী প্রেমকে অনুভব করিয়া যামিনীর হৃদয় অধীর আগ্রহে স্পন্দিত হইতে থাকিত।

এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বত্রিশ বছর বয়সে ভূপতির মাথায় একটু টাক দেখা দিয়াছিল। শুধু তাই নয়। মাথার মধ্যেও এই সময় তার অল্প অল্প যন্ত্রণা বোধ আরম্ভ হইল। ডাক্তার ছয় মাস দার্জিলিংয়ে বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন।

ভূপতি ঠান্ডা দেশ পছন্দ করে না। বাহির হইতে মৃদু উত্তাপ পাইতেই তার ভালো লাগে। দার্জিলিংয়ের বদলে সে বোম্বে যাওয়া ঠিক করিল। বোম্বে অনেক দূর। ভূপতি দূরেও যাইতে চায়।

যামিনীকে তার সঙ্গে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না।

ওকে সে এখনও ভয় করে। ওকে উপলক্ষ করিয়া তার সেই আদিম উন্মত্ততা ভূপতি এখনও ভোলে নাই।

কিন্তু যামিনী বলিল—আমিও যাব।

ভূপতি আপত্তি করিয়া বলিল—তুমি গিয়ে কী করবে ?

যামিনী সজল চোখে বলিল—তোমার কাছে থাকব। আমায় না নিযে গেলে আমি মরে যাব।

শুনিয়া ভূপতি অবাক হইয়া গেল। জীবনের কী একটা বিস্মৃত রহস্য প্রভাতের কুয়াশা হইতে মধ্যাহ্নের আকাশে দেখা দিয়াছে।

বোম্বে গিয়া অল্পদিনের মধ্যেই ভূপতির ভারী মাথা হালকা হইয়া গেলে। দিনগুলি এখানে অলস, বৈচিত্র্যহীন। এখানে উকিল-মোক্তার নাই, রাজ্য বিস্তার নাই, প্রজাশাসন নাই। প্রভুত্ব হ্রস্ব, বিরক্তি স্বল্প, বৈচিত্র্য অপ্রতুল। সে আর যামিনীর মধ্যে এখানে আড়াল কম। খোকা যতদিন রহিল তাকে একরকম মাঝখানে খাড়া করিয়া রাখা গেল। কিন্তু সে এখন বড়ো হইয়াছে। নামকুমের স্কুলে সে বোর্ডিংয়ে থাকিয়া পড়ে। নিজেদের প্রয়োজনে শিক্ষায় ব্যাঘাত দিয়া তাকেও বেশিদিন আটকাইয়া রাখা গেল না।

ভূপতি নিরাশ্রয় অসহায় হইয়া পড়িল।

তাই একদিন সে যামিনীকে বলিল—তুমি এখনও তেমনই আছ মিনি, প্রায় তেমনই আছ।

যামিনী বলিল—তাই কি কেউ থাকে ? আমি কত বদলে গিয়েছি।

তারা পরস্পরের চোখের দিকে চাহিল। কিন্তু পরস্পরকে তারা আব খুঁজিযা পায না।

না শীত, না গ্রীষ্ম। বোম্বের আবহাওয়া ধর্মহীন, নিরপেক্ষ। বোম্বের পথ দিয়া জগতের যাবতীয় ধর্মের লোক চলাচল করে। বোম্বে শহর ঘুমায় এবং জাগে, বোম্বের আকাশে চাঁদ উঠিতে ছাড়ে না। অবন্তীপুরের রাজা জীবনের যে স্তরগুলি দেশে নামাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে তার তলাকার স্তরগুলি ধীরে ধীরে প্রাণসঞ্চার করে, ইটের সমাধিমুক্ত মুমূর্ষু সাদা ঘাসের মতো।

ভূপতির ভয় করে, ইচ্ছাশক্তির নীচে আবার সে এই প্রাণকামী কামনাগুলিকে চাপা দিতে চায়, অবন্তীপুরে ফিরিয়া যাওয়ার কথা ভাবে। কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে বড়ো যার দাবি তাকে ঠেকানো যায় না। জাগরণকে একদিন হয়তো ঘুমের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু ঘুম যখন ভাঙিতে থাকে জাগিয়া ওঠাকে তখন আর কিছুতেই এড়ানো যায় না।

প্রথমে ভূপতি বুঝি ভাবিয়াছিল, যামিনী আজও তেমনই আছে। ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতে শিখিয়া এ ভুল তার ভাঙিয়া যায়। যামিনীকে এখনও চাহিলেই পাওয়া যায় সেই সঙ্গে কী যেন পাওয়া যায় না। স্বামীর বাহুবেষ্টনের মধ্যেও যামিনীর একদিন যেমন তাকে স্তিমিত, সুদূর অন্যমনস্ক মনে হইত এবং এখনও খেয়াল করিলে হয়, আজ যামিনীকেও ভূপতির তেমনই নিস্তেজ তেমনই ঘুমন্ত মনে হইতে থাকে।

স্বামীর নবজাগ্রত প্রেমকে যামিনী গ্রহণ করিতে পারে না। সে তার কল্পনাকে লইয়া দিন কাটায়। তার অর্ধনিমীলিত চোখে ভূপতি যখন ব্যাকুল দৃষ্টিতে তার পূর্বপরিচিত অতল রহস্যকে সন্ধান করে যামিনী তখন অন্য একজন ভূপতির স্বপ্ন দ্যাখে, অন্য একজন ভূপতির দু-চোখ ভরা ব্যগ্র উৎসুক প্রেমকে যাচিয়া লয়।

নিশীথ রাত্রে ভূপতি বিনিদ্র চোখে বসিয়া থাকে বিছানায়। যামিনী মৃদু মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া ঘুমায়।

সকালে ভূপতি বলে---কাল ভালো ঘুম হয়নি মিনি।

যামিনী বলে---মাথা ধরেছিল ? আমায় ডাকোনি কেন ? আজ আবার ওষুধটা তাহলে খাও।

একদিন অপরাহ্ণে তারা ভেহার লেকে বেড়াইতে গিয়াছিল। এই লেক হইতে বোম্বে শহরের জলার্থীদের জল সরবরাহ করা হয়। দৃশ্য ভারী সুন্দর। অনেকে লেকের ধারে পিকনিক করিতে যায়।

ভূপতির পাশে বসিয়া তাকে যামিনী ভুলিয়া গিয়াছিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেই তার ভালো লাগিতেছে, ভূপতির সান্নিধ্য অনুভব করিবার তার অবসর ছিল না। চারিদিকে কত গাছপালা, সবগুলির নামও সে জানে না। কাছের কতকগুলি পামগাছের গোড়া হইতে ডগা পর্যন্ত দেখা যায়, কিন্তু খানিক দূরে জলের কাছাকাছি এক স্তূপ সবুজ রহস্যের মধ্যে আট-দশটা গাছ প্রোথিত হইয়া আছে। ওই গাছগুলি আর তার মাঝখানে লেকের তীর নিচু, লেকের জল ভিতরের দিকে ঠেলিয়া আসিয়াছে। চার-পাঁচটি বোবা পশু ওখানে জল খাইতে নামিল। ও পারে এলায়িত পাহাড়। জল গোড়া ছুঁইয়া আছে।

হঠাৎ ভূপতি যামিনীর একখানি হাত দুহাতের মুঠায় শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। এত জোরে ধরিল যে যামিনীর তাতে ব্যথা পাওয়ার কথা।

যামিনী মুখ ফিরাইয়া অবাক হইয়া গেল।

কী হয়েছে ? হাতে লাগে যে আমার ?

কিন্তু সেদিন লাগিত না।

ভূপতি তার হাত ছাড়িয়া দিল। তার মুখ দেখিয়া যামিনীর সবই বোঝা উচিত ছিল, কিন্তু কিছুই সে বুঝিল না। একটা সন্দেহ করিয়া পরম স্নেহে আবার জিজ্ঞাসা করিল—কী হয়েছে ? অসুখ বোধ করছ ?

ভূপতি বলিল—না। অসুখ নয়।

যামিনী তার দিকে আর একটু সরিয়া গিয়া নিজের ব্যথিত হাতখানা তার লজ্জিত হাতের উপর রাখিয়া ও পারের পাহাড়ের দিকে চাহিয়া রহিল। ভূপতি যাহা চায় তার মধ্যে তাহা আছে, তাহাদের সেই অনির্বচনীয় অতৃপ্ত প্রেম। কিন্তু তার নাগাল পাইতেছে না। একদিন হয়তো যামিনীর কল্পনা থামিয়া যাইবে, হয়তো আকুল হইয়া আজ রাত্রেই অন্ধকারে সে এই বাস্তব ভূপতিকে খুঁজিবে, কিন্তু ভূপতি তখন হয়তো জাগিয়া নাই। আবার কাল রাত্রে ভূপতি যখন আলো জ্বালিয়া অপলক চোখে তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে, সে হয়তো তখন ঘুমাইয়া আছে। একসঙ্গে তারা যে আজ পরস্পরকে দাবি করিবে তার বাধা অনেক।

উদারচরিতানামের বউ

যতীনের মতো মজলিশি মিশুক মানুষ দেখা যায় না। বেঁটে গোলগাল মানুষটা, চিকণ চামড়া ঢাকা একটু চ্যাপটা ধরনের মুখখানিতে হাসিখুশি ভাবটাই বেশি সময় বজায় থাকে, তবে সময়বিশেষে সমবেদনাভরা গাম্ভীর্য, সংশয়ভরা জিজ্ঞাসু আশঙ্কা, বিচারহীন নির্বিকার ক্ষমা, দুঃখ, ক্ষোভ, মায়ামোহ এ সব ভাবও এমন পরিষ্কার ফুটিয়া থাকে যে পটের ছবিও তার চেয়ে স্পষ্ট নয়। গলার আওয়াজটা একটু মোটা। কিন্তু কথা শুনিয়া মনে হয় মিষ্টত্ব একটু বেশিরকম ঘন হইয়া পড়ার জন্যই বুঝি এটা হইয়াছে। কথা সে যে খুব বেশি বলে তা নয়, যা বলে তাতেই সকলের প্রাণ জুড়াইয়া যায়। ভালো, মন্দ, ধনী, দরিদ্র, মূর্খ, পণ্ডিত, বোকা, বুদ্ধিমান সকলেই ভাবে কী, উঁহু, লোকটা আমার চেয়ে একটুখানি অধম যদিবা হয় উত্তম একেবারেই নয়, সমানই বরং বলা চলে সব বিষয়ে, আমার আপনজনের মতো।

যতীনের কয়েকটা দোষ সকলে অনুমোদন করে না, তার মধ্যে প্রধান মেলামেশা আর খাতির করায় বাছবিচারের অভাব। সমজ্ঞানী অবশ্য যতীন নয়। প্রতিবেশী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামদাসকে মাঝে মাঝে অকারণেই ভক্তিভরে প্রণাম করে বলিয়া বাড়ির সামনে ফুটপাতে যে মুচিটি বসিয়া থাকে তাকে দিয়া জুতা সারাই করাইয়া নেওয়ার পরে যে পায়ের ধুলা মাথায় নেয় তা নয়, তবে যতক্ষণ সে জুতাটা সারাই করে হয়তো সামনে উবু হইয়া বসিয়া সুখদুঃখের গল্প জুড়িয়া দেয়। ব্যাঙ্কের টাকার পরিমাণে যে বড়োলোক যতটা সম্মান চায় যতীন তাকে হয়তো বেশিই দেয় তার চেয়ে, আর যে গরিব মানুষটি উপযুক্ত পরিমাণে অবহেলা না পাইলে দারুণ অস্বস্তি বোধ করে তাকে, তাকেও যথেষ্ট পরিমাণে অবহেলা দিতেও তার বাধে না। তবু বড়োলোক আর গরিব দুজনেরই মনে হয়, দুজনকেই যেন সে সমানভাবে আপন করিয়াছে : বাপ আর ছেলের সঙ্গে দুরকম ব্যবহার করিয়াও কুটুম্ব যেমন দুজনের সঙ্গেই সমান কুটুম্বিতা বজায় রাখে। এটা সকলের ভালো লাগে না, মৃদু ঈর্ষার জ্বালায় মনটা খুঁতখুঁত করে।

বাড়িতে হরদম লোক আসে, বাপের আমলের মাঝারি আকারের বাড়িটিতে। ছুটির দিন হয়তো এত লোক আসিয়া হাজির হয় যে ছোটোখাটো বসিবার ঘরটিতে জায়গা হয় না।

যতীন বলে, চলুন দাদা, ওপরে যাই সবাই মিলে।

কেউ কেউ আপত্তি করে, না না, থাক গে। মেয়েদের অসুবিধে হবে।

অসুবিধে হবে ? আহত বিস্ময়ে যতীন এমন করিয়া বক্তার মুখের দিকে তাকায় যে মনে হয় গালে চড় মারিয়াই যেন তাকে আহত আর বিস্মিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তার বন্ধুরা বাড়ির ভিতরে গেলে মেয়েদের অসুবিধা হইবে !

বিনা খবরে সদলবলে যতীন অন্তঃপুরে ঢুকিয়া পড়ে। মেয়েরা চটপট রান্নাঘরে, ভাঁড়ার ঘরে, শোয়ার ঘরে আর আনাচেকানাচে আশ্রয় নেয়। যতীনের বউ শতদলবাসিনী ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া জলের ডেকচি উনানে চাপাইয়া দেয়—এখনই সকলকে চা দিতে হইবে।

যতীন এক ফাঁকে চট করিয়া রান্নাঘরে আসে।—চা হল ?

শতদলবাসিনী বলে, জল চাপিয়েছি। আন্দাজ কত কাপ ?

এই ধরো কাপ চল্লিশেক ?—পান পাঠিয়ো' কিন্তু।

ছুটির দিনের পান সাজার দায়িত্ব সেজো ননদ কৃষ্ণার, বিবাহ হইয়া যতদিন না পরের বাড়ি যায়। জল গরম হইতে হইতে পানের খবরটা আনিতে গিয়া শতদলবাসিনী দ্যাখে কী, পান সাজা হইয়াছে মোট পাঁচ-সাতটি, পান সাজার সরঞ্জাম সামনে নিয়া কৃষ্ণা মশগুল হইয়া পড়িতেছে চিঠি। হাতের লেখা চেনা, কার চিঠি তাও জানা।

ঠাকুরঝি !

কৃষ্ণা চমকায়, থতোমতো খায়, চিঠিখানা ব্লাউজের আড়ালে চালান করিয়া দেয়, ঢোক গেলে। —এই হয়ে গেল বউদি, এক্ষুনি সেজে দিচ্ছি।

চুলোয় যাক তোমার সাজা, ফের আরম্ভ করেছ ? দুদিন বাদে তোর বিয়ে, আর তুই—

লিখলে আমি কী করব ? আমি তো লিখি না।

লেখো না কীসের, জবাব না পেয়েও সে চিঠির পর চিঠি দিয়ে যাচ্ছে। এবার কিন্তু ওঁকে সব বলব আমি, আমার তো একটা দায়িত্ব আছে। একটা কিছু ঘটুক, আর সবাই আমায় দুষুক, জেনেও চুপ করে ছিলাম।

টুকটুকে রাঙা রং শতদলবাসিনীর, রূপের আর সব খুঁত তাতে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, চোখ দুটি যে একটু ছোটোবড়ো প্রায় সে খুঁতটা পর্যন্ত। মুখভার করিয়া ট্যাবা চোখে সে তাকায় তার সেজো ননদের দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে, আর মুখ নিচু করিয়া কৃষ্ণা নীরবে পান সাজে।

দেখি কী লিখেছে আবার।

কৃষ্ণা কাতরভাবে বলে, দেখে আর কী করবে বউদি ? বলেই যখন দেবে—

শতদলবাসিনী বলে, আচ্ছা, এবারকার মতো আর বলব না। কিন্তু ফের যদি তোমরা চিঠি লেখালেখি কর—তুই বুঝিস না ভাই দুদিন পরে তোর বিয়ে—

গভীর আগ্রহে শতদলবাসিনী চিঠি পড়ে, কৃষ্ণার ঠোঁটে দেখা দেয় মুচকি হাসি আর এদিকে রান্নাঘরে উনানে চাপানো চায়ের জলের ডেকচি টগবগ শব্দে বাষ্প ছাড়িতে থাকে। চা দিতেও দেরি হয়, পান দিতেও দেরি হয়।

রাগে আগুন হইয়া যতীন আবার আসিয়া প্রায় দাঁত কড়মড় করিতে করিতে বলে, তোমরা সবাই হনুমান—এক নম্বরের জাম্বুবান তোমরা সব। একটু চা আর দুটো পান দিতে কি বেলা কাবার করবে। চাউনি দ্যাখো একবার, মারবে না কী ?

সলজ্জ হাসি হাসিয়া শতদলবাসিনী বলে, ওমা, ছি কী যে বল তুমি ! মারব কী গো ! গরম জলে হাতটা পুড়ে গেল কিনা—

পুড়বে না, যা কাজের ছিরি। নাও নাও, চটপট বানাও চা।

উপরে মজলিশে ফিরিয়া গিয়া যতীন প্রায় তার বউয়ের লজ্জা পাওয়া হাসিটাই নকল করিয়া বলে, দুধ ছিল না কিনা, একটু দেরি হয়ে গেল চায়ের। যাক, এইবার এসে পড়ছে। চা না হলে কী আলাপ জমে !

আলাপ প্রচণ্ডভাবেই জমিয়াছিল, বর্ষাকালে মেঘের গলিয়া গলিয়া অবিরাম ধারাবর্ষণের মতো, যার ঝমঝম গুঞ্জনধ্বনি শুনিতে শুনিতে মনে হয় বিশ্বব্যাপীই বুঝি হইবে। ঘরখানা মস্ত, আগে যতীনের বাবার শয়ন ঘর ছিল, আসবাবে বোঝাই হইয়া থাকিত। এখন যতীন এ ঘরে শোয় বটে, ঘরে আসবাবপত্র একরকম কিছুই নাই। মেঝের প্রায় সবটা জুড়িয়াই শতরঞ্চি পাতা, এক কোণে দেয়াল ঘেঁষিয়া বিছানার তোশকপত্র গুটাইয়া রাখা হইয়াছে। বসিবার ঘরে সবদিন সকলের স্থান সংকুলান হয় না দেখিয়া যতীন এ ঘরখানা খালি করিয়া নিয়াছে। বসিবার জন্য দেয়াল দরকার হয় না তাই দেয়ালে অনেকগুলি ছবি আর ক্যালেন্ডার লটকানো। দক্ষিণের দেয়ালের মাঝামাঝি প্রকাণ্ড তৈলচিত্র—যে জানে না দেখিলেই তার মনে হইবে নিশ্চয় যতীনের পরলোকগত পিতার ছবি।

জিজ্ঞাসা করিলে যতীন মাথা নাড়িয়া বলে, ওটা হল গিয়ে আমার এক বন্ধুর বাবার ছবি। বছর তিনেক আগে পাশের বাড়িতে এক ভাড়াটে আসিয়াছিল, বাপের একটি তৈলচিত্রের জন্য তার জোরালো সাধ ছিল। যতীন ছবিটি আঁকাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মাসখানেকের জন্য দেশে গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়া দ্যাখে, পাশের বাড়ির নতুন বন্ধুটি কোথায় যে গিয়াছে কেউ জানে না। ছেলেব চিকিৎসাব জন্য বাড়িটি যে তাবা মোটে দু-মাসের জন্য ভাড়া নিয়াছে তা কি যতীন জানিত !

কারণ যাই হোক, পুবের দেয়ালে কয়েকজন বিভিন্ন মানুষের সাধারণ কয়েকটি ফটোব মধ্যে নিজের বাবার একটি ফটো টাঙাইয়া রাখিয়া কয়েকদিনের পবিচিত একজনেব বাবাব তৈলচিত্রকে এতখানি প্রাধান্য দিতে দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া যায়, ভাবে, যতীনের মনটা সত্যই উদার বটে।

এদিকে, যতীনের মা রান্নাঘরেব দাওয়ায় বসিয়া মালা জপ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা কবে, ছেলে কী বলে গেল বউমা ?

যতীনের মা কানে একটু কম শোনে। শতদলবাসিনী এতখানি গলা চড়াইয়া তার প্রশ্নেব জবাব দেয় যে উপরের ঘরে যতীন আর সমবেত সকলেই প্রত্যেকটি কথা শুনিতে পায় : কী আর বলবে, বলে গেল চায়ে দুধ-চিনি কম দিতে, চা খাইয়েই ফতুর হবে।

এ ধরনের অপরাধের জন্য শতদলবাসিনী শাস্তি পায। দিনের বেলা যতীন সময় পায না, বাড়িতে অনেক লোক আসে, নিজেকে অনেক লোকেব বাড়িতে যাইতে হয। বাত্রে,— হযতো অনেক রাত্রেই, কারণ বিপদ রোগ আর শোক যেন পৃথিবীব সমস্ত মানুষের ঘাড়ে সব সময চাপিয়া থাকিতে ভালোবাসে এবং তাদের মধ্যে দু-চারজনকে সাহায্য পবামর্শ সেবা আর সান্ত্বনা দিতেই যে কত সময লাগে বলিবার নয—বাড়ি ফিরিয়া যতীন বউকে ডাকিযা তোলে। পাঁচ বছবেব ছেলে আর দু বছরেব মেয়েকে নিযা শতদলবাসিনী এ ঘরের লাগাও ছোটো ঘবটিতে শোয, ছেলেমেয়েব কান্না আব নোংরামি যতীনের সহ্য হয় না। দুটি ঘরের মাঝে দরজা আছে, দবকাব হইলে কখনও যতীন নিজেই ও ঘবে যায়, কখনও বউকে এ ঘরে ডাকিয়া আনে।

শাস্তির রাত্রেও ডাক শুনিয়া প্রথমটা শতদলবাসিনী বুঝিতে পাবে না শাস্তিব জন্য তাকে ডাকা হইয়াছে, ঘুম ভাঙাব বিরক্তি আর অজানা একটা অস্বস্তির মধ্যেও হঠাৎ উগ্র প্রত্যাশায সর্বাঙ্গে তার বৈদ্যুতিক রোমাঞ্চ হয়। তারপর এ ঘরে আসিয়া যতীনেব পাতা বিছানা তুলিয়া ঘর জোড়া শতরঞ্চি উঠাইযা বাহিরে নিযা গিয়া তাকে ঝাড়িতে হয। ঘর ঝাঁট দিযা আবাব শতরঞ্চি বিছাইযা পাতিতে হয় বিছানা। সমস্তক্ষণ যতীন নীরবে চুরুট টানিয়া যায়।

বিছানা পাতা হইলে চিত হইয়া শুইয়া বলে, এক গ্লাস জল দাও তো। জল দেওযা হইলে বলে, হেঁটে হেঁটে পা দুটো কেমন ব্যথা করছে। একটু টিপে দাও না ? না, অপমান হবে ?

ওমা, অপমান হবে কী গো ! কী যে বল তুমি !

যতীন চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে, ঘুমে ঢুলুঢুলু ট্যারা চোখ প্রাণপণে মেলিযা রাখিয়া দুহাতে শতদলবাসিনী তাব পা টিপিয়া দেয়, সে হাত দুটির রং তার হাতের সোনার চুড়ির রঙের সঙ্গে প্রায মিশ খায়।

কৃষ্ণার গোপন চিঠির অদ্ভুত খাপছাড়া লাইনগুলি হয়তো তার মনে পড়িয়া যায়, স্বামীর পা টেপার সময় ও সব লাইন কী মনে না পড়িয়া পারে, যে মেয়ের এখনও স্বামী হয় নাই তার কাছে একটা মাথা পাগলা ছেলের লেখা কাকুতিমিনতি হা-হুতাশ ভরা লাইন ? মনে পড়িতে পড়িতে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া ওঠার মতো হঠাৎ তার ঘুম টুটিয়া যায় : পা টেপা শেষ হইলে—? পা টেপার পুরস্কার স্বরূপ—?

সন্তর্পণে গায়ে নাড়া দিয়া সে আধো-ঘুমন্ত যতীনকে চোখ চাওয়ায়, সলজ্জ একটু মৃদু হাসি মুখে আনিয়া বলে, এবার থাক ? পরে আবার দেবখন, আঁ্যা ?

দুমিনিট দিয়েই হয়ে গেল ? বলছি ভয়ানক পা কামড়াচ্ছে।

ঘরে আলো আছে, রাস্তার একটা আলোও জানালা দিয়া দেখা যায়—অসমান চোখ দুটি যতক্ষণ জলে ভরিয়া থাকে ততক্ষণ মুখ উঁচু করিয়া সে ঘরের আলোটা দ্যাখে, তারপর জল শুকাইয়া চোখ ঢুলুঢুলু হইয়া আসিলে তাকায় রাস্তার আলোর দিকে। ঘড়িতে সময় চলার টিকটিক আর যতীনের নিশ্বাস ফেলাব স্ স্ শব্দেব সঙ্গে মাঝরাত্রির আরও কত শব্দ সে শোনে, সব শব্দ হয়তো শব্দই নয়।

তারপর একসময মেয়েটা কান্না শুরু করে, তার কান্নায় জাগিয়া গিয়া ছেলেটাও সে কান্নায় যোগ দেয়। পা টেপা বন্ধ করিয়া শতদলবাসিনী বলে, ওগো শুনছো, ওরা জেগেছে, আমি গেলাম।

না, এখন যেতে হবে না।

ওরা যে কাঁদছে ?

কাঁদুক।

আর পা টেপায় না, এবার যতীন তাব আদরের বউকে আদর করিয়া করিয়া আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলে। ছেলেমেয়ের চিৎকাব যত সপ্তমে ওঠে তার বাহুর বাঁধনও তত জোরালো। শাস্তিই বটে। এতক্ষণ এত করিয়াও যাকে শাস্তি পাওয়ানো যায় নাই এতক্ষণে যে তার শাস্তি শুরু হইয়াছে দুজনেই তা বুঝিতে পারে, যে শাস্তি দিতেছে সেও যে শাস্তিগ্রহণ করিতেছে সেও।

গোড়া হইতেই শতদলবাসিনী সব জানে, সব বোঝে। তবু সে কিছুই জানিতে চায় না, কিছুই বুঝিতে চায় না. এখনও চেষ্টা কবে জয়ের।

এতক্ষণে বাগ পড়ল ?

রাগ আবার করলাম কখন ?

কথা বলনি কিনা এতক্ষণ, তাই মনে হচ্ছিল বাগ করেছ। আচ্ছা, আজ দাড়ি কামালে কখন বলো তো ? সাবাদিন তো এক মিনিট সময পাওনি। কী খাটতেই তুমি পাবো, বাব্বা !—অত খেটো না, লক্ষ্মীটি, শবীব ভেঙে পড়বে। মধুব হাসি হাসে শতদলবাসিনী, যতীন দাড়ি কামাইয়াছে কিনা গালে আঙুল বুলাইয়া বুলাইয়া তাই পরীক্ষা কবে। হঠাৎ ভযানক বিরক্ত হইযা বলে, আঃ, কী চিল্লানিটাই শুরু কবেছে দুটোতে, জ্বালিয়ে মাবলো। মেঝেতে আছড়ে ফেলতে সাধ যায়। ছাড়ো তো দুটোকে শান্ত কবে আসি, এখখুনি আসব, দুমিনিটের মধ্যে।

কাঁদুক না। ছেলেপিলের কাঁদা ভালো। দবজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আসছি, দাঁড়াও।

যতীন দু-ঘবের মাঝখানের দবজাটা বন্ধ কবিয়া দিতে উঠিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে গিয়া শতদলবাসিনী পাশ কাটাইযা চট কবিযা ও ঘরে চলিযা যাওযার চেষ্টা করে, কিন্তু স্বামীর বাহুর বন্ধনের সঙ্গে বউ কেন পাবিয়া উঠিবে ?

দরজাটা বন্ধ করা হয়, কিন্তু ছেলেমেয়ের চিৎকারের শব্দ আটকানো যায় না। একটু পরেই ও ঘরের বারান্দার দিকের দরজায় দুমদুম করাঘাতের শব্দ পাওয়া যায়, কৃষ্ণার গলা শোনা যায়, বউদি, ও বউদি ? কী ঘুম বাবা তোমাব ?—বউদি, ও বউদি ?

কৃষ্ণার বিবাহের মাস দুয়েক দেরি আছে। পাত্রটি তেমন সুবিধার নয়। বাড়ির অবস্থাও ভালো নয়, নিজের উপার্জনও বেশি নয়, বয়সটাও কম নয়। কৃষ্ণার পছন্দ-অপছন্দের অবশ্য প্রশ্নই ওঠে না, বাড়ির অন্য কারও পছন্দ হয় নাই। মা দিনরাত খুঁতখুঁত করে, বিবাহিতা বড়ো বোন দুটি আপশোশ ভরা চিঠি লেখে, আত্মীয়স্বজনেবা জিজ্ঞাসা কবে, এমন মেয়ের এমন পাত্র ঠিক করা কেন, বাজারে কী আর ছেলে নাই ?

যতীন বলে, কত লোক বোনের বিয়েই দিতে পারছে না, কানাখোঁড়ার হাতে দিতে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত। আমার বোন বলে কী তার জন্য রাজপুত্তুর আনতে হবে ? মন্দই বা কী ছেলেটি ? স্বাস্থ্য ভালো, রোজগারপাতি করছে—আবার কী চাই ?

তাছাড়া পাত্রটি সস্তা।

এটাই যে একটা মস্ত বড়ো কারণ, শতদলবাসিনীর কাছেই সে কেবল তা স্বীকার করে। টাকাপয়সার টানাটানিটা তার সবসময় লাগিয়াই আছে। বাপের অবস্থা তার ভালোই ছিল, দেশে কিছু সম্পত্তি আছে, ব্যাঙ্কে কিছু টাকা ছিল, নিজেও মাসে মাসে বেতন পায় প্রায় তিনশো টাকা। তবু ধার দিয়া আর দান করিয়া টাকায় তার কুলায় না। ব্যাঙ্কের টাকাগুলি যতদিন ছিল ততদিন চেক কাটিয়া কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে, এখন অসুবিধার সীমা নাই। দেশের সম্পত্তির আয়টা বছরে হাজার দুয়ের কাছাকাছি ওঠে নামে। এই আয়টা আছে বলিয়া রক্ষা, নয়তো কী যে হইত !

বউয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে যতীন এ বিষয়ে আলোচনা করে। স্বামীর মুখে দুর্ভাবনার ছাপ দেখিয়া শতদলবাসিনী বলে, এমন করে টাকাগুলো যদি নষ্ট না করো—

নষ্ট মানে ?—

আহা, যাদের ধার দাও, তারা কেউ একটি পয়সা কখনও ফেরত দিয়েছে, না দেবে ? যাদের এমনি টাকা দাও, তাদের আদ্দেকের বেশি মিথ্যে কাঁদুনি গেয়ে তোমায় ভোলায়।

মিথ্যে কাঁদুনি গেয়ে ভোলায় ? নাম করো তো একজনের কে ভুলিয়েছে ?

শতদলবাসিনী আর যতীনের বন্ধু কজনের নাম জানে, কাকে কী উপলক্ষে কখন ধার দিয়েছে বা দান করিয়াছে তাই বা সে কী জানে। সে সময় তো যতীন তার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসে না। অনেক ভাবিয়া একটি দৃষ্টান্তই কেবল তার মনে পড়ে। তিন-চারবছর আগের ঘটনা, যখন হইতে যতীনের দান করা রোগটা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কেন, সেই যে সেবার শান্তির বিয়েতে সাতাশ শো টাকা দিলে ? ওর বাবার মাইনে কম হোক, ওর দাদা তো সাত-আটশোটাকা মাইনে পায়।

যতীন অসহিষ্ণু হইয়া বলে, সব-দাদাই কি বেশি মাইনে পেলে বোনের বিয়েতে টাকা ঢালে ? টাকা কম পড়ল, শান্তির দাদা দিতে চাইল না, তাইতো আমি দিলাম। আমি শেষ মুহূর্তে পাত্র বদলে দিলাম, বেশি টাকার দরকার হল, আমি না দিলে কে দেবে ? আমার একটা দায়িত্ব নেই ?

শতদলবাসিনী জিজ্ঞাসা করে না যে পরের মেয়ের কোন পাত্রের সঙ্গে বিবাহ, সাতাশ শো টাকার খেসারত দিবার দায়িত্ব নিয়া সে বিষয়ে মাথা ঘামাইতে যাওয়ার কী দরকার পড়িয়াছিল, যতীনকে ও কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা। মৃদুস্বরে সে শুধু বলে, নাইবা বদল করতে পাত্র ? বেশি ভালো পাত্র এনে লাভ তো হয়েছে ভারী, মেয়ের চোখের জল শুকুচ্ছে না। তার চেয়ে আগের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হলে হয়তো—

যতীন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কী করে জানলে শান্তি দুঃখ পাচ্ছে।

ওমা, তা জানবো না ? সেজদি যে ভাগলপুরে থাকে। ননদ সেজদি নয়, আমার সেজদি—সেই যে বিয়ের সময় যে তোমার টিকি কেটে নিয়েছিল না ?—সে।

টাকার আলোচনা বেশিক্ষণ তাদের মধ্যে চলে না, অল্পক্ষণের মধ্যেই ব্যক্তিগত সমালোচনায় দাঁড়াইয়া যায়। এক তরফা সমালোচনা, যতীন বলিয়া যায় আর শতদলবাসিনী চুপ করিয়া শোনে। টাকা সম্বন্ধে শতদলবাসিনীর সংকীর্ণতা কত যে পীড়ন করে যতীনকে বলিবার নয়। ভালো কাজেই যদি না লাগে, টাকার তবে আর মূল্য কী ? মানুষের চেয়ে টাকা কি বড়ো ? এতই যদি টাকা ভালোবাসে শতদলবাসিনী, বাপকে বলিয়া রক্তমাংসের একটা মানুষের বদলে টাকার একটা বস্তাকে বিবাহ করিলেই পারিত !

আমি মরলেই হাজার বিশেক টাকা পাবে। একদিন বিষ-টিস খাইয়ে দিয়ো বরং।

ওমা, বিষ খাওয়াবো কী গো ? কী যে বলো তুমি !

আলোচনাটা হইয়াছিল বর্ষাকালের এক সন্ধ্যাবেলায়। তিন দিন পরে অবিশ্রাম বর্ষণের মধ্যে যতীন ভাগলপুর চলিয়া গেল।

শান্তির জন্য যাচ্ছ ?

হ্যাঁ।

কী আশ্চর্য, সেজদি আন্দাজে কী লিখেছে না লিখেছে—

দেখেই আসি কেমন আছে।

পাঁচ দিন পরে সে ফিরিয়া আসিল এবং আসিয়াই শান্তির শ্বশুরের নামে পাঠাইয়া দিল পুরা একটি হাজার টাকা। শতদলবাসিনী ব্যাপারটা জানিতে পারিল আরও দিন সাতেক পরে।

টাকা পাঠালে কেন ?

যতীন হাই তুলিয়া বলিল, পণের সব টাকা দেওয়া হয়নি বলে ওরা শান্তিকে কষ্ট দিচ্ছিল কিনা, তাই পাঠিয়ে দিলাম।

সহজ কৈফিয়ত, কিন্তু শতদলবাসিনীর ট্যারা চোখের সঙ্গে ভ্রু দুটি পর্যন্ত কুঁচকাইয়া গেল। টাকা পেলে কোথায় ?

তা দিয়ে তোমার দরকার কী ?

শতদলবাসিনী উদাসভাবে বলিল, না আমার আর দরকার কী। ধার করেছ কিনা তাই জিজ্ঞেস করছিলাম ?

তাই বা জিজ্ঞেস করবে কেন ?

যতীনের মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছে বুঝিয়া শান্তির ভয়ে শতদলবাসিনী আর কথাটি বলে না। টাকা সম্বন্ধে নিজের হীনতার চেয়ে স্বামীর উদারতাই তাকে বেশি কাবু করিয়া ফেলে এবং সে জন্য ক্ষণিকের গ্লানি বা অনুতাপ বোধ করিবার মতো উদারও সে নয়। নিজের বোনের বিবাহের বেলায় যার টাকা থাকে না, পরের মেয়ের জন্য সে হাজার হাজার টাকা খরচ করিতে পারে, নিজের না থাকিলে ধার করিয়া জোগাড় করে, এ রকম পরোপকার আজ যেন হঠাৎ তার বড়ো বেশি রকমের খাপছাড়া মনে হয়। এবং দু-একটাদিন কাটিতে মনে হয়, শুধু খাপছাড়া নয়, এটা অন্যায়ও বটে।

কৃষ্ণার জন্য সস্তায় অপাত্র কেনা হইতেছে বলিয়া শতদলবাসিনীর এতদিন বিশেষ আপশোশ ছিল না। যে মেয়ে গোপনে পরের ছেলের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেমনতেমন একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হইয়া যাওয়াই ভালো। পঁচিশ-ছাব্বিশবছরের রোগা লম্বা গোঁয়ার-গোবিন্দ এক ছোঁড়া যাকে ও রকম আবোলতাবোল কথা-ভরা চিঠি পাঠায়, একটু বেশি বয়সের মোটাসোটা একজনের সঙ্গেই তার বিবাহ হওয়া উচিত—শাসনে থাকিবে। কেন যতীনও তো তাকে বেশি বয়সেই বিবাহ করিয়াছে, বিবাহের সময় যতীনও তো কম গোলগাল ছিল না, কিন্তু তাতে কী আসিয়া গিয়াছে ? স্বামীকে অপছন্দ করিয়া সে কি কোনোদিন গোপনে কারও সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করিয়াছে ? তার যদি এতেই মন উঠিয়া থাকে, কৃষ্ণার উঠিবে না কেন ? রূপে বল, গুণে বল, কোন দিক দিয়া তার সঙ্গে কৃষ্ণার তুলনা চলে ? এমন রং আছে কৃষ্ণার, এমন গড়ন, এমন মধুর স্বভাব ? এই সব ভাবিত আর অপাত্রটিকেই কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া তার বিশ্বাস জন্মিয়া যাইত। এবার কিন্তু তার মনে হয়, রূপে গুণে যতই তুচ্ছ আর খারাপ মেয়ে হোক কৃষ্ণা, সে তো শান্তির চেয়ে তুচ্ছ নয়, খারাপ নয় ? শান্তির জন্য যদি দফে দফে এত টাকা খরচ করা যাইতে পারে, কৃষ্ণার জন্য কেন যাইবে না ? পরের মেয়ের জন্য যতটা করা হইয়াছে, ঘরের মেয়ের জন্য অন্তত ততটুকু করা উচিত।

কিন্তু করিবে কে ? যতীনের বড়ো টাকার টানাটানি।

ভাবিতে ভাবিতে শতদলবাসিনীর সোনার মতো মুখের রং একটু বিবর্ণ হইয়া আসে, উনানের আঁচেও আর যেন তেমন রং খোলে না। সামনে দাঁড়াইয়া সে কৃষ্ণার কণ্ঠার হাড়ের কাছে জমানো ময়লা চাহিয়া দ্যাখে, পিছন হইতে দ্যাখে তার দোলনময় চলন। মমতায় কাতর হইয়া ভাবে, আহা, এই মেয়েকে টাকার জন্যে একটা ধেড়ে হনুমানের কাছে বলি দেওয়া হইবে, একটা পিপের মতো মোটা জাম্বুবান হইবে এই কচি মেয়েটার বর ?

মুখ তোমার শুকনো দেখাচ্ছে কেন ঠাকুরঝি ?

কী জানি, জানি না তো ?

না ঠাকুরঝি, অত ভেবো না তুমি। আমি সব ঠিক করে দেব। আর চিঠি লিখেছে ?

কৃষ্ণা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভান করে কিনা সেই জানে, বলে, কে চিঠি লিখবে ?

আহা, তোমার সে গো—সে। রোজ পাঁচ-দশটাচিঠি লেখালেখি করছো, জান না কে ?

ও, সে ? কৃষ্ণা হঠাৎ রাগিয়া যায়, তুমি কেমন ধারা ইয়ে বউদি, বলছি আজ পর্যন্ত আমি একটা চিঠির জবাব দিইনি, বিশ্বাস হয় না কেন তোমার ?

শতদলবাসিনীও রাগিয়া যায়, কেন দাওনি জবাব ? কী এমন মহাপুরুষটা তুমি যে একটা চিঠির জবাব দিতে বেধেছে ? মিছিমিছি মানুষের মনে কষ্ট দিতে বড্ড ভালো লাগে, না ? মেয়েমানুষ জাতটাই এমনি।

কৃষ্ণা যেন মেয়েমানুষ জাতটার সম্মান বাঁচানোর জন্যই বলে, একটা জবাব দিয়েছি। লিখে দিয়েছি, ফের আমার কাছে চিঠি লিখলে পুলিশে ধরিয়ে দেব।

ওমা, পুলিশে ধরিয়ে দেবে কী গো ? কী যে বল তুমি !

সে বিব্রত হইয়া থাকে, অশান্তি বোধ করে। ভাদ্রের গরমটা যখনই অসহ্যবোধ হয় তখনই মনে পড়ে আশ্বিনের বেশি দেরি নাই। আশ্বিনের গোড়ায় কৃষ্ণার বিবাহ হইয়া যাইবে। তার নিজেরই যেন একটা বড়ো রকমের বিপদের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। চিঠি লিখিলে পুলিশে ধরাইয়া দিবে লিখিয়া দিয়াছে ? তার আগে একখানা চিঠিরও জবাব দেয় নাই ? এ আবার কী ব্যাপার ! অমন আগ্রহের সঙ্গে কেন তবে সে চিঠিগুলি পড়িত, পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইয়া যাইত ? ব্লাউজের আড়ালে চিঠি লুকাইয়া সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইত ? বড়ো প্যাঁচালো কাণ্ড-কারখানা সংসারে, বড়ো গোলমেলে মানুষের চালচলন।

তার এত দুর্ভাবনা কেন শতদলবাসিনী বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শান্তির সঙ্গে কৃষ্ণার যেন একটা নেপথ্য সংগ্রাম চলিতেছে, কৃষ্ণার পরাজয়ের কথাটা সে ভাবিতেও পারে না। তাই যদি ঘটে, বাঁচিয়া থাকিয়া সুখ কী ? কীসের ছেলেমেয়ে, কীসের স্বামী, কীসের সংসার, কীসের রাঁধাবাড়া !

খাইতে বসিয়া যতীন চিৎকার করে, ডালে নুন পড়েনি, মাছের ঝোল নুনকাটা, দিন দিন কী হচ্ছে শুনি ? দূর করে দেব বাড়ি থেকে সব কটাকে—লক্ষ্মীছাড়া বজ্জাত এসে জুটেছে কোথা থেকে, জ্বালিয়ে মারলে।

মা যদিবা কানে কম শোনে, এ কথাগুলি শুনিতে পায়। ডাকিয়া বলে, বউমা, খারাপ শরীর নিয়ে কেন রাঁধতে গেলে বাছা ? ভালো মানুষের এ গরম সয় না, খারাপ শরীরে—

যতীন ধমকাইয়া ওঠে, তুমি থামো, খারাপ শরীর না তোমার মাথা।

পাশের বাড়ির দোতলার ছাদের একদিকের খানিকটা আলিসায় ঝুঁকিলে এ বাড়ির বারান্দা দেখা যায়। নাতির কাঁথা মেলিয়া দিতে দিতে পাশের বাড়ির গিন্নি আলিসায় ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করে, কী হয়েছে বাবা।

মুখ তুলিয়া চাহিয়া যতীন হাসিমুখে বলে, কিছু হয়নি পিসিমা। নন্দর চিঠি পেয়েছেন ?

যতীনের পাতানো পিসি সরিয়া গেলে শতদলবাসিনী একবাটি দুধ আনিয়া দেয়। আজ দুধ দিয়েই খাও। কদিন শান্তিব রান্না খেয়ে এসে আমার রান্না মুখে রুচছে না, না ?

মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারার জন্য ডালের বাটিটা তুলিয়া নিয়া দেখিতে পায় ও বাড়ির পাতানো পিসিমা আড়ালে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু চলিয়া যায় নাই। আলিসার আড়ালে লুকাইয়া একটা ফাঁক দিয়া এদিকেই চাহিয়া আছে। ডালেব বাটিটা যতীন নামাইয়া রাখে।

শতদলবাসিনী বুঝিতে পারে, শাস্তিটা রাত্রির জন্য তুলিয়া রাখা হইল। তা হোক, শাস্তির ভয় কে করে ? সব শাস্তির শেষ আছে কিন্তু কতগুলি ব্যাপার যেন কিছুতেই শেষ হইতে চায় না।

ননদের সঙ্গে খাইতে বসিয়া সে বলে, একখানা চিঠি লেখো না ঠাকুরঝি ?

কাকে চিঠি লিখব ?

তোমার সেই তাকে ?

ও, তাকে ? তুমিই লেখো না ?

শতদলবাসিনী মুখভার করিয়া নুনকাটা মাছের ঝোলমাখা ভাত খাইতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে বলে, তুমি বড়ো বোকা ঠাকুরঝি, বড্ড বোকা। আমি হলে কী করতাম জানো, পালিয়ে যেতাম।

পালিয়ে গিয়ে কী খেতে ?

সেও একটা সমস্যা বটে। মেয়েমানুষ হইয়া এ সমস্যাটা না বুঝিয়া উপায় নাই। কৃষ্ণা তবে অনেক ভাবিযাই পুলিশে ধরানোর ভয দেখাইয়া চিঠি লিখিয়াছে।

কৃষ্ণা খাওয়া বন্ধ করিয়াছিল। মুখেব ভাবটা তার কাঁদো কাঁদো।

তুমি যে বলেছিলে সব ঠিক করে দেবে, দাও না ? দু-চারদিনের মধ্যে বিয়েটা ঘটিয়ে দাও না।

দু-চারদিনের মধ্যে বিয়ে ! কাব সঙ্গে ?

যার সঙ্গে ঠিক হয়েছে, আবার কার সঙ্গে।

এই ভাদ্র মাসে ?

হোক ভাদ্র মাস।

কথা শুনিলে মনে হয তামাশা করিতেছে, মুখ দেখিলে বিশ্বাস হয় না। শতদলবাসিনী তাই মাখা ভাত নাড়াচাড়া করিতে করিতে চুপ করিয়া থাকে। কৃষ্ণা অধীর হইয়া বলে, চোখ নেই তোমার ? আমায় দেখে বুঝতে পার না ?

একটু একটু যেন বুঝতে পারি পারি করছিলাম ঠাকুরঝি, ভরসা পাইনি। চিঠির জবাব দিতে না বললে, অথচ—দেখা হত, না ?

হত।

তারপর দুজনেই চুপচাপ। আর খাওয়া গেল না, মাছ-তরকারিও আজ অখাদ্য হইয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে বলিল, ভাদ্র মাসে তো বিয়ে হয় না ঠাকুরঝি, একটা মাস দেরি করতেই হবে।

রাত্রে ছেলেমেয়েরা ঘুমাইয়া পড়িতে দেরি করিতে থাকে, একজন ঘুমায় তো আরেকজন জাগিয়া উঠে। যতীন দশটা বাজার আগেই শুইয়া পড়িয়াছিল, ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে শতদলবাসিনী আহ্বানের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া থাকে। আজ সে শাস্তি গ্রহণ করিবে না—যাই বলুক যাই করুক যতীন আজ সে বিদ্রোহ করিবেই। একবার এখন ডাকিলেই হয়। আজ যেন তার সাহস বাড়িয়া গিয়াছে, সমাজ সংস্কার নীতি ধর্ম সব কিছুর বিরুদ্ধে যাইতে কৃষ্ণার যত সাহস দরকার হইয়াছিল তার চেয়ে বেশি। যতীন ডাকিয়া যেই বলিবে, পা টেপো, মাথা উঁচু করিয়া জবাব দিবে পারবো না, আমি তোমার পা-টেপা দাসী ?

তারপর ? তারপর যা হয় হইবে। কৃষ্ণা চোখ মেলিয়া ভবিষ্যতের কত গাঢ় অন্ধকারকে বরণ করিয়াছে, সে চোখ বুজিয়া গালে একটা চড় খাইতে পারিবে না ?

মনের মধ্যে সদিচ্ছার চিতা জ্বলিতে থাকে, বীরত্বের দীপ্তিতে আত্মসম্মান উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। নিজেকে শতদলবাসিনীর মনে হইতে থাকে অতি উত্তম, অতি মহৎ—একেবারে অসাধারণ কিছু। কিন্তু হায়, ছেলেমেয়ে ঘুমাইয়া পড়ে, রাস্তার ও পাশের বাড়ি দুটির সব আলো নিভিয়া যায়,পাড়া নিঝুম হইয়া আসে কিন্তু বিদ্রোহ করার সুযোগ দিতে কেউ তো ডাকে না।

তারপর যতীনের নাক ডাকার শব্দ কানে আসিলে মনটা খারাপ হইয়া যায়। শাস্তি দিতে না ডাকিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ? নিজেকে বড়ো অসহায়, বড়ো নিরুপায় মনে হইতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া গিয়া শতদলবাসিনী ঘুমন্ত স্বামীর পা টিপিতে আরম্ভ করে।

প্রৌঢ়ের বউ

রসিকের প্রৌঢ়ত্বের সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ এই মৃত্যুভয়। মরণের অবিরাম গুঞ্জন, আমি আসিতেছি, আমি আসিতেছি, শুনিয়াও না শুনিবার সতেজ ঔদ্ধত্য ঝিমাইয়া পড়ায় এই বয়সে মানুষের প্রথম খেয়াল হয়, দূর হইতে মরণ আশ্বাস দিয়া বলিতেছে, এখনও সময় হয় নাই, একটু অপেক্ষা করো। মরণের স্বাদ পাইতে পাইতে বৃদ্ধ ভাবে, দেরি আছে, এখনও দেরি আছে : জীবন বিস্বাদ হওয়ায় প্রৌঢ় ভাবে, হায়, দিন যে আমার ফুরাইয়া আসিল।

তাই, রসিক ভাবিত, দুদিনের জন্য কচি একটা মেয়েকে বউ করিয়া বাড়িতে আনা উচিত হইবে না। কেবল তাই নয়, ছেলেমানুষ বউ নিজে কত ছেলেমানুষি করিবে আর তার কাছে কত ছেলেমানুষি আশা করিবে ভাবিলেও রসিকের বড়ো অস্বস্তি বোধ হইত। আর কি তার সে বয়স আছে ? প্রতিদান দেওয়া দূরে থাক, অল্পবয়সি বউয়ের অন্তহীন ন্যাকামি হাসিমুখে সহ্য করিয়া চলাও কি তার পক্ষে সম্ভব হইবে ? যে চলিয়া গিয়াছে সে ছিল জননী ও গৃহিণী, আসিবে একটি চঞ্চলা বালিকা। তার সঙ্গে কি বনিবে রসিকের ?

প্রয়োজন ছিল না, ইচ্ছা ছিল না, তবু একদিন রসিকের বিবাহ হইয়া গেল।

একদিন অসময়ে তাকে অন্দরে ডাকিয়া সুলোচনা বলিল, এই মেয়েটিকে দ্যাখো তো ঠাকুরপো। ওর নাম সুধারাণী।

রসিক থতোমতো খাইয়া বলিল, তাই নাকি ? তা, বেশ তো।

কচি খুকি নয়, বেশ বড়োসড়ো মেয়েটি। মুখখানা গম্ভীর। মেঝেতে জাঁকিয়া বসিবার ভঙ্গিতে কেমন একটু গিন্নি গিন্নি ভাব আছে। রসিক তো জানিত না সুলোচনাই সুধারাণীকে চওড়া কালোপাড় শাড়িখানি পরাইয়াছে, কানের দুল খুলিয়া ফেলিয়া বালা আর অনন্ত পরাইয়াছে, চুলের জটিল বিন্যাস নষ্ট করিয়া মাঝখানে সিঁথি কাটিয়া পিছন দিকে টানিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে আর ধমক দিয়া বলিয়াছে : মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকো বাছা, একটু যদি লজ্জা করবে আমার দেওরকে দেখে, একটু যদি চঞ্চল হবে....,। সুধারাণীকে রসিকের তাই মন্দ লাগিল না।

তারপর সুলোচনার কাছেই শোনা গেল, মেয়েটার নাকি বয়স হইয়াছে অনেক। গরিব বাপ নাকি বিবাহ দিতে পারে না, কুড়ি পার হইয়া মেয়ে তাই হইয়া গিয়াছে বুড়ি।—সময়মতো বিবাহ হলে অ্যাদ্দিনে তিন ছেলের মা হত, ঠাকুরপো।

বিবাহ করার জন্য এতদিন সকলের অনুরোধ উপরোধ যথারীতি চলিতেছিল, সুলোচনার ব্যবস্থাতেই বোধ হয় এবার সেটা দাঁড়াইয়া গেল রীতিমতো আক্রমণে। রসিক হার মানিয়া বলিল, তবে তাই হোক।

সুধারাণীকে দেখার জন্য হার মানার ইচ্ছা তার কতটুকু জাগিয়াছিল বলা কঠিন।

এমনই কপাল সুধারাণীর, প্রথমবারের আলাপে প্রথম শব্দটিতেই সে রসিকের মন বিগড়াইয়া দিল। রসিকের মনে অনুতাপ, আত্মসমর্থন, দ্বিধা সংকোচ ঔৎসুক্যের আলোড়ন চলিতেছিল, কখনও জাগিতেছিল বিষাদ, কখনও প্রত্যাশার আনন্দ। নিজেকে নিয়াই সে বড়ো ব্যস্ত হইয়াছিল।

একদিন রাত প্রায় এগারোটার সময় বাহিরের ঘরে কাজ করার নামে সে আকাশপাতাল ভাবিতেছে, ধীরে ধীরে সুলোচনা ঘরে আসিয়া বলিল, ঠাকুরপো, একটিও নাকি কথা কওনি বউয়ের

সঙ্গে ? একটা দুটো পর্যন্ত নাকি কাজ কর এখেনে ? ছি ঠাকুরপো, ছি, এমন করে কী কষ্ট দিতে আছে ছেলেমানুষের মনে ? ঘরে লুকিয়ে চুপিচুপি আজ কাঁদছিল।

ভালো উদ্দেশ্যেই সুলোচনা বানানো কথাটা বলিয়াছিল, কিন্তু ফলটা হইল বিপরীত। রসিক ভাবিল, ছেলেমানুষ ? কাঁদিতেছিল ? কী সর্বনাশ ! এতটুকু যার ধৈর্য নাই তার কাছে তবে আর কী আশা করা চলিবে ?

তবু বিবাহ যখন করিয়াছে, মেয়েটির মনে কষ্ট না দেওয়াই কর্তব্য বিবেচনা করিয়া রসিক আজ প্রথম রাত একটার আগে, সুধারাণীকে ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িবার সুযোগ না দিয়াই ঘরে গেল। ভাবিল, সুধারাণীকে বুঝাইয়া দিবে, এ সব অবহেলা নয়, আদরযত্ন স্নেহমমতার অভাব তার হইবে না। তবে রসিক বুড়া হইয়া পড়িয়াছে কিনা, মানাইয়া চলিতে হইলে সুধারাণীর একটু ধীর স্থির শান্ত না হইলে চলিবে কেন ?

খাটের একপ্রান্তে পা ঝুলাইয়া সুধারাণী বসিয়াছিল, আস্তে আস্তে দুলাইতেছিল দুটি পা। হয়তো আনমনে, নয়তো অভ্যাসের বশে। একে তো তাকে দেখিলেই মনে হয় কার যেন সে প্রতীক্ষা করিতেছে, তার উপর ঠিক তার বড়ো মেয়েটির মতো দুপাশে হাত রাখিয়া বসিয়া পা দুলাইতে দেখিয়া রসিক হতাশ হইয়া গেল। হয়তো সুলোচনা জানাইয়া দিয়া গিয়াছে এখনই স্বামী ঘরে আসিবে, কিন্তু এমন বেশে প্রেমিকের পথ চাওয়া এমন অধীর প্রতীক্ষা কেন ? হরিণীর মতো চঞ্চলা যে দশ বছরের মেয়ে, তার অনুকরণে পা দোলানো কেন ?

রসিককে দেখিয়া সুধারাণী একটু জড়সড় হইয়া বসিল—সামান্য একটু। বেশি লজ্জা করিতে সুলোচনা বারণ করিয়া দিয়াছে। রসিক গম্ভীর মুখে হাত দুই তফাতে বসিল, সভায় আসন গ্রহণ করার মতো আড়ম্বরের সঙ্গে।

কী বলিয়া কথা আরম্ভ করা যায় ? এত জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা রসিকের, এত ধীর স্থির শান্ত তার প্রকৃতি, একটি তরুণীর সঙ্গে কথা আরম্ভ করিতে গিয়া বিন্দু বিন্দু ঘাম কী দেখা দিল রসিকের কপালে ? হায় রে কপাল, সতেরো বছর আগে বিবাহের রাত্রেই প্রমীলার সঙ্গে কথা বলিতে গিয়া তার তো কথা খুঁজিতে হয় নাই, ঘর খালি হওয়া মাত্র চাপা গলায় মহাকাব্যের ছন্দে আদরের সুরে আপনা হইতেই যেন উচ্চারিত হইয়াছিল, কেমন লাগছে ? এখন থেকে তুমি আমার হয়ে গেলে।

অনিশ্চয়তায় বিপন্ন মানুষের মতো চিবুকে আঙুল ঘষিতে ঘষিতে শেষে রসিক বলিল, তোমায় ক-টা কথা বলব সুধা।

সুধা কিছুই বলিল না।

আমার বয়েস হয়েছে, তোমার হয়তো আমাকে ঠিক পছন্দ হয়নি—

শুনিয়া চেষ্টা করা গম্ভীর মুখে কী দুষ্টামিভরা হাসিই যে দেখা দিল সুধারাণীর ; কানের দুলে আলোর ঝলক তুলিয়া মাথা নিচু করার পলকটির মধ্যে মানুষকে মর্মাহত করা কী তীক্ষ্ণ চকিত দৃষ্টিতেই একবার সে চাহিয়া নিল রসিকের চোখের দিকে। অস্ফুটস্বরে সে বলিল, ধেৎ।

রসিক নীরবে তার কাজের ঘরে চলিয়া গেল, যখন মনে হইল এতক্ষণ সুধার পক্ষে জাগিয়া থাকা অসম্ভব, তখনও ফিরিয়া গেল না। কাজের ঘরেই শুইয়া রহিল। প্রমীলার আমলেও এ ঘরে তার জন্য একটি বিছানা প্রস্তুত থাকিত, যদিও তখন এ বিছানায় সে ঘুমাইত কদাচিৎ।

এ ঘরে রাত কাটানোর ব্যবস্থা অবশ্য স্থায়ী করা গেল না, লোকে বলিবে কী ? কাজের নামে এখানে অনেক রাত পর্যন্ত কাটানো চলে, বিশেষ কাজের নামে মাঝে মাঝে দু-একটা রাত কাবার করাও চলে, কিন্তু ফাজিল একটা মেয়ে বউ হইয়া অন্দরে প্রমীলার শয়ন ঘরটি দখল করিয়াছে বলিয়াই সে ঘরটিকে তো জীবন হইতে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলা যায় না। প্রৌঢ় রসিকের পক্ষে ও রকম ছেলেমানুষি করা অসম্ভব।

ফাজিল বউটাকেও একেবারে বাদ দিয়া দিন কাটানো যায় না। বিশেষত সুলোচনা যখন আছে এবং কোমর বাঁধিয়া রসিকের পিছনে লাগিয়াছে। নানা ছুতায় সুলোচনা সুধারাণীকে রসিকের কাছে পাঠায়, এমন অবস্থাই সৃষ্টি করে যে রসিকের দৈনন্দিন জীবনের অনেকগুলি খুঁটিনাটি প্রয়োজন সুধারাণীকে ছাড়া মিটিবার কোনো উপায় থাকে না। তার ফলে সুধারাণীর অস্তিত্ব রসিকের কাছে খানিকটা অভ্যস্ত হইয়া যায়, টুকরা টুকরা সান্নিধ্যে বাহিরের একটা সহজ সম্পর্ক তাদের মধ্যে গড়িয়া ওঠে, ছোটোবড়ো অনেক উপলক্ষে প্রশ্ন আর জবাবের ধাঁচের আলাপ আলোচনাও চলে, কিন্তু আর কিছুই হয় না। মধ্যস্থের চেষ্টায় কবে কোন স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল ঘটিয়াছিল, চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধ, ফাল্গুনের হাওয়া, রাতজাগা বাজেকথার কাব্য, এইসব চিরকালের মধ্যস্থ ছাড়া ?

সুলোচনা বলে, ব্যাপার কী বলো তো ঠাকুরপো ? সুধাকে তোমার পছন্দ হয়নি ?

রসিক বলে, বুড়ো বয়সে আবার পছন্দ অপছন্দ।

তবু ব্যাপারটা কী শুনি না ? না হয় বললেই আমায় ?

সুধা বড়ো ফাজিল বউঠান। ফাজিল মেয়ের সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার বয়স কী আমার আছে, আজ বাদে কাল চোখ বুজব আমি ?

সুলোচনা এবার রাগ করিয়া বলে, ফাজিল ! সুধা ফাজিল ! একটা সাত ছেলের মা বুড়িকে এনে দিলে তুমি সুখী হতে, না ? সাত ছেলের মাও কিন্তু একটু আধটু ফাজলামি করে ঠাকুরপো, আর দশটা মানুষের মতো। তোমার মতো গণেশ ঠাকুর সবাই নয়।

সুলোচনার রাগ দেখিয়া রসিকের মনের অশান্তি বাড়িয়া যায়। মাঝে মাঝে ইচ্ছা তো করে তার সুধারাণীকে বউয়ের মতো আদর করিতে, কিন্তু অনেকদিন আগে প্রমীলার সঙ্গে যে ছেলেমানুষি খেলার আবছা স্মৃতিটুকু শুধু মনে আছে, আজ সে খেলার পুনরভিনয় আরম্ভ করার কথা ভাবিলেই তার যে ভয় হয়, বিতৃষ্ণা জাগে। মনে হয়, দূরে বসিয়া থাকিলে যার মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া থাকে, গম্ভীরভাবে তাদের সম্পর্কের গভীর সমস্যার কথা তুলিলে যে দুষ্টামির হাসি হাসে, কাছে গিয়া বসিলেই যার লজ্জা সংকোচ ভীরুতার অসহ্য ন্যাকামি দেখা দেয়, অপটু একটু সেবাযত্নের চেয়ে সর্বাঙ্গের লাবণ্য, মুখের কথা আর চোখের চাহনি দিয়া যে দিবারাত্রি মন ভুলানোর চেষ্টা করে, তাকে আপন করিতে গেলে সং সাজিতে হইবে, অভিনয় করিতে হইবে হাস্যকর। অন্য কিছুতে সুধারাণীর মন উঠিবে না, আর কোনো খেলা সে বুঝিবে না। প্রমীলার সঙ্গে যে খেলা তার চলিত শেষের দিকে, তার গাম্ভীর্য গভীরতা আর মাধুর্যের খবর তো সুধারাণী জানে না। সাংসারিক সমস্যার আলোচনা যে চটুল প্রেমের কাকলির চেয়ে প্রীতিকর হইতে পারে, বুঝাইয়া বলিতে গেলে সুধারাণী মুচকি মুচকি হাসে। প্রমীলার প্রথম বয়সের সেই গা-জ্বালানো হাসি, চুম্বন ছাড়া আর কিছু দিয়াই সে হাসি মুছিয়া নেওয়া যাইত না।

সুলোচনা যতই চেষ্টা করুক, রসিক তাই মনের বিরাগ জয় করিয়া কোনোমতেই নতুন বউকে কাছে টানিতে পারে না এবং এমনিভাবে দিন কাটিতে থাকে। সুধারাণীর মুখের বিস্ময় ও বিষাদের ভাব ঢাকিয়া ক্রমে ক্রমে এক দুর্বোধ্য অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে থাকে।

কাজের ঘরে প্রতিদিন রাত্রি একটা পর্যন্ত জাগিয়া থাকিতে প্রথম প্রথম রসিকের কষ্ট হইত, মাঝে মাঝে বিছানায় শুইয়া কাজ করিতে গিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িত খেয়ালও থাকিত না। তারপর কীভাবে তার সে স্বাভাবিক ঘুমের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, এখন আর ঘুম আসে না, ঘুমাইতে চাহিলেও নয়। জাগিয়া থাকার জন্য তাকে আর কোনো চেষ্টাই করিতে হয় না। একসময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়, বাড়ি আর পাড়াটা ধীরে ধীরে নিঝুম হইয়া আসে, এই ঘরে শুধু জাগিয়া থাকে রসিক একা।

মাথার মধ্যে মৃদু যন্ত্রণা বোধ হয়, দুচোখ জ্বালা করিতে থাকে কিন্তু ঘুম আসে না। সমস্ত জগৎ চারিদিকে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িতেছে অনুভব করিতে করিতে নিজের চিন্তা আর কল্পনার জগৎ যেন স্পষ্ট আর উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে থাকে।

প্রমীলার জন্য তখন রসিকের বড়ো কষ্ট হয়, অবুঝ শিশুর মতো তার মন ফিরিয়া চায় প্রমীলাকে। সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে একটা যুক্তিহীন ক্রুদ্ধ অভিযোগ জাগিয়া ওঠার সঙ্গে তার মনে হয়, প্রমীলা থাকিলে এত রাত পর্যন্ত জাগিতে দিত না, জোর করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিত, শুধু কপালে হাত বুলাইয়া ঘুম আনিয়া দিত তার চোখে।

অন্দরের ঘরে গিয়া সুধারাণীকে ঘুমাইয়া থাকিতে দেখিয়া রসিকের সর্বাঙ্গে যেন আগুন ধরিয়া যায়। ইচ্ছা হয়, লাথি মারিয়া ঘুম ভাঙাইয়া তাকে ঘরের বাহির করিয়া দেয়। স্বামীর আগে যে ঘুমাইয়া পড়ে, স্বামীকে যে ঘুম পাড়াইতে জানে না, সে কী মেয়েমানুষ, সে কী বউ ?

সেদিন রাত্রি সবে দশটা বাজিয়াছে। পাড়ার একজন গল্প করিতে আসিয়াছিল। হাতের আড়ালে তাকে হাই তুলিতে দেখিয়া রসিক আশ্চর্য হইয়া বলিল, শরীর খারাপ নাকি হে ?

না, দুপুরে ঘুমোইনি, ঘুম পাচ্ছে।

একটু পরে আরেকবার হাই তুলিয়া সে চলিয়া গেল। রসিক ভাবিল, কোনো ছুতায় মানুষটাকে অনেক রাত পর্যন্ত আটকাইয়া রাখিতে পারিলে ঘুমের সঙ্গে তার লড়াইটা দেখা যাইত। মাঝরাত্রে নিদ্রাহীন চোখে তার জাগিয়া থাকার কসরত দেখিয়া একটু কি আমোদ পাওয়া যাইত না ? তা ছাড়া, ঘুম হয়তো সংক্রামক। চোখের সামনে ঘুমে একজনের দেহ অবশ আর চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তার চোখেও হয়তো একটু আবেশ আসিত ঘুমের।

না, তা আসিত না। সুধারাণীকে ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াও কি একদিন তার ঘুম আসিয়াছে ?

কাজে আর মন বসিল না, উৎসাহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চেয়ারটা একটু পিছনে ঠেলিয়া দিয়া হেলান দিয়া বসিয়া রসিক টেবিলে পা তুলিয়া দিল। ঠিক সামনেই দেয়ালের গায়ে বড়ো একটি ফটো টাঙানো, দামি ফ্রেমের মধ্যে সাধারণ ঘরোয়া সাজে প্রমীলা দাঁড়াইয়া আছে, মুখে দুষ্টামিভরা তৃপ্তির হাসি। ফটোখানা ছাড়া এদিকের দেয়ালটি একেবারে ফাঁকা, এখানে ওখানে কতকগুলি পেরেকের দাগ শুধু আছে। বুঝা যায়, আরও দু-চারখানা ফটো বা ছবি এ দেয়ালে টাঙানো ছিল, সরাইয়া ফেলা হইয়াছে।

গড়গড়ার নল মুখে দিয়া টানিতে গিয়া রসিকের খেয়াল হইল, প্রমীলার ফটো ঘিরিয়া একটা নূতনত্বের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কালও যার অস্তিত্ব ছিল না—টাটকা ফুলের একটি মালা। তাই বটে, সন্ধ্যার পর ঘরে ঢুকিয়া মৃদু একটু ফুলের গন্ধ সে পাইয়াছিল।

তারপর তামাকের ধোঁয়ায় কখন সে গন্ধ চাপা পড়িয়া গিয়াছে, ফ্যানের বাতাসে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, খেয়ালও থাকে নাই।

কিন্তু প্রমীলার ফটোতে হঠাৎ টাটকা ফুলের মালা জড়াইল কে ? এ বুদ্ধি জাগিল কার ? প্রথম কয়েক মাস সে নিজেই বিকালে বেড়াইয়া ফিরিবার সময় মোড়ের দোকান হইতে মালা কিনিয়া আনিয়া ফটোতে পরাইয়া দিত, একদিন বাসি মালাটি খুলিয়া নতুন মালা পরাইয়া দিবার সময় হঠাৎ তার মনে হইয়াছিল, ফুলের মালা ঘুষ দিয়া স্মৃতির মর্যাদা বজায় রাখিতে চেষ্টা করার মতো ছেলেমানুষি আর হয় না। এ কথা কেন মনে হইয়াছিল কে জানে, সেদিন হইতে আর সে মালা কেনে নাই। এতদিন পরে আবার ফুলের মালা দিয়া প্রমীলার স্মৃতিকে পূজা করিল কে ?

অন্দরের দরজা একটু ফাঁক করিয়া বাড়ির চাকর নিখিল ঘরের মধ্যে একবার উঁকি দিয়া চলিয়া গেল। রোজ এই সময় এমনিভাবে সে একবার উঁকি দিয়া যায়। দু-চারমিনিটের মধ্যে সুধারাণী সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, মৃদুস্বরে অনুরোধ জানায়, খেতে চলো ? আজও সে আসিল, রসিকের টেবিলে তোলা পায়ের কাছেই টেবিলে হাত রাখিয়া সহজভাবে মুখের দিকে চাহিবার চেষ্টায় চিবুক পর্যন্ত চোখ তুলিয়া বলিল, খেতে যাবে না ?

পা নামাইয়া রসিক সোজা হইয়া বসিল।

রসিক জানে, এ সব সুলোচনার ব্যবস্থা। খাইতে বসিবার সময় হইলে সুলোচনার হুকুমে নিখিল আসিয়া দেখিয়া যায় ঘরে বাহিরের লোক কেউ আছে কি না, তারপর সুলোচনার হুকুমেই সুধারাণী তাকে ডাকিতে আসে। অল্পদিন আগে তার যে বিবাহ হইয়াছে এ কথা ভুলিয়া গিয়া অনেকদিনের পুরানো বউয়ের মতো একটু গিন্নি গিন্নি ভাব দেখানোর করুণ চেষ্টার মধ্যেও রসিক সুলোচনার শিক্ষা ও পরামর্শ স্পষ্টই দেখিতে পায়। কোনোদিন সে আমোদ পায়, কোনোদিন মমতা বোধ করে। আজ কিন্তু মনটা বিগড়াইয়া গিয়াছিল।

তুমি মালা দিয়েছ ?

প্রশ্নে নয়, গলার আওয়াজে সুধারাণীব মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। চিরদিন সে বড়ো ভীরু, তার উপর কুমারী জীবনের অন্তে এই প্রৌঢ় বিপত্নীকের বউ হইয়া খাপছাড়া অস্বাভাবিক অবস্থায় তার দিন কাটিতেছে।

এ সব ঢং শিখলে কোথায় ? যেখানেই শিখে থাকো, আমি ও সব পছন্দ করি না। বুঝলে ?

নির্বাক সুধারাণীর আঙুলে আঁচলের কোণটা জড়াইয়া যাইতে থাকে আর রসিক নিজের ওপর বিরক্ত হইয়া ভাবে যে বাগ না করিয়াও এমন কড়া কথা সে বেচারিকে বলিল কেন ? এ সব কিছু বলাব ইচ্ছাও তো তার ছিল না। প্রমীলার ফটোতে মালা-টালা সে যেন আর না দেয়, শুধু এই কথাটা সে সুধারাণীকে বলিবে ভাবিযাছিল। সুধারাণী যদি এখন কাঁদিয়া ফেলে সে কী করিবে ?

সুধারাণী কিন্তু কাঁদাকাটা করিল না, একটু কাঁদো কাঁদোও মনে হইল না তার মুখখানা। একটু রাগের ভঙ্গিতেই যেন দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধবিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে ফিরিয়া যাওয়ার উপক্রম করিল। তখন একটা সন্দেহ মনে জাগায় বসিক বলিল, যেয়ো না, শোনো। বউঠান তোমাকে মালা দিতে বলেছে নাকি ?

জানি না। আমিই যদি দিয়ে থাকি, কী করবে তুমি ? মাববে ?

জবাব, জবাব দেওয়ার ভঙ্গি, গলাব সুর সমস্তই অপ্রত্যাশিত। রসিক আশ্চর্য হইয়া গেল। সুধারাণীও যে এতখানি অভিমান করিয়া অন্যায় ভর্ৎসনার এমন ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানাইতে পারে এ যেন একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আজ পর্যন্ত একবারও সুধারাণীকে সে এমন ভাবে কথা বলিতে শোনে নাই। হয়তো সুযোগ দেয নাই বলিয়া, সুযোগ পাইলে আগেই হয়তো সে এমনিভাবে ফোঁস করিয়া উঠিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারিত নতুন বউ হইলেও সে কাপড়মোড়া তেরো বছরের ছিঁচকাদুনে খুকি নয়। রসিকের মনে হয়, আজ এইমাত্র সে যেন সুধারাণীর অস্তিত্ব প্রথম অনুভব করিয়াছে, এতদিন সে যেন থাকিয়াও ছিল না।

তাই, কয়েক মুহূর্তের জন্য সে যেন ভুলিয়াই গেল যে সুধারাণী প্রমীলা নয়। প্রমীলা রাগ করিলে যেভাবে তার রাগ ভাঙানো একরকম অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল রসিকের, আজও তেমনইভাবে বড়ো রকম ভূমিকা করিয়া সে রাগ দূর করিতে গেল সুধারাণীর। কিন্তু বেশি দূর এগোনো গেল না, হাত ধরিয়া প্রাথমিক আদরের ভোঁতা কয়েকটা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াই সে চাহিয়া দেখিল, সুধারাণীর গাল বাহিয়া টসটস করিয়া জল পড়িতেছে।

প্রমীলা হইলে কাঁদিত না। আগে হইতে কাঁদিতে থাকিলেও কান্না বন্ধ করিয়া দিত। মুখের মেঘ কাটিয়া হাসি ফুটিতে হয়তো সময় লাগিত অনেকক্ষণ, কিন্তু চোখের জল ফেলিয়া সে ন্যাকামি করিত না।

সুধারাণীর ছেলেমানুষি কান্না সচেতন করিয়া দেওয়ায় রসিক অপ্রস্তুত হইয়া থামিয়া গেল। সোহাগের কথা বন্ধ করিয়া ভদ্রতা করিয়া বলিল, খিদে পেয়েছে, চলো খেয়ে আসি। রান্না হয়নি ?

সুধারাণী চোখ মুছিয়া বলিল, হয়েছে। রাগ করলে ?

রসিক জবাব দিল না। কদিন আগে তার ক্রন্দনশীলা দশ বছরের মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে দিতে হঠাৎ থামিয়া যাওয়ায় সেও এমনিভাবে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, রাগ করেছ বাবা ? বলিয়া বাপের রাগের ভয়ে নিজের কান্না সে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

সর্ববিদ্যাবিশারদের বউ

বিবাহের রাত্রেই নিবারণ ডানদিকের স্ত্রীকে বাঁদিকে চালান করিয়া দিয়াছিল।

তুমি এ পাশে এসে শোও, কেমন ?

এই তার প্রথম প্রেমালাপ। সুকুমারী একটু ভীবু আর ভাবপ্রবণ মেয়ে, তার আশঙ্কা আর আশা দুইই ছিল অন্যরকমের। ব্যাপারটা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু কারণ জানিবার চেষ্টাও করে নাই। কে জানে, ডানদিকের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গে হয়তো ব্যথাট্যাথা হইয়াছে মানুষটাব, ডানদিকে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিতে কষ্ট হইবে। এই রকম একটা অনুমান করিয়া সে নীরবে স্বামীর সঙ্গে শয্যায় স্থান পবিবর্তন করিয়াছিল।

সুকুমারী কোনো প্রশ্ন করিল না দেখিয়া নিবারণ নিজেই কারণটা ব্যাখ্যা করিয়া তাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল · স্ত্রীকে বাঁদিকে শুতে হয়—তাই নিয়ম। পরে এ নিয়ম মেনে চল বা না চল তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না, কিন্তু বিয়ের রাতে—

ঘড়ি তখন প্রায় তিনটা বাজে। এতবাত্রে এ বকম একটা তামাশাব মধ্যে কি কেউ বউয়ের সঙ্গে প্রথম আলাপ আবম্ভ করে ? যারা আড়ি পাতিযাছে তারা শুনিলে কী ভাবিবে ! সুকুমারী ভীরু বটে, কিন্তু ভাবপ্রবণতাব জোরে ভীবুতাকে জয় করিযা একটু রাগিয়াই গিযাছিল। আর কিছু মাথায় না আসুক, সোজাসুজি নাম জিজ্ঞাসা করিয়া কথা আরম্ভ করিলেই হইত।

নিবাবণের বোধ হয় ধারণা হইয়াছিল, কথা আরম্ভ কবা মাত্র বউয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিযা অন্তরঙ্গ স্বামীব মতো সে বলিয়াছিল, কত যে ভুল হয়েছে বিয়েতে বলবাব নয়। মন্ত্রতন্ত্র থেকে আরম্ভ করে স্ত্রী-আচাব পর্যন্ত। নতুন জামাই বলে চুপ করে ছিলাম, কিন্তু এমন অস্বস্তি লাগছিল মাঝে মাঝে—

শুনিতে শুনিতে সুকুমারীব সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিযাছিল। কী সর্বনাশ, শেষ পর্যন্ত তবে কি একটা পাগলের সঙ্গে তার বিবাহ হইয়াছে ? একটু পবেই অবশ্য জানা গিয়াছিল ঠিক পাগল নিবারণ নয়, সম্ভবত তামাশাই করিতেছিল।

তুমি যে কথা বলছ না ? ও, সাধাসাধি কবিনি বলে ? বলিয়া এতক্ষণ পরে নিবারণ আবার গোড়া হইতে বউয়ের সঙ্গে ভাব করিবাব চেষ্টা আরম্ভ কবিযাছিল, সুকুমারীর বন্ধুদের কাছে শোনা বিবরণের সঙ্গে যার অনেক মিল। বেশ মিষ্টি লাগিয়াছিল নিবারণকে সুকুমারীর তখন, ভোর পর্যন্ত সামান্য সময়টুকুর মধ্যেই অনেকবাব রোমাঞ্চ হইযা সর্বাঙ্গ তাব অবশ হইয়া আসিয়াছিল— প্রথমবারের চেয়ে ভিন্ন কারণে।

কয়েকটা দিন কাটিতে না কাটিতে সুকুমারী বুঝিতে পারিল, বিবাহের রাত্রে বাঁদিকে তাকে শোয়াইয়া আর মন্ত্রতন্ত্র এবং স্ত্রী-আচারের ভুল দেখাইয়া দিয়া নিবারণ তার সঙ্গে তামাশা করে নাই। তামাশা যে নিবারণ করে না তা নয়, রসকষ মানুষটার মধ্যে যথেষ্টই আছে, কিন্তু নিয়ম পালনের সময় আর ভুলত্রুটি দেখাইয়া দেওয়ার সময় তামাশা করার পাত্র সে নয়।

বিবাহ হইয়াছে শীতকালে, মুখে তাই সুকুমারী একটু ক্রিম মাখে। নয় তো, এমন টুকটুকে রং তার, স্নো ক্রিম পাউডার মাখিবার তার দরকার ? ক্রিমের কৌটাটা দেখিয়া নিবারণ একদিন বলে কী, এই ক্রিম মাখো তুমি ? ছি ! আর মেখো না।

সুকুমারী অবাক।—কেন।

এই ক্রিমটা ভালো নয়, চামড়া উঠে যায়। তোমায় অন্য ক্রিম এনে দেব।

সুকুমারীর দুই বউদিদি এই ক্রিম মাখিয়া মাখিয়া চামড়া ফাটা ঠেকাইয়া রাখে—দুজনের চামড়াই বড়ো ফাটল-প্রবণ। সুকুমারী নিজেও আজ কত বছর এই ক্রিম মাখিতেছে ঠিক নাই। সে একটু হাসিয়া বলে, তুমি কী করে জানলে চামড়া ফাটে ?

নিবারণ রীতিমতো বিরক্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া সুকুমারীর হাসি পরক্ষণেই মিলাইয়া যায়। নিবারণ গম্ভীর মুখে বলে, আমি জানি। আর মেখো না।

এ রকম হুকুম কোনো নতুন বউ মানিতে পারে ? অন্য একটা ক্রিম আনিয়া দিলেও বরং কথা ছিল। বিকালবেলা সুকুমারী মুখে একটু ক্রিম মাখিয়াছে, তারপর কতবার যে আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়াছে হিসাব হয় না, রাত্রি আটটার সময় বাড়ি ফিরিয়া নিবারণ যে কী করিয়া টের পাইয়া গেল !

ক্রিম মেখেছ যে ?

নিবারণের মুখ দেখিয়া সুকুমারীর মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। ঢোঁক গিলিয়া সে বলে, এমন চড়চড় করছিল—

চড়চড় করবে বলেই তো মাখতে বারণ করেছি। এবার থেকে এই ক্রিম মেখো।

পকেট হইতে নিবারণ নতুন ক্রিমটি বাহির করে দেয়। হাতে নিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া সুকুমারী হাসিবে না কাঁদিবে ভাবিয়া পায় না। এই ক্রিম মাখবো ? এ কি মেয়েরা মাখে ? এ তো ব্যাটাছেলের দাড়ি কামিয়ে মাখবার ক্রিম।

নিবারণ জাঁকিয়া বসিয়া বলে, তাই তো এটা আনলাম। দাড়ি কামিয়ে লোকে ক্রিম মাখে কেন, চামড়া চড়চড় করবে না বলে তো ? কামানোর পর যে ক্রিমে চড়চড় করে না, এমনি লাগালে তো তোমার আরও বেশি কম চড়চড় করবে।

সেদিন হইতে সুকুমারীর ক্রিম মাখা বন্ধ হইয়াছে।

কেবল মেয়েদের প্রসাধনের একটি বিষয় নয়, নিবারণ জানে না এমন বিষয় নাই। বিবাহের রাত্রে চারিদিকে সমস্ত ব্যাপারে ভুলত্রুটি আবিষ্কার করিয়া নিবারণের অস্বস্তি বোধ করিবার অর্থটা ধীরে ধীরে সুকুমারী বুঝিতে পারে। চোখের সামনে মানুষকে ভুল করিতে দেখিয়াও চুপ করিয়া থাকিতে যাওয়াটা নিবারণের পক্ষে অস্বস্তির ব্যাপারই বটে। এখনও মাঝে মাঝে ও রকম অস্বস্তি তাকে বোধ করিতে হয়। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের কথা, নিজের বাড়িতে চুপ করিয়া থাকিবার প্রয়োজন বেশি হয় না বলিয়া অস্বস্তিটাও তাকে বেশি ভোগ করিতে হয় না। বাড়ির বাহিরে পথেঘাটে, আত্মীয়বন্ধুর বাড়িতে আর আপিসে সে কী করে সুকুমারী জানে না।

সমস্ত বিষয়েই নিবারণ ব্যবস্থা দেয়, সমস্ত ব্যবস্থার সমালোচনা করে। ব্যাখ্যা তাব মুখে লাগিয়াই আছে, পিঁপড়ার লাইন বাঁধিয়া চলার কারণ হইতে সেজো পিসির ছেলেটা অপদার্থ কেন পর্যন্ত। তার অনেকগুলি নিয়ম এখন এ বাড়িতে চালু হইয়াছে, তার প্রায় সবগুলি নিষেধই বাড়ির মানুষেরা তার সামনে মানিয়া চলে। আগে যে তার মতামতের এতটা মযার্দা ছিল না, বাড়ির কর্তা হওয়ার পর হইয়াছে, এটুকু সুকুমারী সহজেই অনুমান করিতে পারে। তবে কর্তা হইয়া নিবারণ যে নিয়ম কানুনের বহর আর অবিচার অনাচারে বাড়িটাকে গারদখানা বানাইয়া তুলিয়াছে তা নয়। মত মানানোর জন্য তার কোনোরকম জোর জবরদস্তি নাই, তার মতের বিরুদ্ধে গেলেও সে রাগ করে না বা তার মতটা মানিয়া চলিলেও বিশেষ খুশিও হয় না। মত প্রকাশ করিতে পাইলেই তার হইল। কঠোর সে শুধু তার অমতের বেলা। তার নিষেধ কেউ না মানিলে সে রাগিয়া আগুন হইয়া ওঠে—তা সে যত তুচ্ছ বিষয়েই নিষেধ হোক। কাঁচা টম্যাটো খাওয়া যে কত উপকারী আর কেন উপকারী সে কথা সে প্রায়ই বলে, কিন্তু সে ছাড়া বাড়ির কেউ কাঁচা টম্যাটো খায় না। খায় কি না খায় এটা সে খেয়াল করিয়াও দ্যাখে না। কিন্তু একবার যদি তার নজরে পড়ে যে কেউ একতলায় খালি পায়ে হাঁটিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে

একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যায়। চটি বা স্যান্ডেল পায়ে সকলের হাঁটার ব্যবস্থা সে দেয় নাই, দিলে হয়তো সকলে মিলিয়া একসঙ্গে স্যাঁতসেঁতে উঠানে খালি পায়ে সারাদিন হাঁটিলেও সে চাহিয়া দেখিত না ! কিন্তু খালি পায়ে একতলায় হাঁটা সে নিষেধ করিয়া দিয়াছে কিনা, তাই বিধবা পিসিকে পর্যন্ত খালি পায়ে হাঁটিতে দেখিলে সে গজগজ করে আর কাঠের সোল দেওয়া নানা প্যাটার্নের কাপড়ের জুতা কিনিয়া আনিয়া জুতা পরানোর জন্য দুবেলা পিসির সঙ্গে ঝগড়া করে।

পিসি বলে, নে থাম। জুতো পরিয়ে আমায় চিতায় তুলিস।

নিবারণ বলে, ছেলে কী তোমার সাধে বিগড়েছে পিসিমা ? তোমার স্বভাবের জন্য।

পিসি তখন কাঁদিতে আরম্ভ করে। দুটি অন্ন দেয় বলিয়া এমনভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমান করা নিবারণের উচিত, যতই হোক সে তো তার বাপেব বোন ? বলিতে বলিতে ভাইয়ের জন্য পিসির শোক উথলাইয়া ওঠে, নিবারণ কিছু বলিলেই পিসির এ রকম হয়। বাড়িতে একমাত্র পিসির সঙ্গেই নিবারণ আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

পিসির ছেলের নাম নিখিল। যেমন রোগা তেমনই লম্বা চেহারা। ছেলেটা সত্যই এক নম্বরের শয়তান। এদিকে মা হয়তো তাব ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেছে আর যুদ্ধে হার মানিয়া নিবারণ গজর গজর করিতেছে, ভালোমানুষের মতো মুখ করিয়া চোখ মিটমিট করিতে করিতে নিখিল প্রশ্ন করে, কাঁদলে মানুষের চোখ দিয়ে জল পড়ে কেন দাদা ?

সিঁড়ি দিয়া উপবে উঠিবার উপক্রম করিতে করিতে সুকুমারী মুখ লাল কবিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়। ভাবে, উদ্ধত গোঁয়ার ছেলেটার এমন একটা খোঁচা দেওয়া ফাজলামিতে কী রাগটাই না জানি নিবারণ করিবে। হয়তো দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে বাড়ি হইতে। কিন্তু পরক্ষণে নিবারণের ব্যাখ্যা তার কানে আসে—বাপেব বাড়ির জন্য মন কেমন করিয়া কাঁদায় একদিন তাকে যে ব্যাখ্যা শুনিতে হইয়াছিল। চাহিয়া দেখিতে পায়, দুহাত পিছনে দিয়া একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়া নিবারণ পায়চারি আরম্ভ করিয়াছে।

কিছুক্ষণ পবে উপরে গিয়া নিবারণ নিজেই বলে, বড়ো বজ্জাত হয়েছে নিখিলটা। কী রকম অপমান করল আমায় দেখলে ?

অপমানজ্ঞান আছে তোমার ?—সুকুমারীর বড়ো রাগ হইয়াছিল।

কী বললে ? বলিয়া রাগ করিয়া কাছে আসিয়া নিবারণ অন্যমনা হইয়া যায়। এতক্ষণ সুকুমারী মাথা নিচু করিয়া ছিল, মুখ তুলিয়া চাহিবামাত্র নিবারণ ব্যস্ত হইয়া বলে, তোমার জ্বর হয়েছে।

না, জ্বর হতে যাবে কেন ?

উঁহুঁ, তোমার নিশ্চয়ই জ্বর হয়েছে। এ বেলা ভাত খেয়ো না।

স্নেহ করিয়াই নিবারণ তাকে ভাত খাইতে বারণ কবে, চিন্তিত মুখে সহানুভূতিভরা কোমল গলায়। অন্য সময় হয়তো সুকুমাবী গলিয়া যাইত,এখন ব্যঙ্গ কবিয়া জিজ্ঞাসা করে, কী কবে জানলে আমার জ্বর হয়েছে ? মুখ দেখে ?

নিবারণ গম্ভীর হইয়া যায়।—আমি জানি।

ছাই জানো তুমি। রাগটাগ হলে আমার মুখ এ রকম লাল দেখায়—সবারই দেখায়। থার্মোমিটার দিয়ে দ্যাখো, এক ফোঁটা জ্বর যদি ওঠে—

সব জ্বর থার্মোমিটারে ওঠে না। যাই হোক, এ বেলা ভাত খেয়ো না।

ছুটির দিন সকালবেলার ঘটনা, সবে চা-টা খাওয়া হইয়াছে, ভাত খাইতে তখনও অনেক দেরি। তবু সুকুমারীর মনে হয়, সে যেন কতকাল খায় নাই, তখন তখন খুব ঝাল কোনো একটা তরকারি দিয়া

দুটি ভাত খাইতে পাইলে বড়ো ভালো হইত। এখনও দেহেমনে স্বামীর গতরাত্রের আদরের স্বাদ লাগিয়া আছে, এর মধ্যে স্বামীর নিষেধ ভাঙার স্বাদ পাওয়ার জন্য এ রকম ছটফটানি জাগার মতো রাগ হওয়া কি তার উচিত ? ঠিক রাগ কী না সুকুমারী বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কেমন একটা ঝাঁঝালো বিষাদ ! দিন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে অন্যদিনও তো এটা সে অনুভব করিয়াছে, আজ তো নয় কেবল ?

এ বেলা তাকে ভাত খাইতে বাবণ করিয়া নিবারণ বাজারে গিয়াছে, সমস্ত বাজারটাই কিনিয়া আনিবে। কিন্তু একটি বেহিসাবি জিনিস কী থাকিবে তাতে ? যা খাইলে মানুষের ভিটামিন বাড়ে না, রক্তমাংস হাড়ের পুষ্টি হয় না, তাপের উৎপাদন হয় না ? খাওয়ার কথা ভাবিলে নিছক জিভে জল আসে মাত্র এমন কোনো বাজে জিনিস ?

সকালবেলা এখন সংসারের কত কাজ, ঘরে বসিয়া থাকা তার উচিত নয় জানে, তবু ভাত খাইতে বারণ করার আগে ঘরেই সুকুমারী বসিয়া থাকে। বাজার আসার পাঁচ মিনিট পরে আসে ছোটো ননদ পলটু। বিবাহের এক বছরের মধ্যে পলটুর সন্তান সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। পলটুর ধারণা, এ জগতে এমন কেলেঙ্কারি আর কোনো মেয়ের অদৃষ্টে জোটে নাই।

দাদা যেন কী, ছি ! বলিয়া লজ্জায় প্রায় মূর্ছা গিয়া সে বউদিদির গায়ের উপর ঢলিয়া পড়াব উপক্রম করে, একগাদা কত কী সব কিনে এনে বলছে আমার জন্য এনেছে, আমার খেতে ভালো লাগবে। এ অবস্থায় আমাদের নাকি অরুচি হয় !

চোখ বুজিয়া থাকিয়াই পলটু একবার শিহরিয়া ওঠে !

সুকুমারী ভাবে, তবু তো আনিয়াছে ? তাই বা কম কী ! কাজের ছলে বাজাব দেখিতে নীচে গিয়া বাহিরের ঘর হইতে নিবারণের গলা তাব কানে ভাসিয়া আসে। খবরের কাগজকে কেন্দ্র করিয়া পাড়ার কয়েকজন ভদ্রলোকের কাছে রাজনীতির বক্তৃতা হইতেছে। কথা শুনিলে মনে হয়, সব যেন তার কাছে অপোগণ্ড শিশু। ভিতরের দিকের জানলার পরদা একটু ফাঁক করিয়া সুকুমারী একবার উঁকি মারে, মুচকি হাসি খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সকলেব মুখের দিকে তাকায়। সকলেই চা পানে ব্যস্ত। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও তাদের নির্বিবাদে চলিতেছে। এক বছরেব মধ্যে ইউরোপের অবস্থা কী দাঁড়াইবে ব্যাখ্যা করিতে কবিতে নিবারণ যেন কেমন করিয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে চলিয়া গিয়াছিল, কার একটা কথা কানে যাওয়ায় মুখের কথাটা শেষ না করিযাই বলে, আপনি ভুল করেছেন সতীশবাবু, ও শেয়ার কি কিনতে আছে ! এক মাসের মধ্যে অর্ধেক নেমে যাবে। তার চেয়ে যদি—

এখন নয়, এ সব বিষয়ে নিবারণের সঙ্গে কেউ বিশেষ তর্ক কবে না, ঝগড়া বাঁধিবে খেলার সময়। আজ ছুটির দিন, তাস আর দাবার আড্ডা বসিবেই, নিবারণ হযতো তাস হাতে করিয়া দাবার চাল বলিয়া দিতে থাকিবে। ঝগড়া শুনিয়া মাঝে মাঝে ভয় হইবে এই বুঝি মারামাবি বাধিয়া গেল। কেন যে ওরা এখানে খেলিতে আসে !

কী ঠাকুর ?

এবার মাংস চড়াব।

বাহিরের ঘরের ভেজানো দরজার কাছে ঠাকুর ইতস্তত করে।

নাই বা ডাকলে ? নিজেই চড়িয়ে দাও আজকে—চলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

সে সাহস ঠাকুরের নাই, মাংস চড়ানোর সময় নিবারণ তাকে ডাকিবার হুকুম দিয়া রাখিয়াছে, না ডাকিলে কী রক্ষা রাখিবে !

শুনিয়া সুকুমারীর মনে হয়, তবে তো বারণ না মানিয়া এ বেলা মাংস দিয়া সে দুটি ভাত খাইলেও নিবারণ রক্ষা রাখিবে না ! এতক্ষণ পরে গভীর অভিমানে সুকুমারীর চোখে হঠাৎ জল আসিয়া পড়ে।

নতুন কিছুই আজ বাড়িতে ঘটে নাই, তবু যেন সব সুকুমারীর কেমন খাপছাড়া অর্থহীন মনে হয়, বাড়ির সকলের কাজকর্ম চলাফেরা গল্পগুজব। নিবারণের ভাগনি অর্গান বাজাইয়া গান ধরিয়াছে, নিবারণ নিজেই তাকে গান শেখায়। সুকুমারী নিজেও ভালো গান জানে, ভাগনির ভুল সুর শুনিতে শুনিতে তার হতাশা মেশানো এমন একটা উৎকট কষ্ট হয় ! রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিবারণের মা একটি নাতিকে দুধ খাওয়াইতেছিল, ভাঁড়ার ঘরের পাশের ছোটো ঘরটিতে বাড়ির অন্য মেয়েরা চানাচুর খাইতে খাইতে গল্প করিতেছে, ছেলেমেয়েরা হইচই করিয়া খেলা করিতেছে সারা বাড়িতে। এর মধ্যে কী খাপছাড়া, কী অর্থহীন ? এতবড়ো একটা সংসারের দায়িত্ব যার ঘাড়ে সেই লোকটা একটু খাপছাড়া বলিয়া কি তার এ রকম মনে হয় ? সঙ্গ ভালো না লাগায়, করার মতো একটা বাজে কাজও হাতের কাছে না থাকায় সুকুমারী ঘরে গিয়া ব্লাউজ সেলাই করিতে বসে। ব্লাউজ দুটি নিবারণ ছাঁটিয়া দিয়াছে। গলার ছাঁট দেখিতে দেখিতে সুকুমারী ভাবে, এ ব্লাউজ পরিলে লোকে হাসিবে না তো ?

বেলা প্রায় তিনটার সময় সুকুমারীর দাদা পরমেশ আসিল। এই দাদাটির জন্য সুকুমারীর মনে কত যে গর্ব আছে বলিবার নয়। পরমেশ খ্যাতনামা অধ্যাপক, এই বয়সেই কলেজের ছেলেদের জন্য দুখানা বই পর্যন্ত লিখিয়া ফেলিয়াছে। তার ডিগ্রিগুলি উচ্চারণ করিবার সময় আহ্লাদে সুকুমারীর জিভ জড়াইয়া আসে।

খানিকটা দুধবার্লি গিলিয়া সুকুমারী বিছানায় পড়িয়াছিল। ততক্ষণে তার নিজের মনেই সন্দেহ জন্মিয়া গিয়াছে, থার্মোমিটারে ধরা পড়ে না এমন জ্বর হয়তো সত্যসত্যই তার হইয়াছে। ঘরের পাশে একতলার মস্ত খোলা ছাদ, তারই এক প্রান্তে এদিকের ঘরগুলির সঙ্গে কোনাকুনিভাবে আরেকটি ঘর তোলা হইতেছে। নিবারণ গিয়া মিস্ত্রিদের কাজ দেখাইয়া দিতেছিল আর শুইয়া শুইয়া জানালা দিয়া সুকুমারী তাই দেখিতেছিল। পরমেশ সাড়া দিয়া ঘরে ঢুকিতে সে খুশি হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, এসো দাদা।

তোর নাকি জ্বর হয়েছে !

হুঁ।

পরমেশ বসিয়া বলিল, নিবারণ কই ?

সুকুমারী আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল। একজন মিস্ত্রি তখন কাজ বন্ধ করিয়া নিবারণের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে, বোধ হয় সর্দার মিস্ত্রি। ঘরের মধ্যে ভাইবোন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, আর ওদিকে সর্দার মিস্ত্রি বলে, আপনি যদি সব জানেন বাবু তবে আর আমাদের কাজ করতে ডেকেছেন কেন ?

সুকুমারী চাপা গলায় বলে, শিগগির ডাকো দাদা- -এখুনি হয়তো মেরে বসবে।

নিবারণ কী করিত বলা যায় না, পরমেশের ডাক শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল। তারপর মিস্ত্রিকে বলিল, তোমাদের আর কাজ করতে হবে না। নীচে যাও, তোমাদের পাওনা দিয়ে দিচ্ছি। বলিয়া গটগট করিয়া ঘরে চলিয়া আসিল।

তারপর সাধারণ কুশল প্রশ্নের অবসরও তাদের হয় না, শালা-ভগ্নিপতিতে তর্ক শুরু হইয়া যায়। পরমেশ বলে, ওরা সব ছোটোলোক, ওদের সঙ্গে কি ঝগড়া মারামারি করতে আছে হে !

নিবারণ আশ্চর্য হইয়া বলে, ছোটোলোক ? ছোটোলোক হবে কেন ওরা ? ওই তো দোষ আপনাদের, যারা খেটে খায় তাদেরই ছোটোলোক ধরে নেন।

অকারণে খোঁচা খাইয়া পরমেশ একটু চটিয়া বলে, ও, তোমার বুঝি ও সব মতবাদ আছে ? কিন্তু তুমিও তো বাবু সামান্য একটা কথা সইতে না পেরে বেচারাদের তাড়িয়ে দিলে ?

নিবারণ একটু অবহেলার হাসি হাসিয়া বলে, তাড়িয়ে দিলাম কি ওরা ছোটোলোক বলে ? ওইখানে তো মুশকিল আপনাদের নিয়ে, বই পড়ে পড়ে সহজ বিচারবুদ্ধিও আপনাদের লোপ পেয়ে গেছে। ঘর তুলব আমি, আমি যে রকম বলব সে রকমভাবে ওরা যদি কাজ না করে তাহলে চলবে কেন ? তাই ওদের বিদেয় করে দিলাম—ওরা ছোটোলোক বলে নয়।

আজ প্রথম নয়, আগেও কয়েকবার দুজনে তুমুল তর্ক হইয়া গিয়াছে, শেষ পর্যন্ত যা গড়াইয়াছে প্রায় রাগরাগিতে। তর্কটা অবশ্য আরম্ভ করে নিবারণ, বিজ্ঞানের কোনো একটা বিষয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা অভিমত প্রশ্ন বা সন্দেহের মধ্যে ব্যক্ত করিয়া পরমেশের মুখ খুলিয়া দেয়। প্রথমে পরমেশ পরম ধৈর্যের সঙ্গে তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে, তারপর ধৈর্যহারা হইয়া চেষ্টা করে আত্মপক্ষ সমর্থনের, তারও পরে চটিয়া গিয়া আরম্ভ করে আক্রমণ। আজ নিবারণের খোঁচায় প্রথমেই তাকে চটিয়া উঠিতে দেখিয়া সুকুমারী চট করিয়া ঘরের বাহিরে গিয়া ডাকে, দাদা, একবার শোনো। শিগগির শুনে যাও আগে।

পরমেশ কাছে গেলে ফিসফিস করিয়া বলে, তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে, ওর সঙ্গে তর্ক কর কেন ? যাই বলুক হেসে উড়িয়ে দিতে পার না ?

শুনিয়া আজ পরমেশের হঠাৎ প্রথম খেয়াল হয় যে, তাই তো বটে, নিবারণের সঙ্গে সে তর্ক করে কেন ? নিবারণ ছেলেমানুষি করে বলিয়া সেও ছেলেমানুষ হইতে যায় কেন ? তারপর দুজনে ঘরে ফিরিয়া যায়, এ কথায় সে কথায় কিছুক্ষণ কাটিয়া যায়, কোথা হইতে এক টুকরো মেঘ আসিয়া বাহিরের রোদটুকু মুছিয়া নিয়া যায়। ভাসা আলগা মেঘ, একটু পরেই সরিয়া যাইবে।

তখন নিবারণ বলে, আচ্ছা আপনারা যে বলেন লাইটের চেয়ে বেশি স্পিড আর কোনো কিছুর হতে পারে না, তার কী প্রমাণ আছে ?

পরমেশ তাকায় সুকুমারীর মুখের দিকে, ঠোঁটের কোণে মৃদু একটু হাসি দেখা দেয়। উদাসভাবে বলে, কে জানে।

জবাব শুনিয়া একটু থতোমতো খাইয়া নিবারণ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকে। তারপর বলে, আমি বলছিলাম, মানুষের স্পিড তো আরও বেশি হতে পারে। যাকগে ও কথা। আচ্ছা, গ্রহণের সময় দেখা গেছে তারার আলো সূর্যের পাশ দিয়ে আসবার সময় সূর্যের আকর্ষণে বেঁকে যায়।

তাও আমি জানি না।

ও ! বলিয়া নিবারণ এবার গম্ভীর হইয়া যায়। গাম্ভীর্য তার বজায় থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণে সুকুমারীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে এবং পরমেশ দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে আরম্ভ করিয়া ভাবিতেছে, তার রাগটা কমানোর জন্য কী বলা যায়। কিন্তু গাম্ভীর্য নিবারণের আপনা হইতেই উবিয়া যায়। সহজভাবেই আবার সে কথাবার্তা আরম্ভ করে। আলগা মেঘটা উড়িয়া গিয়া আবার চারিদিক রোদে ভরিয়া যায়, সুকুমারীর মুখের বিষাদের ছায়াটা কিন্তু সরিয়া যায় না। গম্ভীর হইয়া থাকাটা বেশি অপমানকর জানিয়াই কি নিবারণ গাম্ভীর্য ত্যাগ করিল ? আর সমস্ত বিষয়ে যেমন, রাগ-দুঃখে মান-অভিমানের বেলাতেও কি তেমনই জানাটা নিবারণের কাছে বড়ো ? এত যে ভালোবাসে তাকে নিবারণ, তার মধ্যেও জানাজানির প্রাধান্য কতখানি কে জানে ?

সন্ধ্যার সময় পরমেশের সঙ্গে নিবারণও বাহির হইয়া যায়। পরমেশ যায় বাড়ি ফিরিয়া, নিবারণ যায় বেড়াইতে। বেড়াইতে গেলে নিবারণ ফিরিয়া আসে এক ঘণ্টার মধ্যে, আজ নটার সময়ও তাকে ফিরিতে না দেখিয়া মনের ক্ষোভে সুকুমারীর মুখে জ্বালাভরা হাসি দেখা দেয়। ক্ষুধায় পেটটা বড়ো বেশি জ্বলিতেছিল বলিয়াই বোধ হয় ক্ষোভটাও তার বেশি হয়। বাড়ির সকলে

অনেকবার খবর নিয়া গিয়াছে, দুধ আনিয়া খাইতে সাধিয়াছে, সুকুমারী খায় নাই। পলটু বসিয়া বসিয়া গল্প করিয়া গিয়াছে নটা পর্যন্ত। একা হওয়ামাত্র ক্ষোভটা যেন একলাফে মাথায় চড়িয়া গিয়াছে।

আর কী সুকুমারীর জানিতে বাকি আছে, এতকাল তাকে ভালোবাসার মধ্যে এত বৈচিত্র্য নিবারণ কী করিয়া আনিয়াছে ? আর সব সে যেমন জানে বলিয়া করে, ভালোবাসিবার নিয়ম-কানুনও জানে বলিয়া মানিয়া চলে ! পলটুর মতো অবস্থায় মেয়েদের অরুচি হয় জানে বলিয়া সে যেমন বিশেষ বিশেষ খাবার জিনিস আনিয়া দিয়াছে, ওর মধ্যে দয়া-মায়া স্নেহ-মমতার প্রশ্ন কিছু নাই, স্ত্রীর সঙ্গে কী করিয়া ভাব করিতে, স্ত্রীকে কী করিয়া আদরযত্ন করিতে হয় তাও তেমনই জানে বলিয়াই তার সঙ্গে এমনভাবে ভাব করিয়াছে, তাকে এত আদরযত্ন করিয়াছে নয়তো নিবারণের মতো মানুষের কাছে ও রকম রোমাঞ্চকর মধুর কথা ও ব্যবহার কে কল্পনা করিতে পারে, প্রতিদিন রাত্রে ঘরে আসিবার পর এতকাল তার যা জুটিয়াছে ?

নিজের মনের জানাজানি প্রক্রিয়াকে সেও যে নিবারণের চেয়ে অনেক বেশি খাপছাড়াভাবে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিতেছে এটা অবশ্য তার খেয়াল হয় না, বেশ জোরের সঙ্গেই অনেক কিছু জানিয়া চলিতে থাকে। একবারে নিঃসন্দেহে হইয়া মানে, রাত্রে নিবারণকে একেবারে নতুন মানুষ মনে হইত কেন, তার কারণটা। বাপের বাড়িতে যে রাত্রিগুলি নিঃসঙ্গ কাটিয়াছে সেগুলি ছাড়া প্রত্যেকটি রাত্রি সমস্ত দুপুরেও তার কাছে রোমাঞ্চ ও শিহরনে ভরা ছিল, এখন সব ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। সব ফাঁকি নিবারণের, শুধু নিয়ম পালন।

আজ একটু রাগ হইয়াছে তাই নিয়মমাফিক স্ত্রীকে স্নেহ করিবার ইচ্ছাটাও উবিয়া গিয়াছে। পরমেশের উপর রাগটা চলিয়া গেল দু-চারমিনিটের মধ্যেই, কিন্তু অসুস্থা উপবাসী বউকে আর ক্ষমা করিতে পারিল না। কী করিয়া করিবে ? যেখানে দরদ আন্তরিক নয়, সেখানে সুবিচারের প্রেরণা আসিবে কোথা হইতে ?

বিবাহের আগে এ রকম বিশ্লেষণের ক্ষমতা সুকুমারীর ছিল না, কোনো মানুষের মাথার মধ্যে যে নিজের পছন্দমতো সিদ্ধান্ত দাঁড় করানোর জন্য দৈনন্দিন জীবনের রাশি রাশি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আবর্জনা হইতে যুক্তিরূপী প্রয়োজনীয় টুকরাগুলিকে শুধু বাছিয়া নেওয়ার এমন একটা প্রক্রিয়া চলিতে পারে এ কথা কল্পনা করার ক্ষমতাও ছিল না। এখন সে যেন খানিক খানিক বুঝিতে পারে, এ ধরনের চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া তার পক্ষে ঠিক উচিত হইতেছে না, এ সব ছেলেমানুষি কল্পনামাত্র, এ রকম জ্বালাভরা দুঃখ ভোগ করার কোনো কারণ ঘটে নাই। তবু অন্ধকার ঘরে ছটফট করিতে করিতে না ভাবিয়া সে পারে না যে, হায়, যে স্বামী উঠিতে-বসিতে চলিতে-ফিরিতে বলে এই করা উচিত আর ওই করা উচিত নয়, যে ক্রিম মাখিতে দেয় না, অকারণে উপোস করাইয়া রাখে আর এক রকম বিনা দোষে রাগ করিযা বাড়ি ফিরিতে দেরি করে, তার সঙ্গে জীবন কাটাইবে কী করিয়া ?

দশটার পরে অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া নিবারণ আলো জ্বালে। সুকুমারী চোখ বুজিয়া ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া থাকে আর চোখের পাতা একটু ফাঁক করিয়া চুপচুপি নিবারণ কী করে দেখিবার চেষ্টা করিয়া রামধনুর রং দেখিয়া বসে। চোখে একটু জল জমিয়াছে। চোখ মেলিয়া হয়তো সব স্পষ্ট দেখা যাইবে, চোখের পাতা একটুখানি ফাঁক করিয়া কিছু দেখা সম্ভব নয়,—অন্তত চোখ না মুছিয়া।

জামাকাপড় ছাড়িয়া নিবারণ মুখহাত ধুইতে বাহির হইয়া যায়। সুকুমারী তাড়াতাড়ি চোখ দুটি মুছিয়া ফেলে বটে, কিন্তু এবার আরও বেশি জল আসিয়া পড়ে। জানে জানে, নিবারণের মতো সব না জানুক, এটুকু সে জানে যে নিবারণ আর কোনোদিন তার সঙ্গে ভালো করিয়া কথা বলিবে না।

নিবারণ ঘরে ফিরিয়া আসে। খানিকক্ষণ তার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। তারপর প্রায় কানের কাছে অতি মৃদুস্বরে তার প্রশ্ন শুনিতে পায়, কাঁদছ কেন ?

সুকুমারীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে, এক মুহূর্তে তার এতক্ষণের সমস্ত জানা যেন বাতিল হইয়া যায়। চোখে একটু জল দেখিবামাত্র রাগ কমিয়া গিয়াছে ! দাদাকে পরামর্শ দিয়া অপমান করানোর মতো অমার্জনীয় অপরাধের জন্য যে রাগ হইয়াছিল। এমন গভীর মায়া তার জন্য তার স্বামীর, আর সে এতক্ষণ সন্দেহ করিয়া মরিতেছিল কিছুই তার আন্তরিক নয় !

চোখের পলকে উঠিয়া সুকুমারী নিবারণের পা চাপিয়া ধরে।—আমায় মাপ করো আমি বড্ড অন্যায় করেছি।

নিবারণ অবশ্য তখন তাকে বুকে তুলিয়া নেয়।—তোমার জ্বর তো বেড়েছে দেখছি।

জ্বর বেড়েছে ? গা গরম হয়েছে আমার ?

বেশ গরম হয়েছে। দাঁড়াও, একবার থার্মোমিটার দিয়ে দেখি।

থার্মোমিটারে দেখা যায়, সত্যই সুকুমারীর জ্বর হইয়াছে, প্রায় একশোর কাছাকাছি। থার্মোমিটারটি রাখিয়া আসিয়া নিবারণ সুকুমারীর গায়ে আদর করিয়া হাত বুলাইয়া দেয়। সুকুমারী আরামে চোখে বোজে।

নিবারণ বলে, আমার সত্যি রাগ হয়েছিল। রাগ করে থাকতে পারলাম না কেন জানো ?

সুকুমারী নীরবে মাথাটা একটু কাত করে। মনে মনে বলে, জানি, আমায় ভালোবাস বলে।

আবার প্রায় কানের সঙ্গে মুখ লাগাইয়া অতি মৃদুস্বরে নিবারণ বলে, আজ জানতে পারলাম কিনা তোমার খোকা হবে, জানা মাত্র সব রাগ কেমন জল হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া সুকুমারী বিস্ফারিত চোখে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, জানা মাত্র সব রাগ জল হয়ে গেল ! এই তবে নিবারণের ক্ষমা করিবার কারণ। যে খোকার মা হইবে তার গুরুতর অপরাধও ক্ষমা করিতে হয় ! গায়ের চামড়া বড়ো চড়চড় করিতে থাকে সুকুমারীর, যেখানে যেখানে নিবারণের হাত বুলানোয় এতক্ষণ আরামের সীমা ছিল না। পেটটা জ্বালা করিতে থাকে। মুখটা তিতো লাগে। মাথাটা ঘুরিতে থাকে।

হঠাৎ সে করে কী, নিবারণকে দু-হাতে ঠেলিয়া দিয়া ছুটিয়া খোলা ছাদে চলিয়া যায়। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় মিস্ত্রিরা ঘরের যে গাঁথনি আরম্ভ করিয়াছিল অস্পষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছিল। তবু সেই হাতখানেক উঁচু গাঁথনিতে হোঁচট খাইয়া সুকুমারী দড়াম করিয়া পড়িয়া যায়।

অন্ধের বউ

বিবাহের এক বছর পরে ধীরাজ অন্ধ হইয়া গেল। চোখের একটা অসুখ আছে, বড়ো বিপজ্জনক অসুখ, চোখের ভিতরেব চাপ যাতে বাড়িয়া যায়। অবস্থাবিশেষে একদিনের মধ্যেই মানুষের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

আগের দিনটা ছিল বিবাহের বার্ষিক তিথি। রাত্রিটা দুজনে জাগিয়া কাটাইয়া দিয়াছিল ! সারারাত কয়েক মিনিটের জন্যও চোখ না বুজিয়া প্রতিদিন সকালে একেবারে সূর্যের মুখ না দেখিলেও রাতজাগাটা তাদের অবশ্য বেশ অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। বিবাহের প্রথম বছরে রাত দুটোর আগে ফিসফিসানি শেষ হওয়াটা সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর পক্ষেও স্বাভাবিক নয়।

ধীরাজ চোখে একটু যন্ত্রণা বোধ করিতেছিল, একটু ঝাপসা দেখিতেছিল। চোখ দুটি বেশ লাল দেখাইতেছিল। কিন্তু বিবাহের তিথিকে যথাযোগ্য সম্মান করার উৎসাহে ও সব সামান্য বিষয়কে তারা গ্রাহ্যও করে নাই। সুনয়না বলিয়াছিল, তাই বলে আজ রাতে ঘুমোতে পাবে না। কাল সারাদিন ঘুমিয়ো, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমারও তো চোখ জ্বালা করছে।

তবে একটু সেই রকম নাচ দেখাও ?

চোখ বোজো ?

পরদিন বিকালের দিকে ডাক্তার ডাকা হইল। তারপর তাড়াহুড়া ছুটাছুটি করিয়া অনেক কিছুই করা হইল। কিন্তু তখন বড়ো বেশি দেরি হইয়া গিয়াছে। ভোরে সুনয়নার হাত ধরিয়া ছাদে দাঁড়াইয়া নূতন সূর্যকেও ধীরাজ যখন ঝাপসা দেখিতেছিল তখন সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করিলেও হয়তো কিছু হইতে পারিত। কিন্তু তখন কে ভাবিয়াছিল টকটকে লাল চোখ, যন্ত্রণা. ঝাপসা দেখা চোখের মধ্যে আলোর ঝলকমারা, এ সব অন্ধ হওয়ার ভূমিকা ! ও সব তারা রাতজাগার ফল বলিয়া ধরিয়া নিয়াছে।

বিশেষজ্ঞ অনেক বকম পরীক্ষা করিলেন কিন্তু অপারেশন করিতে অস্বীকার করিলেন। বলিলেন, আর কিছুই করিবার নাই।

পরদিন সকালে জগতেব আলোর উৎস যথাসময়ে আকাশে দেখা দিলেন কিন্তু ধীরাজ সেটা টেরও পাইল না। তার চোখের আলো চিরদিনের জন্য নিভিয়া গিয়াছে।

চোখের ডাক্তার স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, রাতজাগা ধীরাজের অন্ধ হওয়ার আসল কারণ নয়। রাত না জাগিলেই অবশ্য ভালো ছিল, কিন্তু তাতেও যে ধীরাজের চোখ বাঁচিত তাই বা জোর করিয়া কে বলিতে পারে ? এ বড়ো সাংঘাতিক অসুখ, কত লোকের চোখ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মানুষের মন কি সহজে এ সব যুক্তি মানিতে চায় ? সুনয়নার কেবলই মনে হয়, ও ভাবে জোর করিয়া স্বামীকে রাত না জাগাইলে চোখের অসুখটা কখনও এত তাড়াতাড়ি এ রকম বাড়িয়া যাইত না। অন্তত রোগের লক্ষণগুলিকে রাতজাগার ফল ভাবিয়া নিশ্চয় তারা অবহেলা করিত না, সকালবেলাই চোখের অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইত। ভাবে আর চোখের জলে সকালবেলার আলো এমন ঝাপসা দেখায় যেন সেও আধাআধি অন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সেই ঝাপসা দৃষ্টিতে স্বামীর বিকৃত মুখখানা দেখিতে দেখিতে সে হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, ওগো, আমার জন্যেই আমাদের এ সর্বনাশ ঘটল।

ধীরাজ মরার মতো বলিল, তোমার কী দোষ ?

সুনয়না সজোরে নিজের কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, কার দোষ তবে ? কে তোমার টকটকে লাল চোখ দেখেও তোমায় ঘুমোতে দেয়নি ? সকালে কে তোমায় বলেছে, একটু ঘুমোলেই সব সেরে যাবে ? আমি তোমার চোখ নষ্ট করেছি—স্বামীর চোখখাগি হতভাগি আমি, আমার মরণ নেই। আমিও অন্ধ হয়ে যাব—নিজের চোখ উপড়ে ফেলব। যদি না উপড়ে ফেলি, মা কালীর দিব্যি করে বলছি—

চুপ, ও সব বলতে নেই।

ধীরাজ ব্যস্ত হইয়া সুনয়নার একখানা হাত হাতড়াইয়া খুঁজিতে আরম্ভ করায় সুনয়না হঠাৎ শিহরিয়া অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিল। ধীরাজের কাকা অন্ধ, প্রথম এ বাড়িতে আসিয়া তাকে প্রণাম করার পর এমনিভাবে আন্দাজে তার গায়ে মাথায় শীর্ণ হাত বুলাইয়া কাকা তাকে অভ্যর্থনা আর আশীর্বাদ জানাইয়াছিলেন।

কী খুঁজছ ? কী খুঁজছ তুমি ?

তোমার হাত কই ?

এই যে—

তার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া ধীরাজ সান্ত্বনার সুরে বলিতে লাগিল, ও সব কথা মনেও এনো না। তোমার চোখ গেলে আমি বাঁচব কী করে ? এখন থেকে তোমার চোখ দিয়েই তো দেখব। তুমি আমার সেবা করবে, কাজ করে দেবে, বইটই পড়ে শোনাবে—

সুনয়নার হাত ছাড়িয়া দিয়া ধীরাজ তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে থাকে। সুনয়নার মাথাটা হঠাৎ এমন জোরে তার বুকে আসিয়া পড়িয়াছে যেন সে তার বুকেই মাথা কুটিয়া মরিতে চায়। সে অন্ধ হইয়া গিয়াছে, সান্ত্বনা আর সাহস পাওয়ার বদলে সে নিজেই অপরজনকে বুঝাইয়া আদর করিয়া শান্ত করিতেছে, এটা দুজনের কারও কাছে খাপছাড়া মনে হইল না। ভালোবাসার এই অন্ধ ব্যাকুলতার মতো দুর্ভাগ্যের ভালো ওষুধ জগতে আর কী আছে ?

ধীরাজ বেশি ব্যাকুল হয় নাই। কতকটা বজ্রাহত মানুষের মতো সে বিছানায় পড়িয়া আছে, মুখে বেশি কথা নাই, অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া নাই, কী পাপে তার এমন শাস্তি জুটিল ঈশ্বরের কাছে সে কৈফিয়ত দাবি করা নাই, লোভী শিশুর মতো সকলের সহানুভূতি গিলিবার অধীর আগ্রহও নাই। এখনও সে যেন নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে নাই, চিরদিনের জন্য সে অন্ধ হইয়া গিয়াছে। মনের তলে এখনও যেন তার একটা যুক্তিহীন অন্ধ আশা জাগিয়া আছে, হয়তো সব ঠিক হইয়া যাইতে পারে। ইতিমধ্যেই সুনয়নাকে সে বলিয়াছে—তাছাড়া কী জান, কিছুদিন পরে হয়তো একটু একটু দেখতে পাব। ভালো দেখতে পাব না বটে, চশমা-টশমা নিয়ে হয়তো ধোঁয়াটে ঝাপসা মতো কাছের জিনিস শুধু দেখতে পাব, তবু দেখতে পাব তো। খুব বড়ো একজন স্পেশালিস্টের কাছে যেতে হবে।

ধীরাজের মনে যতখানি হতাশা জাগা উচিত ছিল, ধীরাজের কাছে আমল না পাইয়া তার সবখানি যেন সুনয়নাকে আশ্রয় করিয়া তাকে আত্মহারা করিয়া দিয়াছে। ধীরাজের আপশোশ আর হাহুতাশ যেন মুক্তি পাইতেছে তার মুখে।

পরপর দুটি রাত্রি সে ঘুমায় নাই। একটি রাত্রি জাগিয়াছে স্বামীর সোহাগ ভোগ করিয়া, আর একটি রাত্রি জাগিয়াছে অন্ধ স্বামীর স্ত্রী হইয়া জীবন কাটানোর বীভৎস অসুবিধাগুলির কথা কল্পনা করিয়া। সারারাত সে আলো নিভায় নাই। প্রথম রাত্রে তারা আলো নিভায় নাই, দুজনে দুজনকে দেখিবে বলিয়া। পরের রাত্রে সে আলো নিভায় নাই অন্ধকারের ভয়ে। হাসপাতাল হইতে ধীরাজ বাড়ি ফিরিয়াছিল রাত্রি প্রায় এগারোটার সময়, শ্রান্ত, ক্লান্ত, ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন, অন্ধ ধীরাজ।

একবাটি দুধ চুমুক দিয়া খাইয়াই সে শুইয়া পড়িয়াছিল। শুইয়া পড়িতে তাকে সাহায্য করিয়াছিল বাড়ির প্রায় সকলে, মা বাবা ভাই বোন পিসি খুড়ি ভাইপো ভাইঝি ভাগনে ভাগনির দল। বাড়ির ঠাকুর চাকর পর্যন্ত দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শুধু আসে নাই ধীরাজের অন্ধ কাকা। ধীরাজের মার মৃদু কান্নার শব্দ শুনিতে শুনিতে তখন সুনয়নার কানের মধ্যে হঠাৎ ভাঙা কাঁসির বেতালা আওয়াজের মতো কী যেন ঝমঝম করিয়া বাজিয়া উঠিয়াছিল, বিদ্যুতের আলোয় উজ্জ্বল ঘরখানা পাক খাইয়া অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল।

মূর্ছা নয়, মূর্ছা গেলে সুনযনা পড়িয়া যাইত, জ্ঞান থাকিত না। একটু টলিতে থাকিলেও সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে প্রায় মিনিটখানেক চোখ দিয়াই যেন সেই গাঢ় স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার দেখিয়াছিল। কানের মধ্যে তখন শব্দ থামিয়া গিয়াছে। বাহিরেও কোনো শব্দ নাই। সেই স্তব্ধতাকেও সুনয়নার মনে হইয়াছিল সাময়িক অন্ধকারের অঙ্গ।

তারপর সেই নিবিড় কালো অন্ধকার পরিণত হইয়াছিল গাঢ় কুয়াশায় এবং ক্রমে ক্রমে কুয়াশাও কাটিয়া গিয়াছিল। সকলের কথার গুঞ্জনধ্বনি হঠাৎ স্পষ্ট ও বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এক অজানা আতঙ্কে তখন সুনয়নাব বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতেছে। সে আতঙ্ক ধীরাজের চোখের জন্য নয়—চোখ যে তাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে সুনয়না আগেই সে খবর পাইয়াছিল। অন্যমনস্ক অবস্থায় হঠাৎ কানের কাছে জোরে শব্দ হইলে কিছুক্ষণের জন্য মানুষ যেমন বেহিসাবি আতঙ্কে অভিভূত হইযা যায়, কী জন্য আতঙ্ক তাও বুঝিবার ক্ষমতা থাকে না, চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিবার পরেও সুনয়না অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই রকম একটা আতঙ্ক অনুভব করিয়াছিল।

তাকে চমক দিয়া বাস্তবে টানিযা আনিয়াছিল ঘর খালি হওয়ার পর ধীরাজের অস্ফুট প্রশ্ন : আলো নিভালে না?

এ প্রশ্ন সুনয়না অনেকবার শুনিযাছে। শোযাব আগে আলো নিভাইতে তার প্রায়ই খেয়াল থাকে না, ধীবাজ মনে পড়াইয়া দেয়। কাল এই পরিচিত সাধাবণ প্রশ্নটি শুনিয়া আকস্মিক উত্তেজনায় তার দম যেন আটকাইয়া আসিয়াছিল। ধীরাজ কী তবে ঘরের আলো দেখিতে পাইতেছে !

ধীরাজ সাড়া দেয় নাই। তখন সুনযনা বুঝিতে পারিয়াছিল, ঘুমের অভ্যাস বশে ধীরাজ ও কথা বলিয়াছে। ঘরে আলো জ্বালানো থাক বা নিভানো হোক, ধীরাজের তাতে সব সমান।

বুকেব অস্বাভাবিক ঢিপঢিপানি কমিয়া তখন স্বাভাবিক কান্না বুকের ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিযাছিল কিন্তু ধীরাজেব ঘুম ভাঙিয়া যাওযাব ভয়ে প্রাণ খুলিয়া সে কাঁদিতেও পারে নাই।

তারপর কখনও সন্তর্পণে বিছানায় উঠিয়া কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিয়া আবার নামিয়া আসিয়া, কখনও একদৃষ্টিতে ঘুমন্ত স্বামীর মুখ দেখিয়া, কখনও জানালার শিক ধরিয়া পাশের বাড়ির উঠানে আবছা চাঁদেব আলোয চেনা জিনিসগুলিকে নূতন করিয়া চিনিবার চেষ্টা করিয়া আব সমস্তক্ষণ আকাশপাতাল ভাবিযা সে রাত কাটাইযাছে। ঘবের আলো নিভানোর কথা একবারও তার মনে পড়ে নাই।

বেলা বাড়িলে কয়েকজন প্রতিবেশী দেখা করিতে এবং দুঃখ জানাইতে আসিলেন। আগে সুনয়না ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইত, আজ সে উদ্ধতভাবে বিছানার কাছ হইতে শুধু একটু তফাতে সরিয়া দাঁড়ায়। এই সামান্য ব্যাপারে তার এমন বিরক্তি বোধ হয় বলিবার নয়। সকলের সমবেদনার গাম্ভীর্যে বিকৃত মুখ দেখিয়া আর অর্থহীন ভদ্রতার মিঠা মিঠা কথা শুনিয়া গায়ে যেন তার আগুন ধরিয়া যাইতে থাকে। একজন অকালবৃদ্ধ সবজান্তা ভদ্রলোক যখন অদ্ভুত একটা আপশোশের শব্দ করিয়া বলেন যে অ্যালোপ্যাথি না করিয়া হোমিয়োপ্যাথি করিলে হয়তো উপকার হইত, তখন

বাঘিনির মতো তার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাকে ঘরের বাহির করিয়া দেওয়ার ইচ্ছাটা দমন করা কাল রাত্রে কান্না চাপিয়া রাখার চেয়েও সুনয়নার কঠিন মনে হয়।

হঠাৎ সে শুনিতে পাইল তার গলার আওয়াজে তারই মনের কথা কে যেন উচ্চারণ করিতেছে : আপনারা এখন আসুন, উনি একটু বিশ্রাম করবেন।

সকলে আহত বিস্ময়ে তার এলোমেলো চুল, ক্লিষ্ট মুখ আর বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকায়। ধীরাজ ভদ্রতার খাতিরে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বিনয়ের হাসি হাসিবার চেষ্টা করিতেছিল, তার মুখের হাসি মিলাইয়া যায়।

সকলের আগে কথা বলেন অকালবৃদ্ধ ভদ্রলোকটি : চলো হে চলো, আপিসের বেলা হল।

ধীরাজের ছোটো ভাই বিরাজ সকলকে সঙ্গে করিয়া ঘরে আনিয়াছিল, সকলে চলিয়া গেলে সে বলিল, তুমি সকলকে তাড়িয়ে দিলে বউদি !

ধীরাজ ভর্ৎসনার সুরে বলিল, তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?

সুনয়না উদ্‌ভ্রান্তভাবে বাঁহাতের বুড়ো আঙুল দিয়া নিজের কপালটা ঘষিতে থাকে, কথা বলে না। বিরাজ বছর তিনেক ডাক্তারি পড়িতেছে, সুনয়নার মূর্তি দেখিয়া এতক্ষণে তার খেয়াল হয়, হয়তো তার অসুখ করিয়াছে।

তোমার অসুখ করেছে নাকি বউদি !

সুনয়না মাথা নাড়িয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। একটু পরেই বিরাজ গিয়া খবর দিল, দাদা ডাকছে বউদি।

ঘরে ফিরিয়া গিয়া ধীরাজের পরিবর্তন দেখিয়া সুনয়না স্তম্ভিত হইয়া গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার মুখখানা যন্ত্রণায় বিকৃত হইয়া গিয়াছে, ডান হাতে সে নিজের চুলগুলি সজোরে মুঠা করিয়া ধরিয়া আছে।

সুনয়না সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কী হয়েছে ?

ধীরাজ অস্বাভাবিক চাপা গলায় বলিল, তোমার অসুখ করেছে তো ? আমি টের পাইনি ! বিরাজ না বললে জানতেও পারতাম না। এবার থেকে তোমার অসুখ করবে আর আমি না জেনে তোমায় খাটিয়ে মারব, বকব—

ধীরাজ হঠাৎ যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল, ঠকাও, ঠকাও, তুমিও আমায় ঠকাও। চোখে তো দেখতে পাই না, যা ইচ্ছা তাই বলে কচি ছেলের মতো ভোলাও। বলিয়া ধীরাজ কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

আগের মতো শান্তভাবে ধীরাজ কথাগুলি বলিলে সুনয়না হয়তো তার পাশে বিছানায় আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদাকাটা আরম্ভ করিয়া দিত। স্বামীর ব্যাকুলতা আর কান্না দেখিয়া নিজেকে সে সংযত করিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে পাশে বসিয়া স্বামীর মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া কয়েক ঘণ্টা আগে ধীরাজ যেভাবে তার মাথায় হাত বুলাইয়া তাকে সান্ত্বনা দিয়াছিল তেমনিভাবে এখন তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, ও রকম কোরো না। পাগল হয়েছ, তোমায় ঠকাব ? ঠাকুরপোর কি কাণ্ডজ্ঞান আছে : ভাবনায় চিন্তায় রাত জেগে মুখ একটু শুকনো দেখাচ্ছে, ওমনি ঠাকুরপো ধরে নিল আমার অসুখ হয়েছে। অসুখ হলে তোমায় বলব না ?

কিন্তু বিরাজ যে বলল তোমার নার্ভাস ব্রেকডাউনের উপক্রম হয়েছে ?

ঠাকুরপো তো মস্ত ডাক্তার !

এমন সময় আসিলেন পিসিমা। সুনয়নার দিকে কেউ নজর দিতেছে না বলিয়া বিরাজ বোধ হয় বাড়ির লোককে একটু খোঁচাইয়া দিয়াছিল, ঘরে ঢুকিয়াই পিসিমা বলিতে আরম্ভ করিলেন, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, তুমি কী আরম্ভ করে দিয়েছ বউমা ? কাল থেকে উপোস দিচ্ছ এয়োস্ত্রী মানুষ—

পিসিমার পিছনে পিছনে কাকিমাও আসিয়াছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, আহা, থাক, থাক। এসো বউমা, একটু কিছু খেয়ে নেবে এসো।

কাকিমা একটু গম্ভীর চুপচাপ মানুষ, কারও সঙ্গে বেশি মেলামেশা করেন না। এতদিন মানুষটাকে দেখিলেই সুনয়নার বড়ো মায়া হইত, মনে হইত, আহা, দশ-বারোবছর বেচারি অন্ধ স্বামীকে নিয়া ঘর করিতেছে। আজ কাকিমার শান্ত কোমল মুখখানা দেখিয়া তার গভীর বিতৃষ্ণা বোধ হইতে লাগিল, আন্তরিক মমতাভরা কথাগুলি শুনিয়া মনে হইতে লাগিল, সুযোগ পাইয়া তাকে যেন ব্যঙ্গ করিতেছেন, পিসিমার মৃদু ভর্ৎসনার প্রতিবাদ করিয়া যেন ইঙ্গিতে বলিতেছেন, আহা থাক থাক, ওকে বকবেন না, ও এখন আমার দলের।

একটু আগে সুনয়না হয়তো নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া প্রতিবেশী ভদ্রলোকদের মতো গুরুজন দুজনকেও অপমান করিয়া বসিত। কিন্তু ধীরাজের আকস্মিক উদ্‌ভ্রান্তভাব তার সমস্ত সংগত ও অসংগত উচ্ছ্বাসের বাহির হওয়ার পথ তখনও বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। একটু ঘোমটা টানিয়া দিয়া সে নীরবে কাকিমার সঙ্গে চলিয়া গেল।

একবার ভাঙিয়া পড়িয়াই ধীরাজের ধৈর্য আর সংযম যেন নষ্ট হইয়া গেল। এতক্ষণে সে যেন টের পাইয়াছে তার চারিদিকে যে অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে সেটা রাত্রির সাময়িক অন্ধকার নয়, ভাগ্যের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কখনও দুঃখে সে একেবারে মুষড়াইয়া পড়িতে লাগিল, কখনও অধীর হইয়া ছটফট করিতে লাগিল। মা একবার ছেলেকে দেখিতে আসিয়া ছেলের অবস্থা দেখিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না, চোখে আঁচল দিয়া পালাইয়া গেলেন। বাড়ির সকলে আসিয়া নানাভাবে তাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাতে সে যেন আরও অশান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

সব কথার জবাবে গুমরাইয়া গুমরাইয়া কেবলই বলিতে লাগিল, অন্ধ হয়ে বেঁচে থেকে কী হবে, এর চেয়ে মরাই ভালো।

ধৈর্য আর সংযম দেখা দিল সুনয়নার মধ্যে। মনের সমস্ত অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাকে সে যেন জোর করিয়া মনের জেলে পুরিয়া ফেলিল, বাহিরে এখন তাদের অস্তিত্বের কোনো চিহ্নই প্রকাশ পাইল না। দুজনের দ্রুত পরিবর্তন দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তারা যেন পরামর্শ করিয়া পরস্পরের মানসিক অবস্থাকে অদল-বদল করিয়া নিয়াছে। ধীরাজ যতক্ষণ শান্ত ছিল ততক্ষণ পাগলামি করিয়াছে সুনয়না, এবার ধীরাজকে পাগল হওয়ার সুযোগ দিয়া সুনয়না আত্মসংবরণ করিয়াছে।

জুয়াড়ির বউ

ধরিতে গেলে জুয়ার দিকে মাখনের ঝোঁক ছিল ছেলেবেলা হইতেই। তার অল্প বয়সের খেয়াল আর খেলাগুলির মধ্যে তার ভবিষ্যৎ জীবনের এমন জোরালো মানসিক বিকারের সূচনা অবশ্য কেউ কল্পনা করিতে পারিত না। বাজি ধরে না কে, লটারির টিকিট কেনে না কে, মেলায় গেলে নম্বর লেখা টেবিলে দু-চারটা পয়সা দিয়া ঘূর্ণমান চাকায় লেখা নম্বরের দিকে তির ছোঁড়ে না কে ? এ সব তো খেলা—নিছক খেলা। তবে মাখনের একটু বাড়াবাড়ি ছিল। কথায় কথায় সকলের সঙ্গে বাজি ধরিত, লটারির টিকিট কেনার পয়সার জন্য বিরক্ত করিয়া করিয়া গুরুজনের মার খাইত, মেলায় গিয়া অন্য জিনিস কেনার পয়সা তির ছুঁড়িবার খেলায় হারিয়া আসিত। এই তুচ্ছ ছেলেমানুষি পাগলামি যে একদিন একটা মারাত্মক নেশায় দাঁড়াইয়া যাইবে এ কথা কারও মনে আসে নাই।

প্রকৃত জুয়া আরম্ভ হয় ঘোড়দৌড়ের মাঠে। মাখন তখন কলেজে গোটা দুই পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। নলিনীর দাদা সুরেশ ছিল তার প্রাণের বন্ধু, একদিন সেই তাকে ঘোড়দৌড়ের মাঠে নিয়া গেল।

আজ একটু রেস খেলি চ মাখন।

রেস ? আমার কাছে মোটে দশটা টাকা আছে।

আবার কত চাই ? লাগে তো আমি দেবখন—আয়।

সাত টাকা জিতিয়া দুজনের সেদিন কী ফুর্তি ! সাহেবি হোটেলে সাতগুণ দাম দিয়া চিংড়ি মাছের মাথা আর মুরগির ঠ্যাং গিলিয়া বায়োস্কোপ দেখিয়া সুরেশ বাড়ি গেল আর মাখন ফিরিল তার মেসে। তারপর আর দু-একবার রেস খেলিতে গিয়া কয়েকটি টাকা হারিয়াই সুরেশ যদিবা বিরক্ত হইয়া মাঠে যাওয়া এক রকম বন্ধ করিয়া দিল, একটা দিন যাইতে না পারিলে মাখনের মন করিতে লাগিল কেমন কেমন। সুরেশের কাছে প্রায়ই সে টাকা ধার করিতে লাগিল।

আর একটা পরীক্ষা কোনো রকমে পাশ করিবার পর একদিন হিসাব করিয়া দেখা গেল সুরেশের কাছে মাখন অনেক টাকা ধারে। বন্ধুকে টাকা ধার দিতে দিতে সুরেশের নামে পোস্টাফিসে জমা টাকাগুলি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

এবার বাড়ি গিয়ে তোর টাকা এনে দেব।

ছেলেকে একেবারে এতগুলি টাকা দেওয়া মাখনের বাবার পক্ষে সহজ ব্যাপার ছিল না, তবু তিন তিনটা পরীক্ষা পাশ করা ছেলে চাকরির চেষ্টা করার আগে একজন বন্ধুর সঙ্গে ব্যাবসা আরম্ভ করিয়া দেখিতে চায়, সুযোগ না পাইলে ভয়ানক কিছু করিয়া বসিবার মতো প্রচণ্ড আগ্রহের সঙ্গে দেখিতে চায়, টাকাটা তাকে না দিলেই বা চলে কেমন করিয়া ?

বন্ধুকে দেওয়ার জন্য টাকাগুলি সঙ্গে নিয়া মাখন কলিকাতায় পৌঁছিল শনিবার সকাল দশটার সময়। সমস্ত পথ সে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, এতদিন অল্প টাকা নিয়া খেলার জন্য সে হারিয়াছে। বেশি টাকা নিয়া খেলিলে জিতিবার সম্ভাবনা বেশি। বন্ধুর সমস্ত ঋণ একেবারে শোধ করার কী দরকার আছে ? আজ যদি কিছু বেশি টাকা টাইগার জাম্পের উপর ধরে—টাইগার জাম্প আজ নিশ্চয় জিতিবে,—ঘোড়াটা ফেবারিট হইলেও তিনগুণ নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। সুরেশকে দিয়া দেওয়ার আগে টাকাটা খাটাইয়া কিছু লাভ করিয়া নিলে দোষ কী আছে ? সব টাকা নয়—অর্ধেক। হারুক বা জিতুক অর্ধেক টাকা সে স্পর্শ করিবে না, ঋণ পরিশোধের জন্য থাকিবে।

সন্ধ্যার আগে শেষ ঘৌড়দৌড়ের শেষে খালি পকেটে মাখন এনক্লোজারের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

পরদিন অনেক বেলায় সে ম্লানমুখে সুরেশদের বাড়ি গেল। দরজা খুলিয়া দিল নলিনী। আগে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিত, আজ কিন্তু মুখখানা তার বড়োই গম্ভীর দেখাইতে লাগিল।

ছাতে চুল শুকোচ্ছিলাম, আপনাকে আসতে দেখে নেমে এলাম।

নলিনীর হাসির অভাবটা পূরণ করার জন্য মাখন নিজেই একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, বেশ করেছ। সুরেশ কই ?

দাদা আসছে। টাকা এনেছেন দাদার ?

মাখন থতোমতো খাইয়া বলিল, টাকা ? ও, টাকা। তুমি জানলে কী করে টাকার কথা ?

আমি কেন, সবাই জানে। বাবা রেগে আগুন হয়ে আছে। আনেননি তো ? তা আনবেন কেন ! গম্ভীর মুখ অন্ধকার করিয়া নলিনী ভিতরে চলিয়া গেল।

সুরেশ আসিলে টাকার কথাটা উঠিল বড়োই খাপছাড়া ভাবে। মাখন বলিল, তোর টাকাটা দিতে পারব না সুরেশ। এক কাজ কর, ওই টাকাটা আমায় পণ দে, আমি নলিনীকে বিয়ে করব।

কথা ছিল, কথাটা গোপন থাকিবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা থাকিল না। বিনাপণে বন্ধুর বোনকে বিবাহ করার জন্য মনে মনে বাড়ির সকলেই একটু চটিয়াছিল—নলিনী তেমন রূপসিও নয়। কথাটার সমালোচনা হইত নানাভাবে—একটু কটুভাবেই। নলিনী যে কী করিয়া মাখনকে ভুলাইল ভাবিয়া সকলে অবাক হইয়া যাইত। আজকালকার মেয়ে, ফন্দিবাজ বাপের মেয়ে, ওদের পক্ষে সবই হয়তো সম্ভব। আচ্ছা, পয়সাকড়ি যখন দিল না, গয়না কিছু বেশি দেওয়া কী উচিত ছিল না নলিনীর বাপের ?

শুনিতে শুনিতে একদিন রাগে নলিনী দিশেহারা হইয়া গেল। বড়ো গুরুজন কেউ মন্তব্য করিলে রাগে দিশেহারা হইয়াও হয়তো সে চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু সেদিন মন্তব্যটা করিয়াছিল ননদ বিধু। তার সঙ্গে ইতিমধ্যে কতকটা ভাব হইয়া যাওয়ায় সে বলিয়া ফেলিল, পণ দেওয়া হয়নি মানে ? পণ তো ওঁকে আগেই দেওয়া হয়েছে।

তারপর সব জানাজানি হইয়া গেল। প্রথমটা কেউ বিশ্বাস করিতেই চায় না, কিন্তু সত্য কথায় বিশ্বাস না কবিয়া উপায় কী! মাখনকে জিজ্ঞাসা করায় সেও স্বীকার করিয়া ফেলিল।

রাত্রে মাখন বলিল, টাকার ব্যাপারটা বলতে না তোমায় বারণ করেছিলাম ? বললে কেন ?

নলিনী বলিল, ব্যাবসার নাম করে দাদাকে দেবাব জন্য টাকা নিয়ে গিয়েছিলে, আমায় বলনি কেন ? আমার রাগ হয় না বুঝি ?

হুঁ, রাগ হলে তুমি বুঝি দশজনের কাছে আমার বদনাম করে শোধ তুলবে ? তুমি তো কম শয়তান নও !

বিশ্রী একটা কলহ হইয়া গেল, কথা বন্ধ রহিল তিন দিন। আবার কথা আরম্ভ হওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, অতগুলো টাকা কী করলে ? দাদার কাছ থেকে নিয়েছ, বাবার কাছ থেকে নিয়েছ, টাকা তো কম নয় !

প্রথমে কৈফিয়তটা ভালো করিয়া নলিনীর মাথায় ঢুকিল না। চুপিচুপি কার সঙ্গে মাখন ব্যাবসা করিতেছিল, সব টাকা লোকসান গিয়াছে। তারপর সে টের পাইল মাখন মিথ্যা বলিতেছে। মনটা তার খারাপ হইয়া গেল। স্বামীর মন তো তার ছোটো নয়, টাকা পয়সার ব্যাপারে সে বরং অতিমাত্রায় উদার। টাকা পয়সার ব্যাপারেই তার কেন মিথ্যা বলার প্রয়োজন হইল ?

বাপ আর শ্বশুরের চেষ্টায় মাখনের একটা চাকরি জুটিয়া গেল ভালোই। বছর পাঁচেকের মধ্যে বেতন বাড়িয়া দাঁড়াইয়া গেল প্রায় তিনশো টাকায়। এতদিনে নলিনীর একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হইয়াছে এবং কতকটা স্বামীর চাকরির জন্যই অতি দ্রুত প্রমোশন পাইয়া পাইয়া স্বামীর সংসারে প্রায় গিন্নির পদ পাইয়াছে। সংসারে বিশেষ অশান্তি নাই, রোগ-শোক নাই, অনটন নাই—নলিনীর মনেও জোরালো দুঃখ কিছু নাই। কেবল সেই যে তিন দিন কথা বন্ধ থাকার পর মাখনেব মিথ্যা বলার জন্য মনটা তার খারাপ হইয়া গিয়াছিল, মৃদু আশঙ্কার মতো একটা স্থায়ী অস্বস্তির মধ্যে সেই মন খারাপ হওয়ারই কেমন যেন একটা অদ্ভুত খাপছাড়া জের চলিতেছে। কোনো পাপ করে নাই নলিনী তবু ভয়ে রূপান্তরিত পুরানো পাপের মতোই কী যেন একটা দুর্বোধ্য ভার সব সময়েই তার মনকে বহন করিতে হইতেছে।

মাখনের জুয়ার নেশা কাটিয়া যায় নাই, ভালোবাসার নেশার মতোই প্রথম বয়সের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা আর অসহ্য অধীরতার যুগটা পার হইয়া ধীর স্থির হিসাব করা নেশায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পাকা প্রেমিকের অভ্যস্ত প্রেম করার মতো তার জুয়া খেলাটাও দাঁড়াইয়া গিয়াছে অনেকটা নিয়মিত। টাকা অবশ্য জমে না, অনেক সাধ অবশ্য মেটে না, মাঝে মাঝে বিশেষ প্রয়োজনের সময় টাকার জন্য অবশ্য সাময়িকভাবে রীতিমতো বিপদে পড়িতে হয়, তবু মোটামুটি সংসার চলিয়া যায়। মাখনের শ-খানেক টাকা বেতন হইলে যেমন চলিত তেমনিভাবে চলিয়া যায়। মাখনের বেতন শ-খানেক টাকা ধরিয়া নিলে অবশ্য অনেক হাঙ্গামাই মিটিয়া যাইত, এর চেয়ে অনেক কম বেতনেও জগতে অনেক লোক চাকরি করে, কিন্তু মুশকিল এই যে তিনশো টাকা যে বেতন পায় তার বেতনের দুশো টাকা কোনো কাজে না আসিলেও বেতন তার শ-খানেক টাকার বেশি নয় এটা ধরিয়া নেওয়া তার নিজের পক্ষেও অসম্ভব, আত্মীয়বন্ধুর পক্ষেও অসম্ভব।

আত্মীয়বন্ধুর রাগ অভিমান বিরক্তি আর উপদেশ উপরোধ সমালোচনা এখনও চলিতে থাকিলেও নলিনী এক রকম আর কিছুই বলে না। সে জানে এ রোগের ওসুধ নাই। এ কথাটাও সে জানে যে প্রয়োজন হইলে জুয়ার খরচটা মাখন কমাইয়া দিবে, কিন্তু সত্যসত্যই প্রয়োজন হওয়া চাই। পেট ভরানোর মতো, গা ঢাকা দেওয়ার মতো, রোগের সময় ডাক্তারের টাকা ওসুধ কেনার মতো খাঁটি প্রয়োজন। এ রকম আসল প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ববোধের কাছেই কেবল তার জুয়ার নেশা হার মানে।

কত কৃত্রিম প্রয়োজনই নলিনী দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কতবার কতভাবে স্বামীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, সংসারে এটা চাই, ওটা চাই, সেটা চাই। মাখন শুধু বলিয়াছে, আচ্ছা, আচ্ছা, হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রায় কিছুই হয় নাই।

বাড়ি বদলানোর জন্য নলিনী অনেকবার ঝগড়া করিয়াছে। বলিয়াছে, এ বাড়িতে আমি থাকব না, একটা ভালো বাড়িতে চল। বলিয়া রাগ করিয়া বাপের বাড়িতে চলিয়া গিয়াছে। তখন অবশ্য মাখন বেশি ভাড়ার একটা ভালো বাড়িতে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু তার ফলটা নলিনীর পক্ষেই হইয়াছে মারাত্মক। কারণ, জুয়ার খরচ মাখন এক পয়সা কমায় নাই, টান পড়িয়াছে সংসারের খরচেই। আবার উঠিয়া যাইতে হইয়াছে কম ভাড়ার বাড়িতে।

নলিনী বলিয়াছে, আমি দুগাছা করে নতুন চুড়ি গড়াব।

মাখন বলিয়াছে, আচ্ছা।

কিন্তু তারপর দুবছরের মধ্যে সস্তা এক জোড়া দুলও নলিনীর গড়ানো হয় নাই। কারণ, চুড়িও নলিনীর আছে, দুলও আছে।

কিন্তু নলিনী যেদিন বলিয়াছে, একটা লাইফ ইনসিওর পর্যন্ত করবে না তুমি ? তার এক মাসের মধ্যে মাখন দশ হাজার টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স করিয়াছে এবং এখন পর্যন্ত নিয়মিত প্রিমিয়াম দিয়া আসিলেও বেশি ভাড়ার বাড়িতে উঠিয়া যাওয়ার ফলটা নলিনীকে ভোগ করিতে হয় নাই।

ধরিতে গেলে টাকা পয়সার ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়াই হইয়া গিয়াছে। তবু সেই রহস্যময় মৃদু আতঙ্কের পীড়ন একটুও শিথিল হয় নাই। কী যেন একটা বিপদ ঘটিবে—অল্পদিনের মধ্যেই ঘটিবে। কিন্তু কী ঘটিবে ? মাখন একদিন জুয়ায় সর্বস্ব হারিয়া সর্বনাশ করিবে ? কিন্তু মাখনের সর্বস্ব তো তার তিনশো টাকার চাকরি, উপার্জনের টাকা জুয়ার নেশায় নষ্ট করা সম্বন্ধে সে যতই অবিবেচক হোক, চাকরি নষ্ট করার মানুষ সে নয়। সে বিশ্বাস নলিনীর আছে। তবে ? আরও অনেক বেশি আরামে ও সুখে বাঁচিয়া থাকার সুযোগ পাইয়াও স্বামীর দোষে কোনোরকমে খাইয়া পরিয়া অতি গরিবের মতো বাঁচিয়া থাকিতে পাওয়ার যে জ্বালাভরা অভিযোগ, এটা কি তারই প্রতিক্রিয়া ?

কিন্তু কোথায় জ্বালাভরা অভিযোগ ? রাজপ্রাসাদে রাজরানির মতো সুখে ও আরামে থাকিবার ব্যবস্থা মাখন করিয়া দিক এটা সে চায়, মাখনের ভালোবাসার প্রকাশ হিসাবে চায়, কিন্তু না পাওয়ার জন্য বিশেষ ক্ষোভ তো তার নাই।

নলিনী তাই কিছু বলে না। সব বিষয়েই সে এক রকম হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, মাখনের সহজ সাধারণ ভালোবাসার মধ্যে একটু রোমাঞ্চ আনিবার চেষ্টায় পর্যন্ত। চেনা মানুষ স্বামী হইয়াছে, তার কাছে কি অচেনা মানুষের নাটকীয় ভালোবাসা আশা করা যায় ? এতদিন ছেলেমানুষ ছিল তাই চেষ্টা করিয়াছে, বিবাহের আগে বুদ্ধি কম ছিল তাই তখন ভাবিয়াছে, বিবাহ হইলে হয়তো মাখন বদলাইয়া যাইবে। কিন্তু জুয়ার নেশার উত্তেজনা আর অবসাদের মধ্যে যার মনের জোয়ার-ভাটা বউয়ের কথা কী তার মনে পড়ে, বউয়ের জন্য একবার একটু পাগল হওয়ার সময় কী তার থাকে !

ভাবিতে ভাবিতে নলিনীর সাধারণ ছোটো ছোটো চোখ দুটিতে অস্পষ্ট স্বপ্নের স্পষ্ট ছায়া এমন অদ্ভুত ভাবালুতার আবরণে ঘনাইয়া আসে যে জগতের সব ডাগর ডাগর চোখগুলিতেও তা সম্ভব মনে হয় না। হয়তো তখন দুপুর বেলায় আঁচল পাতিয়া মেঝেতে গড়ানোর অবসরটা পাওয়া গিয়াছে। ছেলেমেয়েরা একজন খেলায় মত্ত, একজন ঘুমে অচেতন। চোখ বুজিলে কষ্ট বাড়িয়া যায়, নলিনী তাই চোখ মেলিয়া স্বপ্ন দ্যাখে—তার কুমারী জীবনের স্বপ্ন আত্মহারা আবেগের সঙ্গে তাকে ভালোবাসিলে মাখন কী করিত। সম্ভব অসম্ভব কত কথাই নলিনী ভাবে।

তারপর অল্প অল্প অস্বস্তির মধ্যে মৃদু ভয়ের পীড়নে স্বপ্ন শেষ হইয়া চোখ দুটি তার বড়ো সাধারণ দেখাইতে থাকে। দুটি সন্তান যার তার কেন আর এ সব স্বপ্ন দেখা, আর কী এ স্বপ্ন সফল হয় ! যদিবা হয়, কোনো এক আশ্চর্য উপায়ে আংশিকভাবে সফল হয়, দুদিন পরে সেটুকু সম্ভাবনাও আর থাকিবে না। আবার ছেলে বা মেয়ে কোলে আসিবে নলিনীর, তারপর সব শেষ। উদাসীন মাখনের মধ্যে প্রেমের উদ্দীপনা জাগানোর কথা ভাবিতে তার নিজেরই কী লজ্জা করিবে না ? কী দিয়াই বা সে উদ্দীপনা জাগাইবে।

এখনও কেউ জানে না ! দুদিন পরেই জানিবে। মাখন হয়তো খুশি হইয়া আদর যত্ন বাড়াইয়া দিবে, বলিবে : একটু দুধ খেয়ো। এ সময় দুধটুধ খেতে হয়। কিন্তু তারপর ? আরও শ্রান্ত হইয়া পড়িবে মাখন, আরও ঝিমাইয়া পড়িবে। মাথা কপাল খুঁড়িয়া মরিয়া গেলেও আর নলিনী তাকে জাগাইয়া তুলিতে পারিবে না। নলিনীর ভ্রু কুঁচকাইয়া যায়, সংকুচিত চোখ দুটিতে মরণের চেয়ে গভীর আতঙ্কের ছাপ পড়ে, শীতের দুপুরে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যায়।

কোনো কি উপায় নাই ? যে কোনো একটা উপায় ? ব্যর্থ হইলে যদি সর্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে, তবু সার্থকতার সেটুকু সম্ভাবনা থাকিবে তারই লোভে সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিত। কিন্তু সে রকম উপায়ই বা কোথায় যাতে সমস্ত শেষ হইয়া যায়, নয় মাখনের ভালোবাসা মেলে ?

ঠিক সেই সময় দুরুদুরু বুকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে মাঠে রেলিং ঘেঁষিয়া এগারোটি ঘোড়ার মধ্যে একটির অগ্রগতি লক্ষ করিতে করিতে মাখন ভাবিতেছিল, এবারও না জিতিলে বিপদে পড়িবে বটে, কিন্তু যদি জেতে—

সন্ধ্যার পর ঘোড়দৌড়ের মাঠ হইতে বন্ধু অবনীর সঙ্গে শ্রান্ত ক্লান্ত মাখন ফিরিয়া আসে। সুরেশের মতো অবনী এখন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। মানুষটা সে একটু বেঁটে, রোগা লাজুক আর ভীরু। কথার জবাবে পারিলে কথা বলার বদলে মৃদু একটু হাসিয়াই কাজ সারে। কখনও কেউ তাকে উত্তেজিত হইতে দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। ঘোড়া ছুটিবার সময় মাখন যখন আগ্রহে উত্তেজনায় বাঁহাতের বুড়ো আঙুলটা কামড়াইতে থাকে, অবনী নির্বিকারভাবে বিড়ি টানিয়া যায়। জিতিলে মাখন হুর্‌রে বলিয়া প্রচণ্ড একটা চিৎকার করিয়া লাফাইয়া ওঠে, হারিলে ঝিমাইয়া পড়ে। অবনী জিতিলেও মৃদু একটু হাসে, হারিলেও হাসে।

নলিনীর সাজপোশাক দেখিয়া দুজনেই একটু অবাক হইয়া যায়। ফ্যাশন করিয়া শাড়ি পরিয়াছে, রঙিন ব্লাউজ গায়ে দিয়াছে, শুধু ঘষামাজায় খুশি না হইয়া গালে বোধ হয় একটু রঙের আর চোখে একটু কাজলের ছোঁয়াচ দিয়াছে।

মাখন বলে, কোথায় যাবে ?

নলিনী একগাল হাসিয়া বলে, কোথায় আবার যাব !

সেজেছ যে ?

সেজেছি ? কী জ্বালা, কোথাও না গেলে বাড়িতে বুঝি ভূত সেজে থাকতে হবে ? তারপব অবনীর কাছে গিয়া বলে, সইকে বুঝি তালা বন্ধ করে রাখেন, আসে না কেন ?

অবনী নীরবে মৃদু একটু হাসে।

চলুন সইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।

বলিয়া স্বামীর যে বন্ধুর সঙ্গে তিন হাত তফাতে দাঁড়াইয়া নলিনী সংক্ষেপে কথা বলিত, রীতিমতো তার হাত ধরিয়া তাকে টানিয়া তোলে এবং মাখনের দিকে এক নজব না চাহিয়াই বাহির হইয়া যায়।

প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও নলিনী ভিতরের উত্তেজনা গোপন করিতে পারে না। অবনীর বউ বলে, কী হয়েছে সই ?

কিছু না।

কোমরে আঁচল জড়াইয়া অবনীর বউ রান্না করিতেছিল। নলিনীর চেয়ে সে বয়সে বড়ো, কিন্তু বড়োই তাকে ছেলেমানুষ দেখায়। মানুষটা সে সব সময়েই হাসিখুশি, কাজ করিতে করিতে গুণগুণ করিয়া এখনও গান করে। তাকে দেখিলেই নলিনীর বড়ো হিংসা হয়, মনটা কেমন করিতে থাকে। ওর স্বামীও তো জুয়া খেলে, তার চেয়ে অনেক কষ্টেই ওকে সংসার চালাইতে হয়, দুটি ছেলের মধ্যে একটি ওর মরিয়া গিয়াছে, তবু সব সময় এমন ভাব দেখায় কেন, দুদিন আগে বিবাহ হইয়া আসিয়া স্বামীর আদরে মাটিতে যেন পা পড়িতেছে না ?

অবনীর বউ বলে, এমন সেজেগুজে হঠাৎ ?

নলিনী বলে, এমনি এলাম তোমায় দেখতে ?

কী ভাগ্যি আমার ! ভাতের হাঁড়ি উনানে চাপাইয়া হাসিতে হাসিতে অবনীর বউ কাছে আসিয়া বসে।

কথা আজ জমে না। রাত্রির সঙ্গে নলিনীর ভয় বাড়ে, ক্রমেই বেশি অন্যমনস্ক হইয়া যায়, তবু উঠিবার নাম করে না। যত রাত হইবে মাখন তত বেশি রাগ করিবে—তত বেশি নাড়া খাইবে মাখনের মন। একটুও কি পরিবর্তন আসিবে না ? রাগটা যখন পড়িয়া যাইবে, তখন ?

রান্না শেষ হয়, অবনীর খাওয়া হইয়া যায়, তখনও নলিনীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অবনীর বউ অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। হাসিখুশি ভাব মিলাইয়া গিয়া তারও মুখে যেন ভয়ের ছাপ পড়ে।

আমায় কিছু বলবে সই ?

নলিনী মাথা নাড়িয়া বলে, কী বলব ? না না, কিছু বলব না।

তোমায় নিতে আসছে না যে ?

কে জানে। ওর কথা বাদ দাও।

খানিক পরে অবনীর বউ বলে, ওই তবে তোমায় দিয়ে আসুক আর রাত করে কাজ নেই। পুঁইচচ্চড়ি রেঁধেছি, মুখে দিয়ে যাবে সই ?

হোক আর একটু রাত, মাখনের রাগ আর একটু বাড়িবে। আরম্ভ যখন করিয়াছে, শেষ না দেখিয়া ছাড়িবে না। মরিয়া হইয়া নলিনী সখীর রান্না পুঁইচচ্চড়ি মুখে দিবার জন্য সখীর সঙ্গে এক থালায় খাইতে বসে। দুজনে বেশ পেট ভরিয়া খায়, সকালের জন্য পান্তা না রাখাতেই ভাতে কম পড়ে না, শাক ডাল ভাজা মাছ তরকারি যতটুকুই থাক, ভাগাভাগি করিয়া খাওয়ার সময় তো মেয়েদের কখনও কম পড়েই না।

খাওয়ার পরে পান মুখে দিয়া অবনীর বউ স্বামীকে ডাকিয়া বলে, ওগো শুনছো, একটু বেরিয়ে এসো ঘর থেকে। সইকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো। বাবা, এগারোটা বাজে !

নলিনীর বুক কাঁপিয়া ওঠে। যেভাবে বাহির হইয়া আসিয়াছে, এতরাত্রে আবার অবনীর সঙ্গে একা ফিরিতে দেখিলে কী রাগটাই না জানি মাখন করিবে ! করুক রাগ, রাগাইবার জন্যই তো সাজিয়া গুজিয়া এ ভাবে সে বাহির হইয়াছে, এখন সে জন্য ভয় পাইলে চলিবে কেন ? নিজেকে নলিনী অনেক বুঝায় কিন্তু বুকের ঢিপঢিপানি কিছুতেই কমে না।

দু-বন্ধুর বাড়ি বেশি দূরে নয়। রিকশায় মিনিট দশেক লাগে। অবনীর বাড়ির কাছেই গলির মোড়ে রিকশা পাওয়া যায়। অবনী দুটি রিকশা ভাড়া করিতেছিল, নলিনী বারণ করিল, মিছিমিছি কেন বেশি পয়সা দেবেন ? একটাতেই হবে।

না না, দুটোই নিই—

নলিনীর গলার আওয়াজ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, এ সব খাপছাড়া উত্তেজনা কী তার সহ্য হয় ! তবু মরিয়া হইয়া সে বলিল, আসুন না, একটাতে বসে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

গল্প কিছুই হয় না, সমস্ত পথ দুজনেই যতটা সম্ভব পাশের দিকে হেলিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। বাড়ির দরজার সামনে রিকশা থামা মাত্র নলিনী তড়াক করিয়া নামিয়া যায়। অবনীকে বলে, ওকে ডেকে দিয়ে আপনি এই রিকশাটা নিয়ে ফিরে যান।

দরজা খুলিয়া দিতে আসিয়া মাখন দেখিতে পাইবে এতরাত্রে বউ তার এক রিকশায় অবনীর সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া বাড়ি ফিরিয়াছে, নলিনীর এই আশা বা আশঙ্কা পূর্ণ হইল না। দরজা খুলিয়া দিল চাকর।

ঘরে গিয়া নলিনী দ্যাখে কী, মেয়েটাকে কোলে নিয়া আনাড়ির মতো থাপড়াইয়া থাপড়াইয়া মাখন তাকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করিতেছে। বউয়ের সাড়া পাইয়া মাখন ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল, কী আশ্চর্য বিবেচনা তোমার ! দুজনকে ফেলে রেখে এত রাত পর্যন্ত বাইরে কাটিয়ে এলে ? খুকিকে তো অন্তত নিয়ে যেতে পারতে সঙ্গে।

মেয়েকে নামাইয়া দিয়া মাখন নিজের বিছানায় উঠিয়া শ্রান্তভাবে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। খুব যে রাগ করিয়াছে তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

তুমি কাউকে পাঠালে না কেন ? অবনীবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে---

কাকে পাঠাব ? শম্ভু এতক্ষণ খুকিকে রাখছিল।

দু-মিনিট আগে দরজা খুলিতে যাওয়ার সময় শম্ভু তবে মেয়েকে মাখনের কোলে দিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যা হইতে মাখনকে মেয়ে রাখিতে হয় নাই ! নলিনী জিজ্ঞাসা করিল না, মাখন নিজে কেন তাকে আনিতে যায় নাই। আব জিজ্ঞাসা করিয়া কী হইবে ? নিজের চোখে বউ আর বন্ধুকে জড়াজড়ি করিতে দেখিলেও বোধ হয় তার রাগ হইবে না। এমন বদমেজাজি মানুষ, এক গ্লাস জল দিতে দেরি হওয়ায় আজ সকালেই শম্ভুকে মারিতে উঠিয়াছিল, শুধু বউকে তার এত অনুগ্রহ কেন ? একদিন কী সে রাগের মাথায় বউয়ের গালে একটা চড় বসাইয়া দিতে পারে না, যাতে খানিক পরে ভালোবাসার জন্য না হোক অন্তত অনুতাপের জন্যও অনেকগুলি চুমু দিয়া চড়ের দাগটা মুছিবার চেষ্টা করা চলে ?

বাহিরটা একবার তদারক করিয়া আসিয়া নলিনী ঘুমন্ত মেয়ের পাশে শুইয়া পড়ে। মাখন বলে, খেলে না ?

নলিনী বলে, ওদের বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া যায়, তারপর মাখন যেন ভয়ে ভয়েই আস্তে আস্তে বলে, আজ অনেকগুলি টাকা জিতেছি।

নলিনী সাড়া দেয় না।

প্রায় সাতশো।

নলিনী তবু সাড়া দেয় না।

তোমায় একটা গয়না গড়িয়ে দেব---যা চাও।

নলিনী চুপ করিয়া থাকে। নিঃশব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবে : কে শুনতে চায় তুমি হেরেছ কী জিতেছ, কে চায় তোমার গয়না, একবার কাছে ডাকতে পার না আমায় ?

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মাখন বলে, রাগ করেছ ? না না, ঘুমোও আব জ্বালাতন করব না।

শহরতলি

প্রথম পর্ব

এক

এদিকের শহরতলির এই অঞ্চলে বড়ো রাস্তায় বিদ্যুতের আলো আছে,—অনেকটা দূরে দূরে। ছোটো গলিতে আলকাতরা মাখানো কাঠের থামের মাথায় আজও টিমটিমে তেলের বাতি জ্বলে। কোনো বাড়িতে ভাড়াটে কেরানিবাবুর বউ অপরিচ্ছন্ন কিন্তু বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত রান্নাঘরে উনানে ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া চামচ দিয়া কণ্ঠার নীচে ঘামাচি মারেন, রাত্রে খোকা কাঁদিয়া উঠিলে বেডসুইচ টিপিয়া বদলান তার কাঁথা ; হয়তো ঠিক পিছনেই আরও বড়ো বাড়ির রীতিমতো বড়োলোক মালিকের রান্নাঘরে ডিবরি বারবার বাতাসে নিভিয়া যায়, রাত্রে খোকা কাঁদিলে টর্চ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া খোকার মা প্রায় কাঁদিয়া ফেলেন নিজেও।

একটু বেশি রাত্রে আর রাত্রির শেষভাগে ট্রামের আওয়াজ কানে আসে, বন্ধ ঘরের বাহিরে ঝড়ের অন্তিম অবস্থার হা-হুতাশ ভরা একটা অস্বস্তিকর একটানা আহ্বানের মতো। মোটরের হর্ন দূরেও বাজে, কাছেও বাজে, সময় অসময় নাই---কেবল সময় বিশেষে বাজে বেশি, সময় বিশেষে কম। পথের দুপাশে সচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের, স্বাচ্ছন্দ্য ও দুর্ভোগের, রুচি ও অরুচির, সুন্দর ও কুৎসিতের, পরিচ্ছন্নতা ও নোংরামির, সম্মুখ ও পিছনের, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের (যথা—গৃহ-নির্মাণ-উপকরণের সমাবেশ) কত যে আশ্চর্য সমন্বয় ও গলাগলি ভাব ! নাম লেখা গেট, বাগান ও লন, আধুনিক ফ্যাশানের সুদৃশ্য দোতলা বাড়ি, বিচিত্র শাড়ি, সুন্দরী নারী, রেডিয়োর গান, ইট বাহির করা পুরানো একতলা বাড়ি, সামনে সিমেন্ট-ফাটা রোয়াকে ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাগজের টুকরা, আধপোড়া বিড়ি, কোমরে ঘুনসি বাঁধা উলঙ্গ শিশু। পথের এদিকে ছবির মতো সাজানো মনিহারি দোকান---সাবান, কেশতৈল, পাউডার, স্নো, ক্রিমে ঠাসা ; পথের অপর দিকে নিছক একটা কয়লার আড়ত, খুচরা ও পাইকারি বিক্রয় হয়, মালিক শ্রীভূষণচন্দ্র নন্দী। তিনটি মহিষের গাড়ি কয়লা আনিয়া আড়তে জমা করে, পুরীষ ও পাঁকের কোমল গভীর স্নেহে দেহের ভার নামাইয়া এই তিন জোড়া মহিষ অবসর সময়টা জাবর কাটে আড়তের ঠিক পিছনে---রাস্তা হইতে অনেকটা চোখে পড়ে, গন্ধও পাওয়া যায় কিছু কিছু। কাছেই ডাইমন্ড রেস্টুরান্ট ; ফাস্টক্লাস চা রুটি মাখন চপ কাটলেট ডবল ডিমের মামলেট (মাত্র তিন পয়সা) ইত্যাদি পাইবেন বলিয়া মালিক রাধানাথ দে স্বহস্তে সাইনবোর্ড লিখিয়া রাখিয়াছে। এক রকম গা ঘেঁষিয়াই টিনের চালার নীচে লোচন সাউয়ের মুড়িচিড়ার দোকান, কাচ বসানো টিনের পাত্রে বাতাসা, দড়িতে ঝুলানো তিলুড়ি, এক ছড়া চাঁপাকলা....। ছোটো স্যাকরার দোকান, কামারের দোকান, টিনের মগ-বালতি তৈরি আর ঘটিবাটি ঝালাই করার দোকান, সাইকেল মেরামতের দোকান এ সবও আছে।

আর কিছু দূরে আছে বড়ো বড়ো কারখানা।

হাপরের দড়ি টানিতে টানিতে তিনু, রক্তবর্ণ লোহার পাতে হাতুড়ি পিটাইতে পিটাইতে বিশু, আর অবাধ্য লোহার পাতকে মনোমতো আকৃতি দিবার চেষ্টা করিতে করিতে বেন্দা যখন হাঁপাইয়া পড়ে, তখন বেন্দাই হয়তো চোখ তুলিয়া তাকায় সেইদিকে, যেদিকে আছে বড়ো বড়ো কারখানাগুলি। প্রকাণ্ড একটা লাল দালানের লাগাও বিরাট একটি টিনের শেড আর তিনটি মোটা মোটা চোঙা পরিষ্কার দেখা যায়, অন্যগুলি একটু আড়ালে পড়িয়াছে। একী কাণ্ড, অ্যাঁ ? কত বিঘা জমি জুড়িয়া না জানি কারখানাগুলি গড়া হইয়াছে ? নিবিড় কালো কী ধোঁয়াটাই উঠিয়া যাইতেছে চোঙাগুলি দিয়া আকাশের দিকে। বেন্দা জানে, বিদ্যুতে যেমন কাচের ভিতরে অবিরাম শিখাহীন আলো জ্বলে, তেমনই অবিরাম কলও চলিতে পারে, সব কল ধোঁয়া ছাড়ে না। কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী চোঙা দিয়া যে ধোঁয়া বাহির হয়, বেন্দার কাছে তাই কেবল কলকারখানার প্রতীক।

যশোদা যখন একসঙ্গে তিনটি বড়ো বড়ো কয়লার উনুনে আঁচ দেয় তখনও বড়ো কম ধোঁয়া হয় না। শীতকালে ধোঁয়াটা যেন যশোদার বাড়ি ছাড়িয়া নড়িতে চায় না, যশোদাব বাড়ির ছোটো উঠানে, ইট আর টিনের ছোটোবড়ো কাঁচাপাকা ঘরগুলির মধ্যে স্থায়ীভাবে আটকাইয়া থাকিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এখন, বৈশাখের প্রথমে, অনেক দূরের সমুদ্র হইতে ফুরফুরে বাতাস আসিয়া সকাল সন্ধ্যায় খনি-গন্ধি ধোঁয়া উড়াইয়া লইয়া যায়।

এ বাড়িতে অল্প জায়গায় যশোদা অনেকগুলি ঘর তুলিযাছে, অনেকগুলি মানুষকে থাকিবার জায়গা দিতে হয়। আগে কেবল পাঁচটি ইটের ঘর ছিল, তখন উঠানটিও ছিল মস্ত বড়ো। পশ্চিম কোণে কল আর চৌবাচ্চার কাছে খানিকটা স্থান ছিল বাঁধানো, বাকিটা কাঁচা। তারপর দুটি টিনেব ঘর তুলিবার ফলে উঠান তার এক রকম অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, আছে কেবল ওই বাঁধানো স্থানটুকু। কয়েক বছর কাটিয়া গিযাছে কিন্তু এখনও উঠানের সংকীর্ণতা যশোদার অভ্যাস হইয়া যায় নাই, মাঝে মাঝে পীড়ন করে। দু হাতে জলভরা প্রকাণ্ড দুটি বালতি ঝুলাইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে মুখ করিয়া সশব্দে তাকে নিশ্বাস ফেলিতে দেখা গিয়াছে, ফাঁপব ফাঁপর লাগিলে মানুষ যেমন করে। বোঝা গিয়াছে, ফাঁপর ফাঁপর লাগাটা যশোদার মানসিক, বালতি দুটি ভারী বলিয়া নয়। এ রকম দু-চারটি জলভরা বালতির ভাবে কাবু হওয়ার মতো শরীর যে যশোদার নয়, দেখিলেই সেটা বোঝা যায়। সাধারণ বাঙালি ঘরের গোটা কয়েক পরম স্বাস্থ্যবতী যুবতিকে অনায়াসে গড়া চলিত এতখানি মালমশলা দিয়া ভগবান তাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

নিজের বা নিজের ভাইয়ের জন্য আজ এ বেলা যশোদার উনানে আঁচ দিবার দরকার ছিল না, পাড়ায় বউভাতের নিমন্ত্রণ আছে। কিন্তু আরও যে বিশ-বাইশজন লোক বাড়িতে আছে তাদের জন্য যশোদাকে রাঁধিতে হইল। এরা সকলেই ভাড়াটে এবং পোষ্য। কারণ অনেকে নিয়মমতো ভাড়াও দেয় না, ভরণপোষণের খরচও দেয় না—দিতে পারে না। এতগুলি লোককে উপবাসী বাখিয়া ভাইকে নিয়া কি নিমন্ত্রণ খাইতে যাওয়া চলে ?

সকাল সকাল যশোদা রান্না শেষ করিয়া ফেলিল। বড়ো গরম পড়িয়াছে আজ। রাঁধিবার সময় ঘামে যশোদার ভালোমতোই স্নান হইয়া গিয়াছিল, রান্না শেষ করিয়াই তবু একবার স্নান করিয়া নিল। শরীরের ঘাম না শুকাইয়া স্নান করিলে অসুখ হয়, এ সব যশোদা মানে না, অত তুচ্ছ কারণে অসুখ হইবে এমন শরীর যশোদার নয়। তাছাড়া, ঘাম ধুইয়া ফেলাব জন্যই স্নান করা, ঘাম শরীরে বসিয়া গেলে আর স্নান করিয়া লাভ কী ?

তখন সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করাব ব্যস্ততায় সময়মতো সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া শাঁখে ফুঁ দেওয়া হয় নাই বলিয়া যশোদার মনটা খুঁতখুঁত করিতে থাকে। শাঁখ বাজাইয়া সামনে ভাইকে দেখিয়া বলে, হ্যারে নন্দ, কোথায় থাকিস সারাদিন ? বাবুটি সেজে ঘুরে বেড়ালেই তোর দিন কাটবে ?

নন্দকে দেখিলে যশোদার ভাই বলিয়াই মনে হয় না। বাইশ-তেইশ বছর বয়স, অপরিপুষ্ট শরীর, মুখে মেয়েদের মতো তেলতেলা ধরনের কোমলতা। পাশে না বাড়ুক উপরের দিকেও যদি ভালোরকম বাড়িয়া উঠিত তবু আশা করা চলিত, এককালে মোটাসোটা হইয়া যশোদার ভাই হিসাবে মোটামুটি মানানসই হইলেও হইতে পারে ছেলেটা। কিন্তু এ রকম একটা আশা পোষণ করার সুযোগও সে রাখে নাই। মতি নামে একজন ভাড়াটে আছে যশোদার, বয়স পঞ্চাশের কাছে গিয়াছে কিন্তু মানুষের সঙ্গে ভাব করিয়া তাদের সঙ্গে সে পেশাদার রসও পান করে রসিকতাও করে। একদিন নূতন বন্ধু সুধীরের কানে কানে সে বলিয়াছিল, ওই যে ওরা দুজন যশুদা আর নন্দ, এক মায়ের পেটের ভাইবোন না হয় হল, কিন্তু বাপ কী ওদের একটা রে দাদা !

সেই দিন যশোদা ও নন্দের তফাতটা ভালোভাবে খেয়াল করিয়া সুধীরের মনে সত্যই খটকা লাগিয়াছিল যে, কথাটা কী তবে সত্যি নাকি. কে জানে।

নন্দ একগাল হাসিয়া বলিল, বউ দেখতে গিয়েছিলাম দিদি। সুন্দব বউ হয়েছে—এইটুকু বাচ্চা !

সত্যি ?

যশোদা ভাবিতেছিল, যারা বাড়ি ফিবিযাছে তাদের ভাত দিয়া বউ দেখিতে যাইবে কি না, নন্দর মুখে নতুন বউয়ের বূপবর্ণনা শোনাব পব আর ধৈর্য ধরা গেল না !—তোর ধনাদাকে ডাক তো নন্দ।

ধনঞ্জয় আসিলে যশোদার ঘরখানা যেন ভবাট হইয়া গেল। নন্দের বদলে যশোদার ভাই হইলে তাকেই মানাইত ভালো। মাস দুই আগে ধনঞ্জয় দেশ হইতে চাকরির খোঁজে আসিয়া যশোদার বাড়িতে ডেরা বাঁধিয়াছে। প্রথম দিন সাবান-কাচা লালচে ধুতির উপর গেঁয়ো ধোপার সাফ করা অতিরিক্ত নীল লাগানো শার্ট গায়ে দিয়া, বগলে মযলা শতরঞ্চি মোড়া বিছানা আর রংচটা টিনের বাক্‌সো হাতে করিয়া সে যখন বাড়িতে ঢুকিয়াছিল, মনে হইয়াছিল একটা দৈত্য আসিয়াছে। বুড়ো মতি তাকে এখানে আনিয়াছে, মতির সে দেশের লোক।

সেই দিন সুধীরের কানে কানে মতি বলিয়াছিল, যশোদা একলাটি থাকে, ওর দুঃখু আর সয় না মাইরি, তাই ধনাকে নিয়ে এলাম। দুটিতে মানাবে ভালো, অাঁ ? রসিকতা করিয়া মতি নিজে প্রাণপণে হাসে, সেদিনও হাসিয়াছিল। কিন্তু এমন একটা লাগসই রসিকতাও সুধীরের ভালো লাগে নাই দেখিয়া হাসিটা তার থামিয়া গিয়াছিল হঠাৎ।

যশোদা দুটি কাজের খোঁজ দিয়াছে, কিন্তু একটিও ধনঞ্জয়ের পছন্দ হয় নাই। লোকটার উপর যশোদা সেই জন্য বিশেষ খুশি ছিল না। গরিবের এত বাছবিচাব থাকিলে চলিবে কেন, পেটের ভাত যখন তাকে জোগাড় করিতেই হইবে ?

ধনঞ্জয় আসিলে যশোদা বলিল, একটা উপকাব করবে আমাব ? রেঁধে বেড়ে রেখে দিইছি, সুধীবকে ডেকে দুজনায় মিলে সবাইকে পরিবেশনটা করবে ? এঁটো বাসন তুলবখন আমি এসে। তিনটে থালা কম পড়বে—তিনজনকে পাতায় দিয়ো, কেমন ?

ধনঞ্জয় রাগে আগুন হইয়া বলিল, সবাইকে ভাত বেড়ে দিতে বলছ আমায় ? আস্পর্ধা তো কম নয় তোমার ! মাইনে করা বামুন নাকি তোমার আমি ?

শুনিয়া যশোদাও বাগিয়া গেল।—ও বাবা, একটা কাজ করতে বললে এ যে দেখি ফোঁস করে ওঠে। এ কোন দেশি নবাব বাদশা রে বাবা ! যাও বাবু তুমি, যাও, বসে বসে বিড়ি টানো গে।

ধনঞ্জয় গটগট কবিয়া চলিয়া গেল। নন্দ বলিল, ও বাড়ি থেকে চাঁপার মা নয় কুমুদ মাসিকে ডেকে আনব দিদি ?

যশোদা বলিল, কেন ? ও বাড়ির মানুষকে আবার টানাটানি কী জন্যে ? এতগুনো মদ্দ পুরুষ রয়েছে এ বাড়িতে, একটা বেলা কেউ ভাত বেড়ে দিতে পারবে না কটা মানুষকে ? গলায় দড়ি অমন অকম্মার ধাড়িদের ! দূর করে তাড়িয়ে দেব সবকটাকে বাড়ি থেকে। মতি আর সুধীরকে ডাক দিকি।

মতি আর সুধীরকে বলামাত্র তারা রাজি হইয়া গেল। সুধীর একটু বেঁটে, ঘাড়ে গর্দানে জড়ানো শক্ত মজবুত শরীর, গুন্ডার মতো দেখিতে। পরিবেশনের ভার পাইয়া অতিমাত্রায় খুশি হইয়া সে বলিল, একটু সেজেগুজে বউভাতে যেয়ো কিন্তু চাঁদের মা।

যশোদা বলিল, তামাশা রাখো তো বাবু তুমি। কচিখুকি নাকি যে সাজব গুজব ?

কচিখুকি না হোক, সাজগোজের সমস্যাটা একটু বিপদে ফেলিয়া দিল বইকী যশোদাকে। সাজগোজের ধার সত্যই যশোদা ধারে না, সে বয়সও নাই শখও নাই, বয়স থাকার সময়েও শখ ছিল কিনা সন্দেহ। তবু নিমন্ত্রণ বাড়িতে একখানা ভালো কাপড় তো অন্তত পরিয়া যাইতে হইবে ? ভালো কাপড় কি ছাই আছে যশোদার ! বাক্‌সো খুলিয়া অনেক দিনের পুরানো খান তিনেক রঙিন শাড়ি

নাড়াচাড়া করিতে করিতে যশোদা যেন ফাঁপরে পড়িয়া গেল। কোনো বিষয়ে মনস্থির করিতে যশোদার সময় লাগে না, দ্বিধা করিতে হয় না, কোন শাড়িখানা পরিবে ঠিক করিতে গিয়া তার যেন আজ মাথা ঘুরিয়া গেল। সস্তা দামের শাড়ি, চাকচিক্য নাই, তবু তো রঙিন ! রঙিন কাপড় পরা কি তার ঠিক হইবে ? কী রকম অদ্ভুত খাপছাড়া না জানি দেখাইবে তাকে ! এমনি তো যে চেহারা তার।

কোনটা পরি বল তো নন্দ ?

আমি কী জানি ?

বাক্সের তলায় একখানা ফিকে রঙের শাড়ি পাওয়া গেল। যশোদা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। একদিকের আঁচলের কাছে একটু ছেঁড়া আছে। তা হোক।

সত্যপ্রিয় মিলস এবং আরও কতকগুলি ব্যাবসার মালিক সত্যপ্রিয় এদিকে শহরতলির একপাশে প্রকাণ্ড বাগানবাড়িতে বাস করে। সত্যপ্রিয়ের প্রচার বিভাগের পরিচালক জ্যোতির্ময়ও এ পাড়াতে বাস করে, যশোদার বাড়ির কাছেই। সম্প্রতি জ্যোতির্ময় অপরাজিতা নামে একটি মেয়েকে হঠাৎ বিবাহ করিয়া বসিয়াছে। এই নতুন বউটিরই আজ বউভাত।

আপিসের অনেককে বলিতে হইয়াছে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে বলিতে হইয়াছে। জ্যোতির্ময়ের বাড়িতে লোক গিজগিজ করিতেছিল। আয়োজন ভালোই হইয়াছে, চাকুরে জামাইকে টাকা মেয়ের বাপ ভালোরকমেই দিয়াছেন, সুতরাং আয়োজন খারাপ হওয়ার কথা নয়। বউ দেখিয়া যশোদা খুশি হইতে পারিল না। বউ বাচ্চাই বটে, পনেরোর বেশি বয়স হইবে না। বয়সের চেয়ে ঢের বেশি কচি দেখায়, কারণ শরীরে পুষ্টি হয় নাই। জ্যোতির্ময়ের বয়স ডবলেরও বেশি, এতটুকু মেয়ে কি তার সঙ্গে মানায় ?

নিজের ইচ্ছায় নয়, বাড়ির লোকের অনুরোধে নয়, জ্যোতির্ময় নাকি সত্যপ্রিয়কে খুশি কবিতে বিবাহ করিয়াছে। সত্যপ্রিয়র একটা মত আছে, বিবাহ না করিলে দায়িত্বজ্ঞান জন্মায় না। দায়িত্বজ্ঞান জন্মায় নাই যার চাকুরির উন্নতি দূরে থাক চাকুরিটা বজায় রাখাই কি তার পক্ষে কঠিন নয় ? সুতরাং—

একদিন যশোদাকে জ্যোতির্ময় নিজেই এই ধরনের কথা বলিয়াছিল, মেয়ে খোঁজার সময়।

বিয়ের জন্য কর্তা বড়ো খোঁচাচ্ছেন চাঁদের মা। কেবলই বলছেন, এবার একটা বিবাহাদি করে ফেলুন জ্যোতির্ময়বাবু, বিবাহাদি না করলে কি দায়িত্বজ্ঞান জন্মায়, দায়িত্বজ্ঞান না জন্মালে কী—

যশোদা হাসিয়া বলিয়াছিল, তা বিয়ে করুন না, ভালো কথাই তো বলছেন উনি, খোঁটা ছাড়া কি পুরুষ মানুষের চলে ?

তুমিও ওই দলের চাঁদের মা ? কর্তার মতামত জান না কিনা, তাই বলছ। ওর মতে বিয়ে করতে হলে কী করতে হবে জান, একটি সাত বছরের খুকিকে বিয়ে করতে হবে।

শেষ পর্যন্ত তাই করিয়াছে নাকি জ্যোতির্ময় ? সত্যপ্রিয়কে খুশি করার জন্য একটি খুকিকে বউ করিয়া আনিয়াছে ? যশোদার বড়ো আপশোশ হয়। একটি বড়োসড়ো মেয়ে হইলে কেমন মানাইত জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে ! মনিবকে খুশি করিতে কেউ যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিতে পারে, তাও এমন বেমানান একটি মেয়েকে, যশোদা কল্পনাও করিতে পারে না। তবে হয়তো সত্যপ্রিয় নিছক মনিব নয় জ্যোতির্ময়ের। সে নাকি জ্যোতির্ময়কে খুব স্নেহ করে। সত্যপ্রিয়র মতো ধনীর স্নেহের মূল্য জ্যোতির্ময়ের মতো মানুষেরা হয়তো এইভাবেই দেয়। এই সব লেখাপড়া শেখা ভদ্রলোকদের রকমই আলাদা।

জ্যোতির্ময়ের বোন সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করে, কেমন বউ হয়েছে যশোদাদিদি ?

তা মন্দ কী।

সুবর্ণের বিবাহ হয় নাই, কিন্তু এমন সাজাটাই সে সাজিয়াছে যেন বিয়ের কনেটি, আজিকার উৎসবটি যেন তারই বিবাহের ভূমিকা—সাজগোজেই যেখানে যত বর আছে সকলকে আজ সে আয়ত্ত করিয়া রাখিবে। আনন্দে ও উত্তেজনায় মেয়েটা ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, যশোদার জবাবে একটু দমিয়া গেল।

বউ বুঝি তোমাব পছন্দ হয়নি যশোদাদিদি ?

এত বড়ো মেয়ের ন্যাকামিতে যশোদার গা জ্বলিয়া যায়। সে বলিল, আমার পছন্দ অপছন্দ কী বোন, আমি তো বিয়ে করিনি ? তোমার দাদার পছন্দ হলেই হল।

দিদির পিছনে পিছনে আরও একবার বউ দেখিতে আসিয়া নন্দ হাঁ করিয়া সুবর্ণকে দেখিতেছিল, এবার সে যশোদাব কথাব প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কেন, বউ তো সুন্দর, আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

যশোদা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, ফোড়ন না কেটে তুই যা তো এখান থেকে নন্দ, এত বয়স হল তোর কথা বলতে শিখলি না এখনও ?

অন্যায় কথাটা কী বলিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া নন্দ মুখভার করিয়া সরিয়া গেল।

বউকে দেওয়ার জন্য যশোদা একখানা সস্তা রঙিন শাড়ি আনিয়াছিল, শাড়িখানা বউয়ের হাতে দিতে একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করিয়া সুবর্ণও সরিয়া গেল। কেবল সুবর্ণ নয়, আরও অনেকের মনে হইতে লাগিল, বউয়েব জন্য উপহার আনিয়া এবং এমন সস্তা একখানা শাড়ি বউয়ের একেবারে হাতে দিয়া, যশোদা সকলকে অপমান করিয়াছে।

একে দুয়ে আসিয়া সকলে বউ দ্যাখে। কেউ একখানা বই দেয়, কেউ সিঁদুরের কৌটা, কেউ কিছুই দেয় না। জ্যোতির্ময়েব দিদি আর বউদিদি মেয়েদেব অভ্যর্থনা করেন, পুরুষদের অভ্যর্থনা করেন জ্যোতির্ময়েব কাকা এবং দাদা। জ্যোতির্ময় নিজে একটি মটকার পাঞ্জাবি পরিয়া এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়, সহকর্মী আর বন্ধুদের সঙ্গে একটু হাসি-তামাশা করে, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সদরে গিয়া দাঁড়ায়, রাস্তায় চোখ পাতিয়া রাখে। বড়ো অন্যমনস্ক মনে হয় জ্যোতির্ময়কে, বড়ো চঞ্চল মনে হয়।

একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করে, সত্যপ্রিয় আসবে নাকি হে ?

জ্যোতির্ময় চমকাইয়া বলে, আঁ ? কে, কর্তা ? হ্যাঁ, আসবেন।

ঠিক অবহেলা নয়, স্পষ্ট বোঝা যায় সত্যপ্রিয়র আগমনের আশায় অথবা আশঙ্কায় জ্যোতির্ময় কারও দিকে ভালো করিয়া চাহিয়াও দেখিতে পারিতেছে না। আপিসের লোকেরা ব্যাপারটা বুঝিতে পাবে, অন্য সকলে বুঝিতে না পারিলেও খানিক খানিক অনুমান করিতে পারে।

তারপর সত্যই সত্যপ্রিয় আসিল।

সত্যপ্রিয় এত বড়ো ধনী, যত না ধন তার আছে মানুষের কল্পনায় তার পরিমাণটা এত বেশি বাড়িয়া গিয়াছে যে, সাধাবণ লোকের বাড়ি সামাজিক নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলে, সকলে অতিমাত্রায় ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া পড়ে। এই জন্য এই সব বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার একটি সুন্দর পদ্ধতি তার নিজেকেই ঠিক করিয়া লইতে হইয়াছে, সকলের আদর, অভ্যর্থনা ও ভদ্রতা করিবার ব্যাকুলতাকে লোকটা এমন কৌশলে নিজেই খানিক খানিক পরিচালনা করে বলিবার নয়। যেখানে প্রতিনিধি পাঠাইয়া কাজ সারা যায়, সেখানে অবশ্য সত্যপ্রিয় কখনও যায় না, সকলকে সামলাইয়া চলিবার হাঙ্গামাও পোহাইতে হয় না।

মস্ত মোটর আসিয়া থামে, সত্যপ্রিয় নামিয়া আসে—খালি হাতে। জ্যোতির্ময়ের বউয়ের মুখ দেখিবার জন্য উপহার একটা সে আনিয়াছে, কিন্তু এত বড়োলোক সত্যপ্রিয়, সে কি উপহার হাতে করিয়া নামিতে পারে ? উপহার হাতে থাকে ভূষণের, সে সত্যপ্রিয়র আত্মীয়, বন্ধু, চর বা অনুচর একটা কিছু হইবে। মখমলে মোড়া দামি সুদৃশ্য একটি বাক্সো, দেখিলেই বোঝা যায় ভিতরে দামি কিছু আছে।

সত্যপ্রিয় নামিবামাত্র কয়েকটি চাপা গলায় উচ্চারিত হয়, ওই যে উনি, ওই যে উনি—কর্তা এসে গেছেন। জ্যোতির্ময়ের কাকা আর জ্যোতির্ময় অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগাইয়া যায়। আর হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া, নিজের আগমনটা সহজ করিয়া দিবার জন্য, নিজে তিনি যে কতদূর নিরহঙ্কারী সরল সহজ মানুষ এটা প্রমাণ করার জন্য, সত্যপ্রিয় বলে, না, না, আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমারই তো অপরাধ হয়ে গেল, আমাদের জ্যোতির্ময়বাবুর বাড়ির কাজ, প্রথম থেকে এসে আমারই তো সব দেখাশোনা করা উচিত ছিল—বড়ো দেরি করে ফেললাম। তারপর জ্যোতির্ময়ের দিকে চাহিয়া, কেমন লাগছে জ্যোতির্ময়বাবু নববিবাহের স্বাদ ? মা-লক্ষ্মীকে দেখতে পাব তো ?

বেশিক্ষণ থাকা তো উচিত হবে না, তাই ধীরে ধীরে সত্যপ্রিয় উপরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, কিন্তু সমস্তক্ষণ হাসিমুখে এদিকে ওদিকে চাহিয়া দ্যাখে, নিরুদ্‌বেগ শান্তভাবে এর সঙ্গে ওর সঙ্গে কথা বলে, যেন তাড়াহুড়া কিছুই নাই, সে বহুক্ষণ থাকিবে। পিছনে পিছনে উপহার হাতে চলিতে থাকে ভূষণ।

উপরে উঠিয়া নতুন বউয়ের সামনে দাঁড়াইয়া সানন্দ কণ্ঠে সত্যপ্রিয় বলে, বাঃ বাঃ, সুন্দর মুখশ্রী, চমৎকার লাবণ্য। বেঁচে থাকো মা, সুখী হও। বলিয়া ভূষণবাবুর হাত হইতে মখমল মোড়া কেসটি লইয়া অপরাজিতার হাতে দেয়।

এবার প্রত্যাবর্তনের পালা, অথচ ব্যস্ততা দেখাইলে চলিবে না। সুতরাং দূরের একজন পরিচিত ব্যক্তির দিকে চাহিয়া সত্যপ্রিয় উচ্চকণ্ঠে বলে, আমাদের জ্যোতির্ময়বাবুর কেমন ঘরটান হয়েছে দেখেছেন যোগেনবাবু ? আর কি আমরা জ্যোতির্ময়বাবুর দেখা পাব ? ঘরের টানে চাকরি ছেড়ে আমাদের না ডুবিয়ে দেন !

পরিহাসের সুরে কথাগুলি বলিতে বলিতে সিঁড়ির দিকে আগাইয়া গিয়া তেমনই নিরুদ্‌বেগ, অচঞ্চল মন্থর গতিতে অবতরণ।

কিছু খেতে হবে ? আপনি তো জানেন জ্যোতির্ময়বাবু, আমরা সেকেলে বামুন, সন্ধ্যাহ্নিক না করে কিছু খাই না। যে ভিড় কাজের, কখন বা বাড়ি ফিরি কখন বা সন্ধ্যাহ্নিক করি। বেশ তো বেশ তো, সে জন্য কী, পাঠিয়ে দিন না বাড়িতে কী খাওয়াতে চান। সেকেলে মানুষের খাওয়াও জানেন তো—যাই পাঠান, দু-চার মনের নীচে যেন না নামে, দেখবেন। হাসিতে হাসিতে সত্যপ্রিয় গাড়িতে উঠিল, গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

সত্যপ্রিয়র নিমন্ত্রণ রক্ষার এই পদ্ধতির সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের পরিচয় আছে, আরও দু-একটি বাড়িতে প্রায় এই রকমভাবেই সত্যপ্রিয়কে সে নিমন্ত্রণ রাখিতে দেখিয়াছে। কিন্তু একটা ব্যাপার সে আগে দ্যাখে নাই, সত্যপ্রিয়র এত দামি উপহার দেওয়া, কর্মচারীর বউকে। একটু পরেই তার কানে আসিল, সত্যপ্রিয় একটি নেকলেস দিয়া বউ দেখিয়াছে। চোখ ঝলসানো নেকলেস, হাজার দেড়েকের বেশিই দাম হইবে। বিস্ময়ে, আনন্দে অভিভূত হইয়া জ্যোতির্ময় নিজের চোখে দেখিতে গেল। দেখিয়া আরও বেশি অভিভূত হইয়া গেল। এ কী আশ্চর্য ব্যাপার !

সুবর্ণ আবার প্রায় আত্মহারা হইয়া বলিল, দেখেছ যশোদা দিদি, দেখেছ ?

যশোদা সংক্ষেপে বলিল, দেখেছি।

সোজাসুজি চেনা না থাক, সত্যপ্রিয়র পরিচয় যশোদা কিছু কিছু জানে। এত দামি জিনিসের দাম না তুলিয়া কি সত্যপ্রিয় ছাড়িবে ? হয়তো ইতিমধ্যেই কিছু দাম তুলিয়া নিয়াছে। যে খাটুনিটাই জ্যোতির্ময় খাটে, মানুষ হইয়া গাধার মতো।

সকাল সকাল খাইয়া যশোদা বাড়ি ফিরিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু সেটা সম্ভব হইল না। মেয়েদের খাইতে বসানোর সময় এমনই বিশৃঙ্খল দেখা গেল চারিদিকে যে কখন মেয়েদের দেখিয়া শুনিয়া খাওয়ানোর ভারটা যশোদার ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া গেল সে নিজেই টের পাইল না, যশোদাকে

দেখিয়া মেয়েদের মধ্যে ফিসফাস গুজগাজের অন্ত ছিল না, মাঝে মাঝে হাসাহাসিও চলিতে লাগিল, কোন ফাঁকে কোথা হইতে একটা ফাজিল মেয়ে ডাকিয়াও বসিল, ওগো হিড়িম্বা, এদিকে একটু চাটনি।

এ সব যশোদা গায়ে মাখে না, অভ্যাস আছে। যেদিক হইতে ডাক আসিয়াছিল, সেদিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিমুখে সে বলিল, খুকি-পুতুল কে চাটনি চাইলে গা ? পাঁপড় নেবে ?

অনেক রাত্রে নিজের অন্ধকার ঘুমন্ত পুরীতে ফিরিয়া যশোদার কিন্তু কেমন একটু অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। হিড়িম্বা ? হিড়িম্বার মতো দেখায় নাকি তাকে ? আলো জ্বালিয়া যশোদা আয়নায় নিজের মুখখানা একবার দেখিল, কিন্তু এতটুকু আয়নায় শুধু নিজের মুখ দেখিয়া কি বোঝা যায় তাকে হিড়িম্বার মতো দেখায় কিনা ! আয়নাটি দেয়ালে লটকাইয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া যশোদা এঁটো থালা আর পাতা গুনিয়া দেখিল। একজন খায় নাই। ধনঞ্জয় নাকি ?

ভাবিতে ভাবিতে ধনঞ্জয় কোথা হইতে সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে, শোনো বলি, চাঁদের মা, কাল ভোরে আমি দেশে ফিরে যাব।

বটে নাকি ? তা বেশ তো।

কত পাবে বলো দিকি, পাওনাটা মিটিয়ে দিই তোমার।

পাওনা মিটিয়ে দেবার জন্যে না খেয়ে রাত দুটো পর্যন্ত জেগে বসে রয়েছ ? মাথা খারাপ নাকি তোমার ?

ধনঞ্জয় একটু দমিয়া যায়, এদিক ওদিক চাহিয়া বলে, ভোর ভোর রওনা দেব কিনা, তুমি আবার এক রাত জাগলে উঠতে তোমার বেলা হবে কিনা, এই জন্যে।

আমার চেয়ে ভোরে উঠবে তুমি ? কখন উঠে উনুনে আঁচ দিই টের পেয়েছ একদিন ?

ধনঞ্জয় আরও দমিয়া গিয়া বলে, রাত জাগলে কিনা—

এক রাত জাগলে আমরা কাজে ঢিল দিই না, তোমাদের মতো নবাব বাদশা তো নই আমরা ? তা ভাত খেলে না কী জন্যে ? পরিবেশন করতে বলেছিলাম বলে অপমান হয়েছে বুঝি ?

ধনঞ্জয় চুপ করিয়া থাকে, যশোদা কড়াদৃষ্টিতে তার বিরাট দেহটা দেখিতে দেখিতে অবজ্ঞা মেশানো কড়া গলায় বলে, রোজগার করতে এসে লেজ গুটিয়ে দেশে পালাচ্ছ, ধিক তোমাকে। এত বড়ো দেহটা রেখেছ কী জন্যে, কাজের নামে যদি শিউরে ওঠ, দুটো পয়সা যদি না উপায় করতে পার ? রোগা প্যাঁটকা এইটুকু টুকু বাচ্চাগুনো পর্যন্ত চানাচুর খবরের কাগজ বেচে পয়সা কামাচ্ছে শহরে, তুমি পারলে না ?

এবার ধনঞ্জয় রাগ করিয়া বলিল, তোমার অত মুরুব্বিপানা কী জন্যে শুনি ? মানুষকে মান্যি করে কথা কইতে না পার, চুপ মেরে থাকো।

যশোদাও রাগ করিয়া বলিল, কাজের মুরোদ নেই, তেজ তো আছে দেখি ষোলোআনা ? যেয়ো তুমি কাল সকালে দেশে ফিরে, আমার কী !

পরদিন সকালে ধনঞ্জয় দেশে চলিয়া গেল।

কেবল যশোদার উপর রাগ করিয়া নয়, শহর আর শহরতলি তার সহ্য হইতেছিল না। আরও বেশি সহ্য হইতেছিল না চাকরির জন্য চেষ্টা করিতে গেলে যা সব সহ্য করিতে হয়।

দুই

যশোদার বাড়িটি যেখানে, তারই কাছাকাছি শেষ হওয়া উচিত ছিল শহরতলির। কিন্তু শহরতলি যেন নিজেকে ডিঙাইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শহর যেন নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াছে দূরে, বহু দূরে— শহরের দিকে পিছন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে পথের, পথের দুপাশের বাড়িঘর

মাঠ-পুকুর ঝোপঝাড়ের, পথচারী মানুষের মুখের ভাব ও আলাপের শহুরে ভাবটা কমিয়া আসিতে থাকে বটে, কিন্তু একেবারে লুপ্ত যেন হয় না। ধনঞ্জয় একদিন প্রায় দশ-বারোমাইল হাঁটিয়া গিয়াছিল ঝোঁকের মাথায়, যশোদার সঙ্গে ঝগড়া করিবার পরেই যে ঝোঁকটা আসিয়াছিল ; চলিতে চলিতে তার মনে হইয়াছিল, শহরের শেষ চিহ্নটুকু পিছনে ফেলিয়া যাইতে হইলে তিনশো মাইল তফাতে তার গ্রামের নদীটি পর্যন্ত তাকে হাঁটিতে হইবে, তারপর সাঁতার দিয়া পার হইতে হইবে নদী, নদী যাতে তার দেহলগ্ন শেষ শহুরে ধূলিকণাটি ধুইয়া মুছিয়া লইতে পারে। যশোদার সঙ্গে কলহের পরেই শহরের উপর ধনঞ্জয়ের বিতৃষ্ণা বাড়িয়া যাইত। একটু বসিয়া থাকিতে দেখিলেই যশোদা যে তাকে খোঁচায় এটাও ধনঞ্জয় শহুরে অমানুষিকতার পর্যায়ে ফেলিয়াছিল। যশোদা যে তার চাকবি জুটাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, দুটি কাজ জোগাড়ও করিয়া দিয়াছিল, এ জন্য ধনঞ্জয় কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা বোধ করে নাই। যাদের দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তাদের কাছ হইতে যশোদার ভাড়া আর খাওয়ার খরচ আদায় করিবার কড়াকড়িতেও সে স্তম্ভিত হইয়া যাইত। যাদের কাজ গিয়াছে, কাজের খোঁজে আসিযা যারা কাজ পাইতেছে না, তাদের যে যশোদা বিনা পয়সায় থাকিতেও দেয়, খাইতে পরিতেও দেয়, এতটুকু অবহেলা দেখায় না, চেষ্টা করিয়া কাজও জুটাইয়া দেয়, এদিকটা সে সময় ধনঞ্জয়ের খেয়ালও হইত না, তার শুধু মনে হইত, শহুরে মেয়েমানুষ কী ভয়ানক ! তবু যশোদার সঙ্গে কলহ করিলে মনটা বড়ো খারাপ হইয়া যাইত ধনঞ্জয়ের ; যশোদার স্যাঁতসেঁতে বাড়ির মধ্যে থাকিতেও তার দম আটকাইয়া আসিত, বাড়ির বাহিরে শহরতলির আবেষ্টনীতেও ফাঁপর ফাঁপর লাগিত।

জ্যোতির্ময়েরও মাঝে মাঝে এ রকম হয়, কারও সঙ্গে কলহ না করিলেও। শহরের চেয়েও এখানকার শহরতলির জীবনের গতি তার যেন মনে হয় অনেক বেশি ঊর্ধ্বশ্বাসী। কাছাকাছি অনেকগুলি কলকারখানা থাকার জন্য নয় কেবল, কাছাকাছি অনেকগুলি কলের চাকা ঘুরিতেছে বলিয়াই মানুষ জীবনের গতি বাড়ায় না, কলের চাকার গতিবেগ হাজার মাইল দূরে মানুষের জীবনেও সঞ্চারিত হইতে জানে। দুপুরবেলা বড়ো রাস্তায় গাড়িগুলি যেভাবে পরস্পরের গতিবেগ সংযত করে, থামিয়া থামিয়া যেভাবে অগ্রসর হয় শ্লথগতিতে, তাতে বরং মনে হওয়ার কথা জীবনের গতি এখানে কলকারখানার কল্যাণেই বুঝি মন্থর। কিন্তু জীবনের গতি তো চলাফেরা ছুটাছুটি নয়, বিমানে যে বোঁ করিয়া পৃথিবীটা পাক দিয়া আসিল জীবন হয়তো তার অলস ও শান্ত, ছোটো একটি ডিঙি ভাসাইয়া গা এলাইয়া পৃথিবীটা পাক দিতে জীবনের বেশির ভাগ ব্যয় হইয়া গেলেও হয়তো তার কিছু আসিয়া যায় না। শহরের চেয়ে শহরতলির মানুষের জীবনীশক্তি বেশি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের উগ্রতা বেশি, অভাবও বেশি। বাস্তব অভাব, পার্থিব অভাব, রক্তমাংসের মানুষের জীবনকে যে অভাব করিয়া দেয় একেবারে অভিশপ্ত। অভাবের তাড়নায় শহরের চেয়ে শহরতলির সমবেত জীবনীশক্তি অনেক বেশি তাড়াতাড়ি নিজেকে ক্ষয় করিয়া ফেলে। নূতন জীবন সে ক্ষয়ের পূরণ করিয়া চলে ক্রমাগত, সে নূতন জীবন এখানে যত-না সৃষ্টি হয় তার চেয়ে ঢের বেশি পরিমাণে আসে বাহির হইতে, নিকট ও দূর হইতে।

ধনঞ্জয় চলিয়া যাওয়ার পর আরও দুজন বৈশাখ মাসের মধ্যে চলিয়া গেল যশোদার বাড়ি হইতে ; একজন দেশে আর একজন স্বর্গে অথবা নরকে মৃত্যুর যদি অন্য কোনো দেশ থাকে সেইখানে। সত্যপ্রিয় মিল এবং আরও কয়েকটা মিলে বড়ো রকমের একটা ধর্মঘটের উপক্রম হইয়া থামিয়া গেল। পাড়ায় ছেলেদের 'মডার্ন ক্লাব ও লাইব্রেরি'র প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব হইয়া গেল, সত্যপ্রিয় আসিয়া একটি স্বলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিল। আমাদের দেশের আগেকার অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া কত যে তাতে হা-হুতাশ আর বার তিনেক ইংরাজের সঙ্গে ঝগড়া না করিয়া দেশের প্রকৃত উন্নতির চেষ্টা করিবার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ। 'মডার্ন ক্লাব ও লাইব্রেরি'র পক্ষে

প্রবন্ধটি একটু খাপছাড়া হইল বটে, কিন্তু পাঁচশত টাকা দান করিয়া যিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন, তাকে নিজের ইচ্ছামতো প্রবন্ধ পাঠ করিতে না দিলে তো চলে না। তাছাড়া মতামত যেমনই হোক, আগাগোড়া দেশের জন্য কী গভীর মমতা প্রবন্ধটিতে প্রকাশ পাইয়াছে ? দেশের দুরবস্থার, বিশেষত যুবকগণের বেকার সমস্যার যে শোচনীয় বর্ণনা আছে, শুনিতে শুনিতে কী গভীর হতাশায় মন ভরিয়া যায় ? কেমন একটা প্রেরণা জাগে মনের মধ্যে যে অন্য চিন্তা চুলোয় পাঠাইয়া হাসিমুখে আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার মতো বাজে গোঁয়ারতুমি ভুলিয়া গিয়া, বড়ো কিছু করা আর বড়ো কিছু হওয়ার মরীচিকাকে প্রশ্রয় না দিয়া, ভবিষ্যতে যাতে কোনোরকমে খাইয়া পরিয়া সুখে থাকা যায় প্রথম বয়স হইতেই প্রাণপণে সেই চেষ্টা কবা কর্তব্য ?

নন্দ উৎসবে গিয়াছিল, বাড়ি ফিরিয়াই বলিল, একটা চাকরি না হলে আর চলবে না দিদি।

রাত তখন দশটা বাজিয়াছে। যশোদা বলিল, তুমি যদি চাকরি করবে তো কেত্তন গেয়ে দিন কাটাবে কে ? কাল সকালতক সুবুদ্ধি টিকবে না, টেঁকে তো কাল সকালে চাকরির ভাবনা ভাবিস। এখন খেয়ে নিয়ে আমায় ছুটি দে তো, গরমে সিদ্ধ হলাম।

ভাইকে ভাত বাড়িয়া দিয়া বলিল, মতি, বুড়ো আর সুধীর এখনও ফেরেনি। জ্বালিয়ে খেলো দুটোতে আমাকে—চাকরানি পেয়েছে আমায়। কাল যদি না তাড়াই দুটোকে—

আজ গুমোট দিয়া এমন গবম পড়িয়াছে যে, রাত্রে ঘরের মধ্যে যশোদার ঘুম আসিল না। ঘণ্টাখানেক এপাশ ওপাশ করিয়া আর প্রাণপণে হাতপাখা চালাইয়া সে উঠিয়া গেল ছাতে, ভাবিল বাকি রাতটা ছাতেই মাদুর পাতিয়া শুইয়া থাকিবে। ছাতে গিয়া দ্যাখে কী, তিল ধারণের স্থান নাই। দশ-বারোজন মানুষ এলোমেলোভাবে মাদুর আর ছেঁড়া শতরঞ্চি বিছাইয়া সমস্ত ছাতটি দখল করিয়া আছে, কেউ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কেউ বসিয়া বসিয়া টানিতেছে বিড়ি।

দু-চারজন মানুষ হইলে যশোদা হয়তো গ্রাহ্য করিত না, একপাশে মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িত। কিন্তু এতগুলি পুরুষের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া মেয়েমানুষ কি ঘুমাইতে পারে ?

মতি আব সুধীর খানিক আগে ফিবিয়া আসিয়াছে, ঘরেব ভিতর হইতেই যশোদা সেটা টের পাইযাছিল। কিছু না বিছাইযাই দুজনে একপাশে শুইয়া পড়িযাছে, বোধ হয় যশোদাকে ছাতে আসিতে দেখিয়া। দুজনে নেশা করিয়া আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু রাত বারোটা বাজিতে না বাজিতে ফিরিয়া আসিয়াছে কেন ? কী কাণ্ড করিয়া আসিযাছে দুজনে কে জানে ?

আলিসায় বসিয়া একজন বিড়ি টানিতেছিল, বলিল, বড়ো গরম, না চাঁদের মা ?

যশোদা ঠাহর করিয়া দেখিল, তার অন্য বাড়ির ভাড়াটে জগৎ। একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুমি এ বাড়িতে ঢুকলে কখন ?

জগৎ বলিল, মতি আর সুধীর দরজা খোলার জন্যে ডাকছিল, শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। ভাবলাম কী, তোমার এ বাড়ির ছাতে যদি একটুক্ হাওয়া পাই, তা শালার হাওয়া কই। ই কী গুমটো গরম গো চাঁদের মা, অ্যাঁ ?

যশোদা কাছে আগাইয়া গেল, গবম তো বটে, কিন্তু তোমার কি চোখে ঘুম নেই, রাতদুপুরে বসে বসে বিড়ি টানছ ? সকাল সকাল যেতে হবে না কাজে ?

ঘুম না এলে করব কী বলো ? ঘরে গরমে সিদ্ধ করে দিল, ছাতে এলাম, তা এখানে যেমনই গরম তেমনই মশা।—বিড়িটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কাঁধের কাছে সশব্দে চড় মারিয়া জগৎ মশা মারে ; গরমটা যশোদা নিজেও অনুভব করিতেছে, মশার উৎপাতও যে কম নয় তারও তো একটা প্রমাণ দেওয়া চাই ! আলিসায় ভর দিয়া যশোদা কিন্তু ভাবে যে, কে জানে গরম আর মশাই তোমায় জাগিয়ে রেখেছে না কারুর কথা ভেবে তোমার চোখে ঘুম নেই !

দেশে মশা নেই তোমাদের ?

আছে না ? মানুষ টেনে নিয়ে যেতে পারে এমন মশা।

আমায় টেনে নিতে পারবে না, কী বল ? তেমন গতর আমার নয়। বলিয়া আলিসায় ঠেসান দিয়া যশোদা একটু হাসিল। মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ অকারণে নিজের দেহের বিপুলতার কথাটা যশোদার মনে পড়িয়া যায়। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় ঘুমন্ত মানুষগুলিকে আবছা দেখা যাইতেছিল। সকলেই ঘুমের মধ্যে অল্প-বিস্তর নড়িতেছিল, কেবল মতি আর সুধীর মটকা মারিয়া থাকায় দুজনে হইয়াছিল কাঠের মূর্তির মতো স্থির।

গতর বড়ো হলে গরমটা বেশি লাগে, না জগৎ ? সবাই ঘুমুচ্ছে দ্যাখো, আমার গরমে প্রাণটা বেরিয়ে গেল।

গতরের জন্যে নয়, গরমটা সত্যি যেন কেমন খারাপ হেথা, গায় সয় না। দেশের গরম এমন নয়।

যশোদা তা জানে। যারা অল্পকাল শহরে আসিয়াছে দেশ ছাড়িয়া, দেশের গরমটা পর্যন্ত তাদের ভালো লাগে। তা না হইলে ধনঞ্জয় অমনভাবে দেশে পলাইয়া যায় ?

আচ্ছা, একটা কথা তোমায় শুধোই জগৎ, ঠিক মতো জবাব দিয়ো, মন রাখা কথা বোলো না, অ্যাঁ, আমি খুব মোটা, না ?

মোটা ? উঁহুঁ, মোটা তো তুমি নও চাঁদের মা ? একটু বাড়ন্ত গড়ন তোমার, বাস্ ?

শুনিয়া খুশি হইয়া জগৎকে শুইয়া পড়িতে বলিয়া যশোদা নীচে নামিয়া গেল। ঘরের মধ্যে প্রাণপণে পাখা নাড়িতে নাড়িতে এক সময় ঘুমাইয়াও পড়িল।

সকালে কলতলার কাজ সারিয়া রান্নাঘরে জলের বালতি দুটি নামাইয়া রাখিয়া যশোদা আবার ছাতে গেল। প্রায় সাতটা বাজে, জ্যোতির্ময়ের দোতলা বাড়ির পাশ কাটাইয়া যশোদাব ছাতের অর্ধেকটাতে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। রোদের মধ্যেই এখনও পড়িয়া ঘুমাইতেছে তিনজন--- জগৎ, মতি আর সুধীর। জগৎ মন কেমন করায় রাত জাগিয়াছিল, অন্য দুজন করিয়াছিল নেশা। দরদ অথবা মদ, যে নেশার ফলেই হোক মানসিক কোমলতা আনিবার কী সুন্দর আরামজনক পরিণাম ! যশোদা প্রথমে মতি আর সুধীরকে ঝাঁকানি দিয়া তুলিয়া দিল, তাবপব ডাকিয়া তুলিল জগৎকে।

মতি আর সুধীর হাই তুলিয়া গা-হাত মোড়া দিয়া বিড়ি ধরাইয়া একটু আবাম করিতে যাইতেছিল, যশোদা বলিল, তোমরা দুজনে ভাত পাবে না এ বেলা। চানটি করে নিয়েই দৌড়ে কাজে চলে যাও। ছুটতে ছুটতে গেলে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবে।

দুজনেই বিড়ি কোমরে গুঁজিয়া উঠিয়া পড়িল। মতি একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, ভাত হয়নি যশোদা ? খিদেয় নাড়িতে পাক দিচ্ছে।

যশোদা ছাতে ছড়ানো মাদুর ও চাটাইগুলি একটি একটি করিয়া গুটাইয়া তুলিতেছিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া একগাল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যশোদা কে গো মতিবাবু মশায় জিজ্ঞেস করি তোমাকে ?

মতির চুল প্রায় সাদা হইয়া আসিয়াছে, কুলিমজুরও তাকে ঠিক বলা যায় না, কারণ সত্যপ্রিয় মিলে গাঁটের উপর আলকাতরা দিয়া সংকেত, অক্ষর ও সংখ্যা আঁকিয়া দেওয়া তার কাজ। সে নাম ধরিয়া ডাকিলে যশোর রাগ করা উচিত নয়, সব সময় রাগ সে করেও না। কিন্তু যশোদার মেজাজ বোঝা ভার। হাসি ও প্রশ্নে মতি কাবু হইয়া পড়ায় যশোদা নিজেই আবার বলিল, আমাকে ডাকছ নাকি যশোদা বলে ? কাল একপেট গিলে সাহস বেড়ে গিয়েছে নয় ? সবাই চাঁদের মা বলে, তুমি না হয় তাই বললে। একবার বলো তো কেমন শোনায় দেখি ?

মতি ভয়ে ভয়ে বলিল, ভাত হয়নি চাঁদের মা ?

যশোদা বলিল, ভাত হবে না কেন, তোমরা এ বেলা পাবে না ভাত। চান করে মাথা ঠান্ডা করে নিয়ে ছুটে যাও দিকি কাজে, কাজে না গেলে একটি বেলাও ভাত জুটবে না মতি।

কাজ গেলে যে যশোদাই তাকে দুবেলা ভাত জোগাইবে যতদিন আবার কাজ না হয়, মতিও তা জানে যশোদাও জানে। তবে সেটা তর্কের বিষয় নয়, মতি ও সুধীর কথা না বলিয়া নীচে চলিয়া গেল। এখানে বাস করিলে মদ খাওয়া চলিবে না। এ ধরনের একটা নিয়ম যশোদা করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু নিয়মটা ভাঙিলেই সে যে সব সময় শাস্তির ব্যবস্থা করে তা নয়। এদের জীবনের সঙ্গে যশোদার পরিচয় আছে, জীবনের যে স্তরে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এরা বাস করে তাও তার অজানা নয়। কঠোর নিয়ম করিলে চলিবে কেন ? কে সে নিয়ম মানিয়া চলিবে ? কী দরকার সে নিয়ম মানিয়া চলিবার জীবন যাদের সব দিক দিয়া ফাঁকিতে ভরা ? কেবল একটা বিষয়ে সাধু হইলেই কি দিনগুলি ওদেব সুখে আর আরামে ভরিয়া উঠিবে ! অতিবিক্ত অবিশ্রাম খাটুনি, পেটভরা খাদ্য আব বিরাম ও আরামের অভাব, সমস্তই যাদের বিষের সমান, দু-এক চুমুক বাড়তি বিষ পান করিলে, তাদের কী আসিয়া যায় ! কেবল বাড়াবাড়িটা রদ করিবাব জন্য যশোদা মাঝে মাঝে রাগ দেখায়, শাস্তি দেয়, তবে শাস্তিটা হয় একটু খাপছাড়া ধরনের, যেন দুরন্ত ছেলেকে শাসন করিতেছে এমনি।

নীচে নামিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া যশোদা ডাক দিল, নন্দ, একটু পবিবেশন করবি আয় দিকি দাদা।

নন্দ আসিলে ভাত বাড়িতে বাড়িতে যশোদা বলিল, কাল তো বলছিলি চাকবি নইলে চলবে না. আজ যা না একবার জ্যোতিবাবুর আপিসে ?

কী হবে গিয়ে ? কাজ দেবার মতলব ওদের নেই।

যশোদা রাগ করিয়া বলিল, কাজ দেবার মতলব কার থাকে বে ছোঁড়া ? কাজ আদায় করে নিতে হয়। যা চেহারাটি করেছ নিজের, ভরসা করে কে তোমাকে কাজে লাগাতে চাইবে ? জ্যোতিবাবুকে বলছি গিয়ে আর একবার, দুপুর বেলা একবার যাস। পয়সা চেয়ে নিয়ে যাস ট্রামের।

নন্দ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচটি থালায় যশোদার ভাত বাড়া দেখিতে লাগিল। দরজা দিয়া দেখা যায় খাইতে বসিয়াছে তিনজন, পাঁচ থালা ভাত বাড়িবার দরকার ? চাকরির সমস্যার চেয়ে এই সমস্যাটাই যেন নন্দকে পীড়ন করিতে লাগিল বেশি। শেষে থাকিতে না পারিয়া যশোদার ভুল সংশোধনের জন্য বলিল, পাঁচ থালা বাড়ছ যে ? তিনজন বসেছে মোটে—কেষ্ট যতীন আর বলাই।

য থালা বাড়ি তোর তাতে কী ? তিনজন বসেছে তো আর কেউ বসতে জানে না ? থালায় ভাজা, আলুসিদ্ধ আর চচ্চড়ি সাজাইয়া দিয়া যশোদা বাহির হইয়া গেল। রান্নাঘরেই যে কথা নন্দকে অনায়াসে বলা চলিত, উঠানে দাঁড়াইয়া সেই কথাগুলি পাড়াসুদ্ধ লোককে শুনাইবার মতো জোর গলায় বলিল, যার যা লাগে দিস রে নন্দ, আমি বাজারে গেলাম।—মতি আবার একটু কানে কম শোনে, ঘণ্টাখানেকের মতো যশোদা বাড়ি ছাডিয়া গিয়াছে না জানিলে তাডাতাড়ি দুটি ভাত খাইয়া কাজে যাইবাব সাহস বুড়োর হইবে না।

বাজারে যশোদা যায় বটে, এ সময় কোনোদিন যায় না। এত সকালে বাজারও ভালো রকম বসে নাই, বাড়িতেও দুয়ে-চারে উনিশটি মানুষকে ভাত দিবার হাঙ্গামা। নন্দ একা কেন সামলাইতে পারিবে ? তবু যশোদা বাড়ির বাহির হইয়া গেল। পেট ভরিয়া দুটি ভাত-তরকারি খাইতে পাওয়া যাদের জীবনের চরম বিলাসিতা, পেট ভরাইয়া কাজে গেলেও দিনটা অর্ধেক কাবার হইতে না হইতে যাদের পেটে আবার ক্ষুধার আগুন জ্বলিতে থাকিবে, নিজে ভাত বাড়িয়া তাদের খাওয়ানোর দায়িত্বটা যশোদা হঠাৎ যেন ভুলিয়া গিয়াছে !

যশোদার এ বাড়ির সদর দরজাটি সরু ও স্যাঁতসেঁতে গলিতে, দুপাশে টিন আর খোলার বাড়ি। আরও একটি বাড়ি আছে যশোদার, কতগুলি টিনের ঘরের সমষ্টি। গলিটি হাত তিনেক চওড়া, যশোদার বাড়ি দুটির মধ্যে ব্যবধানও হাত তিনেক, দুটি বাড়ির সদর দরজাও প্রায় মুখোমুখি।

ও বাড়িটাকে যশোদা চিড়িয়াখানা বলে, এই চিড়িয়াখানায় জীবগুলির বাস করিবার ব্যবস্থা প্রধানত স্ত্রী-পুরুষে জোড়ায় জোড়ায়। মাঝে মাঝে জোড় ভাঙিয়া যায়, যশোদার চেষ্টাতেও আর জোড়া লাগে না, মাঝে মাঝে নূতন জোড়া বাস করিতে আসে পুরানো জোড়া বিদায় নেয়। জোড় ভাঙিয়া হোক, এক সঙ্গে হোক, বিদায় যারা নেয় হয়তো পাড়াতেই কোনো বাড়িতে তাদের দেখা যায়, হয়তো কোনোদিন আর তাদের পাত্তাও মেলে না। শহরের চারিদিকেই শহরতলি, একদিকের শহরতলি হইতে আর একদিকের শহরতলিতে গেলেও দূরদেশে যাওয়ার মতোই মানুষ হারাইয়া যায়।

বাড়িটাতে ছেলেমেয়ে আছে এক গাদা—বাহির হইতেই নানা বয়সের ছেলেমেয়ের হইচই হুল্লোড় ও কান্না শুনিতে পাওয়া যায়। একখানা ঘর আর রান্নার জন্য আনাচেকানাচে একটু জায়গা, এই তো রাজ্য এক একটি ভাড়াটের, এত রাশি রাশি ছোটোবড়ো ছেলেমেয়ে কোথায় গুদামজাত করা থাকে ভাবিলে সত্যই বিস্ময় বোধ হয়।

আগে, দুটি বাড়িই যশোদা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে ভাড়া দিত, ভাড়াটেরা কী করে না করে সে বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া মাসে মাসে ভাড়াটা পাইলেই খুশি থাকিত। অভিজ্ঞতা জন্মিতে জন্মিতে ক্রমে ক্রমে যশোদার জ্ঞান হইয়াছে যে, সংসারে যত গন্ডগোলের গোড়া মেয়েমানুষ। জ্ঞান জন্মিবার পর এদিকের বাড়িটাকে ঘরোয়া মেস বা হোটেল বা ওই ধরনের একটা কিছুতে পরিণত করিয়া স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিয়াছে।

বলিয়াছে, না বাবু, সুখের চেয়ে আমার স্বস্তি ভালো।

কোনটা যে তার সুখ ছিল আর কোন স্বস্তিটা যে তার ভালো হইয়াছে, দু-বাড়ির আবহাওয়ার পার্থক্যই সেটা পরিষ্কার ঘোষণা করিয়া দেয়।

এ বাড়িতে দুখানা পাকা ঘর সে নিজের দখলে রাখিয়াছে। একটি ঘরে থাকে তার আসবাবপত্র, অন্য ঘরটিতে থাকে সে আর তার ভাই নন্দ। ঘর দুখানা একটু পিছনের দিকে, মাঝখানে সিঁড়ির নীচে একটা দরজা আছে সেটা বন্ধ রাখিলে বাড়ির সঙ্গে ঘর দুখানার আব যোগ থাকে না। আগে যশোদা দরজাটা নিয়মমতো বন্ধ করিত, আজকাল গ্রাহ্যও করে না। এর দুটি প্রধান কারণ আছে। প্রথমত তার গায়ে এত জোর যে এ বাড়িতে এমন একটিও পুরুষ নাই যে, তার হাতের একটা চড় খাইযা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, দ্বিতীয়ত নিজে সে যে স্ত্রীলোক এটা তার সব সময় খেয়ালও থাকে না।

শেষোক্ত কারণটা যশোদার শত্রুও স্বীকার করে। যশোদার সবচেয়ে বড়ো শত্রু তার ছেলেবেলার সখী কুমুদিনী, পাড়াতেই স্বামীপুত্র সংসার লইয়া সে বাস করে। যশোদাব কথা উঠিলেই তাকে বলিতে শোনা যায় : ওটা কি মেয়েমানুষ ? ও মেয়েমানুষের বাবা ! আরও অনেক কথা সে বলে, বলিতে বলিতে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। তারই সংজ্ঞা অনুসারে যশোদা যে মেয়েমানুষ নয় মেয়েমানুষেব বাবা, এ কথাটা ভুলিয়া গিয়া নাক সিঁটকাইয়া তীব্র আবেগের সঙ্গে সে আবার বলে, পুরুষের গাদি বাড়িতে, তার সবকটা হয় মাতাল নয় গুন্ডা, মেয়েমানুষ হয়ে কী করে যে ওদের মধ্যে থাকে, মাগো !

একটু খাপছাড়া জীবনযাপন করে বইকী যশোদা, একটু অনন্যসাধারণ হয় বইকী তার রীতিনীতি চালচলন, কিন্তু খুব বেশি বেমানান যেন তার পক্ষে হয় না। এ রকম অবস্থায় অন্য কোনো স্ত্রীলোক হয় পুরুষের আশ্রয় খুঁজিত, নয় মানুষের মতবাদ ও নির্দেশের চাপে ধ্বংস হইয়া যাইত, যশোদা কিছুই করে নাই। জীবনযাপন করে সে স্বাধীন, কারও কাছে তার কোনো প্রত্যাশা নাই, নিন্দা-প্রশংসা সে গ্রাহ্য করে না, কারও দরদের জন্য কাঁদিয়াও মরে না। বিপদে-আপদে তারই কাছে মানুষ উপকার পায়, পুরুষের কাছে যে কাজ পাওয়া কঠিন যশোদার কাছে তাই পাওয়া যায়। লম্বা-চওড়া শক্ত-সমর্থ শরীরটাতে তার নারীসুলভ লাবণ্য ও কোমলতার চিরদিন এমন অভাব যে, বয়স যখন আরও কম ছিল তখনও কোনো পুরুষের সঙ্গে তার বৈধ বা অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক থাকিতে পারে এ কথাটা মনে আনিতেও লোকের কেমন সংকোচ বোধ হইত, মনে হইত, না, তা হয় না।

শহরতলি পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

একটা গুজব শোনা যায়। দশ-বারোবছরের আগেকার কথা, যশোদা যখন সবে ভদ্র-অভদ্র নির্বিশেষে ঘরভাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সত্যপ্রিয়র বাগানবাড়িটা তখন নাকি কেবল ঝোপঝাড়ে ভরা বাগান ছিল, চারিদিকেব প্রাচীর ছিল ভাঙা। বাগানের মধ্যে গাছপালার আড়ালে একটা আখড়া ছিল কুস্তির এবং সেই আখড়ার ওস্তাদ ছিল কেদার নামে একটি মাঝবয়সি লোক। মাথা গিয়া ঠেকিত ঘরের ছাতে, দরজা দিয়া যাতায়াত করিতে হইত পাশ ফিরিয়া, রাস্তায় ষাঁড়কে সরাইয়া সে পথ চলিত। মানুষ যে অমন জোয়ান হয় তাকে যারা চোখে না দেখিয়াছে তাদের কি তা বিশ্বাস হয় ? রূপকথার রাজপুত্রের মতো কোথা হইতে আসিয়া দু-একটা বছর ও পাড়ায় বাস কবিয়া, পাড়ার ছেলেদের কুস্তি শিখাইয়া, পদক্ষেপে দুপাশের বাড়ি কাঁপাইয়া পথ দিয়া হাঁটিয়া কে জানে আবার সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে ! সে চলিয়া যাওয়ার পর বিশ্বসংসারে যশোদা নাকি আর পুরুষ দেখিতে পায় না, সকলে তার কাছে শিশু। আজও যশোদা তার সেই ভালোবাসার লোকটিব পথ চাহিয়া আছে।

যশোদা শুনিয়া হাসে—তা নয় ? চেয়ে চেয়ে চোখ ভেবে গেল সত্যি। ইবারে যদি না চশমা লি—

অনেকেই মনে মনে বলে, মরণ তোমার বেহায়া ! কিন্তু দু-চাবজন ভাবপ্রবণ যাবা আছে তারা মনে মনে বলে, আহা ! ব্যাকুল আগ্রহে তারা যশোদাব মুখে একটু বেদনার ছাপ খোঁজে, চোখের দৃষ্টিতে একটু ব্যথার আভাস দেখিতে চায়। কিন্তু হায় রে যশোদার হাতিব দেহে হাতিব প্রাণ, এক মুহূর্তের জন্য যদি তার চোখেমুখে স্বপ্নময় ব্যথিত বেদনার ছাপ দেখা গেল !

বাড়ি দুটিতে যশোদা যদি কেবল গরিব ভদ্রগৃহস্থদের ভাড়াটে বাখিত তবে কোনো কথা ছিল না। প্রথমে কিছুকাল ওই রকম ভাড়াটে যশোদা খুঁজিত, মাল সরকার, ট্রামের কন্ডাক্টার, প্রেসের কম্পোজিটাব এই শ্রেণির ভাড়াটের নীচে সে নামিত না। তারপব সমস্ত বাছবিচার তুলিয়া দিয়াছে। ভদ্রলোকেরা নাকি বড়ো বেশি ছোটোলোক, যারা পুবো ভদ্রলোকও নয় খাঁটি ছোটোলোকও নয়, তারা নাকি একটু অদ্ভুত অপদার্থ জীব। তাব চেয়ে কুলিমজুর ভালো। বাবুদেব চক্ষুলজ্জাও আছে, কুলিমজুরের ভয়ডব আছে, কিন্তু না-বাবু না-কুলিমজুরদেব চক্ষুলজ্জাও নাই, ভয়ডবও নাই। সাহসের অভাব হইলে যে ভযডর হয় সে ভযডরের কথা যশোদা বলিতেছে না, ও বকম ভযডর এ শ্রেণির লোকগুলিব পুরামাত্রাতেই আছে, সে হিসাবে ওবা সব কেঁচোব মতো অপদার্থ জীব, ওদের ভয়ডর নাই ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে, তিল তিল কবিয়া আত্মহত্যা কবা সম্বন্ধে আর ওদেব উপর যাদেব বাঁচিয়া থাকা নির্ভব করে তিল তিল করিয়া তাহাদেবও হত্যা করা সম্বন্ধে। কেমন যেন চালচলন ওদের, কেমন যেন ভালোমন্দ পাপপুণ্যের হিসাব, কোকেনখোবদেব মতো। মা বোন যখন খাইতে পায না, বউ যখন জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে বান্না কবে, পথ্য না দিয়া ছেলেকে কেবল ওষুধ খাওয়াইতে হাসপাতালের ডাক্তাব যখন বাবণ করিয়া দেন, তখনও সকলের কথা ভুলিয়া গিয়া বাহিরে পুবুষমানুষের স্ফূর্তি কবিবার ব্যাপারটা যশোদা বুঝিতে পারে। কিন্তু তখন দুশ্চিন্তায় মুখ পাংশু করিয়া কপাল চাপড়াইতে চাপড়াইতে অদৃষ্টকে গাল দিয়া চকচকে জুতাটি পরিয়া চুলে সিঁথি কাটিতে দেখিলে যশোদার রক্তে আগুন ধবিয়া যায়। সাজিতে পার, হাসিতে পার না লক্ষ্মীছাড়া ? গুনগুন করিয়া গান ধরিতে পার না আপনজনের রোগ দুঃখ দুর্দশাকে উপেক্ষা করিয়া ? তবে তো যশোদার কিছুই বলিবার থাকে না। সর্বাঙ্গে বাবুত্বের ং ্যাসকে আমল দিয়া দোকানঘরের সাইনবোর্ডের মতো কেবল মুখে দুর্ভাবনার বিজ্ঞাপন লটকাইয়া আবার কোন দেশি দরদ দেখানো ?

বাজারে যশোদা গেল না, এ বাড়ির সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া ও বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িল। ঢুকিয়াই মনে হইল যেন নূতন জগতে আসিয়া পড়িয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে বাস করিলে আর

সৃষ্টিরক্ষায় মন দিলেই কি তাদের জগৎ এমনভাবে বদলাইয়া যায় ? এই সকালবেলাই ছেলেমেয়ের কলরবে আর স্ত্রী-পুরুষের কলহে বাড়িটা সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। কলতলাতে মেয়েদের মধ্যেই ঝগড়া বেশি। পিছনের ছোটো পুকুরটি বুজাইয়া দিবার পর আজকাল উঠানে কলের জলের জন্য রীতিমতো মারামারি হয়। চার-পাঁচজন ছাই দিয়া প্রাণপণে বাসন মাজিতেছে, একজন কলসিতে জল ভরিতেছে, দুজন দাঁড়াইয়া আছে স্থান খালি হইবার প্রতীক্ষায়। আর একটা কল এ বাড়িতে করিয়া না দিলে চলিবে না। দরখাস্ত যশোদা অনেকদিন আগেই করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু কী যে হইয়াছে তার দরখাস্তের, আর কোনো পাত্তাই মিলিতেছে না। তাগিদ দিতে গেলে প্রকাণ্ড আপিসের এ বলে ওর কাছে যাও, ও বলে তার কাছে যাও, ভালো করিয়া কথার জবাবটাও দিতে চায় না কেউ। একটা জলের কল বসাইবার অনুমতি চাহিয়া এত হাঙ্গামা সহিতে হয়, কে জানে শহরের জলের দেবতারা এমন উদাসীন কেন।

এ বাড়িতে ঢুকিলেই একটা ভাপসা ধোঁয়াটে দুর্গন্ধ যশোদার নাকে লাগে। একা মানুষ যশোদা কিন্তু একাই সে তার ও বাড়িটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে, এ বাড়িতে মেয়েমানুষ দুগন্ডার কম নয়, কিন্তু নোংরামি কিছুতেই ঘুচিতেই চায় না। উঠানের একপাশে একগাদা আবর্জনা জমিয়া আছে, রাস্তার একটা লোমওঠা কুকুর কোন ফাঁকে ভিতরে ঢুকিয়া আবর্জনা ঘাঁটিয়া খাবার খুঁজিতেছে, কারও সেদিকে নজর নাই।

ওদিকের ভিজা রোয়াকে চিত হইয়া পড়িয়া পরেশের সাত মাসের ছেলেটা হাত-পা ছুঁড়িয়া চেঁচাইতেছে, তার দিকেও নজর দিবার কারও অবসর নাই। কাছেই তার মা পরেশের বাঁ পায়ের হাঁটুর নীচে মস্ত একটা ঘায়ে মলম লাগাইয়া ময়লা ন্যাকড়া জড়াইয়া দিতেছে। মাসখানেক শয্যাগত থাকিয়া পরেশ এখন খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিতে পারে। মোটরের ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া গিয়া নাকি ঘা হইয়াছে। কথাটা যশোদা বিশ্বাস করে নাই। বছর দুই আগে ঠিক এই রকম অকস্মাৎ একবারে পরেশের একটা হাতও ভাঙিয়াছিল, শহরের অপরদিকের শহরতলিতে প্রাচীর ডিঙাইয়া একটা বাড়িতে চুরির উদ্দেশ্যে ঢুকিবার জন্য কয়েক মাস জেলও হইয়াছিল। তারপর এতদিন যশোদার এখানে থাকিয়া নিয়মমতো কাজে গিয়া ভালোভাবেই সে দিন কাটাইতেছিল ; হঠাৎ আবার চুরি করার ঝোঁক চাপায় বোধ হয় এই দুর্দশা হইয়াছে। লোকটার সম্বন্ধে কী যে করিবে যশোদা ভাবিয়া পায় না। চোরকে বাড়িতে থাকিতে দেওয়া কি উচিত, আরও কতগুলি পরিবার যে বাড়িতে থাকে ? চুরি করিতে গিয়াই হাঁটুর নীচে ঘা হইয়াছে এটা নিশ্চিতভাবে না জানিয়া ছেলে-বউসুদ্ধ একটা লোককে তাড়াইয়া দেওয়াও কি উচিত ? বিশেষত এক মাস ঘরে বসিয়া থাকার জন্য লোকটার যখন চাকরি নাই ?

তোমার পা কেমন আছে পরেশ ?

সংকোচ ও অপরাধ ভরা হাসি হাসিয়া পরেশ বলিল, একটু ভালো চাঁদের মা। আর সাতটা দিন, তারপর—

নিজে তো ন্যাকড়াটা জড়িয়ে নিতে পার পায়ে ? হাত দুটো তো যায়নি তোমার ? ছেলেটা চেঁচিয়ে মরল, কোলে নাও না খোকার মা ? কী যে তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান বাছা বুঝিনে কিছু।

পরেশ তবু হাসে, আরও বেশি সংকোচ, আরও বেশি অপরাধভরা হাসি। মানুষের কাছে এই একটিমাত্র মুখভঙ্গি পরেশ করিতে জানে, তার বড়ো বড়ো টানা চোখ দুটির খাপছাড়া সৌন্দর্যের মতো এ মুখভঙ্গি অর্থহীন।

ওদিকের কোণের ঘরে নদেরচাঁদের বউ অনেকদিন জ্বরে ভুগিতেছে। তার খবরটা জানিবার জন্য যশোদা পা সবে বাড়াইয়াছে, কলতলায় এক কাণ্ড হইয়া গেল। জগতের বোন কালো একটু স্থান করিয়া বাসন মাজিতেছিল, কোথা হইতে নদেরচাঁদের মেয়ে চাঁপা আসিয়া তাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া নিজে সেখানে বসিয়া পড়িল।

আমি আগে বাসন রেখে গেছি।

কালো মুখ কালো করিয়া বলিল, ধাক্কা দিলে কেন ? মুখে বলতে পারতে না ?

কালোর স্বাস্থ্য ভালো, চাঁপার মতো সে রোগা নয়। কিন্তু শহরতলিতে সে আসিয়াছে অল্পদিন আগে দেশের গাঁ হইতে, এখনও শহরতলির শহুরে মেয়েদের সঙ্গে কলতলার যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। মুখভার করিয়া সে একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। বাসন মাজিতে আরম্ভ করিয়া চাঁপা মুখ ফিরাইয়া বলিল, রাগিস কেন ? কত্খন লাগবে এ কটা বাসন মাজতে ?

ধাক্কাটা যে চাঁপা শুধু আগে বাসন মাজিবার সুযোগ পাওয়ার জন্য দেয় নাই, যশোদা তা জানে। একবার ভাবিল চাঁপাকে ধমক দেয়, তারপর ভাবিল, কী হইবে ধমক দিয়া ? শক্ত সমর্থ যে মেয়ে মুখ বুজিয়া এমন ধাক্কাটা সহ্য করে, তার হইয়া কিছু করিতেও যশোদার ভালো লাগে না। কালোর উপর চাঁপার বড়ো দ্বেষ, কোনো দোষ নাই কালোর, তবু চাঁপা তাকে দেখিতে পারে না। প্রকারান্তরে দোষ আছে কালোর, চাঁপার সুখের পথে সে কাঁটা হইয়া আছে। চাঁপার মা ক্রমাগত জ্বরে ভোগে, চাঁপার বাবা নদেরচাঁদ নেশার ফাঁদে পড়িয়া অকালে বুড়ো হইয়া পড়িয়াছে, বড়ো কষ্টে দিন কাটে চাঁপার। এতদিনে একটু সুখের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে চাঁপার। জগৎকে সে কী করিয়া বাগ মানাইয়াছে সেই জানে, বোধ হয় সেও অল্পদিন শহরে আসিয়াছে বলিয়া শহুরে মেয়েটাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। মাস ছয়েক আগে জগতের বউ মরিয়া গিয়াছিল, তার তিনমাস পরে সকলে জানিয়াছে, চাঁপার সঙ্গে জগতের বিবাহ হইবে।

[illegible] কালে বিবাহটা হইয়া যাইত, ও ঘর হইতে জগতের এ ঘরে আসিয়া জগতের রোজগারে ভাগ বসাইয়া আরামে চাঁপা দিন কাটাইতে পারিত, পোড়ারমুখি কালোর জন্য সব আটকাইয়া আছে। কালোর বিবাহ না দিয়া জগৎ নিজে আবাব বিবাহ করিতে পারিতেছে না। একদিকে বাধা দিতেছে তার আধ-পাগলা মা, অন্যদিকে আটকাইতেছে টাকায়।

তোর মা কেমন আছে লো চাঁপা ? যশোদা জিজ্ঞাসা করিল।

জ্বর নেই গো যশোদাদিদি।

চাঁপার মার ঘরে উঁকি দিয়া যশোদা জগতের ঘরে গেল। ঘরের কোনায় ময়লা ছেঁড়া কাপড়ে নতুন বউটির মতো মস্ত ঘোমটা টানিয়া জগতেব মা বসিয়াছিল আর আপনমনে বিড়বিড় করিয়া বকিতেছিল। বউ সাজিবাব পাগলামিটাই জগতের মাব বেশি প্রবল।

দবজার কাছে বসিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে খোলা দবজা দিয়া জগৎ চাহিয়াছিল কলতলার দিকে। যশোদাকে দেখিয়া দৃষ্টিও সরাইয়া নিল, একটু ভিতরের দিকে সরিয়াও বসিল। চাঁপাকেই দেখিতেছিল বোধ হয় এতক্ষণ। সকালবেলা কোথা হইতে একটা কলকে ফুল জোগাড় করিয়া খোঁপায় গোঁজায় জগতের চোখে চাঁপার রূপটা বোধ হয় আজ বাড়িয়া গিয়াছে।

জগৎ বলিল, কালোকে কেমন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল, দেখলে চাঁদের মা ?

যশোদা বলিল, তুমি তো দেখেছ ? তাতেই হবে।

কালোর সঙ্গে মোটে বনিবনা নেই চাঁপার।

কার সঙ্গে বা আছে ? যা স্বভাব মেয়ের।

চাঁপার নিন্দায় ক্ষুণ্ণ হইয়া জগৎ মুখভার করিয়া থাকে আর তার মুখের দিকে চাহিয়া যশোদা মনে মনে বলে, ধিক তোমাকে। বোনটাকে অমন করে ঠেলে সরিয়ে দিলে, একটু কালের জন্যে না হয় একটু তুমি বিরাগ হতে চাঁপার ওপর ?

ফিরিয়া যাওয়ার সময় যশোদার চোখে পড়ে, তখনও কালো মুখভার করিয়া কলতলার একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। এ রকম নীরব দুর্বল অভিমানও যশোদা দু-চোখে দেখিতে পারে না। কার উপর তুই মুখভার করিয়া আছিস ছুঁড়ি, কে তোর মুখভারের মর্যাদা রাখিবে ?

নিজের বাড়িতে যশোদা ঢুকিল না, মতি আর সুধীরকে ভাত খাওয়ার জন্য আরও একটু সময় দেওয়া দরকার। গলি ধরিয়া যশোদা আগাইয়া গেল। একটু গেলেই এ পাড়ার রাজপথ, দুটি গাড়ি পাশাপাশি চলিতে পারে এতখানি চওড়া, পিচঢালা এবং বিদ্যুৎবাহী তারের থাম বসানো। গলির ভিতর হইতে এ রাস্তায় পা দিলেই যশোদার মনে হয়, ভিজা কাপড়ের মতো সর্বাঙ্গে ল্যাপটানো একটা অশুচি আবরণ খোলা আলো-বাতাসের স্পর্শে খসিয়া গেল। তবে আরাম যশোদার হয় না, খুশিও সে হইতে পারে না। এই রাস্তাটি তৈরি হইয়াছে বলিয়াই তো তাহার বাড়ি দুটি এমনভাবে আড়াল পড়িয়াছে, সংকীর্ণ গলির স্থানটুকু বাদ রাখিয়া দুপাশে এমন ঘিঞ্জিভাবে টিন আর খোলার বাড়ি উঠিয়াছে। বছর দশেক আগে এখানে পথও ছিল না, গলিও ছিল না, দূরে যে রাস্তা দিয়া আজ ট্রাম আসিয়া ঘুরিয়া যায়, সেই রাস্তা পার হইয়া আসিলেই মানুষ ছড়ানো বাড়িগুলির আনাচকানাচ দিয়া, কলাবাগান ভেদ করিয়া পুকুরের পাড় ঘুরিয়া যেদিকে খুশি চলিতে পারিত। দশ বছরে শহরতলির শহুরে ভাবটা কী হুহু করিয়া না বাড়িয়া গিয়াছে।

জ্যোতির্ময়কে নন্দের চাকরির কথাটা মনে করাইয়া দিয়া যশোদা বাড়ি ফিরিবে ভাবিয়াছিল। জ্যোতির্ময়ের বাড়ির পাশ দিয়া যশোদার বাড়ির ছাতে রোদ আসিয়া পড়ে বটে, যাইতে হয় একটু ঘুরিয়া। যাওয়ার সময় চোখে পড়ে সত্যপ্রিয়র বিরাট বাড়ির বিরাটতর বাগানের পিছন দিকের খানিকটা প্রাচীর। এতবড়ো বাগানের ফুলফল আর কৃত্রিম নির্জনতার শোভা একটি পরিবারের কী কাজে লাগে কে জানে।

জ্যোতির্ময় রান্নাঘরের বারান্দায় খাইতে বসিয়াছিল। খানিক দূরে বসিয়া ভাইয়ের খাওয়া দেখিতেছে জ্যোতির্ময়ের দিদি, ঘরের মধ্যে গলা সাধিতেছে সুবর্ণ। পরিবেশন করিতেছে বামুন। বিবাহ উপলক্ষে যে সব আত্মীয়স্বজন আসিয়াছিলেন তাঁরা চলিয়া গিয়াছেন।

এসো চাঁদের মা।

জ্যোতির্ময়ের আহ্বানটি মিষ্টি। গোলগাল তামাটে রঙের মানুষ সে, মুখের চামড়া মসৃণ ও কোমল। দেখিলেই মনে হয় লোকটি বুঝি তাদেরই একজন, যারা শান্ত ও সহিষ্ণু, ভীরু ও সাবধানি, ভোঁতা ও হিসাবি। কিছুক্ষণ আলাপ করিলেই কিন্তু এ ধারণায় গোল বাধিয়া যায়। মনে হয়, মানুষটা সে চালাকচতুরও বটে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, তেজ, অহংকার আর একগুঁয়েমি যেন আছে। মনটা কোমল কিন্তু মায়ামমতা যেন বড়ো কম। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সাময়িক প্রেরণার মতো জ্যোতির্ময়ের কথাবার্তা চালচলনের মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া আসিয়া উঁকি দিয়া আবার কোথায় হারাইযা যায়, ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না, কেমন একটা অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব জাগে। অবিশ্বাস ও সন্দেহকে প্রশ্রয় দিতেও কিন্তু ইচ্ছা হয় না। ভয় আর দুর্বলতা, সাহস আর তেজ, বিষাদ আর হাসিখুশি ভাব, ভোঁতামি আর ধারালো বুদ্ধি, এলোমেলোভাবে এ সমস্তের ভাসা ভাসা আবির্ভাব অস্থিরচিত্ততার মতোই লাগে বটে, কিন্তু এমন একটা সংযম আর আন্তরিকতার প্রচ্ছন্ন আবরণ সব সময় তাকে ঘিরিয়া থাকে যে, অতিরিক্ত উদারতার সঙ্গে তাকে বিচার করিতে বড়ো ভালো লাগে মানুষের।

তোমার ভায়ের চাকরি চাঁদের মা ? চেষ্টা তো করছি, দেখি কী হয়।

নন্দকে আজ একবার পাঠিয়ে দেব আপনার আপিসে ?

পাঠিয়ে দেবে ? তা দিয়ো। বলিয়া জ্যোতির্ময় একগ্রাস ভাত গেলে, গিলিয়াই চিন্তিতভাবে বলে, আজকেই পাঠাবে ? কদিন পরে পাঠাতে পার না ?

ভাইয়ের জন্য চাকরি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে যশোদা, জ্যোতির্ময় যেন একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা করে যশোদার কাছে, দয়া করিয়া যশোদা কি আজ তার ভাইকে আপিসে না পাঠাইয়া পারে না ?

যশোদা বলে, তা আপনি যদি বলেন—

জ্যোতির্ময় সঙ্গে সঙ্গে খুশি হইয়া বলে, হ্যাঁ, সেই ভালো, আমি এদিকে কর্তাকে বলে কয়ে রাখি একটু, তারপর একদিন তোমার ভাইকে নিয়ে যাব, কেমন ?

বলে কয়ে রাখবেন তো ঠিক ? না ভুলে যাবেন ?

ভুলব কেন ? আমি সহজে কোনো কথা ভুলি না চাঁদের মা। তুমি যে আগে একদিন বলেছিলে, আমি কি ভুলে গেছি ? ভুলিনি। তোমাব আসবার কোনো দরকার ছিল না, তোমার ভায়ের চাকরির জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছি, মনে না করিয়ে দিলেও চেষ্টা করতাম।

কথা শুনিয়া মনে হয়, নন্দর একটা চাকরি করিয়া দিবার চেষ্টায় জ্যোতির্ময়ের দিনে বিশ্রাম নাই, রাত্রে ঘুম নাই। সেই যে কবে একদিন যশোদা তাকে এ বিষয়ে অনুরোধ জানাইয়াছিল, তারপর হইতে জ্যোতির্ময় বাঁচিয়াই আছে এই একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়া—নন্দর একটি চাকরি।

বিরক্তির সঙ্গে যশোদার কৌতুক বোধ হয়, কৌতুক বোধের সঙ্গে একটু দরদও জাগে। নিজের কোনো একটা সমস্যা নিয়া বেচারি হয়তো দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে, এখনও হয়তো সেই কথাই ভাবিতেছে, এই সব জমা করা চিন্তা আর উদ্‌বেগ যশোদার মন রাখার ব্যাকুলতায় কেন্দ্রচ্যুত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য নন্দর চাকরির দুর্ভাবনায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে, অতিমাত্রায় ভঙ্গি নিয়া মানুষ যখন মন্দিরে ঠাকুরকে প্রণাম করিতে যায়, পথের ধারে ফেলিয়া রাখা পথ বাঁধানোর বাড়তি পাথরটাকে ব্যাকুল আগ্রহে প্রণাম করা তার পক্ষে সম্ভব বইকী।

যশোদাকে পিঁড়ি পাতিয়া জাঁকিয়া বসিয়া জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে আলাপ জুড়িতে দেখিয়া তার দিদি গম্ভীরমুখে কোথায় উঠিয়া চলিয়া গিয়াছিল, এতক্ষণে একটা কলাইকরা প্লেটে আম কাটিয়া আনিয়া সামনে রাখিল। নাম তার সুধীরা। গাম্ভীর্য ও ধীরতায় তার সত্যই তুলনা নাই।

যশোদাকে সে পছন্দ করে না, আমলও দেয় না—আমল পাওয়ার জন্য যশোদার কিছুমাত্র চেষ্টা না থাকায় যশোদাকে সে আরও বেশি অপছন্দ করে। এককালে একজন আধা-হাকিমের গৃহিণী ছিল এখন বিধবা হইয়াছে। বিধবাও হইয়াছে প্রায় পাঁচ-সাতবছর, কিন্তু গিন্নি গিন্নি ভাবটা এত বেশি বজায় আছে বলিবার নয়। বাড়াবাড়িটা বোধ হয় এই জন্য যে আসল যা ছিল তার ভিতরটা হইয়া গিয়াছে ফাঁপা, বজায় আছে শুধু ভাবটুকু ফাঁকি ফাঁকিতে সেটা উঠিয়াছে ফাঁপিয়া।

যশোদা বলে, নতুন বউকে দেখছি না, আসেনি বউ বাপের বাড়ি থেকে ?

পাখা নাড়িয়া আমের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে মুখ না ফিরাইয়াই সুধীরা সংক্ষেপে বলে, এসেছে।

ওমা, কবে এল ? জানি না তো !

পরশু এসেছে।

যশোদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে, ওপরে আছে বুঝি ? যাই, চেনা করে আসি।

সুধীরা অসন্তুষ্ট হইয়া বলে, নতুন বউয়ের সঙ্গে আবার চেনা করবে কী বাছা ?

এ সব বিকারগ্রস্ত মানুষের অপমান যশোদা সহজে গায়ে মাখে না, সে হাসিয়া বলে, নতুন বউ বলেই তো চেনা করা। ভয় নেই গো দিদি, বউকে তোমাদের চুরি করে নিয়ে পালাব না।

যশোদা উপরে উঠিতে থাকে, সুধীরা বোনকে ডাক দিয়া বলে, সুবর্ণ, ও সুবর্ণ ? —ও বাড়ির যশোদা বউ দেখবে, নিয়ে যা তো সঙ্গে করে বউয়ের কাছে।

যশোদা কতবার এ বাড়িতে আসিয়াছে, পথ চিনিয়া সে কি যাইতে পারিবে না উপরে, দোতলার দুখানা ঘরে খুঁজিয়া পাইবে না নতুন বউ অপরাজিতাকে ? সাজা-গৃহিণীদের গিন্নিপনার মানে বোঝা সত্যই কঠিন।

বাড়ি ফিরিয়া যশোদা দেখিল, মোটে তিনটি এঁটো থালা পড়িয়া আছে, আরও দুজন খাইতে বসিয়াছে এবং তাদের জন্য নতুন করিয়া ভাত বাড়িতে নন্দ একেবারে গলদঘর্ম।

আরে নিষ্কর্মার ঢেঁকি, হাতায় করে হাঁড়ি থেকে ভাত তুলে থালায় দেবে, তাও পার না ? পালা তুই, ভাগ।

নন্দকে রেহাই দিয়া যশোদা জিজ্ঞাসা করিল, কে কে খেয়েছে রে নন্দ ?

নন্দ গড়গড় করিয়া বলিয়া গেল, কেষ্ট, বলাই আর যতীন।

যশোদা একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, মতি আর সুধীর খায়নি ? কী হল তবে আর দু-থালা ভাত, বেড়ে যে রেখে গেলাম পাঁচ থালা ?

নন্দ বিব্রত হইযা এদিক ওদিক তাকায়, ওই তো খেয়ে গেল ওরা!

কারা ? মতি আর সুধীর ?

হুঁ।

এঁটো থালা গেল কই ?

যশোদার জেরায় কাবু হইয়া এবার নন্দ সব বলিয়া ফেলে। মতি আর সুধীরের ভাত খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র সুধীর তাড়াতাড়ি এঁটোকাঁটা সাফ করিয়া থালা দুটি মাজিয়া ধুইয়া রাখিয়া গিয়াছে আর নন্দকে বলিয়া গিয়াছে অনেক করিয়া যে, যেন যশোদাকে না বলে।

খুব বুদ্ধিমান তো সুধীর ! —তুই না বললেও টের পেতে যেন আমার বাকি থাকত। বলিয়া যশোদা হাসিল।

তারপর গম্ভীর হইয়া ভর্ৎসনার সুরে বলিল, পেটের জ্বালায় ওরা না হয় বারণ না মেনে খেয়ে গেল, বলবি না বলে তুই যে আমায় বলে দিলি বড়ো ? ধিক তোকে বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসের মান যে রাখে না মানুষের মধ্যে তাকেই বলি সবচেয়ে হীন, চোর-জোচ্চোর ভালো তার চেয়ে।

এ রকম সময়ে যশোদাকে বড়োই দুর্বোধ্য মনে হয়। কী যে তার মনের ভাব, রাগ সে সত্যই করিয়াছে না সবটাই তার ভান, কিছুই বোঝা যায় না। হাসি-তামাশা করা চলে এমন একটা তুচ্ছ ব্যাপারে কথা দিয়া কথা রাখে নাই, তাও যশোদারই জোরালো জেরার ফাঁদে পড়িয়া, এটা কখনও নন্দর এতবড়ো অপরাধ বলিয়া যশোদা ভাবিতে পারে ? মুখ দেখিয়া কথা শুনিয়া মনে হয় কিন্তু তাই সে ভাবিতেছে !

নন্দ ভয়ে ভয়ে বলে, তুমি যে জিজ্ঞেস করলে ?

জিজ্ঞেস করব না ? জিজ্ঞেস তো আমি করবই—আমি কি গুনে জানি একজনের কাছে তুমি পিতিজ্ঞে করেছ আমায় কিছু বলবে না ? চুপ করে থাকতে পাবতে না তুমি ?

চুপ করে থাকলেও তো তুমি বকতে।

বকতাম তো কী হয়েছে ? পিতিজ্ঞে রক্ষার জন্যে মুখ বুজে একটু বকুনি যদি না সইতে পার, তুমি মানুষ কীসের শুনি ?

এক জায়গায় কাজ করে বটে, তবু মতিব সঙ্গে সুধীরের বন্ধুত্ব হওয়াটা সত্যই বড়ো খাপছাড়া ব্যাপার। মতির চুলে পাক ধরিয়াছে, মানুষটা সে শান্ত, ভীরু এবং একটু মতলববাজ। সুধীরের বয়স ত্রিশেরও কম, বেঁটে আর চওড়া শরীরটা তার লোহার মতো শক্ত, যেমন অশান্ত তেমনই নিষ্ঠুর তার প্রকৃতি এবং পৃথিবীর সকল গোঁয়ারের মতো সে বোকা। তবু মতির সঙ্গেই সুধীর ভিড়িয়া গিয়াছে, দুজনে একসঙ্গে হাসি-তামাশা গল্পগুজব করে, নেশা আর আমোদ করিতে যায়—দুটিতে যেন সমবয়সি ইয়ার।

রাস্তায় পা দিয়াই সুধীর একগাল হাসিয়া বলিল, চাঁদের মাকে ফাঁকি দিয়ে কেমন দুজনে পেট-পূজাটি সেরে এলাম মতিদা !

ফাঁকি না তোর মাথা। আমরা যাতে খাই তাই জন্যে তো ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, তাও বুঝিস না পাঁঠা ?

বটে নাকি, হ্যাঁ ?

সুধীর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। এমন খাপছাড়া প্যাঁচালো দরদের ব্যাপারগুলি সে ভালো বুঝিতে পারে না। পরের সুখদুঃখের কথা যে সংসারে কেউ ভাবে এ ধারণাটাই তার কেমন অদ্ভুত ও অসম্ভব মনে হয়, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খাইতে চায় না। তার সমস্ত জীবনটাই একটা একটানা পেষণের ইতিহাস, পরের আশ্রয়ে মানুষ হইয়াছে, পরের অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অন্ধ স্বার্থপরতা ও ক্ষমাহীন নির্মমতাকে জানিয়াছে সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম, সুস্থ শরীরে খাটিতে পারিলে খাইয়াছে, অসুস্থ শরীরে খাটিতে না পারিলে উপবাস করিয়াছে, ভিক্ষা করিয়াছে, চুরি করিয়াছে, জেলেও গিয়াছে। একবার অনেক কষ্টে কিছু টাকা জমাইয়া বিবাহ করিয়াছিল, দু-মাসের মধ্যে বউটা একজনের সঙ্গে উধাও হইয়া গিয়াছে। তার আগে এবং পরে যে কয়েকটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে সে বাস করিয়াছে, তারা যেমন তার কাছে প্রাণপণে আদায় করিয়াছে সেও তেমনি তাদের কাছে প্রাণপণে আদায় করিয়াছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যেভাবে হোক নিজের প্রাপ্য আদায় করার সহজ সরল সম্পর্কটা সুধীর বুঝিতে পারে, আর কিছু তার মাথায় ঢোকে না। নিজেও সে চিরদিন নিজের সুখদুঃখ ভালোমন্দের হিসাব ছাড়া আর কোনো হিসাব করে নাই, অন্য কেউ এই হিসাব লইয়া মাথা ঘামাইবে এ আশাও করে নাই। জীবনে যে কারও অকারণ দরদ পায় নাই এ জন্য তার তাই কোনো আপশোশও নাই। হয়তো কখনও পাইয়াছিল দরদ, হয়তো মানুষকে দরদি করিবার সুযোগ আসিয়াছিল, কিন্তু সে বুঝিতেও পারে নাই কী পাইতেছে, কীসের সুযোগ আসিয়াছে।

কেহ তাহাকে কোনোদিন বুঝাইয়াও দেয় নাই, বুঝিতেও দেয় নাই।

চলিতে চলিতে নানা কথা মনে হয় সুধীরের। একটি দুটি করিয়া যশোদার কতগুলি কাজের কথা মনে পড়ে, আজকের আশ্চর্য ব্যবহারের সঙ্গে যার কেমন যেন একটা মিল আছে। কিছুদিন আগে তার জ্বর হওয়ায় যশোদা তার সেবা করিয়াছিল, খুবই সাধারণ সেবা, মাথাটা ধোয়াইয়া মুছিয়া দেওয়া, জোর করিয়া বার্লি আর ওষুধ খাওয়ানো, আর কিছু নয়—তবু ও রকম সেবাও কি সুধীরকে কোনোদিন কেউ করিয়াছে ? মারামারি করায় একবার পঁচিশ টাকা জরিমানা হইয়াছিল সুধীরের, যশোদা জরিমানাটা না দিলে জেলে যাইতে হইত। তারপর দু-একটাকা করিয়া মাস তিনেকের মধ্যে যশোদা প্রায় দশ-বারোটাকা আদায় করিয়া নিয়াছে বটে, কিন্তু যাচিয়া জরিমানার টাকা দিয়া কেউ কি সুধীরকে কোনোদিন জেল হইতে বাঁচাইয়াছে ?

সত্যি বলছ মতিদা ?

কী সত্যি বলিয়াছে মতি ? অ, যশোদার কথা ! সত্য বইকী, যশোদাকে তো চেনে না সুধীর, ও সব সে বুঝিবে না। মেজাজটা একটু যা খারাপ যশোদার, চেহারাটাও হাতির মতো, কিন্তু সকলের জন্য বড়ো মায়া যশোদার, অমন মেয়েমানুষ হয় ? —একটা বিড়ি দে তো। গাটা কেমন করছে সুধীর, কালকের নেশাটা এখনও কাটেনি।

বিড়ি নেই।

দে না একটা ? কেমন ধারা মানুস যেন তুই সুধীর।

সুধীর বিরক্ত হইয়া বলিল, নেই তো দেব কোথা থেকে ? গড়াব ?

একটা বিড়ির জন্যই দুজনের মধ্যে যেন মনোমালিন্য ঘটিবার উপক্রম হয়। মতি খানিক আগে আর সুধীর খানিক পিছনে চলিতে থাকে।

এত সকালেই বড়ো রাস্তায় গাড়ি আর মানুষের ভিড় হইতে আরম্ভ করিয়াছে। দশটা এগারোটার সময় এ রাস্তায় চলাই দুষ্কর হইয়া পড়ে। ঠেলা গাড়ি, মহিষের গাড়ি, লরি আর বাসের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে এমন হইয়া দাঁড়ায় যে থাকিয়া থাকিয়া মোটরগাড়িকেও গোরুর গাড়ির সঙ্গে

সমান তালে শামুকের গতিতে চলিতে হয়, মাঝে মাঝে জমাট বাঁধিয়া সমস্ত গাড়ির গতিই কিছুক্ষণের জন্য একেবারে স্থগিত হইয়া যায়। তখন পথের দিকে চাহিলে মনে সংশয়ই জাগে, এ কী শহরতলির পথ না শহরের কেন্দ্র ? সংশয় দূর হয় যখন মনে পড়ে শহরের কেন্দ্র এ রকম অপরিচ্ছন্ন নোংরা নয়, সেখানে পথের ধারে বুদবুদ তোলা পচা পাঁকে ভরা ছোটোখাটো খালের মতো এ রকম নর্দমা নাই, গেঁয়ো ধরনের দোকানপাট আর সেকালের ধরনের আড়ত নাই, এত বড়ো বড়ো মিল নাই, এ ধরনের মালবাহী গাড়ি সেখানে এভাবে জড়াজড়ি করে না, সেখানে দামি ও সুদৃশ্য প্রাইভেট কারের স্রোত কেবল রঙিন বৈদ্যুতিক আলোর ইঙ্গিতে কিংবা ট্রাম বাস প্রভৃতি মানবজাতীয় মালবাহী গাড়ি আর মানুষের ভিড়ে গতিহীন হয়, সেখানে পথের ধারে প্রত্যেকটি বাড়ি রাজপুরী, প্রত্যেকটি দোকান শুধু এই বাণীর রূপক যে ধনী ছাড়া পৃথিবীতে মানুষ নাই, থাকা উচিত নয়।

কারখানায় গিয়া মতি সবে খাকি শার্টটি খুলিয়া রাখিয়া আলকাতরার বালতি আর বুরুশটি তুলিয়া লইয়াছে, মাল চালানের কুলিদের সর্দার ভরদ্বাজ আসিয়া বলিল, ওই বিশঠো গাঁটমে কাল লিখা নাই কাহে ? ভরদ্বাজ চমৎকার বাংলা বলিতে পারে, কিন্তু রাগের সময় বলে না।

সব গাঁটমে তো কালকে আমি লিখেছি ?

লিখেছো ? তোমার মুন্ডু করিয়েছো। কাল চালান বরবাদ গেল, কাশীবাবু হামাকে দুষছে। কাম যদি না করবে শালা, চলা যাও না কাম ছোড়কে ?

বুরুশটা ছিনাইয়া লইয়া মতির গালে আঘাত করিয়া ভরদ্বাজ গজরাইতে গজরাইতে চলিয়া গেল। আঘাত যত না লাগিল মতির, আলকাতরা লাগিল তার চেয়ে অনেক বেশি। সাদা চুল আর কালো গালের রং দেখিয়া আশেপাশে যারা কাজ করিতেছিল তারা হাসিয়া বাঁচে না।

গালের আলকাতরা মুছিতে মুছিতে মতি ভাবিতে থাকে কাশীবাবুর কাছে গিয়া নালিশ জানাইবে কিনা। কিন্তু গাঁটে লেখা হয় নাই বলিয়া কাশীবাবু নিজেই যদি চটিয়া থাকেন, নালিশ জানাইয়া লাভ কী হইবে ? কাশীবাবু হয়তো অন্যগালে আলকাতরা মাখাইয়া দিবেন।

কিন্তু এই গাঁটগুলি কোথায় ছিল কাল ? এখানে যে ছিল না মতির তাতে সন্দেহ নাই, এতকাল সে এ কাজ করিতেছে একেবারে কুড়িটা গাঁট বাদ পড়িবার মতো ভুল কি তাব হইতে পারে ? তা ছাড়া, কালই যদি গাঁটগুলি চালান দিবার এত বেশি দরকার ছিল, আগে এইগুলিতে লিখিবার জন্য তাকে নিশ্চয় বলিয়া দেওয়া হইত—চিরকাল যেমন বলা হইয়াছে। একটা ধাঁধায় পড়িয়া যায় মতি, ব্যাপারটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সে কয়েকটা আলকাতরার দাগ আঁকিয়া দেয় নাই বলিয়া একেবারে চালান বরবাদ হইয়া গেল ?

ভাবিতে ভাবিতে সমস্যাটা মতির কাছে জল হইয়া যায়। দোষ তার নয়। হয় কাশীবাবু নয় ভরদ্বাজের গাফিলতিতে কাল গাঁটগুলি চালান দেওয়া হয় নাই এবং চিরদিনের রীতি অনুসারে যারা উপরে থাকে তাদের ঘাড় হইতে পিছলাইয়া দোষটা আসিয়া চাপিয়াছে তার ঘাড়ে। দোষ দিতে ছুতাও তো চাই একটা ? কী চালাক কাশীবাবু আর কী শয়তান ভরদ্বাজ ব্যাটা !

গালে আলকাতরা মাখাইয়া দেওয়ার জন্য একটু রাগ আর একটু দুঃখ মতির হইয়াছিল বইকী, তবে আঘাত আর অপমান সম্বন্ধে অনুভূতিগুলি তার অনেকটা ভোঁতা হইয়া আসিয়াছে কিনা, রাগ দুঃখ অপমান অভিমান খুব সহজেই সে ভুলিয়া যাইতে পারে। এমনকী, আসল ব্যাপারটা বুঝিয়া এবার একটু কৌতুকও মতির বোধ হয়। দোষ ঘাড়ে চাপানোর জন্য এতগুলি লোকের ভিতর হইতে তাকেই বাছিয়া নেওয়া হইয়াছে, এ জন্য একটু গর্বও কি মতি বোধ করিতে আরম্ভ করে ?

মেঝে হইতে বুরুশটি তুলিয়া বালতির উপর আড়াআড়িভাবে রাখিয়া গাঁটগুলিতে কী অক্ষর আর কী নম্বর লেখা হইবে তার নমুনা আনিতে ভরদ্বাজের কাছেই মতি যাইবে ভাবিতেছে, সুধীর আসিয়া হাঙ্গামা বাধাইয়া দিল।

প্রথমটা খুব একচোট হাসিল সুধীর, তারপর ব্যাপারটা শুনিয়া রাগিয়া হইয়া গেল আগুন। খানিক তফাতে কোথা হইতে কী কাজে ভরদ্বাজ কোথায় যাইতেছিল, সুধীর গিয়া তাকে টানিয়া হ্যাঁচড়াইয়া এদিকে নিয়া আসিল, গালাগালি চোটপাট চলিল মিনিটখানেক, তারপর আলকাতরার বালতিটা সুধীর কাত করিয়া দিল ভরদ্বাজের মাথার উপর।

একটা হইচই বাধিয়া গেল। কাশীবাবু ছুটিয়া আসিল এবং গোলমালের মধ্যে কাশীবাবুর গায়েও কী করিয়া যে আলকাতরা লাগিয়া গেল খানিকটা ! ভরদ্বাজের একজন পার্শ্বচরের সঙ্গে তখন সুধীরের মারামারি চলিতেছে এবং আট-দশজন তাদের ছাড়াইবার চেষ্টা করায় মনে হইতেছে মারামারি বুঝি বাধিয়াছে দশ-বারোজনের মধ্যে। কাশীবাবু কার গালে যেন একটা চড় বসাইয়া দিল। বোধ হয় যাকে সামনে পাইল তারই গালে। ঠিক তার পরেই পিছন দিকে না চাহিয়া একজন দু-পা পিছু হটায় আসিয়া পড়িল একেবারে কাশীবাবুর ঘাড়ে। মনে হইল, একজনের গালে চড় মারার শোধটাই বুঝি আর একজন নিয়াছে।

গোলমাল থামিবার একঘণ্টার মধ্যে মতি, সুধীর এবং আরও আটজন শ্রমিক বরখাস্ত হইয়া গেল। অন্য আটজনের অপরাধ ? প্রকাশ্য অপরাধ কারখানার মধ্যে মারামারি করা, যা তারা কেউ করে নাই। ওদের মধ্যে পাঁচজন তো যেখানে গোলমাল চলিতেছিল তার ধারে কাছেও ছিল না। গোলমাল থামিবার পরে তারা আসিয়াছিল, যোগ দিয়াছিল শুধু জটলায়। কিন্তু কিছুদিন আগে সত্যপ্রিয় মিলে যে ধর্মঘট হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময় এই আটজনের নাম উঠিয়াছিল মিলের পক্ষে অবাঞ্ছিতদের লিস্টে। আজকের গন্ডগোলের সুযোগে মতি আর সুধীরের সঙ্গে এদেরও কাশীবাবু তাড়াইয়া দিল। ওরা মারামাবি করে নাই ? কাশীবাবু নিজের চোখে ওদের মারামারি করিতে দেখিয়াছে, আলকাতরার জন্য ভরদ্বাজ চোখের পাতা ভালো করিয়া খুলিতে পাবিতেছিল না, তবু সেও দেখিয়াছে, কাশীবাবুব আরও কত পার্শ্বচরও যে দেখিয়াছে তার হিসাব হয় না।

দশজনের কাজ গেল। কাশীবাবুব কড়া হুকুমে মিলের মধ্যে কর্মব্যস্ততা আবার চরমে উঠিয়া গেল, মানুষ আর যন্ত্র সমানে কাজ করিতে লাগিল। কী যেন একটা উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে কিন্তু হাতে যথেষ্ট সময় নাই, তাই উর্ধ্বশ্বাসে কাজ করা। এত ব্যস্ততার মধ্যে একটুও আবেগ নাই, ব্যাকুলতা নাই, নাকেমুখে ভাত গুঁজিয়া কারখানার দিকে ছুটিব সময় একজন মাত্র মানুষের মধ্যে যতখানি আবেগ আর ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়, এখানে এতগুলি মানুষের সমবেত ব্যস্ততার মধ্যে সেটুকু ভাবোচ্ছ্বাসের ছন্দও নাই।

তবু মানুষ তো যন্ত্রের অধীন নয়. যন্ত্রই মানুষের অধীন, প্রভুত্বটা এখনও ঠিকমতো আয়ত্ত হয় নাই মানুষের, এই যা আপশোশ। তাই, টিফিনের ছুটির সময় কারখানার প্রাঙ্গণে দশজন বরখাস্ত শ্রমিককে ঘিরিয়া সকলে জটলা করিতে লাগিল, একটু বক্তৃতাও বুঝি করিল দু-একজন। টিফিনের সময় শেষ হওয়ার পরেও থামিল না। মিলের কাজ বন্ধ হইয়া রহিল। কাশীবাবু ভড়কাইয়া গিয়া ক্রমাগত ফোন করিতে লাগিল হেড আফিসে আব সত্যপ্রিয়র কাছে।

কিন্তু কিছুতেই এবার ধর্মঘট ঠেকানো গেল না। যে দশজনকে বরখাস্ত করা হইয়াছে তাদের আবার কাজে না নিলে কেহ কাজ করিবে না। হেড আফিসে ফোনটা সত্যপ্রিয়র কানেই প্রায় লাগানো ছিল, সমস্তক্ষণ, মিনিটে মিনিটে খবর যাইতেছিল। মন্তব্য প্রায় কিছুই করিতেছিল না, কেবল শুনিতেছিল। একবার শুধু বলিয়াছিল : ব্যাখ্যা আপনাকে করতে হবে না কাশীবাবু, যা ঘটেছে তাই শুধু বলে যান। না, এখনও পুলিশ ডাকবেন না, আর একটু দেখা যাক। ভয় পাবেন না মশায়, পুলিশ রেডি হয়েই আছে, ডাকামাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাজির হবে। অনাথ পৌঁছয়নি ? দেখুন তো।

অনাথ সত্যপ্রিয়র সেক্রেটারি। কাশীবাবু দেখিয়া আসিয়া জানাইল, অনাথবাবু ওদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ওরা তাকে কথাই বলতে দিচ্ছে না, হইচই করছে। একজন একটা ঢিল ছুঁড়েছে অনাথবাবুর দিকে, গায়ে লাগেনি।

জবাবে সত্যপ্রিয় বলিল, আপনি একটি আস্ত গর্দভ কাশীবাবু ! ওই দশজনকে দাঙ্গা করার জন্য পুলিশে দিলেই চুকে যেত—বরখাস্ত করে ছেড়ে দিলে ওরা মিলেব মধ্যে এসে গোল বাঁধাবে এটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধিও আপনার ঘটে নাই। শুধু বরখাস্তই যদি কববেন, এতকাল করতে পারতেন না, সুযোগের জন্য অপেক্ষা করাব কী দরকাব ছিল ?

আজ্ঞে অনাথবাবুকে ফোন করলাম, অনাথবাবু বললেন—

অনাথ আপনার মতোই গাধা। ডেকে আনুন অনাথকে, বুঝিয়ে আব কিছু হবে না। পুলিশকে খবব দিচ্ছি, পুলিশ এলেই মিল খালি করে গেট বন্ধ করে দেবেন।

সন্ধ্যাব পর মতি, সুধীর আর ওই দশজন ববখাস্ত শ্রমিকের সঙ্গে প্রায শ-দুই শ্রমিক যশোদাব বাড়িতে আসিয়া হাজির। উঠানে স্থান হইল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজনেব, বাকি সকলে সরু গলিটুকুর মধ্যে গাদাগাদি করিয়া আর গলিব মোড়ে রাস্তায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া বহিল। সুধীব খুব লাফালাফি করিতেছিল, যশোদার ধমকে থামিযা গেল। খুন্তি হাতে রান্নাঘবের দরজায় দাঁড়াইয়া প্রথমে যশোদা এক রকম হুড়মুড় কবিয়া বাড়িব মধ্যে ঢুকিয়া পড়ার জন্য একচোট গালাগালি দিল সকলকে, তারপব মন দিয়া ব্যাপাবটা সব শুনিল, তারপর আবার গালাগালি দিয়া বলিল, তোমরা সবাই পাঁঠা, এক ফোঁটা বুদ্ধি নেই তোমাদের কারু ঘটে। দল বেঁধে হল্লা করলেই হবে ? দু-নম্বর মিলে ছুটে যেতে পারলে না সবাই মিলে, সেখানেও ধর্মঘট কবাতে পারলে না ?

তাই তো বটে—এটা তো খেয়াল হয় নাই কাবও। কী কবা যায় এখন ?

কী আবার করবে ? পাঁচ-দশজন মিলে খুঁজে বাব করো গে দু-নম্বরের যতজনকে পাব। কাল ভোব না হতে তোমবা সবাই গিয়ে দু-নম্বরে ধবনা দেবে। এবাব ভাগো সবাই আমাব বাড়ি থেকে, দম আটকে মাববে নাকি ?

বাছিয়া বাছিয়া কয়েকজনকে একটু বসিযা যাইতে বলিয়া বাকি সকলকে যশোদা বাড়িব বাহিব করিয়া দিল। তারপর ওই বাছা বাছা কয়েকজনেব সঙ্গে পবামর্শ কবিল দু ঘণ্টা ধবিযা।

পরদিন দুপুরবেলা ডাক আসিল যশোদার, মিলে মজলিশ বসিযাছে, একবাব যাইতে হইবে যশোদাকে। কাশীবাবু নিজে গাড়ি নিযা আসিয়াছে।

আমি গিয়ে কী করব ?

আপনি মাতিযে দিয়েছেন ওদের, আপনি না গেলে ওরা কারও কথা শুনবে না।

যশোাদ উদাসভাবে বলিল, ওদের দাবি মিটিয়ে দিলেই কথা শুনবে।

সেই তো সমস্যা দাঁড়াইয়াছে এখন। ইতিমধ্যে শ্রমিকের দাবি বাড়িয়া গিযাছে, দশজন ববখাস্ত শ্রমিককে ফিরাইয়া নিলেই আর চলিবে না, আগের বার যে সব দাবি উপলক্ষে ধর্মঘট বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল সেইগুলিও মিটাইয়া দেওয়া চাই।

আপনার পরামর্শে এটা হয়েছে।

আমার পরামর্শ কি ওরা শোনে ? শুনলে কি আর এ দুর্দশা হয় ওদের ? কত বলি যে কাজকর্ম যখন থাকে, পয়সা জমা দুটো, অসময়ে কাজে লাগবে। কানেও তোলে না কেউ আমার কথা।

গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া গম্ভীরভাবে যশোদা মাথা নাড়ে, কথায় বলে না অভাবে স্বভাব নষ্ট, তাই হয়েছে ওদের। মজুরি হাতে পেলেই আর ছেঁড়া ন্যাকড়াটি পরা চলবে না, নতুন একটি কাপড় কেনা চাই। একটি গামছা কেনা চাই, জলপানি খাওয়া চাই, গায়ে তেল মাখা চাই—

যশোদা তামাশা করিতেছে কিনা কাশীবাবু ঠিক বুঝিতে পারে না, দ্বিধাভরে বলে, তাড়ি খেয়ে খেয়েই ওদের যত দুর্দশা।

তাড়ি খেয়ে ? তাড়ি না খেলে ওরা বাঁচত ! খাওয়ার মধ্যে খায় তো শুধু একটু তাড়ি, নয়তো একটু দিশি, তাও যদি না খাবে, খিদে-তেষ্টা মিটবে কীসে ? শুনিয়া সেই যে কাশীবাবু চুপ করিয়া গেল, আর কথাটি বলিল না। মিলের সামনে পাঁচ-ছশো শ্রমিক এলোমেলোভাবে ভিড় করিয়া আছে, যশোদাকে দেখিয়া তাদের কী উৎসাহ। ধর্মঘটের চেয়ে আজ সারাদিন যশোদার কথাই তারা বেশি আলোচনা করিয়াছে। মুখে মুখে কত কথাই যে রটিযাছে যশোদার সম্বন্ধে !

মিলের ভিতরে আপিসঘরে বৈঠক বসিযাছে। বৈঠকে অনাথ, হেড আপিসের আরও দুজন বড়ো কর্মচারী এবং শ্রমিক সমিতির দুজন প্রতিনিধি আছে। একটি চেয়ারে যশোদাকে বসিতে দেওয়া হইল। এমন অস্বস্তি যশোদা জীবনে কখনও ভোগ করে নাই। তারপর কত কথা আর কত আলোচনাই যে আরম্ভ হইল, যশোদা কিন্তু শুনিল বেশি, কথা বলিল কম।

শ্রমিক সমিতির একজন প্রতিনিধি অনুযোগ দিয়া বলিল, আমাদের না জানিয়ে ধর্মঘট আরম্ভ করা কি আপনার উচিত হয়েছে ?

যশোদা বলিল, ধর্মঘট আরম্ভ করার ধ-ও জানি না আমি। সে হোক, শেষ পর্যন্ত আপনারা তো জেনেছেন ?

কিন্তু এ রকম জানায় তারা খুশি নয়, শ্রমিকেরা ধর্মঘট করিয়াছে বটে, ধর্মঘটটা আসলে যেন যশোদার। এতক্ষণ আলোচনা করিযা একটা মিটমাট হইয়াছিল, শ্রমিক সমিতি মীমাংসাটা মানিয়া লইযাছে, কিন্তু শ্রমিকরা মানিতে চাহিতেছে না। এ ভাবে ডিসিপ্লিন নষ্ট হইলে—

মীমাংসাটা কী হইয়াছে ? দশজনের মধ্যে ন-জন বরখাস্ত শ্রমিককে ফিরাইয়া নেওয়া হইবে, আরও পঁচিশ জন নূতন শ্রমিক নিয়া কাজের চাপ কমানো হইবে, কিন্তু কাজের সময় আর মজুরি সম্বন্ধে অন্য যে দাবি করা হইযাছে, সেগুলি মেটানো হইবে না।

শুনিয়া যশোদা বলিল, তবে তো খুব হল !

তবু এই মীমাংসাই যশোদা মানিয়া নিল, নতুন লোকের সংখ্যাটা কেবল পঁচিশ হইতে চল্লিশে উঠিল এবং ঠিক হইল এর মধ্যে ত্রিশ জনকে যশোদা ঠিক করিয়া দিবে। মানিয়া নেওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না। যশোদা জানিত এ ধর্মঘট টিকিবে না, [illegible] অসময়ে ধর্মঘট আরম্ভ হইয়াছে, ঝোঁকটা কাটিয়া গেলেই অনেকে কাজে যোগ দিতে চাহিবে, অনেকে নিরুপায় হইয়া কাজে যোগ দিবে। যশোদা তো জানে ওদের অবস্থা।

দশজনের মধ্যে বাদ যাবে কে ?

অনাথ বলিল, সুধীর। ওকে নেওয়া চলে না। আমাদেরও তো প্রেস্টিজ আছে একটা। প্রেস্টিজ মানে—

যশোদা একটু হাসিল। প্রেস্টিজ শব্দটা এত বেশি কানে আসে !

যশোদা শর্ত মানিয়া নেওয়ামাত্র অনাথ ফোনটা [illegible]য়া নিল। সত্যপ্রিয় সংবাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। সত্যপ্রিয় মিলে আসে নাই, কোনোদিন এ সব ব্যাপারের ধারে কাছেও সে আসে না, শ্রমিকদের সে বড়ো ভয় করে। সেই তো মালিক মিলের, উত্তেজিত অবস্থায় সকলে মিলিয়া তাকে যদি আক্রমণ করে, যদি প্রথমে গায়ের জামাকাপড় টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া তারপর তার দেহটাকে ছিঁড়িতে আরম্ভ করে ঠিক ওইভাবে ? এই কল্পনা আর সেই সঙ্গে গভীর একটা আতঙ্ক সত্যপ্রিয়র মনে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধিয়া আছে।

রাত্রে সকলে খাইয়া গেল, সুধীর আসে না। নন্দকে দিয়া ডাকিয়া পাঠানো হইল তবু আসে না। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া সে ছাতে গিয়া গুম খাইয়া বসিয়া আছে। শেষে যশোদা নিজেই ডাকিতে গেল।

যশোদা কাছে আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র, সুধীর গটগট করিয়া নামিয়া গেল নীচে। কিন্তু যশোদাও ছাড়িবার মেয়ে নয়, সেও পিছুপিছু ধাওয়া করিয়া সুধীরকে পাকড়াও করিল তার ঘরে।

ভাত খাবে না ?

সুধীর কথা বলে না, চৌকিতে বসিয়া চুপচাপ দেয়ালের দিকে চাহিয়া থাকে, যেখানে একটা টিকটিকির লেজ শিকার করিবার উত্তেজনায় এ-পাশ ও-পাশ নড়িতেছিল। সহজ রাগটা সুধীরের হইয়াছে যশোদার উপর ! আজ সকালে যে যশোদার দরদের পরিচয়ে তার মাথা প্রায় ঘুরিয়া গিয়াছিল, সেই যশোদাই শেষ পর্যন্ত তার এমন সর্বনাশ করিল।

দশজনের মধ্যে আর সকলকে ফিরাইয়া নেওয়া হইল, বাদ পড়িল শুধু সে ! মতির হইয়া সে লড়াই করিয়াছে, মতির কাজটা পর্যন্ত বজায় রহিল, বরখাস্ত করা হইল একা তাকে !

মাথা গরম কোরো না বাবু ছেলেমানুষের মতো। মাথা গরম করে কাজটির মাথা তো খেলে নিজের। খোঁচা না দিলে সুধীরের মুখ খুলিবে না জানিয়াই যশোদা খোঁচা দিয়া কথা বলে। সুধীর মুখ ফিরাইয়া বলে, আমি খেলাম না তুমি খেলে ?

মারামারি করলে তুমি, চাকরি খেলাম আমি ? বেশ তো বিচার তোমার বাবু ?

যশোদা হাসে, গলা নামাইয়া গোপন কথা বলার মতো সুরে বলে, তবে কী জান, শুনে আমি বড়ো খুশি হয়েছি—সত্যি বলছি তোমায়। মতি চুপচাপ সয়ে গেল কথাটি কইলো না, ছিছি, ওটা কি মানুষ ? ভীরু অপদার্থ ওটা। তোমার সাহস আছে, তুমি তাই বুখে দাঁড়ালে—আর কেউ পরের অপমান গায়ে মেখে নিত অমনি করে ?

শুনিতে শুনিতে বাতাসে মেঘ উড়িয়া যাওয়ার মতো সুধীরের মুখের উপর হইতে রাগ দুঃখ অভিমানের ছায়া মিলাইয়া যাইতে থাকে। একটু নরম গলায় সে বলে, তুমি বললেই ওরা আমায় রাখত।

তাতে লাভটা কী হত বলো ? এরপর ওখানে আর কাজ করতে পারতে তুমি ? ও কাজ গেছে যাক—আমি তোমায় ভালো কাজ জুটিয়ে দেব। বেশি মাইনে, কম খাটুনি। মানুষের মতো তেজ আর বুকের পাটা কটা লোকের থাকে ? তোমার তা আছে জেনে ভাবলাম তুমি আরও ভালো কাজের যুগ্যি—এইসব ভেবে আর বললাম না তোমায় ফিরিয়ে নিতে।

বড়ো শ্রান্তি বোধ হইতেছিল যশোদার। যতবড়ো শরীর হোক, সহ্যের তো একটা সীমা আছে ? ঘরের কাজে যশোদাকে যে সাহায্য করিতে আসে, অসুখ হইয়া তিনদিন সে আসে নাই। ঘরে বাহিরে কী খাটুনি আর হাঙ্গামাই তাকে পোয়াইতে হইতেছে। তার উপর আবার এই বোকাহাবা ধাড়ি শিশুকে বুঝাইয়া শান্ত করিবার দায়িত্বটা পর্যন্ত তার। চৌকির একপাশে বসিয়া হাই তুলিয়া যশোদা আবার বলে, কাজ গিয়ে শাপে বর হল তোমার।

সুধীর অভিভূত হইয়া যশোদাকে দেখিতে থাকে, সে দৃষ্টিতে অন্য কারও হয়তো রোমাঞ্চ হইত, যশোদা দেখিয়াও দেখে না। আবার হাই তুলিয়া বলে, এবার ভাত খাবে চলো—দুটি খেয়ে নিয়ে রেহাই দাও আমায়।

সুধীর মিনতি করিয়া বলে, একটু বোসো চাঁদের মা, একটু গল্প করি তোমার সঙ্গে।

কী বললে ? গল্প ? বসে বসে গল্প করব তোমার সঙ্গে ? খাবে তো খেয়ে যাও সুধীর, নয়তো উপোসে রাত কাটবে বলে রাখলাম।

তিন

প্রচার বিভাগটা সত্যপ্রিয়র ব্যাবসার উন্নতির নাম করিয়াই খোলা হইয়াছে বটে, বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপনও দেওয়া হইতেছে সত্য, কিন্তু জ্যোতির্ময়ের আসল কাজ সত্যপ্রিয়র নামও প্রচার করা। সত্যপ্রিয়র এমন ব্যাবসা নয় যে পেটেন্ট ওষুধের মতো তাব জন্য বিজ্ঞাপন দিয়া দেশ ছাইয়া ফেলা প্রয়োজন, সাময়িকপত্রে সত্যপ্রিয়ব প্রবন্ধ আব বক্তৃতার রিপোর্ট প্রকাশ করিবার মূল্যস্বরূপ বিজ্ঞাপনগুলির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সত্যপ্রিয়র প্রত্যেক প্রবন্ধ আর বক্তৃতায় ভারতবর্ষের শোচনীয় অধঃপতনের জন্য কী হা-হুতাশই থাকে আর সমাজ, ধর্ম ও দেশকে সুনিশ্চিত সর্বনাশের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কী ব্যাকুলতাটাই প্রকাশ পায়—তবু যে প্রবন্ধ আব বক্তৃতার রিপোর্ট প্রকাশ করিবার জন্য প্রকারান্তরে মূল্যের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে, এও কি দেশের অধঃপতনের একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত নয় ! কেবল কি তাই ? কতকগুলি কাগজ আছে মূল্য দিয়াও তাদের বাগানো যায় না।

এ সব পাগলামি আমাদের কাগজে ছাপানো চলবে না মশায়।

ঠিক পাগলামি নয়, একটু খাপছাড়া মতামত আছে মাঝে মাঝে, সেটা মিথ্যা নয়। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কী জানেন, লেখাটা না ছাপলে উনি হয়তো চটে যাবেন, বিজ্ঞাপনের কনট্রাক্টটা—একটু হাসে জ্যোতির্ময়—বোঝেন তো সব ? যার যেদিকে খেয়াল চাপে। তা ছাড়া, ওঁর নাম দিয়ে ছাপা হবে, মতামতের দায়িত্ব তো আপনাদের নয়।

ম'তামতের দায়িত্ব না থাক, মতটা প্রচারের দায়িত্ব তো আছে ? দেশের জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, অর্ধেক জীবন জেলে কাটিয়েছেন, তাঁরা সবাই ভুল করে দেশকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন সর্বনাশের দিকে, আর টাকার গদিতে শুয়ে আপনার পাগলা জগাই আবিষ্কার করছেন দেশোদ্ধারের একমাত্র উপায়। দু-জায়গায় লিখেছেন, গভর্নমেন্টের সঙ্গে বিবাদ করা অন্যায়, আর এক জায়গায় লিখেছেন, প্রকৃতির নিয়মে যখন যে জাতি রাজপদে অধিষ্ঠান করে তাদেব প্রাপ্য রাজসম্মান না দিলে দেশের কখনও উন্নতি হবে না ! রাজার জাতিকে বাজসম্মান দিতে থাকলে প্রকৃতির নিয়মে আমরা একদিন নিজেরাই রাজার জাত হতে পারব, নয় তো কোনোদিন পারব না। এ সব কোন দেশি কথা মশাই ?

যুক্তিও তো দিয়েছেন।

যুক্তি ? অমন যুক্তি আমরাও দিতে পারি শুনবেন ? দেয়ালটা সাদা দেখছেন তো ? আপনি ভুল দেখছেন। বিজ্ঞানে বলে, সবগুলি রং মিশে সাদা হয়, বিজ্ঞান অবশ্য সত্যকে বিকৃত করে দেখে, আপনি যদি বেদের সপ্তম অধ্যায়টা পাঠ করেন, দেখবেন সেখানে লেখা আছে সমস্তই অস্থায়ী। সুতরাং রং মিশে সাদা হয়নি, রংগুলি অস্থায়ী বলে সাদা দেখায়—চোখের ভুল। এবার দেখতে পাচ্ছেন দেয়ালের রংটা লাল ? এই নীল হয়ে গেল, এই আবার সবুজ হল, দেখতে দেখতে হলদে হয়ে গেল—

তামাটে মুখ প্রায় কালো করিয়া জ্যোতির্ময়কে ফিরিতে হইয়াছে। কিন্তু উপায় কী ? তবু তাকে চেষ্টা করিতে হয়, চাকরি তো বজায় রাখিতে হইবে ?

বন্ধুদের কাছে জ্যোতির্ময় অনুচ্চারিত অভিযোগের জবাব দিবার মতো সবিনয়ে বলে, ব্যাপারটা কি জান ? সকলের হল দলাদ'ি মাতামাতি নিয়ে কারবার, কর্তার মতামত প্রচলিত মতামতের বিরোধী। তা ছাড়া, কর্তা বড়োই তেজস্বী আর স্বাধীনচেতা পুরুষ—এই জন্য কর্তাকে অনেকে পছন্দ করে না।

অপরাধ কার, সে নিজে কেন অপরাধী সাজিয়া থাকে, জ্যোর্তিময় বুঝিতে পারে না। তবুও সত্যপ্রিয়কে যারা মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করে না, সত্যপ্রিয়র মতামত নিয়া হাসাহাসি করে নিজেদের মধ্যে, তাদের কাছে কেমন যেন ছোটো মনে হয় নিজেকে।

জ্যোতির্ময়কে সত্যপ্রিয়র সব সময়েই প্রায় দরকার হয়। কেবল আপিসে কাজ করিয়াই তার রেহাই নাই, সকালে ও সন্ধ্যায় প্রায়ই বাগানবাড়িতে ছুটিতে হয়, ছুটির দিনগুলিও অধিকাংশই বাগানবাড়িতে কাটে। হয়তো ঘণ্টাখানেক সত্যপ্রিয় তার সঙ্গে কাজের কথা বলে, বাকি সময়টা অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। তবে অসময়ে খাওয়ার জন্য বাড়িতে জ্যোতির্ময়কে ছুটিতে হয় না, খাওয়াটা সত্যপ্রিয়র ওখানেই হয়। মানুষজনকে খাওয়ানো সম্বন্ধে সত্যপ্রিয় বড়োই উদার। হয়তো সত্যপ্রিয়র ধারণা আছে, মানুষকে দিয়া গুণ গাওয়ানোর একটা খুব সহজ উপায় মানুষকে ঠাসিয়া নুন খাওয়ানো।

চাকরি জ্যোতির্ময়কে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। মুখে সে বলে বটে যে, খাটিতে খাটিতে প্রাণ গেল, এত খাটুনি মানুষের সহ্য হয় না—বাড়ির চেয়ে আপিসে থাকিতেই সে ভালোবাসে, বাড়ির লোকের ভাবনা ভাবার চেয়ে কাজের ভাবনা ভাবিতেই তার আরাম বোধ হয় বেশি। অনেক বয়সে বিবাহ করিলে লোকে নাকি একটু বউপাগলা হয়, জ্যোতির্ময়েরও হয়তো এ রকম পাগলামি একটু আসিয়াছে, কিন্তু সেটা প্রকাশ পায় রাত্রে শয্যাগ্রহণ করিবার সময়, যখন আর কোনো কাজ করিবার থাকে না, আর কিছু ভাবিবার থাকে না। আগে বিশ্রাম ছিল শুধু ঘুম, এখন জুটিয়াছে পুতুল নিয়া খেলা করার আমোদ—অপরিপুষ্ট ও অপরিণত অপরাজিতার বিবর্ণ মুখ ও উৎসুক দৃষ্টি শ্রান্তি দূর করিতে সাহায্য করে। সারাদিন মনের রাশ টানিয়া রাখিবার পর আলগা দেওয়ামাত্র প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় প্রচণ্ডভাবে, মনের একটা সাময়িক বিকারের মতো। কী যে সে করে অপরাজিতাকে নিয়া আর কী যে করে না, কিছুই ঠিক থাকে না। কথা শুনিতে শুনিতে অপরাজিতার মাথা ঘুরিয়া যায়, আদরে সোহাগে দম আটকাইয়া আসে—শান্ত, সহিষ্ণু ও অন্যমনস্ক মানুষটার আকস্মিক প্রণয়মূলক উন্মত্ততার ভয়ে তার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতে থাকে। কোনোদিন তার মূর্ছা হওয়ার উপক্রম হয়, ফ্যাকাশে মুখে চটচটে ঘাম দেখা দেয়, চোখ স্তিমিত হইয়া আসে। জ্যোতির্ময় খেয়ালও করে না অপরাজিতার মুখে একটি কথা নাই, আধমরা মানুষের মতো সে শিথিল হইয়া গিয়াছে। এক গ্লাস জল দিতে বলিলে সে যে নড়িতেছে না সেটা দুষ্টামিও নয়, অবাধ্যতাও নয়, আলস্যও নয়। আপিসের পিয়ন কথা না শুনিলে জ্যোতির্ময় যেমন বিরক্ত হয়, অপরাজিতার উপর তার তেমনই বিরক্তি জাগে। নেহাত ভদ্রলোক বলিয়াই আপিসের পিয়নের মতো বউকে গালাগালি করে না, মৃদু অনুযোগ ও উপদেশ দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়ে।

অপরাজিতার গা-এলানো নির্বাক শিথিল ভাবটা জ্যোতির্ময় যে অসুস্থ দেহমনের দুর্বলতার লক্ষণ বলিয়া চিনিতে পারে না, হয়তো তার আরও একটা কারণ আছে। মাঝে মাঝে অপরাজিতাও খেপিয়া যায়, কী অফুরন্তই মনে হয় সেদিন তার জীবনীশক্তি। গলগল করিয়া ক্রমাগত কথা বলিয়া যায়, অপরিমিত হাসে, প্রাণহীন জড়বস্তুর মতো কেবল সোহাগ গ্রহণ করার বদলে সোহাগের বন্যায় স্বামীকে একেবারে ভাসাইয়া দিবার চেষ্টা করে, এমন লজ্জাহীন বেহায়ার মতো আচরণ করে যে, জ্যোতির্ময় প্রায় স্তম্ভিত হইয়া যায়। আবেগের আতিশয্যে কোনোদিন নিজের চুল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করে ; অস্বাভাবিক ফরসা মুখখানা তাহার দেখায় রক্তবর্ণ, চোখ হইয়া থাকে বিস্ফারিত।

পরিসমাপ্তিটাই জ্যোতির্ময়কে সবচেয়ে বেশি বিব্রত করে। অকারণে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া অপরাজিতা বলিতে থাকে, লোকে বউকে কত ভালোবাসে, তুমি আমায় একটুও ভালোবাস না। কিছুতেই কী সে থামে ! জ্যোতির্ময় যতই বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, অন্য যত স্বামী আছে পৃথিবীতে তাদের সকলের চেয়ে সেই বেশি ভালোবাসে তার বউকে, অপরাজিতা তত বেশি কাঁদে আর তত বেশি অনুযোগ করে।

পরদিন নটা-দশটার আগে কোনোমতে অপরাজিতাকে তোলা যায় না, সুবর্ণ গিয়া জাগাইয়া দিলেও তার হাত ছুঁড়িয়া দিয়া পাশ ফিরিয়া তৎক্ষণাৎ আবার ঘুমাইয়া পড়ে। ঘুম যখন ভাঙে, বুঝিতে যখন পারে, সে কে এবং কোথায় আছে, তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাওয়াব উপক্রম হয়। কোনো রকমে সে নীচে যায়, লজ্জায় ভয়ে কাঠ হইয়া থাকে, অন্য সময়, অন্য অবস্থায়, অন্য লোক তার মুখ আর কালিপড়া চোখ দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ হয়তো তাকে বিছানায় ফেরত পাঠাইয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিয়া আনিত, কিন্তু এ সময়, এ অবস্থায়, এ বাড়িতে কে অনুমান করিবে অসুখের ঝড়েই একরাত্রে মেয়েটার অবস্থা হইয়াছে দুমড়ানো মোচড়ানো চারাব মতো ? প্রতিদিনকার মতো কালও সে নিয়মিত খাইয়া দাইয়া ঘবে গিয়াছিল, কাল বরং অন্যদিনের চেয়ে তাকে মনে হয়েছিল একটু বেশি সজীব আর হাসিখুশি। তা ছাড়া, অনেক রাত্রে তার হাসি আর কথাব শব্দও তো বাড়ির লোকের কানে আসিয়াছে কিছু কিছু।

তাই সুধীরা মুখ বাঁকাইয়া শুধু বলে, হুঁঃ। আর সুবর্ণ কেবলই মুচকি মুচকি হাসে, আড়ালে ডাকিয়া নিয়া গত রজনীর ইতিহাস সব না হোক কিছু শুনিবার জন্য কেবলই খোঁচায়, তোষামোদ করে আব কেবলই ভয় দেখায়, না যদি বলো বউদি, আমার বিয়ে হলে একটি কথা তোমায় বলব না।

জ্যোতির্ময় কিছু দ্যাখেও না, বলেও না। ঘুম ভাঙিবাব পর আর অপরাজিতার দিকে তাকানোব অবসর তার হয না। কত দায়িত্ব তাব, কত দুশ্চিন্তা ! মন পড়িয়া থাকে আপিসের দিকে। অপরাজিতা উঠিবার আগেই হযতো সে বাহিব হইযা যায়।

হেড আপিসটি বেশ বড়ো, কয়েকটি বিভাগ আছে, শ-চারেক লোক কাজ কবে। জ্যোতির্ময়ের আপিস যে ঘরে তার মাঝামাঝি মানুষ-সমান উঁচু কাঠের পার্টিশন তুলিয়া দু-ভাগে ভাগ করিয়া ফেলা হইয়াছে, একভাগে জ্যোতির্ময় বসে, অন্যভাগে অনাথের বড়ো শালা কেষ্টবাবু। কেষ্টবাবুর কাজটা যে ঠিক কী, এত কাছাকাছি থাকিয়া এতদিনেও জ্যোতির্ময ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। এককালে স্বদেশি করিত, অনেকগুলি স্বদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ ছিল, সভা-সমিতি ও নেতাদের মজলিশে সব সময়েই প্রায় তাকে দেখা যাইত। কেবল জেলে যাওযার আশঙ্কা আছে এমন কোনো বিপজ্জনক সম্ভাবনাব সময় আর তার পাত্তা মিলিত না। প্রৌঢ় বয়সে বোধ হয কতকটা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ কবার পুরস্কাব স্বরূপ আর কতকটা অনাথের খাতিরে এখানে একটা চাকরি পাইয়া এখন একটু আরাম করিতেছে। শ্রোতা পাইলেই নিজের গৌববময় অতীত জীবনেব গল্প আরম্ভ কবে, সগর্বে বলে, ছেড়ে দিয়ে এলাম সাধে ? আব সইল না মশায়। ওবা সব কটা হামবড়া, কেবল দলাদলি আর নিজে কী কবে বড়ো হবে সেই চেষ্টা। চক্কোত্তিমশায়েব কথাই ঠিক, ওবাই দেশের সর্বনাশ করছে। শ্রোতা না পাইলে টেবিলের সামনে মুখ গম্ভীব করিয়া বসিয়া থাকে, মাঝে মাঝে ফোনটা তুলিয়া নিয়া কথা বলে, আর যখন তখন নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে একে ওকে ডাকিয়া অর্থহীন প্রশ্ন করে এবং উপদেশ ও ধমক দেয়। এইসব পরিশ্রমের কাজ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে সত্যপ্রিয়র দামি মোটব আপিসের সামনে আসিয়া দাঁড়ানোমাত্র তাকে ডাকিয়া দিবাব জন্য পিয়ন পাঁচুকে সতর্ক করিয়া দিয়া টেবিলে পা তুলিয়া একটু ঘুমায়।

ঘুমানোর আগে হয়তো জোর গলায় জিজ্ঞাসা করে, কী করছেন জ্যোতির্ময়বাবু ?

প্রুফ দেখছি।

চক্কোত্তিমশায়ের নতুন প্রবন্ধটার প্রুফ ? সংস্কৃত কোটেশনগুলি ভালো করে মিলিয়ে দেখবেন কিন্তু, অনেক খুঁজে পেতে বার করেছি।

জ্যোতির্ময় জবাব দেয় না। প্রবন্ধগুলিতে সংস্কৃত সাহিত্যে সত্যপ্রিয়র অগাধ পাণ্ডিত্যের যে পরিচয় থাকে, তার উৎস যে কেষ্টবাবু নয়, কেষ্টবাবু শুধু সত্যপ্রিয়র কোন বিষয়ে কী ধরনের শাস্ত্রীয়

বাক্য প্রয়োজন জানিয়া নিয়া কয়েকজন আসল পণ্ডিতের কাছ হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আনে, জ্যোতির্ময়ের তা জানা আছে। তবু মোটামুটি সংস্কৃত জানা থাকায় সংগ্রহের কাজটা কেষ্টবাবু করে এবং করিতে পারে বলিয়া লোকটার উপর জ্যোতির্ময় বড়োই ঈর্ষা বোধ করে।

পিছনের ঘরখানা খাতাপত্রের গুদাম। আপিসঘরে ঢুকিলেই জ্যোতির্ময় পুরানো কাগজের সোঁদা গন্ধ পায় : কয়েক বছর নাকে লাগিতে লাগিতে সবদিন গন্ধটা সে আজকাল সচেতনভাবে অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু অভ্যস্ত আবেষ্টনীর আরামটা সঙ্গে সঙ্গে বোধ করে। টেবিলের উপর বাঁধানো খাতা, ফাইল, কাগজপত্র, অভিধান পর্যায়ের কয়েকটি ইংবাজি বাংলা বই, কতকগুলি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা, আজের তারিখের সাত-আটখানা ইংরাজি বাংলা ছোটোবড়ো সংবাদপত্র, কাগজচাপার তলে কয়েকটি প্রুফ, কাঁচের দোয়াতদান, ব্লটিংপ্যাড, কলিংবেল, পিনকুশন এই সমস্ত খুঁটিনাটির অস্তিত্ব পর্যন্ত যেন চোখের পলকে অনুভব করিয়া সে খুশি হইয়া ওঠে।

নিজের রাজ্য পরিদর্শনরত রাজার মতোই তৃপ্তিভরা এক অপরূপ গাম্ভীর্য তার গোলগাল মুখখানিতে ফুটিয়া ওঠে। নূতন ও পুরাতন চেয়ারগুলি, এক কোণে বইভরা বুকশেলফ ও অন্য কোণে বাদামি কাগজে বাঁধানো পাহাড় সমান পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল—এ সমস্ত যে তাকে ঘিরিয়া আছে কাজ করিতে করিতেও সে যেন মাঝে মাঝে তা অনুভব করিতে পারে। কাজের সময় এবং অন্য সময়েও অনুভব করিতে পাবে না কেবল পার্টিশনটার ও-পাশে কেষ্টবাবুর অস্তিত্ব। বোধ হয় কেষ্টবাবুর উপর তার রাগ আছে বলিয়া।

নন্দকে জ্যোতির্ময় একটি চাকরি দিয়াছে, সত্যপ্রিয় মিলে ধর্মঘটের কিছুদিন পরেই। যশোদার আর ইচ্ছা ছিল না নন্দ এখানে চাকরি করে, ধর্মঘটের সঙ্গে সে যেভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিল তারপর তার ভাইকে এখানে চাকরি করিতে দেওয়াটা একটু খারাপ দেখায়। কিন্তু এদিকে ভাইটাও তার দিন দিন বড়োই বখাটে হইয়া যাইতেছে। গান বাজনা করিয়া আর তাস পিটাইয়া অলস বেকার জীবনযাপন করিতে করিতে অমানুষ হইয়া পড়িতেছে দিন দিন। যশোদার নিজের হাতে মানুষ করা ছেলে, সেই ছেলের চোখে কি না মাঝে মাঝে ধরা পড়িতেছে ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু চাউনি ! বারণ তাই যশোদা করে নাই। সত্যপ্রিয় মিলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া তো তার হয় নাই, এমন আর কী খাবাপ দেখাইবে তার ভাই সত্যপ্রিয়র আপিসে সামান্য মাহিনায় কাজ করিলে! বাস্তব জগতের সংস্পর্শে একটু আসুক নন্দ, নরম মনটা তার গলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, একটু শক্ত হোক।

একটা ছোটোখাটো দোকান করে দি, তাই চালা তুই নন্দ, কেমন ?

না দিদি। চাকরিই করি।

তা করবে না ? চাকরি ছাড়া আব কীইবা করবার ক্ষমতা তোমার আছে !

নন্দর কাজটা জ্যোতির্ময়কে সাহায্য করা। সহকারী সে নয়, সাহায্যকারী। নানা ঠিকানায় যে সব চিঠিপত্র পুস্তিকা প্রভৃতি যায় তার উপর ঠিকানা লেখা, কোথায় কী পাঠানো হইল সেটা খাতায় টুকিয়া রাখা, যেখানে জ্যোতির্ময়ের নিজে না গেলেও চলে অথচ পিয়ন পাঠানো যায় না সেখানে ছুটাছুটি করা, জ্যোতির্ময়ের প্রয়োজন মতো হাতের কাছে এটা ওটা আগাইয়া দেওয়া, এই ধরনের সব ছোটো ছোটো সাধারণ কাজ। এই কাজ পাইয়া নন্দ কিন্তু ভারী খুশি। সে চাকরি করে কেবল এই জন্যই তার গর্বের সীমা নাই, তার উপর জীবনের হঠাৎ একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কী একটা অজানা রহস্যময় জগতে সে আসিয়া পড়িয়াছে যেখানে চলাফেরা ওঠাবসা কথা বলা চুপ করিয়া থাকা সব কিছুরই নিয়ম নতুন !

এক কোণে ছোটো একটি টেবিল তার রাজ্য। জ্যোতির্ময়ের টেবিলের তুলনায় তার টেবিলটিকে অবশ্য দেখায় সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যের কাছে জংলি দেশের জমিদারির মতো, তবু মোটা মোটা খাতা, দোয়াতদান, ব্লটিংপ্যাড, পিনকুশন এ সব সম্পদপূর্ণ এমন একটি সম্পত্তিই বা নন্দের কবে ছিল।

অতি যত্নে নন্দ সব সাজাইয়া গুছাইয়া রাখে, মসৃণ ও সমতল করিয়া লাল নীল পেন্সিলের দুটি মুখ কাটে, লালকালির কলম ভুলিয়াও কখনও কালো কালিতে ডুবায় না, খাতার কাগজে লিখিবার সময় ধরিয়া ধরিয়া সাবধানে লেখে, খামে ভরিবার আগে প্রচারপত্রটির সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের লিখিত পত্রটি ক্লিপ দিয়া আঁটিবে না পিন দিয়া আঁটিবে এ কথাটি পর্যন্ত জ্যোতির্ময়কে জিজ্ঞাসা করিয়া নেয়। আর পরম উৎসাহে আপিসের নিয়মকানুন আয়ত্ত করার চেষ্টা করে।

জ্যোতির্ময় গম্ভীর মুখে বলে, অনাথবাবু ঘরে এলে উঠে দাঁড়িয়ো।

নন্দর মুখ ম্লান হইয়া যায়, ভয়ে ভয়ে বলে, উনি রাগ করেননি তো ? আর কে কে এলে উঠে দাঁড়াব ?

বলে দেবখন।

বাড়ি ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। তার শুকনো মুখ দেখিয়া যশোদা মনে মনে রাগ করিয়া ভাবে, সামান্য একটা চাকরির পরিশ্রম পর্যন্ত সইবার ক্ষমতা নেই শরীরে, কেন জন্মেছিলি তুই পৃথিবীতে ? ভাইকে সে দুধ খাওয়ায়, কলা খাওয়ায়, সন্দেশ খাওয়ায়—চাকরির শ্রমে ক্লান্ত শরীরটা যদি ভালো ভালো খাদ্য পাইয়া একটু পুষ্ট হইতে রাজি হয়। সন্ধ্যার সময় যশোদা রাঁধাবাড়া নিয়া ব্যস্ত থাকে, তখন অবসর হয় না, রাত্রে নন্দ চাকরির গল্প করে—সমস্ত দিনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের বিস্তারিত কাহিনি। নন্দর আনন্দ ও আগ্রহ যশোদাকে পীড়ন করে। শুনিতে শুনিতে মনে তার খটকা লাগে যে, চাকরি করিতে গিয়া বাস্তব জগতের সংস্পর্শে আসিয়া নন্দর মন শক্ত হইবে এ আশা বোধ হয় মিথ্যা। যে জগতে নন্দ মানুষ হইযাছে সেখানকার বাস্তবতা কী কম কঠোর, কম সর্বগ্রাসী ? তাই যদি নন্দকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া থাকে, সত্যপ্রিয়র আপিসের বাস্তবতা কি পারিবে ? এক একটা ছেলে বোধ হয় এইরকম বর্মপরা মন নিয়া জন্মায়, পৃথিবীর ধুলাকাদা সে মনের নাগাল পায় না। পাপ পর্যন্ত তারা করে পুণ্য করার মতো নির্দোষ আগ্রহের সঙ্গে। যে সব ছেলের সঙ্গে নন্দ এতকাল আড্ডা দিত, এখনও সকাল সন্ধ্যায় দিতেছে, তাদের কাছে বখামি পাকামি শিখিতে কি কিছু তার বাকি আছে ? কিন্তু কী কাজে লাগিয়াছে তার ও সব শিক্ষা ? ছেলেমানুষি ঘোচে নাই, মন পাকে নাই, কয়েকটা কেবল বিকার জন্মিয়াছে মনের, কদর্য এবং কুৎসিত। বসিয়া বসিয়া স্বপ্ন দেখার তাতে তার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। খারাপ দিকেও কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়া নন্দর মনটা যদি একটু শক্ত হইত, শিশু ভিখারি আর কিশোরী মেয়ের মতো ভয়, লজ্জা, অভিমান, বিনয়, নির্ভরশীলতা, সংকোচ, স্বপ্ন দেখা এ সব যদি একটু কমিত, বাঁচিয়া থাকাই যে একটা ভীষণ লড়াই এ বিষয়ে সামান্য একটু জ্ঞান জন্মিয়া ভাবপ্রবণতাটা খানিকটা নিস্তেজ হইয়া আসিত, তাতেও বোধ হয় খুশি হইত।

একদিন সত্যপ্রিয় মহাসমারোহে বাপের বার্ষিক শ্রাদ্ধের আয়োজন করিয়াছে, রাজ্যের লোককে আহারের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, একদলকে মধ্যাহ্নে আর একদলকে রাত্রে। আপিসের সকলে রাত্রে সত্যপ্রিয়র বাড়ি খাইতে যাইবে। হঠাৎ দুপুরবেলা সত্যপ্রিয় আপিসে আসিয়া হাজির। কেউ স্বপ্নেও ভাবে নাই সেদিন সে আপিসে আসিবে। সকলেই কমবেশি গা এলাইয়া দিয়াছিল—কেরানিরা পর্যন্ত। কেরানিদের সঙ্গে সত্যপ্রিয়র এক রকম কোনো সম্পর্কই নাই, তাদের উপর অনেক উপরওয়ালা আছে, অন্যদিন যারা তাদের এক মুহূর্তের জন্য ঘাড় তুলিতে দেয় না। সত্যপ্রিয় না আসিলেও তাদের কাজে ঢিল পড়িবার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু কেবল একজনের কড়াকড়িতে যেখানে নিয়মতান্ত্রিকতা জেলখানার অত্যাচার হইয়া দাঁড়ায়, একটি মাত্র স্ক্রু আঁট থাকিলে যেখানে সংগঠন খাড়া থাকে, সেই একজনের অভাবে স্ক্রুতে ঢিল পড়িলেই নিয়ম শিথিল হয়, সংগঠনে আলগা পড়ে। অন্যদিন সত্যপ্রিয় না আসিলেও কিছু আসিয়া যায় না, তার আসিবার সম্ভাবনাতেই যথারীতি কাজ চলিতে থাকে। কিন্তু আজ সত্যপ্রিয়র আবির্ভাব এক রকম অসম্ভব জানা থাকায় কাজে কারও মন

নাই, মাস্টার আসিবে না জানিয়া স্কুলের ছেলেদের যেমন হয় সকলের মনে সেই রকম একটা মুক্তির আনন্দ আসিয়াছে, উপরওয়ালারাও হঠাৎ বিস্ময়কর উদারতার সঙ্গে কেরানিদের অনেকটা রেহাই দিয়াছে, ধমক দিবার পরিশ্রমটুকুও তারা আজ করিতে নারাজ। অনাথ ও আরও তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সিঁড়ির ঠিক পাশের ঘরে দরোয়ানকে দিয়া দরোয়ানের শিলনোড়াতেই সিদ্ধি বাটাইতেছে, আপিসের দলাদলিতে এরা অনাথের দল। অন্যঘরে উপরওয়ালাদের আরেকটি দলের গোপন পরামর্শের আসর বসিয়াছে, আলোচ্য বিষয়—আপিসের কূটনীতি এবং অনাথের প্রতিপত্তি ক্ষয় করিবার উপায় উদ্ভাবন। দুটি ছেলেমানুষ কেরানি বারান্দায় দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতে টানিতে গল্প করিতেছে। কর্মব্যস্ততার গুঞ্জনধ্বনির বদলে আজ আপিস জুড়িয়া উঠিয়াছে গল্পগুজবের চাপা কলরব। কয়েকজন বৃদ্ধ কর্মচারী শ্রান্ত চোখ বুজিয়া ঝিমাইতেছে আর পাঁচুকে যথারীতি সতর্ক করিয়া না দিয়া টেবিলে পা তুলিয়া দিয়া কেষ্টবাবু হইয়া পড়িয়াছে নিদ্রাগত।

সত্যপ্রিয়র দামি মোটরটি নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল, হাতির দাঁতের ছড়িটি হাতে করিয়া সত্যপ্রিয় নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। আপিসের আবহাওয়ায় যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহিয়া গেল। কী ভাগ্যে মোটর আসিয়া দাঁড়ানোমাত্র পাঁচুর চোখে পড়িয়াছিল, চাপা গলায় অনাথকে খবরটা দিয়াই সে উপরে ছুটিয়া গেল। তারপর চওড়া একটা কাগজের তলে চাপা পড়িয়া গেল শিলনোড়া, যুবক কেরানি দুটির হাতের সিগারেট পায়ের তলে পিষিয়া গিয়া হাতে দেখা দিল কলম, বৃদ্ধ কর্মচারী কজন চমকিয়া সজাগ হইয়া উঠিল, কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া কেষ্টবাবু পরীক্ষা করিতে লাগিল মোটা একটা হিসাবের খাতা ; আপিসটা হঠাৎ হইয়া গেল অস্বাভাবিক রকম স্তব্ধ। সত্যপ্রিয় মৃদু একটু হাসিল। এ রকম নিঃশব্দ পূজায় সে বড়ো তৃপ্তি পায়। এক একটি ঘরের সম্মুখ দিয়া সত্যপ্রিয় যায় আর ঘরের ভিতরের কর্মচারীরা তড়াক তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, সত্যপ্রিয় চাহিয়াও দেখে না। তবে এ ঘরে ঢুকিবামাত্র পার্টিশনের ওপারে কেষ্টবাবু যে লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়া চেয়ারটাই উলটাইয়া দিল, আর এপারে জ্যোতির্ময় ঘাড় গুঁজিয়া লিখিতেই লাগিল, এটা চাহিয়া দেখিল। একটু ক্ষণের জন্য মনে হইল, দেয়াল আর পার্টিশনের শেষপ্রান্তের কয়েক হাত ব্যবধানের মধ্যে দাঁড়াইয়া সত্যপ্রিয় ঠিক করিতে পারিতেছে না কার অংশে পদার্পণ করিবে। এ ধরনের সমস্যায় সত্যই সত্যপ্রিয়র বিরক্তিও জাগে, কৌতুকও বোধ হয়। ব্যাপারটা হাস্যকব বটে, কিন্তু তুচ্ছ নয়। যার অংশে পা দিবে সেটা হইবে তার সম্মান ও পুরস্কার, অন্যজনের পক্ষে যা তিরস্কারের সমান।

এদিকে আসুন কেষ্টবাবু, দুজনে জ্যোতির্ময়বাবুর অতিথি হওয়া যাক। কী লিখছেন জ্যোতির্ময়বাবু ?

মুখ তুলিয়া দেখিয়া জ্যোতির্ময়ও তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বসুন, বসুন। অত ফর্মালিটি করবেন না, এ যুগে এ সব ফর্মালিটি অচল, কী বলেন ?

বলিয়া নিজে সত্যপ্রিয় দাঁড়াইয়া থাকে, বসে না। হাসিমুখে উচ্চারিত সহজ সরল মন্তব্য আর প্রশ্নটি যে তার কতবড়ো ফাঁদ, সত্যপ্রিয়র কাছে যে অনেকদিন কাজ করে নাই, তার পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। সে দাঁড়াইয়া আছে, শুধু বসিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই জ্যোতির্ময় বসে কিনা হঠাৎ তাই পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সাধ হইয়াছে সত্যপ্রিয়র। কিন্তু ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনের পরীক্ষায় জ্যোতির্ময় কখনও ফেল করে না। সে ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। সত্যপ্রিয়র কথার ফাঁদের জবাবও তার জানা আছে—আজ্ঞে না, এটা ঠিক ফর্মালিটি নয়, আপিসের সুপিরিয়ার আপিসারের সামনে দাঁড়ানোই নিয়ম।

এই কথাগুলি জ্যোতির্ময় উচ্চারণ করিল বটে, কিন্তু বলিল কী শুধু এইটুকু ? কেবল সুপিরিয়র আপিসার বলিয়া দাঁড়ায়, আর কোনো কারণ নাই ? কত কারণ আছে আরও। সত্যপ্রিয় অসাধারণ

মানুষ, এ জগতে তার মতো মানুষ আর নাই, তার অতুলনীয় বিদ্যাবুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, কর্মশক্তি, নিষ্ঠা সমস্ত মিলিয়া জ্যোতির্ময়কে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে গদগদ করিয়া দিয়াছে, এইগুলিই আসল কারণ। তবে এ সব কথা মুখে বলিতে নাই, নির্জলা স্তোকবাক্যের মতো শোনায়, এ রকম সস্তা মোসাহেবি সত্যপ্রিয়র ভালো লাগে না। না বলিয়াও এই কথাগুলি বলিবার একটা কায়দা আছে, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, মুখের ভাবে, চোখের দৃষ্টিতে, বলার ধরনে কথাগুলি নেপথ্যে থাকিয়াও সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করে। কায়দাটা আয়ত্ত করিতে একটু সময় লাগে, কিন্তু তারপর আর বিশেষ অসুবিধা হয় না। মনের কথা বলাও হইয়াছে, সত্যপ্রিয়র শোনাও হইয়াছে, টের পাইয়া তখন বড়োই আনন্দ হয়। সরব পূজাও অবশ্য আছে সত্যপ্রিয়র, কিন্তু নীরব পূজা যখন জানাইয়া দেয় পূজা যথাস্থানে পৌঁছিয়াছে, তখন প্রায় পুলকের শিহরনের সঙ্গেই মনে হয়, দেবতার সঙ্গে যেন রীতিমতো একটা সম্পর্কই স্থাপিত হইয়া গেল।

কেষ্টবাবুর পূজাটা প্রধানত সরব, জ্যোতির্ময়ের নীরব পূজার মতো মার্জিতও নয়, সরসও নয়। কেষ্টবাবুর ঈর্ষাতুর মুখের দিকে এক নজর চাহিয়া জ্যোতির্ময়ের পূজায় পরিতৃপ্ত দেবতা উপবেশন করে। তারপর অনাথ আসিয়া জোটে। নিজের ঘরে না গিয়া সত্যপ্রিয় জ্যোতির্ময়ের ঘরে গিয়াছে টের পাইয়া আপিস পরিচালনায় যে কজন সত্যপ্রিয়র ডানহাত আর বাঁহাত তারাও আসিয়া জোটে। প্রথমে দাঁড়াইয়া থাকে, বসিতে বলিলে বসে। সত্যপ্রিয় কথা বলে এমনভাবে যেন এ আপিসটির সঙ্গে তার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নাই, সে কেবল একজন মাননীয় অতিথি, একটু বেড়াইতে আসিয়াছে, গল্পগুজব করিতে আসিয়াছে। বাহিরের লোকের মতোই এক সময় সে ভদ্রতার কুশল জিজ্ঞাসা করার মতো বলে, কাজকর্ম চলছে কেমন আপনাদের, ঠিকভাবে চলছে তো ? বলিয়া মুখটা এদিকের কাঁধের সান্নিধ্য হইতে ধীরে ধীরে ওদিকের কাঁধের কাছে লইয়া গিয়া নিজেই আবার বলে, একটু যেন ঢিল পড়েছে মনে হল। তা হোক, তা হোক, তাই স্বাভাবিক, মাঝে মাঝে হঠাৎ দু-একটা দিন এ রকম ঢিল পড়ে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্বাস্থ্য বজায় রেখে পাশ্চাত্য প্রথায় কাজ কবা কঠিন, মানুষকে একেবারে যন্ত্র বানিয়ে দিচ্ছে দিনকে দিন—স্বাস্থ্য, শান্তি সব রসাতলে গেল।

এই ভয়টাই সকলের মনে জাগিতেছিল। আজ যখন তার পিতৃশ্রাদ্ধ, কেহ কল্পনাও করিবে না সে আপিসে আসিবে, অতএব আজই একবার দেখিয়া আসা যাক কাজকর্ম কেমন চলিতেছে। সকলেই মুখ কাঁচুমাচু করিয়া ক্লিষ্ট হাসি হাসে। অনাথ বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু কাজে ঢিল পড়েছে আজ, কারও মন বসছে না কাজে। ও বেলা আপনাব ওখানে যাবার কথা ভেবে—

এখন ছুটি দিয়ে দিলে কেমন হয় অনাথ ?

জবাব দেওয়ার আগে অনাথ এক মুহূর্তের মধ্যে সত্যপ্রিয়র মুখের ভাবটি অধ্যয়ন করিয়া ফেলে, তারপর দৃঢ়স্বরে বলে, আজ্ঞে না, খেতে যাবে রাত্রে, এখন থেকে ছুটি কেন ?

সত্যপ্রিয় সকলের দিকে চাহিয়া বলে, দেখলেন আপনারা ? আপিসের ওপর এতটুকু জোরও আমার নেই, একদিন হাফ হলিডে দিতে চাইলে দিতে পারি না।

সত্যই যেন আপিসের উপর সত্যপ্রিয়র কিছুমাত্র জোর নাই, এইবকমভাবে সকলে নিঃশব্দে হাসিল। এভাবে হাসাই নিয়ম, কারণ এটা রসিকতা। ইচ্ছে করলে একদিন কেন, যতদিন খুশি আপিস ছুটি দিতে পারেন—এ ধরনের কোনো কথা বলা নিষেধ। কারণ, তাতে দিনকে রাত বলিয়া যে রসিকতা করা হইয়াছে তার জোর কমিয়া যায়। সত্যপ্রিয় সাধারণভাবেই কথা বলিয়া যায়, রাগ করিয়াছে কিনা বোঝা যায় না, কিন্তু আপিসের কাজে শৈথিল্য দেখিয়া যে খুশি হয় নাই, সেটা টের পাইতে কারও বাকি থাকে না। খুশি না হওয়ার মধ্যেই এ ব্যাপারের শেষ নয়, বেতনভোগী কর্মচারীদের সম্বন্ধে অমন নিষ্ক্রিয় খুশি-অখুশির ধার সত্যপ্রিয় ধারে না। কিছু একটা ঘটিবেই। হয়তো সপ্তাহ কাটিবে, মাস কাটিবে, আজিকার আকস্মিক আপিস পরিদর্শনের কথা সত্যপ্রিয়র মনে আছে

কিনা টেরও পাওয়া যাইবে না। হঠাৎ একদিন কয়েকটা পরিবর্তন কয়েকটা নূতন নিয়ম বিনা সমারোহে চালু হইয়া যাইবে। কিন্তু কী পরিবর্তন ? কী নিয়ম ?

কিছুক্ষণ পরে সত্যপ্রিয় উঠিল। বুকশেলফের আড়ালে আধ-ঢাকা নন্দর দিকে কখন চোখ পড়িয়াছিল কেউ জানে না, উঠিয়া দাঁড়াইয়াই কিন্তু জিজ্ঞাসা করিল, ছেলেটি কে জ্যোতির্ময়বাবু ?

জ্যোতির্ময়ও এই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। একজন হেলপার নিতে বলেছিলেন, ওই ছেলেটিকে নিয়েছি। নন্দ এদিকে এসো। এঁকে প্রণাম করো।

ঝুঁকিয়া পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করবার সময় মনে হইল নন্দর শিরদাঁড়াটা বুঝি জামা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিবে, আশীর্বাদ করার ছলে সত্যপ্রিয় আলগোছে তারই উপরে একটু হাত বুলাইয়া দিল। হঠাৎ-জাগা ছেলেমানুষি খেয়ালের হাত হইতে মানুষ হইয়া কে রেহাই পায় ? সংযমের জন্য সময় পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

বোধ হয় নিজের এই আকস্মিক ও অকারণ দুর্বলতার কাছে হার মানার জন্যই নন্দর স্বাস্থ্যের শোচনীয় অভাবটা সত্যপ্রিয় ক্ষমা করিয়া ফেলিল। বোধ হয় আপিসের তুচ্ছতম কেরানিটিকেও সে তুচ্ছ করে না, ডানহাত বাঁহাতগুলিকে এটা বুঝাইয়া দিবার জন্যই বিদায় নেওয়া কয়েক মিনিট পিছাইয়াও দিল। নন্দকে জিজ্ঞাসা করিল দু-একটা কথা, উপদেশ ও উৎসাহ দিল যথেষ্ট, সামান্য অবস্থা হইতে মানুষ যে শুধু নিজের চেষ্টাতেই বড়ো হইতে পারে এই সুপ্রাচীন মিথ্যাটি কয়েকবার কয়েকভাবে নন্দর মাথায় ঢুকাইবার চেষ্টা করিল—সমস্তই স্নেহ ও শুভেচ্ছার সঙ্গে।

তারপর হঠাৎ সে যেন চিরকালের মতো বিদায় গ্রহণ করিতেছে, সকলের সঙ্গে এই তার শেষ দেখা এমনই উদাস ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, আচ্ছা যাওয়া যাক এবার, কাজ করুন আপনারা। যে সমস্যাতে আপনারা আমাকে ফেলে দিলেন মশায় ! মাঝে মাঝে দশজনকে ডেকে খাওয়াতে না পারলে তো আমি বাঁচব না মশায়, পয়সা যে রোজগার করছি দুটো, আর কীসে তার সার্থকতা বলুন ? কিন্তু আমার বাড়িতে নেমন্তন্ন থাকলেই যদি কাজে ঢিল পড়ে, তবে তো ভাবনার কথা ! পয়সাই যে রোজগার হবে না তা হলে, দশজনকে খাওয়াব কী !

সে চলিয়া গেলে সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। এ আপিসে সবচেয়ে বেশি মাহিনা পায় বীরেনবাবু নামে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সত্যপ্রিয়র সম্বন্ধে বেশি মাথা ঘামানোর বদলে কাজের দিকেই তার ঝোঁক বেশি। এক রকম তারই চেষ্টায় সত্যপ্রিয়র নূতন একটি ব্যবসায় এবং আপিসের নূতন একটি বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গড়িয়া তোলার কাজে সত্যপ্রিয়র সঙ্গে কয়েকবার তার মনোমালিন্যও হইয়া গিয়াছে ! সত্যপ্রিয় যে তাকে পছন্দ করে না, তাকে ছাড়া চলিবে না বলিয়াই যে টিকিয়া আছে, অনেকেই তা জানে। বীরেনবাবু সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিল, ভয় নেই, কেউ আপনারা জবাই হবেন না। উনি শুধু ওয়ার্নিং দিয়ে গেলেন। উনি কাউকে জবাই করেন না।

কথাটা সেই রাত্রেই প্রমাণ হইয়া গেল অদ্ভুতভাবে।

সত্যপ্রিয়র প্রকাণ্ড বাড়ির প্রকাণ্ড হল, বড়ো বড়ো তিনটি ঘর আর উপর ও নীচের লম্বাচওড়া বারান্দায় নিমন্ত্রিতেরা সারি সারি বসিয়া গিয়াছে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলাইয়া স্ফটিকের জপমালা হাতে করিয়া খড়ম পায়ে সত্যপ্রিয় একে একটু হাসি, ওকে দুটি কথা দিয়া কৃতার্থ করিয়া বিনয় ও ভদ্রতা রক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। পরিবেশন আরম্ভ হওয়ামাত্র হঠাৎ যেন একটা গুরুতর কথা মনে পড়িয়া গেল।

নন্দ সারাক্ষণ ছায়ার মতো জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল, হলঘরের একপ্রান্তে জ্যোতির্ময়ের কাছেই সে খাইতে বসিয়াছে। কাছে গিয়া সত্যপ্রিয় বলিল, ছি ছি, এঁকে এখানে বসালে কে ? ওঁর দিদি শুনলে রাগ করবেন যে ! তোমাদের কারও ঘটে একফোঁটা বুদ্ধি নেই ভূষণ—সকলকে কুশাসনে বসিয়েছ, পাতায় খাওয়াচ্ছ বলে এর বেলাও তাই করবে ? কার্পেটের আসন নিয়ে এসো একটা, আর রুপোর থালা গেলাস বাটি বার করে দিতে বলো।

পরিবেশন বন্ধ হইয়া রহিল, হলের একদিকে কয়েক হাত জায়গা খালি ছিল সেইখানে লাল ঘাসের মধ্যে সবুজ বাঘ আঁকা কার্পেটের আসন পাতা হইল, সত্যপ্রিয়র সবিনয় অনুরোধে ভীতসন্ত্রস্ত নন্দ পায়ে পায়ে উঠিয়া গিয়া আসনে বসিল। সামনে ঝকঝকে রুপোর থালা দেওয়া হইয়াছে, সাধারণ থালার তিনগুণ তার আকার।

তুমি শুধু এঁকে পরিবেশন করবে ভূষণ—আর কারও দিকে তোমার তাকাবার দরকার নেই।

ঘরের শ-দেড়েক মানুষের কারও মুখে কথা নাই। জ্যোতির্ময়ের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিহ্বল নন্দ এদিক-ওদিক তাকায়, মনে হয় বুঝি কাঁদিয়াই ফেলিবে। কাল সাহেবি পোশাকে যে সত্যপ্রিয়কে আপিসে দেখিয়াছিল, আজ বাড়িতে আধা-সাধকের বেশে সত্যপ্রিয়কে চেনা তার পক্ষে যেমন কঠিন, আজ দুপুরে আপিসে নন্দকে স্নেহকোমলকণ্ঠে আশীর্বাদ উপদেশ ও উৎসাহ দিতে যে দেখিয়াছিল, এখন বাড়িতে সেই নন্দকে এই অপরূপ উপায়ে পীড়নের আনন্দে মশগুল সত্যপ্রিয়কে চেনাও তার পক্ষে কম কঠিন নয়। সকলে বেতন পায় কাজের বদলে, সকলেই দাস। তাই ঘরভরা মানুষ স্তব্ধ হইয়া এখনকার সত্যপ্রিয়কে চিনিবার চেষ্টা করে।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন, পরিবেশন আরম্ভ করো ? আপনারা খান।

সরিয়া আসিয়া জ্যোতির্ময়কে উদ্দেশ করিয়া সত্যপ্রিয় বলে, সত্যি বলছি জ্যোতির্ময়বাবু, ওনার পরিচয় জানতাম না। এই খানিক আগে শুনলাম। তাই ত্রুটি হয়ে গেছে, যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে পারিনি।

জ্যোতির্ময় নীরবে লুচি ভাঙিয়া এক টুকবা লুচি আর কিছু বেগুন ভাজা মুখে তোলে। না জানিয়া সত্যই অপরাধ হইয়া গিয়াছে। যার প্ররোচনায় সত্যপ্রিয়র দুটি মিলে ধর্মঘট হইয়াছিল মাত্র কিছুদিন আগে, তার ভাইকে চাকরিটা দেওয়া উচিত হয় নাই।

সত্যপ্রিয়র সংযম আছে, কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে না—একমাত্র অর্থোপার্জনের বিষয়টি ছাড়া। নন্দর সামনে থালাবাটিতে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য জমিতে থাকে, নন্দ হাত গুটাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। কিন্তু সত্যপ্রিয় আব তার দিকে তাকায় না, আর কিছুই তাকে বলে না। আগের মতো একে একটু হাসি এবং ওকে দুটি কথা দিয়া বেতনভোগী অতিথিদের আপ্যায়ন করিতে থাকে।

বাড়ি ফিরিবার সময় জ্যোতির্ময় বলে, কাল থেকে তুমি আর আপিসে যেয়ো না ভাই। যদি পারি অন্য কোথাও তোমার একটা চাকরি করে দেব।

নন্দ চুপ করিয়া থাকে। জ্যোতির্ময় একটু সংকোচের সঙ্গে বলে, আমার কোনো দোষ নেই বুঝতে পারছ তো ? এক মাসের মাইনেটা তোমায় পাইয়ে দেব।

মাইনে চাইনে।

বিছানায় শুইয়া নন্দ আর সেদিন প্রতিদিনকার মতো ঘুমানোর আগে খানিকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে না, চুপচাপ শুইয়া থাকে। নিজের হাতে মানুষ করা ভাই সম্বন্ধে যশোদার অনুভূতি একটু বেশি রকম তীক্ষ্ণ। অন্ধকার ঘরে নন্দর অভ্যস্ত নড়ন-চড়নের সাড়া না পাইয়া সে ঘরের অন্যপ্রান্তের বিছানা হইতে জিজ্ঞাসা করে, ঘুমোলি নন্দ।

না, ঘুমোইনি।

নন্দ রাগ করিয়াছে ? কী হইল নন্দর ?· কী আবার হল তোর ?

সকলের সঙ্গে ঝগড়া করবে তুমি, আর চাকরি যাবে আমার। সর্বনাশ করে ছাড়বে তুমি আমার।

নন্দর উলটাপালটা কথা জোড়া দিয়া ঘটনাটা আগাগোড়া গঠন করিতে যশোদার একটু সময় লাগে। তখন সে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলে, আর তুই কী করলি ? ঘাড় হেঁট করে খেয়ে এলি পেট পুরে ? মরণ হয় না তোর নচ্ছার হারামজাদা ছেলে !

খেয়েছি নাকি আমি কিছু ?

খাসনি ? কিছু খাসনি ? বসেই বা রইলি কেন অমন অপমানের পর ? কার্পেটের আসন আর রুপোর থালাবাটি যখন আনতে বলল, গটগট করে উঠে চলে আসতে পারলি না তুই ? বলে আসতে পারলি না, তোমার মতো লোকের বাড়িতে আমি—

উঠিয়া আলো জ্বালিয়া : যাক গে মরুক গে। যা করেছিস, বেশ করেছিস। কী খেতে দি তোকে এখন আমি ! লুচি পোলাউ ফেলে এলি, ঘরে যা আছে তা কি তোর মুখে রুচবে ? দাঁড়া, আনিয়ে দিচ্ছি।

রাত তখন এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। সুধীরকে সঙ্গে নিয়া গিয়া সেই রাত্রে যশোদা তার শত্রু ও সখী কুমুদিনীকে ডাকিয়া তুলিয়া তার স্বামীর সাইকেলে সুধীরকে খাবার আনিতে পাঠাইয়া দিল। কুমুদিনীর স্বামীর টিফিন ক্যারিয়ারটিও সঙ্গে দিল।

যত শিগগির পারো ফিরে আসবে কিন্তু—জোরে জোরে চালিয়ে যাও।

একঘণ্টা পরে সুধীর ফিরিয়া আসিল। যশোদার ফরমাশ মতো সব জিনিস সে পায় নাই, তবে অনেক কিছুই আনিয়াছে। লুচি, তরকারি, ডাল, মাংস, ডিমভাজা, মামলেট, সাতরকম মিষ্টি, দই এবং রাবড়ি। রাগ ও ঝোঁকের মাথায় এতসব খাদ্য যশোদা আনিতে দিয়াছিল বটে, এতরাত্রে নন্দকে সব খাইতে দেওয়ার সাহস তার হইল না।

অর্ধেকের বেশি তুলিয়া রাখিল, বাকিটা ভাগ করিয়া দিল সুধীর আর নন্দকে।

পেট ভরেনি দিদি।

খুব ভরেছে, এবার ওঠো।

সন্দেশ দাও আর একটা।

উঁহু, যা খেয়েছ তাতেই তোমার অসুখ হয় কিনা দ্যাখো, আর সন্দেশ খায় না। ধনঞ্জয়ের কথা যশোদার মনে পড়িতেছিল। সমস্ত খাবারটাই তাকে নির্ভাবনায় দেওয়া চলিত, অসুখের কথা ভাবিতে হইত না। মানুষটা খাওয়ায় ছিল ভীম, হজমশক্তিতে অগস্ত্য। ভাবিতে ভাবিতে যশোদার মনে পড়ে যে, খাইয়া ধনঞ্জয়ের পেট ভরিত কিনা এ কথা তো একদিনও সে তাকে জিজ্ঞাসা করে নাই ! এ বাড়ির সকলেই যতক্ষণ ক্ষুধা না মেটে চাহিয়া যায়, এ বিষয়ে যে সংকোচ করিবার কিছু থাকিতে পারে কারও তা মনেও আসে না। কিন্তু ধনঞ্জয়ের মতো যে বেশি খায়, একজনে তিন-চারজনের ভাত, তার হয়তো একটু লজ্জা করিত বারবার চাহিয়া খাইতে। মোটামুটি আন্দাজ করিয়াই অবশ্য যশোদা তাকে সব দিত, তবু পরের পেটের খবর কি আন্দাজে লোকে সঠিক জানিতে পারে ?

এতরাত্রে হঠাৎ এত সব ভালো ভালো খাদ্য আনাইবার কারণটা জানিবার জন্য সুধীর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিয়া ভালো রকম জবাব পায় নাই। নন্দ শুইয়া পড়িলে যশোদা যখন ঘরে দরজা দিবার উপক্রম করিতেছে, তাকে বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া চুপিচুপি সুধীর আর একবার জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কী বলো তো চাঁদের মা ? এতরাত্রে খাবার আনালে, নিজে কিছু খেলে না, আমাদের খাইয়ে সব তুলে রাখলে ? যশোদা একটু হাসিয়া বলে, মাথাটা হঠাৎ বিগড়ে গেল কিনা—

সুধীর ভয় পাইয়া বলিল, মাথার অসুখ আছে নাকি তোমার।

নেই ? রাতদুপুরে যারা খালি খালি বাজে কথা শুধোয় একবার ছেড়ে দশবার, তাদের মাথাটা ছেঁচে ফেলতে সাধ যায় সুধীর। ভালোয় ভালোয় শুয়ে পড়ো গে যাও।

শুনিয়া সুধীর ক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া গেল। কী অকৃতজ্ঞ যশোদা ! এতরাত্রে প্রাণপণে সাইকেল চালাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে খাবারগুলি নিয়া আসিল, এত জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও খাবার আনিবার কারণটা তাকে কিছুতেই খুলিয়া বলিল না। ভালো ভালো জিনিসগুলি পেট পুরিয়া তাকে অবশ্য খাইতে দিয়াছে যশোদা, তবু—

পরদিন সকালে উঠিয়াই নন্দ ছুটিয়া গেল জ্যোতির্ময়ের বাড়ি।

আমার এক মাসের মাইনেটা পাইয়ে দেবেন তো ?

যশোদা নিজের হাতে মানুষ করিয়াছে বটে, কিন্তু কেবল একজন মানুষ তো আর একজনকে মানুষ করে না, আরও অনেক কিছু করে। দাবিটা অবশ্য নন্দের অন্যায় নয়, নিজের প্রাপ্য সে দাবি করিতে শিখিয়াছে জানিলে যশোদা খুশিই হইবে, কিন্তু এমন সসংকোচে ভিক্ষা চাওয়ার মতো দাবি করা কেন ? কাল রাত্রেই বেতনের যে টাকা কয়েকটা সে নিবে না বলিয়াছিল, সকাল হইতে সে টাকার উপর এত লোভ কেন, ফসকাইয়া যাওয়ার এত ভয় কেন ?

চার

বর্ষার পরে একদিন ধনঞ্জয় আসিয়া হাজির।

সেই রকম জামাকাপড়, সেই শতরঞ্জি মোড়া বিছানা আর রংচটা টিনের বাক্‌সো, কেবল আগের বারের চেয়ে ধনঞ্জয় নিজে একটু কাবু হইয়া পড়িয়াছে মনে হয়। এই শরীরে সামান্য জোয়ারভাটা ধরাই কঠিন, সুতরাং দেখিয়াই যখন টের পাওয়া যায়, ভাটাটা সম্ভবত বেশ একটু জোরালোই হইয়াছে।

যশোদা খুশি হইয়া বলিল, তুমি কোথা থেকে গো নবাবসায়েব ? এসো, এসো। বাড়ির আমার মান্যি বাড়ল।

ধনঞ্জয় একটা পিঁড়িতে বসিয়া বলিল, আবার ফিরে এলাম চাঁদের মা।

তা বেশ করেছ, ফিরে আসবে বইকী। সবাই আসছে, তুমি আসবে না কোন দুঃখে ?

বিকালে একটু অবসর পাইয়া কালো আসিয়া যশোদাকে তার দুঃখের কাহিনি শুনাইতেছিল। জগৎ বড়ো খারাপ ব্যবহার আরম্ভ করিযাছে তার সঙ্গে। আর সহ্য হয় না। কী রকম খারাপ ব্যবহাব ? খাইতে দেয় না ? মারে ? না, সে সব নয়, ভালো করিয়া কথা বলে না, বকে, খোঁটা দেয়, আরও কত কী করে ! নালিশ শুনিতে যশোদাব ভালো লাগে না, বিশেষত এইসব অভিমান আর ভাবপ্রবণতার নালিশ। তবু সে মন দিয়া শুনিবার চেষ্টা করিতেছিল আর কালোর কাঁদো কাঁদো মুখ দেখিয়া ভাবিতেছিল, এমনই নরম মন না হলে আর চাঁপা তোমায় কলতলায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, তুমি চুপ করে থাকো ! ধনঞ্জয় আসিবামাত্র কালোর কথা শুনিতে আর তার কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। দুঃখের কথা বলিতে না পাইয়া মনের দুঃখে কালো ঘরে ফিরিয়া গেল।

যশোদা ধনঞ্জয়ের খারাপ চেহারা আর সংকোচ লক্ষ করিতেছিল, কিন্তু অনর্থক মিষ্টিকথা বলা যশোদার ধাতে নাই।—কাজ করবার মন করে এসেছ তো এবার, না আবার লেজ গুটিয়ে পালাবে ?

না, কাজ করব। উপায় কী।

যশোদাও তো এই কথাই বলিয়া আসিয়াছে চিরকাল, কাজ যখন করিতেই হইবে কাজ না করিয়া উপায় কী ! দেশের জন্য মন অবশ্য কাঁদে, শহর আর শহরতলি ভালো অবশ্য লাগে না সকলের, কিন্তু এ সব মন-কাঁদা আর ভালো লাগা-না-লাগাকে প্রশ্রয় দিলে মানুষের চলিবে কেন ?

বেশ, থাকো এখানে, কাজ একটা জুটিয়ে দেবখন।

এখানে থাকার কথায় ধনঞ্জয়ের সংকোচ বাড়িয়া যায়, সে উশখুশ করিতে থাকে। যশোদা চিন্তিতভাবে বলিতে থাকে যে, কোন ঘরে ধনঞ্জয়কে থাকিতে দেওয়া যায় ? টিনের ঘরে তার জায়গাটা আবার বেদখল হইয়া গিয়াছে, সুধীর যে ঘরে থাকে সেখানে একজনের জায়গা হইতে পারে বটে, কিন্তু বড়োই ঘেঁষাঘেঁষি হইবে। তার চেয়ে—পাকা ঘরে জায়গা আছে, সেখানে থাকো না তুমি ? ভাড়া কিন্তু একটু বেশি।

ধনঞ্জয় বিপন্নভাবে ডান হাতের তালুটা হাঁটুতে ঘষিতে ঘষিতে বলে, আমি বলছিলাম কী, যদ্দিন কাজকম্ম না জোটে আমি বরং অন্য কোথাও—

এখানে থাকবে না ? বেশি ভাড়া না দিতে চাও—

বেশি ভাড়ার জন্যে নয়। মানে, কী জান চাঁদের মা, সঙ্গে এবার---

আর কিছু বলিতে হয় না, যশোদা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া বলে, অ ! পয়সা-কড়ি সঙ্গে নেই, ট্যাঁক এবার টিক্‌টিক্‌ করছে।—যশোদা হাসে, কোথায় থাকবে তবে ? মিনি পয়সায় থাকতে দেবে জানাশোনা আছে কেউ ?

ধনঞ্জয় ছেলেমানুষের মতো বিব্রত হইয়া পড়ে, গলাটা সাফ করিয়া বলে, কাজটা যদ্দিন না হয় এক রকম করে—

যশোদা গম্ভীর মুখে বলে, রাস্তায় ঘুরে ঘুবে কাটিয়ে দেবে আর কলের জল খেয়ে পেট ভরাবে। তাই করো গে যাও, আমার কাছে এসেছ কেন ? আমি কাজ জুটিয়ে দেব, সে পর্যন্ত আমার অন্ন খেতে মানে বাধবে—এমন যদি মানী দুর্যোধন তুমি রোজগার করতে বেরিয়েছ কেন ঘর থেকে ? বউয়ের আঁচল ধরে বসে থাকলেই পারতে ঘরে !

ধনঞ্জয় হঠাৎ গরম হইয়া বলিল, বউ কোথা যে বউয়ের খোঁটা দিচ্ছ ?

যশোদা আশ্চর্য হইয়া বলিল, বউ নেই তোমাব ? আরবাব যে বললে ছেলেমেয়ে আছে চারটি ?

ছেলেমেয়ে থাকিলেই যে বউ থাকিবে তার কী মানে আছে ? বউ মরিতে জানে না ? কেবল একটি নাকি, দুটি বউ মরিয়াছে ধনঞ্জয়ের। চারটি ছেলেমেয়েই তার প্রথম বউয়েব, পাঁচ নম্বব সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়া সে বউ মরিয়া যায় পাঁচবছর আগে। তারপব ধনঞ্জয় যাকে বিবাহ করিয়াছিল, প্রথম সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়া সেও মরিয়া গিয়াছে আজ প্রায় দু-বছর। সেই হইতে ধনঞ্জয়ের বৈরাগ্য আসিয়াছে, আর সে বিবাহ করিবে না।

আমার বউ বাঁচবে না চাঁদের মা, ছেলেমেয়ে হতে গেলেই মরে যাবে। মোদেব গাঁয়েব রাধাচরণ কবরেজ নিজে বলেছে। .

এক চড়ে মাথাটি ঘুরিয়ে দিতে পারনি তোমাদেব গাঁয়ের রাধাচরণ কবরেজের ? কথা শোন একবার !

দেহ বড়ো হইলে বুদ্ধি নাকি কম হয়। এই হিসাবে ধনঞ্জয়ের একফোঁটা বুদ্ধি থাকাও উচিত নয়। সে যেন তারই প্রমাণ দিবার জন্য বলে, না না, কথাটা সত্যি। তবে যদি তোমার মতো বড়োসড়ো কাউকে—

পাকা ঘরে ধনঞ্জয়ের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া রাত্রে রান্নাঘরে তাকে ডাকিয়া যশোদা তার দেশের গল্প শুনিতেছিল। উনানে মস্ত কড়াই চাপাইয়া সে তখন তেল গরম করিতেছে, ডাল সম্ভার দিবে। কী বলিতেছে খেয়াল করিয়াই ধনঞ্জয় সভয়ে থামিয়া গিযাছিল, কে জানে এবার যশোদা রাগের মাথায় কড়াইয়ের গরম তেলটাই তার গায়ে ঢালিযা দিবে কিনা ! কিন্তু যশোদা রাগিল না, প্রচণ্ড শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তাই করো তবে এবার, আমাকেই বিয়ে করে ফেলো। বলিয়া হাসি আর যশোদার থামে না। জগতে যত মানুষ প্রাপ্য হাসি প্রত্যাখ্যান করিয়া হাসে না, তাদের সকলের ভাগের হাসি যশোদা যেন একাই বেদখল করিয়াছে। হাসির শব্দে সুধীর আসিয়া রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইল, হাসির ধমক কিছুতেই সামলাইতে না পারিয়া কোনোমতে কড়াইটা নামাইয়া রাখিয়া যশোদা পালাইয়া গেল উঠানে।

উঠানে বড়ো তাড়াতাড়ি যশোদার হাসি থামিয়া গেল। এতটুকু উঠানে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া হাসা যশোদার পক্ষে অসম্ভব। এখানে দাঁড়াইলেই যেন চারিদিকের ঘরগুলি সরিয়া সরিয়া আসিয়া

তার হাসিকান্না চাপা দিবার চেষ্টা করে। ঘরে তো এ রকম হয় না ? এখানে তবু মাথার উপরে আকাশ আছে, ঘরে শিক বসানো জানালা ছাড়া কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই। হয়তো ঘরের পক্ষে খাঁচা হওয়াটাই স্বাভাবিক বলিয়া পীড়ন করে না, উঠান ফাঁকা হওয়া উচিত বলিয়া এখানকার সংকীর্ণতা বাগে পাইলেই যশোদার দম আটকাইয়া দিতে চায়।

বাপরে বাপ---কী হাসাতেই পারে লোকটা। দম আটকে মবলাম হাসতে হাসতে ! বলিয়া আব একটুও না হাসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া যশোদা আবার উনানে কড়াইটা চাপাইযা দেয। ভাবিতে থাকে যে, কী কুক্ষণে বেশি লোককে থাকতে দেবার জন্যে উঠানে ঘর তুলেছিলাম ! ঘর থেকে বেরিয়ে একটু হাঁপ ছাড়বার জায়গা নেই। এই কথা ভাবিযা মনে মনে আপশোশ কবিতে করিতে চাঁদের কথা মনে পড়িয়া যশোদাব বড়ো কষ্ট হয়। প্রবল বন্যাব মতো যেভাবে হাসি আসিয়াছিল, সেইভাবে পুত্রশোক ভিতব হইতে ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু এমন খাপছাড়া অদ্ভুত সংযম যশোদার যে, হাসি ঠেকাইতে না পারিলেও শোকটা অনায়াসে চাপিযা রাখিযা বান্না করিয়া যায়।

ধনঞ্জয়ের সঙ্গে এত হাসাহাসি সুধীরের ভালো লাগে নাই, একফাঁকে সে যশোদাকে জিজ্ঞাসা করে, ওকে যে দালান ঘবে থাকতে দিলে, ভাড়া দিতে পারবে ? মতি কী বলছিল জান, ওর একটি কানাকড়ি সম্বল নেই।

বেলের ইয়ার্ডে যশোদা সুধীরের একটি চাকরি করিয়া দিয়াছে। কাজটি ভালো, আগের চেয়ে সুধীরের উপার্জন বাড়িয়াছে। সুধীরেব গর্ব ও গৌরবের সীমা নাই।

যশোদা বলে, তোমাব সে কথা ভাববাব দবকার ? কাজকর্ম হলেই সম্বল হবে।

সুধীর সবজান্তার মতো হাসিয়া বলে, হচ্ছে ! কাজ করার মতলব ও সব লোকের থাকে ? রোজগার কবলেও একটি পযসা আদায় করতে পাববে ভেবেছ ? যদ্দিন পারে থেকে তোমার ঘাড়টি ভেঙে পালাবে।

যশোদা রাগিযা বলে, পালায় পালাবে, তোমাব কী ক্ষেতি হবে শুনি ? তোমবা বড়ো বাকি বেখেছ আমাব ঘাড় ভাঙতে ! কতগুনো টাকা পাব তোমার কাছে একবারটি মনে পড়ে ?

শুনিয়া অপমানে মুখ কালো কবিয়া সুধীব সবিযা যায়। শত্রু অকথ্য গাল দিলেও সুধীরের এ রকম অপমান বোধ হইত না, আপনজনেব মতো ভালো পবামর্শ দিতে আসিয়া এ রকম আঘাত খাইলে মানুষের সহ্য হয় ? মনে মনে গর্জাইতে গর্জাইতে সুধীর ভাবে কী, এ মাসের বেতনটা একবার হাতে পাইলে হয়, যশোদার একটি পয়সা বাকি রাখিবে না। কিন্তু একমাসের বেতনে তো কুলাইবে না ! যশোদার কাছে সে যে অনেক টাকা ধাবে ! যশোদাব পাওনাটা অবিলম্বে সংগ্রহ কবিয়া তার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবাব সুখটা অনুভব কবিবার আগ্রহে কত মতলবই যে সে মনে মনে ঠাওরাইতে থাকে। মানুষের পাওনা ফাঁকি দিবার মতলব ঠাওরানোই যার চিরদিনের অভ্যাস একেবারে উলটো ধরনেব ভাবনা ভাবিবার সময তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখে এমন একটা আশ্চর্য দুঃখের ছাপ পড়ে যে, দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়, মনে হয় এইমাত্র লোকটার কোনো আপনজন মরিয়া গেল নাকি ?

মানুষকে কাজ জুটাইয়া দিতে যশোদা বড়ো ওস্তাদ। অনেক বছর ধরিয়া ধীরে ধীরে আপনা হইতে অনেকগুলি ছোটোবড়ো কলকারখানার সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ গড়িয়া উঠিয়াছে, অনেক কারখানার ম্যানেজার হইতে সর্দার কুলি পর্যন্ত তাকে চেনে---চোখে না দেখিলেও নাম শুনিয়াছে। অনেক শ্রমিকের সঙ্গে যশোদার মুখোমুখি পরিচয় আছে, অনেকে তাকে কেবল দু-একবার চোখে দেখিয়াছে, অনেকে সহকর্মীদের মুখে তার নাম শুনিয়াছে। কার কাজ নাই, কার কাজ চাই, কে কাজের লোক, কে অকেজো, কোথায় কোন কারখানায় কী ধরনের লোক নেওয়া হইতেছে বা হইবে, এ সব খবর ঘরে বসিয়াই এত বেশি পাওয়া যায় যে খাতাপত্রের সাহায্য ছাড়া মনে রাখা অসম্ভব। কিন্তু

ও সব হিসাব রাখার বালাই যশোদার নাই, সেটা তার পেশাও নয় ! কোনো আদর্শ, উদ্দেশ্য বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করে নাই, শ্রমিক-জগতে আপনা হইতে তার একটা স্থান জুটিয়া গিয়াছে, প্রথমে খুবই সংকীর্ণ ছিল এখন পরিসর বাড়িয়াছে।

কিন্তু নিজের স্থানটির সীমা যশোদা কখনও অতিক্রম করে না, চেষ্টা করিয়া পরিসর বাড়াইবার চেষ্টাও করে না। যাদের সঙ্গে তার সংযোগ আছে, সোজাসুজি পরিচিত না হোক অন্তত পরিচিত কারও মধ্যস্থতায় যাদের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ একটা স্থাপিত হইয়াছে অথবা হয়, কেবল তাদের সম্বন্ধে যেসব খবর কানে আসে সেইগুলিই সে বাছিয়া বাছিয়া মনে রাখে। চেষ্টা করিয়া সে মনে রাখে তা নয়, মনে থাকিয়া যায়। হয়তো কানে আসিল ভারতলক্ষ্মী মিলের লুমে কাজ করিবার জন্য কয়েকজন লোক চাই ; সঙ্গে সঙ্গে ভারতলক্ষ্মী মিলের সহকারী ম্যানেজারের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না থাকিলেও লোকটি তাকে বড়ো বিশ্বাস করে, আজ পর্যন্ত যত লোককে সে পাঠাইয়াছে প্রত্যেককে ওখানে নেওয়া হইয়াছে ; সেই সঙ্গে যশোদার আরও মনে পড়িয়া গেল লুমে কাজ করিয়াছে এমন সাতজন বেকারকে সে জানে তাদের দুজন একেবারে অপদার্থ, দুজন সুবিধাজনক নয়, তিনজন ভালো। এক টুকরা কাগজ ছিঁড়িয়া পেন্সিল দিয়া যশোদা তখন আঁকাবাঁকা অক্ষরে সাত জনের নাম লেখে, তিনজনের নামের পর লেখে good, দুজনের নামের পরে লেখে not good, আর দুজনের নামের পর লেখে bad ; লিখিয়া not good ও bad চারজনকে একটু সুযোগ দিবার অনুরোধ করিতে গিয়া যশোদার ইংরাজি জ্ঞানে কুলায় না, চোখকান বুজিয়া বাংলাতেই অনুরোধটা জানায়, তারপর নিজের নাম স্বাক্ষর করে। অনুরোধটা কাকে করিতেছে, কী জন্য করিতেছে, সাতটি নাম ও নামের পাশের মন্তব্যের অর্থ কী এ সব কিছুই কাগজের টুকরাটি পড়িয়া বুঝিবার উপায় থাকে না, কিন্তু ভারতলক্ষ্মী মিলেরই একজন শ্রমিকের সঙ্গে সাতজন কর্মপ্রার্থীকে মিলে পাঠাইয়া দিলে সেখানকার গুজরাটি সহকারী ম্যানেজার জলের মতো সমস্ত পরিষ্কাব বুঝিযা ফেলে। কাগজের টুকরাটি যত্ন করিয়া রাখিয়া সাতজনকেই হয়তো কাজে লাগাইয়া দেয়, হয়তো পাঁচজনকে কাজে লাগাইয়া বাকি দুজনকে ফিরাইয়া দেয়।

যশোদার মতে যারা bad কাজ না পাইলে অথবা কাজ পাইয়া কিছুদিন পরে ববখাস্ত হইলে তারা যশোদার কাছে নালিশ জানাইতে আসে। যশোদা বলে, আমি কী করব ? কাজ জানো না, তার ওপর কাজে ফাঁকি দেবে, কে রাখবে তোমাদের ? তার চেয়ে এক কাজ কর না তোমরা, অন্যকাজে লেগে যাও। অন্য কাজে হয়তো তোমাদের মন বসবে।

তারা রাজি হয় না, কিছুতেই রাজি হয় না, রাগ করিয়া যশোদাকে প্রথমে কড়া কড়া কথা বলিয়া গাল দিবার উপক্রম করিয়াই যশোদার মুখ দেখিয়া থামিয়া যায়, তারপর একমাস কাটে, দু-মাস কাটে। মুখ কাচুমাচু করিয়া একদিন তারা আবার আসিয়া দাঁড়ায় যশোদার কাছে। কিছুদিন পরে হয়তো তাদের একজনকে দেখা যায় একটি আপিসের বারান্দায় বুকের কাছে লাল ওরফে অফিসের নামের সংকেত লেখা লম্বা কোট গায়ে চাপাইয়া কলিংবেলের টুং টুং আওয়াজের প্রতীক্ষায় টুলে বসিয়া ঢুলিতেছে। আর এক জনকে দেখা যায় পাড়ারই ডায়মন্ড রেস্টোরেন্টে (ডবল ডিমের মামলেট মাত্র ১৫ পয়সা) পাড়ার চা-প্রিয় ছেলেবুড়োকে চা সরবরাহ করিতেছে। মুখের উপর হইতে একটা পরদা যেন সরিয়া গিয়াছে দুজনেরই, জীবনযাপনে দুজনেই বেশ মশগুল।

যশোদা কী করিয়া টের পায় ভগবান জানেন, বোধ হয় অনেকদিন এদের সঙ্গে এদেরই এক জন হইয়া বাস করিতেছে বলিয়া, কয়েকজন অলস ও অকর্মণ্যকে কেবল জীবিকা অর্জনের ভিন্ন পথ ধরাইয়া সে কাজের মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। তার সখী কুমুদিনীর বাড়ির ঠিক পাশে নকড়ির ছিল কুঁড়ে, একমাসের বেশি নকড়ি কোথাও চাকরিতে টিকিয়া থাকিতে পারিত না, তার ছেলেমেয়ে বউয়ের সে কী দুর্দশা ! একবার যশোদার একখানা শাড়ি মাঝামাঝি ভাগ করিয়া নকড়ির বউ আর

মেয়ে তিনদিন ঘরের মধ্যে আটক থাকিবার পর বাহিরে আসিতে পারিয়াছিল। তারপর যশোদা নকড়ির তাড়িখানায় চাকরি করিয়া দিয়াছে, এবং জীবনযুদ্ধে এই চাকরির কর্মটি নকড়ির গায়ে যেন আঁটিয়া বসিয়া গিয়াছে, কোনোদিন খসিয়া পড়িবে না। আর সম্প্রতি নকড়ির বউ একখানা নতুন ডুরে শাড়ি পরিয়া সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া সকলকে দেখাইয়া বেড়াইয়াছে, যশোদাকে পর্যন্ত !

ধনঞ্জয়ের জন্য কাজ জোগাড় করিতে গিয়া যশোদা কিন্তু বিপদে পড়িয়া গেল। একেবারে আনাড়ি মানুষটা, কোনো কাজ জানে না, কাজ শিখিবার বয়সও চলিয়া গিয়াছে। গায়ে জোর আছে, মাথায় মোট বহা আর ঠেলাগাড়ি ঠেলার মতো যে সব কাজ শুধু গায়ে জোর থাকিলেই মোটামুটি করা যায়, সে সব কাজও লোকটা করিবে না—অপমান হইবে। সহ্যও বোধ হয় হইবে না, প্রকাণ্ড একটা দেহ থাকিলেই তো কষ্ট সহ্য করার শক্তি জন্মায় না। চাষবাসের কাজ জানে, কিন্তু এখানে চাষবাসের কাজ যশোদা কোথায় পাইবে !

নিজের হাতে চাষ করতে তো ? না অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিজে ফপরদালালি করতে ?

নিজে কিছু করতাম বইকী।

কিছু কিছু করতে !

সেটা যশোদা আগেই টের পাইয়াছিল, মানুষটা একটু আরামপ্রিয় অর্থাৎ সহজ ভাষায় কুড়ে। আরামপ্রিয় মানুষ না হইলে রাগ-অভিমান এমন প্রবল হয়, কথায় কথায় বোধ হয় অপমান ! নিখুঁত সৃষ্টি ভগবানের কুষ্ঠিতে নাই ভাবিয়া যশোদার বড়ো আপশোশ হয়। কী অপরূপ একটা শরীর ! ধরাবাঁধা কাজে অলস কিন্তু বাজে কাজে পরিশ্রম করিতে খুব পটু, পনেরো মাইল হাঁটিয়া বেড়াইয়া আসে, না বলিতেই বালতি বালতি জল তুলিয়া ছাতে বর্ষার শ্যাওলা সাফ করিয়া দেয়—রাত্রে চিত হইয়া শুইয়া শরৎকালের আকাশ দেখিবে ! দেহের গড়নটা তাই তার বিকৃত হয় নাই, কেবল ভালো করিয়া খাইতে না পাওয়াব জন্যই বোধ হয় একটু—ধনঞ্জয়ের সর্বাঙ্গে চোখ বুলাইয়া যশোদা আন্দাজ করিবার চেষ্টা করে ভালো করিয়া খাইতে না পাওয়ার জন্য কতটুকু ক্ষতি তার দেহের হইয়াছে, খাওয়া পাইলে আরও কতখানি পরিপুষ্ট দেখাইত তাকে।

কিন্তু কাজ ? উপার্জনের ব্যবস্থা ? বসাইয়া বসাইয়া লোকটাকে পেট ভরিয়া খাওয়াইলেই তো চলিবে না, যতই ভালো লাগুক ওব খাওয়া দেখিতে ! অনেক ভাবিয়া যশোদা একদিন বলিল, এক কাজ করো তুমি। সুধীরের সঙ্গে রেলের ইয়ার্ডে যাও, চার্দিন ঘুরেফিরে কাজকম্মো দ্যাখো গিয়ে, তারপর ওখানেই সুবিধামতো একটা কাজ তোমাকে জুটিয়ে দেব।

কাজ হবে কিনা না জেনে—

যশোদা জোর দিয়া বলিল, হবে। নইলে মিছিমিছি তোমায় পাঠাব, মাথা খারাপ নাকি আমার ? কাজ তুমি করতে পারবে কিনা সে হল ভিন্ন কথা।

ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যশোদা এইসব আলোচনা করে আর সুধীর এদিক হইতে ওদিক যাওয়ার সময় আর ওদিক হইতে এদিক আসার সময় তীব্রদৃষ্টিতে দুজনকে দেখিয়া যায়। গা জ্বালা করে সুধীরের। না খাইয়া কাজে গেলে ক্ষুধায় সে কষ্ট পাইবে বলিয়া এই যশোদাই কি একদিন তাকে খাওয়ার সুযোগ দিতে ছল করিয়া বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল? তার জন্য নিশ্চয় নয়, বুড়া মতির জন্য। বুড়ো মানুষকে যশোদা কষ্ট দিতে চায় নাই। তা ড়া, দুবেলা খাইতে দেওয়ার জন্য যশোদা টাকা নেয়, জোরজবরদস্তি করিয়া খাওয়া বন্ধ করিবার তার কী অধিকার আছে, তাতে গোলমাল হইতে পারে। এই সব ভাবিয়াই হয়তো যশোদা সেদিন ও রকম বুদ্ধি আঁটিয়া তাদের খাওযার সুযোগ দিয়াছিল, নিজেরও মান বাঁচাইয়াছিল। চালাক তো কম নয় যশোদা। অসুখের সময় সেবা করা ? জরিমানার টাকা দেওয়া ? এ সমস্তের চমৎকার ব্যাখ্যা সুধীর এখন আবিষ্কার করিতে থাকে। কী আর এমন সেবাটা যশোদা তার করিয়াছিল, ও রকম সে তো অসুখবিসুখের সময় সকলেই করে। যাদের কাছে

থাকা আর খাওয়ার জন্য টাকা নেয় দুবেলা রাঁধিয়া তাদের খাওয়ানোর মতো অসুখের সময় সেবা করাটাও তো যশোদার সাধারণ কর্তব্য।

জরিমানার টাকাটা যশোদা দিয়াছিল, নিছক তাকে হাতে রাখিবার জন্য। সে কাজের লোক, তার মতো কাজের লোক আর কটা আছে ? সে হাতে থাকিলে ধীরে ধীরে জরিমানার টাকাও আদায় হইয়া যাইবে, অন্যদিকেও অনেক সুবিধা হইবে, এইসব হিসাব করিয়াই যশোদা তার সেই উপকারটা করিয়াছিল সন্দেহ নাই। রেলের ইয়ার্ডে তাকে কাজটা জুটাইয়া দিয়া মাঝখান হইতে যশোদা কিছু টাকা মারিয়াছে কিনা তাই বা কে জানে !

সুধীর চিরকাল জানিয়া আসিয়াছে মানুষের চালচলনই এই রকম, এই ধরনের ব্যবহারই মানুষ মানুষের সঙ্গে করিয়া থাকে, অন্য সময় অন্য কারও সঙ্গে হইলে রাগ করার কিছু আছে বলিয়া সে ভাবিতে পারিত না। এখন যশোদার সম্বন্ধে একটির পর একটি পরিবর্তনশীল মানসিক ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া তার যেন ধাঁধা লাগিয়া যাইতে থাকে। অভিনব প্রত্যাশা ও প্রার্থনার মন্দিরে গোঁয়ারগোবিন্দরা চিরদিন হরিজনের মতো ভীরু, সংকোচ আর অস্বস্তিতে মৃতপ্রায়—যতদিন না ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া মনের সুখে মন্দিরটাই ভাঙিয়া চুরমার করিবার সুযোগ পায়।

কাজে যাওয়ার সময় ধনঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়া গিয়া চারিদিক দেখাইয়া শুনাইয়া দিবার প্রস্তাবে সে চোখে অন্ধকার দেখে।—আমার কাজটি ওকে দেবার মতলব করছ বুঝি ?

তোমার কাজটি ছাড়া জগতে আর কাজ নেই ?

শরৎকাল আসিবার পর অন্যান্য বছরের মতো এবারও চারিদিকে সকলের মধ্যে যশোদা একটা বিস্ময়কর মানসিক উদ্‌বেগ লক্ষ করে। চাঁপা ও কালোর বিবাদ চরমে উঠিয়াছে, ঠেলাঠেলি ও গালাগালির বদলে চাঁপা এখন নিজে কালোর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে আর একদিকে জগৎকে দিয়া তাকে পীড়ন করায় অন্যদিকে সকলের কাছে তার নামে অকথ্য কুৎসা রটায়। জগৎকে হারানোর ভয়ে ব্যাকুল হইবার কোনো কারণ ঘটে নাই, জগৎ নিজেও বরং বিবাহের দিনটি আগাইয়া আনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, তবু চাঁপার দুর্ভাবনার যেন সীমা নাই। তা ছাড়া, মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ অকারণে তার মুখে এমন একটা হতাশার ছাপ দেখা যায় যে, কালোর সম্বন্ধে তার বাড়াবাড়িটা একটু কমানোর জন্য তাকে ধমক দিবে ভাবিয়াও যশোদা ধমক দিতে পারে না।

পরেশকে একদিন পুলিশ ধরিয়া নিয়া যায়।

এতকালের মধ্যে এই দ্বিতীয়বার চুরির জন্য যশোদার ভাড়াটে পুলিশের হাতে পড়িল। যশোদার মনটা বড়োই খারাপ হইয়া যায়। পরেশকে চলিয়া যাইতে বলাই উচিত ছিল। আগে কোনোদিন চুরি করে নাই বা ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলে করিবে না, কিন্তু চুরি করা যে কোনোদিন এদের কারও পেশা ছিল না, রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া গোপন অভিযানে বাহির হইবার ত্রাস ও উত্তেজনার স্বাদ যে এরা কেউ পায় নাই, যশোদা তা জানে। পরেশের মতো সে সব মানুষের জাতই আলাদা, তাদের চিনিতেও যশোদার বিশেষ কষ্ট হয় না। তবু জানিয়া-বুঝিয়াও পরেশের সম্বন্ধে কেন যে মনের দুর্বলতা আসিয়াছিল !

পরেশের বউকে সে জিজ্ঞাসা করিল, এবার তুমি কী করবে ?

পরেশের বউ বলিল, কালীঘাটে আমার বাপের বাড়ি, আমায় যদি কালীঘাটে দিয়ে এসো যশোদাদিদি ?

কালীঘাটে তার বাবার বাড়ির ঠিকানা পরেশের বউ জানে না, কিন্তু মন্দিরের কাছে গেলে সেখান হইতে চিনিয়া যাইতে পারিবে। নন্দর সঙ্গে তাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে বলায় পরেশের বউ আপত্তি করিল, মিনতি করিয়া বলিল, না দিদি, পুরুষের সঙ্গে যাব না।

নন্দ তো ছেলেমানুষ, খোকার মা ?

হোক ছেলেমানুষ, পুরুষমানুস তো, নন্দর সঙ্গে তাকে যাইতে দেখিলেই তার বাবা সন্দেহ করিবে, পাড়া-প্রতিবেশী সন্দেহ কবিবে।

তুমি আমায় দিয়ে এসো দিদি, পায়ে পড়ি তোমার।

ধনঞ্জয়কে সঙ্গে করিয়া যশোদা পরেশের বউকে পরদিন সকালবেলা তাব বাপেব বাড়ি পৌঁছিয়া দিল। তারপর গেল মন্দিরে। এককালে এ অঞ্চলও নাকি শহরতলি ছিল। কবে ? যখন এখানে সবে শহরের পত্তন হইয়াছিল, তখন ?

ধনঞ্জয় মস্ত বিদ্বান, স্কুলে ইতিহাস পড়িয়া যত বড়ো শরীর প্রায় তত বড়ো ঐতিহাসিকে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, কলকাতা শহর যখন পত্তন হয়, সেই ইংরেজ আমলে, এটা তখন গাঁ ছিল।

সেই ইংবেজ আমল মানে ? এটা কোন আমল ?

ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে গো। ওই যে ভবানীপুর না, যেখানটা এখন আসল শহর, ওইখানটাও আগে শহরতলি ছিল, শ্যাল ডাকত দিনদুপুরে।

দুৎ !

দুৎ ? কেন, দুৎ কেন ? তিনটে গাঁ নিয়ে হল কলকাতা শহব, তাহলে একদিন ভবানীপুর কেন চৌরঙ্গিতেও তো শ্যাল ডাকতে পারত অনাযাসে, ওখানটা যখন গাঁ ছিল ?

কথাটা বিবেচনা করিয়া যশোদা বলিল, সে হিসাবে সব জাগাই তো এককালে গাঁ ছিল।

ধনঞ্জয় করুণার হাসি হাসিয়া বলিল, তা কেন হবে ? কলকাতা হল বাংলাব রাজধানী, ভাবতবর্ষের বাজধানী হল দিল্লি। কলকাতাব যখন চিহ্নও ছিল না তখনও দিল্লি শহর ছিল। এটা শহর নাকি ? এটা হল—এটা হল নরক। বাঙালিরা খুব বজ্জাত কিনা তাই ইংরেজরা তাদেব জন্যে এই নরক বানিয়েছে, কলকাতা শহব আছে বলেই তো বাঙালির এই দুর্দশা। ছেলেগুলো একবার কলকাতা আসে আব বিগড়ে যায়, আমাদের গাঁয়ে কত ছেলে অমন গেছে। একটা বছর তুমি কলকাতা থাক, বাস্ আর গাঁয়ে গিয়ে বাস করতে পাববে না। কলকাতাব মতো পাজি জায়গা আছে ! পেট ভরে মানুষ খেতে পর্যন্ত পায না বাছা তোমাদের কলকাতায়, হাঁ !

যশোদা ফোঁস করিয়া উঠিল, কেন, পেট ভবে খেতে পাই না তোমাকে ?

ধনঞ্জয় লজ্জিত হইয়া বলিল, আমার কথা বলছি নাকি ? যেমন ধব ওই খাবারের দোকানটা, চার আনার খাবার কেনো, একবারটি মুখে দিতে কুলোবে না।

ভারী খাইয়ে তুমি তাই বলছ। এক সের রসগোল্লা খেলে ঢেকুর তুলবে।

যশোদা আর একটু খোঁচাইতেই ধনঞ্জয় বাগ করিযা তার খাওয়ার শক্তির পরিচয় দিতে স্বীকার হইয়া গেল। পাঁচ টাকার একটা নোট সঙ্গে করিযা যশোদা বাহির হইয়াছিল, নতুবা সে এ পরীক্ষা দেওয়াব জন্য ধনঞ্জযকে খ্যাপাইযা তুলিত কিনা সন্দেহ। নিজেরও যশোদার ক্ষুধা পাইয়াছিল বইকী, ভালো খাবার খাইতে তার নিজেরও তলে তলে বেশ একটু লোভ ছিল বইকী। যশোদা ভাত খায় তার সবচেয়ে জোয়ান ভাড়াটেব তিনগুণ সেই জন্যই সে মাঝে মাঝে রীতিমতো সংকোচ বোধ করে, প্রাণ ভরিয়া ভালো খাবার খাওয়ার সাধটা তার সাধারণত চাপাই থাকে। আজ ধনঞ্জয়ের সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে পেট ভরিয়া খাবার খাইল—ধনঞ্জয়ের খাওয়ার পরিমাণটা তার চেয়েও বেশি, এই জন্য ধনঞ্জয়ের কাছে বসিয়া খাইতে তার লজ্জা করে না।

দুজনকে একত্র দেখিলেই লোকের একটু অবাক হইয়া চাহিয়া থাকার কথা, দোকানি সবিস্ময়ে দুজনের খাওয়া দেখিতে লাগিল। তারপর হাসিয়া ফেলিল।

চোখে পড়ায় ধনঞ্জয় রাগিয়া বলিল, হাসি কী জন্যে শুনি ?

যশোদা বলিল, আমাদের খাওয়া দেখে হাসছে আর কী।

দোকানির হাসি নিভিয়া গিয়াছিল, হাতজোড় করিয়া সে তাড়াতাড়ি বলিল, আজ্ঞে না গিন্নিমা, খাওয়া দেখে কী হাসতে পারি ! আপনারা খাবেন আজ্ঞে, তবে তো আমাদের দুটো পয়সা ! আপনাদের দেখে বড়ো আনন্দ হল কিনা মনে, তাই হাসলাম একটু মনের সুখে। আমার একটি দিদি আছে গিন্নিমা, আমার পিসতুতো দিদি, তেনাও আপনারই মতো আজ্ঞা।

যশোদা বলিল, বটে নাকি ?

দোকানি বলিল, আজ্ঞা। তবে তেনার বয়েসটা কিছু বেশি হবে, চুলে পাক ধরে গেছে। আমরা যাই, তা তামাশা করে বলেন কী যে গুরুজন আমি, আমায় পেন্নাম কর রসিক। যেই পেন্নাম করতে মাটিতে মাথা ঠেকাই, মাথার পরে পা-টি তুলে দেয়। বাস্ সব নড়নচড়ন বন্ধ। পা-টি না সরালে আর মাথাটি সরাবার জো নেই।

বেশ বুঝা যায় শেষটুকু বাড়ানো ও বানানো গল্প। যত শক্তিমতী পিসতুতো বোনই মাথায় পা রাখুক, মাথা নাড়ানো চলিবে না এত জোরে পায়ের চাপ দিয়া তামাশা করার শক্তি তার থাকিতে পারে না, কারণ মাথায় ও রকম চাপ পড়িলে ডাক্তার ডাকিবার দরকার হয়। রসিক কেবল রসালো খাবারের দোকান করে নাই, মানুষটাও সে রসিক বটে। যশোদার শুনিতে বেশ মজা লাগিতেছিল।

রসিক বলিল, কিন্তু হায় অদেষ্ট ! বোনাইটি আমার এই এইটুকুন মনিষ্যি—একটা বাচ্চা ছোকরার সমান। মা কালী আপনাদের কেমন সুন্দর মিল করেছেন দেখে তার কথাটা মনে পড়ল কিনা, তাই হাসছিলাম গিন্নিমা।

অনেক বেলা হইয়াছে, গঙ্গার ঘাটে বসিবার আর সময় ছিল না, তবু দুজনে একটু বসিল। খাওয়াটা বড়ো বেশি হইয়াছে। অনেক নারী-পুরুষ ঘাটে স্নান করিতেছে, লজ্জাটা নারী ও পুরুষ উভয়েরই কম, মানুষের যতটা থাকা দরকার প্রায় ততটুকু—দেখিলে কে বলিবে তারা শহর বা শহরতলির অধিবাসী, স্নানের সময় অন্তত স্বাভাবিকতার পবিত্রতাটুকু পাওয়ার জন্যই যেন তারা বাড়তি সভ্যতা ত্যাগ করিয়াছে।

আমি সত্যি হাতির মতো দেখতে; না ?

কই না, তুমি তো মোটা নও।

হাতি কী আর মোটা, হাতির চেহারাই হাতির মতো। কোত্থেকে যে হলাম এমন ! আমার বাপ-মা তো এমন ছিল না, আমার ভাইটা তো এমন নয়, বোন আছে একটা সে রীতিমতো সুন্দরী—হ্যাঁ, মাইরি বলছি তোমায়। বিশ্বাস হল না ?

ধনঞ্জয় কী একবার যশোদাকে বলিতে গেল, তুমিও রীতিমতো সুন্দরী ? কথাটা কেমন শোনাইত কে জানে, জীবনে প্রথম একজন মানুষের কাছে কথাটা শুনিতে যশোদার কেমন লাগিল তাই বা কে জানে ! কিন্তু ধনঞ্জয় কথাটা জোলো করিয়া ফেলিল এইভাবে যে, তুমিও তো খুব বেশি খারাপ নও।

খুব বেশি না হই—খারাপ তো ?

কে বললে খারাপ ?

যশোদা হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, তিনটি যুবতি তৈরি করা চলিত এতগুলি হাড়মাংসের পুতুলের মতো। একটু বুঝি বিশ্বাস তার হয় কথাটাকে, বড়ো সাধ কিনা বিশ্বাস করার। দেখিতে সে খারাপ নয় এ কথা বিশ্বাস করিবার সাধ ছিল নাকি যশোদার ? হয়তো ছিল এতদিন খেয়াল করিয়াও খেয়াল করে নাই, খেয়াল করিতে সাহস পায় নাই। ধনঞ্জয় তাকে স্পষ্ট সুন্দরী বলিলে সে বোধ হয় এই খেয়ালখুশির রসালো ফাঁদে পড়িত না, শুনিতে ভালো লাগা আলাদা কথা, সে মিঠা কথায় কাবু হওয়ার মানুষ যশোদা নয়, কিন্তু ধনঞ্জয় যেভাবে যা বলিয়াছে, সে কথাটা তো সত্য হওয়া আশ্চর্য নয়। তবু উঠিবার আগে ছড়া কাটিয়া রসিকতা করিতে যশোদা ছাড়িল না—

ছদ্মবেশী ভীমকে পেয়ে কীচক খুশি ভারী,
সৈরিন্ধ্রী লো ! এ জগতে তুমিই সেরা নারী।

ধনঞ্জয় রসিকতা না বুঝিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, আহা, কীচক তো ভীমকে আর দেখতে পায়নি চোখে, ভেবেছিল দ্রৌপদী বুঝি। আমি তো তোমায় চোখে দেখে বলছি, দেখতে তুমি খারাপ নও।

যশোদা হাসিয়া বলিল, আ মর ! এ দেখি কচি খোকার মতো অভিমান করে। তুমি কি বাবু কীচক, না আমি ছৈরিন্ধ্রী, যে গায়ে লাগল ?—নাও ইবারে বাড়ি চলো, যা রোদটা উঠেছে।

এদিকে পাড়ার দুজন স্ত্রীলোকের উপর রান্নার ভার দিয়া ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যশোদাকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া সুধীর চোখে অন্ধকার দেখিতে থাকে। কেন গেল যশোদা, কী দরকার ছিল যশোদার যাওয়ার ? যদি বা গেল, নন্দ থাকিতে ধনঞ্জয়ের সঙ্গেই বা গেল কেন ? সুধীরকে তো সে বলিতে পারিত, আমার সঙ্গে চলো সুধীর। একদিন না হয় সুধীর কাজে যাইত না।

নন্দ কীর্তন শিখিতে যাইতেছিল, তার কাছে সুধীর পরেশের বউয়ের বিবরণ এবং যশোদার কালীঘাট যাওয়ার প্রয়োজন খুঁটিয়া খুঁটিয়া জানিয়া একটু যেন শান্ত হইল মনটা। যশোদা বাধ্য হইয়া গিয়াছে। হয়তো সুধীরের কাজে যাওয়া হইবে না ভাবিয়াই বেকার ধনঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়া গিয়াছে। তবু, সব কথা একবার তো সে বলিতে পারিত যে, এখানে যাচ্ছি সুধীর, তোমার কাজ কামাই হবে তাই ধনঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়ে গেলাম !...এভাবে তাকে জানাইয়া যাওয়ার অর্থই যে তার অনুমতি নিয়া যশোদার কালীঘাটে যাওয়া এবং তার অনুমতি নিয়া যশোদার কোনো কাজ করার সঙ্গত বা অসঙ্গত কোনো কারণই থাকিতে পারে না, এ সব সুধীরের মাথায় আসে না। অত সব ভাবিবার জানিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা তো তার নাই। সে রাগ করিতে জানে, তাই সোজাসুজি যশোদার উপর রাগ করে।

তারপর সে ইয়ার্ডে যায় কাজ করিতে।

ওয়াগনে কুলিরা মাল বোঝাই দেয়, সুধীর সর্দারি করে। মাল তুলিতে একটু সাহায্য করে, কুলিদের তাড়া দেয়, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিড়ি টানে, হঠাৎ ওয়াগনের ভিতরে ঢুকিয়া একটা মাল এদিকে একটা মাল ওদিকে কয়েক ইঞ্চি সরাইয়া দেয়, থাকিয়া থাকিয়া বস্তাগুলি গোনে আর রাজেনকে জিজ্ঞাসা করে, কটা বস্তা যাবে বললেন আজ্ঞে এটাতে ?

রাজেন যশোদার সখী কুমুদিনীর স্বামী, রাজেনকে বলিয়াই যশোদা এখানে সুধীরের কাজ জুটাইয়া দিয়াছে। কুমুদিনী জানিলে অবশ্য যশোদার লোককে কাজ দেওয়ার সাহস রাজেনের হইত না, কিন্তু কুমুদিনী জানে না। যশোদাকে রাজেন পছন্দ করে, ভয় আর খাতিরও করে—কিন্তু সেটা কুমুদিনীর অজ্ঞাতই আছে। আড়ালে যাই বলুক দেখা হইলে কুমুদিনী সখীর মতো আলাপ করে যশোদার সঙ্গে, তখন তার কথা শুনিয়া আর মুখের ভাব দেখিয়া কে অনুমান করিবে যশোদাকে সে দু-চোখে দেখিতে পারে না, যশোদার নাম শুনিলেই তার মোটা শরীরের ঢিলা চামড়ায় জ্বালা ধরিয়া যায় ! যশোদার কাছে কোনো উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা ঘটিলে নির্বিবাদে সেটা আদায় করিয়া নিতেও কুমুদিনীকে কোনোদিন কুণ্ঠিত দেখা যায় নাই। উপকার পাওয়ার পরেই যশোদার নিন্দায় কুমুদিনী মুখর হইয়া উঠিলে রাজেন প্রায় নির্বিকারভাবেই স্ত্রীর কথাগুলি শুনিয়া যায়, মাঝে মাঝে সায় দিয়া বিস্ময় ও বিরাগের দু-একটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য হয়তো করে। কাঁচাপাকা চুলে ঢাকা মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলে, ছি ছি, ওকে আর বাড়িতে ঢুকতে দিয়ো না।

তারপর কাজে যাওয়ার সময় হয়তো যশোদার বাড়িতে একবার উঁকি দিয়া যায়, জীর্ণ শীর্ণ মুখের চামড়া কৌতুকের হাসিতে কুঁচকাইয়া কুমুদিনীর নিন্দাগুলি সব যশোদাকে শোনায়, বলে, শুনলে যশোদা, কী সব বলে তোমার নামে ?

যশোদা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলে, বলুক গে যাক, মরুক গে যাক, আজ তো নতুন নয়। ছেলেবেলা থেকে এমনি করে বলছে আমার নামে। তবে কী জান সরকারমশায়, আমার জন্যে এর সত্যি মায়া আছে। এমনি বলে মুখে, কিন্তু—

বাড়িতে যতই নিরীহ হইয়া থাক, যশোদার কাছে যতই কৌতুকের হাসি হাসুক, মেজাজ কিন্তু রাজেনের একেবারেই ঠান্ডা নয়। সুধীর কয়েকবার বোকার মতো প্রশ্ন করিলেই তার মেজাজ গরম হইয়া যায়।

মনে থাকে না তোর নচ্ছার ? কবার বলব ?

নাকের মাঝখানে আঁটা চশমার ভিতর দিয়া রাজেন হাতের খাতাটির বাদামি রঙের পাতায় চোখ বুলাইয়া বলে, তেইশটা।

জায়গা থাকবে।

থাকবে তো তোর কী ? তোর বাবার ওয়াগন ? নির্দোষ মন্তব্যের জবাবটা একটু কড়া হইয়া গিয়াছে ভাবিয়াই হয়তো রাজেন একটু মৃদু গলায় বলে, ছেচল্লিশটা বস্তা দুটো ওয়াগনে যাবে, তেইশ ভাগ হবে না রে পাঁঠা কোথাকার !

অ !—সুধীর তাড়াতাড়ি আর একবার ওয়াগনের ভিতরে গিয়া বস্তাগুলি গুনিয়া ফেলে। আরও কয়েকটি ওয়াগনে একই সময়ে মাল বোঝাই হইতেছিল। চটে মোড়া, কাঠের বাক্সে প্যাক করা, চৌকো গোল ছোটো বড়ো কত মাল এখানে আসিয়া জমা হইয়াছে, কাছে ও দূরে কত বিভিন্ন তাদের গন্তব্যস্থান। প্রতিদিন রাশি রাশি মাল বাহিরে চলিয়া যায়, কিন্তু শহরের মালের ভান্ডার যেন অফুরন্ত। কথাটা ভাবিতে গেলে মাঝে মাঝে বিব্রত হইয়া সুধীরকে মাথা চুলকাইতে হয়, ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মাল যে কেবল এখান হইতে বাহিরে চলিয়া যায় তা অবশ্য নয়, ধুঁকিতে ধুঁকিতে ইঞ্জিন যে লম্বা ওয়াগনের সারি বাহির হইতে টানিয়া আনে সেগুলিও মালে বোঝাই থাকে, কিন্তু যে মাল বাহিরে যায় তার সঙ্গে এই সব মালের তফাতটা অনায়াসেই সুধীর বুঝিতে পারে। একই বস্তা হয়তো ফিরিয়া আসে, ওয়াগনে তুলিবার সময় যে প্যাকিং কেসটির উপর সে পানের পিক ফেলিয়াছিল, কয়েকমাস পরে সেই প্যাকিং কেসটিই হয়তো অন্য এক ওয়াগন হইতে নামানো হয়, কিন্তু তবু সুধীর জানিতে পারে ভিতরের মাল বদলাইয়া গিয়াছে। কারণ—সুধীর এইভাবে মনের মধ্যে যুক্তি খাড়া করে—যে জিনিস এখান হইতে দুশো-তিনশো মাইল দূরে চালান গিয়াছিল সেই জিনিস কিছুকাল পরে আবার ফিরিয়া আসিবে কেন ? মানুষ তো পাগল নয় যে মিছিমিছি গাড়ি ভাড়া গুনিবে।

সুধীরের শ্লথ অপরিণত মস্তিষ্ককে এই শহরের মাল আনাগোনার ব্যাপারটার বিরাটত্ব সমুদ্র দর্শনার্থীর প্রথম সমুদ্র দর্শনের মতো একটা আয়ত্তাতীত বিস্ময় ও আনন্দে চিরদিন স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা আছে, ব্যাপক ও বিচিত্র। ভাবিতে গেলে তার মনে হয়, চিরটা জীবন সে বুঝি কেবল এই শহরের আমদানি-রপ্তানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজই করিয়া আসিয়াছে। জেটিতে সে কুলির কাজ করিয়াছে, চোখ মিটমিট করিতে করিতে চাহিয়া দেখিয়াছে, ক্রেনের সাহায্যে বিদেশি জাহাজে মাল ওঠানো-নামানোর সশব্দ প্রক্রিয়া, ছোটোবড়ো স্টিমার আর পানসি নৌকোয় নিজে সে তাড়াহুড়া হইচই করিয়া মাল বোঝাই দিয়াছে, মাল নামাইয়া নিয়াছে, শহরতলির খালগুলির দুপাশে গুদাম ও আড়তে কাজ করিবার সময় নৌকায় ধীরেসুস্থে মাল আনা-নেওয়া দেখিয়াছে ; রেলের ইয়ার্ডে কাজ করার সময় দেখিয়াছে, মালগাড়ির আশ্রয়ে মালের দুমুখি স্রোত আর কাজের অবসরে শহরতলির প্রধান পথের ধারে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে, মাল বোঝাই লরি ও গোরু মহিষের গাড়ির আনাগোনা, ঝাঁকা ও মোট মাথায় মানুষের যাতায়াত। বিদেশে কী যায় বিদেশ হইতে কী আসে, মফস্বলে কী যায়, মফস্বল হইতে কী আসে সে সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট আবছা ধারণা সুধীরের আছে।

ধারণাটি লইয়া সময়ে অসময়ে সে মনে মনে খেলা করে, সৃষ্টি করে অর্থহীন অবাস্তব কতগুলি সমস্যা এবং ভাবিতে ভাবিতে বিফল ও বিরক্ত হইয়া ওঠে। কত সমস্যাই যে মনে জাগে সুধীরের ! নদীটা যদি হঠাৎ মজিয়া যায়, জাহাজ স্টিমার নৌকার আনাগোনা যদি হইয়া যায় বন্ধ, কী হয় তাহা হইলে ? রেল কোম্পানি যদি হাঙ্গামা সহিতে নারাজ হইয়া একদিন বলিয়া বসে, 'ধুত্তোর' এবং বলিয়া রেলগাড়ির চলাচল বন্ধ করিয়া দেয়, কী হয় তাহা হইলে ? বাজার-গাড়িতে, লরিতে, মানুষের মাথায় শহরে মাছ তরকারি আসা বন্ধ হয়, শহরের লোকের মাছ তরকারি সংগ্রহ করিবার কী উপায় হইতে পারে ? এই রকম আরও কত দুর্ভাবনাই আসে সুধীরের মাথায়। পচা জিনিস সম্বন্ধে মাছি যতটুকু জানে ব্যাবসা বাণিজ্যের সঙ্গে এতকাল এতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বেচারি ব্যাপারটা ততটুকুও বোঝে না কিনা।

কাজে ফাঁকি দিলে যতটা না হয় সুধীরকে চিন্তিত দেখিলে রাজেন রাগিয়া আগুন হইয়া যায়।

তুই বড়ো বজ্জাত সুধীর, এক নম্বর বজ্জাত।

এত গরমে ক্রমাগত গালাগালি কাঁহাতক মানুষের সহ্য হয় ? সুধীরের রক্ত আর মাথা এক সঙ্গে গরম হইয়া ওঠে। মনে মনে রাজেনকে অকথ্য গালাগালি দিতে দিতে ওয়াগনের দরজা বন্ধ করিতে যায়। দরজা সিলমোহর করিতে হইবে, খড়ি দিয়া ওয়াগনের গায়ে সংকেত ও নির্দেশ লিখিতে হইবে, তারপর সরাইয়া দিতে হইবে পাশের লাইনে। প্রথম কাজ দুটি অন্যলোকের, শেষ কাজটা করিতে হইবে সুধীরকে। দরজা বন্ধ করিয়া সুধীর তীব্রদৃষ্টিতে রাজেনকে দেখিতে থাকে—শুকনো মোচার মতো শীর্ণ মুখ তুলিয়া রাজেন তার দিকে চাহিলেই সে মুখ ফিরাইয়া নিবে, সেটুকু বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সুধীরের আছে, কিন্তু যশোদার উপর নিরুপায় ক্রোধের জ্বালায় পেট ভরিয়া সুধীর খাইতে পারে নাই, যার চেয়ে তার রাগের বড়ো প্রমাণ বোধ হয় আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু কাজে আসিয়া সুধীর তার অতীত ও বর্তমান জীবনের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই সব কথাই ভাবে। কাজ যারা করে তাদের জীবনে এই জন্যই কি রোমান্স থাকে না ?

কাজে সুধীর ফাঁকি দেয় না কিন্তু তাকে কোনো ফাঁকে চিন্তিত মুখে বিড়ি টানিতে দেখিলে রাজেন বড়ো রাগিয়া যায়। নিজের জানা একটি লোক ছিল রাজেনের, এই কাজটা সে তাকে জুটাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল, যশোদার অনুরোধে সুধীরকে কাজটা জুটাইয়া দিতে হওয়ায় সুধীরের উপরেই বোধ হয় তার মেজাজটা একটু বিগড়াইয়া আছে।

এক নম্বর ফাঁকিবাজ তুমি সুধীর—এক নম্বর বজ্জাত।

সুধীরের রক্ত আর মাথা একসঙ্গে গরম হইয়া ওঠে। পেটটাও বুঝি তার ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, মাঝ-দুপুর পার হইয়া গিয়াছে। চোখ তুলিয়া চাহিয়া দ্যাখে, ধনঞ্জয় কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বিড়ির ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে রাজেনের গালাগালিতেই বোধ হয় আমোদ পাইয়া মুখে হাসিও ফুটাইয়াছে। শুকনো মোচার মতো শীর্ণকায় রাজেনের উপর যে রাগটা হইয়াছিল, সে রাগটা সুধীরের তাই গিয়া পড়ে দৈত্যের মতো বিশাল-দেহ মানুষটার ওপর। মনে মনে রাজেনের বদলে ধনঞ্জয়কে অকথ্য গালাগালি দিতে দিতে সে ওয়াগনের আরও কাছে সরিয়া যায়। ধনঞ্জয়কে সুধীর ভয় করে। ভূতপ্রেত দৈত্যদানার যে ভয় আচমকা ছোটো ছেলেদের ঘুম ভাঙাইয়া দেয়, অন্ধকারে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া যে ভয়ে ছোটো ছেলে থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদে। সেই সঙ্গে হিংসা তো আছেই। গত কয়েকদিনের মধ্যে যে হিংসার তীব্রতা মারাত্মক গোপন রোগের মতো ভিতরে ভিতরে একটা দুর্বোধ্য যাতনায় সুধীরকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

ধনঞ্জয় কাছে আগাইয়া আসে। কালীঘাট গেলাম ভাই যশোদার সঙ্গে—যা মিষ্টিটাই একপেট খাওয়ালে যশোদা। যত বলি আর খাব না, তত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খাওয়ায়, বলে, এই খাওয়ার ক্ষমতা

নিয়ে তোমার এত গব্বো ! আর কটা রসগোল্লা যদি না খাও তুমি, চাদ্দিকে তোমার নিন্দে রটিয়ে বেড়াব।—বাড়ি এসে ফের বলে কী, নাও চান করে, ভাত খেয়ে নাও চটপট, তারপর সুধীরের সঙ্গে কাজকম্ম দেখবে যাও।

সুধীর এখান হইতে ওখানে যায়, মাল গোনে, ওয়াগনের দরজা বন্ধ করে, কুলিদের সঙ্গে ঠেলিয়া এ লাইন হইতে ওয়াগন পাশের লাইনে সরাইয়া দেয়। এই সব গোলমালের মধ্যে যে ওয়াগনটির কিছুক্ষণের জন্য নড়িবার কথা ছিল না সেটাকে সুধীর কীভাবে কখন ঠেলিয়া দেয় আর কীভাবে ওয়াগনের চাকা ধনঞ্জয়ের একটি পায়ের উপর দিয়া চলিয়া যায় ঠিক মতো কেউ বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

হাসপাতালে যশোদার কাছে ধনঞ্জয় বলে, সরতে পেলাম কই ? পাশের লাইনে একটা ইঞ্জিন যাচ্ছিল তাই দেখছি, পাশ থেকে গাড়িটার ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম। লাইনের বাইরে পড়েছিলাম গো যশোদা, দুটো পা-ই যদি গুটিয়ে নিতাম তাড়াতাড়ি, হায় হায় ! কেমন যেন হকচকিয়ে গেলাম।

ধনঞ্জয় কাতরায় আর কাঁদে। এতবড়ো একটা দৈত্যের মতো মানুষের চোখ দিয়া জল পড়িতে দেখিয়া যশোদারও মনে হয়, একমাত্র চাঁদের শোকে দু-একটা দিন সে যা করিয়াছিল, আজ বুঝি তাই করিয়া বসিবে—সোজাসুজি কাঁদিয়া ফেলিবে। তবু সে জেরা করে।

একটা পা গুটিয়ে নিলে, আরেকটা নিলে না কেন ?

তা কি ধনঞ্জয় জানে ? অনেক ভাবিয়া সে আন্দাজে বলে, পড়বার সময় একটা পায়ে চোট লেগেছিল বলে বোধ হয়।

সেটা সম্ভব। যশোদা কয়েকবার যে প্রশ্ন করিয়াছে, আবার তাকে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু গাড়িটা ঠেলে দিলে কে ?

কে জানে। দু-একজন সুধীরের নাম করছিল, কিন্তু তারাও ঠিক দ্যাখেনি, জোর করে বলতে নারাজ।

কিন্তু সুধীর ওয়াগনটা ঠেলিয়া দিবে কেন ধনঞ্জয়ের গায়ের উপর ? দিলেও ইচ্ছা করিয়া নিশ্চয় দেয় নাই। ভ্রু কুঁচকাইয়া যশোদা ভাবিতে থাকে, তার মনের মধ্যে এই প্রশ্নটা বারবার জাগিতে থাকে যে, ধনঞ্জয়ের গায়ের উপর সুধীর ইচ্ছা করিয়া ওয়াগনটা ঠেলিয়া দিবে কেন ?

নন্দ বড়ো চমৎকার কীর্তন গাহিতে পারে। ছেলেবেলা হইতেই তার গানের দিকে ঝোঁক, গান শোনার সুযোগ পাইলে সে আর সব ভুলিয়া যাইত। এখনও ভুলিয়া যায়, গান শোনাব সময় আর নিজে গাওয়ার সময়। মাইলখানেক দূরে কদমতলার বিখ্যাত কীর্তনিয়া দীননাথ তাকে কীর্তন শিখাইয়াছে। শিক্ষা এখনও শেষ হইয়াছে বলা যায় না, তবে যেটুকু নন্দ শিখিয়াছে সাধারণ লোকের পক্ষে তাই যথেষ্ট, আর কিছু শিখাইবার মতো বিদ্যা গুরুরও তার আছে কিনা সন্দেহ। তবু নন্দ এখনও নিয়মিতভাবে শিখিতে যায়, দীননাথ যা শেখায় ব্যাকুল আগ্রহে তাই শেখে, মাঝে মাঝে দু-চারটাকা গুরুদক্ষিণা দেয়। কীর্তন দীননাথের জীবিকার উপায়ও বটে, জীবনের একমাত্র নেশাও বটে, এখন পর্যন্ত নন্দর এটা শুধু নেশা হইয়াই আছে। নন্দর ইচ্ছা শুধু কীর্তন করিয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিবে—কীর্তনের মতো আর কী আছে জগতে ? সোনার মতো নাম বলিয়া সুবর্ণ যার নাম, তার কথা অবশ্য আলাদা। তবে নন্দর কল্পনার চিরন্তনী রাধার সঙ্গে ভাবভঙ্গি চালচলন কোনোদিক দিয়াই সুবর্ণের মিল নাই বলিয়া নন্দর বড়ো আপশোশ। কথা সুর ভাব ও আবেগ এই সব নিয়া যে কীর্তন, নন্দর মনে সত্যসত্যই তার একটা মূর্তি আছে, কখনও স্পষ্ট দেখিতে পায় কখনও আবছা হইয়া যায় ; সুবর্ণের সঙ্গে কতকটা মিল আছে মূর্তিটির, কিন্তু সে মিল কোনো কাজের মিল নয়, তার কোনো দাম নাই। নন্দর রূপধরা কীর্তন বিজনে বসিয়া মালা গাঁথে, ফুলগাছের পাতাটি খসিয়া পড়ার শব্দে চকিত হইয়া ওঠে, উৎসুক চোখে চাহিয়া থাকে, চুল আর আঁচল উড়াইয়া যমুনা নামক

নদীর তীরে (শহরের কয়েক মাইল উজানে গঙ্গার ধারে নন্দর একটি চেনা স্থানের সঙ্গে যার আশ্চর্য মিল আছে) ছুটিয়া যায়, ধুলায় সোনার অঙ্গ লুটাইয়া কাঁদে, অভিমানে মুখভার করিয়া থাকে, আরও কত কী করে। সুবর্ণকে নন্দ কোনোদিন এ সব করিতে দেখে নাই।

মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দীননাথ দলবলসহ কীর্তন গাহিতে যায়, নন্দও সঙ্গে যায়। কোনোদিন গুরু আসর জমায়, কোনোদিন শিষ্য। সাধারণ জীবনে নন্দ ভীরু ও লাজুক, চোখ তুলিয়া লোকের সঙ্গে কথা বলিতে পারে না, কিন্তু কীর্তনের আসরে শ্রোতাদের মধ্যে আবেগ, রোমাঞ্চ ও শিহরন বিতরণ করার সময় তার সবটুকু আড়ষ্ট ভাব কাটিয়া যায়, লজ্জা ভয়ের চিহ্নও থাকে না। সর্বাঙ্গের ভাবভঙ্গির মধ্যে শব্দে যা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা গেল না, তারই অভিব্যক্তি দিবার চেষ্টাটা যেন আপনা হইতেই চলিতে থাকে। কীর্তনের কথায় হঠাৎ রাধিকার লজ্জা পাওয়ার সময় নন্দকে দেখিতে দেখিতে সত্যই মনে হয় ভিজা কাপড়ে পরপুরুষের সামনে পড়িয়া গৃহস্থ বধূ যেন নিজের মধ্যে নিজেই লুকাইতে চাহিতেছে, কাপড়টি এখানে ওখানে একটু টানিয়া না দিলেই নয়, কিন্তু আঁচলের তলা হইতে হাতটি বাহির করিতে যাওয়ায় হাতটিই তার লজ্জায় অবশ হইয়া গেল, মচকান ডালের মতো মরিয়াই গেল নাকি কে জানে!

কোনো কোনোদিন রাধার বিরহে কৃষ্ণের কী অবস্থা হইয়াছিল আত্মহারা হইয়া সকলকে তাই বুঝাইতে থাকে, শুনিতে শুনিতে দীননাথ কাঁদিয়া ফেলে। নন্দকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলে, আমি কী পারি? এমন কিশোর কোমল কণ্ঠ আমি কোথায় পাব? বিরহ যাতনায় শ্যামের যখন আমার চেতনা লোপ পেয়ে এসেছে, রাধার নাম নিতে নিতেই শেষ নিশ্বাস ফেলবেন ভেবে অস্ফুটস্বরে বলছেন রাধা রাধা, আর নিজের মুখে রাধার নাম শুনে দেহে যেন জীবন ফিরে আসছে—তখনকার সেই আকুল মিনতিভরা ডাক আমার এই কর্কশ কণ্ঠে আমি কেমন করে ফোটাবো গো।

সত্যসত্যই এমনিভাবে বলে দীননাথ, নাটকের পার্টের মতো আগে হইতে যেন মুখস্থ করা ছিল। আসরে যে আবহাওয়াটা তখন সৃষ্টি হইয়া আছে, শ্রোতারা যে রকম মুগ্ধ ও বিভোর হইয়া গিয়াছে, তাতে দীননাথের কথা ও কান্নায় সকলের চোখ সজল হইয়া আসে, অনেকে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চায়, কেউ কেউ কাঁদেও।

বড়ো আসরে অনেকক্ষণ জমজমাট কীর্তন করিয়া আসিবার পর দু-তিনদিন নন্দ হাসে না, কথা বলে না, খাইতে চায় না, নড়াচড়া করিতে চায় না, প্রাণহীন জড়পিণ্ডের মতো শুইয়া বসিয়া সময় কাটায়। যশোদা ভয়ে ভয়ে ভাবে যে, কী জানি কী হইবে এ রকম প্রচণ্ড ভাবাবেগ আর তার প্রতিক্রিয়া এই রোগদুর্বল ছেলেমানুষের কতদিন সহ্য হইবে? নন্দর কীর্তনের মোহ কাটাইতে কত চেষ্টাই যে যশোদা করিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। জোর করিয়া আটকাইয়া রাখিলে দিনদিন নন্দর ভাবপ্রবণতা আর অবরুদ্ধ উত্তেজনার চাঞ্চল্য এমনভাবে বাড়িয়া যাইতে থাকে যে, তাতেও যশোদা ভয় পাইয়া যায়।

এ কী অপদার্থ একটা জন্মিয়াছিল তার ভাই হইয়া? এর চেয়ে কোকেনখোর আফিমখোরেরাও ভালো, তারা কেবল নিজেদেরই সর্বনাশ করে, এ ছোঁড়া আরও কত ছেলেমেয়েকে গোল্লায় পাঠাইতেছে তার হিসাব নাই।

একদিন সত্যপ্রিয় নন্দর কীর্তন শুনিবার আগ্রহ জানাইয়া অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। অনুরোধটা আসিল জ্যোতির্ময়ের মারফতে। সেদিন পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে নন্দকে নিয়া একটু নির্দোষ পরিহাস করায় নন্দ যে রাগ করিয়া চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছে, এ কথা জানিয়া সত্যপ্রিয়র নাকি দুঃখের সীমা নাই। নন্দর জায়গায় অবশ্য আরেকজন লোক নেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সত্যপ্রিয় যত শীঘ্র সম্ভব নন্দকে আরেকটি চাকরি দিবে। আগামী রবিবার সত্যপ্রিয় বাড়িতে একটু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করিয়াছে, ওই দিন নন্দ যদি একটু কীর্তন করে তার বাড়িতে, আর যশোদা যদি দুটি শাকান্ন গ্রহণ

করে, সত্যপ্রিয় বড়োই বাধিত হইবে। বলিলেন, মিল আর শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলতে চান।

সত্যপ্রিয়র মিলে আবার একটা ধর্মঘটের গুজব চলিতেছিল, দু-চারজন পান্ডা আসিয়া যশোদার সঙ্গে দেখাও করিয়াছে। হঠাৎ নন্দ আর তাকে সত্যপ্রিয়র এতখানি খাতির করার কারণটা অনুমান করিতে যশোদার অবশ্য দেরি হইল না, তবু সে রাজি হইয়া গেল। এখন ধর্মঘট করার পক্ষপাতী সে নয়, মিলে কাজ খুব কম, এখন ধর্মঘট কবিয়া বিশেষ কিছু লাভ হইবে না। তাছাড়া ধর্মঘট হইবে কিনা তাও এখনও ঠিক নাই। এদিকে সত্যপ্রিয়কে শ্রমিকদের অনেকদিনের ন্যায়সঙ্গত দাবির কিছু কিছু অন্তত মিটাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করার যদি সুযোগ পাওয়া যায়, সেটা গ্রহণ করিতে দোষ কী ? লাভ হয়তো কিছুই হইবে না, তবু চেষ্টা করিতে দোষ নাই।

নন্দর কীর্তন করা সম্বন্ধেই কেবল যশোদাব মনটা খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। অনেক লোকের মধ্যে কীর্তন করিতে গেলেই নন্দর বড়ো বেশি উত্তেজনা হয়। কিন্তু বাধা দিযাই বা কী হইবে ? এখানে না হোক দুদিন পরে অন্য একটা বড়ো আসরে নন্দ কীর্তন কবিতে যাইবে—আধমরা হইয়া বাড়ি ফেরার আগে সে হয়তো জানিতেও পারিবে না নন্দ কীর্তন করিতে গিয়াছিল।

উপলক্ষ সামান্য, সত্যপ্রিযব পিতার মাসিক শ্রাদ্ধ। শোনা যায, জীবনের শেষ দশ বৎসর সত্যপ্রিয়র পিতা ছেলের মুখদর্শন করেন নাই, মুখদর্শন করিবার পর বাঁচিয়াছিলেন মোটে কযেক মাস। কেউ কেউ নেহাত তামাশা করিয়াই বলে বটে যে, সত্যপ্রিয় নিজের মুখটা না দেখাইলে বুড়া আরও কয়েকটা বছব হয়তো টিকিয়া যাইত। কিন্তু এ সব কথা সত্যপ্রিযর কানে যায় কিনা সন্দেহ, গেলেও পিতৃহত্যার পাপ মাথায় চাপিয়াছে এ ধরনের খুঁতখুঁতানিব জন্যই সে বার্ষিক বা মাসিক একটা শ্রাদ্ধও বাদ দেয় না, এ কথা মনে করার কোনো সংগত কারণ নাই।

জ্যোতির্ময় এবং তার বাড়ির মেয়েদেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। উপলক্ষ যত সামান্যই হোক, নিমন্ত্রিতের সংখ্যা শ-তিনেকের নীচে নামিবে না। সত্যপ্রিয়র বাড়িতে কোনো উপলক্ষে নিমন্ত্রিতেব সংখ্যা এর কম বড়ো একটা হয় না, কম করা চলে না। লোকে বলিবে কী ?

রবিবার সকালে জ্যোতির্ময় অপরাজিতাকে বলিল, কীর্তন যদি শুনতে চাও তিনটের আগে যেতে হবে, তা যদি না শোনো তাহলে সন্ধ্যার সময় গেলেই চলবে। আর শোনো, উনি যে নেকলেসটা দিয়েছিলেন বিয়ের সময়, সেটা পরে যেয়ো।

আমি যাব ?—অপরাজিতা বিবর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিল।

যাবে না ? ওঁর বাড়ি নেমন্তন্ন, এত কাছে থেকে না গেলে চলবে কেন ?

তবে অবশ্য কোনো কথা নাই, না গেলে যখন চলিবেই না তখন যাইতে হইবে বইকী।

না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম যাব কিনা। গভীর শ্রান্তিতে অপরাজিতার হাই ওঠে, আবার শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা হইতেছে।

নেকলেসটা কিন্তু পরা চলবে না।

জ্যোতির্ময় একটু হাসিয়া বলিল, কেন ? সাজবার সাধ নেই ? না না, পোরো নেকলেসটা, কর্তা দেখলে খুশি হবেন। চোখে অবশ্য ওঁর পড়বে কিনা সন্দেহ, তবু যদি সামনে পড়েন কখনও, প্রণাম করবার সময় পড়তে পারে চোখে। সামনে পড়লে প্রণাম কোরো কিন্তু পায়ে হাত দিয়ে।

নেকলেসটা কেমন কালো হয়ে গেছে, ও আর পরা যাবে না।

জ্যোতির্ময় আশ্চর্য হইয়া বলিল, কালো হয়ে গেছে মানে ? দেখি।

অপরাজিতা অপরাধীর মতো মখমলের কেসটা বাহির করিয়া আনে। কেসটি তেমনি উজ্জ্বল আছে, কিন্তু নেকলেসটির কেমন যেন জ্যোতি নাই। সোনাটা পিতলের মতো দেখাইতেছে, পাথর আর মুক্তাগুলি যেন কাচ আর পুঁতি।

কাউকে দেখাইনি অ্যাদ্দিন, লুকিয়ে রেখেছিলাম। তোমায় বলতেও কেমন—

জ্যোতির্ময় বিহ্বলের মতো চাহিয়াই থাকে। অপরাজিতা আবার বলে, আমাদেরই ভুল হয়েছিল, জিনিসটা নকল।

জ্যোতির্ময় যেন চোখে দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারে না, তাই কী হয়, উনি আসল জিনিস বলে নকল দেবেন ?

আসল জিনিস বলে তো দেননি।

জ্যোতির্ময় নেকলেসটা নাড়াচাড়া করিতে থাকে, তার মুখের খানিকটা জ্যোতিও যেন নিভিয়া গিয়াছে।

অপরাজিতা মিনতি করিয়া বলে, আচ্ছা, নাইবা গেলাম আমি ? শরীরটা একটু—

শুনিবামাত্র কী রাগটাই যে জ্যোতির্ময়ের হয় ! চোখ পাকাইয়া সে বলে, বড়ো ছোটো মন তো তোমার ? যদি দিয়েই থাকেন একটা নকল জিনিস, তাই বলে ওঁর বাড়ি যাবে না তুমি ? মাস গেলে উনি মাইনে দেন বলে দুবেলা পেট ভরছে সেটা খেয়াল আছে ?

অন্য কেউ হয়তো বলিত যে, একা সত্যপ্রিয় নয়, কাজ করিলে সকলেই মাস গেলে মাহিনা দিয়া থাকে, এটা এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া উদারতার পরিচয় নয়। অপরাজিতা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মখমলের কেসটা বন্ধ করিয়া তার হাতে দিয়া জ্যোতির্ময় বলিল, বাক্সে তুলে রেখে দাও, কেউ যেন না দ্যাখে। কাউকে বোলো না।

নেকলেসটা নকল বলিয়াই যেন জ্যোতির্ময় রাগ করিয়া বেলা একটা বাজিতে না বাজিতে গাড়ি আনিয়া সকলকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কেবল নিমন্ত্রণ রাখিতে যাওয়া নয়, এখন হইতে রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত অপরাজিতাকে সত্যপ্রিয়র বাড়িতে থাকিতে হইবে। যশোদার সরু গলির মুখে গাড়ি দাঁড় করাইয়া তাকে ডাকা হইল, কিন্তু যশোদার এখন গেলে চলিবে না, ও বেলার রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করিয়া যাইতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় যশোদা যখন সত্যপ্রিয়র বাড়িতে গেল, নীচের প্রকাণ্ড হল ঘরটিতে নন্দর কীর্তন চলিতেছে। হল ঘরটি পুরুষ শ্রোতায় ভরিয়া গিয়াছে, পাশের দুটি ঘরের বড়ো বড়ো চারটি দরজার কাছে মেয়েদের ভিড়। নন্দর কীর্তন শুনিবার লোভ যশোদার কম নয়, তবু সে না শুনিয়া এড়াইয়া চলিবার চেষ্টাই করে, পাড়ায় কোথাও নন্দর কীর্তন হইলেও সহজে যাইতে চায় না। সে ভাবিয়াছিল এতক্ষণে কীর্তন শেষ হইয়া গিয়াছে। একটি দরজার কাছে মেয়েদের মধ্যে বসিয়া কীর্তন শুনিতে শুনিতে সে ভাবিতে থাকে, আজ তো বিভোর হইয়া নন্দ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কীর্তন করিয়া চলিয়াছে, কাল তার কী অবস্থাটাই না জানি হইবে ! কিন্তু বেশিক্ষণ যশোদা এ সব দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিতে পারে না।

নন্দর কীর্তন শুনিতে শুনিতে যশোদারও মানসিক জগৎটা ধীরে ধীরে একেবারে বদলাইয়া যায়। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয়, বুকের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে আর যত সব আবোল-তাবোল খাপছাড়া কথা মনে আসে। নন্দ এদিকে নিজেই রাধা হইয়া তার কৃষ্ণের মতো কালো তমালকে কত যে মনের কথা বলে আর যশোদা এদিকে ভাবিতে থাকে যে ধনঞ্জয়টা সত্যই কী নিষ্ঠুর, এ জগতে কেবল সেই পারে যশোদাকে বুকে তুলিয়া লইতে কিন্তু একবারও কী সে বলিল, এসো যশোদা, আমার বুকে এসো ? যাইতে বলিলেই যে চলিয়া যায় সে কেমন ধারা প্রেমিক গো ! বলিয়া নন্দ এদিকে যত অনুযোগ করে, যশোদার তত মনে হয়, তাই তো বটে, ঠিক তো, সে কাছে ঘেঁষিতে দেয় না বলিয়া কাছে ঘেঁষিবে না, কেমনধারা মানুষ ধনঞ্জয় ?

তারপর একসময় সুবর্ণের দিকে চোখ পড়ায় যশোদা যেন চেতনা ফিরিয়া পায়, মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠে। মুখখানা লম্বাটে হইয়া গিয়াছে সুবর্ণের, ছোটো একটু হাঁ করিয়া আছে, দু-চোখ বড়ো

বড়ো করিয়া খোলা, কী একটা রোগের যন্ত্রণায় মেয়েটা যেন মুখ ভেংচি দিয়াছে। একটু আগে তার নিজের মুখভঙ্গিটা কী রকম হইয়াছিল কে জানে ! আর ধনঞ্জয়ও তো কাটা পা নিয়া পড়িয়া আছে হাসপাতালে।

জোর করিয়া যশোদা বাড়ির কথা ভাবিতে আরম্ভ করে, এ সব পাগলামিকে আর প্রশ্রয় দিবে না। সকাল সকাল সে রান্না সারিয়া রাখিয়া আসিয়াছে, ও বাড়ির নদেরচাঁদের বউকে পরিবেশন করিতে বলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু খাওয়ার সময় বোধ হয় গোলমাল বাধিবে, যা শয়তান তার বাড়ির লোকগুলি, হইচই এত ভালোবাসে ! এ সব কথা ভাবে বটে যশোদা, কিন্তু ভাবিতে যেন ভালো লাগে না, আবেগে ব্যাকুল হওয়ার জন্য মনটা আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে—ঘরবাড়ি, ভাড়াটে, ডালভাত পরিবেশন এ সমস্তের চিন্তায় রস কই, নেশার মতো রস ?

এদিকে কাশীবাবুর সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে সত্যপ্রিয় জ্যোতির্ময়কে জিজ্ঞাসা করিতেছিল যশোদা আসিয়াছে কিনা। যশোদার সম্বন্ধে আজ তার আগ্রহের সীমা নাই। কীর্তন শেষ হইবার পর যশোদাকে সঙ্গে করিয়া জ্যোতির্ময় দোতলার একপ্রান্তে একটি মাঝারি আকারের ঘরে নিয়া গেল। এটি সত্যপ্রিয়র অবসর যাপনের ঘর, একপাশে প্রায় চৌকির মতো সাদাসিদে ছোটো একটি খাটে বিছানা, একটি রিভলভিং বুকশেলফে কতগুলি বই আর মেঝেতে আসন করিয়া বসিয়া লিখিবার জন্য একটি ডেস্ক ছাড়া আর কোনো আসবাবের বালাই নাই। একটি চেয়ারও চোখে পড়ে না। বাড়ির অন্যান্য অংশে গৃহস্বামীর ঐশ্বর্যের নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন দুই চোখ ভরিয়া দেখিতে দেখিতে এ ঘরে আসিয়া ঢুকিলে মনে হয়, এখানে বুঝি কোনো সংসারবিরাগী নিস্পৃহ সন্ন্যাসী বাস করে। সত্যপ্রিয়র বেশ আর ঝকঝকে মেঝেতে তার বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া কথাটা আরও বেশি করিয়া মনে হয়।

সত্যপ্রিয়র বেশ দেখিয়া জ্যোতির্ময় পর্যন্ত আজ একটু অবাক হইয়া গেল। যশোদাকে ডাকিয়া আনিতে যাওয়ার সময় সত্যপ্রিয়র পরনে সাদা কাপড় ছিল, গায়ে জামা ছিল—দূরে কোথায় অসময়ে বাদলা দেখা দেওয়ায় শহরতলিতে শীতের আমেজ টের পাওয়া যাইতেছিল। এখন কিন্তু খালি গায়ে হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া সত্যপ্রিয় মেঝেতে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিযাছে, পরনের কাপড়খানা গরদের। কাঁধে মোটা পইতা, গলায় বুদ্রাক্ষের মালা, বাহুতে অনেকগুলি কবজ ও তাবিজ, কবজির কাছে স্ফটিকের জপমালা জড়ানো। মনটা হঠাৎ যেন কেমন করিয়া উঠিল জ্যোতির্ময়ের, সত্যপ্রিয় কি দর্শক অনুসারে বেশ বদলায় ? সত্যপ্রিয়কে নানা বেশে সে দেখিয়াছে, কোনোদিন হ্যাটকোট পরা খাঁটি সাহেবি পোশাক, কোনোদিন মাথায় টুপি, গায়ে লম্বা কোট খানিকটা—পশ্চিম ভারতীয়ের পোশাক, কোনোদিন মটকার পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি, কাঁধে ভাঁজ করা চাদর—বাঙালি পোশাক, কোনোদিন মাঝে মাঝে সত্যপ্রিয়র বেশে মুসলমান ভদ্রলোকের বেশের একটু ধাঁচ যে কী করিয়া আমদানি হয় জ্যোতির্ময় বলিতে পারে না। আজ হঠাৎ জ্যোতির্ময়ের মনে পড়িয়া গেল, যতবার সত্যপ্রিয়কে সে ভিন্ন ভিন্ন পোশাকে দেখিয়াছে তার প্রত্যেকবার বিশেষ প্রয়োজনে হয় ভিন্ন দেশীয় কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির তার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবার অথবা তার নিজের গিয়া দেখা করিবার কথা ছিল।

ঘরের রিক্ততা ও সত্যপ্রিয়র বেশ যশোদাকেও একটু কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল। মানুষটাকে প্রণাম করিবার কোনো সংকল্পই তার ছিল না, কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া প্রৌঢ় ও সাধুবেশধারী ব্রাহ্মণকে সে একেবারে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া ফেলিল, কারও বলিয়া দিবার দরকার হইল না—যশোদা, ইনিই তিনি, একে প্রণাম করো। দেখিয়া জ্যোতির্ময় ভাবিতে থাকে, এই জন্যই কি সত্যপ্রিয় তাড়াতাড়ি বেশ বদলাইয়াছে, যশোদার মনে শ্রদ্ধা জাগাইবার জন্য ? একটু পিছাইয়া আসিয়া মেঝেতে হাতের ভর দিয়া একটু কাত হইয়া যশোদা সসম্ভ্রমে বসে আর জ্যোতির্ময় মনের মধ্যে নকল নেকলেসের

দীপ জ্বালিয়া নতুন দৃষ্টিতে সত্যপ্রিয়কে দেখিতে থাকে। এ কী সম্ভব ? মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী দেখা করিতে আসিবে বলিয়া সত্যপ্রিয় ইচ্ছা করিয়া বেশের খানিকটা বাঙালিত্ব লোপ করিয়া দেয়, পুরোপুরি মাড়োয়ারি সাজে না সেটা মাড়োয়ারিরও দৃষ্টিকটু হইবে বলিয়া ? কেবল এইটুকু বেশ পরিবর্তন করে যার অলক্ষ্য প্রভাব আগন্তুকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হইতে তাকে সাহায্য করিবে, অজ্ঞাতসারে তার দৃষ্টিকে তৃপ্তি দিবে ?

আপনিও বসুন জ্যোতির্ময়বাবু।

জ্যোতির্ময় বসিলে সত্যপ্রিয় বলিল, তোমার ভাই বড়ো সুন্দর কীর্তন করে বাছা, শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছি। কিন্তু—তুমি প্রায় আমার মেয়ের বয়সিই হবে তোমায় বলতে দোষ নেই—ছেলেটির স্বাস্থ্য ভালো নয়।

মেয়ের বয়সি না হইলে নন্দর স্বাস্থ্য ভালো নয় এ কথাটা তাকে বলিলে কী দোষ হইত যশোদা বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু খুশি সে হয়।

আজ্ঞে হ্যাঁ, ওর জন্য মাঝে মাঝে বড়ো ভাবনা হয়।

বয়স বাড়লে হয়তো স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। পড়াশোনা কতদূর করেছে ?

প্রথম পাশের পরীক্ষায় ফেল করেছে।

বেশ, বেশ। পাশ করে তো সব রাজা হচ্ছে আজকাল। দেশের বেকার সমস্যা যে কী উৎকট হয়ে দাঁড়িয়েছে তা টের পাই বাছা আমরা, চাকরির জন্য রোজ দলে দলে ছেলেরা আসছে, তাদের দেখে কী দুঃখই যে হয়। আমার দেশের সোনার চাঁদেরা, দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসা, দুটি অন্নের জন্য তারা হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। সকলের আগে এখন আমাদের কী করা দরকার জানো বাছা, দেশের বেকার সমস্যা দূর করা। খেতেই যদি না পায় মানুষ তবে সে করবে কী, আগে পেটের ভাতের জোগাড় করে তবে না অন্য কথা ?—কথা বলিতে বলিতে সত্যপ্রিয় যশোদার মুখের ভাব-পরিবর্তন লক্ষ করিতে থাকে, পেটের ভাতের কথাটা যশোদার খুব প্রিয় বুঝিতে পারিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করে, কিন্তু দেশকে যারা চালায়, তারা কী তা বুঝতে পারে, না বুঝতে চায় ? সব ভেসে চলেছে স্রোতে, নাম চাই, হাততালি চাই। না, না, সবাই ফাঁকিবাজ আমি তা বলছি না বাছা, দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, এ রকম মহৎ লোক কী নেই দেশে, অনেক আছে—কিন্তু বলো তো বাছা, তুমিই বলো, চোখকান বুজে শুধু ত্যাগ করলেই কি কাজ হয় ? না খেয়ে যে মরতে বসেছে যথাসর্বস্ব বিক্রি করে, বিলেত থেকে দামি ওষুধ এনে খাওয়ালে সে কী বাঁচে। ইংরেজকে তাড়াও, ধর্মঘট কর, স্বাধীনতা চাই—এই সব বলে বাবুরা চেঁচাচ্ছেন, এদিকে দেশের চাষি-মজুররা খেতে পাচ্ছে না, ছেলেরা সব বেকার যন্ত্রণা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করছে—

প্রথমটা যশোদা একটু ভড়কাইয়া গিয়াছিল, এখন সামলাইয়া উঠিয়া গম্ভীর মুখে শুনিয়া যায়। মিলের কথা শান্তভাবে আলোচনা করিয়া মিলের শ্রমিকদের সম্বন্ধে কোনো অনুরোধ করিয়া যে লাভ হইবে না, বুঝিতে যশোদার আর বাকি থাকে না। ভদ্রলোক ভাবপ্রবণতা আনিয়াছে। আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, এ বর্ম ভেদ করিয়া শ্রমিকদের কাহিনি দিয়া তার মর্ম ভেদ করার ক্ষমতা কারও নাই। কথা বলিতে বলিতে আবেগের আতিশয্যে কারও মুখ দিয়া যখন থুতু ছুটিতে আরম্ভ করে, পরের কথায় সে তখন কান দেয় না।

একটু আত্মসংবরণ করিয়া সত্যপ্রিয় বলে, যাক, যাক। দেশের অবস্থা তোমারও অজানা নয়, আমারও অজানা নয়। তোমার ভাইকে একটি চাকরি দিতে হবে, না ? ছেলেমানুষ ঝোঁকের মাথায় কাজটা ছেড়ে দিল, নইলে ওই কাজেই ওর উন্নতি হত। বেশ কাজ করছিল ছেলেটি, না জ্যোতির্ময়বাবু ? তা, কয়েকটা মাস যাক এখন, ক-মাস পরে তোমার ভাইকে একটি ভালো চাকরি বোধ হয় দিতে পারব। আমার মিল দুটোতে ক-মাস পরে আগাগোড়া সংস্কার করব ভাবছি, নতুন

লোকজন নিয়ে কাজের ভালো ব্যবস্থা করে ফেলব। মিলের লোকেরাও নানারকম দাবিদাওয়া করছে, সে বিষয়েও একটু বিবেচনা করে দেখতে হবে।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছয়টা দরজার একটার দিকে পা বাড়াইয়া বলে, এবার সকলকে খেতে বসানো দরকার, দেখি গিয়ে কী ব্যবস্থা হল। দুটি শাকান্ন মুখে দিয়ে যেয়ো কিন্তু বাছা।

সত্যপ্রিয় চলিয়া গেলে জ্যোতির্ময় নেকলেসের কথা, সত্যপ্রিয়র বেশ পরিবর্তনের গোপন রহস্যের কথা, সব ভুলিয়া গিয়া প্রায় গদগদ কণ্ঠে বলিল, দেখলে চাঁদেব মা, শুনলে ? এমন মানুষ আর দেখেছ ?

যশোদা স্বীকার করিয়া বলিল, খানিক খানিক দেখেছি—এমন তুখোড় দেখিনি।

তারপর যশোদা অন্দরে গেল। তাকে দেখিযাই সুবর্ণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, কী সুন্দর কীর্তন করে তোমার ভাই, যশোদাদিদি ! এমন আর জীবনে শুনিনি !

কত সুদীর্ঘ জীবন সুবর্ণের, কত কীর্তনই সে শুনিয়াছে ! সে আর জীবনে কখনও এমনটি শোনে নাই, নন্দর এতবড়ো সার্টিফিকেট যেন আর হয় না।

গলাটা মিষ্টি বলে শুনতে ভালো লাগে, নইলে শিখেচে কচু।

সুবর্ণ উত্তেজিত হইয়া বলে, না, না, তুমি জানো না যশোদাদিদি, ভালো কবে না শিখলে কেউ এমন করে গাইতে পারে ? সবাই কী বলছে জানো ? কীর্তন যে এমন হয় অ্যাদ্দিন কেউ ভাবতেও পারেনি।

যশোদা একটু হাসে আর মনে মনে বলে, সবাই তো তোমাবই মতো পণ্ডিত। কীর্তন যে গাহিয়াছে যশোদাই তার দিদি শুনিয়া মেয়েরা কেউ কেউ আসিয়া তার সঙ্গে কথা বলে, কীর্তনের প্রশংসা জানায়। যশোদা প্রতিবাদ করে না, মৃদু একটু হাসিয়া কতকটা কথা বদলানোব উদ্দেশ্যে আর কতকটা মেয়েমানুষের প্রকৃতিগত কৌতূহলের জন্য জিজ্ঞাসা করে, এ মেয়েটি কে, ও বউটি কে। অল্প সময়ের মধ্যেই অধিকাংশ মেয়ের পরিচয় যশোদার জানা হইয়া যায়। নিমন্ত্রিতার সংখ্যা আজ খুব কম, কিন্তু সত্যপ্রিয়র অন্দরেই যত নারী বাস করে, একটি সাধারণ কাজেবঁ বাড়ি ভরাট কবিয়া তুলিবার পক্ষে তারাই যথেষ্ট। কেউ বসিয়া থাকে, কেউ ঘুবিয়া বেড়ায়, কোথাও দল বাঁধিয়া কয়েকজন গল্পগুজব করে। বেশির ভাগ মেয়েকে সুবর্ণই যশোদাকে চিনাইয়া দেয়, কোনটি সত্যপ্রিয়র মেয়ে, কোনটি তার বউ, কোনটি তার বোন, কোনটি ভাগনি অথবা ভাইঝি অথবা দূরসম্পর্কের আত্মীয়া।

সত্যপ্রিয়র অন্দরের কমবয়সি মেয়েদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে সুবর্ণ মন্তব্য করে, কী বিচ্ছিরি করে সেজেছে, এমন গেঁয়ো ওরা ! গায়ে রাশ রাশ গযনা চাপিয়ে দিলেই যেন সাজ হয় !

যশোদা ভাবে, থাকলে তুমিও গায়ে চাপাতে ছাড়তে না। সুবর্ণের মন্তব্য শুনিয়া নয়, আপনা হইতেই এ বাড়ির মেয়েদের সম্বন্ধে যশোদার একটা অস্পষ্ট ধাবণা গড়িয়া উঠিতে থাকে। বাড়ির লোকের কাছে বাড়ির কর্তা কতকটা রাজার মতো, সেই একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের ও কর্তৃত্বের চাপে কারও স্বাভাবিক বিকাশ হয় নাই, সকলেই অল্পবিস্তর বিকাশ পাইয়াছে। তা ছাড়া আছে বড়োলোকের অন্দরমহলের অধিবাসিনী হওয়ার অপরিহার্য পরিণাম। এ বাড়ির মেয়ে হওয়ার অর্থই যে অন্য বাড়ির মেয়ের মতো না হওয়া, এটা সকলেই জানে। আশ্রিতা আছে বহু, কারও দাবির জোর বেশি, মানমর্যাদাও বেশি, কারও দাবির জোর কম, মানমর্যাদাও কম এবং এই হিসাব মতো এ ওর মন জোগাইয়া চলে, এ ওকে অবজ্ঞা করে, হিংসাটা হইয়া থাকে বিশ্বব্যাপী। আশ্রিতারাই কি বাড়ির মেয়েদের মন বিগড়াইয়া দেয় বেশি, আবহাওয়াটা করিয়া তোলে বেশি বিকৃত ? সত্যপ্রিয়র সেজো মেয়ে আর মেয়েটির সমবয়সি পিসতুতো বোনটির আজন্ম একসঙ্গে লালিতপালিত হওয়ার ফলটা কয়েক মিনিট চোখে দেখিয়াই যশোদার তাক লাগিয়া যায়। সেজো মেয়ের কাপড়খানার

দাম অনেক বেশি, গয়নাও তার গায়ে অন্যজনের চেয়ে দশগুণ। আজ একটি নতুন দুল পরিয়াছে সেজো মেয়ে।

সেজো মেয়ে (মুখভার) : সবাই চলে গেলেই তোমার দুল ফিরিয়ে দেব।

পিসতুতো বোন (ভীতা) : কেন ভাই ?

সেজো মেয়ে : দিদির কানবালা ধাব কবে পরতে পারবে বলেই তো যেচে যেচে নিজের বিচ্ছিরি দুল দুটো আমায় পরালে।

পিসতুতো বোন : তুই নিজেই তো চেয়ে নিলি ভাই ?

সেজো মেয়ে : কখন চাইলাম ?

পিসতুতো বোন : না ঠিক, এমন বোকা আমি।

সেজো মেয়ে : বোকা তুমি নও। দুল দুটো পরলে নিজেকে খুব সুন্দব দেখায় জানো কিনা তাই আমি যেই দুল দুটো নিয়ে এলাম, ওমনি ফন্দি এঁটে দিদিব কানবালা নিয়ে পরলে, যাতে আরও সুন্দর দেখায়। ফরসা রঙের অহংকারে ফেটে পড়ছ, বোকা হতে যাবে কোন দুঃখে ?

পিসতুতো বোন : আমার রংটা তো ফ্যাকাশে সাদা ভাই, তোর মতো দুধে আলতা তো নয় ভাই ? কানবালা খুলে ফেলব ?

বাড়ির একটি বিশেষ শ্রেণির আশ্রিতাদের সঙ্গে খাইতে বসানো হইল, দাসী চাকরানি নয়, সত্যপ্রিযব সঙ্গে সত্যই তাদেব সম্পর্ক আছে, তাবা আত্মীয়া। তবে, সত্যপ্রিয়ব মেয়ে আর বউরা যে যশোদাকে একেবাবে খাতির কবিল না তা নয়, একটু দূরে দাঁড়াইয়া যশোদা আব যশোদার খাওয়া চাহিয়া দেখিয়া তাদের কী ফিসফাস কথা আব চাপা হাসি। সুবর্ণ বোধ হয় অন্য ঘরে খাইতে বসিয়াছিল।

পিসতুতো বোনের সঙ্গে কলহের পর সেজো মেয়েব মনটা ভালো ছিল, কে একজন যশোদার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সে খিলখিল কবিয়া হাসিয়া ফেলিল। যশোদা তখন বড়ো বড়ো লেডিকিনি মুখে তুলিতেছিল। খাওয়া বন্ধ করিয়া সে বলিল, এই ছুঁড়ি এদিকে শোন।

মেয়েদের হাসিগল্পেব গুঞ্জন থামিযা গেল, সেজো মেযে কয়েক পা আগাইযা আসিয়া মুখ লাল করিয়া বলিল, তোমার তো আস্পদ্দা কম নয় !

তোমারই বা কম কী দিদি ? আমায় নেমন্তন্ন করে এনে বয়সে আমি তোমার মা-মাসির সমান, আমার খাওয়া দেখে কী বলে তুমি হাসলে ? এ রকম যে হাসতে নেই, ছোটোলোকের বাড়ির মেয়েরও সেটুকু শিক্ষে আছে।

আমায় তুমি ছোটোলোকের মেযে বললে ! দাঁড়াও, বাবাকে বলে তোমায় মজা দেখাচ্ছি। সেজো মেয়ে ঝড়ের মতো বাহির হইয়া গেল।

যশোদা খাইয়া উঠিয়া বাড়ির পিছনের বারান্দায় সত্যপ্রিয়র স্ত্রীর কাছে একটু বসিল। রাত প্রায় এগারোটা বাজে, জ্যোতির্ময়ের বাড়ির সকলে কোথায় যে উধাও হইয়া গিয়াছে ! একসঙ্গে ফেরা যাইত।

সত্যপ্রিয়র স্ত্রী বড়ো শান্ত ও নিরীহ মানুষ, কিছুক্ষণ আগে তার সঙ্গে দু-একটা কথা বলিয়াই যশোদা এটা টের পাইয়াছিল। সব সময়েই যেন যেন ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া আছে।

মেয়ে নাকি কী বলেছে আপনাকে ?

কী আবার বলবে ? ছেলেমানুষ, ওর কথার ভারী দাম !—যশোদা একটু হাসিল।

আপনি রাগ করবেন না, ছেলেমেয়েগুলো আমার বড়ো বেয়াড়া। বলুন রাগ করবেন না ? বলিয়া সত্যপ্রিয়র স্ত্রী যশোদার হাত ধরিল। ইস, এই জন্য সে এখানে একা বসিয়া আছে, বাড়ির গিন্নি সে ! ধনীর গৃহিণীতে পরিণত হইতে না পারায় স্বামী-পুত্র, আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী কারও সঙ্গো

আঁটিয়া উঠিতে না পারায় একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া নিজের একটা মানসিক বিকারের অবাস্তব জগতে ভাসিয়া গিয়াছে, সকলের অপরাধে নিজেকে যেখানে সে অপরাধী মনে করে, তাদের হাত ধরিয়া ক্ষমা চায়।

কিছুক্ষণ পরে সত্যপ্রিয় আসিল।

খাওয়া হয়েছে ? বড়ো রাত হয়ে গেল। গাড়ি বলে দিয়েছি।

গাড়ি কী হবে ? এইটুকু পথ হেঁটেই চলে যাব।

কিন্তু তা হয় না, যশোদা যে সত্যপ্রিয়র অতিথি। পথ যতটুকুই হোক, রাত্রিকাল, স্ত্রীলোক, হাঁটিয়া যাওয়া চলে ?

যশোদা জিজ্ঞাসা করিল, জ্যোতির্ময়বাবুর বাড়ির সবাই কি চলে গেছে ?

আধঘণ্টা আগে। আমিই বললাম জ্যোতির্ময়বাবুকে, একটু পরে তোমাকে পাঠিয়ে দেব তোমার ভায়ের সঙ্গে। গাড়িটা একটু আটকা ছিল। তা তোমার ভাইকে তো কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না যশোদা।

সে তবে আগেই চলে গেছে। কেত্তন করলে ওর শরীর বড়ো দুর্বল লাগে।

সত্যপ্রিয় নিজেই সঙ্গে করিয়া যশোদাকে গাড়িতে তুলিয়া দিল। বোধ হয় সেদিন নন্দকে যে অপমান করা হইয়াছিল, আজ সুদে-আসলে নন্দর দিদিকে সম্মান দিয়া তার ক্ষতিপূরণ হইতেছে। যশোদা ভাবিল, কী মতলব আঁটছ তুমি কে জানে ! সত্যপ্রিয়কে একটু বেশি রকম গম্ভীর ও অন্যমনস্ক মনে হইতেছিল। যশোদাকে আর একদিন আসিবার জন্য অনুরোধ করিল।

শুনলাম বেয়াদবির জন্য মেয়েকে নাকি ধমক দিয়েছ। আমার কাছে নালিশ করতে এসেছিল, আমিও ধমক দিয়েছি। তবু আমার বাড়িতে আমার মেয়েকে অমন করে বলবার সাহস কারও হতে পারে, ভাবতেও পারিনি যশোদা।

ছেলেমানুষের দোষ দেখিয়ে দেব, তাতে আর সাহসের কী আছে !

সত্যপ্রিয় হঠাৎ যেন বড়ো সরল হইয়া গিয়াছে, যশোদার সঙ্গে যেন তার অনেকদিনের পরিচয়। ম্লানমুখে একটু হাসিয়া বলিল, তুমি জানো না যশোদা, আমার চাকরবাকরের দোষ দেখিয়ে দেবার সাহস পর্যন্ত অনেকের হয় না। যাদের কোনোদিন একটি পয়সা পাবার ভরসা নেই যারা চায়ও না একটি পয়সা, তারা পর্যন্ত ভয়ে মরে আমি পাছে চটে যাই।

এ কথার জবাবে যশোদা কিছু বলিল না। প্রত্যাশা না থাকে, সত্যপ্রিয় চটিলে যে ভয়ের কারণ আছে এটুকু সেও বোঝে। টাকা অনেক কিছু করিতে পারে। তার বাড়ির কাছেই এমন দু-একজন মানুষ বাস করে যাদের হাতে মোটে শ খানেক টাকা গুঁজিয়া দিলে একদিন এই সত্যপ্রিয়র মাথাটা ফাটাইয়া কয়েকমাস জেল খাটিয়া আসিতে রাজি হইয়া যাইবে। টাকার পরিমাণটা বেশি করিলে একেবারে খুন করিয়া ফাঁসিকাঠে ঝুলিবার ঝুঁকিটা নিতেও হয়তো রাজি হইয়া যাইতে পারে। এরা সব নিচুস্তরের জীব, কিন্তু উঁচুস্তরেও এমন কত জীব আছে, যারা এদেরই রকমফের, হাতে কিছু টাকা গুঁজিয়া দিলে যারা খুন না করিয়াও মানুষের এমন সর্বনাশ করিতে পারে, যা খুন করারও বাড়া। এমন শক্তি যে টাকার, সত্যপ্রিয় সেই টাকা গাদা করিয়াছে। প্রত্যাশা যারা করে না, তারাও তাকে ভয় করিবে বইকী। তা ছাড়া, প্রত্যাশা করা না করার প্রশ্নই কেবল নয়, গেরুয়া কাপড় দেখিলেই ধর্মভীরু গৃহস্থের যেমন পায়ে লুটাইতে ইচ্ছা হয়, বড়োলোককে ভয় আর খাতির করা সেইরকম একটা সংস্কারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে মানুষের।

পরদিন দুপুরবেলা কীর্তনের অবসাদে নন্দ ঝিমাইতেছে, কোথা হইতে সুবর্ণ আসিয়া হাজির।

একটু কীর্তন গাইবে ? একটুখানি ?

উত্তেজনা সে যেন চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না, চোখেমুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যশোদা যে ঘরের অন্যদিকে চৌকিতে বসিয়া জামা সেলাই করিতেছিল, তার চোখে পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ। একটা ঘরে ঢুকিয়া সেই ঘরেই যশোদার মতো একটি মানুষকে চোখে না পড়ার মতো অবস্থা, আবেগ একটু বেশি রকম উথলাইয়া না উঠিলে হওয়া সম্ভব নয়।

নন্দ মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, এমনি তো হয় না, মানে, আয়োজন চাই কিনা অনেক, আর অনেকক্ষণ ধরে না গাইলে—

এ বাড়িতে সুবর্ণের আসাটাই খাপছাড়া ব্যাপার, তাও এমন অসময়ে। কাল নন্দর কীর্তন শুনিয়া তার কী রকম লাগিয়াছিল নন্দকে জানাইবার জন্য সে ছটফট করিতেছিল, সবুর সয় নাই। নতুবা জানাইবার সুযোগের অভাব তার হইত না, নন্দই হয়তো আজকালের মধ্যে তাদের বাড়ি যাইত।—কীর্তন যে এমন হয়, আমি সত্যি জানতাম না। কাল শুনতে শুনতে আমার যে কী রকম হচ্ছিল—

যশোদা মনে মনে বলে, রকম দ্যাখো ছুঁড়ির, ও রকম তো তোর সব সময়েই হচ্ছে।

মুখে অবশ্য ভদ্রতা করিতে হয়, এ ধরনের ভাবোচ্ছ্বাসের জন্য গালে চড় কসাইয়া দিবার নিয়ম নাই। বড়ো জোর গম্ভীর মুখে, কড়া সুরে এদিকে আসিয়া বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করা চলে যে, ব্যাপারখানা কী। কিন্তু তাতে কি এ সব মেয়ের মাথা ঠান্ডা হয় ?

তুমি শুনেছ যশোদাদিদি ? কাল শুনেছ কীর্তন ? ও, হ্যাঁ, তুমি তো কাল গিয়েছিলে নেমন্তন্ন খেতে। কীর্তন শুনে কাল বাড়ি ফিরে বউদি কাঁদছিল। ঘরে নয়, সবাই ঘুমোবার পর সিঁড়িতে বসে। আমি জিজ্ঞেস করতে বললে, কীর্তন শুনে এমন মন কেমন করছে ছোট্‌ঠাকুরঝি !—বউদি আমায় ছোট্‌ঠাকুরঝি বলে।

সবাই ঘুমোবার পর তুমি বুঝি জেগেছিলে ?

হ্যাঁ, কিছুতেই ঘুম আসছিল না কাল।

চান করনি আজ ?

না। গায়ে জল লাগলেই এমন ছ্যাঁকছ্যাঁক করে উঠছিল যশোদাদিদি। ওই যা, আসল কথাই ভুলে গেছি। বউদি তোমায় একবার যেতে বলেছে, বড্ড দরকার।

চলো তবে, এখুনি শুনে আসি দরকারটা কী।

ছেলেমানুষ। রাত্রে ভালো করিয়া ঘুমায় নাই। জ্বরও বোধ হয় আসিয়াছে। চোখ দেখিলে মনে হয়, কোনো পাগলাগারদ হইতে যেন পলাইয়া আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি সেলাই রাখিয়া যশোদা উঠিয়া পড়ে। বাড়ি নিয়া গিয়া সর্বাগ্রে নিজের হাতে লেবু দিয়া বড়ো এক গ্লাস শরবত বানাইয়া মেয়েটাকে খাওয়াইবে, তারপর অন্যকথা।

কিন্তু সুবর্ণ নড়িতে চায় না।—তুমি যাও না যশোদাদিদি, আমি যাচ্ছি একটু পরে।

না, আমার সঙ্গে এসো। এখানে কী করবে তুমি ?

একটু কীর্তন শুনব। নন্দর দিকে চাহিয়া মিনতি করিয়া বলে, জোরে না গাও, গুনগুন করে একটু গাও না ? সেই যেখানটা গাইতে গাইতে কাল তুমি কাঁদছিলে, সেখানটা।

যশোদা আর কথা না বলিয়া সোজাসুজি সুবর্ণের ডান হাতের কবজি চাপিয়া ধরিয়া তাকে একরকম গায়ের জোরে টানিয়াই সঙ্গে নিয়া ঘরের বাহির হইয়া যায়। আর ভদ্রতা করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। কে বলিতে পারে কখন মেয়েটা মেঝেতে চিত হইয়া হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে মুখে ফেনা তুলিতে আরম্ভ করিয়া দিবে ? কেবল লেবুর শরবত নয়, যাওয়ার সময় দু-পয়সার বরফও কিনিয়া লইয়া যাইতে হইবে কিষেনের দোকান হইতে। সুবর্ণের মাথাটাও ধোয়াইয়া দিবে বাড়ি গিয়াই।

হাত ছাড়ো যশোদাদিদি—উঃ রে বাবা রে, হাতটা ভেঙে ফেলবে নাকি তুমি আমার ?

বাড়ির বাহির হইয়া যশোদা তার হাত ছাড়িয়া দিল। চোখ মুছিতে মুছিতে সুবর্ণ তার সঙ্গে চলিল আর বিড়বিড় করিয়া কী যে বলিতে লাগিল অস্ফুটস্বরে সেই জানে।

কেঁদো না সুবর্ণ। রাস্তায় যদি কাঁদো ঠাস করে গালে চড় বসিয়ে দেব বলে রাখছি।

শুনিয়া সুবর্ণের কান্না ও বিড়বিড়ানি দুইই হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। বরফ কেনার সময় ক্ষীণকণ্ঠে সে একবার জিজ্ঞাসা করিল বটে, বরফ কিনছ কেন যশোদাদিদি ?—যশোদা জবাবও দিল না।

জ্যোতির্ময়ের বাড়ি গিয়া গলা নরম করিয়া যশোদা বলিল, তোমাব যে অসুখ হয়েছে বোন, জ্বর হয়েছে। মাথাটা ধুয়ে দিই এসো, তারপর তুমি শুয়ে পড়োগে যাও। বরফ দিয়ে আমি সুন্দর শরবত বানিয়ে দিচ্ছি, খেলেই তোমার জ্বর কমে যাবে।

মিষ্টিকথা শোনামাত্র সুবর্ণ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, আমার অসুখ হয়েছে আর তুমি আমায় এমন করে মারলে যশোদাদিদি !......

সুবর্ণের ব্যবস্থা করিয়া জ্যোতির্ময়ের ঘরে বসিয়া ভদ্রলোকের বিজ্ঞাপন দেওয়া খাপছাড়া দরদের কথা যশোদার মনে হইতে থাকে। বেশ সাজানো ঘরখানা, আসবাবপত্র একটু বেশি রকম ঠাসা। এক ঘরে খাট, ড্রেসিং টেবিল, লেখাপড়ার জন্য মাঝারি আকারের একটি টেবিল ও চেযার, ট্রাংক, সুটকেস, অর্গ্যান, আলনা ইত্যাদি অনেকগুলি জিনিস ভর্তি করায নড়াচড়ার স্থানাভাব ঘটিয়াছে। অধিকাংশ আসবাবই জ্যোতির্ময় ভালোবাসিয়া কিনিয়া দিয়াছে, অর্গ্যানটি তো মাত্র ক-মাস আগে কেনা।

ভালো কী গাইতে জানি ? তবু কিনে দিলেন।---অপবাজিতা সলজ্জ আনন্দে যশোদাকে জানায। সুবর্ণকে কিনিয়া দেওয়ার বদলে স্ত্রীব নামে সংগীতযন্ত্রটি কেনায বাড়িতে যে কথা হইযাছিল, যশোদার কানে তাহা আগেই পৌঁছিয়াছে। জ্যোতির্মযকে যশোদা মোটামুটি চেনে, তাই এমন একটা সহজ সাংসারিক চালে তার ভুল হওয়ায় সে আশ্চর্য হয় নাই। দুদিন পবে যে বোন বিবাহ হইয়া শ্বশুরবাড়ি চলিয়া যাইবে, তার নাম করিয়া ওটা কিনিলেই কোনো গোল হইত না ! কিন্তু সেটা জ্যোতির্ময়ের খেয়াল হয় নাই। বিবাহের সময় যৌতুক হিসাবে অর্গ্যানটি দিতে হইতে পারে, এ আশঙ্কা অবশ্য একটু ছিল। কিন্তু সেও তো জ্যোতির্ময়েরই হাত। যার নামেই কেনা হোক মেয়ে দেখিতে আসিলে এই অর্গ্যান বাজাইয়া সুবর্ণকে গান একটু শুনাইতেই হইবে, অর্গ্যানটি কাব সম্পত্তি, বরপক্ষ তখন সে প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিবে, তখন বলিলেই হইবে এটি জ্যোতির্ময়ের স্ত্রীর জিনিস। তাছাড়া, বরপক্ষ যদি অর্গ্যান একটা দাবি করে, নাছোড়বান্দা হইয়া দাবি করে, স্ত্রীর নামে কেনা হইয়াছে বলিয়াই এটি দান না করিয়া জ্যোতির্ময় কি পারিবে ? আব একটু সস্তা দামের অন্য একটা অবশ্য—

ভদ্রলোকের অন্দরমহলে আসিলেই যশোদার চুল ধরে আব এই ধবনের চিন্তা মনে গিজগিজ করিতে থাকে। তবে অপরাজিতা আজ যে সব কথা বলিতেছিল কানে যাওয়ার পর সে পূর্ণমাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিল।

ওমা, এ সব কী কথা বলছ বউ ?

বলিবার যে খুব বেশি প্রয়োজন ছিল অপরাজিতার তা নয়, তার চেহারা দেখিয়া, মুখচোখ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় ভিতরে কিছু গোলমাল হইয়াছে। কিন্তু অবস্থাটা যে এমন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেও কি তা অনুমান করিতে পারিয়াছিল ?

ভয়ে অপরাজিতার মুখ ছাইবর্ণ হইয়া গেল। খুব খারাপ নাকি দিদি ?

যশোদা তাড়াতাড়ি অভয় দিয়া বলিল, খারাপের তো কিছুই ছিল না বউ, শরীরটা এমনই খুব দুর্বল করে ফেলেছ কিনা, তাই যা একটু ভয়। ওনাকে বলনি ?

কখন বলি ?

তাও তো বটে, উপহারে আসবাবে যে ঘব ভরিয়া দেয়, প্রত্যেক রাত্রি যার পাশে শুইয়া কাটে, এত বড়ো বিপদেব কথাটা তাকে বলিবার তোমার সুযোগ কোথায় ! প্রথমটা যশোদার বড়ো রাগ হয়, মনে হয়, এমন ন্যাকামো কবা যাদের স্বভাব চুলোয় যাক তারা, কাজ নাই, তাদের কথায় থাকিয়া। কিন্তু অপরাজিতার শীর্ণ বিবর্ণ মুখে ভাসা ভাসা ভয়ার্ত চোখের চাউনি দেখিয়া মনটা আবার গলিয়া যায়।

তা বললে তো চলবে না বোন। ওনাকে বলে চিকিৎসাব ব্যবস্থা করতে হবে তো ?

অনেক বুঝাইয়া, অনেক পবামর্শ ও উপদেশ দিয়া যশোদা বাড়ি ফিরিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে যে, বেশি বযসে বিয়ে করা বউকে কি লোকে এতই বেশি ভালোবাসে ? এমনভাবে সীমা ছাড়াইয়া যায় সেই ভালোবাসা যে, বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া তিলতিল করিয়া মরিতে থাকিলেও খেয়াল পর্যন্ত হয় না খাপছাড়া কিছু ঘটিতেছে ? সুশ্রী ও কচি মুখখানা আর সুগঠিত ও কোমল দেহখানা দেখিয়া বউটাব জন্য যদি দরদ জাগিয়া থাকে জ্যোতির্ময়ের বুকে, সে দরদ কেন তাকে এখন বলিয়া দেয না, সে শ্রীও নাই, সে লাবণ্যও আর নাই ? বউটাও বা এমন হাবা কেন, স্বামীকে অসুখের কথা বলিতে লজ্জা পায় ? ভদ্র স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার খেলা এই রকম ভদ্রতা বজায় রাখিয়া চলে নাকি ? ভাগ্যে সংসারে সকলে ভদ্র নয় !

হাসপাতাল হইতে ধনঞ্জয় ফিবিয়া আসিয়াছে।

ডান পাটি হাঁটুব নীচ হইতে বাদ গিয়াছে। এখনও ব্যান্ডেজ বাঁধা, তবে ঘা শুকাইয়া আসিয়াছে। আরও কিছুদিন পরে কাঠের পা লাগানো চলিবে।

কী পাপে আমার এমন দশা হল যশোদা ?

পাপ ? পাপের কথা না ভাবাই ভালো। সবই ভগবানের ইচ্ছা। ভগবান যা করেন মানুষের বুঝবার উপায় আছে কী, কেন কবেন ? সহ্য কবা ছাড়া মানুষের আর উপায় নাই।

প্রাণে যে বেঁচে গিয়েছ—

এব চেয়ে মরাই ভালো ছিল।

ধনঞ্জয় মবে নাই, আধমবা হইয়া গিয়াছে। এ শরীরে আগে জোয়ারভাটা টের পাওয়া যাইত না, এখন যেন ভাটাব সময় কালীঘাটের কাছে আদিগঙ্গার যে অবস্থা যশোদা অনেকবার দেখিয়া আসিয়াছে, সেই বকম হইয়া গিয়াছে ধনঞ্জয়েব চেহাবা।

দেশে খবর দেবে না ?

ধনঞ্জয় ভাবে, অকর্মণ্য হইয়া সে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়াছে, যশোদা তাই তাড়াতাড়ি দেশে খবর দিয়া তাকে তাড়ানোর ব্যবস্থা কবিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুখ বাঁকাইয়া সে বলে, তাড়াবার জন্য তর সইছে না চাঁদের মা ? ধন্য তোমরা শহুবে মানুষ ! তুমি বললে সুধীরের সঙ্গে রেলের ইয়ার্ডে কাজ শেখো গে যাও, তোমার জন্য আমার এই সব্বোনাশ হল, আর তুমিই আমাকে—

ধনঞ্জয়ের চোখে জল আসিয়া পড়ে। এত বড়ো অপবাদের জবাবে যশোদা শান্তভাবে শুধু জানায় যে তাড়ানো দূরে থাক, ধনঞ্জয় এখন যাইতে চাহিলে যশোদা তাকে যাইতে দিবে নাকি ? ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক এইখানেই এখন ধনঞ্জয়কে থাকিতে হইবে কিছুকাল, পায়ের ঘা শুকাইয়া যতদিন কাঠের পায়ের ব্যবস্থা না হয়। তারপর সে যদি দেশে যাইতে চায় দেশে চলিয়া যাইবে। আর যদি এখানে কোনো কাজকর্ম করিতে চায়, তাও হয়তো যশোদা ঠিক করিয়া দিতে পারিবে।

কাজ ? আর কি আমি কাজ করতে পারব যশোদা ?

কেন পারবে না ? কাঠের পা নিয়ে লোকে রোজগার করে খাচ্ছে না ? দেশে খবর দেবার কথা বলছিলাম, কাউকে যদি তুমি দেখতে চাও ?

কে আর আছে দেশে ধনঞ্জয়ের, কাকেই বা সে দেখিতে চাহিবে। এখন আর খবর দিয়া কাজ নাই, ভালো হইয়া রোজগারপাতি করার মতো সুদিন যদি কখনও ধনঞ্জয়ের আসে—

আমার দেনাটাও তখন আস্তে আস্তে শোধ করে দিতে পারবে।

যশোদার আর সব ভালো, মিষ্টি করিয়া কথা বলিতেও সে জানে, কেবল মাঝে মাঝে এই রকম এক একটা কথা বলিয়া এমন সে প্রাণে আঘাত দেয় মানুষের ! এখন প্রাণে আঘাত পাইলেও যশোদার আশ্রয়ে যশোদার অন্নে প্রাণধারণ করিয়া থাকিতে থাকিতে কয়েকদিন পরে যশোদার এই কথা মনে করিয়াই লজ্জাটা যে তার কম হইবে, প্রাণে একটু স্বস্তি বোধ করিবে, এ সব অবশ্য ধনঞ্জয়ের খেয়াল হয় না। সামান্য একটু সাময়িক মনঃকষ্ট দিয়া অনেকদিনের অনেক বেশি মনঃকষ্ট নিবারণের এ সব উপায়ের সঙ্গে তার পরিচয় নাই—কজন মানুষেরই বা থাকে !

সুধীর প্রথমটা ধনঞ্জয়ের কাছে ভেড়ে নাই। ধনঞ্জয় হাসপাতাল হইতে বাড়িতে আসিয়াছে, দু-তিনদিন এটা যেন তার অজানাই রহিয়া গেল। তারপর একদিন সকাল বেলা কাজে যাওয়ার আগে মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য আনিয়া আস্তে আস্তে সে ধনঞ্জয়ের ঘরে গেল।

কেমন আছ ধনাদা ? খাও, বিড়ি খাও একটা।

ধনঞ্জয় বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছিল। সুধীরের দেওয়া বিড়িটা ধরাইয়া সে বলিল, বোসো দিকি ভাই এখেনে, তোমাকে একটা কথা সুধোই পষ্ট করে। যা হবার তা তো হল, সব আমার অদৃষ্টের দোষ, গোলমাল টোলমাল আমি আর করব না, মা কালীর দিব্যি। গাড়িটা কে *ঠেলে* দিয়েছিল বলো দিকিন ?

শুনিতে শুনিতে সুধীরের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বুকের মধ্যে টিপটিপ করিতেছিল—কে *ঠেলে* দেবে, কেউ *ঠেলে* দেয়নি।—বড়োবাবু নিজে এসে সবাইকে জিজ্ঞেস করে রিপোর্ট দিলে—

সে তো জানি, তুমি নিজে দ্যাখোনি কিছু ?

সুধীর রাগিয়া বলিল, কী বললে ? আমি দেখেছি ? দেখেও চুপ মেরে আছি ? আমি মিথ্যুক ? বড়োবাবু নিজে এসে—

হয়তো একটা কলহ বাধিয়া যাইত দুজনের মধ্যে, যশোদা আসিয়া পড়ায় সেটা আর ঘটিতে পারিল না।

যশোদা রাগ করিয়া সুধীরকে বলিল, কাজে যাও তো তুমি। কেমন ধারা মানুষ তুমি, রোগা মানুষটার সঙ্গে ঝগড়া করছ ? যাও, এখুনি চলে যাও, একটি কথা নয় আর।

ধনঞ্জয়ের সঙ্গে সুধীরের কলহ হইয়া গেলেও বোধ হয় এর চেয়ে ভালো ছিল। সোজাসুজি কলহ-বিবাদের ঝাঁজ কতক্ষণ মানুষের মনে থাকে ? যশোদা আসিয়া এমন করিয়া বলায় সুধীরের মনে যে জ্বালা ধরিয়া গেল তার ঝাঁজ সহজে মিটিবার নয়। তার জন্য দরদ ছিল যশোদার মনে, ধনঞ্জয় আসিয়া সে দরদ গাপ করিয়াছিল। এখনও, ধনঞ্জয়ের ঠ্যাং কাটা যাওয়ার পরেও, এই ধনঞ্জয়কেই যশোদা দরদ করিবে ? সে তুচ্ছ হইয়া থাকিবে ?

কেন এমন হইল ? কেন যশোদা তাকে আর পছন্দ করে না ?

যশোদা ধনঞ্জয়ের সেবা করে, তাকে বাটিভরা দুধ খাওয়ায়, না বলিতে দরকার মতো তাকে বিড়ি পর্যন্ত কিনিয়া দেয়। অসুখে-বিসুখে আরও দু-একজনকে এ বাড়িতে সুধীর শয্যাগত হইয়া থাকিতে দেখিয়াছে, সে নিজেও একবার অসুখে ভুগিয়াছিল, তখন যশোদা যেমন সেবা করিয়াছিল ধনঞ্জয়ের সেবা করার সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল তফাত। অন্য সমস্ত কাজ যেন যশোদার কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, অন্য সকলের সুবিধা অসুবিধার জন্য তার যেন আগের মতো ভাবনা নাই, ধনঞ্জয়ের সুখসুবিধার ব্যবস্থা করাটাই যেন তার এখন একমাত্র কর্তব্য, সব সময় সে যেন কেবল ধনঞ্জয়ের কথাই ভাবে, ধনঞ্জয়ের ডাক শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকে। অন্তত দেখিয়া শুনিয়া সুধীরের তাই মনে হয়। দেখাশোনাটা সারাদিন চলে না, সুধীরকে কাজে যাইতে হয়। কিন্তু কল্পনা তো

আছে সুধীরের, কাজে যাওয়ার আগে আর কাজে যাওয়ার পরে সে যতটুকু দেখে আর শোনে, ওয়াগনে মাল বোঝাই দিতে দিতে তারই ভিত্তিতে সে অহর্নিশ যশোদার আত্মবিস্মৃত সেবাযত্নের এমন কল্পনা গড়িয়া তোলে যে সত্যসত্যই সেই অনুপাতে ধনঞ্জয়ের সেবা করিয়া থাকিলে দু-চার দিনের মধ্যে যশোদাও শয্যাগ্রহণ করিত আর তার নিজেরই দরকার হইত সেবার। এইসব দুর্ভাবনায় অন্যমনস্ক হইয়া রাজেনের গালাগালিতে সুধীরের প্রাণান্ত হয়। সুদীর্ঘ সরীসৃপের মতো লম্বা মালগাড়ির একপ্রান্তে ইঞ্জিন আসিয়া ঠেকিলে ওয়াগনের সঙ্গে ওয়াগনের ধাক্কায় যে শব্দ ওঠে তাতে সে চমকাইয়া ওঠে। না, এর চেয়ে তার একটা পা কাটা গেলে যেন ভালো ছিল ! অথবা পা কাটার বদলে ধনঞ্জয় যদি একেবারে মরিয়া যাইত। ধনঞ্জয় অবশ্য এখনও মরিতে পারে—কিন্তু লোকটার মরাবাঁচার ভার কি ভগবান সুধীরেব হাতে ছাড়িয়া দিবেন একদিন এক মুহূর্তের জন্য, সেদিন তাকে আলগা ওয়াগনটার পাশে দাঁড় করাইয়া বাখিয়া হঠাৎ সুধীরের মাথায় ওয়াগনটা ঠেলিয়া দিবার বুদ্ধি যেমন জোগাইয়া দিয়াছিলেন ?

এই চিন্তাটা মাথায় আসিলে সুধীরের মুখের ভাব এমন হয় যে বকিতে গিয়া রাজেন পর্যন্ত তাকে কিছু বলিতে সাহস পায় না, কথাগুলি গিলিয়া ফেলে।

বাড়ি ছাড়িয়া কাজে আসিতে সুধীরের ভালো লাগে না, নানা ছুতায় সে বাড়িতে বসিয়া থাকিবার চেষ্টা করে। কাজে যাইবে না কেন, কী হইয়াছে সুধীরের ? অসুখ হইযাছে—পেট ব্যথা করিতেছে। বেশ, তবে আর এ বেলা সুধীরের কিছু খাইয়া কাজ নাই।

তোমার ব্যাপারখানা কিছু ধরতে পারছি না সুধীর। কাজে নাকি ফাঁকি দিচ্ছ আর মেজাজ দেখাচ্ছ, রাজেন বললে। এ তো ভালো কথা নয় ? এ কাজটা যদি যায় তোমার, আর কাজ আমি জুটিয়ে দিতে পারব না বলে রাখছি।

না দিলে কাজ জুটিয়ে, কাজ করব না।

খাইয়া দাইয়া দেরি করিয়া সুধীর সেদিন কাজে গেল বটে, মাঝরাত্রে ফিরিয়া আসিল মাতাল হইয়া। আসিয়া এমন মাতলামিই সে আরম্ভ করিয়া দিল, শুধু মদ খাইয়া মাতাল হইয়া যেটা কোনো মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব নয়। কুড়ি-বাইশজন কুলিমজুরকে বাড়িতে রাখিয়াও যশোদা তার বাড়িকে এতদিন ঠিক বস্তির পর্যায়ে নামিতে দেয় নাই, সুধীব একাই সেই কাজটা করিয়া দিল।

সকলে ভাবিয়াছিল পরদিন যশোদা বোধ হয় তাকে দূব দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে। কিন্তু যশোদা কিছুই বলিল না। বলাব খুব বেশি সুযোগও সে পাইল না, কারণ পরদিন কারও কাছে কিছু না বলিয়া সুধীর উধাও হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিল তিনদিন পরে।

তখনও যশোদা তাকে কিছুই বলিল না।

কদিন বাহিরে ঘুরিয়া আসিয়া সুধীরের বোধ হয় হাওয়া পরিবর্তনের কাজ হইয়াছিল, সেই সঙ্গে মতেরও বোধ হয় পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। চোরের মতো পলাইয়া গিয়াছিল যশোদার ভয়ে, ফিরিয়া আসিল যেন লাটসাহেব হইয়া, ভয় নাই, অনুতাপ নাই, মুখ ভার করিয়া থাকা নাই, এ জগতে কাউকে সে গ্রাহ্যও করে না। কৈফিয়ত হিসাবে নয়, নেহাত যেন দয়া করিয়াই যশোদাকে হঠাৎ উধাও হওয়ার কারণটা জানাইয়া দিল।

মনটা ভালো ছিল না চাঁদের মা, তাই একবার একটু ঘুরে এলাম।

যশোদা বলিল, বেশ করেছ। রাজেনকে বলে দিয়েছি, এবার কিছু বলবে না, আর কিন্তু এ রকম পাগলামি কোরো না কখনও।

তোমার জন্যেই তো। তুমি আমার সঙ্গে ও রকম কর কেন ?

যশোদা কথা বলে না। সুধীরের সম্বন্ধে কী করা দরকার এখনও সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই।

সুধীর বলিতে থাকে, জানো চাঁদের মা, সেই যে সেদিন তুমি মুখে বললে আমি ভাত পাব না, কিন্তু পাছে ভাতটি না খেয়ে যাই তাই জন্যে নিজে তাড়াতাড়ি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে, সেদিন টের পেয়েছি সংসারে টাকা বল, রূপযৌবন বল, দরদ ছাড়া সুখ নেই মানুষের।

যশোদা রীতিমতো বিব্রত হইয়া বলে, অ ! সেদিন টের পেয়েছ।

আবেগের মাথায় সুধীর বলিয়া বসে, তুমি বললে তোমার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি চাঁদের মা।

প্রাণ তোমাকে দিতে হবে না, নদেরচাঁদের বউটা জ্বরে ভুগছে, ওকে একটু ওষুদ এনে দাও দিকি ?

খানিক পরে খবর আনিতে গিয়া যশোদা দেখিল ঔষধ আনা হইয়াছে কিন্তু খাওয়ানো হয় নাই। বিছানায় চাঁপার মা কোঁকাইতেছে, ঘরের কোণে চাঁপা আর সুধীর মশগুল হইয়া আলাপ করিতেছে।

চাঁপা বলিল, ওষুধটা কবার খাওয়ার বুঝে নিচ্ছিলাম দিদি।

ওষুদটা খাইয়ে গল্প কর চাঁপা। বলিয়া যশোদা চলিয়া আসিল।

তারপর হইতে সুধীরকে চাঁপার যেন সর্বদাই দরকার হইতে লাগিল। দু-বেলা ডাকিয়া পাঠায়, নিজে আসিয়া সুধীরের সঙ্গে গুজগাজ ফিসফাস করে, কী যেন একটা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে দুজনে। ও বাড়িতে গেলেই যশোদা দুজনকে একসঙ্গে দেখিতে পায়। দু-একবার কালোকেও তাদের সঙ্গে দেখা গেল, তিনজনে হাসি-গল্প করিতেছে। কথা বেশি বলিতেছে সুধীর, হাসি চাঁপাই হাসিতেছে বেশি, কালো হাঁ করিয়া শুনিতেছে। যশোদা ওদের এড়াইয়া চলিতে লাগিল, চাঁপা যদি জগৎকে ছাড়িয়া সুধীরের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে, যশোদার কিছু বলিবার নাই। নিজের ভালোমন্দ চাঁপা ভালো করিয়াই বোঝে। চাঁপার জন্য সুধীরের দরদ জাগিয়া তার জন্য দরদটা যদি একটু কমে তাহা হইলেই যশোদা এখন বাঁচে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, যশোদাকে উপেক্ষা করাব লক্ষণ সুধীরেব দেখা গেল না। কয়েকদিনের মধ্যে চাঁপার সম্বন্ধে তার একান্ত উদাসীনতা দেখা গেল, চাঁপা ডাকিলে সব সময় সে যাইতে চায় না। কেবল চাঁপা যখন কালোকে পাঠাইয়া, তাকে বিশেষ দরকারে ডাকিয়া পাঠায়, তখন কালোর সঙ্গে সে মুখ গম্ভীর করিয়া শুনিয়া আসিতে যায় দরকারটা কী এবং গিয়াই ফিরিয়া আসে অল্পক্ষণের মধ্যে। ধীরে ধীরে আবার যেন তার আগেকার অস্থিরতা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ধনঞ্জয় আর যশোদাকে একসঙ্গে দেখিলেই কোথা হইতে সে আসিয়া উপস্থিত হয় কিছুতেই নড়িতে চায় না। যশোদাকে একা পাইলেই কাছে বসিয়া আবোল-তাবোল গল্প জুড়িয়া দেয়, ধনঞ্জয়ের যত পারে নিন্দা করে, তার জানা একটি স্ত্রীলোকের উপর ধনঞ্জয়ের কী গভীর অনুরাগ ছিল সেই গল্প ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া এমন করিয়া বলে যে কথাটা সত্য না মিথ্যা জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন হয় না।

তারপর একদিন সুধীর বলে কী, একটা কথা বলি শোনো চাঁদের মা। শুনে রাগ কোরো না কিন্তু। আমার কোনো কুমতলব নেই আগেই বলে রাখছি তোমাকে।

তুমি মস্ত সাধুপুরুষ। শুনি কথাটা ?

আর তো সুধীব থ:কিতে পারে না যশোদাকে ছাড়া, সে যে পাগল হইয়া গেল যশোদার জন্য তা কি যশোদা দেখিতে পায় না ? এমন ভাবে আর কতদিন চলিবে ? তার চেয়ে এখানকার বাড়িঘর বিক্রয় করিয়া যশোদা চলুক না তার সঙ্গে দূরদেশে, যেখানে তারা দুজনে ঘর বাঁধিয়া পরম সুখে থাকিতে পারিবে ?—তুমি ভাবছ আমার চেয়ে বয়স তোমার দু-এক বছর বেশি, চেহারাটা তোমার জবরদস্ত, তোমার জন্যে আমার মন কাঁদতে পারে না, বাড়ি বিক্রির টাকার পরে আমার লোভ ? আগেই তো বলেছি তোমাকে, আমার কোনো কুমতলব নেই। বেশ বাড়িঘর থাক তোমার, এমনিই চলো তুমি আমার সঙ্গে, আমিই রোজগার করে তোমায় খাওয়াবো।

কথাটার আকস্মিকতায় যশোদা খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া থাকে, তারপর বলে, বটে ? ফাজলামির আর পাত্তর পেলে না তুমি, তাম্‌শা জুড়েছ আমার সঙ্গে ? আস্পদ্দা তো কম নয় তোমার !

সুধীর ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, তাম্‌শা নয় চাঁদের মা, সত্যি তাম্‌শা নয়। মতিদা বলছিল, কেউ কোনোদিন তোমায় দরদ দেখায়নি বলে মনটা তোমার বিগড়ে গেছে, কেউ দরদ করলেই ভাব তাম্‌শা জুড়েছে। কী করলে তোমার বিশ্বেস হবে বলো, আমি তাই করব। তুমি জান না যশোদা—

জানতে চাই না আমি। যাও তুমি, বেরোও আমার বাড়ি থেকে—এখুনি বেরোও। ফের যদি আমার সামনে পড়, কিলিয়ে তোমায় নিকেশ করব।

কেবল এই কথা কয়েকটি নয়, আবও অনেক কিছু যশোদা অবশ্য তাকে বলিল, যে রকম জোরালো ঝাঁজালো, অকথ্য কথার ফোড়ন না থাকিলে সুধীরের মতো মানুষের পক্ষে বোঝাই কঠিন হয় যে তাকে সত্যসত্যই তিরস্কার করা হইতেছে।

তখন দুপুরবেলা। সুধীর সেদিন কাজে যায় নাই। ফতুয়াটা গায়ে দিয়া সুধীর বাহির হইয়া গেল আর সারাটা দিন রাগে যশোদা গরগর করিল। রেল ইয়ার্ডের একটা কুলি, সে কাজটা জুটাইয়া দিয়াছে বলিয়া দু-বেলা দুটি অন্ন জুটিতেছে, সে কিনা তাকে এমনভাবে অপমান করিতে সাহস পায় ! এই কী লাভ হইয়াছে তার কুলিমজুরকে আপন করিতে গিয়া ? রাগের প্রথম অবস্থাটা কাটিয়া যাইবাব পর বড়ো দুঃখ হয় যশোদার, একবার চোখে জলও আসিয়া পড়ে। সুধীর কুলিমজুর বলিয়াই যশোদার এতখানি অপমান বোধ বা রাগ বা দুঃখ নয়, সুধীরের প্রেমনিবেদনের ভঙ্গিটাই তাকে বড়ো যন্ত্রণা দিতেছিল। দুজনে মিলিয়া তারা পালাইয়া যাইবে এ যেন সুধীর প্রার্থনা করে নাই, যশোদাই অনেকদিন হইতে তাব পাযে ধরিয়া সাধিতেছিল, এতদিনে ভাবিয়া চিন্তিয়া সুধীর রাজি হইয়া গিয়াছে। সুধীরের মনের ভাব টের পাইতে যশোদার বাকি ছিল না, কদিন হইতে এই সমস্যাটাই সে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া কবিতেছিল, ভাবিতেছিল কী উপায়ে তার এই পাগলামি ঘুচানো যায়। একদিন পোষা কুকুরের মতো পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া সে তার ভালোবাসার কথাটা বলিয়া ফেলিতে পারে, এ ভয়ও যশোদার ছিল। কিন্তু এমনভাবে সোজাসুজি এমন একটা প্রস্তাব তার কাছে করিবার সাহস যে সুধীরের পক্ষে হওয়া সম্ভব, যশোদা তা কল্পনাও করে নাই।

রাত্রে রান্নার শেষে যশোদা দেখিতে পাইল, সুধীর চোরের মতো পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ি ঢুকিতেছে। ক্ষমা-টমা সে চাহিবে না, যশোদা তা জানে। ও সব কায়দাদুরস্ত চালচলন এখনও এদের আয়ত্ত হয় নাই, একটু পরে সুধীর আবার চুপিচুপি বাহির হইয়া গেল। দোকানে খাবার কিনিয়া খাইতে গেল বোধ হয়। মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হইয়া যাইতেছিল, পরিষ্কার করিয়া ব্যাপারটা যশোদা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারিতেছিল না। এ সব মানুষকে বিচার করা বড়ো কঠিন। এদের মতো একাধারে এমন বোকাহাবা পাকা, বজ্জাত, ঝানু, শিশু, কোমল, কঠোর, সাহসী, ভীরু, ভালো আর মন্দ জীব আর হয় না। সুধীরের আসল উদ্দেশ্যটা ধরিতে না পারিয়াই যশোদা বড়ো অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। সুধীর কি সত্যই বিশ্বাস কবিয়াছিল যশোদা তার সঙ্গে পালাইয়া যাইতে রাজি হইবে ? এ রকম একটা বিশ্বাস তার মনে জন্মিল কীসে ? যশোদা ধমক দিলে যার মুখ শুকাইয়া যায়, যশোদার স্নেহ-মমতার জন্য তার ব্যাকুলতা জন্মিতে পারে, যশোদার সঙ্গে পিরিত করার শখ হওয়াও তার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু এমন একটা ধারণা তার মনে আসে কী করিয়া যে যশোদা তাকে প্রশ্রয় দিবে ?

কখন আবার সুধীর আসিয়া ঢুকিয়াছিল যশোদা দেখিতে পায় নাই, পরদিন সকালে ঘরের বাহিরে আসিয়া কলতলায় যশোদাকে দেখিয়াই চোরের মতো সুধীর আস্তে আস্তে পালাইয়া যায়। দোষ করিয়া গুরুজনের কাছে ছোটো ছেলে যেমন করে। দেখিয়া কে বলিবে এই সেই গোঁয়ার-গোবিন্দ

সুধীর, মতির হইয়া যে মিলে মারামারি করিয়াছিল, যশোদাকে কাল যে ডাক দিয়া বলিয়াছিল, চলো গো যশোদা, আমরা হাত ধরাধরি করে পিরিত করতে যাই !

সারাদিন সুধীরের পাত্তা মিলিল না, সারাদিন যশোদা তারই কথা উলটাইয়া পালটাইয়া মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। একরাত্রেই যশোদার মন শান্ত হইয়া গিয়াছে ; নিজের ভাবপ্রবণতার মেঘ কাটিয়া যাওয়ায় আর সুধীরেব মতো গৃহসুখে বঞ্চিত অশিক্ষিত বর্বর দুর্ভাগাগুলির জন্য তার স্বাভাবিক মমতা ফিবিয়া আসায়, এবার ধীরে ধীরে সে সুধীরের পাগলামির মানে বুঝিতে পারে। কবে যেন সুধীর প্রথম টের পাইযাছিল, সংসারে টাকা বলো, বূপ-যৌবন বলো, দরদ ছাড়া সুখ নাই ? যশোদা যেদিন তাকে ভাত খাওয়ার সুযোগ দিতে ছল করিয়া বাড়ির বাহির হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং দরদের দাম কষিতে তাকে শিখাইয়াছে যশোদাই। আর মতি যেন কী বলিয়াছে সুধীরকে ? পুবুষের ভালোবাসা না পাওয়ায় মনটা বিগড়াইয়া গিয়াছে যশোদার ! যশোদার কাছে দরদ চিনিযা বূপলাবণ্যের অভাবে পুবুষের ভালোবাসা না পাইয়া যশোদা মনে মনে কাঁদিতেছে জানিযা, সুধীরের পক্ষে এ কথা মনে কবা আশ্চর্য কী যে তার মতো জোয়ান বয়সি মানুযের ভালোবাসা পাইয়া যশোদা একেবারে কৃতার্থ হইয়া যাইবে।

স্বস্তি বোধ কবে যশোদা, মুখে একটু হাসিও তার দেখা দেয়। আহা, সুধীর তবে সত্যই দরদ দেখাইতেছিল ! হাতির মতো যে যশোদাকে কেউ চায় না, তাকে সঙ্গে করিয়া পলাইতে চাহিয়া সেই একটা মস্ত ত্যাগ স্বীকার করিতেছিল। তার আসল লোভ যে শ্রীমতী যশোদার উপর, সেই রোজগার করিয়া যশোদাকে খাওয়াইবে, এই কথাটায় যশোদাব বিশ্বাস জন্মানোর জন্য তাই অমন ব্যাকুল হইয়া পড়িযাছিল সুধীর।

রাত্রে রান্না করিতে করিতে যশোদা ভাবে, না, তার কুলিমজুরেরাই ভালো। এদের যদি আপন না করিবে, আপন হইবে কারা ? সত্যপ্রিয়র মতো যারা বড়োলোক, অথবা জ্যোতির্ময়ের মতো যাবা ভদ্রলোক ? বড়োলোক, ভদ্রলোক আর ছোটোলোক, বিগড়াইয়া অবশ্য গিয়াছে সকলেই, তবু অভাবে যারা বিগড়াইয়া গিয়াছে তারা এখনও মানুষ আছে খানিক খানিক। আব এ অবস্থায জীবন কাটাইয়া খানিক খানিক মানুষ থাকাও কী সহজ গৌরবের কথা ! সুধীরের মতো একজন করিয়া প্রত্যেক দিন তার সঙ্গে বেয়াদবি কবুক, তবুও যশোদা চিরকাল এদেরই ভালোবাসিবে।

সারাটা দিন বাহিরে কাটাইয়া রাত্রি প্রায় দশটার সময় সুধীর চুপিচুপি নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছিল। যশোদা হাঁকিয়া বলিল, ও মতি, সুধীবকে ডাকো, ভাত খেয়ে যাক।

সুধীরকে রান্নাঘরে খাইতে বসাইয়া যশোদা বলিল, এবারটি ধরলাম না তোমার কথা, আর কিন্তু ও সব বোলো না আমায় কোনোদিন।

সুধীর মুখ নিচু করিয়া খাইতে থাকে, যশোদা পিঁড়িটা আর একটু সরাইয়া আনিয়া মুখোমুখি বসিয়া বলে, কাজে যাওনি আজ ?

না।

কাল থেকে যেয়ো।

রান্নাঘরটি যশোদার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কেবল তিনটি উনানের ধোঁয়ায় দেয়াল কালিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। ধোঁয়ার সঙ্গে লড়াই করিয়া যশোদা পারে না। দোষটা অবশ্য আসলে ধোঁয়ার নয়, মানুষের পেটের। দু-বেলা ভাত সিদ্ধ করিতে না হইলে তিনটি উনানে দু-বেলা আঁচ দেওয়ারও দরকার হইত না, দেয়ালে এত কালিও জমিত না।

ঘর-সংসার করার সাধ হয়ে থাকলে বিয়ে-থা করো একটা ? বলো তো আমিই না হয় বিয়েটা দিয়ে দিই তোমার একটা মেয়ে ঠিক করে ?

সুধীর মাথা নাড়িয়া চুপচাপ খাইয়া যায়।

যশোদা বলে, বেশ তো সাধ না হয়ে থাকে আমার কথা রাখবার জন্যেই বিয়ে করো। তুমি তো বলছিলে আমার জন্য প্রাণ দিতে রাজি আছ। প্রাণ দেওয়াব চেয়ে বিয়ে করাটা কি কঠিন নাকি ?

সুধীর চুপচাপ খাইয়া যায়।

চাঁপাকে যদি তোমার পছন্দ হয়—

সুধীর মাথা নাড়ে। যশোদা বলে, অ ! আমি ভাবলাম কী, হযতো বা চাঁপাকে পছন্দ হয়েছে তোমার।

এবার সুধীর মুখ তুলিয়া বলিল, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা কেন দিচ্ছ চাঁদের মা ?

সেদিন এই পর্যন্ত। দিন তিনেক চুপচাপ থাকিয়া যশোদা আবার অন্যভাবে কথাটা পাড়িল। চাঁপা বড়ো কষ্টে দিন কাটাচ্ছে, এমন মায়া হয় মেয়েটাকে দেখলে ! তুমি যদি বিয়ে কর ওকে, বড্ড খুশি হব আমি।

চাঁপাকে ? চাঁপার কি মায়ামমতা কিছু আছে চাঁদের মা ? ওর চেয়ে কালো ঢের ভালো।

তারপর যশোদা ঘটকালি করিয়া কালোর সঙ্গে সুধীরেব বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিল। বলিল, খবচার টাকাটা কিন্তু ফেরত দিতে হবে বাবু। দু টাকা চার টাকা করে দিয়ো, কিন্তু যদ্দিনে হোক শোধ করে দিতেই হবে। তুমি আমার এমন কিছু সাতপুরুষেব কুটুম নও যে, তোমার ঘর-সংসার পাততে গিয়ে আমি ফতুর হব।

একদিনে দুটি বিবাহ হইয়া গেল, সুধীরেব সঙ্গে কালোর আর জগতের সঙ্গে চাঁপার। কদিন পরে সত্যপ্রিয়র ছোটোমেয়ের বিবাহ, এখন হইতে গেটে শানাই বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে। যশোদাব বাড়িতে দুটি বিবাহে শানাই বাজিল শুধু এক সন্ধ্যা, উৎসব হইল একটু অভদ্র রকমের, তবে এমন জমজমাট উৎসব হইল বলিবাব নয়। রা বাবোটাব পর মতির তো জ্ঞানই বহিল না। যশোদাকে একাধারে কন্যাকর্তা ও বরকর্তার নাবী-সংস্করণ হইয়া সমস্ত দাযিত্ব ঘাড়ে নিতে হইল বটে, আমোদ-আহ্লাদ সেও করিল না কম। সকলের সঙ্গে এক হইয়া সে মিশিয়া গেল। নেশাটা জমিয়া আসিলে মতি একবার তাব গলাটা জড়াইয়া ধরিযাছিল, হাত ছাড়াইয়া যশোদাকে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চলিযা যাইতে দেখিয়া সবাই ভাবিযাছিল সে বুঝি রাগ করিযাছে। ওমা, খানিক পবে এক বাটি দুধ আর একটা চামচ আনিয়া সকলের সামনে জোব করি মতিকে শিশুর মতো কোলে শোযাইয়া যশোদা তাকে তিন চামচ দুধ খাওয়াইযা ছাড়িল !

পাঁচ

যশোদা বড়ো ব্যস্ত, একেবারে সময় পায় না। দুটি বিবাহের হাঙ্গামা চুকিতে না চুকিতে সত্যপ্রিয় মিলে জোরালো ধর্মঘটের আয়োজন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সবদা যশোদার কাছে লোকজন আসে যায়, তার সঙ্গে পরামর্শ করে, শ্রমিকদলের সভায় গিয়া তাকে বক্তৃতা করিতে বলে। যশোদার পরামর্শের ধরনটা একটু বিচিত্র। খুঁটিয়া খুঁটিয়া সে কেবল প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া যায় অথবা যারা পরামর্শ করিতে আসে তাদের কথা কাটাকাটি মন দিয়া শোনে। তারপর একেবারে মত প্রকাশ করে ; এখন করলেও চলে অবিশ্যি, কিন্তু কিছুকাল পরে কবলেই ভালো হত।

বক্তৃতা করা সম্বন্ধে হাতজোড় করিয়া বলে, ওটি মাপ করতে হবে। আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, অত ভনিতে করে সাজিয়ে গুজিয়ে বলা আমার কম্মো নয়। দু-দশজনে এলে, কথাবার্তা কইলাম, সে আলাদা। ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়, বক্তিমে করব কী গো !

অপরাজিতার সম্বন্ধে জ্যোতির্ময়কে সতর্ক করিয়া দিবে ভাবিয়াছিল, নানা হাঙ্গামায় যাওয়া হয় নাই। মাঝখানে অপরাজিতা আর একদিন তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, সেদিন তার অবস্থা দেখিয়া সত্যসত্যই যশোদার বড়ো ভাবনা হইয়াছে। একদিন যশোদা জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেল।

বড়ো ব্যস্ত জ্যোতির্ময়। সত্যপ্রিয়র কন্যার বিবাহ উপলক্ষে প্রীতি-উপহারের পদ্য লিখিতেছে। একটি দুটি নয়, অনেকগুলি। মা-বাবা, মাসি-পিসি, খুড়া-জেঠা, দাদা-দিদি, বউদিদি, ভগ্নীপতি ইত্যাদি নানা সম্পর্কের উপযোগী আশীর্বাদে গুরুগম্ভীর অথবা হাসি-তামাশায় হালকা পদ্য লিখিতে হইবে। প্রত্যেক পদ্যের শেষে ভগবানের কাছে প্রার্থনা থাকিবে যে, নবদম্পতি যেন সুখী হয়। একটু ক্লিষ্ট দেখাইতেছে জ্যোতির্ময়কে, অসুখী মনে হইতেছে। প্রীতি-উপহারের পদ্য লিখিবার পরিশ্রমে নয়, সেই নেকলেসটার জন্য। নেকলেসটা যেন পাইয়া বসিয়াছে জ্যোতির্ময়কে, ক্রমাগত পীড়ন করিতেছে। ভাবিয়া সে কিছু ঠিক করিতে পারে না। সত্যপ্রিয় তাকে এমনভাবে ঠকাইবে কেন ? এমন কোনো কথা ছিল না যে, কর্মচারীর বউকে তার হাজার টাকা দামের গহনা দিতেই হইবে, না দিলে লোকে নিন্দা করিবে, তাই বাধ্য হইয়া কোনোরকমে সেদিন মানরক্ষা করিতে হইয়াছে ! সত্যপ্রিয় অবশ্য বলিয়া দেয় নাই যে, হাজার টাকা দামের নেকলেস দেওয়া হইল, কিন্তু সেদিন নেকলেসটির ঝলমলে রূপ দেখিয়া সেই ধারণাই তো সকলের মনে জাগিয়াছিল, লোকের মনে এ রকম মিথ্যা ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি সত্যপ্রিয়র না থাকিবে, এমন জিনিস সে কেন দিবে প্রথম কয়েকদিন যা চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়, তারপর কয়েক মাসের মধ্যে চাকচিক্য হারাইয়া এমন সস্তা দেখাইতে থাকে ? সত্যপ্রিয় ভালো একখানা কাপড় দিতে পারিত, ছোটোখাটো সোনার কিছু দিতে পারিত, কিছু না দিয়াও পারিত। একেবারে কিছু না দিলে জ্যোতির্ময় একটু ক্ষুণ্ণ হইত সত্য, কিন্তু সে ক্ষোভ এমন উগ্র হইত না, এমন স্থায়ীও হইত না।

সত্যপ্রিয়র দোষক্ষালনের জন্য কতভাবেই যে ব্যাপারটা জ্যোতির্ময় বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ভাবিয়াছে, হয়তো সত্যপ্রিয় জানিত না, নিজে তো দোকানে গিয়া সে জিনিসটি কেনে নাই। এত সব খুঁটিনাটি বিষয়ে নজর দিবার তার সময় কোথায় ? একেবারে অপরাজিতার হাতে দিবার সময় এক মিনিটের জন্য ছাড়া হয়তো জিনিসটা সত্যপ্রিয় ধরেও নাই, চোখেও দেখে নাই। যে জিনিসটা কিনিয়া আনিয়াছে, শেষ মুহূর্তে যে সত্যপ্রিয়র হাতে জিনিসটা তুলিয়া দিয়াছে, সেই হয়তো ঠকাইয়াছে সত্যপ্রিয়কে। নির্ভয়েই ঠকাইয়াছে, কারণ দুদিন পরে ফাঁকি ধরা পড়িলেও কেউ তো আর সত্যপ্রিয়কে জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে না, আপনি আমার বউকে কত দামের উপহার দিয়েছিলেন ?

প্রীতি-উপহারের পদ্য লিখিতে বসিয়া এইসব কথাই জ্যোতির্ময় ভাবিতেছিল, যশোদাকে দেখিয়া খুশি হইয়া বলিল, এসো চাঁদের মা। সব সময় এসো না কেন বলো তো ?

সব সময় আসব কেন ?

তা ঠিক। সত্যি বলছি চাঁদের মা, তোমার সঙ্গে কথা বলতে এমন ভালো লাগে, এমন সহজভাবে তুমি কথা বলতে পার। কোনো বিষয়ে তোমার ন্যাকামি নেই। মানুষের মন রেখে কথা বলতে বলতে প্রাণ বেরিয়ে গেল চাঁদের মা।

না বলিলেই পারেন ?

সেটা যে সম্ভব নয়, যশোদাও খানিক খানিক বোঝে। অন্যভাবে কথা বলিতে জানিলে তো বলিবে, মানুষের মন রাখিয়া কথা না বলিলে বোবা হইয়া থাকিতে হয়।

অপরাজিতার কথাটা যশোদা প্রথমে জ্যোতির্ময়ের মন রাখিয়া মোলায়েম করিয়াই বলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু জ্যোতির্ময় যেন শুনিয়াও শোনে না, কথাটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে মনে হয় না। তখন যশোদা ভদ্রতা ভুলিয়া যায়, এমন সব কথাই শোনায় যে মনে মনে জ্যোতির্ময় রাগিয়া

যায়, ভাবে যে কড়া সুরে বলিয়া দিবে কিনা, তার স্ত্রীর ভাবনা যশোদাকে ভাবিতে হইবে না কিন্তু ভদ্রলোক বলিয়া কিছুই সে বলিতে পারে না, চুপচাপ শুনিয়া যায়, মাঝে মাঝে ভয়, বিস্ময় ও দুর্ভাবনা জানাইতে বরং এই ধরনের মন্তব্যই করে : সত্যি বলছ ? এ সব তো জানতাম না আমি ! ইস্, বড়ো অন্যায় হয়ে গিয়েছে তো !

বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিন না ?

বাপের বাড়ি ? তাই তো, বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেই তো হয় ! কথাটা তো একেবারেই খেয়াল হয়নি আমার ! বলিতে বলিতে জ্যোতির্ময় অন্যমনস্ক হইয়া যাওয়ার উপক্রম করে, অন্যমনস্ক হইয়া যাওয়ার উপক্রম করিতে করিতে বলে, তাই দেব। চক্কোত্তিমশায়ের মেয়ের বিয়েটা চুকে গেলেই পাঠিয়ে দেব।

যশোদা উঠিয়া আসিবে, হঠাৎ জ্যোতির্ময় জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা চাঁদের মা, তোমাকেই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। চক্কোত্তিমশায়কে তো তুমি চেন, তোমার কী মনে হয় সামান্য কটা টাকার জন্য উনি ছোটোলোকোমি করতে পারেন ?

যশোদা সঙ্গে সঙ্গে বলিল, তা পারেন।

পারেন ? —জ্যোতির্ময় যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সত্যপ্রিয়র মেয়ের বিবাহের তিনদিন আগে সত্যপ্রিয় মিলে ধর্মঘট আরম্ভ হইয়া গেল। কেবল ধর্মঘট নয়, একটু মারামারিও হইয়া গেল। এবারও মারামারির সূত্রপাত হইল মতির জন্য। বড়ো রহস্যময় মারামারি। পরদিন ধর্মঘট হইবে, কাজ করিতে হইবে না ভাবিয়া আগের দিন রাত্রে মতি— মিলের প্রায় এক মাইল দূরে তার একটি চেনা স্ত্রীলোকের ঘরে নিশ্চিন্ত মনে মদ খাইতে গিয়াছিল। একাই গিয়াছিল, কালোকে বিবাহ কবিবার পর সুধীর আর মতির সঙ্গে হল্লা করিতে বাহির হয় না। কার যেন একটু রাগ ছিল মতির উপরে, এতদিন গোঁয়ার সুধীরটা সঙ্গে থাকায় মতিকে কিছু বলিতে পারে নাই, সেদিন রাত্রে একা পাইয়া মারিয়া সে মতিকে একেবারে জখম করিয়া দিল। পরদিন সত্যপ্রিয় মিলে গুজব রটিয়া গেল যে মতি খুন হইয়াছে। মিলের সামনে কয়েক শো শ্রমিক জমায়েত হইয়াছিল। শ-তিনেক শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয় নাই, মিলের গেট বন্ধ করিয়া কাশীবাবু তাদের দিয়া কিছু কিছু কাজ চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল। ভিতরের মজুরদের অন্য পথে বাহির হইবার চমৎকার ব্যবস্থা কাশীবাবু করিয়াছিল, কিন্তু তারা দল বাঁধিয়া সদরের গেট দিয়াই বাহির হইয়া আসিল ; কতলোকে কতরকম উসকানিই যে দিতেছিল !

বাহিরের দলের একজন হাঁকিয়া বলিল, তোরা মতিকে মারলি কেন রে ? বলিয়াই সেও যে ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়া গেল !

ভিতরের দলের একজন হাঁকিয়া বলিল, তোরাও অমনিভাবে মরবি ! বলিয়া সেও যে ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়া গেল !

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল মারামারি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং পুলিশ আথালিপিথালি সকলকে পিটাইতেছে। কয়েকজন জখম হইয়া হাসপাতালে গেল, কয়েকজন গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে গেল, মিল অঞ্চল প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় যশোদা যখন হাসপাতালে কয়েকজন আহত শ্রমিকের কাতরানি শুনিতেছে, সত্যপ্রিয় মিলের মজুরদের মধ্যে খবর রটিয়া গেল যে ধর্মঘট উসকানির জন্য যশোদার উপর এমন অকথ্য অত্যাচার করা হইয়াছে যে তাহাকে হাসপাতালে যাইতে হইয়াছে। মতি খুন হয় নাই এ খবরটাও পাওয়া গেল।

পরদিন একজন মজুরও সত্যপ্রিয় মিলে কাজ করিতে গেল না। মতির মতো যশোদার সম্পর্কে গুজবটাও যে সত্য নয় এটা অবশ্য ক্রমে ক্রমে সকলেই জানিতে পারিল, কিন্তু তখন আর সে জন্য

কিছু আসিয়া যায় না, কাল মারামারিটা হইয়া যাওয়ার ফলে সত্যপ্রিয় মিলের মজুরদের মধ্যে মনের মিল হইয়া গিয়াছে।

মারামারির ফলে মনের মিল ? মজুরদের মধ্যে ও রকম হয়, ওরা ছোটোলোক কিনা। দু-একজন লোক দলের মধ্যে চিড় খাওয়াইয়া দেয়, একজনের মনে হয়তো একটু অভিমান আছে, ধর্মঘটের দাবি উঠাইতে তার পরামর্শটা গ্রাহ্য করা হয় নাই। সে কয়েকজনকে শুনাইয়া বলিল, কর্মো নেই ধর্মো ঘটে। কয়েকজনের মনে হইল, তাই তো বটে, কী দরকার হাঙ্গামায় ? কয়েকজনের মনে হইল, একজন যেন বড়ো বেশি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে ধর্মঘটের জন্য, ওর মতলবটা কী ? হিংসা, ভয়, সন্দেহ, দুর্বলতা, অবিশ্বাস, ভুল ধারণা আর আত্মমর্যাদার অভাব তো চিরদিন পুরামাত্রাতেই আছে, তার উপরে একটু কুপরামর্শ জুটিলে আর দেখিতে হয় না। যে ধর্মঘট করে না সে ভাবে, যারা ধর্মঘট করিয়াছে তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী ? একটু হাতাহাতি, মারামারি করিতে পাইলে এই চরম প্রশ্নের মীমাংসাটা তাদেব হইয়া যায়, হঠাৎ যেন তাদের তুচ্ছ জীবনে এ ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। কুপরামর্শদাতারা সময়মতো সাবধান না হইলে এই জন্য মারামারির পর মজুরদের মনের মিল হইয়া যায়।

মারামারিতে সুধীর একটু জখম হইয়াছিল। পরদিন সকালে ঘর হইতে তাকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া গেল। জগৎকেও তারা খুঁজিতেছিল, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না।

চাঁপা নির্বিকার চিত্তে বলিল, আমি কী জানি তার খবর ? রাতে ঘরে ছিল না।

যশোদা রান্না করিতেছে, ঝড়ের মতো কালো ছুটিয়া আসিয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ও দিদি, পুলিশে ধরে নিল যে ?

যশোদা বলিল, নিক না। জোয়ানমদ্দ মানুষটাকে পুলিশ কি গিলে খাবে ? হাঙ্গামা মিটলেই ছেড়ে দেবে দুদিন পরে।

কালো তা বুঝিতে চায় না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপে আর ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদে। মেয়েমানুষ সমস্ত গন্ডগোলের গোড়া, এই মতবাদ খাড়া করিয়া যশোদা যে এ বাড়িতে স্ত্রীলোক থাকিতে দেয় না, এ বাড়িতে ঢুকিয়া কালো যেন যশোদার সেই মতবাদটাই প্রমাণ করিয়া দিতে থাকে। যশোদা শেষে রাগ করিয়া বলিল, কেবল কি পিরিত করতে জেনেছিস, বাছা সংসারে ? একটু এদিক ওদিক হলে যদি চোখে আঁধার দেখবি, পিরিতের মানুষটাকে আঁচলে বেঁধে রাখিস না কেন ?

এই বলিয়া রাগে আগুন হইয়া যশোদা হনহন করিয়া হাজির হইল একেবারে গলির মোড়ে, যেখানে কাশীবাবু একটু আড়ালে গা-ঢাকা দিয়াছিল।

সুধীরকে ধরানো হচ্ছে কী জন্যে ? ওরা মারামারি করেছে নিজেদের মধ্যে, আপনার তাতে কী ? এমনিতে পুলিশ তো মেরে লোপাট করে দিলে, আপনি আবার বেছে বেছে এক-একজনার পিছনে লাগছেন কেন ?

সঙ্গে পুলিশ ছিল, কাশীবাবু নির্ভয়ে একগাল হাসিয়া বলিল, সুধীর তোমার পিরিতের লোক নাকি যশোদা ? তা তো জানতাম না ! জড়িয়ে ধরার সময় বেড় পায় ?

বটে রে মুখপোড়া, রসিকতা হচ্ছে ?—হাত ধরিয়া হ্যাঁচকা টানে কাশীবাবুকে কাছে টানিয়া আনিয়া ঘাড় ধরিয়া মাথাটা নিচু করিয়া যশোদা ভদ্রলোকের মুখখানা জোরে জোরে রাস্তায় ঘষিয়া দিল। কাশীবাবু যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইল, মুখের অর্ধেক চামড়া তার উঠিয়া গিয়াছে, দরদর করিয়া রক্ত চোঁয়াইয়া পড়িতেছে।

সুতরাং সুধীরের সঙ্গে যশোদাও হাজতে গেল। ঘণ্টা তিনেক পরে সত্যপ্রিয় স্বয়ং তাকে ছাড়াইয়া লইয়া আসিল। যশোদার সামনেই মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধা কাশীবাবুর কাছে হাতজোড় করিয়া বলিল, আপনাকে মিনতি করছি কাশীবাবু, আমায় না জানিয়ে দয়া করে কিছু আপনি করতে যাবেন

না। দুদিন একটু ব্যস্ত আছি, দাঙ্গা বাধিয়ে, পুলিশ ডেকে এক কাণ্ড করে আপনি বসে আছেন। আমার মিলের লোককে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল, আপনি ভাবছেন এতে আমার সম্মান খুব বাড়ল ? কে ডাকতে বলেছিল আপনাকে পুলিশ ? আমার দেশের মানুষ ওরা, দুটি অন্নের জন্য খাটতে এসেছে, খিটিমিটি বাধে নিজেদের মধ্যে তা মিটিয়ে নেব, ওদের না পোষায় ওরা কাজ করবে না, আমার না পোষায় আমি কারখানা তুলে দেব—পুলিশ ডাকব কোন লজ্জায় ?

যশোদা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কাশীবাবুর রাস্তায় ঘষা মুখটা বোধ হয় বড়ো জ্বালা করিতেছিল, মাথার ঠিক ছিল না, সত্যপ্রিয়র তীব্র অনুযোগে থতোমতো খাইয়া সে বলিয়া বসিল, আজ্ঞে আপনি নিজেই তো—

সত্যপ্রিয় গর্জন করিয়া উঠিল, যান, যান, বাড়ি যান আপনি। আপনার মতো অপদার্থ লোক রেখেই আমার সর্বনাশ হবে একদিন।

কাশীবাবু বিছানায় শুইয়া স্ত্রীর সেবা গ্রহণের জন্য বাড়ি গেল। সত্যপ্রিয় বলিল, যশোদা, তিন মাস আমি মিলের কোনো ব্যবস্থা বদলাতেও পারব না, নতুন ব্যবস্থা চালাতেও পারব না। আমি যদি বলি তিনমাস পরে আমি নিজে খোঁজখবর নিয়ে ওদের সমস্ত নালিশ আর দাবির ব্যবস্থা করব, হাঙ্গামাটা তুমি মিটিয়ে দিতে পারবে ?

যশোদা ভাবিয়া বলিল, আপনি যদি বলেন—

আমি বলছি।

যশোদা চেষ্টা করিয়া দেখিতে রাজি হইয়া চলিয়া আসিল বটে, মনটা তার খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। এই সময় ধর্মঘট চালাইয়া যা কিছু আদায় করিতে পারা যায়, আদায় করিয়া লইলেই ভালো হইত। এ সব মতলববাজ লোককে বিশ্বাস আছে ? তিন মাসে কত কী করিয়া বসিবে ঠিক আছে কিছু ! কিন্তু টাকা সম্বন্ধে যত মতলববাজ লোকই হোক— ব্যাবসাদার মানুষেরা ও রকম একটু হয়— দেশ সম্বন্ধে একটু মমতা বোধ হয় আছে সত্যপ্রিয়র। পুলিশ সম্বন্ধে যে কথাগুলি সত্যপ্রিয় বলিল, তার মধ্যে একটু আন্তরিকতা আছে বলিয়া মনে হইল না ?

বাড়ি ফিরিয়া কালোর খোঁজ করিতে গিয়া যশোদা দেখিল, না খাইয়া ঘরে কপাট দিয়া সে পড়িয়া আছে। যশোদা ডাকিতে সে দরজা খুলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে আলো একটু কম, আলো কম বলিয়াই বোধ হয় কী যে একটা আশ্চর্য কমনীয় রূপ চোখে পড়ে কালোর দুঃখক্লিষ্ট মুখে ! ন্যাকামি দেখিয়া রাগ করার বদলে যশোদা যেন একটু আশ্চর্য হইয়া গেল—সময় সময় এমন দেখায় কেন মানুষের মুখ ? মুখখানা কচি বলিয়া ? না সত্যই ভিতরের কিছু মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে ? এ রকম আকুল হওয়ার মধ্যে সুখ আছে নাকি কিছু, একটা বিশেষ ধরনের আনন্দ, যশোদা যার স্বাদ জানে না ?

যশোদার দেহে সুধীরের বাহুর বেড় না পাওয়ার রসিকতাটা যশোদা ভুলিতে পারিতেছিল না, প্রেমিকের বাহুবন্ধনের জন্য যশোদার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নাই, তবু ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে হইতেছিল, কথাটা তো মিথ্যা নয় কাশীবাবুর, দেহটা তার একটু বড়োসড়ো বইকী। যেমন ধর এই কালো, এই ছিপছিপে পাতলা মেয়েটাকে সুধীর যেমনভাবে বুকে তুলিয়া লইতে পারে—ঠিক তেমনিভাবে যশোদাকেও বুকে তুলিয়া লইতে একজন বোধ হয় পারে—ধনঞ্জয়। কাশীবাবুকে ডাকিয়া আনিয়া ধনঞ্জয়ের চেহারাটি একবার দেখাইয়া দিবে নাকি, একবার বলিয়া দিবে নাকি যে, আপনার মতো বামনাবতার সবাই নয়। মশায়, হ্যাঁ দেখুন চেয়ে ? হাতে হাতে অবশ্য প্রমাণ করিয়া দেওয়া চলিবে না যে যশোদাকে বেড় দিবার পক্ষে ধনঞ্জয়ের বাহু দুটি যথেষ্টই লম্বা—

কিন্তু ধনঞ্জয়ের পা কাটা গিয়াছে। আর কি এখন মানুষকে ডাকিয়া গর্বের সঙ্গে তাকে দেখানো চলে ?

অপরাধটা যেন কালোর, এমনিভাবে হঠাৎ বেচারা কালোর উপরে রাগ করিয়া সে বলিল, না খেয়ে পড়ে আছিস যে ছুঁড়ি ? একটা দিনের জন্য তোকে ছেড়ে যেতে পাবে না সে মানুষটা ?

কালো সাগ্রহে বলিল, একটা দিন দিদি ? কাল আসবে ?

আজকেই হয়তো আসবে। যা, নেয়ে খাবি যা।

সত্যপ্রিয়র বাগানবাড়িতে সত্যপ্রিয়র একটি মেয়ের বিবাহ, কিন্তু মনে হয় সমস্ত শহরতলিতে যেন রাশি রাশি মেয়ের বিবাহ হইতেছে। যশোদার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সত্যপ্রিয়র মোটরে আসিয়া যশোদার গলির সামনে মোটর দাঁড় করাইয়া জ্যোতির্ময় আর অনাথ দুজনে তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিল।

গাড়ি নিয়া নিমন্ত্রণ করিতে যাওয়ার কথায় জ্যোতির্ময় বলিয়াছিল, আজ্ঞে, গাড়ির দরকার নেই, বাড়ি ফেরার পথে আমি বলে যাব। শুনিয়া হঠাৎ এমন একটা অদ্ভুত রকমের উদাসভাব সত্যপ্রিয়র মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল বলিবার নয়। জ্যোতির্ময় তাড়াতাড়ি ত্রুটি সংশোধন করিয়া বলিয়াছিল, আজ্ঞে, গাড়ি নিয়েই যাই তবে, তাড়াতাড়ি হবে।

সত্যপ্রিয় বলিয়াছিল, না না, তাড়াহুড়ো করবেন না। বাড়িতে ঢুকেই বললেন, তোমার নেমন্তন্ন, আর বলেই চলে এলেন, এতে অপমান করা হয় মানুষের। বসে কিছুক্ষণ আলাপ পরিচয় করে বিশেষভাবে অনুরোধ করে আসবেন, বিয়েতে যেন আসে।

বিবাহের দিন সন্ধ্যার সময় সত্যপ্রিয়র গাড়িতেই জ্যোতির্ময় বাড়ির সকলকে এবং যশোদা ও নন্দকে বিবাহবাড়িতে নিয়া গেল। ধর্মঘট মিটাইয়া দিয়া যশোদা যেন সত্যপ্রিয়কে কিনিয়া ফেলিয়াছে, কীভাবে তাকে সম্মান দেখাইবে সত্যপ্রিয় ভাবিয়া পাইতেছে না।

যশোদা কিন্তু সংশয়ভরে নন্দকে বলিয়াছে, উঁহুঁ, কী যেন মতলব আছে লোকটার। নইলে এমন বাড়াবাড়ি করত না।

নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথায় অপরাজিতা এবারও বলিয়াছিল, আমি যাব ? তারপর রওনা হওয়ার সময়ও সে আপত্তি করিয়াছে, বলিয়াছে, দ্যাখো, শরীরটা বড়ো খারাপ লাগছে, ভিড়ের মধ্যে নাইবা গেলাম আমি ?

একবারটি চলো লক্ষ্মী। গিয়ে না হয় একপাশে চুপটি করে বসে থেকো।

সকলকে অন্দরের মুখে ছাড়িয়া দিয়া জ্যোতির্ময় এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড হোগলার মণ্ডপ তোলা হইয়াছে, থামগুলি রঙিন কাগজ আর দেবদারু পাতায় ঢাকা, বাহিরের গাছগুলিকে লাল নীল আলোয় সাজানো হইয়াছে। অনেকগুলি জোরালো আলোয় চারিদিক ঝলমল করিতেছে। পান, সিগারেট আর শরবত বিতরণ করা হইতেছে হরদম, মাঝে মাঝে গোলাপজলের পিচকারিও মারা হইতেছে। চারিদিকে লোক গিজগিজ করিতেছে, নানা অবস্থার নানা বয়সের লোক—বাঙালিই বেশি, অবাঙালিও আছে। সকলেই বেশভূষা করিয়াছে প্রাণপণে, কিন্তু গরিবদের দেখিলেই চেনা যায়। কেবল পোশাক ভেদ করা দারিদ্র্য নয়, অনভ্যস্ত উৎসবের আবেষ্টনীতে সকলের দৈনন্দিন অভ্যস্ত জীবনের পরিচয় বিচিত্র ইঙ্গিতে প্রকাশ হইয়া যাইতেছে। সংকোচ, ভয়, দীনতা, দুঃখ, রোগ, শোক, বিষণ্ণতা, তার নিজের ? চার-পাঁচজন চেনা মানুষ জিজ্ঞাসা করিয়াছে, মুখ তার শুকনো কেন, তার কী অসুখ করিয়াছে ? এত বড়ো ভয়ানক কথা যে, একটা নেকলেস তাকে এমন অবস্থায় আনিয়া দিতে পারে যে, তাকে দেখিলে লোকের মনে হয় সে অসুস্থ !

ক্রমাগত গাড়ি আসিয়া নিমন্ত্রিতদের নামাইয়া দিয়া যাইতেছিল। জমিদার, ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী, উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার। তিনজন মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীর পরে দুজন মন্ত্রীর আবির্ভাব ঘটিল—একজন অন্য প্রদেশের। তারপর কয়েকজন বোম্বাইওয়ালা, পাঞ্জাবি ও য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীর পিছনে আসিল দুজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। দুজনেই ইংরেজ। বোধ হয় এদের অভ্যর্থনা করার জন্যই

একজন বাঙালি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এতক্ষণ সত্যপ্রিয়র কাছে দাঁড়াইয়া মোটা একটা সিগার টানিতেছিল। এদের একজনের সঙ্গে জ্যোতির্ময় চাকরির প্রথম দিকে একবার দেখা করিতে গিয়াছিল। নিজে যায় নাই, সত্যপ্রিয় সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। একটু চা পান আর ঘণ্টাখানেক নানা বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। ঠিক যে আলোচনা হইয়াছিল তা নয়, নানা বিষয়ে জ্যোতির্ময়ের মতামত জানিবার জন্য যেন কতকটা জেরাই করা হইয়াছিল জ্যোতির্ময়কে, তবে সে কাজটা ভদ্রলোক করিয়াছিল বড়োই অমায়িকভাবে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আগাগোড়া সত্যপ্রিয় বিশেষ কথা শুনিয়াছিল—যেটা সত্যপ্রিয়র একেবারেই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যাই হোক, কোনো বিষয়ে নিজের কোনো মতামত জ্যোতির্ময়ের ছিল কিনা সন্দেহ, ততদিনে সত্যপ্রিয়র মতামতগুলিও সে মোটামুটি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, সুতরাং সত্যপ্রিয়র সামনে বসিয়া ভারতবর্ষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে তার বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। সত্যপ্রিয়ও মোটামুটি খুশি হইয়াছিল, কেবল ফিরিবার সময় দু-একটি বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিল, আমার কথাগুলি এখনও সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারেননি। যাই হোক, আপনার নিষ্ঠা আছে, ধীরে ধীরে বুঝবেন। আমার কত বছরের চিন্তার ফল, ও কী আর দু-চারদিনে বোঝা যায়।

তারপর জ্যোতির্ময় আর ইংরেজ ভদ্রলোকটির সংস্পর্শে আসে নাই। কিন্তু সত্যপ্রিয়র যত লেখা ও বক্তৃতা ছাপা হয়, সত্যপ্রিয় নিজে যে সেগুলিতে নানারকম মন্তব্য যোগ করিয়া এর কাছে পাঠাইয়া দেয়, কিছুদিন পরে জ্যোতির্ময় তা জানিতে পারিয়াছে।

সেই সঙ্গে একটা বিষয়ে জ্যোতির্ময়ের একটা অস্পষ্ট ধারণাও জন্মিয়াছে। গভর্নমেন্টের বড়ো বড়ো কনট্রাক্ট বাগানোর ব্যাপারে সত্যপ্রিয় যে অসাধারণ ও প্রায় অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, অনেকের কাছেই তা দুর্বোধ্য রহস্যে ঢাকা। কিন্তু জ্যোতির্ময়ের মনে হয়, এই ইংরেজ ভদ্রলোকটির অনুগ্রহেই বোধ হয় সত্যপ্রির এই বিশেষ সৌভাগ্য।

স্পষ্ট ধারণা করিবার উপায় নাই। সত্যপ্রিয়কে ব্যক্তিগতভাবে এতখানি অনুগ্রহ করিবার মতো উচ্চপদে তো ভদ্রলোক প্রতিষ্ঠিত নয়। ব্যক্তিগত অনুগ্রহের ব্যাপারও এটা নয়। জোর গলায় যে ঘোষণা করিতেছে যে, আমি দেশকে ভালোবাসি, ভারতবর্ষের সকল সমস্যার সমাধান আমি আবিষ্কার করিয়াছি, দেশের অপরিণামদর্শী অন্ধ নেতাদের প্রদর্শিত ভ্রান্তপথ ত্যাগ করিয়া আমার প্রদর্শিত পথে চলিলে তেত্রিশ বৎসরে ভারত স্বাধীন হইবে, ভারতের ঘরে ঘরে সুখ ও শান্তি বিরাজ করিবে—মাঝে মাঝে সে ইংরেজ-বিদ্বেষ আর সোজাসুজি গভর্নমেন্টের সঙ্গে বিরোধ ত্যাগ করিতে বলে বলিয়াই কি তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার মতো উদারতা গভর্নমন্টের হয় ?

অথবা হয় ?

কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না জ্যোতির্ময়। মনে হয়, কোথায় যেন একটা ধাঁধা আছে। দেশপূজ্য নেতা, স্বদেশি প্রতিষ্ঠান, স্বাধীনতার আন্দোলন সমস্ত কিছুরই বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্যপ্রিয় যেমন করে, গভর্নমেন্টের নিন্দাও তো করে ? অবশ্য স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচারকদের সমালোচনার সময় ভাষাটা যেমন তীব্র হয়, এদের প্ররোচনায় দেশের যে সর্বনাশ হইতেছে তার বর্ণনা যেমন রোমাঞ্চকর হয়, গভর্নমেন্টের নিন্দাটা তেমন জমে না। শিক্ষার অব্যবস্থা, নদীনালার সংস্কারের অভাব, পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রচারে সহায়তা, ভ্রান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ, এই ধরনের কয়েকটি বিষয়ে গভর্নমেন্টের ভুল দেখাইয়া সসম্ভ্রমে গভর্নমেন্টকে সতর্ক করিয়া দিয়াই সত্যপ্রিয় ক্ষান্ত হয়। তবু, এ সব তো বিরুদ্ধ সমালোচনা ? সত্যপ্রিয় যে সত্যসত্যই দেশকে ভালোবাসে, যত খাপছাড়া বা উদ্ভট সে ভালোবাসা হোক, তার লেখা ও বক্তৃতায় তার যথেষ্ট পরিচয় থাকে।

দেশের দুরবস্থার যে বর্ণনা লেখায় ও বক্তৃতায় সত্যপ্রিয় দেয়, দেশকে ভালো না বাসিলে কেউ তা পারে ? নেতারা যা চায় সত্যপ্রিয়ও তাই চায়—কেবল তার উপায়টা একটু পৃথক, একটু

অভিনব। কদিন আগেও সত্যপ্রিয়র একটি পুস্তক জ্যোতির্ময় প্রকাশ করিয়াছে, তাতে সত্যপ্রিয় স্পষ্টই বলিয়াছে, সর্বাগ্রে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা চাই, প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর চেষ্টা করা কর্তব্য : বলিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা কাকে বলে ধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থের সাহায্যে সেটা ব্যাখ্যা করিয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকগুলি সম্ভবত কেষ্টবাবুই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। তা হোক, সেটা বড়ো কথা নয়, সংস্কৃত শ্লোকের অপার সমুদ্রে ভাড়াটে ডুবুরি নামাইয়া রত্ন উদ্ধার করিলে দোষ হয় না, সেগুলি কাজে লাগাইতে পারাই আসল কথা। ব্যাখ্যার পর সত্যপ্রিয় নির্দেশ করিয়াছে, প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করিবার উপায়। এই উপায় নির্দেশ করাই প্রবন্ধটির প্রধান উদ্দেশ্য, প্রবন্ধটির নামই ছিল, 'তেত্রিশ বৎসরে ভারতের স্বাধীনতা লাভের উপায়'। ধর্ম যখন লোপ পায়, সমাজব্যবস্থা বিকৃত হয়, দেশবাসীর দারিদ্র্য, অন্নাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অকালমৃত্যু বীভৎস রূপ ধারণ করে, দেশহিতৈষীর তখন সর্বপ্রথম কর্তব্য কী ? এ সমস্তের মূল কারণ অনুসন্ধান। কারণ না জানিলে প্রতিকার হইবে কী রূপে? শাস্ত্রগ্রন্থ, ধর্মগ্রন্থ, দেশবিদেশের হাজার বৎসরের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া সত্যপ্রিয় দেখাইয়াছে, একটিমাত্র কারণে দেশের সর্বাঙ্গীণ দুরবস্থা ঘটে—রাজশক্তির সহিত উদ্দেশ্যহীন বিরোধ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনায় ঈশ্বর কয়েকটি মূলনীতি স্থির করিয়া দিয়াছেন, কেবল সূর্যের সহিত পৃথিবীর সম্পর্ক বিচার করিয়াই সে নীতির মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব, ওই সকল মূলনীতির একটি হইল—রাজশক্তির সহিত অকারণ কলহ করিলে দেশবাসীর ধর্ম, সমাজ, সুখ-সম্পদ স্বাস্থ্য-শান্তি নষ্ট হইবেই হইবে, কিছুই তাহা ঠেকাইতে পারিবে না। এই নিয়মের দ্বারাই বিশ্বনিয়ন্তা শক্তির সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। এইখানে সত্যপ্রিয় শক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের মতবাদ ও ভারতীয় ঋষিগণের মতবাদ আলোচনা করিয়া বিজ্ঞানের মতবাদের ভ্রান্তি প্রমাণ করিয়াছে, যদিও সত্যকথা বলিতে কী, আলোচনাটা জ্যোতির্ময় একবিন্দুও বুঝিতে পারে নাই। ভারতবর্ষে যে অধঃপতন হইয়াছে, ভারতবাসীর যে শোচনীয় দুরবস্থা দেখা দিয়াছে এবং দিন দিন অধঃপতন ও দুরবস্থা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ ভারতবাসীর রাজশক্তির সহিত বিবাদ। কিন্তু তাই যদি হয়, ভারতবর্ষ কি তবে স্বাধীনতা পাইবে না ? স্বাধীনতা পাইতে গেলেই তো রাজশক্তির সহিত ভারতবাসীর বিবাদ বাধিবে—কারণ রাজশক্তি বৈদেশিক ? না, তা নয়। সত্যপ্রিয় স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে, স্বাধীনতা ভারতবাসী অনায়াসে পাইতে পারে, তেত্রিশ বৎসরে পাইতে পারে, যদি ঠিক পথ অনুসরণ করা হয়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী রাজশক্তির সহিত ভারতে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে, কখনও একরূপে কখনও অন্যরূপে, কখনও প্রবলভাবে, কখনও ক্ষীণভাবে—ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দেয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অধঃপতন ঘটিতে ঘটিতে ভারত বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সুতরাং, মূর্খেরও এখন বোঝা উচিত যে ভারতবাসীর সর্বপ্রথম কর্তব্য রাজশক্তির সহিত সর্বপ্রকার বিরোধ পরিত্যাগ করা। কার্যে, চিন্তায় ও বাক্যে এমন কিছুই প্রশ্রয় পাইবে না যাহা রাজশক্তির পছন্দসই নহে। এমন কী, কেহ যদি ভ্রান্তিবশত রাজশক্তির বিরোধিতা করিয়া দেশের সর্বনাশ করিতে উদ্যত হয়, রাজশক্তি তাকে উপেক্ষা করিলেও দেশবাসীর নিজেদেরই কর্তব্য হইবে তাকে সংযত করা। একদিনে ইহা হইবে না সত্যপ্রিয় তাহা জানে, সত্যপ্রিয়র পন্থা অনুসরণ করিলে ইহাতে বিশ বৎসর সময় লাগিবে। যে মুহূর্তে ভারতবাসী রাজশক্তির সহিত বিরোধ পরিত্যাগের চেষ্টা আরম্ভ করিবে, সেই মুহূর্ত হইতে ধর্ম ও সমাজের অধোগতি রদ হইয়া দেশবাসীর অন্নকষ্ট, সুখশান্তির অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব এ সমস্তের প্রতিকারও আরম্ভ হইবে—বিশ বৎসর পরে দেখা যাইবে, একমাত্র পরাধীনতা ছাড়া ভারতবর্ষের কোনো অভাব নাই। ভারতীয় ধর্ম, ভারতীয় সমাজ-বিধান চরম উন্নতি লাভ করায় তখন পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করিবে, কারণ প্রকৃতির নিয়মে ধর্ম ও সমাজ বিধানের অনুরূপ রাজশক্তিই দেশে প্রচলিত থাকিতে পারে ; এইখানে ঋষিগণের বাক্য হইতে

সত্যপ্রিয় দেখাইয়াছে, একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আধারহীন শক্তি হয় না, আধার পরিবর্তিত হইলেই শক্তিরও বাহ্যিক রূপান্তর ঘটিবে, অবশ্য মূলশক্তি চিরদিনই অবিনাশী ও অপরিবর্তনীয়, ইত্যাদি। তেরো বৎসর ভারতবাসী যদি ধর্ম আর সমাজ বিধানের উৎকর্ষ বজায় রাখিতে পারে ভারতের বৈদেশিক রাজশক্তি ভারতীয় রাজশক্তিতে পরিণত হইবে। সুতরাং, তেত্রিশ বৎসরে ভারতবর্ষ কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, সর্বপ্রকাব স্বাধীনতা লাভ করিবে। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার করিয়া, স্বাধীনতার আন্দোলন তুলিয়া নেতৃবর্গ দেশেব ধ্বংসের পথটাই পরিষ্কার করিয়া দিতেছে—স্বাধীনতাকে হাজার বৎসর ভবিষ্যতে ঠেলিয়া দিতেছে।

সত্য কথা বলিতে গেলে, সত্যপ্রিয়র প্রবন্ধটি জ্যোতির্ময়ের কাছে কতকটা প্রলাপেব মতো মনে হইয়াছে, তবু কী যেন আছে প্রবন্ধটিতে যা মনের নীতিধর্মগত অন্ধবিশ্বাসে জন্ম-মৃত্যু-সীমাহীনতা নক্ষত্রলোক-আশ্রয়ী দুর্বোধ্য ও রহস্যময় অনুভূতিব জগতে, কেমন যেন একটা অদ্ভুত প্রভাব বিস্তাব করে। আশার কথা বলা হইয়াছে, তবু অকারণ হতাশায় মন ভরিয়া যায়, কার্যের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তবু মনে হয় হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকাই ভালো। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা বলিতে বসিয়া প্রাচীন ভারতের স্বর্গের সঙ্গে বর্তমান ভারতের নরকের তুলনা করিয়া, ধর্ম আর ঈশ্বর আর দর্শনের কথা বলিয়া, সত্যপ্রিয় যেন একেবারে মনের ভিত্তি ধরিয়া নাড়া দেয়—আসল বক্তব্য সত্যপ্রিয় কী যুক্তি দিয়া প্রমাণ কবিয়াছে সে বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়াই তার কথা মানিয়া লইতে ইচ্ছা হয। মাঝে মাঝে, বহির্জগতের চিন্তাধারার সঙ্গে হঠাৎ যখন জ্যোতির্ময়ের কোনো কারণে একটু সংস্পর্শ ঘটিয়া যায়, তখন দু-একবার তার মনে হইযাছে, সত্যপ্রিয়ব বলিবার যেন কিছুই নাই, সে শুধু ধর্ম, ঈশ্বর, শাস্ত্র, দেশ ও সমাজের দোহাই দিয়া দেশবাসীকে স্বাধীনতার প্রচলিত আন্দোলন বন্ধ কবিতে বলিতেছে। এই একটি কথাই বলিবার আছে সত্যপ্রিয়র এবং এই একটি কথাই সে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া ঘুরাইয়া ফিবাইযা পুনরাবৃত্তি করিযা চলিয়াছে।

এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে জ্যোতির্ময় বিবাহের আসরের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। একজন বড়োবাজারের বড়ো ব্যবসায়ী সামনে পড়িল। ভুঁড়ি নাই, বাঙলা বলিতে পারে। সত্যপ্রিয়র সঙ্গে অনেকদিনের ঘনিষ্ঠতা, কারণ, সত্যপ্রিয় তিনবাব তিনটি মুখের গ্রাসে লাখ তিনেক টাকা কাড়িয়া লইয়াছে।

জোতিরমোয়বাবু যে ! কেমোন আছেন ! ভাল ত ! একদৃষ্টে খানিক তফাতে সত্যপ্রিয়র দিকে চাহিয়া থাকে। সাদা ও কালো রাজকর্মচারী কজনকে সত্যপ্রিয় বিবাহের আসর দেখাইতেছিল এবং সম্ভবত হিন্দুবিবাহ পদ্ধতির অবনতি ও তাহার কুফল ব্যাখ্যা করিতেছিল।—দেখিয়েছেন জোতিরমোয়বাবু ! মেযের সাদি দিতে দিতে কেমোন নিজের কাম বাগিয়ে নিয়েতেছেন। কী চীজ আছেন আপনার সত্যবাবু ! কি বলিয়েতেছেন জনিসন সায়েবকে জানেন ? হামি জানি ! বলিয়েতেছেন—সায়েব, ইয়ংম্যান স্বদেশি করবে আর তোমরা তাদের জেলে ভেজবে, তোমরা তাদের জেলে ভেজবে আর ইয়ংম্যান স্বদেশি করবে—হামারা বাত শুনিয়ে, জেলে কখুনো দিয়ো না, একঠো নরম গরম মেয়ের সাথে জবরদস্ত সাদি দিয়ে দাও, স্বদেশি না করে ইয়ংম্যান তখন সে তিশ রুপেয়ার কেরানি বনে যাবে।

জ্যোতির্ময় হাসিয়া বলিল, তাই নাকি ! সত্যপ্রিয়বাবু ও কথা বলছেন আপনি কী করে জানলেন মোহনলালজি ?

হামি না জানিয়েলে কে জানবে ? হামি আর উনি দুজন তো টেন্ডার দিয়েলাম—সায়েব হামাকে পুছলো, মোহনলালজি, দেশকো যত আদমি ইংরেজ রাজকো ভাগাতে চায় তাদের কী করা যায় বলুন তো ? হামি বললাম, জেলমে পুরে দিন। বাস্, হামি আর টেন্ডার না পেলাম।

জ্যোতির্ময় সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, ওঁকে জিজ্ঞাসা করায় উনি কী বললেন ?

হামারা সামনে কি পুছিয়েছে : ওই অনুমান করে লিন না। আপনি সত্যবাবুকে না জানেন? সত্যবাবুর জবাব না শুনেন ?—হাসিয়ে হাসিয়ে উনি কোতোবার বলেছেন, সাধুকে দারু পিলাবে তো মন্দিরমে ঘটা করে পূজা দিয়ে চরণামৃত বোলকে পিলায়ে দেও। দশ রোজ পিলায়ে দিলে সাধু মাতাল হয়ে যাবে, চোরকে সাধু বানাবে তো আসলি সাধু বনে থাকলে চুরির কতো সুবিস্তা সমঝিয়ে দিয়ে দশ রোজ ধরে সাধু বানাও—চোর আর চুরি না করবে। সত্যবাবু সায়েবকো এসা কুছু বলিয়ে থাকবেন!

হয়তো তাই হইবে। যে সামান্য একটা নেকলেসের ব্যাপারে ছ্যাঁচড়ামি না করিয়া পারে না—

তারপর এক সময় কোনোরকমে লুচি পোলাও কিছু পেটে পুরিয়া মণ্ডপের থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া জ্যোতির্ময় নানা রঙের শাড়ি-পরা একদল ছোটো ছোটো চঞ্চল মেয়ের মহোল্লাসে প্রীতি-উপহারের সংগৃহীত কাগজ ভাগাভাগি করা দেখিতেছে, সত্যপ্রিয়র বড়োছেলে মহীতোষ আসিয়া তাকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

কী হয়েছে মহী?

বউদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

অপরাজিতা? অপরাজিতার আবার কী অসুখ হইল। অন্দরে মেয়েদের ভিড়, একটা ঘরে বাসর বসিয়াছে, বারান্দা ও দু-তিনটি ঘরে খাওয়া চলিতেছে, শাড়ির বর্ণ-বৈচিত্র্যে চোখ ঝলসিয়া যায়। কিছু না জানিয়াও জ্যোতির্ময় বুঝিতে পারিল, এদের একজনও অপরাজিতা নয়। বাড়ির প্রায় পিছনে কোণের দিকে ছোটো একটি ঘরের সামনে স্বয়ং সত্যপ্রিয় দাঁড়াইয়াছিল। আর একটু তফাতে তিন-চারজন মেয়ের কাছে দাঁড়াইয়া সুবর্ণ নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। জ্যোতির্ময়কে দেখিবামাত্র এতক্ষণের চাপা রাগ ও বিরক্তির বশে সত্যপ্রিয় বলিয়া ফেলিল, আপনার মাথায় গোবর ভরা জ্যোতির্ময়বাবু! বউমাকে এ অবস্থায় কী বলে নিয়ে এলেন?

মাথায় যে জ্যোতির্ময়ের সত্যসত্যই গোবর ভরা তার প্রায় আরও একটা প্রমাণ দিয়া সে বলিল, আপনি যে আনতে বললেন?

সত্যপ্রিয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জ্যোতির্ময়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। মহীতোষকে একখানা গাড়ি একেবারে বাড়ির পিছনে আনিয়া লাগাইতে বলিয়া দিল। গাড়ি যেন বড়ো হয়, এক জনকে যেন শোয়ানো চলে গাড়িতে।

মহীতোষ বলিল, অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করে দিলে হয় না?

সত্যপ্রিয় যেন শুনিতে পাইল না এমনিভাবে সরিয়া গিয়া বারান্দায় রেলিংয়ে ঝুঁকিয়া একটু চাহিয়া রহিল, তারপর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াই রাগ করিয়া বলিল, দাঁড়িয়ে রইলি যে মহী?

এই যে যাই।—চোখের পলকে মহীতোষ অদৃশ্য হইয়া গেল।

জ্যোতির্ময় সুবর্ণের কাছে সরিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী হয়েছে রে সুবর্ণ?

সুবর্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বউদি হঠাৎ মুচ্ছো গিয়ে গোঙাতে লাগল, আর—

এবার সত্যপ্রিয় ডাকিয়া বলিল, ভয় পাবেন না জ্যোতির্ময়বাবু। দুজন ডাক্তার পরীক্ষা করছেন, দেখি তাঁরা কী বলেন। যশোদাও ভেতরে আছে।

মিনিট পনেরো পরে দরজা খুলিয়া ডাক্তার দুজন বাহির হইয়া আসিল, যশোদাও সঙ্গে আসিল। দুজন ডাক্তারকে জ্যোতির্ময় চেনে, দুজনেই নাম করা চিকিৎসক, একজন শহরের, একজন শহরতলির। এমন কত ডাক্তার আজ সত্যপ্রিয়র কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছে।

ডাক্তার দুজন মুখ খুলিবার আগেই সত্যপ্রিয় বলিল, একটু সুস্থ হয়েছেন তো এখন? যাক বাঁচা গেল। বিয়েবাড়িতে একটা বিপদ-আপদ ঘটলে বাড়ির কর্তার বুকের মধ্যে কেমন করে, আপনারা কী বুঝবেন! সামান্য একটু কিছু ঘটল তো সব কাজ পণ্ড হতে বসল। যাই হোক ভগবানের দয়ায় সুস্থ

যখন হয়েছেন, গাড়ি করে এবার ওঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দি, কী বলেন ? বাড়ি কাছেই, পাঁচ মিনিটের পথ। ইনি মেয়েটির স্বামী।

ডাক্তার দুজনের মধ্যে যার বয়স কম সে একটু ইতস্তত করিতে লাগিল। জ্যোতির্ময়ের দিকে এক নজর চাহিয়া সে হঠাৎ বলিল, আমি বলছিলাম কী—

পরম ধৈর্যের ভঙ্গিতে তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, বলুন ? বলুন, আপনি কী বলছেন ?

ডাক্তার ঢোঁক গিলিয়া বলিল, বাড়ি কাছে হলে আর ভালো একখানা গাড়ি পেলে নেওয়া চলে বইকী।

সত্যপ্রিয় বলিল, তা ছাড়া আপনি যখন সঙ্গে যাচ্ছেন, তখন আর ভয়ের কী থাকতে পারে ?

সুতরাং, আর কারও কিছু বলিবার রহিল না, কেবল যশোদা একবার বলিল, আজ রাতে ঠাইনাড়া করা কি ভালো হবে ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার কী জবাব দিল ভালোমতো বোঝা গেল না। সিঁড়ি দিয়া নামাইয়া গাড়ি পর্যন্ত নেওয়ার জন্য স্ট্রেচারের মতো একটা কিছুর ব্যবস্থার কথা ডাক্তার উল্লেখ করিলে যশোদা বলিল, থাক, থাক, এঁদের আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই। আমিই নিয়ে যাচ্ছি ওকে কোলে করে, তাতে ঝাঁকুনিও কম লাগবে।

শিশুর মতো অপরাজিতার শরীরটা দু-হাতে অবলীলাক্রমে বুকের কাছে তুলিয়া নিয়া যশোদা নীচে নামিয়া গেল। তাকে বুকে ধরিয়া রাখিয়াই নিজে সে গাড়িতে উঠিয়া বসিল। ডাক্তার ভিতরে আসিল, জ্যোতির্ময় আর সুবর্ণ সামনে বসিল।

যশোদা ডাক্তারকে বলিল, এইভাবেই রাখলাম, আবার নামাতে হবে তো। বারবার তোলা-নামার চেয়ে একভাবে থাকাই ভালো। কী বলেন ?

ডাক্তার সংক্ষেপে বলিল, হ্যাঁ।

দক্ষিণের গেট দিয়া গাড়ি রাস্তায় পড়িতেই যশোদা কারও সঙ্গে পরামর্শও করিল না, কারও অনুমতি চাহিল না, চালককে সোজা হাসপাতালে যাইতে হুকুম দিয়া দিল। জ্যোতির্ময় চমকাইয়া উঠিল, সুবর্ণ অস্ফুট একটা শব্দ করিয়া আবার কাঁদিয়া ফেলিল, ডাক্তার চুপ করিয়া রহিল।

যশোদার গা বোধ হয় বড়ো বেশি রকম জ্বালা করিতেছিল, ডাক্তারের লজ্জিত নীরবতাও তাকে থামাইয়া রাখিতে পারিল না, একটু পরে আবার বলিল, হাসপাতালে না গিয়ে কী করি বলুন ? আপনাদের মতো ডাক্তারের ভরসায় বাড়ি নিয়ে যেতে সাহস হল না।

ডাক্তার এবারও কিছু বলিল না।

এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের একটা ঘরে অপরাজিতার মরণ রদ করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে, বাহিরে একটা কাঠের বেঞ্চে বসিয়া থাকে জ্যোতির্ময়, যশোদা আর সুবর্ণ। প্রিয়জনকে হাসপাতালে দিবার একটা অযৌক্তিক অসুবিধা আছে, নিজেদের কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই, জানা থাকিলেও নিজেদের কিছু করা হইল না ভাবিয়া বড়ো কষ্ট হয়। একজন মরিতেছে আর এমন নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা ! এ যেন এক ধরনের অপরাধ।

রাত তিনটার সময় ডাক্তার জানাইল, এখন তারা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যাইতে পারে। না, ঠিক নিশ্চিন্ত মনে নয়, আর ভয় নাই এমন কথা ডাক্তার বলিতে পারে না, তবে এখনকার মতো বিপদটা কাটিয়া গিয়াছে। অপরাজিতা যদি নেহাত মরেই তবে তার মরিতে অন্তত দু-একটা দিন সময় লাগিবে। এমন রূঢ়ভাবে যে ডাক্তার খবরটা জানাইল তা নয়, তার কথার মোটামুটি অর্থটা এই।

যশোদার সঙ্গে সুবর্ণকে বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া জ্যোতির্ময় একাই হাসপাতালে বসিয়া রহিল। অপরাজিতাকে সে কি খুব ভালোবাসে ? অপরাজিতা মরিয়া গেলে খুব কষ্ট হইবে তার ? উত্তেজনার

প্রতিক্রিয়া আর রাত্রি জাগরণের অবসাদের জন্য বোধ হয় মনটা ভোঁতা হইয়া গিয়াছে, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

হাসপাতাল হইতে সে যখন বাহির হইল, রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। রাস্তার আলো নেভে নাই, কিন্তু চারিদিকে দিনের আলোর আবির্ভাবের আবছা সংকেত টের পাওয়া যায়। ট্রাম ও বাস চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু জ্যোতির্ময় হাঁটিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত রাত জাগিয়া থাকার পর শহর ও শহরতলির জাগরণ আরম্ভ হইবার সময়টা এই পথ দিয়া হাঁটিতে ভালো লাগিতেছিল। কয়েক ঘণ্টা পরে মানুষ ও গাড়িঘোড়ার কী ভিড়টাই এই পথে আরম্ভ হইবে। শহরতলি হইতে শহরের দিকেই মানুষ চলিতে আরম্ভ করিবে বেশি, বিকালের দিকে সে স্রোতটা ফিরিয়া আসিবে শহর হইতে শহরতলির দিকে।

পথটা এলোমেলোভাবে বহুদূর বিস্তৃত সারি সারি রেললাইন ডিঙাইয়া গিয়াছে। ব্রিজের উপর রেলিংয়ে ভর দিয়া জ্যোতির্ময় একটু দাঁড়াইল। ওয়াগন বাছাই করিবার জন্য ইস্পাতের রেখার দুর্বোধ্য আর জটিল রেখাচিত্র দিয়াই শহর ও শহরতলিকে যেন ভাগ করা হইয়াছে। উঁচু থামের উপর হইতে এদিকে ওদিকে জোরালো আলো ফেলিয়া কোনো কোনো লাইনের কিছু কিছু অংশ আলোকিত করা হইয়াছে, বাকিটা আবছা আলো-অন্ধকারে ঢাকা। ব্রিজের দু-পাশে বহুদূর পর্যন্ত অসংখ্য ওয়াগন বিশৃঙ্খলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। কয়েকটা ওয়াগন ইঞ্জিনের ঠেলা খাইয়া আপনা আপনি একদিকে আগাইয়া চলিয়াছে, লিভার ঠেলিয়া ঠেলিয়া সেগুলিকে সরাইয়া দেওয়া হইতেছে এক লাইন হইতে আর এক লাইনে। দুদিকে কাছে ও দূরে থামের মাথায় বসানো সিগনালের অনেকগুলি লালনীল আলো, মানুষের হাতের সঞ্চরণশীল আলোর নড়িয়া নড়িয়া দূরের মানুষকে দুর্বোধ্য ইঙ্গিত করা, কতবার জ্যোতির্ময় এই ব্রিজের উপর দিয়া দিনে ও রাত্রে যাতায়াত করিয়াছে, কিন্তু কোনোদিন খেয়ালও করে নাই ব্রিজের দুপাশে নগরের এমন একটা রূপ বিছানো রহিয়াছে। অপরাজিতাকে সে যে বিবাহ করিয়াছে, এতকাল এক বিছানায় রাত কাটাইয়াছে, অপরাজিতার মধ্যে নিজের এক প্রতিনিধিকে আনিয়া দিয়াছে, তাও কী এতকাল সে খেয়াল করিয়াছিল ?

অপরাজিতা যদি মরিয়া যায় !

কী হইবে অপরাজিতা মরিয়া গেলে ? ব্রিজের দুদিকে রেললাইনগুলি এমনিভাবেই পাতা থাকিবে, ইঞ্জিনের হুসহুস আর ওয়াগনে ওয়াগনে ঠোকাঠুকির এমনই শব্দ উঠিবে, থামের মাথার জোরালো আলো, সিগনালের লালনীল আলো, লণ্ঠন নাড়িয়া মানুষের সংকেত কিছুই বদলাইবে না।

বাড়ি ফেরার পথে যশোদার সঙ্গে দেখা করিয়া গেল। যশোদা উনানে আঁচ দিয়াছে, আঁচ প্রায় ধরিয়া আসিল।

কাল চাকরিতে রিজাইন দেব চাঁদের মা !

বেশ তো, রিজাইন দেওয়া তো পালাবে না ? বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়বেন যান।

অপরাজিতা বাঁচিবে না আশঙ্কা করিয়াই সত্যপ্রিয় একটু ব্যস্ত হইয়া তাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিল। কেবল অমঙ্গলের ভয় নয়, তার চেয়ে বেশি ভয় ছিল গোলমালের। এত টাকা খরচ করিয়া মেয়ের বিবাহের আয়োজন করিয়াছে, তার মধ্যে এমন একটা উৎপাত কি মানুষের ভালো লাগে ? সে রাত্রে অপরাজিতার প্রাণটা বাহির হইবে না জানা থাকিলে হয়তো তাকে সরাইয়া দিবার জন্য অতটা ব্যস্ত হইয়া পড়িত না।

পরদিন বেলা প্রায় এগারোটার সময় নিজেই জ্যোতির্ময়ের বাড়ি খবর জানিতে আসিল। এ বড়ো সহজ সম্মান ও দরদের পরিচয় নয়। জ্যোতির্ময়ের বৈঠকখানায় অল্প দামি কাঠের চেয়ারে বসিবার আগে প্রথম কথা বলিল এই : ইস্, আপনার চোখমুখ যে বসে গেছে জ্যোতির্ময়বাবু !

জ্যোতির্ময় বলিল, আজ্ঞে না, ও কিছু নয়।

অপরাজিতার খবর ? তার অবস্থা বিশেষ ভালো নয়, শেষ পর্যন্ত কী হইবে বলা যায় না, সে হাসপাতালেই আছে এবং সম্ভবত কিছু দিন থাকিতে হইবে।

আপনি কিছু দিন ছুটি নিন জ্যোতির্ময়বাবু।

ছুটি সম্পর্কে জ্যোতির্ময়ের বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। এ সব বিষয়ে সত্যপ্রিয়র ব্যবস্থা বড়ো জটিল, ছুটি চাহিলেই দেয়, সময় সময় দরকার মনে করিলে, যেমন আজ জ্যোতির্ময়ের বেলা মনে করিয়াছে, না চাহিলেও নিজে হইতে যাচিয়া ছুটি দিতে চায়। কিন্তু ছুটি যে নেয় শেষ পর্যন্ত তার হয় বিপদ। কাজ আর কাজের দায়িত্ব সত্যপ্রিয় ভাগ করিয়া দিয়াছে, যার যা কবাব কথা তাকে তা করিতেই হইবে, কাজ না করার পক্ষে কোনো যুক্তি নাই, কোনো কৈফিয়ত নাই। সে নিজে হইতে ছুটি নিতে বলিয়াছিল, ছুটিতে থাকার সময় মানুষ কাজ করিতে পারে না, এ যুক্তিটা খুব জোরালো সন্দেহ নাই, কিন্তু জোরালো যুক্তিটা শুনাইবার সুযোগ তো সত্যপ্রিয় কোনোমতেই সৃষ্টি করিবে না ! কাজ কেন হয় নাই সে কৈফিয়ত আজ পর্যন্ত সত্যপ্রিয কারও কাছে স্পষ্ট ভাষায় দাবি করিয়াছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু রাগ যে সে করিয়াছে, এ ভাবে যে চলিবে না, কাজের ক্ষতির সঙ্গে যে চাকরির ক্ষতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, এই সব কী কৌশলে যেন ববাবর ভাষাব চেয়েও স্পষ্ট কবিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়া আসিয়াছে !

জ্যোতির্ময় তাই আমতা আমতা কবিয়া বলিল, আজ্ঞে, আপনাব নতুন প্রোগ্রামটা চালু করা হচ্ছে, এ সময়—

সত্যপ্রিয় আবেগভবা কণ্ঠে বলিল, না, না, ওসব প্রোগ্রাম-ট্রোগ্রামের কথা নিয়ে আপনি আব এখন মাথা ঘামাবেন না জ্যোতির্ময়বাবু।

এ সব কথার অর্থও জ্যোতির্ময় জানে। সত্যপ্রিয় সকলকেই এমনিভাবে দরদ জানায়, সকলের প্রতিই এমনি উদারতাব পরিচয় দেয়। কিন্তু সত্যসত্যই যদি কোনো মূর্খ এই দরদ আর উদারতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বসে, দুদিন পরে সে আর কূল দেখিতে পায় না। এ বিষয়ে সত্যপ্রিয়র একটা থিয়োরি আছে। কর্মচারীদেব সে এইসব কথা বলে, বন্ধু ও আত্মীয় হিসাবে, কর্মচারী ও উপরওয়ালার সম্পর্কটা তো তাতে বাতিল হইয়া যায় না, মাসান্তে কর্মচারী মাহিনা তো গ্রহণ করে, সুতরাং কাজ সম্পর্কে আত্মীয বন্ধু হিসাবে সে যা বলে, কাজ সম্পর্কে সে কথাগুলি প্রয়োগ কবা কি কর্মচারীদের উচিত ? তার মতো অবস্থাব আব একজন মানুষও কি আছে সামান্য মাহিনার কর্মচারীর সঙ্গে যে এমন সহজভাবে মেলামেশা করে, বিপদে-আপদে সহানুভূতি জানায়, পবামর্শ দেয় ? এই মেলামেশার অনুগ্রহটুকু বাড়তি পাওনা মনে করিয়া তাদের কৃতার্থ থাকা উচিত। প্রথম প্রথম যাবা বোকামি করিয়া এই সহজ কথাটা বুঝিতে পারে না, তাদের সে ক্ষমাও করে, ভবিষ্যতে সাবধান হইবার সুযোগও দেয়। কিন্তু যে পুরা টাকা মাহিনা দেয় সে প্রতিদানে পুরা কাজ চাহিবে, দরদ আর ভালোবাসা দেখানোর জন্য মাহিনা দিয়া মানুষ লোক রাখে না—এই সরল সত্যটা যার মাথায় কোনো রকমেই ঢোকানো যায় না, অগত্যাই সত্যপ্রিয় তাকে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে চরিয়া খাইবার জন্য মুক্তি দেয়।

অবশ্য, এই রকম দরদ ও সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করে বলিয়াই সকলে হাসিমুখে দশ ঘণ্টার জায়গায় পনেরো ঘণ্টা কাজ করে, তিনজনের কাজ একজনে করে। কিন্তু সত্যপ্রিয় তো করিতে বলে নাই ? যার যতক্ষণ ইচ্ছা কাজ কবুক না, সত্যপ্রিয়ব কী আসিয়া যায়, তার কাজ হইলেই হইল।

জ্যোতির্ময় তাই আবার আমতা আমতা করিয়া বলিল, আজ্ঞে, ছুটির দরকার হলেই আপনাকে বলব। এখন তো হাসপাতালেই রইল, দুবেলা গিয়ে শুধু দেখে আসা।

শ খানেক টাকা বরঞ্চ আপনি রাখুন, চিকিৎসার জন্য যদি দরকার হয়।

এ আর এক বিপদ। যার যা প্রাপ্য তার বেশি একটি পয়সা কোনোদিন কেউ সত্যপ্রিয়র কাছে পায় নাই, কোনোদিন পাইবেও না। সে যে দান করে হিসাব করিলে দেখা যায়, দানের রীতি, নীতি, প্রথা, নিয়ম, সামাজিক ও অন্যবিধ বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি হিসাবে সেটাও গ্রহীতার প্রাপ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্মচারীদের হাতে টাকা গুঁজিয়া জোর করিয়া সাহায্য করিতেও দু-একবার সত্যপ্রিয়কে দেখা গিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে টাকা সত্যপ্রিয়র ফিরিয়া আসে, কোথাও আসে কাজে, কোথাও আসে বাধ্যবাধকতার প্রয়োজনীয় সম্পর্কটা বজায় থাকাতে, কোথাও আসে প্রতিহিংসায়।

সত্যপ্রিয় চলিয়া গেলে জ্যোতির্ময় স্নান করিতে গেল। খাইয়া আপিস যাইবে। যাওয়ার পথে হাসপাতালে খবর নিয়া যাইবে।

সুবর্ণ বলিল, আজকেও আপিস যাবে দাদা ?

একবার না গেলে চলবে কেন ? সকাল সকাল ফিরে আসব।

কী দরকার ? রাত্রিটাও আপিসে থেকো—সুবর্ণের মুখ বিবর্ণ, চোখ ফুলিয়া গিয়াছে। বলিতে বলিতে আবেগে বিবর্ণ মুখে রক্তের সঞ্চার হয়, মাথা ঝাঁকি দিয়া সে আবার বলে, বউদি যেন মরে—মরে, মরে, মরে। মরে যেন তোমার হাত থেকে রেহাই পায়।

সুধীরা চিৎকার করিয়া বলে, সুবর্ণ !

আর জ্যোতির্ময় করে কী, ঠাস করিয়া এক চড় বসাইয়া দেয় বিবাহযোগ্যা বোনের গালে, গায়ের যত জোর আছে, তত জোরের সঙ্গে। পাঁচটি আঙুল নয়, সুবর্ণের টুকটুকে গালে, তিনটি আঙুলের ছাপ সঙ্গে সঙ্গে এমন স্পষ্টভাবে ফুটিয়া ওঠে যে, ভয় হয় কোনোদিন বুঝি এ দাগ আর মুছিয়া যাইবে না।

আপিস যাওয়ার সময় জ্যোতির্ময় একটু ঘুরিয়া যায়, যশোদার বাড়ির গলিটার সামনে দিয়া যাইতে আজ কেমন সংকোচ বোধ হইতেছিল।

দুপুরবেলা সুবর্ণ সুধীরাকে বলিল, আর তো এ বাড়িতে আমার থাকা হয় না দিদি।

সুধীরা বলিল, চুপ কর। বকিসনে মেলা।

সুবর্ণ তখন গেল যশোদার কাছে।

আর তো আমার ও বাড়িতে থাকা হয় না যশোদাদিদি।

গালের দাগ দেখিয়া যশোদার বড়ো মায়া হইয়াছিল, কথা শুনিয়া মনটা বিগড়াইয়া গেল। —মারবে না? সারারাত জেগে ভয়ে ভাবনায় পাগল হয়ে আছে মানুষটা, তাকে তুমি অমন করে বলতে গেলে কেন ?

কোথাও কি সহানুভূতি নাই ? এমন কী কেউ নাই জগতে যে যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিবেচনা বাদ দিয়া কোন অবস্থায় কে তাকে কী জন্য মারিয়াছে, সে কথা ভুলিয়া গিয়া, শুধু গালে চড় খাইয়া গালটা তার ফুলিয়া গিয়াছে বলিয়া ব্যাকুল হয় ? জগতে দরদি নাই ভাবিয়া সুবর্ণের যখন কান্না আসিতেছে, দেখা হইল নন্দর সঙ্গে। সুবর্ণের গাল দেখিয়া নন্দ যে ঠিক ব্যাকুল হইল, তা বলা যায় না, বোধ হয় বিস্ময়েই অভিভূত হইয়া গেল। সুবর্ণের কাছে তাই যথেষ্ট। নন্দকেই তো সে খুঁজিতেছিল। আর কে আছে তার নন্দ ছাড়া ?

এসো তো আমার সঙ্গে।

এখানে এই সরু গলির মধ্যে দাঁড়াইয়া কী কথা বলা যায়, যে নোংরা চারিদিকে, যে দুর্গন্ধ চারিদিকে, দুজন মানুষ পাশাপাশি চলিতে গেলে হয় গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগে, নয় দুপাশের দেয়ালে গা ঠেকিয়া যায়। তা ছাড়া যশোদার ভয় আছে, দেখিলেই দুজনকে সে তফাত করিয়া দিবে। বেণী দুলাইয়া সুবর্ণ হনহন করিয়া চলিতে থাকে, পায়ের স্যান্ডেলে শব্দ হয় চটচট। পাড়ার রাস্তায়

এমনভাবে সুবর্ণের সঙ্গে চলিতে গিয়া নন্দর মুহূর্তে মুহূর্তে রোমাঞ্চ হয় আর মুহূর্তে মুহূর্তে হাত-পা যেন আড়ষ্ট হইয়া আসে। চেনা পথের দুপাশে চেনা ঘরবাড়ি দোকানপাট সব যেন হাজার হাজার চেনা মানুষে ভরিয়া গিয়াছে, সকলে চাহিয়া দেখিতেছে সুবর্ণের চলন আর নন্দের অনুসরণ।

একটু আস্তে হাঁট না ?

সুবর্ণ থমকিয়া দাঁড়ায়। ঠিক তিনু, বিশু আর বেন্দার কামারশালার সামনে। লোহার পাত গরম হইতেছে, তিনু প্রাণপণে হাপরের দড়ি টানিতেছে, বিশু হাতুড়ি উদ্যত করিয়া আছে, বেন্দা লোহার পাতটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আগুনে গুঁজিয়া গুঁজিয়া ধরিতেছে। সেইখানে দাঁড়াইয়া সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করে, নন্দ কি তবে সুবর্ণের সঙ্গে যাইতে চায় না ? তবে না হয় থাক নন্দ, সুবর্ণ একাই যাইবে ! যেদিকে দু-চোখ যায় চলিয়া যাইবে ! নন্দ ভাবিয়াছিল, সুবর্ণ বুঝি ব্যাকুল হইয়া হাসপাতালে ছুটিয়া যাইতেছে তার বউদিকে দেখিবার জন্য ; কিন্তু হাসপাতালের পথ তো যেদিকে দু-চোখ যায় চলিয়া যাওয়ার পথ নয়। সুবর্ণের মুখে কড়া রোদ পড়িয়াছে, অভিমানের গাঢ় ছায়া স্পষ্ট করিয়া নন্দকে দেখানোর জন্যই সুবর্ণ যেন মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছে সূর্যের দিকে। রাধার অভিমানের জ্বালায় নন্দ নিজে কত জ্বলিয়াছে, তবু সুবর্ণের অভিমান সে চিনিতে পারে না। এতক্ষণ পরে হঠাৎ ব্যাকুল হইয়া সে বলে, তোমার অসুখ করেছে, সুবর্ণ ?

চেনা মানুষের কথা আর তো নন্দব মনে থাকে না, সেইখান হইতে গলা ফাটাইয়া অনেক দূরের একটা রিকশাকে ডাকিয়া আনে। রিকশায় উঠিয়া বসিয়াই সুবর্ণ অবশ্য নন্দর গায়ে গা এলাইয়া মূর্ছা যায়। কিন্তু নন্দ রিকশাওয়ালাকে বাড়ির দিকে ফিবিয়া যাইতে বলামাত্র সচেতন হইয়া বলে, না না, বাড়ি নয়, ট্রাম রাস্তার দিকে যেতে বলো।

বাড়ি আর সুবর্ণ ফিরিবে না। নন্দ যদি ফিরিতে চায়, ফিরিয়া যাক। আর যদি সুবর্ণেব সঙ্গে যায় নন্দ, অনেক দূরের কোনো এক অজানা শহরে চলিয়া যায় সুবর্ণের সঙ্গে, আর নদীর ধারে ছোটো একটি ঘর ভাড়া করিয়া দুজনে বাস করে, আর নন্দ যদি সারাদিন কীর্তন করে, আর নন্দর কীর্তন শুনিতে শুনিতে সুবর্ণ যদি রাঁধাবাড়া ঘরকন্নার কাজ করে—

নন্দর পকেটে আনা পাঁচেক পয়সা ছিল, তবে সুবর্ণের হাতে ছিল সোনার চুড়ি, কানে সোনার দুল। শহরের দিকে না গিয়া শহরকে পিছনে ফেলিয়া শহবতলি ডিঙাইয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলে কী ঘটিত বলা কঠিন। এদিকের শহবতলি হইতে শহরে যাওয়ার পথে যদি হাসপাতালটা না পড়িত এবং হাসপাতালে যদি অপরাজিতা না থাকিত, আর অপরাজিতার কাছে একবার শেষ বিদায় নেওয়ার সাধটা যদি সুবর্ণের না জাগিত, তাহা হইলেও কী ঘটিত বলা কঠিন। হয়তো কয়েকদিন পরে দুজনে ফিরিয়া আসিত, হয়তো তাদের ফিরাইয়া আনা হইত এবং বিশ্রী একটা হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়া যাইত। কিন্তু অপরাজিতার খবর লইতে গিয়া জানা গেল, ঘণ্টাখানেক আগে সেও নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে, ফিরিয়া সে আর আসিবে না, ফিরাইয়া তাকে আনা যাইবে না। কেবল শরীরটাকে চিতায় তুলিয়া পুড়াইবার হাঙ্গামাটুকু করিতে হইবে।

সুতরাং নন্দ ও সুবর্ণের নিরুদ্দেশ যাত্রা আপনা হইতে বাতিল হইয়া গেল। জ্যোতির্ময় আপিস যায় নাই, আপিস যাওয়ার পথে খবর নেওয়ার জন্য হাসপাতালে ঢুকিয়া হাসপাতালেই আটক হইয়া গিয়াছে। হাসপাতালের নূতন ও পুরাতন দালানের মাঝখানে চারিদিকে চওড়া কাঁকর বিছানো পথের জন্য প্রায় সবুজ দ্বীপের মতো দেখিতে ছোটো একটু গোলাকার ঘাসে ঢাকা জমি আছে। সবুজ রংকরা গোটা তিনেক লোহার বেঞ্চিও সেখানে পাতা আছে, রোগীর খবর যারা জানিতে আসে, ইচ্ছা করিলে দরকার মতো ওখানে ফাঁকায় বসিয়া বেশি বেশি বাতাস টানিয়া বুকের ধড়ফড়ানি শান্ত করিতে পারে। এখন রোদের বড়ো তেজ, জ্যোতির্ময় একাই একটা বেঞ্চে চুপচাপ বসিয়াছিল। গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সুবর্ণ তাকে জড়াইয়া ধরিল। সুবর্ণ মরিতে বলিয়াছিল বলিয়াই কি অপরাজিতা মরিয়া গিয়াছে ?

জ্যোতির্ময় ধীরে ধীরে তাকে ছাড়াইয়া পাশে বসাইয়া দেয়। বলে, এ রকম করে না, ছিঃ! উতলা হতে নেই, মরতে বললে কী মানুষ মরে রে পাগলি ? আর তুই তো শুধু মুখে বলেছিলি মনে মনে তো চাইছিলি তোর বউদি বাঁচুক। কত মা পর্যন্ত কতবার রাগ করে ছেলেমেয়েকে মরতে বলে, মরতে বললেই যদি কেউ মরত—

মনে হয়, জ্যোতির্ময় যেন বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছে। হঠাৎ থামিয়া গিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে সে বলিল, ইস্ গালটা যে তোর ফুলে গিয়েছে সুবর্ণ ! খুব লেগেছিল না ? সেই শাড়িটা তোকে কিনে দেব সুবর্ণ।

কয়েকদিন আগে স্কুলে যাওয়ার জন্য নতুন ফ্যাশানের একটা শাড়ি চাহিয়া সুবর্ণ জ্যোতির্ময়ের ধমক খাইয়াছিল, এদিকে খরচ চলে না, নিত্য নূতন ফ্যাশানের শাড়ি! সেদিন সুবর্ণ ভাবিয়াছিল যে, হুঁ, বউদিকে তো খুব কিনে দিতে পার, আমায় দেবার বেলাই তোমার খরচ চলে না। গালে চড় মারার ক্ষতিপূরণস্বরূপ জ্যোতির্ময় সেই শাড়িখানা কিনিয়া দিবে শুনিয়া হঠাৎ তার মনে পড়িয়া গেল, অপরাজিতার রাশি রাশি শাড়ি সমস্তই এবার সে পাইবে। মনে পড়ায় সুবর্ণ ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অপরাজিতার শোকে নন্দর কাঁদিবার কথা নয়, মুখখানা ম্লান ও গম্ভীর করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইত, সুবর্ণকে আকুল হইয়া কাঁদিতে দেখিয়া সেও চোখ মুছিতে লাগিল।

তখন দেখা গেল, জ্যোতির্ময়ের চোখ দিয়াও জল পড়িতেছে। কান্না বোধ হয় ছোঁয়াচে।

ছয়

পাড়ায় চার-পাঁচটি নূতন বাড়ি তৈরি হইতেছে। শহরতলির পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে কয়েক বছর আগে, দিন দিন পরিবর্তন যেন দ্রুততর হইয়া উঠিতেছে। শহরের লোক শহর ছাড়িয়া শহরতলিতে বাস করিতে আসিতেছে। এ কী একটা নূতন ফ্যাশন ? ভবানীপুর কালিঘাটের মতো যেখানে ধনঞ্জয়ের মতে এককালে দিনদুপুরে শিয়াল ডাকিত, এই শহরতলিকেও শহর ক্রমে ক্রমে গ্রাস করিয়া ফেলিবে ? দশ-বারোবছর আগে এ অঞ্চল কী ছিল, এখন কী দাঁড়াইয়াছে, ভাবিলেও যশোদা অবাক হইয়া যায়। কাছাকাছি যে প্রকাণ্ড একটা শহর আছে, তখন তাই বা কে ভাবিতে পারিত ? ছড়ানো বাড়িঘর, মেটে পথ, ডোবা-পুকুর, বাঁশঝাড় এ সব কিছুরই অভাব তখন ছিল না। সত্যপ্রিয়র বাগানবাড়িটা ছিল প্রায় জঙ্গল, বাগানবাড়ির দক্ষিণ দিকে কয়েক ঘর গরিব মুসলমানের একটি বস্তি ছিল, বছর তিনেক আগে তারা যে কোথায় উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর জানা যায় না। বোধ হয়, শহরতলির উত্তর দিকে যে নূতন মুসলমান পল্লিটি গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইখানে গিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। এ পাড়ায় আগেকার সেই ভাঙা ঘরের বাসিন্দা শ্রমিক শ্রেণির গরিব মুসলমানদের বদলে এলোমেলোভাবে কয়েকটি পাকাবাড়িতে কয়েক ঘর ভদ্র মুসলমান পরিবার আসিয়াছে, এরা সকলেই চাকুরিজীবী। পরিষ্কার বেশভূষা করিয়া পরিশ্রমের অভাবে বেঢপ শরীর লইয়া নটা-দশটার সময় প্রত্যেক দিন এদের ট্রামের উদ্দেশ্যে ব্যস্ত হইয়া ছুটিতে দেখিলে সেই অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণির মুসলমান পরিবার কয়েকটির জন্য যশোদার কষ্ট হয়।

তবে শহরতলির ধীরে ধীরে শহরে পরিণত হওয়ার বিরুদ্ধে যশোদার কোনো নালিশ নাই— যদি তার মনের মতো শহরে পরিণত হয়। এ বিষয়ে বড়ো আশ্চর্য ও নিখুঁত কল্পনা আছে যশোদার, তার এই পাড়াকে কেন্দ্র করিয়া এই শহরতলিকে সে বড়ো শহরটির সঙ্গে সংলগ্ন একটি সুবিন্যস্ত, পরিচ্ছন্ন, সুশ্রী নগররূপে কল্পনা করিতে পারে। সে নগরে পল্লির সবুজ রূপের বাহুল্য নাই, নগরবাসীর জীবন পল্লিবাসীর জীবনের মতো সহজ সরলও নয়। পল্লির সঙ্গে যশোদার যথেষ্ট পরিচয় আছে, কিন্তু পল্লির রূপ তার চোখে পড়ে না, ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল, পচা জলের ডোবা-পুকুর,

নোংরা পথঘাট, জীর্ণ ঘরবাড়ি খেত-খামারের মন-ভুলানো, চোখ-জুড়ানো শ্রী তার মানস-নয়নে পর্যন্ত অতি বিশ্রী ঠেকে এবং ঘষা পড়ার অভাবে পল্লিবাসীটির বুদ্ধিটা একটু ভোঁতা বলিয়াই শহরবাসীর চেয়ে তাদের সরলতা কেন বেশি হইবে যশোদা বুঝতে পারে না, সংকীর্ণ জগতে একঘেয়ে অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে বলিয়াই জীবনটাই বা তাদের শহরবাসীর চেয়ে সহজ হইবে কেন তাও যশোদা বুঝিতে পারে না—পল্লিবাসীরাও তো কম গরিব নয় ? যশোদার কল্পনার নগর তাই শহররূপী গ্রাম নয়, শহরই বটে। নগরের পথে ট্রাম চলে, পথের দুপাশে পাঁচ-সাততলা বাড়ি থাকে, দোকান থাকে, সিনেমা থাকে, পার্ক থাকে, গলি থাকে, হাজার হাজার মানুষ থাকে, অনেক কিছুই থাকে শহরের। কেবল সেই সঙ্গে সঙ্গে থাকে সামঞ্জস্য, বড়ো বাড়ির আড়ালে ছোটো বাড়ির ফাঁপর লাগে না, গলিঘুঁজির গোলকধাঁধা থাকে না, নাকেও লাগে, গায়েও ন্যাপটাইয়া যায় এমন ভাপসা দুর্গন্ধ কোনো গলিতে কোনো বাড়িতে পাওয়া যায় না, আর—

আর, সত্যপ্রিয় অবশ্য মোটরে চড়িয়াই বেড়ায় যশোদার নগরে, কিন্তু যশোদা যে কুলিমজুরদের সঙ্গে ঘর করে, তারা পেট ভরিয়া খাইতে পায়, পরিষ্কার জামাকাপড় পরিতে পায়, দরকার মতো স্ত্রী পায়, জীবনটা উপভোগ করাব মতো অবসর পায়—আর ? মনে মনেও তার আদরের হতভাগাগুলোকে পাওয়াইয়া দেওয়াব ব্যাপারে যশোদা তেমন পটু নয় ! কত কিছু কাম্য আছে মানুষের, কত কিছু পাইতে পারে মানুষ, কত কিছু পাইযাছে মানুষ, কিন্তু এদের দেওয়ার সময় যশোদা যেন সে সমস্তের হদিস পায় না, এদের যেন ধন মান স্বাস্থ্য সুখ তেজ শক্তি জ্ঞান বুদ্ধি রূপ যশ এ সমস্তের সত্যই দাবি থাকিতে নাই। কিন্তু এদেব পেটের জ্বালা, বোগ শোক দুঃখ গ্লানি অভাব অভিযোগ মনোবিকার এ সমস্ত ম্যাজিকের মতো দূর করিয়া দিবার ক্ষমতা যশোদার কল্পনার আশ্চর্য রকম আছে। এদের দুর্দশা দেখিতে দেখিতে কল্পনাবোধ হয় তার হইয়া গিয়াছে ভোঁতা, তাই অসম্ভব স্বপ্ন সে দেখিতে পারে না, ভিখারিকে রাজা হওয়ার আশীর্বাদ করিতে যে কেউ তাকে বারণ করে নাই এটা ভুলিয়া গিয়া শুধু বলিতে পাবে, আহা, খোঁড়া পা নিয়ে তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ, তোমার কষ্ট কমুক, তোমার দুঃখ দূর হোক।

খোঁড়া ধনঞ্জয়ের কাঠের পা আসিযাছে। পাড়ায় চাঁদা তুলিয়া আর নিজে কয়েকটা টাকা দিয়া যশোদাই তাকে কৃত্রিম পা-টি কিনিয়া দিয়াছে। যশোদার শত্রু আর ছেলেবেলার সখী কুমুদিনী চার আনা চাঁদা দিযা বলিয়াছে, আর কেন ভাই, এবাব মায়া কাটিয়ে বিদেয় দে। লোকে যে নিন্দে করছে ভাই ?

কেন নিন্দে করছে ? কীসের নিন্দে ?

কচি খুকিটি কিনা, বোঝ না কেন নিন্দে করছে, কীসের নিন্দে !

যশোদার ন্যাকামিতে ক্ষুব্ধ হইযা মুখ নাড়া দিলেও কুমুদিনী বুঝাইয়া বলে। বলে যে, মানুষটা যতদিন দুপায়ে খাড়া ছিল, চেহারা যেমন হোক দশজনের একজন হইয়া বাড়িতে বাস করিত, লোকে হাসি-তামাশা করিলেও তেমন কিছু বলিত না—হয়তো ভাবিতও না। কিন্তু এখন পা কাটা যাওয়ার পরেও যশোদা যদি তাকে ঘরে রাখিয়া পোষে, সকলকে অবহেলা করিয়া কেবল তাকে নিয়াই দিনরাত মাতিয়া থাকে, কাঠের পা কিনিয়া দিবার জন্য সকলের কাছে চাঁদা পর্যন্ত আদায় করিতে শুরু করে—

যশোদা ফোঁস করিয়া ওঠে, কেন, সেবারে গগ্নার পা কাটা গেলে ঘরে রেখে পুষিনি তাকে ? কাঠের পা কিনে দিইনি চাঁদা তুলে ?

কুমুদিনী বিজ্ঞের মতো বলে, সে হল আলাদা কথা। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলে, যাকগে ভাই, যা খুশি করগে ভাই তুই, কলঙ্কে আর ডর কী তোর, বোঝার ওপর শাকের আঁটি বই তো নয়। ছেলেবেলা সই পাতিয়েছি, তাইতে বলা, নয় তো আমার কী এলো গেলো।

সামনাসামনি এমনভাবে কথা কুমুদিনী সচরাচর বলে না। চার আনা চাঁদা দিতে হওয়ায় গায়ে এত জ্বালা ধরিয়াছে নাকি তার ? কে জানে, হয়তো ধনঞ্জয় আর তাকে নিয়া সত্যসত্যই খুব একচোট আলোচনা, গবেষণা আর নিন্দা চলিতেছে।

তারপর যশোদার কানে আসে, এ কাজে সুধীরের উৎসাহই নাকি সকলের চেয়ে বেশি, সত্য মিথ্যা কত কথাই যে সে রটাইয়া বেড়াইতেছে ! এখনও সুধীরের ক্ষোভ থাকিবার কোনো কারণ যশোদা ভাবিয়া পায় না। কালোকে নিয়া সে বরং এমন মশগুল হইয়া পড়িয়াছে যে দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, অল্পের জন্য যশোদার হাত হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য অদৃষ্টকে তার ধন্যবাদ দেওয়াই বেশি স্বাভাবিক। সুধীরের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে,—গ্রীষ্মের তৃষ্ণাতুর পশুর একেবারে শ্রাবণের ধারাজলে লুটোপুটি করার মতো—দেখিলে হাসিও পায় করুণাও হয়। ছায়ার মতো যে যশোদার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে যশোদার চলাফেরা লক্ষ করিত, মুখ দেখিলে মনে হইত এই বুঝি সর্বনাশ ঘটিল, বহুদিনের উপবাসী বাঘের মতো এই বুঝি সে ঝাঁপাইয়া পড়ে হুঙ্কার দিয়া যশোদার ঘাড়ে—সেই সুধীর এখন যশোদার ধারে কাছে ভিড়িতে চায় না, কেবলই এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করে, সামনে পড়িলে এদিক ওদিক তাকায় আর কখনও কখনও বোকার মতো একটু হাসে, আরও বেশি বোকার মতো জিজ্ঞাসা কবে, কী খবর চাঁদের মা ? চালচলন বদলাইয়া গিয়াছে সুধীরের, মেজাজ নরম হইয়াছে, শুকনো বাকলের মতো রুক্ষ কঠিন মুখের চামড়ার ভিতর হইতে একটা কোমল আস্তরণের হদিসও যেন পাওয়া যাইতেছে না ? একটি কালো সোনার কাঠির ছোঁয়াচে মানুষটার মধ্যে যেন পলকে পলকে পরিবর্তনের ভেলকি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

নিন্দে করে নাকি বেড়াচ্ছ তুমি আমার ?

সুধীর জবাব দিবার আগেই কালো তাড়াতাড়ি বলে, না দিদি না, মিথ্যে লাগিয়েছে তোমার কাছে মান্‌ষে।

যশোদা চোখ পাকাইয়া বলে, তুই চুপ কর ছুঁড়ি, তোকে বলিনি আমি। কেঁউ কেঁউ করতিস দুদিন আগে কুকুর বাচ্চার মতো, বড়ো মুখ ফুটেছে, না ?

সুধীর ক্ষুব্ধ হইয়া বলে, গাল দিয়ো না চাঁদের মা।

কতবার কত কারণে রাগ করিয়াছে যশোদা, এমন কালো মেঘের ছায়া কে কবে তার মুখে ঘনাইয়া আসিতে দেখিয়াছে ?—গাল দেব না ? গাল দিতে বারণ করলে ? কথা কইলে যদি না সয়, যাও না চলে এখান থেকে ? কে মাথার দিব্যি দিয়েছে থাকতে ? পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে যাও দুজনে।

বলিয়া যশোদা নিজেই গটগট করিয়া বাহির হইয়া যায়, পরক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত শান্তকণ্ঠে বলে, আজ পর্যন্ত একটি পয়সা দিলে না, এমনি করে তো দেনা শোধ হবে না সুধীর। আজকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ো, ও মাসের আর পাঁচটি টাকা দিয়ো দেনার জন্যে। আচ্ছা, পাঁচটা না পার, তিনটে টাকাই দিয়ো।

তারপর যশোদার রাগটা কমিবার সময় দিয়া রাত্রে কালোকে সুধীর তার কাছে কাঁদাকাটা করিতে পাঠাইয়া দেয়। সুধীর নয়, অনেকেই তার নিন্দা করিতেছে এ খবরটা আবিষ্কার করিয়া যশোদার রাগটা কমিয়া আসায় কালোকে সে বলিয়া দেয় যে, আচ্ছা যা, মাইনে পেলে দিতে বলিস।

এতদিন ধনঞ্জয়কে যশোদা ঘরে ভাত দিয়া আসিয়াছে, আজ বাহিরে আসিয়া সকলের সঙ্গে বসিয়া খাইবার ডাক পড়িল।

উঠতে পারি না যে চাঁদের মা ?

খুব পারবে। চেষ্টাই করে দ্যাখো পার কিনা।

বড়ো লাগে চাঁদের মা।

পেরথম পেরথম লাগবে না ? তাই বলে শুয়ে বসে দিন কাটালে চলবে নাকি, অভ্যাস করতে হবে না চলাফেরার ?

উঠলে যে মাথা ঘোরায় চাঁদের মা ?

পেরথম পেরথম মাথা একটু ঘোরায়।

আজ যশোদার প্রথম খেয়াল হয় ধনঞ্জয় সত্যসত্যই বড়ো বেশি আহ্লাদে হইয়া পড়িয়াছে. আদুরে ছেলের মতো তার ঘ্যানঘ্যানানির অন্ত নাই। নিজের দুরদৃষ্টের কথা ছাড়া মুখে তার কথা শোনা যায় না, পা কাটা যাওয়ায় যন্ত্রণায় সে যত না কাতরাইয়াছিল এখন পায়ের ঘা শুকাইয়া আসিবার পর নিজের পোড়া কপালের নিন্দা করিয়া সে যেন তার চেয়ে বেশি কাতরায়। তার কথা বলার ভঙ্গিতে যেন ভিক্ষুকের সকরুণ আবেদন নিবেদনের ধ্বনি শোনা যায়। এত যে আরামে যশোদা তাকে রাখিয়াছে, এত সেবা যত্ন করিতেছে প্রাণপাত করিয়া, কাছে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার একঘেয়ে নালিশ শুনিয়াছে আর আশা ও ভরসার কথা শুনাইয়াছে, কিছুতেই ধনঞ্জয়ের তৃপ্তি হয় নাই, সহানুভূতির উগ্র পিপাসা কমে নাই। নিজের দুঃখের কথা বলিতে বলিতে সে অহোরাত্র কাঁদিতে চায়, সেই সঙ্গে কাঁদাইতে চায় পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে। যশোদার কাছে তার যে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এ কথাটিও সে যেন ধীরে ধীরে ভুলিয়া গিয়াছে, যশোদার কাছে এ সব যেন তার পাওনা ছিল। পা কাটিয়া পঙ্গু হওয়ার জন্য তার এই দাবি জন্মিয়াছে।

ধনঞ্জয় মুখ ভার করিয়া পায়ে কাঠের পা-টি আঁটিতে যায়, যশোদা বলে, শুয়ে থেকে থেকে মাথাও কি খারাপ হয়ে গেছে তোমার ? এখান থেকে ওখানে গিয়ে খেতে বসবে, ওটা আঁটছ যে ?

ধনঞ্জয় কাঁদো কাঁদো হইয়া বলে. আর পারি না চাঁদের মা, সত্যি বলছি আর পারি না আমি। আমি কেন মরলাম না চাঁদের মা ?

হয়েছে, এসো এবার। নির্বিকারভাবে এই কথা বলিয়া যশোদা আরও বেশি নির্বিকারভাবে চলিয়া যায়। আর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না মানুষটাকে, এবার হইতে একটু শক্ত হইতে হইবে।

পরদিন সকালে কাশীবাবু আসিয়া হাজির।—কেমন আছ চাঁদের মা ?

রাস্তায় ঘষিয়া মুখের যেখানে যেখানে চামড়া তুলিয়া দিয়াছিল যশোদা, সেই জায়গাগুলি এখনও সাদাটে হইয়া আছে। মুখখানা কিন্তু হাসি হাসি। পরমাত্মীয় যেন দেখা করিতে আসিয়াছে।

বসুন। আপনি ভালো তো ?

অনেকক্ষণ বসিয়া কাশীবাবু আজেবাজে গল্প করে, শ্রমিকদের কথা বলে, মিল পরিচালনার কথা বলে—সব অর্থহীন ভাসাভাসা কথা। এ বাড়ির বাসিন্দা তারই মিলের শ্রমিকেরা যশোদার বাড়িতে রোয়াকে বসিয়া যশোদার সঙ্গে তাদের ম্যানেজারবাবুকে আলাপ করিতে দেখিয়া একটু অবাক হইয়া যায়—ভাবে যে, এতদিনে বুঝি সত্যসত্যই তাদের দাবিগুলি সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা হইবে, আলোচনা করিবার জন্যই আসিয়াছে। কাশীবাবু কিন্তু সে আলোচনার ধার দিয়াও যায় না, যশোদা নিজে কথাটা তুলিলে আশ্বাস দিয়া শুধু বলে যে, সত্যপ্রিয় নিজে খোঁজখবর নিতেছেন, প্রায়ই মিলে আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া যান, যথাসময়ে তিনিই সব ব্যবস্থা করিবেন।

ভাসাভাসাভাবে একটা খবর যশোদার কানে আসিয়াছিল, সত্যপ্রিয় নাকি গভর্নমেন্টের বড়ো একটা কনট্রাক্ট পাইয়াছে অথবা শীঘ্রই পাইবে, মিল বড়ো করা হইবে, উৎপাদন দুগুণ তিনগুণ বাড়াইয়া ফেলা হইবে। জিজ্ঞাসা করিতে কাশীবাবু একটু থতোমতো খাইয়া গেল।—কই না, আমি তো কিছু জানি না ? কত গুজব বাজারে রটে।

একেবারে বিদায় নেওয়ার খানিকটা আগে যশোদার বাড়িতে আসিবার আসল কারণটি কাশীবাবু ব্যক্ত করে। সত্যপ্রিয় তাকে পাঠাইয়া দিয়াছে—অনুতপ্ত ও লজ্জিত সত্যপ্রিয়। সত্যপ্রিয়

মিলে একটি চাকরি খালি আছে, ভালো চাকরি, ষাট টাকা বেতন। নন্দকে এই চাকরিতে ভর্তি করিয়া নেওয়ার জন্য কাশীবাবুর উপর হুকুম আসিয়াছে।

কী চোখেই যে চক্কোত্তিমশাই তোমায় দেখেছেন চাঁদের মা। কপাল তোমার ভালো।

যশোদা উদাসভাবে বলিল, কী জানি কপাল ভালো কী মন্দ !

সত্যপ্রিয়র এ উদারতায় যশোদা একটুও মুগ্ধ হইয়া যায় না। মনটা বরং তার খারাপ হইয়া যায়। ধীরে সুস্থে নন্দকে আগের চাকরিটির মতো সাধারণ একটি চাকরি দিলে কোনো কথা ছিল না, পঁচিশ টাকার বদলে না হয় বেতনটা এবার ত্রিশ টাকাই হইত। কিন্তু অনুগ্রহের এ রকম বাড়াবাড়ির একটিমাত্র অর্থ হয়—শ্রমিকদের দাবি মেটানো সম্বন্ধে সত্যপ্রিয় যে কথা দিয়াছিল, সেটা পালন করিবার ইচ্ছা তার নাই। তাই ভাইকে মোটা মাহিনার চাকরি দিয়া যশোদাকে সে বাঁধিয়া রাখিতে চায়। শ্রমিকদের সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি পালনের সময় পার হইয়া গেলেও যশোদা যাতে গোলমাল না করিয়া চুপ করিয়া থাকে। যশোদার কথায় শ্রমিকেরা ধর্মঘট বন্ধ করিয়াছিল, যশোদা চুপ করিয়া থাকিলে তারাও চুপ করিয়া থাকিবে।

এখন সমস্যা হইল, নন্দকে সে চাকরি করিতে যাইতে দিবে কিনা। দু-তিনমাসের বেশি চাকরি নন্দর থাকিবে না, ধর্মঘটের উপক্রম হইলেই আবার তার চাকরিটি খসিয়া যাইবে এবং নন্দর চাকরির খাতিরে ধর্মঘট যশোদা বন্ধ রাখিবে না, স্থগিতও করিবে না, সত্যপ্রিয় যদি কথা না রাখে এবার ধর্মঘট ঘটাইয়া যশোদা এসপার ওসপার একটা কিছু করিয়া তবে ক্ষান্ত হইবে। কিন্তু সত্যসত্যই কি সত্যপ্রিয় মতলব আঁটিয়াছে যশোদাকে হাত করিয়া শ্রমিকদের একেবারে ফাঁকি দিবে ? নন্দকে চাকরি করিতে না পাঠাইয়া সত্যপ্রিয়কে চটাইয়া দেওয়া কি সংগত হইবে ?

রাত্রে নন্দকে সে জিজ্ঞাসা করে, চাকরি করবি নন্দ ? নাই বা করলি !

নন্দ জোর দিয়া বলে, না, চাকরি করব। চাকরি ছাড়া আমার চলবে না।

কেন চলবে না ? দু-তিনমাস পরে আবার তো খেদিয়ে দেবে তোকে—কী এমন বাজা হবি তুই দু-তিনমাস চাকরি করে !

নন্দ আবার জোর দিয়া বলে, খেদিয়ে দেবে কেন ? এবার আর খেঁদিয়ে দেবে না।

শুনিয়া সন্দিগ্ধভাবে যশোদা জিজ্ঞাসা করে, কী করে জানলি তুই ?

চক্কোত্তিমশাই নিজে বলেছে।

শুনিয়া আরও বেশি সন্দিগ্ধ হইয়া যশোদা জিজ্ঞাসা করে, তুই বুঝি চাকরির জন্যে চক্কোত্তিমশায়ের কাছে গেছিলি নন্দ ?

নন্দ সাড়া দেয় না। রাগে দুঃখে অভিমানে যশোদাও অনেকক্ষণ গুম খাইয়া থাকে। অন্ধকার ঘরের দুই প্রান্তের দুটি চৌকিতে ভাইবোনের অস্বাভাবিক নীরবতা অন্ধকারকে যেন কুৎসিত করিয়া দেয়, সরু গলিটার মধ্যেই কেবল যে ভাপসা গন্ধ চিরস্থায়ী হইয়া আছে, ঘরের মধ্যেও হঠাৎ যেন সেই গন্ধের হদিস মেলে—অন্তত তাই মনে হয় যশোদার।

আমায় একবার বলতেও পারলি না নন্দ ? তুই কি কচিখোকা যে, তোকে আমি আটকে রাখতাম ?

চাকরি ছাড়া আমার চলবে না দিদি।

একটা রহস্যময় ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে দুজনের মধ্যে। যশোদা স্পষ্ট অনুভব করতে পারে, জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু জানা যাইবে না, এতকাল পরে নন্দর জীবনে এমন একটা গোপন কিছুর আমদানি হইয়াছে যা নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পদ, দিদিকে সে ভাগ দিতে পারিবে না। তাকে ডিঙাইয়া সত্যপ্রিয়র কাছে চাকরি ভিক্ষা করিতে যাওয়া শুধু চাকরির লোভে নয়—এতক্ষণে নন্দ তাহা হইলে কাঁদো কাঁদো হইয়া কথা বলিত, এমন তেজের সঙ্গে ঘোষণা করিতে পারিত না যে চাকরি ছাড়া তার চলিবে না, তাই সে চাকরি সংগ্রহ করিয়াছে, যশোদাকে জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করে নাই।

তবু যশোদা জেরা করে। তবু সে জানিতে চায়, চাকরির এত দবকার তার কেন হইল। নন্দ যে কৈফিয়ত দেয় তাতে যশোদা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যায়। তার ভাই নন্দ, তার নিজের হাতে মানুষ করা রুগ্ণ আর ভাবপ্রবণ অপদার্থ নন্দ, সে কিনা আজ তাকে শোনায় যে, বসিয়া বসিয়া দিন কাটাইলে তো চলিবে না, জীবনে একটু উন্নতির চেষ্টা তো করিতে হইবে তাকে ? বুড়া মানুষের মতো এইসব কথা বলিয়া আসল কথাটা গোপন করিয়া রাখে তার কাছে !

বিষাদের স্বাদ যশোদা প্রায় জানেই না, বিষাদ যদি কখনও ঘনাইয়া আসে তার বাহন হয় চাঁদের জন্য শোক। তাও খুব বেশি প্রশ্রয় পায় না যশোদার কাছে, পুত্রশোকে কাতর হওয়ার অবসরই বা তার কই ? আজ চাঁদের কথা মনেও পড়ে না তবু গাঢ় বিষাদে তার যেন ঝিম ধরিয়া যায়, ঘুমেব বদলে দু-চোখ ভরিয়া আসে, চোখেব পাতা খানিকক্ষণ খুলিয়া রাখা আর খানিকক্ষণ বন্ধ করার উত্তেজিত অবসাদ। আর হ্যাঁ, আজ নিজেকে তার অসহায় মনে হয়, মনে হয় জীবনটা তার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে—এত কাল কেন বাঁচিয়াছিল যশোদা, ভবিষ্যতে কেন বাঁচিবে ?

সকালে নিজেকে একটু অসুস্থ মনে হয়। তবে রাত্রির অনুভূতিগুলি রাত্রেই বিদায় হইয়া গিয়াছে। বিষাদও নাই, নিজেকে অসহায় মনে করাও নাই, জীবনেব ব্যর্থতা বা সার্থকতা নিযা মাথা ঘামানোও নাই। নন্দকে চাকরি দেওযার ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝিয়া আসিবাব জন্য সোজাসুজি সে গিয়া সত্যপ্রিয়ব সঙ্গে দেখা করে।

সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে, ষাট টাকা মাইনের চাকরি করবার যুগ্যি ছেলে তো আমার ভাই নয় চক্কোত্তিমশায়, ওকে যে নিচ্ছেন, ও কি পাববে ?

সত্যপ্রিয় মৃদু হাসিয়া বলে, তুমি একেবারে চমকে গেছ দেখছি। ভাবছ, কী জানি কী মতলব আছে লোকটার, যেচে এমন একটা চাকরি দেয় কেন ভাইকে। ভাবছ তো ? মতলব একটা আছে বইকী। মিলে নন্দর চাকরি নামমাত্র, আসলে ও চাকবি করবে আমার। বড়ো সুন্দর কীর্তন করে তোমার ভাই, সেদিন শুনে সবাই প্রশংস করেছে। মাঝে মাঝে আমার এখানে কীর্তন করবে, এই জন্য ওকে চাকরি দিয়েছি। নিজের পকেট থেকে মাইনে গুনতে হত, তার বদলে মিল থেকে যাতে মাইনেটা পায় আর আমারও কীর্তন শোনা হয়, সেই রকম একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

যশোদা আশ্চর্য হইয়া বলে, কিন্তু মিলও তো আপনার ?

সত্যপ্রিয় তেমনিভাবে মৃদু মৃদু হাসে, মিল আমাব বটে, কিন্তু মিলের টাকা আলাদা, আমাব টাকা আলাদা ! কপালেব কথা বলো কেন, এতগুলি ব্যাবসা আমার, কোনো একটা ব্যাবসা থেকে পাঁচটি টাকা নিজের জন্য চাইতে পারি না ! —যশোদার মুখ দেখিয়া আবার বলে, ও সব বড়ো গোলমেলে ব্যাপারের কথা, ও সব তুমি বুঝবে না। কোনো ব্যাবসার শেয়ার হোল্ডার আছে, কোনো ব্যাবসার স্লিপিং পার্টনার আছে, কোনো ব্যাবসার আমি শুধু ম্যানেজিং এজেন্ট— তাছাড়া, আসল ব্যাপারটি কী জান, লাভ হলে লাভটি নেব, লোকসান হলে আমার গায়ে লাগবে না, এই হল ব্যাবসার মূল কথা। কত প্যাঁচ কষতে হয়, কত নিয়ম করতে হয় তার ঠিকানা আছে ! নিজে নিয়ম করে নিজে তো ভাঙতে পাবি না ? আমিই সব, আমারই সব—তবু, আমি কেউ নই, আমার কিছুই নয়। বছর বছর ব্যাঙ্কের টাকা যে আমার কী করে হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে, নিজেই ভালো বুঝতে পারি না। এইখানে বোসো তুমি, একটা কাগজে সই করে দিচ্ছি, একঘণ্টার মধ্যে লাখ টাকা এসে হাজির হবে তোমার সামনে।...

বলিতে বলিতে সত্যপ্রিয় রীতিমতো উৎসাহিত হইয়া উঠে, বোঝা যায় টাকার কথা বলিতে তার মজা লাগিতেছে। জীবনে একটি কাজ সে করিয়াছে জীবন দিয়া, এও একটা সাধনা বইকী! কিন্তু এ সাধনার ফাঁকি যশোদা জানে, একটা সীমায় ঠেকিবার পর এ সাধনা একঘেয়ে হইয়া যায়, সেইখানে সাধনার সমাপ্তি, তারপর কেবল জের টানিয়া চলা। সত্যপ্রিয় এখন তাই করিতেছে। ব্যাঙ্কে টাকা জমানো আর খোলামকুচি জমানোর মধ্যে আর বিশেষ কোনো পার্থক্য এখন নাই। যত বড়ো

পেটুক হোক, কত আর খাইতে পারে মানুষ ?—এইভাবে কথাটা যশোদা বিচার করে। বড়োলোকের দান সম্বন্ধেও তার তাই বিশেষ শ্রদ্ধা নাই। কোটিপতিরা লাখ টাকার হাসপাতাল স্থাপন না করিলেই বরং সে একটু আশ্চর্য হয়, যেমন আশ্চর্য হয় ময়রার দোকানের পেটুক মালিক যদি অমাবস্যার নিশিপালন না করে।

যশোদাকে অভিভূত হইতে না দেখিয়া সত্যপ্রিয় একটু ক্ষুণ্ণ হয়। নন্দকে চাকরি দিবার কারণটা জানিয়া যশোদা অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরিয়া যায়।

পরদিন কাশীবাবু আবার আসে, আবার বসিয়া বসিয়া গল্প করে, যাওয়ার সময় নন্দকে একেবারে সঙ্গে নিয়া যায়। এবার নন্দ একেবারে চাকরির দলিল নিয়া বাড়ি ফেরে, একমাসের নোটিশ না দিয়া কার ক্ষমতা আছে নন্দকে এবার বরখাস্ত করে ? করিলে, একটি মাসের বেতন মাগনা দিতে হইবে, চালাকি নয় নন্দর সঙ্গে !

কী করতে হবে তোকে ?

কিছু না দিদি, কাশীবাবুর ঘরে একটা চেয়ারে বসে থাকব আর কাশীবাবু যা বলবেন করব। আজকে শুধু সঙ্গে করে মিলটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলেন। কাল থেকে কাজ আরম্ভ।

পরদিন নন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, সারাদিনে সে ঘণ্টাখানেক খাতা লিখিয়াছে, দুবার কাশীবাবুর হুকুমে মিলটা ঘুরিয়া আসিয়াছে, আর একবার গিয়া একটি লোককে কাশীবাবুর কাছে ডাকিয়া আনিয়াছে। বাপ-মা তুলিয়া গালাগালি দিয়া কাশীবাবু লোকটিকে দিয়াছে তাড়াইয়া।

যশোদা বলিল, এ আবার কেমন ধারা চাকরি রে বাবা !

রাত্রে বিতাড়িত লোকটি যশোদার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। তার নাম ভুবন, ধর্মঘটে সে একজন পান্ডা ছিল। আসিয়াই সে বলিল, বেশ দিদি, বেশ ! ভাইকে দিয়ে শেষকালে আমারই ঘাড় ভাঙলে ?

কী বলছ তুমি ভুবন ?

যেন জানো না কিছু, ন্যাকা ঠাকরুন ! আমিও এর শোধ তুলব, সর্বনাশ যদি না করি তোমার আমি—গটগট করিয়া ভুবন চলিয়া গেল। যশোদা ভালো করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। ভাবিল, নন্দকে দিয়া কাশীবাবু ডাকাইয়া আনায় বলিয়া সে বুঝি রাগ করিয়াছে। ব্যাপারটা কিন্তু তার মনের মধ্যে খচখচ করিতে লাগিল। নন্দকে দিয়া কাশীবাবু ডাকাইয়া আনে কেন ভুবনকে ? ভুবনকে ডাকিবার লোকের কি তার অভাব ঘটিয়াছিল ?

এদিকে সত্যপ্রিয় মিলে চাকরি যাওয়ার যেন মরশুম পড়িয়া গেল। একদিন যায়, দুদিন যায়, নন্দ আসিয়া খবর দেয়, সেদিনও সে ভুবনের মতো একজনকে ডাকিয়া আনিয়াছিল, কাশীবাবু গালাগালি দিয়া তাকে ছাড়াইয়া দিয়াছেন।

ব্যাপার কী মতি ?

মতি ভয়ে ভয়ে বলে, তা তো জানি না চাঁদের মা।

সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিতে সেও গম্ভীর মুখে বলিল, জানি না।

যশোদা বলিল, তোমাদের কী হয়েছে বলো তো ? আমাকে যেন সবাই কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলছ কদিন থেকে ?

তোমার এখন কর্তাবাবু, কাশীবাবু, এনাদের সঙ্গে ভাব, আমরা কী তোমার সঙ্গে মিশতে সাহস পাই !

যশোদা লম্বা করিয়া টানিয়া বলিল, ব—টে ! বড়ো যে লম্বা-চওড়া কথা শিখেছ দেখছি !

সুধীর রাগিয়া বলিল, যাও, কী আর খেতি করবে তুমি, না হয় কাজ থেকে তাড়াবে। গতর থাকলে ঢের কাজ পাব।

কাজ থেকে তাড়াব মানে ?

মানে সুধীর বলিল না, গুম হইয়া বসিয়া রহিল। কালোর মুখখানাও অন্ধকার, একদিন যে কালো সুধীরকে তাড়াতাড়ি হাজত হইতে ফিরাইয়া আনার জন্য যশোদার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াছিল। একরকম যশোদাই তো সুধীরকে সত্যসত্যই শেষ পর্যন্ত হাজত হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল।

যার চেষ্টায় এখনও হাজতে পচাব বদলে পরদিনই সুধীর আসিয়া কালোর মুখে হাসি ফুটাইয়াছিল, আজ তার দিকে কেমনভাবে চাহিয়া আছে দ্যাখো মেয়েটা, যেন যশোদার মতো শত্রু তার আর নাই ! আপশোশ করিয়া কী হইবে, মেয়েমানুষ এমনি অকৃতজ্ঞই বটে।

কিন্তু কেবল কালো তো নয় ? জগৎ আর মতিরই বা কী হইল ?

দুদিন পবে কাজ গেল জগতের, তার পরদিন মতির।

পায়ে পায়ে কাছে আসিয়া কালো বলিল, কাজ থেকে শেষ পর্যন্ত তাড়ালে দিদি ? ধন্যি তুমি।

কী বলছিস তোরা কালো ? ডাক তো জগৎকে আর সুধীরকে। কিন্তু তারা কেউ আসিল না।

পরদিন মতি বলিল, তুমিই কাজ খসালে, এবার থেকে তুমিই তবে খেতে দিয়ো চাঁদের মা।

যশোদা বলিল, এসো তো মতি আমার সঙ্গে।

মতিকে সঙ্গে করিয়া সে গেল জগতের ঘরে। জগৎ রাগিয়া আগুন হইয়া আছে। কেবল রাগ নয়, কী অবজ্ঞা সেই সঙ্গে—কথাই বলিবে না যশোদার সঙ্গে ! অনেক বলিয়া অনেক বুঝাইয়া ব্যাপারটা যশোদা বুঝিতে পারিল। খুবই সহজ একটা চাল দিয়া যশোদাকে সত্যপ্রিয় কুপোকাত করিয়াছে। প্রথমে রটিয়াছে এই যে যশোদা ভিড়িয়াছে উপরওয়ালাদের সঙ্গে, যশোদা বিশ্বাসঘাতিনী। প্রমাণ ? আগে একবার ধর্মঘট থামাইয়াছিল কে সকলের ক্ষতি করিয়া ? গতবার ধর্মঘট থামাইয়াছে কে সকলের ক্ষতি করিয়া ? সত্যপ্রিয়র সঙ্গে, কাশীবাবুর সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতা কীসের যশোদার, দুবেলা সত্যপ্রিয়র মোটর চাপিয়া কেন সে সত্যপ্রিয়র বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখিতে যায় ? নন্দর মতো একটা ছোঁড়া যে মিলে অমন চাকরি পাইল, এটা কীসের পুরস্কার ? এক একটা ছুতা দিয়া একে একে ধর্মঘটের সাত-আটজন পান্ডাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল এটা কার পরামর্শ ?

আমার পরামর্শ নাকি জগৎ, অ্যাঁ ? আমি পরামর্শ দিয়েছি তোমাদের তাড়াবার ?

কাশীবাবু নিজে বলেছেন।

শুনিয়া খানিকক্ষণ যশোদা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল, পেটে পেটে এই মতলব ছিল ব্যাটার, তাই তিনমাস ধর্ম্মোঘট বন্ধ রাখতে বলেছিল ! সবাইকে ডাক দিকি একবার জগৎ, পিলেটা চমকে দিই হাড়হাবাতে সত্যপ্রিয় আর কাশীবাবুর।

কিন্তু কেউ আসিল না। আর কে বিশ্বাস করিবে যশোদাকে ? কী লাভ হইয়াছে যশোদাকে বিশ্বাস করিয়া ? বরং লোকসান হইয়াছে পুরামাত্রায়। যশোদা যদি খারাপ মানুষ নাও হয়, ধরা যাক তার কোনোই দোষ নাই, কী দরকার তাকে টানাটানি করিয়া ? সাবধান থাকাই ভালো। শ্রমিক প্রতিষ্ঠান দুটি হইতেও যশোদা সম্পর্কে সাবধান থাকিবার জন্য সকলকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যশোদা কে যে তার কথায় সকলে ধর্মঘট করিবে আর ধর্মঘট থামাইবে ?

যশোদা নন্দকে বলিল, কাল থেকে কাজে যাস না নন্দ।

শুনিয়া নন্দ মুষড়িয়া গেল। বড়ো আরামের চাকরি, ইতিমধ্যে সে পনেরো টাকা আগাম মাহিনা চাহিবামাত্র পাইয়া গিয়াছে !

দিশেহারা নন্দ পরামর্শ করিতে গেল সুবর্ণের সঙ্গে। সুবর্ণ আঁতকাইয়া উঠিয়া বলিল, না না, কখনও চাকরি ছেড়ো না তুমি। আমাদের কী উপায় হবে ?

চাকরি না ছাড়িলেও যে তাদের কী উপায় হওয়া সম্ভব নন্দ ভাবিয়া পায় না। তবে সুবর্ণই একদিন এক মিনিটের নোটিশে তাকে বগলদাবা করিয়াও উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, সুবর্ণই

আজ মত বদলাইয়া তাড়াতাড়ি জীবনে তার উন্নতি করাইয়া প্রচলিত প্রথায় তাকে বরণ করিতে চায়, সুতরাং নন্দর কিছু বলিবার থাকিলেও বলিবার উপায় নাই। বলিতে ইচ্ছাও হয় না। অন্যকথা অবশ্য বলিতে ইচ্ছা হয় অনেক, আসরে শত শত মানুষের মধ্যে একা নন্দ একাকিনী সুবর্ণকে যে সব কথা হাসিয়া কাঁদিয়া বলে তার চেয়েও মৌলিক, তার চেয়েও রোমাঞ্চকর রাশি রাশি কথা। মনে হয়, সুবর্ণেরও যেন ওইরকম অনেক কিছু বক্তব্য আছে। তাই, নন্দও একরকম কিছুই বলে না, সুবর্ণও বলে না—জীবনমরণের সমস্যা নিয়া পরামর্শটা পর্যন্ত তাদের এমন সংক্ষিপ্ত হয় বলিবার নয়। শুনিলে অন্য লোকের মনে হওয়া আশ্চর্য নয় যে, কিশোর-কিশোরীর মাসিকপত্রে যে সব ধাঁধা থাকে দুজনে বুঝি তারই উত্তর বাহির করিতেছে, একজন আর একজনকে শুনাইতেছে এক একটি সংকেত-সূত্র।

সুবর্ণ হয়তো বলে, একশো যদি হত—

নন্দ সায় দেয়। আচমকা তিনটি মোটে শব্দ সুবর্ণ উচ্চারণ করিযাছে, কিন্তু দুজনের কাছেই তার অর্থ পরিষ্কার। নন্দর যদি একশো টাকা বেতন হইত আর নন্দ যদি জ্যোতির্ময়ের মতো একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া বাস করিত আর মেলামেশা করিত ভদ্রলোকের সঙ্গে অর্থাৎ সোজা কথায় নন্দ যদি জ্যোতির্ময়ের স্তরে ঠেলিয়া তুলিতে পারিত নিজেকে, তবে আর তাদের কোনো ভাবনা ছিল না।

একটুক্ষণ চোখে চোখে চাহিয়া থাকিয়া সুবর্ণ হয়তো আবার বলে, দাদার চাকরি গেলেও—

এবারও নন্দ সায় দেয়। জ্যোতির্ময়ের যদি চাকরি যায় এবং আর সে চাকরি না পায় এবং ভয়ানক গরিব হইয়া যশোদার বাড়ির মতোই একটা বাড়িতে কায়ক্লেশে দিন কাটাইতে বাধ্য হয় অর্থাৎ সোজা কথায়, জ্যোতির্ময় যদি নন্দর স্তরে নামিয়া আসে, তাহা হইলেও তাদের কোনো ভাবনা ছিল না।

আবার একটু চোখে চোখে চাহিয়া সুবর্ণ হয়তো আবার আরও নিচু গলায় ফিসফিস করিয়া বলে, বউদির কথা তুলে খুব খোঁচাচ্ছি, কিন্তু—

অপরাজিতার কথা তুলিয়া সুবর্ণ জ্যোতির্ময়কে খুব খোঁচাইতেছে, সে যাতে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া গরিব হইয়া যায়। কিন্তু অপরাজিতার স্মৃতির অস্ত্রেও সুবর্ণ তার মর্মভেদ করিতে পারিতেছে না, সমস্ত খোঁচানো ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

দুজনে প্রায় একসঙ্গে নিশ্বাস ফেলে। নিশ্বাস ফেলিয়া নন্দ হয়তো বলে, যদি না হয় ?

সুবর্ণ হয়তো জবাব দেয়, তাহলে তাই করব।

অর্থাৎ কিছুতেই যদি কিছু না হয়, তাহা হইলে অগত্যাই দুজনে তারা হাত ধরাধরি করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবে। এমনিভাবে কথার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ আর মুখের ভাব আর দৃষ্টি বিনিময় দিয়া অনায়াসে তারা পরস্পরের মনের কথা বুঝিতে পারে, কী সৃষ্টিছাড়া মনের মিলটাই যে তাদের হইয়াছে ! এই রকম আদানপ্রদানের নামই বোধ হয় ভালোবাসার ভাষা, কে বলিবে !

যশোদার বারণ না মানিয়া নন্দ চাকরি করিতে যায় আর যশোদা সকলকে জিজ্ঞাসা করে, নন্দকে যদি আমি খেদিয়ে দিই, তবে তো তোমরা আমায় বিশ্বাস করবে ?

কিন্তু বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন এখন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, যশোদাকে তারা এড়াইয়া চলিতে চায়, যশোদার সঙ্গে মাখামাখি করিয়া বিপন্ন হইবে কে ? বলাই নামে একজন শ্রমিক যেদিন বরখাস্ত হইয়াছিল তার পরদিন সকালে উঠিয়াই ছেঁড়া কাপড় জামা শতরঞ্চি কম্বল গুটাইয়া বিদায় হইয়া গেল যশোদার বাড়ি হইতে শোনা গেল তাকে আবার কাজে নেওয়া হইয়াছে। তারপর সাতদিনের মধ্যে যশোদার বাড়ি খালি হইয়া গেল। যশোদার পাওনা-গণ্ডা মিটাইয়া দিয়াই গেল সকলে, কাশীবাবু সকলকে দরকার মতো আগাম টাকা দিয়াছে। যশোদাকে টাকা না দিয়া যাইতে পারিলে অবশ্য সকলে তাহাই করিত, কিন্তু যশোদাকে ফাঁকি দেওয়া বড়ো কঠিন।

প্রথমে যশোদা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কী করছ তোমরা বুঝতে পারছ ? সাধ করে ফাঁদে পা দিচ্ছ ? যদ্দিন না মিলের দেনা শোধ হবে টুঁ শব্দটি করতে পারবে না তোমরা, যা বলবে যা করবে মুখটি বুজে মেনে নিতে হবে তোমাদের—বুঝতে পারছ ?

বুঝিতে পারিতেছে সকলেই, কিন্তু উপায় কী ?

কেবল সত্যপ্রিয় মিলের নয়, অন্য মিলের যারা যশোদার বাড়িতে ছিল তারাও পলাইয়া গেল। উপর হইতে তাদের উপরেও চাপ পড়িয়াছে। এ বাড়িতে রহিল কেবল মতি আর ধনঞ্জয়, ও বাড়িতে সুধীর আর নদেরচাঁদ। সুধীরকেও চলিয়া যাওয়ার জন্য কালো ক্রমাগত খোঁচাইতেছিল, কিন্তু সে কাজ করে রেলের ইয়ার্ডে, যশোদার দেনা শোধ করিয়া যশোদাকে ত্যাগ করার জন্য কে তাকে আগাম টাকা দিবে ? নদেরচাঁদের কাজ ছিল না, মিলে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনাও তার নাই।

তিনটি উনানে যশোদার আঁচ পড়ে না। একটি উনান ধরানোর সময় তার মনে হয়, এত বড়ো উনান ধরাইয়া কী হইবে, মিছামিছি কয়লার অপচয়। ছোটো একটি উনান তৈয়ারি করিতে হইবে। অন্যসময় প্রয়োজন হওয়া মাত্র ছোটো উনান যশোদার প্রস্তুত হইয়া যাইত, এ রকম সামান্য কাজ ফেলিয়া রাখা যশোদার স্বভাব নয়, কিন্তু এবার ছোটো উনানটি যশোদার মনের মধ্যেই জ্বলিতে থাকিল। রান্নাঘরে বড়ো বড়ো উনান তিনটির কাছে কাদামাটি দিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি বা উৎসাহ যেন তার নাই।

শহরতলি পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

শহরতলি

দ্বিতীয় পর্ব

এক

শহরতলির রূপান্তর গ্রহণের প্রক্রিয়া দিন দিন দ্রুততর হইয়া উঠে।

অদ্ভুত ব্যাপার কিছু নয়, তবু আশ্চর্য মনে হয়। মাটিব বাসন যেন দেখিতে দেখিতে কৃত্রিম ধাতুতে দাঁড়াইয়া যাইতেছে আর চাকচিক্য বাড়িতেছে প্রতিদিন। কত এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা নূতন পিচের আববণে গা ঢাকিয়া ঝকঝক করিতেছে, কত আঁকাবাঁকা সরু গলি চওড়া আব সিধা হইয়া যাইতেছে, কত অনামি পথেব গায়ে আঁটা হইয়া যাইতেছে জমকালো নাম।

চাবিদিকে বাড়ি উঠিতেছে অসংখ্য। ফাঁকে ফাঁকে ছড়ানো সেকেলে ধরনের সাদাসিধে একতলা দোতলা অনেক বাড়ি অদৃশ্য হইয়া সেখানে দেখা দিতেছে আধুনিক ফ্যাশনেব বাড়ি—শুধু গঠনের মধ্যেই কত কায়দা। এ অঞ্চলে ছোটোবড়ো সব বাড়িরই প্রায় আকার ছিল চারকোনা বাক্সের মতো, এখন বাড়িগুলি হইয়াছে ইট-কাঠ-চুন-সুরকি-সিমেন্ট-লোহার জ্যামিতি। অস্বাভাবিক রূপলাবণ্যের অপ্রত্যাশিত আঘাতে বাড়িগুলি যেন দৃষ্টিকে পীড়া দেয়। শিল্পী ভাস্কর কি মিস্ত্রির কাজ আবম্ভ করিযাছে, তাই তাল সামলানো যাইতেছে না ?

দোকানপাটের সংখ্যাও হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে, পুরানো দোকানের চেহারাও বদলাইয়া যাইতেছে। ছোটো ছোটো কত পুরানো দোকান যে উঠিয়া গেল !—ছোটো অপবিচ্ছন্ন ঘরে এলোমেলোভাবে জিনিস সাজাইযা এতদিন যাদের কাছে মাল বিক্রি করা চলিত তাদের অনেকেই তো নাই, নূতন যারা আসিয়াছে তারা ছবির মতো সাজানো দোকান চায়।

বড়ো রাস্তায় বাস্তার আলোর সংখ্যা আরও জোর বাড়িয়াছে বটে কিন্তু এখন দুদিকের দোকানেব আলোতেই রাস্তাটি এমন ঝলমল করে যে, বাস্তাব আলো বাত বাবোটা পর্যন্ত নিভাইয়া বাখিলেও চলে।

বাজারেব সংস্কার হইয়াছে। এলোমেলোভাবে যেখানে সেখানে কেউ আর মাছ-তবকারি বেচিতে বসে না, সন্ধ্যার পর বাজারের অর্ধেকটা এখন আর আবছা অন্ধকারে ঢাকিয়া যায় না। দুবেলা ধোয়া-মোছার ব্যবস্থা করিয়াও অবশ্য বাজারের নোংবামি আর দুর্গন্ধ এখনও দূর করা যায় নাই, কোনোদিন যাইবেও না, তবু কুলির দেহ ভদ্রলোকের দেহে পরিণত হওয়ার মতো, বাজারের পবিবর্তন যে হইয়াছে, তাতে সন্দেহ নাই।

দলে দলে যেসব নরনারী আসিয়া এ অঞ্চলের নূতন ধরনের বাড়িগুলিতে নীড় বাঁধিতেছে, শহরতলিব পবিবর্তিত আবেষ্টনীর সঙ্গে তাদের চালচলন বেশভূষা বেশ খাপ খায়। অনেকে বাস করিতে আসিয়াছে নিজের বাড়িতে, অনেকে আসিয়াছে ভাড়াটে হইয়া। জমির দাম এত বাড়িয়া গিয়াছে যে বড়োলোক ছাড়া বাড়ি করিয়া এ অঞ্চলে বাস করা আর সম্ভব নয়। প্রথম দিকে যারা জমি কিনিয়া বাড়ি করিয়াছিল অথবা তৈরি বাড়ি কিনিয়া নিয়াছিল, তারা প্রায় অধিকাংশই না-বড়োলোক ধরনের ধনী, বাড়ি করিতেই হয়তো অনেকের জীবনের সঞ্চয় ফুরাইয়া গিয়াছে। তবু এরাই প্রথমে এই শহরতলিকে ফ্যাশনেবল শহুরে রূপ দিয়াছে, এ অঞ্চলে বাস করার মর্যাদা ও সুবিধা বাড়াইয়াছে, আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছে। তারপর আসিয়াছে বড়ো বড়ো চাকুরে, ব্যবসায়ী, জমিদার—দশগুণ কম দামে পাঁচ কাঠা জমি কিনিতে একদিন যাকে চোখে অন্ধকার দেখিতে হইয়াছিল তার ছোটো বাড়িখানার পাশে উঠিয়াছে বাগানঘেরা প্রাসাদ।

অনেক বস্তির চিহ্নও লোপ পাইয়াছে, কেবল যেগুলি বড়ো রাস্তার অনেক তফাতে ভদ্রপাড়ার পিছনে পড়িয়াছে সেগুলি টিকিয়া আছে,—কোনোটা সম্পূর্ণ, কোনোটা আংশিক। যশোদার বাড়ির

তিন দিকে নতুন বাড়ি উঠিয়াছে, কেবল কুমুদিনীর বাড়ি যেদিকে সেদিকটা আগে যেমন ছিল তেমনই আছে। রূপান্তরের ঢেউ যশোদার দুটি মুখোমুখি বাড়ি পর্যন্ত আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছে।

যশোদা বাড়ি দুটি বিক্রি করিলে সঙ্গে সঙ্গে এদিকের আট-দশখানা বাড়ি পরিবর্তনের স্রোতে ভাসিয়া যাইত। বিক্রি করিবার জন্য এ সব বাড়ি আর ফাঁকা জমির মালিকেরা সকলেই উৎসুক হইয়া আছে, এ অঞ্চলে জমির দাম যে এত চড়িতে পারে পাঁচ-সাতবছর আগে কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। সব বেচিয়া দিয়া শহরের আরও তফাতে সস্তায় জমি কিনিয়া আবার তারা বাড়িঘর তৈরি করিয়া নিবে, একটা মোটা টাকা হাতে থাকিয়া যাইবে। এখন তাদের ভয় শুধু এই, হঠাৎ জমির দাম না কমিয়া যায়।

কিন্তু যশোদার জন্য কেউ তারা বাড়ি বিক্রি করিতে পারিতেছে না। যে কোম্পানি সমস্ত পাড়াটা চড়া দামে কিনিতে চায়, মাঝখানে যশোদার বাড়ি দুটি বাদ পড়িলে তারা বেশি দাম দিবে না। সকলেই যদি বেচিতে রাজি হয়, এক কাঠা জমিও বাদ না পড়ে, তবেই যশোদার বাড়ির এ পাশের জমির দরটা তাদেরও দেওয়া চলিতে পারে—নয়তো অত দামে ছাড়া ছাড়া জমি কিনিয়া কোম্পানির কী লাভ হইবে ?

এইসব বাড়ির মালিকেরা একত্র হইয়া অনেক পরামর্শ করিয়াছে, যশোদাকে বুঝাইয়াছে, অনুরোধ করিয়াছে, ভয়ও দেখাইয়াছে। কুমুদিনী যে তাকে কত খোঁচাইয়াছে বলিবার নয়। কুমুদিনীর বাড়িটি ছোটো কিন্তু জায়গা অনেক। বাড়ির পিছনে তার একটি ছোটোখাটো বাগান আছে, পেয়ারা, লেবু, ডালিমগাছে বাগানটি ঠাসা। অনেকগুলি টাকা হাতে পাওয়ার শখটা কুমুদিনীর চিরদিনই বড়ো প্রবল। টাকা হাতে পাওয়ার শখটা অবশ্য কারও কম থাকে না, কিন্তু একসঙ্গে মোটা টাকা পাওয়ার জন্য কুমুদিনীর মনটাই বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশি ছটফট করিতেছে।

তারপর মনের অশান্তি আর সকলের পীড়াপীড়িতে অস্থির হইয়া উঠিয়া বাড়ি বেচিতে যশোদা যদি বা রাজি হইয়াছিল, শেষ মুহূর্তে হঠাৎ আবার তার মন বদলাইয়া গেল।

সামান্য একটা উপলক্ষে।

বাড়ি বেচিতে রাজি হওয়া মাত্র যশোদা বলিল, তবে আর এ বাড়িতে আমি একটা দিনও থাকব না। আমি চললাম।

কুমুদিনী, রাজেন আর ধনঞ্জয় তিনজনেই ব্যাকুল হইয়া বলিল, চললে ? কোথায় চললে তুমি বলা নেই কওয়া নেই ?

যশোদা হাসিল। যশোদার সেই শান্ত কৌতুকভরা হাসি দেখিয়া সকলে স্বস্তি বোধ করিল। না, রাগে দুঃখে বিরক্তিতে মাথা যশোদার বিগড়াইয়া যায় নাই।

দুদিন একটু ঘুরে আসব।

রাজেন বলিল, কোথায় যাবে ?

যশোদা বলিল, চুলোয়। কুঁড়ে পাও, গোয়াল পাও একটা ঠিক করে রেখো দিকি আমার জন্যে—পরশু এসেই জিনিসপত্তর নিয়ে উঠে যাব।

কুমুদিনী মুখ অন্ধকার করিয়া বলিল, হুঁ, জিনিসপত্তর ! জিনিসপত্তর বেঁধেছেঁদে রাখতে হবে তো আমাকে ?

তোকে তো আমি বলিনি সই !

কারও কাছে মনের কথা ফাঁস না করিয়া যশোদা বাড়ি ছাড়িয়া শহরের এক সস্তা হোটেলে গিয়া উঠিল। কিছুদিন হইতে যশোদা ভাবিতেছিল, রীতিমতো একটা হোটেল খুলিয়া নিজের চারিদিকে আবার কতকগুলি মানুষ জড়ো করিয়া অনাত্মীয় মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়াইয়া দিয়া দিন কাটাইবে। কিন্তু দুটি দিন সেই আদর্শ ও পবিত্র হোটেলে কাটাইয়াই সে বুঝিতে পারিল, এই সব

কলমপেষা কুলিরা কারও সঙ্গে সুখদুঃখের উপভোগ ভাগাভাগি করে না, যেটুকু করে সেটুকু শুধু মৌখিক ভদ্র আলাপে চলতি শব্দের আদান-প্রদান। সহানুভূতি কাকে বলে কেউ জানে না, চায় না এবং পায়ও না।

ক্ষুণ্ণ মনে যশোদা তাই ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, কুমুদিনী সত্যই তাব সমস্ত জিনিসপত্র বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। শহরের অন্যপ্রান্তে একটি বাড়িও রাজেন ঠিক করিয়াছে, সকলে মিলিয়া এখন সেখানে গিয়া উঠিবে তারপর যা ব্যবস্থা হয় করা হইবে। যশোদা চলিয়া যাইবে আর তারা এখানে পড়িয়া থাকিবে, কুমুদিনীর তা সহ্য করা অসম্ভব। শত্রু যদি চোখের আড়ালেই চলিয়া গেল, দিন তার কাটিবে কী করিয়া ?

যশোদা রাজেনকে বলিল, তোমাদের যাবার তাড়াতাড়ি কীসের ?

রাজেনের হইয়া কুমুদিনী জবাব দিল, তোমাবই বা তাড়াতাড়িটা কী শুনি।

যশোদা মুখভার করিয়া বলিল, আমার কথা আলাদা। একা মানুষ আমি, দুদিন আগে যাই পরে যাই, কারও কিছু এসে যাবে না। তোমরা কেন মিছিমিছি দু-চারমাস আগে থেকে ঘর ছাড়া হবে ?

কুমুদিনী মুচকিয়া একটু হাসিল।—আমরাও তো একা মানুষ চাঁদের মা, নই ?—দুটি একা মানুষ।

রাজেন ও কুমুদিনী চলিয়া গেলে বাড়ি ছাড়িয়া যাওযার জন্যে প্রস্তুত হইযা যশোদা বাড়িব উনুনগুলা ভাঙিয়া দিতে গেল।

যশোদার লাথিতে তার রান্নাঘরের প্রকাণ্ড উনুন তিনটি ভাঙিয়া গেল। বাড়ি ছাড়িযা যাওযাব সময় নাকি উনুন ভাঙিয়া দিয়া যাইতে হয়।

মেয়েলি শাস্ত্রেব এ সব বিধান যশোদা যে বিশেষ মানিযা চলে তা নয়, তা ছাড়া লাথি দিয়া উনুন ভাঙিতে হইবে এমন কোনো নির্দেশও এ শাস্ত্রে নাই। তবে, মন ভাঙিয়া গেলে মানুষের পক্ষে উনুন ভাঙিবাব জন্য এ বকম খাপছাড়া উপায় অবলম্বন করা আশ্চর্য নয়।

উনুন ভাঙিল, একটি পাও জখম হইল যশোদাব। লোহাব একটা শিক ডান পায়ের পাতায এফোঁড়-ওফোঁড় বিঁধিয়া গেল। মন-ভাঙা আবেগে লাথিগুলি যশোদা একটু জোরে জোরেই মারিয়াছিল।

মেঝেতে বসিয়া নিজেই সে টান দিয়া শিক খুলিয়া ফেলিল। তখন আরম্ভ হইল বক্তপাত। কত রক্তই যে ছিল যশোদার প্রকাণ্ড শরীরটাতে, দেখিতে দেখিতে রক্তে মেঝে ভাসিয়া গেল।

বগল-লাঠিতে ভর দিযা এক পায়ে দবজার কাছে দাঁড়াইযা ধনঞ্জয যশোদার কীর্তি দেখিতেছিল, তার দিকে চাহিয়া যশোদা বলিল, দেখলে ?

রক্ত দেখিয়া ধনঞ্জয় প্রথমটা থতোমতো খাইয়া যায়।

পা কাটা যাওয়ার পব কিছুদিন সে সামান্য কারণে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, বাগারাগি চেঁচামেচি করিয়া বাড়ি সরগরম করিয়া তুলিত, কত যে ছেলেমানুমি আর পাগলামি তার আসিযাছিল হিসাব হয় না। তাবপর ধীরে ধীরে সে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। সব সময়েই প্রায় বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, অথচ কোনো বিষয়ে সে গভীরভাবে চিন্তা করিতেছে তাও মনে হয না। ডাকিলে চমকাইয়া ওঠে না, ডাক সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সচেতন হইয়া ওঠে, সাড়া দিতে একটু সময় লাগে। মস্তিষ্কের ক্রিয়া যেন আজকাল তার একটু শ্লথগতিতে সম্পন্ন হয়। কেমন একটু বোকাহাবার মতো হইয়া পড়িয়াছে মানুষটা।

যশোদার পা জখম হইয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িতেছে এটা খেয়াল করিয়া উঠিতে একটু তার সময় লাগে, কিন্তু তারপর চোখের পলকে ঝিমানো মানুষটা যে সজীব হইয়া উঠে অতিমাত্রায়।

বগলের লাঠি ফেলিয়া দিয়া ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে কাছে আগাইয়া যায়, গায়ের নতুন আলোয়ানটি দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে ব্যাকুলভাবে বলে, ডাক্তার ডেকে আনি ?

আলোয়ানটি কাড়িয়া নিয়া যশোদা বলে, ডাক্তার না হাতি ডাকবে। জল আনো এক ঘটি আর খানিকটা ন্যাকড়া।

ধনঞ্জয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়ে, এক পায়ে দুয়ারের কাছে গিয়া বগল-লাঠি তুলিয়া নিতে গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম করে। যশোদা ডাকিয়া বলে হুটোপুটি কোরো না বাবু, ধীরে সুস্থে আনো।

রক্ত পড়ছে যে গো !

কই রক্ত পড়ছে ? টিপে ধরে আছি দেখছ না ?

ধনঞ্জয় জল আর ন্যাকড়া আনিতে যায়, পায়ের পাতার ফুটা টিপিয়া ধরিয়া রাখিয়া যশোদা চাহিয়া থাকে উনুনের ভগ্নস্তূপের দিকে। একদিন দুবেলা এই উনুনে বিশ-পঁচিশজনের রান্না করিত যশোদা, কুলিমজুরের মোটা ভাত, যশোদা যাদের আপন করিতে গিয়াছিল। আজ তারা সকলেই তাকে ত্যাগ করিয়াছে, বাড়িতে তার মানুষ নাই। পরের বাড়ির একটা মেয়েকে চুবি করিয়া ভাইটা পর্যন্ত তার কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে।

এদিকে ধনঞ্জয় চেঁচামেচি আরম্ভ করে, ও চাঁদের মা, ন্যাকড়া যে পাচ্ছি না ?

ছোটো টিনের তোরঙ্গে ছেঁড়াকাপড় আছে একটা, সেইটে নিয়ে এসো।

নির্দেশ দিয়া বলিয়া যশোদা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। টিনের তোরঙ্গটি যে চাবিবন্ধ আছে, ধনঞ্জয় খুলিতে পারিবে না, এ কথা তার মনে আছে। তবু সে আর সাড়াশব্দ দেয় না, পায়ের ক্ষত হইতে আঙুলের ছিপি খুলিয়া রক্তপাতের পথটাও মুক্ত করিয়া দেয়। এ একটা সাময়িক মানসিক বিলাস ভাঙা-মনের। নিজেকে আঘাত করিতেও সময় বিশেষে মানুষের বড়ো ভালো লাগে, নিজের লাল রক্তের অপচয়ও ভালো লাগে।

কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়া ধনঞ্জয়ও চুপ করিয়া যায়, খানিক পরে জলের ঘটি আর ছেঁড়া কাপড় হাতে করিয়া আসিয়া যশোদার কাণ্ড দেখিয়া আবার ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

টিপে ধরো, টিপে ধরো, শিগগির টিপে ধরো।

যশোদা করুণভাবে একটু হাসিয়া বলে, কী করে খুললে বাস্‌কো ?

টেনে খুলেছি।

তার মানে বাস্‌কোর তালাটি ভেঙেছো আমার। ধন্য তুমি।

পায়ে একটা লোহার শিক বিঁধিয়া যাওয়া বাধা হিসাবে গণ্য করিবার মতো গুরুতর ব্যাপাব কিছু নয়। বাড়ি ছাড়িয়া যাওয়ার আর সব ব্যবস্থাই যখন হইয়া গিয়াছে, বাড়িটা বিক্রয় করিতে পর্যন্ত বাকি আছে, কেবল হাতে টাকাটা পাইয়া দলিল রেজেস্ট্রি করা, ভারী ভারী জিনিসপত্র প্রায় সমস্তই পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে শহরের অপর প্রান্তের আরেক শহরতলির ভাড়াটে বাড়িতে, রওনা হওয়ার আয়োজন শেষ, শুধু বাকি আছে গাড়ি ডাকিয়া বাকি জিনিসপত্র নিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসার, তখন পায়ে শিক বেঁধাকে উপলক্ষ করিয়া হঠাং বাঁকিয়া বসার কোনো অর্থ হয় না। যে সব কারণে যশোদা এ বাড়ি ছাড়িয়া এদিকের শহরতলি ছাড়িয়া জন্মের মতো চলিয়া যাইতেছিল, পা একটু জখম হওয়ায় তার একটিও বাতিল হইয়া যায় নাই। তবু শেষ মুহূর্তে যশোদা ওই ছুতায় যাওয়াটাই বাতিল করিয়া দিল।

ধনঞ্জয় বলিল, এ পা নিয়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে চাঁদের মা !

যশোদা চুপ করিয়া রহিল। তার এই গাম্ভীর্য ধনঞ্জয়ের কাছে চিরদিন বড়ো অস্বস্তিকর। একটু ভয়ে ভয়ে যে বলিল, খুব ব্যথা করছে তো ?

যশোদা ফোঁস করিয়া উঠিল, কীসের ব্যথা ? আমার আবার ব্যথা-বেদনা কীসের শুনি ?

ধনঞ্জয় আরও দমিয়া গেল।—পায়ের কথা বলছি গো। তোমার ওই পায়ের কথা যাতে শিক বিঁধেছে। কম লেগেছে তোমার পায়ে !

না লাগেনি, একটুও লাগেনি। আমার আবার লাগালাগি কী ? মুখপোড়া ভগবান আমায় লোহা দিয়ে গড়েছে জান না ?

ধনঞ্জয় বলিল, গাড়ি ডাকি তবে ?

যশোদা বলিল, থাক।

আজ যাবে না ?

না।

ধনঞ্জয় খুশি হইয়া বলিল, আমিও তো তাই বলছি। তাড়াহুড়োর কী আছে ? পায়ের ব্যথাটা কমুক, দুদিন পরে গেলেও চলবে।

বলিতে বলিতে ধনঞ্জয়ের মুখে ম্যাজিকের মেঘের মতো বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। তোমার পা দুদিন পরে সেরে যাবে, আমার পা কিন্তু কোনোদিন ঠিক হবে না চাঁদের মা।

অনেকদিন যশোদা ধনঞ্জয়ের মুখে তার কাটা পায়ের জন্য নালিশ শোনে নাই, বিষাদেব ছাপটা যদিও চোখে পড়িয়াছে সব সময়েই। হাঁটুর নীচেই ডান পা-টি ধনঞ্জয়ের শেষ হইয়া গিয়াছে, ঘা শুকাইয়া খানিকটা মসৃণ হইয়াছে, বাকিটা হইয়া আছে এবড়ো-খেবড়ো। দেখিলে যশোদার এখনও বেদনা আর বিতৃষ্ণা মেশানো একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়, কতকটা প্রিয়জনেব মৃতদের দেখিয়া বিব্রত হওয়ার মতো।

আমারও ডান পা-টা জখম হয়েছে, দেখেছ ?

এতক্ষণ খেয়াল হয় নাই, এবাব খেয়াল করিয়া এই অত্যাশ্চর্য যোগাযোগে ধনঞ্জয়ের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

হয়তো আমার পা-টাও তোমাব মতো কেটে বাদ দিতে হবে।

না না, তা কী হয়, কী যে বলো তুমি চাঁদেব মা !

হতে পারে তো ? পা-টা যদি পেকে ফুলে ওঠে, তারপর পচে গলে যায়, তারপর ডাক্তার কবাত দিয়ে কেটে তোমার পায়ের মতো করে দেয়, বেশ হয় তা হলে, না ?

কথা শুনিলে আর কথা বলিবার ভঙ্গি দেখিলে মনে হয় যশোদার মনে বুঝি ঘোরতব বিকার আসিয়াছে। পায়ের পাতায় তার যেভাবে আঘাত লাগিয়াছে তাতে পা-টি পাকিয়া ফুলিয়া উঠিতে অবশ্য পাবে এবং শেষ পর্যন্ত কাটিয়া পায়ের খানিকটা বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হওয়াও আশ্চর্য নয়, সামান্য আঁচড় লাগিয়াও সময় সময় ও রকম হয়। কিন্তু সেটা যে বেশ হয়, ধনঞ্জয়ের সঙ্গে তারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটা সামঞ্জস্য ঘটিবে শুধু এই জন্যই, এ রকম ছেলেমানুষি কথা যশোদার মুখে মানায় না। কথাটা সে বলে রীতিমতো আবেগের সঙ্গে, যেটা তার পক্ষে আরও বেশি অস্বাভাবিক, সেই জন্য মনে হয় সে যেন তামাশা করিতেছে।

ধনঞ্জয় খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকে।

আমার সঙ্গে তামাশা করছ চাঁদের মা ?

শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ও গম্ভীর হইয়া যশোদা বলে, না, তামাশা করিনি। মনটা ভালো নেই কিনা, তাই কী বলতে কী বলেছি। বাড়িভরা লোক ছিল আমার, তুমি ছাড়া আজ কেউ নেই, কী অদেষ্ট বলো তো আমার ?

চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে যশোদার, আর বিহ্বলের মতো তাই দেখিতে থাকে ধনঞ্জয়। যশোদার মুখ সে গম্ভীর হইতে দেখিয়াছে, সহানুভূতিতে কোমল হইতেও দেখিয়াছে, কিন্তু সে মুখে বিষন্নতা কী কোনোদিন নজরে পড়িয়াছিল তার ? যশোদা যে কাঁদিতে পারে, আর দশজন সাধারণ

স্ত্রীলোকের মতো দুঃখে জল আসিতে পারে তারও চোখে, কেবল ধনঞ্জয় নয়, যশোদাকে যারা চেনে তাদের প্রায় সকলের পক্ষেই এটা কল্পনা করাও কঠিন ছিল।

শূন্য বাড়িতে শূন্য ঘরে খালি তক্তপোশের দুই প্রান্তে দুজনে বসিয়াছিল। তক্তপোশের বিছানাপত্র গুটাইয়া বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে। ঘরের জিনিসপত্র যশোদা পা জখম হওয়ার আগেই রোয়াকে টানিয়া নিয়া গিয়াছে। ধনঞ্জয় সরিয়া সরিয়া যশোদার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিল, কোঁচার খুঁট দিয়া যশোদার চোখ মুছাইয়া দিল। যশোদার চোখ দিয়া জল পড়া যেমন আশ্চর্য ব্যাপার, ধনঞ্জয়ের কাণ্ডটা তার চেয়ে কম নয়। অন্য সময় এত সাহস ধনঞ্জয়ের হইত না।

মানুষটাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়ার বদলে যশোদা তার হাত নামাইয়া ধরিয়া রাখিল, বলিল, হয়েছে। কচি খুকি না কি আমি, আদর করে কান্না থামাচ্ছ ?

ধনঞ্জয়ের জন্যই এবার যশোদার মন আরও খারাপ হইয়া যায়। বড়ো আত্মগ্লানি সে বোধ করে। নিজের উপর রাগ ধরিয়া যায়। ধনঞ্জয় ছেলেমানুষ—বয়সে না হোক মনের দিক দিয়া সত্যই বড়ো ছেলেমানুষ। অতি তুচ্ছ একটু সাধারণ অন্তরঙ্গতাই যে মানুষটাকে খুশিতে গদগদ করিয়া দেয়, হাতে খেলনা পাওয়া শিশুর মতো, অনেকবার সে তার প্রমাণ পাইয়াছে। কতবার সে ভাবিয়া রাখিয়াছে, লোকটার সঙ্গে কথায় ব্যবহারে একটু দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। কোনোমতেই তো কথাটা সে মনে রাখিতে পারে না ! সকলে তাকে ত্যাগ করিয়াছে শুধু ধনঞ্জয় ত্যাগ করে নাই, এই ভাবটাই শুধু মনে থাকিয়া যায়। তাকে ত্যাগ করার কারণ যে ধনঞ্জয়ের নাই, উপায়ও নাই, এটা যেন খেয়ালও থাকে না !

বেলা অনেক হইয়াছে, কিন্তু এখনও যশোদার উঠানে ভালো করিয়া রোদ আসে নাই। পুবে একটি নূতন তিনতলা বাড়ি উঠিয়াছে, যশোদার বাড়িটি পড়িয়া গিয়াছে আড়ালে। নূতন বাস্তাটির সোহাগে চারিদিকের বাড়ি যেন মাথা তুলিতেছে বর্ষাকালের আগাছার মতো। কতটুকু সময়েব মধ্যেই প্রকাণ্ড এক-একটা বাড়ি যে সম্পূর্ণ হইতেছে ! কোনো কাজেই মানুষের যেন আজকাল আর সময় লাগে না—শহরের মানুষের। নূতন যুগের নূতন মন্ত্রে ম্যাজিকের মতো কাজ হইয়া যায়।

ঘরেব মধ্যে যশোদার শীত করিতেছিল আর তাকে পীড়ন করিতেছিল ঘরের রিক্ত নগ্নতা। মেঝেতে ছড়ানো পড়িয়া আছে জঞ্জাল, এক টুকরা ছেঁড়া কাগজ যশোদা ঘরে জমিতে দিত না, যা কিছু অকেজো, যা কিছু পরিত্যাজ্য সব যশোদা চিরদিন নির্বিকার চিত্তে ফেলিয়া দিয়াছে,—যদি কাজে লাগে ভাবিয়া ঘরের জঞ্জাল সঞ্চয় করার মতো ভীরু সে কোনোদিন ছিল না। তবু, দুঃসাহসীর মনের গোপন ভীরুতার মতো এত জঞ্জাল যে ঘরের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া ছিল !

শূন্য দেয়ালে শুধু নানারকম দাগ আর একটি পুরানো বাংলা দেয়ালপঞ্জি,—জীবনবিমা কোম্পানির বিজ্ঞাপন। দেয়ালপঞ্জির ছবিটিতে এক জোড়া নারী ও পুরুষ ও তাদের গন্ডাখানেক ছেলেমেয়ের দেহে স্বাস্থ্য আর মুখে আনন্দের হাসি যেন ধরিতেছে না। প্রথমে ছবিটা দেখিলেই যশোদার রাগ হইত, মনে হইত রেশারেশি করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া দিয়াই মানুষ আজকাল মিথ্যাকে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া তুলিতেছে, সর্বত্র ছড়াইয়া দিতেছে।

অনেক বিষয়ের মতো এ বিষয়েও যশোদার একটি নিজস্ব মতামত আছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর বিশ্লেষণ অবশ্য যশোদার মতামতের পিছনে নাই, পাণ্ডিত্যের ফেনা সঞ্চয় করিবার সুযোগও তার ঘটে নাই, মুখে ফেনা তুলিয়া জাবরও সে কাটে না, কাজে লাগায় শুধু নিজের উপলব্ধি ও সাধারণ বুদ্ধিকে। প্রচারের আশ্রয়ে মিথ্যা যে পুষ্ট হয় এ কথা বুঝিতে যশোদার গভীরভাবে ভাবিবার দরকার হয় নাই। তারপর ধীরে ধীরে চোখে সহিয়া আসিলে ছবিটির বিজ্ঞাপনের ছাপ যশোদার কাছে

মুছিয়া গিয়াছে, জীবনবিমা কোম্পানির দেয়ালপঞ্জির ছবি তার কাছে হইয়া দাঁড়াইয়াছে অজানা শিল্পীর আঁকা একটি অবাস্তব মধুর কল্পনা।

আগে ঘরদোর ভালো করে সাফ করিয়ে তারপর জিনিসপত্র ঘরে ঢোকাব, কেমন ?

ধনঞ্জয় সায় দিয়া বলিল, সেই ভালো। কাকে দিয়ে সাফ করাবে, তুমি তো পারবে না ?

কেন পারব না ? কী হয়েছে আমার ?

না না, তুমি আজ আর উঠো না চাঁদের মা। বিছানাটা এনে পেতে দি, শুয়ে থাকো।

শুইয়া থাকার প্রস্তাবে যশোদা উঠিয়া দাঁড়াইল এক পায়ে ভর দিয়া। একটু হাসিয়া বলিল, এখানে শীত করছে, রোদে বসি গে চলো বাইরে।

উঠানের একপাশে একটু রোদ আসিয়াছিল, সেইখানে একটা ভাঙা তক্তায় বসিয়াই যশোদা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, নন্দের তো জেল হবে ?

এতবড়ো গুরুতর বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করায় খুশি হইয়া ধনঞ্জয় বলিল, মেয়েটির বাড়ির লোক যদি গোলমাল করে—

দিন চারেক আগে সুবর্ণ আর নন্দ উধাও হইয়া গিয়াছে, সুবর্ণের বাড়ির লোকেরা কী করিয়াছে যশোদা কিছুই জানে না। জ্যোতির্ময় একবার আসিয়া জিজ্ঞাসাও করে নাই, তার বোনটিকে সঙ্গে করিয়া যশোদার ভাই কোথায় গিয়াছে, এ খবরটা কি সে রাখে ? হয়তো জ্যোতির্ময় পুলিশে খবর দিয়াছে, হয়তো চারিদিকে খোঁজ করাইতেছে, দুজনের সন্ধান পাইলেই নন্দকে জেলে পাঠাইয়া ছাড়িবে। সুবর্ণের সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করিবে সেই জানে। হয়তো দূরে কোনো আত্মীয়ের কাছে পাঠাইয়া দিবে, হয়তো কোনো বোর্ডিংয়ে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবে, হয়তো মেয়ের এই কীর্তিকথা গোপন করিয়া চুপিচুপি কারও সঙ্গে বিবাহ দিবে—তারপর যা হবার হোক।

এ সব কথাই যশোদা আজ কদিন ধরিয়া ভাবিতেছে। নিজেকে সে অনেকবার বলিয়াছে যে, নন্দ জেলে যাক, চুলোয় যাক, যমালয়ে যাক তার কিছু আসিয়া যায় না। ও নচ্ছারটার সঙ্গে আর তার কোনো সম্পর্কই নাই। তবু মাঝে মাঝে যশোদার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে, একা নন্দই কি দোষী ? এই কেলেঙ্কারির জন্য সুবর্ণের কি কোনো দোষ নাই ? সুবর্ণ ছেলেমানুষ কিন্তু অমন ভাবপ্রবণ, ফাজিল আর পাকা মেয়েকে ভুলাইয়া চুপ করিয়া পালানোর সাহস কি নন্দের হওয়া সম্ভব ? কাঁচপোকার আরশোলোকে টানিয়া নিয়া যাওয়ার মতো সুবর্ণই নন্দকে টানিয়া নিয়া গিয়াছে, দোষটা চাপিল একা নন্দের ঘাড়ে।

ফিরিয়া আসিলে দুজনের বিবাহ দিয়া দেওয়া যায় না ? জ্যোতির্ময়ের কাছে গিয়া কথাটা আগে হইতে আলোচনা করিয়া আসিলে হয়তো সে ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজি হইয়া যাইতেও পাবে। এ বিবাহ অবশ্য সুখের হইবে না, কিন্তু এই কুৎসিত ব্যাপারের জের টানিয়া চলার চেয়ে সে সুখের অভাবও অনেক ভালো।

কিন্তু বিয়ে কি হবে ?

ধনঞ্জয় চমকাইয়া উঠিল।—বিয়ে ? কার বিয়ে ?

ধনঞ্জয়ের সেই চমক দেখিয়া, চমকের মানে বুঝিয়া, যশোদার মনের মেঘ ফাঁক হইয়া কোথা হইতে যেন খানিকটা সোনালি রোদ আসিয়া পড়িল।

ধনঞ্জয়ের হাঁটুতে টোকা দিয়া একটু হাসিয়া সে বলিল, কেন, তোমার বিয়ে ? আমার সঙ্গে ?

এ বেলা যশোদা আর রান্নার ব্যবস্থা করিল না। একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া দুজন লোক ডাকিয়া আনিয়া, নিজেও কোমরে আঁচল জড়াইয়া ঘরদুয়ার ধোয়ামোছা আরম্ভ করিয়া দিল। বেলা তিনটার সময় দইচিঁড়ার ফলারে পেট ভরাইয়া মাটি ছানিয়া রান্নাঘরে তৈরি করিতে বসিল ছোটোখাটো একটি উনুন।

সব কাজে সাহায্য করিতে গিয়া ধনঞ্জয় সারাদিন আজ যশোদার বকুনি শুনিয়াছে, উনুন তৈরি করিতে দেখিয়া সে অবাক হইয়া বলিল, দু-চারদিনের জন্য আবার উনুন পাতছো কেন ?

ইটের উপর আড়াআড়িভাবে শিক বসাইতে বসাইতে যশোদা বলিল, দু-চারদিন কে বললে ? থাকতে হলে রেঁধেবেড়ে খেতে হবে তো ? না, ফলার করব রোজ ?

কদিন থাকবে ?

চিরদিন।

এখান থেকে যাবে না ?

কেন যাব ?

বাড়ি বেচবে না ?

কেন বেচব ?

ও বাড়িতে যে মালপত্র গেছে ?

আনিয়ে নেব। ও বেলা কেদারকে বললেই হবে। তিনটে গোরুর গাড়িতে মাল গেছে, একেবারে একটা লরিতে মাল ফেরত আসবে।

ধনঞ্জয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। যশোদার খেয়ালের আদি-অন্ত পাওয়া ভার। বাড়ি ছাড়িয়া যাওয়া হইবে না শুনিয়া মুখখানা তার বিমর্ষ হইয়া যায়। নন্দ চলিয়া যাওয়ার পর এ বাড়িতে কেবল সে আর যশোদা কদিন বাস করিতেছে। প্রথম রাত্রে নন্দ ফিরিবে কী ফিরিবে না এ কথা কারও জানা ছিল না, কোনো কারণে ফিরিতে তার দেরি হইতেছে ভাবিয়া যে যার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, নিশ্চিন্ত মনে প্রতিদিনের মতো ঘুমও আসিয়াছিল দুজনের। পরদিন যশোদার সই আর শত্রু কুমুদিনী আসিয়া বলিয়াছিল, আমি থাকব ভাই তোর কাছে রাত্রে ?

যশোদা রাজি হয় নাই। ধনঞ্জয়ের সঙ্গে একা এক বাড়িতে রাত কাটানোর ভয়াবহ পরিণামের কথা বারবার মনে পড়াইয়া দিয়া কুমুদিনী যশোদাকে কাবু করিতে চাহিয়াছিল, যশোদা হাসিমুখে বলিয়াছিল, আমার সুনাম দুর্নামে কার কী আসবে যাবে বল, কে আছে আমার ? দুর্নাম হতে বাকিই বা কী আছে বল ? আমার ভাই মন্দ, আমিই বা মন্দ নই কীসে ?

শেষ পর্যন্ত রাগ করিয়া গালাগালি আর অভিশাপ দিতে দিতে কুমুদিনী চলিয়া গিয়াছিল।

অনেক ভাবিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মতো কল্পনারাজ্যে অনেকক্ষণ বিচরণ করিয়া সেদিন সন্ধ্যার পর ধনঞ্জয় ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমি তোমার ঘরে শোব যশোদা ? তোমার হয়তো ভয় করবে ?

ভয় করবে ?—যশোদা অবাক হইয়া গিয়াছিল, আমার ভয় করবে একা এক ঘরে শুতে ! গোটা বাড়িটাতেই আমি যে আজ একা থাকব গো ?

ধনঞ্জয় আর কথা বলিতে পারে নাই। যশোদাকে বুঝা যায় না, যশোদার খেয়ালের অন্ত পাওয়া যায় না।

যশোদা আবার বলিয়াছিল, তুমি শোবে সইয়ের বাড়িতে, পুবের ঘরে।

এই বাড়িতে যশোদার সঙ্গে রাত্রিযাপনের মধ্যে ধনঞ্জয় হয়তো অনেক কিছু রোমাঞ্চকর সম্ভাবনা আবিষ্কার করিতেছিল, কুমুদিনীর বাড়িতে তাকে রাত্রে থাকিতে হইবে শুনিয়া সে মুষড়াইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর রাজেন আসিল। লরিতে চাপাইয়া রাতারাতি মালপত্র ফিরাইয়া আনিবার অনুরোধে সে একটু হাসিল।

রাত্তিরে হাঙ্গামা করবার দরকার কী চাঁদের মা ? আমি গিয়ে রাত্তিরটা থাকছি সেখানে, ভোর ভোর মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ব ?

কেন, সেখান রাত কাটাবার তোমার দবকার ? হরনাম সিংকে বলো গে আমার নাম করে গাড়ি আর লোকজন নিয়ে গিয়ে সেই সব ব্যবস্থা করে দেবে, তুমি শুধু সঙ্গে থাকবে। সকালে ওর গাড়ি পাওয়া যাবে না।

কী বকশিশ দেবে আমাকে ?

রাত্তিরে আমায পাহারা দিয়ো।

রাজেন হাসিমুখে চলিয়া গেল। চিরদিন হাসিমুখেই রাজেন তার কাজ করিয়া দেয়,—কুমুদিনীকে ফাঁকি দিয়া। যশোদার সঙ্গে রাজেন বেশি মেলামেশা করিবে কুমুদিনী এটা পছন্দ করে না, দুজনকে কথা বলিতে দেখিলে সে বাগিয়া আগুন হইয়া যায়, দু-তিনদিনের জন্য যশোদাকে একেবারে ত্যাগ কবে। তারপব নিজেই আবার ভাব করিতে আসে। তীক্ষ্ণ কথা আদান-প্রদানের ভাব। দিনান্তে একবার যশোদা কাছে না আসিলে আর খানিকক্ষণ ঝগড়া করিয়া না গেলে কুমুদিনীর ভালো লাগে না, সারারাত মেজাজ তার এমন গবম হইয়া থাকে যে রাজেনের দুর্ভোগের সীমা থাকে না।

রাজেন বাহির হইয়া যাওয়া মাত্র ধনঞ্জয় ফোঁস করিয়া উঠিল, ওকে থাকতে বললে যে তোমার কাছে ?

লণ্ঠনের আলোয ধনঞ্জয়েব মুখ দেখিয়া যশোদা বাগ কবার বদলে শান্তভাবেই বলিল, মাথা খারাপ না কি তোমার ? তামাশা বোঝ না ?

ধনঞ্জয় অবুঝ শিশুর মতো আবদার করিয়া বলিল, ও রকম তামাশা আর কোরো না, বুঝলে ? বড়ো খারাপ লাগে শুনলে।

যশোদা কথা বলিল না। ধনঞ্জয়ের কথা শুনিযা তারও খারাপ লাগিতেছিল।

দুই

যশোদা বাড়ি বেচিবে না শুনিয়া সবচেয়ে বেশি গোলমাল করিল কুমুদিনী।

একা এক বাড়িতে থাকার জন্য বটে, বাড়ি বিক্রি করিতে অস্বীকার কবার জন্যও বটে। প্রথম কারণটা নিয়া সকালবেলা ঘণ্টা দুই ঝগড়া করিয়া ফুঁসিতে ফুঁসিতে বেচারি সবে বাড়ি গিযা রান্না চাপাইয়াছে, অন্য ব্যাপারটা কানে আসিল। হাঁড়ি নামাইয়া আবার সে ছুটিয়া আসে যশোদার কাছে।

এটা কী শুনছি চাঁদের মা সই ? বাড়ি নাকি তুই বেচবি না ?

যশোদা উনানে হাঁড়ি চাপাইতেছিল, সংক্ষেপে জানাইল, উঁ হুঁ।

কেন শুনি ? তোর একার জন্য সবাই মবব আমরা ? আমরা তোর কী করেছি, নিজের ক্ষতি করেও আমাদের সব্বোনাশ করবি ? তুই কি পাগল নাকি চাঁদের মা সই, মাথা কি তোর খারাপ ?

মাথা নয়। কপাল খারাপ।

আরও চটিয়া কত কথাই যে কুমুদিনী বলিযা যায়! যশোদা বেশির ভাগ সময় চুপচাপ শুনিয়া যায়, মাঝে মাঝে দু-একটা মন্তব্য করে। এইমাত্র ঝাড়া দু-ঘণ্টা ঝগড়া করিয়া গিয়া কুমুদিনী বোধ হয় একটু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, প্রথম দিকে কথাগুলি তার তেমন ঝাঁঝালো হয় না। তারপর ক্রমে ক্রমে মেজাজ চড়িতে থাকায় সে যশোদার চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করিতে আরম্ভ করে। মনে হয়, এতকাল শুধু যশোদার দোষের অফুরন্ত তালিকা মুখস্থ করিয়া সে দিন কাটাইয়াছে, যশোদার মতো খারাপ মেয়েমানুষ যে জগতে আর দুটি নাই এ কথাটা প্রমাণ না করিয়া সে ছাড়িবে না।

শেষে যশোদা বলে, এদিকে তুই তো আলাপ করছিস আমার সঙ্গে, আরেক জন যে না খেয়ে কাজে গেল ?

যাক। আরেক জনের জন্য তোর অত দরদ কেন শুনি ?

পিরিতের মানুষটার জন্য দরদ হবে না ?

কুমুদিনী মুখ বাঁকাইয়া বলে, তা তামাশা আর করছো কেন ? পিরিত যে তোমাদের ঢের দিন থেকে চলছে, তা কী আর জানিনে আমি।

যশোদা হাসিয়া বলে, কত গন্ডা লোকের সঙ্গে যে তুই আমার পিরিত ঘটিয়ে দিলি ভাই ! কিন্তু আমার এমনি পোড়াকপাল—

কুমুদিনী ফোঁস করিয়া একটা অতি কুৎসিত মন্তব্য করিয়া নিজেই একটু থতোমতো খাইয়া যায়—কথাটা তার নিজের কানেই বীভৎস শোনায়। এতক্ষণ চটে নাই কিন্তু এবার যশোদা চটিয়া উঠিবে ভাবিয়া কুমুদিনীর একটু ভয়ও বুঝি হয়। চিরদিন সে যশোদাকে ভয় করিয়া আসিয়াছে। রাগ না করিয়া যতক্ষণ যশোদা আমল দেয় ততক্ষণই সে ঝগড়া করে, যশোদা রাগ করিলেই তার কান্না শুরু হইয়া যায়। তাড়াতাড়ি সামলাইয়া নরম গলায় সে অন্য কথা জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, কেন বাড়ি বেচবি না বলতে তো দোষ নেই ভাই চাঁদের মা সই ?

কুমুদিনীর অকথ্য মন্তব্যে যশোদা রাগ করিয়াছে কিনা বোঝা যায় না, কেবল মুখখানা তার একটু গম্ভীর দেখায়। একটু ভাবিয়া সে বলে, না, বলতে আর দোষ কী ? সত্যপ্রিয় কিনে নিচ্ছে তো ঘরবাড়ি—ওকে আমি বেচব না, লাখ টাকা দিলেও নয়।

সত্যপ্রিয়বাবু তো কিনছে না ? একটা কোম্পানি থেকে কিনছে।

ওটা সত্যপ্রিয়র কোম্পানি। লোকটা আমার ঘর ভেঙেছে, আমার বদনাম রটিয়েছে, ওকে আমি বাড়িঘর বেচব ? সবাই কত ভালোবাসত আমায়, এখন একজন আসে দেখিস আমার কাছে ? কত করেছি ওদের জন্যে আমি, আজ ওরা আমায় বলছে সত্যপ্রিয়র লোক, টাকা খেয়ে ওদের বন্ধু সেজে ওদের সর্বনাশ করছি ?

এ ভাবে কোনো বিষয়ে নালিশ করা, অভিমানে এ ভাবে বিচলিত হওয়া যশোদার স্বভাব নয়। বন্ধুরূপী শত্রু বলিযা কুলিমজুরেরা ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া মনটা কী যশোদার এত নরম হইয়া গিয়াছে ?

কুমুদিনী একটু ভাবিয়া বলে, তা একদিক দিয়ে তো ভালোই হয়েছে ভাই চাঁদের মা সই? কতকগুলি কুলিমজুরদের পাল্লায় পড়ে যন্ত্রণা পাচ্ছিলে, বেঁচে গেছ। এখন অন্য ভাড়াটে রাখ বাড়িতে,—না না, ভাড়াটে রাখবে কী করে, বাড়ি তো তুমি বেচে দিচ্ছ। বলিয়া কুমুদিনী একগাল হাসিল।

কিন্তু যশোদার জীবন সে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। যখন তখন যশোদার কাছে ছুটিয়া আসে, মত বদলানোর জন্য ঝগড়া করে, অভিশাপ দেয় আর মিনতি করে, মাঝে মাঝে ধনঞ্জয়কে পর্যন্ত মধ্যস্থ মানে।

ধনঞ্জয় দ্বিধাভরে বলে, আমি তো বলছি প্রথম থেকে কিন্তু—

যশোদা বলে, কী মুশকিল, তোমরা বেচ না তোমাদের ঘরবাড়ি। আমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কী ? আমায় নিয়ে টানাটানি করছ কেন ?

যশোদার বাড়ি বেচার সঙ্গে তাদের স্বার্থের সম্পর্ক কোথায়, কেবল কুমুদিনী নয় পাড়ার সকলেই অনেকবার কথাটা তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু যশোদা স্বীকার করে না। সে বলে, সব সত্যপ্রিয়ের চাল। সকলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকুক, অন্য ক্রেতা আসুক, যশোদার বাড়িসুদ্ধ কিনিতে পাইলে যে দর সত্যপ্রিয় দিবে বলিয়াছে তার চেয়ে বেশি দর দিয়া তখন কিনিয়া নিবে, যার খুশি বেচিবে না, সত্যপ্রিয় কথাটি বলিবে না।

জমির দর চড়ছে দেখছ না দিন দিন ? বেচবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?

রাজেনও যশোদার কথায় সায় দেয়—চিরদিন দিয়া আসিতেছে। তবে কুমুদিনীকে জানাইয়া নয়। কুমুদিনীর কাছে সে যশোদার কথার জোরালো প্রতিবাদই করে।

তারপর একদিন দেখা যায়, যশোদার কথাই ঠিক। পেনশনভোগী এক ভদ্রলোক রাজেনের বাড়ির পাশে উমেশ তরফদারের বাড়িটা এবং ওই ভদ্রলোকেরই এক বন্ধু কানাই নন্দীব এগারো কাঠা ফাঁকা জমিটুকু কিনিতে রাজি হইয়া গেল—যশোদা বাড়ি বেচিলে সত্যপ্রিয়ের কোম্পানি যে দর দিবে বলিয়াছিল সেই দরে। কিন্তু পেনশনভোগী ভদ্রলোক ও তার বন্ধুর আর এখানে বাড়ি বা জমি কেনা হইল না। কোম্পানির লোক আসিয়া সকলকে জানাইয়া দিল, যশোদা যে শত্রুতা করিয়া নিজের বাড়িটা আটকাইয়া রাখিতেছে এটা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। একজনের শয়তানিতে সকলে মারা পড়িবে কোম্পানি সহ্য করিবে না। যে বেচিতে চায় তার বাড়ি আর জমিই কোম্পানি কিনিয়া নিবে। যে বেচিবে না তার সঙ্গে বুঝাপড়া হইবে পরে।

শুনিয়া যশোদা বলিল, বুঝাপড়া ? আবার কী বুঝাপড়া করবে ওরা ? বুঝাপড়ার দেখছি শেষ নাই ওদের ?

বিনা শর্তে সকলের বাড়ি ও জমি সত্যপ্রিয়ই কিনিয়া নিল। বেচিল না কেবল কুমুদিনী।

এতকাল কয়েক হাজার কাঁচা টাকা হাতে পাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়া, যশোদার সঙ্গে প্রতিদিন ঝগড়া করিয়া, শেষ মুহূর্তে সে বাঁকিয়া বসিল। কৈফিয়ত দিল এই : আরও দাম চড়ুক, তখন বেচব।

তারপর কয়েকদিন কুমুদিনী আর যশোদার কাছে আসে না। রাজেনের কাছে খবর পাইয়া যশোদা নিজেই তাকে দেখিতে গেল। কুমুদিনীর সাত বছরের ছেলেটাকে এক হাতে ধরিয়া কাঁধে তুলিয়া বলিল, কী হল ভাই কুমুদিনী সই, বাড়ি যে বেচলে না ?

তুই যে বেচলি না ? দাম চড়লে তুই যখন বেচবি, আমিও তখন বেচব।

তবে আর তুই বেচেছিস।

অনেকদিন পরে আজ যশোদার বড়ো আমোদ ও আনন্দ বোধ হয়। মানুষকে মানুষ ভালোবাসে বইকী। সকলে না হোক, নাটকীয় ভালোবাসা না হোক, দু-চারজন সত্যই ভালোবাসে। কুমুদিনীর অন্তহীন কটুকথায় তার যে একটুও রাগ হয় না, কুমুদিনীকে সে ভালোবাসে বলিয়াই তো ? তাকে ফেলিয়া একা একা কুমুদিনী যে বাড়িঘর বেচিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে না, কুমুদিনী তাকে ভালোবাসে বলিয়াই তো ?

তার বেশি আর কী চাই মানুষের ?

কুমুদিনীর ঘরভরা ছেলেমেয়েদের কলরব শুনিতে শুনিতে যশোদার বিরাট দেহটি অবসন্ন হইয়া আসে। কারণটা বুঝিতে না পারিয়া সে একটু আশ্চর্য হইয়া যায়। সে তো জানে না মনের মধ্যে গভীর অশান্তির গুরুভার বহিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ মুক্তি পাইলে শুধু মন নয় শরীরটাও মানুষের আশ্চর্যরকম হালকা মনে হয়, শান্তি যেন আসে ঘুমের ছদ্মবেশে। ঘুমের মতোই হয়তো অস্থায়ী, তবু এখন যশোদার মনে যে শান্তি আসিয়াছে তার তুলনা হয় না।

ইংরাজি নববর্ষ শুরু হয় শীতকালে। রাজেন পরামর্শ দিল, ইংরাজি নববর্ষের প্রথম দিন আবার হোটেল খুলিলে কেমন হয় ? কারখানার কুলিমজুরদের জন্য না হোক, কারখানার বাহিরে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা অর্জন করে তাদের জন্য ? যশোদারও তো জীবিকা অর্জন করিতে হইবে ! বিশেষত ধনঞ্জয়ের মতো বিরাটকায় একটি পোষ্য যখন তার জুটিয়াছে।

যশোদা বলিল, কিছুদিন যাক।

রাজেনও সায় দিয়া বলিল, আচ্ছা যাক কিছুদিন।

দিন যায়। নন্দ ও সুবর্ণের কোনো খবর আসে না। কোথায় কীভাবে ওরা দিন কাটাইতেছে কে জানে ! দিন ওদের চলিতেছেই বা কী করিয়া ? নন্দ কী রোজগারের কোনো উপায় করিতে পারিয়াছে ? সুবর্ণের গায়ের গহনা একটি একটি করিয়া স্যাকরার দোকানে যাইতেছে হয়তো ! নন্দর মতো ছেলে, দুদিন আগেও দিদি মুখে তুলিয়া না দিলে যে প্রায় খাইতেই জানিত না, একটা মেয়েকে চুরি করিয়া পালাইয়া এতকাল সে যে কেমন করিয়া ব্যাপারটার জের টানিয়া চলিতেছে, ভাবিলেও যশোদা অবাক হইয়া যায়।

মাঝে মাঝে নন্দর কীর্তন শুনিবার জন্য যশোদার জোরালো ইচ্ছা জাগে। কীর্তন করিলেই নন্দর শরীর খারাপ হয় বলিয়া নন্দর কীর্তন করা যশোদা আগে পছন্দ করিত না, যদিও কীর্তন শুনিতে শুনিতে সকলের মতো অনির্বচনীয় ভাবাবেগে সেও চিরদিন এক দুর্বোধ্য ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছে। এখন মাঝে মাঝে তার মনে হয়, নন্দ থাকিলে নিজেই নন্দকে গাহিতে বলিয়া একদিন সে ভালো করিয়া তার কীর্তন শুনিত।

জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে রাস্তায় একদিন যশোদার দেখা হইয়া গেল। একটি নূতন শ্রমিক-সমিতির সভায় যোগ দেওয়ার জন্য যশোদাকে এক রকম জোর করিয়া ধরিয়া নিয়া যাওয়া হইয়াছিল, যাওয়ার ইচ্ছা তার একেবারেই ছিল না। আবার শ্রমিকদের ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে যাইবে, তার কি লজ্জা নাই ? পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তাকে যাইতে হইয়াছিল। সভায় গিয়াই সে টের পাইয়াছিল, তার অনুমানই ঠিক। সমিতিটি খাঁটি শ্রমিক-সমিতি নয়, একজন ভদ্রলোক নিজের স্বার্থের জন্য সমিতি গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন।

সভা শেষ হওয়ার আগেই যশোদা চলিয়া আসিয়াছিল—বাঁচিয়া থাকিতেই যারা মরিয়া আছে তাদের ভালো করার নামে ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধনের এ সব চেষ্টা সে সহ্য করিতে পাবে না।

ফিরিবার সময় তার বাড়ির গলি আর বড়ো রাস্তার মোড়ের কাছে প্রকাণ্ড তিনতলা নতুন বাড়িটার সামনে দুজনে মুখোমুখি হইয়া গেল। বড়ো বাড়িটার নীচের একটা অংশে চায়েব দোকান, জ্যোতির্ময় বোধ হয় চা খাইয়া ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। এত কাছে বাড়ি জ্যোতির্ময়ের, দোকানে তার চা খাওয়ার কী প্রয়োজন হইয়াছে কে জানে ! বাড়িতে কি জ্যোতির্ময়ের যাইতে ইচ্ছা হয় না, যে বাড়িতে একদিন তার একটা বউ আর একটা বোন ছিল, যে বউটা মবিয়াছে হাসপাতালে আর যে বোনটাকে চুরি করিয়াছে যশোদার ভাই ?

কিছুদিন একটানা কঠিন অসুখে ভুগিলে যেমন হয় সে রকম নয়, জ্যোতির্ময় বড়ো রোগা হইয়া গিয়াছে। যশোদার সঙ্গে কথা না বলিয়াই সে চলিয়া যাইতেছিল, কী ভাবিয়া দাঁড়াইল।

কোনো খবর পাওনি, না ?

যশোদা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

জ্যোতির্ময় আনমনে কী যেন একটু ভাবিল। পথে মানুষ ও গাড়িঘোড়ার সংখ্যা এত বেশি বাড়িয়া গিয়াছে, পথের দুদিকের চেহারা এত বেশি বদলাইয়া গিয়াছে যে যশোদার মনে হয়, এ বুঝি তার বাড়ির কাছের সেই পথটি নয়, দূরে অন্য কোথাও আসিয়াছে।

খবর একটা পাওয়া যাবে চাঁদের মা, কী বল ?

তা পাওয়া যাবে বইকী। আজ হোক কাল হোক, নিজেরাই একটা খবর ওরা পাঠাবে।

তোমায় যদি আগে জানায়, আমাকে জানাবে তো সঙ্গে সঙ্গে ? আমায় খবর দিতে হয়তো ওদের ভয় হবে।

আপনাকে জানাবো বইকী। কিন্তু ওদের সম্বন্ধে আপনি কী করবেন।

প্রশ্ন শুনিয়াই জ্যোতির্ময় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, সে সব পরে বিবেচনা করা যাবে চাঁদের মা। নিজের বোনকে তো আর ফাঁসি দেব না আমি ?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অন্যমনে সে কী যেন ভাবিল। তারপর হঠাৎ বলিল, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি চাঁদের মা। নন্দ কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে গেছে, এই কথা বলছো তো সবাইকে ?

যশোদা বলিল, হ্যাঁ, ওই ধরনের কথাই বলেছি। পাটনায় একটা চাকরি পেয়েছে। জ্ঞান হবার পর এই বোধ হয় প্রথম মিছে কথা বললাম জ্যোতিবাবু।

জ্যোতির্ময় খানিকক্ষণ যেন অবাক হইয়াই যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কথা বলিল বড়ো খাপছাড়া।

বাহাদুরি কোরো না বেশি।

গটগট করিয়া সে চলিয়া গেল বাড়ির উলটা দিকে। গলিতে ঢুকিবার আগে মুখ ফিরাইয়া যশোদা দেখিতে পাইল, আবার সে ফিরিয়া আসিতেছে। আরও কিছু তার বলিবার আছে ভাবিয়া যশোদা একটু দাঁড়াইল, কিন্তু জ্যোতির্ময় তার দিকে চাহিয়াও দেখিল না, সোজা আগাইয়া চলিয়া গেল।

এক মুহূর্ত যশোদা অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কী হইয়াছে জ্যোতির্ময়ের ? সে কী পাগল হইয়া যাইতেছে ? জ্যোতির্ময়ের মন যে কত দুর্বল যশোদার অজানা ছিল না। তাই তার চেহারা দেখিয়া আর কথাবার্তা চালচলনে মানসিক বিকারের স্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়া যশোদা ভয় পাইয়া গেল।

অনেকদিন পরে সত্যপ্রিয়কেও আজ যশোদা দেখিতে পাইল। জ্যোতির্ময় চলিয়া যাওয়ার একটু পরেই।

প্রথমে চোখে পড়িল সত্যপ্রিয়ের গাড়ি, পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে। অনেকটা আগাইয়া গিয়া দেখা গেল সত্যপ্রিয়কে। দুজন সাহেবি পোশাক পরা লোকের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে সে গাড়ির দিকে ফিরিয়া যাইতেছিল। খুব সম্ভব নূতন কেনা জমি ও বাড়িগুলি দেখিতে এ পাড়ায় আসিয়াছে।

পথের দুই প্রান্ত ধরিয়া দুইজন চলিতেছিল, যশোদা কল্পনাও করে নাই সত্যপ্রিয় তার সঙ্গে কথা বলিবে। পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে সত্যপ্রিয় বলিল, কেমন আছ চাঁদের মা।

কাছে গেল না, শুধু দাঁড়াইল। যশোদাও পথের অপর প্রান্তে দাঁড়াইয়া পড়িল। শান্ত কণ্ঠে বলিল, ভালো আছি। আপনি ভালো তো ?

সত্যপ্রিয়র সঙ্গের লোক দুজন বিস্মিত চোখে চাহিয়া আছে। একজন সাইকেল আরোহী ঘণ্টা বাজাইয়া চলিয়া গেল। পথের মাঝে এ ভাবে পীড়ন করা কেন ? এত করিয়াও কি সত্যপ্রিয়ের সাধ মেটে নাই ?

চলে যাচ্ছে এক রকম।

সত্যপ্রিয় চলিতে আরম্ভ করিল। যশোদা এক মুহূর্ত নড়িতে পারিল না। তার চোখে হঠাৎ জল আসিয়া পড়ায় পথটা ঝাপসা হইয়া গিয়াছিল।

বাড়ি ঢুকিয়া যশোদা দেখিতে পাইল, নন্দ আর সুবর্ণের বয়সি দুটি ছেলেমেয়ে ভিতরের বারান্দায় জলচৌকিতে বসিয়া আছে। অল্প দূরে দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া বিড়ি টানিতেছে ধনঞ্জয়।

যশোদাকে দেখিয়া তিনজনেই চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ধনঞ্জয় তাড়াতাড়ি বলিল, এত শিগগির যে ফিরে এলে চাঁদের মা ?

প্রশ্নের জবাব না দিয়া যশোদা পালটা প্রশ্ন করিল, এরা কে ?

ওরা ঘর ভাড়া নিতে এসেছে। আমি বললাম এখানে ঘর ভাড়া মিলবে না—

ছেলেটি বলিল, রাজেনদা, আমাদের বসতে বলে গেছে। কাছেই বাড়ি না রাজেনদার ?

যশোদা বলিল, হ্যাঁ কাছেই বাড়ি।

রাজেনদা বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসতে গেছে। আমরা থাকলে যদি আপনার অসুবিধে হয়—

পরিষ্কার ধবধবে জামাকাপড় পরনে, সমস্তই সাদাসিধে সাধারণ, তবু দুজনের পরিচ্ছদেই যেন মার্জিত রুচি আর সহজ ও স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতার ছাপ আঁকা রহিয়াছে। ছেলেটির বয়স তেইশ চব্বিশের বেশি হইবে না, মুখখানা মেয়েদের মতো কোমল। মেয়েটির বয়স বোধ হয় ষোলো বছর, এলোখোঁপায় আটকানো আঁচলটি খসিয়া পড়ি পড়ি করিয়াও পড়িতেছে না, সিঁথিতে সূক্ষ্ম সিঁদুরের রেখা। মুখখানা সুশ্রী, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চপল দুটি চোখ।

এতক্ষণ সে অবাক হইয়া যশোদার বিরাট দেহটি দেখিতেছিল,—জীবনে বোধ হয় সে এতবড়ো লম্বাচওড়া মেয়েমানুষ দেখে নাই। এবার ছেলেটির দিকে চাহিয়া অকারণেই ফিক করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, তুমি থামো। আমি বুঝিয়ে বলছি।

তারপর সোজাসুজি যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া মেয়েটি বলিল, আমরা খারাপ লোক নই, আমাদের বিয়ে হয়েছে।

যশোদা বলিল, বিয়ে না হলে বুঝি লোক খারাপ হয় ?

মেয়েটি আবার ফিক করিয়া হাসিল, না, তা বলিনি। আপনি যদি কিছু সন্দেহ করেন, যদি ভাবেন আমরা পালিয়ে এসেছি বাড়ি থেকে, তাই জন্যে আগে থেকে বলে রাখলাম। আমরা দুজনেই ছেলেমানুষ তো ? আমরা এমনিভাবে এসে ঘরভাড়া নিতে চাইলে আপনার কেন, সব্বারই মনে হতে পারে, ভেতরে কোনো গোলমাল আছে নিশ্চয়। আপনিই বলুন, মনে হতে পারে না ? গোলমাল অবিশ্যি আছে, তবে ও ধরনের গোলমাল নয়। আমায় চুরি করার জন্যে ওঁর হাতে হাতকড়া পড়বে আর আপনাকে নিয়ে পুলিশ টানাটানি করবে, সে ভয় করবেন না। গোলমালটা কী হয়েছে শুনুন। হয়েছে কী জানেন—

মুখে যেন খই ফুটিতে থাকে মেয়েটির। যশোদা অবাক হইয়া শুনিয়া যায়। এতটুকু মেয়ে, বিবাহ নাকি হইয়াছে মোটে মাস ছয়েক আগে, কিন্তু কথায় একেবারে পাকা গিন্নি। কী তাব মুখেব ভঙ্গি, কী ভণিতা, কী ফোড়ন আর ব্যাখ্যা ! শুনিতে শুনিতে যশোদার মনে হয়, কার যেন অনুকরণ কবিতেছে মেয়েটি, হাত নাড়া, ঠোঁট নাড়া, চোখের পলক ফেলা, রাগ দুঃখ ক্ষোভ বিস্ময় কৌতুক ফুটাইয়া তোলা আর মিলাইয়া দেওয়া, সব যেন তার নকল, কথাগুলি সমস্তই শোনা কথার পুনরাবৃত্তি। কে জানে মা না মাসি না পিসি কে নিজেকে এমনভাবে উজাড় করিযা মেয়েটির মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছে !

গোলমালটা অসাধারণ কিছু নয়, মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে সর্বদাই ঘটিতেছে। দাদার পছন্দ-করা একটি মেয়েকে বাতিল করিয়া অপছন্দ-করা এই মেয়েটিকে বিবাহ করায়, বিবাহে নগদ টাকা নিতে রাজি না হওয়ায় এবং সম্প্রতি একটা কারখানায় পঁচিশ টাকায় প্রায় কুলিমজুরের একটা কাজ নেওয়ায়, দাদা ভয়ানক চটিয়া গিয়াছে। দাদার স্ত্রীর মতে, মায়ের পেটের ভাই তো দূরের কথা শত্রুও মানুষের সঙ্গে এমন শত্রুতা করে না।

আসলে, আমার জাই-ই যত নষ্টের গোড়া। কদিন যা দেখেছি তাতেই বুঝেছি, ভাসুর আমার লোক ভালো। আমায় দেখে ভাসুরের পছন্দ হয়েছিল, এক বন্ধুর কাছে বলেছিলেন উনি শুনেছেন, কিন্তু আমার জায়ের রংটা আমার চেয়ে একটু কম ফরসা কিনা, আর দেখতেও আমার মতো সুন্দর নয় কিনা—তা, তার এখন বয়েস হয়েছে, ছেলেমেয়ে হয়েছে তিনটি, প্রথম বয়েসে যেমন ছিল এখনও কি তেমনই চেহারা থাকে, রূপ-যৌবন মানুষের দুদিনে উবে যায়—আমায় দেখেই তাই অপছন্দ হয়ে গেল। তারপর যে মেয়েটিকে নিজে দেখে পছন্দ করল—ওগো, বলো না সে দেখতে কেমন ছিল ? হাসছ যে ? আমার খুব অহংকার হয়েছে ভাবছ বুঝি ? না বাপু, আমি ও সব অহংকার বুঝি না, ন্যাকামিপনার ধার ধারি না। সত্যি কথা বলব তাতে দোষ কী, তা সে নিজের সম্বন্ধেই হোক আর যার সম্বন্ধেই হোক ? আমি তো আর বলিনি, আমি আকাশের পরির মতো সুন্দরী ! মোটামুটি

দেখতে সুন্দর আমি, এই পর্যন্ত, ব্যাস। আমার মতো সুন্দর মেয়ে গন্ডা গন্ডা গড়াচ্ছে পথেঘাটে। তুমিই তো বলেছিলে, সে মেয়েটা দেখতে কালো আর চোখ একটু ট্যারা, বলোনি ? যাক গে, যা বলছিলাম, বলি। কী কথায় কী কথা এসে পড়ল। দেখুন তো দিদি, এমনি করে পেছনে লাগলে কেউ কথা কইতে পারে ? কী যেন বলছিলাম—হ্যাঁ, সেই হল আমার জায়ের রাগ। এমন ব্যবহার শুরু করলে আমাদের সঙ্গে কী বলব। নগদ টাকা সম্বন্ধে বলতে লাগল, উনি যে নগদ নেননি সে কী আর অমনি অমনি—নগদ নিলে টাকাটা আমার ভাসুরের হাতে পড়ত, এ বেশ বউয়ের গায়ে গয়না হল। আমার পিসি—পিসিই আমায় মানুষ করেছে, বড্ড ভালোবাসে আমায়—পিসি নিজে থেকে আটশো টাকার গয়না বেশি দিয়ে দিল। গয়না যা দেবার কথা ছিল, তা তো দিলই, তার উপরে আরও সাড়ে আটশো টাকার গয়না, নগদ টাকার বদলিতে। ভাসুর তিনশো টাকা মাইনে পান, ও কটা টাকা নগদ পেলেই বা তিনি এমন কী বড়োলোক হয়ে যেতেন, তিন মাসের মাইনেও নয় ! কিন্তু জা আমার ওই কথা বলে বলে ভাসুরের মন ভাঙাতে লাগল। তারপর ও যেই চাকরিটা নিল,—না নিয়েই বা কী করবে বলুন, ভালো একটা চাকরিও জুটিয়ে দেবে না, এদিকে ঘরে বসে থাকার জন্যও খোঁচাবে ! ভাসুর নয়, আমার জা। হাতখরচের দু-চারটে পয়সা তো মানুষের লাগে ? দাদার কাছে গিয়ে চাইলে তিনি বলবেন, আহা বউদির কাছ থেকে নে না গিয়ে। বউদির কাছে চাইলে এমন করে মুখ বাঁকাবে ! একবার দুবার চেয়ে শেষে ও আর চাইত না। আমি একটা গয়না দিলাম বেচতে, তাও বেচবে না। এদিকে নস্যি কেনার একটা পয়সা নেই ! তখন এই চাকিরটা নিয়ে নিল। কিন্তু আমার জায়ের সে কী বাগ ! বলে কী, লোকের কাছে দাদার মাথা হেঁট কবাবাব জন্যে ইচ্ছে করে এই চাকরি নিয়েছে। নইলে এতগুলো পাশ করে কেউ কুলিমজুবের কাজ নেয় ? খেটে খেলে লোকের কাছে মাথা হেঁট হবাব কী আছে বলুন তো দিদি ? রাত্তিরে আমার জা কী সব পরামর্শ দিল কে জানে, সকালে আমার ভাসুব ওকে বললেন কী, হয় এ কাজ ছেড়ে দাও, নয় আমার বাড়ি থেকে বেরোও। ফিক করিয়া সে আবার হাসিল, না, ঠিক ওমনিভাবে বলেননি, তবে মোট কথাটা দাঁড়াল ওই। আমরাও তাই চলে এলাম।

ছেলেটিব নাম অজিত, মেয়েটিব নাম সুব্রতা।

তোমার ডাকনাম কী বোন ? সুব্রতা বলে ডাকতে পারব না।

আমার ডাকনাম নেই।—সুব্রতা হাসে।

অজিত বলে, ওর ডাকনাম হল গিয়ে—

সুব্রতা চোখ পাকাইয়া বলে, দ্যাখো, ভালো হবে না কিন্তু !

অজিত হাসিমুখেই চুপ করিয়া থাকে। তখন সুব্রতা বলে, আচ্ছা, বলো। কী আর হবে, আজ হোক কাল হোক জানতে তো পাবেনই !

এই সামান্য হাসিতামাশার ব্যাপারেও মনে হয়, অজিত যেন বউয়ের বড়ো বাধ্য। সুব্রতার কৃত্রিম চোখ-পাকানো রাগকে পর্যন্ত সে সম্মান করিয়া চলে। প্রথমটা যশোদার একটু কেমন কেমন লাগিয়াছিল, তারপর দু-একটা দিন যাইতে না যাইতে সে টের পাইয়াছে, এটা দুজনের একটা ভালোবাসার খেলা মাত্র। দুজনে বড়ো মজা পায় এ খেলায়। এই বয়সের দুটি ছেলেমেয়ের মধ্যে, মিলন যাদের হইয়াছে মোটে ছ-মাস আগে, এমন একটা আশ্চর্য মিল আছে মনের যে যেটুকু যশোদা বুঝিতে পারে তাতেই সে অবাক হইয়া যায়। সুব্রতা যদি আবদার ধরে, আমায় আকাশের চাঁদ পেড়ে দাও—আদব দিলেই বউরা সময় অসময়ে যে আবদার ধরিয়া স্বামীদেব মেজাজ বিগড়াইয়া দেয়,—অজিত সঙ্গে সঙ্গে বলে, দিচ্ছি পেড়ে। সুব্রতা জানে অজিত বুঝিবে এটা তার আবদার,

সুব্রতার এই জানা অজিত জানে, অজিতের এই জানাও সুব্রতা জানে, আবার সুব্রতার—দুজনের জানাজানির এই প্রক্রিয়া যশোদার মনে হয় অন্তহীন আর রহস্যময়, তবু যেন দুজনের মধ্যেই এর সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা ঘটিয়াছে, সহজ ও শান্ত আনন্দের গভীর অনুভূতিতে।

একেই কি বলে ভালোবাসা ? মনের মিল ?

যশোদা ভাবে।

হিংসার মতো কী যেন একটা মৃদু প্রতিক্রিয়া জাগে যশোদার মনে, ক্ষীণ একটা অস্বস্তিবোধের পীড়ন চলিতে থাকে।

সুব্রতা তার ঘর সাজায়, সকালে আর সন্ধ্যায় অজিত তাকে সাহায্য করে। তিন টাকা ভাড়ায় যশোদা বড়ো ঘরখানাই তাদের দিয়াছে ; একটি তোরঙ্গ আর দুটি স্যুটকেসে ঘরটা যেন খালি খালি দেখায়। সুব্রতা দেয়ালে টাঙায় ছবি আর ফটো, জানালায় দেয় পর্দা, অজিতকে দিয়া আলনা আনায় আর বেশি বেশি জামাকাপড় অকারণে বাহির করিয়া সাজাইয়া রাখে, যশোদার দেওয়া চৌকির পায়া চারটিতে রঙিন কাপড়ের ঢাকনি দেয়, টুকিটাকি আরও কত কী যে সে করে। আর সেই সঙ্গে করে অজিতের সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শ—যশোদার সামনেই। মাঝে মাঝে যশোদারও মতামত জিজ্ঞাসা করে। মাস নয়, বছর নয়, সমস্ত ভবিষ্যৎকে সে যেন এই একটি ঘরে আটক করিয়াছে। এই ঘরেই তার যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কোথায় টেবিল পাতিবে, কোনদিকে আলমারি রাখিবে, কখানা আর কী ধরনের চেয়ার কিনিবে, এ সব কল্পনার আর শেষ থাকে না। যে রেটে সে কল্পনায় আসবাব কিনিতে থাকে, তাতে এক বছর পরে এ ঘরে তিল ধারণের স্থান থাকিবে কী করিয়া যশোদা ভাবিয়া পায় না।

কয়েকদিন রাঁধিয়া খাওয়ায় যশোদাই। তারপর একদিন দুপুরে সুব্রতা বলে, আমি কোথায় রাঁধব দিদি ?

আমার রান্না রুচছে না ?

ওমা, সে কী কথা ! সত্যি বলছি দিদি, এমন রান্না জীবনে খাইনি কখনো। আজ যে কুমড়োর ছক্কা খাওয়ালে, ঠিক অমৃতের মতো লাগল। কুমড়োর ছক্কার যে আবার এমন স্বাদ হয়, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তবে কী জান দিদি, আমরা হলাম ভাড়াটে, চিরকাল তো আর তোমার ঘাড়ে খাওয়া উচিত হবে না।

আমার ঘাড়ে খাবে কেন বোন ? তোমরা খরচা দিয়ো, রান্না এক জায়গাতেই হবে। চারটি তো প্রাণী আমরা বাড়িতে, দু-জায়গায় বেঁধে কোনো লাভ আছে ? মিছেমিছি বেশি খরচ।

শুনিয়া সুব্রতা খুশি হইয়া তৎক্ষণাৎ এ প্রস্তাবে রাজি হইয়া যায়। যশোদার প্রশংসা করিয়া বলে যে, বাস্তবিক, বয়স না হইলে কী এ সব কথা মানুষের মাথায় আসে। কিন্তু একটা বিষয় আপত্তি করে সুব্রতা, সকাল সন্ধ্যায় চা-জলখাবার সম্বন্ধে।

চা-টা কিন্তু আমি করব দিদি।

নিজের হাতে করে খাওয়াতে চাও, না ? বলিয়া যশোদা হাসে।

সুব্রতার সঙ্গে এমনিভাবে আলাপ করে যশোদা, কখনও মা মাসির মতো, কখনও সমবয়সি সখীর মতো। কিছুক্ষণ আলাপ করিবার পরেই সব গোলমাল হইয়া যায়, সুব্রতার কথা শুনিতে শুনিতে সমবয়সি বন্ধু মনে হয় তাকে, আর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলে খেয়াল হয় যে সে ষোলো বছরের একটি কচি মেয়ে মাত্র, যে বয়সের মেয়ে যশোদারও থাকিতে পারিত।

এরা যে তার ভাড়াটে এ কথা যশোদার মনেই থাকিতে চায় না। দুজনকে তার মনে হয় অতিথি, তার বাড়িতে বেড়াইতে আসিয়াছে ; এদের খাওয়াদাওয়ার ভালো ব্যবস্থা করা আর সুখসুবিধার দিকে নজর রাখার দায়িত্ব যেন তার।

পরদিন সকালে উনুনে আঁচ দিয়া যশোদা সুব্রতাকে ডাকিতে যায়। এ সময় রোজ সুব্রতা রান্নাঘরে উপস্থিত থাকে, আজ তাকে না দেখিয়া যশোদা একটু আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল।

ঘরে গিয়া যশোদা দ্যাখে কী, অজিত ছোটো টুলটিতে মুখভার করিয়া বসিয়া আছে, চৌকিতে শতরঞ্চির উপর উপুড় হইয়া গুটানো তোশকে মুখ গুঁজিয়া সুব্রতা কাঁদিতেছে।

কী হল সকালবেলা তোমাদের ?

যশোদার সাড়া পাইয়াই সুব্রতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসে। জলভরা চোখ, ভিজা গাল আর ফুলানো ঠোঁটে কী ছেলেমানুষ আর সুন্দরই তাকে দেখায় ! মনে হয় গিন্নিপনার অভ্যাসটাও যেন তার এখনকার মতো ঘুচিয়া গিয়াছে। শিশুর মতো যশোদার কাছে সে নালিশ জানায়।

চায়ের জিনিসপত্র কিনবার পয়সা পর্যন্ত নেই দিদি। বললাম, এমনি মোটা মোটা চুড়ি ছ-গাছা করে কেউ এক হাতে পরে না, দু-গাছা চুড়ি বেচে দিয়ে এসো। তা, কিছুতেই বেচবে না। কী হয় বাড়তি চুড়ি বেচলে ?

চায়ের জিনিসপত্র কেনার জন্য বউয়েব গয়না বেচব !—অজিত বলে।

কেন, বউ কি পর ?—সুব্রতা বলে।

কঠিন সমস্যা সন্দেহ নাই। বউয়েব গয়না বেচার সমস্যা যশোদার আগেব ভাড়াটেদের মধ্যেও অনেকবার দেখা দিয়াছে, কিন্তু সমস্যাটা তখন দাঁড়াইত ঠিক উলটা। গয়না বেচিতে স্বামীরাই ছিল উৎসুক, বউয়েরা ছিল বিরোধী। কলহও ছিল তাদের ভিন্ন ধরনেব, কথা কাটাকাটি ছিল যেন গালাগালি আর অভিশাপ, মারামাবির ভূমিকার মতো। দু-একটি স্বামী যে বউকে চড়-চাপটা বসাইয়া দিত না, তাও নয়। অতীতে স্বামী-স্ত্রীর যত কলহে সে মধ্যস্থতা করিয়াছে তার সঙ্গে এই নব দম্পতির কলহের পার্থক্যটা এত বেশি স্পষ্ট হইয়া যশোদার কাছে ধরা পড়ে যে, এদের মিল ঘটানোর লাগসই উপায় সে ভাবিয়া পায় না। মিলনের চেয়ে মধুব যে বিরোধ, তার কী প্রতিবিধান আছে ?

এক রকম জোর কবিয়া রান্নাঘবে ধবিয়া নিয়া গিয়া দুজনকে সে চা আব হালুয়া খাওযায়। মন কাঁদিতে থাকে নন্দ আর সুবর্ণের জন্য। হয়তো এমনিভাবে কোথায় কার বাড়িতে একটি ঘর ভাড়া নিয়া তারা আছে, পয়সার টানাটানির জন্যই হয়তো তাদেবও প্রথম ঝগড়া বাধিয়াছে এমনিভাবে। প্রথম বয়সের উত্তেজনায় দুঃখকে ববণ কবাব সুখ দুদিনে ঘুচিয়া গিয়া দুর্দশাব দুজনেব সীমা থাকিবে না, এই কথাই সর্বদা সে ভাবে, কিন্তু আসলে হয়তো এদেব মতোই দুর্লভ আনন্দে দিনগুলি তাদেরও ভরিয়া আছে ! ভাবিতে গিয়া সংশয় জাগে যশোদাব। সুবর্ণ তো সুব্রতাব মতো নয়। সুব্রতার গিন্নিপনা আছে পাকামি নাই, লজ্জাহীনতা আছে বেহায়াপনা নাই, বুদ্ধি আছে কুটিলতা নাই, চপল হাসি মন ভুলানোর অস্ত্র নয় সুব্রতার। সুব্রতার মতো সুবর্ণ কি আপন করিতে পারে, সুব্রতাব মতো মনের মিল কি সুবর্ণের সঙ্গেও কারও হয় ?

অজিতের চা খাওয়া দেখিতে দেখিতে যশোদার মনে হয়, কে জানে নন্দও তো অজিতের মতো নয়। এদের দুজনের মতো নয় বলিয়াই হয়তো ওদের মধ্যে এদের মতো মিল হইয়াছে।

যশোদার গম্ভীর মুখ দেখিয়া অজিত আর সুব্রতা ভাবে, তাদের চুড়ি বিক্রির কথাটাই সে ভাবিতেছে। দুজনেই যশোদার দিকে তাকায় আর চোখ নামাইয়া নেয়, তারপর প্রায় একসঙ্গেই পরস্পরের দিকে মুখ ফিরানোর ফলে যেই চোখোচোখি হয়, দুজনের মুখেই মৃদু হাসি ফুটিয়া ওঠে। যশোদার প্রকাণ্ড শরীরটা আজও তাদেব চোখে অভ্যস্ত হইয়া যায় নাই, এখনও বিস্ময আব কৌতুক জাগে।

হাসি দেখিয়া যশোদা বলে, বড়ো ছেলেমানুষ তোমরা।

দুজনে ভাবে, এ বুঝি যশোদার শরীর দেখিয়া হাসার জন্য তিরস্কার। লজ্জায় অজিতের চোখ মিটমিট করে, সুব্রতার গাল দুটি লাল হইয়া যায়।

যশোদা বলে, দুটো চুড়ি বেচবে কী বেচবে না, তাই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি, কাঁদাকাটা কেন ? তেমন দরকার হলে গয়না বেচতে কোনো দোষ নেই—বেচাই বরং উচিত। মেয়েমানুষের গয়না তো শুধু শখের সামগ্রী নয়, বিপদে-আপদে কাজে লাগবে বলেই গয়না গড়ানো, ও হল এক ধরনের সঞ্চয়। তাই বলে যখন-তখন সামান্য কারণে বেচতে নেই। চায়ের জিনিসপত্র কেনার জন্যে কি আর গয়না বেচা চলে ? তবে মনে কর সুবুর—সুব্রতার একটা অসুখবিসুখ হওয়ার কথাটা যশোদার জিভের ডগায় আসিয়া পড়িয়াছিল, সামলাইয়া নিয়া সে বলে, ছেলেপিলে হবে বলে টাকার দরকার, তখন তো আর বউয়ের গয়না বেচব না বললে চলবে না। আমার কাছে ধার নাও টাকা, পরে শোধ করে দিয়ো।

সুব্রতার মুখের লালিমা, আরও বেশি গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল, সে চুপ করিয়া থাকে।

অজিত বলে, টাকা ধার করতে কেমন যেন লাগে।

যশোদা সুব্রতার মুখখানা দেখিতে দেখিতে বলে, সে তো ভালোই। তবে দিদি বলে যখন ডাকো আমায়, নিশ্চয় শোধ করে দেবে জানো মনে মনে, তখন কটা দিনের জন্য আমার কাছে নিতে দোষ নেই।

অজিত কাজে চলিয়া যায়। সুব্রতা রান্নাঘরে আসিয়া যশোদাকে টুকিটাকি কাজে সাহায্য করিবার সুযোগ খোঁজে আর বারবার কী যেন একটা কথা বলিতে গিয়া চুপ কবিয়া যায়। রান্না প্রায় সবই হইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল রান্না শেষ করা যশোদার চিরদিনের অভ্যাস, ভাড়াটেরা তার নটার মধ্যে খাইয়া কাজে বাহির হইয়া যাইত। মাঝখানে বাড়িতে যখন কেউ ছিল না, শুধু সে আর ধনঞ্জয়, তখন রান্না শেষ হইত অনেক বেলায়। অজিত আসিবার পর আবার যশোদা নটার মধ্যে সকালের রান্না শেষ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভালো যে যশোদার বিশেষ লাগে তা নয়। মস্ত উনুনে কত লোকের রান্না সে একদিন রাঁধিত, বাড়িতে দুবেলা যেন চলিত নিমন্ত্রণের হাঙ্গামা, এখন শুধু সিদ্ধ করা চারজনের ভাত।

জানো দিদি—

কিন্তু যশোদাকে কথাটা সুব্রতার আর বলা হয় না। রাজেন আসিঁয়া বসিতে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। রাজেনের কাছে হঠাৎ তার এত লজ্জার কারণটা কেউ বুঝিতে পারে না।

ভাড়াটেরা কেমন চাঁদের মা ?

মন্দ কী !

আর এক জোড়া ভাড়াটে আছে, আনব ?

যশোদা হাসিয়া বলে, কেন, এক জোড়ায় কলঙ্ক ঠেকানো যাবে না ?

রাজেনও হাসিয়া বলে, তা কেন, রোজগারের ব্যবস্থাও তো করতে হবে ?

এদের মতো ভদ্রলোক ভাড়াটে আনবে তো ?

প্রশ্ন শুনিয়া রাজেন উৎকণ্ঠিত ব্যগ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, কেন, এদের কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না চাঁদের মা ? না তিন টাকা ভাড়ায় একখানা ঘর দিতে হয়েছে বলে ভাবছ ? আমি কী সে সব না ভেবেই তোমায় ভাড়াটে এনে দিয়েছি ! কটা মাস অপেক্ষা করো, অজিতের মাইনে ডবল হয়ে যাবে,—তখন—

যশোদা মাথা নাড়িয়া বলে, সে জন্য নয়। ভাবছি, শেষকালে কি ভদ্রলোক ভাড়াটেই শুধু রাখতে হবে আমায় যারা দু-চোখে কোনোদিন দেখতে পারেনি ?

আমি কিন্তু মানুষ চাঁদের মা।

মানুষ না ঘোড়া তুমি তা জানিনে, তবে ভদ্রলোক তুমি নও।

বি এ ফেল করেছি, সাতষট্টি টাকায় চাকরি করা, বিয়ে করা বউ নিয়ে ঘরসংসার করছি—আমি যদি ভদ্রলোক নই, কে তবে ভদ্রলোক শুনি ? সত্যপ্রিয় ?

ও আবার একটা লোক নাকি যে ভদ্র হবে ? ও হল মানুষের রূপ ধরা দৈত্য—কিংবা দানোয় পাওয়া মানুষ। চাদ্দিকে হু হু করে বাড়ি তুলে গন্ডা গন্ডা ভদ্রলোক এসে বাসা বাঁধছে, ভদ্রলোক কাকে বলে জানো না ? চাষা মজুরকে যারা ঘেন্না করে, বড়োলোকের পা চাটে, ন্যাকা ন্যাকা কথা কয়, আধপেটা খেয়ে দামি দামি জামাকাপড় পরে, আরাম চেয়ে চেয়ে ব্যারামে ভোগে, খালি নিজের সুখ খোঁজে, মান অপমান বোধটা থাকে টনটনে কিন্তু যত বড়ো অপমান হোক দিব্যি সয়ে যায়, কিছু না জেনে সবজান্তা হয়—আর বলব ?

রাজেন মাথা নাড়িয়া বলিল, বলতে চাও বল, তবে আর শুনবার দরকার নেই। তোমার যখন ঝোঁক চাপে চাঁদের মা—

মুখে খই ফুটতে থাকে, না ?

ভদ্রলোকেব ওপর তোমার এত রাগ কেন যশোদা ?

ভদ্রলোকেরা কি মানুষ ?

আর একজোড়া ভাড়াটে আনিবার অনুমতি যশোদা দেয়। একজোড়া যখন আসিয়াছে, আরও আসুক। মনটা কিন্তু খুঁতখুঁত করিতে থাকে যশোদার। মনে হয়, চলিতে চলিতে সামনে একটা বাধা পাইয়াছে বলিয়া নিজেব মনেব দুর্বলতাব জন্য সে যেন বিপথে চলিতে আবম্ভ কবিয়াছে। দুপুরবেলা কুমুদিনী আসিয়া বেড়াইয়া গেল, সুব্রতার সঙ্গে ভাবও করিয়া গেল। ইতিমধ্যে যতবাব সে আসিয়াছে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যশোদাব সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলিযাই চলিয়া গিয়াছে, বসিতে বলিলেও বসে নাই। আজ প্রায় সমস্তটা দুপুর এ বাড়িতে কাটাইয়া গেল।

সুব্রতার কী হইয়াছে কে জানে, সমস্ত দুপুর কুমুদিনী যে এত কথা বলিল তার সঙ্গে, কথায বা ভাবভঙ্গিতে তার এতটুকু গিন্নিপনা দেখা গেল না। কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হইতে লাগিল তাকে।

কুমুদিনী চলিযা যাওয়ার পব আবার সে উশখুশ করিতে থাকে, সকালে রান্নাঘরে যেমন করিয়াছিল।

বলে, জানো দিদি, সেই যে বলছিলে না—?

যশোদা বলে, কী বলছিলাম ?

সেই যে, সে জন্য গয়না বেচা চলে ?

কিছুক্ষণ যশোদা বুঝিতেই পাবে না, অবাক হইয়া সুব্রতার মুখেব দিকে চাহিয়া থাকে। তাবপর খেয়াল হয়।

ওমা, সত্যি ? বলিয়া সুব্রতাকে সে বুকে টানিযা নেয।

কী হয তখন যশোদার, প্রথম সন্তান সম্ভাবনায় উদ্‌ভ্রান্ত পরেব একটা মেয়েকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ? তীব্র বেদনার সম্ভাবনায় বিরাট দেহের প্রত্যেকটি অণু ভয়ার্ত ঔৎসুক্যে সজাগ হইয়া ওঠে, চাঁদকে প্রসব করার সময় যেমন হইয়াছিল। আলিঙ্গনেব চাপে দম আটকাইয়া সুব্রতার প্রাণ বাহির হইয়া যাওযার উপক্রম হয়। জোর তো সোজা নয় যশোদার দুটি বাহুতে। সুব্রতার অস্ফুট আর্তনাদে সচেতন হইয়া সে তাকে ছাড়িয়া দেয়। ধপ করিয়া মেঝেতে বসিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে ক্ষীণস্বরে সুব্রতা বলে, আর একটু হলেই শেষ করে দিয়েছিলে দিদি।

রাত্রে ধনঞ্জয়কে খাইতে দিয়া সামনে বসিয়া থাকিতে থাকিতে যশোদার মনে হয়, আর একজন মানুষকে খবরটা শুনাইতে না পারিলে বুকটা তার ফাটিয়া যাইবে।

জানো, সুবুর ছেলেপিলে হবে।

বাড়িতে ভাড়াটে আসিবার পর ধনঞ্জয় কেমন মুষড়াইয়া গিয়াছে। কদিন চুপচাপ শুধু সকলকে দেখিয়া গিয়াছে, মুখে তার একটি কথা শোনা যায় নাই। যশোদার মুখে সুব্রতার সন্তান-সম্ভাবনার

খবরটা শুনিয়া এ বিষয়ে সে কিছুই বলে না, অভিমানী বালকের মতো নিজের নালিশটা জানাইয়া বসে।

রাজেনকে তুমি অত খাতির কর কেন চাঁদের মা ?

সুব্রতার নূতন খাপছাড়া অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা দেখিয়া যশোদা আশ্চর্য হইয়া গেল। কোথায় কী ছিল, কতদূর বিভিন্ন আবেষ্টনীর মধ্যে, হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে কোথায়। কিন্তু ছোটোবড়ো সব বিষয়ে অনেক ভুল করিলেও এবং নানারকম মুশকিলে পড়িলেও কখনও তাকে কাবু হইতে দেখা গেল না। নিজেই ভুল সংশোধন করিতে লাগিল, মুশকিলের আসান করিতে লাগিল। চায়ের সেট আর ওই ধরনের কয়েকটি অভাব মিটানোর জন্য সুব্রতার চুড়ি বিক্রি করার সমস্যা যশোদা সমাধান করিয়া দিয়াছিল। তবে সেটা সাময়িকভাবে কোনোরকমে কাজ চালানো গোছের সমাধান। সে সমাধান গ্রহণ করার বদলে সুব্রতা নিজের সমস্যার আরও স্থায়ী ও ব্যাপক মীমাংসা করিয়া ফেলিল। যশোদার কাছে টাকা ধার করার বদলে দামি চায়ের সেট কেনার মতো প্রয়োজনগুলিকেই বাতিল করিয়া দিল !

হাসিমুখে বলিল, প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি দিদি কদ্দুর হিসেব করে চলতে হবে আমাকে।

একটি অ্যালুমিনিয়ামের কেটলি আর সস্তা কয়েকটি কাপডিশ মাত্র কেনা হইল। আসবাব কিনিয়া ঘর বোঝাই করা তো বন্ধ হইয়া গেলই, যশোদাকে একদিন সুব্রতা জিজ্ঞাসাও করিল, বাড়তি আসবাব বিক্রি করিয়া ফেলা যায় না ?

খরচপত্রও সে হঠাৎ কমাইয়া ফেলিল। যুদ্ধের সম্ভাবনা টের পাওয়া মাত্র বুদ্ধি থাকিলে একটা দেশ যেমন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়, অদূর ভবিষ্যতে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই বাধিবে জানিয়া সুব্রতাও যেন তেমনিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করিতেছে।

সুব্রতার মধ্যে ন্যাকামি নাই। তরুণ মনের স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতা তার মধ্যে যথেষ্টই আছে কিন্তু দমনও সে করিতে জানে। বাঁকা আলোয় চকচকে কাচকে হিরার মতো খাতির করার খেলায় হয়তো সে আনন্দ পায় এবং সে কাচের বিনিময়ে কিছু সোনাদানাও অনায়াসে দিয়া বসে কিন্তু হিরার বদলে কাচ পাইয়াছে বলিয়া কখনও আপশোশ করে না। কারণ, কাচ যে কাচ তা সে জানে, আসলে সে দাম দেয় শুধু আনন্দটুকুর।

যশোদা এটা আশা করে নাই। সুব্রতাকে ভালো লাগিলেও এবং একটু স্নেহ জাগিলেও প্রথমটা তাকে যশোদার মনে হইয়াছিল, তুবড়ির মতো উচ্ছ্বাসভরা অকালে পাকা ফাজিল মেয়ে। তারপর ক্রমে ক্রমে যশোদা বুঝিতে পারিয়াছে, কথা বলা ছাড়া আর কোনো বিষয়ে সে তুবড়ি-ধর্মী নয়। ঠেকিয়া শেখা অভিজ্ঞতার পরিমাণটা তার অস্বাভাবিক রকমের বেশি নয়, কেবল দেখিয়া-শেখা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের স্বভাবসিদ্ধ পটুতার জন্য জ্ঞানের ভান্ডারটা বেশি রকম ভরিয়া ওঠায় তাকে একটু পাকা মনে হয়, আসলে মেয়েটা কাঁচাই আছে। মনকে সংকীর্ণ করার অপরাধে নিজেকে অপরাধী করে নাই বলিয়া সাহস ও সরলতা তার একটু বেশি, তাই তাকে মনে হয় ফাজিল।

রাজেনকে যশোদা বলে, না, এরা ঠিক ভদ্রলোক নয়।

দেখলে তো ? এমন ভাড়াটে এনে দিয়েছি, দুদিনে পছন্দ হয়ে গেল। কী তোমার ভালো লাগে না লাগে, সব জানা আছে চাঁদের মা !

যশোদা হাসিয়া বলে, মনের মানুষ তুমি, তুমি জানবে না তো কে জানবে ?

কাছে বসিয়া কুমুদিনী মুখ বাঁকায়। ধনঞ্জয় অসহায় দৃষ্টিতে যশোদার দিকে চাহিয়া থাকে।

সুব্রতার সুঠাম দেহ আর সুন্দর মুখখানা দেখিয়া একটা কথা যশোদার বারবার মনে পড়িয়া যায়। বাড়ির লোকের পছন্দ করা কুরূপা মেয়েটির বদলে তাকে বিবাহ করিয়া অজিত যে গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছে যশোদাকে প্রথম দিন তাই ব্যাখ্যা করিয়া শোনানোর সময় অজিতকে হাসিতে দেখিয়া

সুব্রতা সবিনয়ে ঘোষণা করিয়াছিল, সে সুন্দরী বটে কিন্তু তার মতো গন্ডা গন্ডা সুন্দরী মেয়ে রাস্তাঘাটে গড়াগড়ি যাইতেছে। সুব্রতার কথা আর ভঙ্গিকে তখন যশোদার মনে হইয়াছিল, একেলে মেয়ের পাকামির প্যাঁচ, ঘযামাজা ন্যাকামি। তারপর যশোদা জানিতে পারিয়াছে মেয়েদের পক্ষে এ বিশ্বাস পোষণ যতই বিস্ময়কর হোক, কথাটায় সুব্রতা সত্যসত্যই বিশ্বাস করে। তাব মতো বূপবতী মেয়ের পক্ষে নিজেব বূপ সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা আন্তরিকতার সহিত পোষণ কবা যে সম্ভব, এ অভিজ্ঞতা যশোদার ছিল না। রামলক্ষ্মণের মন ভুলানোর প্রতিযোগিতায় সীতা-উর্মিলার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এ বিশ্বাস যে সূর্পণখার ছিল, সে তো সে স্ত্রীজাতীয়া জীব বলিয়াই !

স্নেহ করার সঙ্গে সুব্রতাকে যশোদা তাই একটু শ্রদ্ধাও করিতে শিখিয়াছে।

চার

সুব্রতাব চরিত্রের আব একটা দিকও ক্রমে ক্রমে যশোদার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মেয়েটা খুব মিশুক।

যশোদা আব কুমুদিনীর সঙ্গে ভাব জমিয়াছিল একদিনে, পাড়ার কয়েকটি বাড়ির মেয়েদের সঙ্গেও সে ভাব জমাইয়া ফেলিল কয়েক দিনের মধ্যে। প্রথমে পরিচয় করিতে গেল সবচেয়ে কাছেব বাড়ির এবং সম্ভবত ছোটোখাটো একটা পরিধির মধ্যে সবচেয়ে গবিব ও অতি ভদ্র পরিবাবেব মেয়েদের সঙ্গে। পরিবারটি অমূল্য নামে একজন বছব পঞ্চাশেক বয়সের রোগজীর্ণ কেরানি ভদ্রলোকের। যশোদার সঙ্গে এ বাড়ির মেয়েদের ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও পরিচয় আছে অনেক দিনের। পবদিনই ও বাড়ির সাত হইতে চল্লিশ পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সেব আটজন মেয়ে যশোদার বাড়ি বেড়াইতে আসিল। সাত বছব বয়সের মেয়েটির রঙিন কাপড় পরার ভঙ্গি দেখিযা মনে হইল, যৌবনে পা দিয়া তাড়াতাড়ি দলের তিনটি তবুণী মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে যেন তাব তর সহিতেছে না।

অনেকদিন আগে অমূল্যর বাড়ির মেয়েরা দু-একবার যশোদাব বাড়ি বেড়াইতে আসিযাছিল। যশোদা তখনও কুলিমজুরদের বাড়িতে ভাড়াটে বাখিতে আবম্ভ করে নাই। তারপর নানা আপদে-বিপদে মাঝে মাঝে যশোদাকে তাবা ডাকিয়াছে বটে, কিন্তু যশোদার বাড়িতে কখনও আসে নাই। আজও তারা যশোদার কাছে আসে নাই, আসিয়াছে সুব্রতার নতুন সংসার দেখিতে।

অমূল্যর স্ত্রী আশাপূর্ণা পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল, আমবা এলাম। কই, তোমার নতুন ভাড়াটে কই চাঁদের মা ?

যশোদা বলিল, আমার নতুন ভাড়াটেকে খুঁজছ পাঁচুর মা ? এসো, বসবে এসো।

আশাপূর্ণার পান চিবানো বন্ধ হইয়া গেল। এতকাল কুলিমজুরের সঙ্গে কারবার করিয়া প্রায় তাদের মতো বনিয়া গিয়া এখনও তাকে সমানের মতো সম্বোধন করার মতো ভদ্রতা যশোদার আছে, সে তা কল্পনাও করে নাই।

কয়েক মাসের মধ্যে দেখা গেল যশোদার বাড়িতে দুপুরবেলা রীতিমতো মেয়েদের বৈঠক বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। দু-একটি মেয়ে নয়, উকিল, ডাক্তার, মাস্টার, প্রফেসর, কেরানি, জীবনবিমার এজেন্ট প্রভৃতি অনেক রকম ভদ্রলোকের বাড়ির অনেক মেয়ে। সকলের বাড়ি যে খুব কাছে তাও নয়। বড়ো রাস্তার ধারের কয়েকটি বাড়িতে পর্যন্ত সুব্রতা তার পরিচয়ের অভিযান আগাইয়া নিয়া গিয়াছে।

হাসি-গল্প গান-বাজনায় যশোদার বাড়ি দুপুরবেলা মুখরিত হইয়া ওঠে। সুব্রতা মোটামুটি গান জানে, একটি হারমনিয়াম আর একটি সেতার তার সঙ্গেই আসিয়াছিল। তারপর কয়েক জোড়া তাস আসিয়াছে, নগেন ডাক্তারের বাড়ির ক্যারাম বোর্ডটি আসিয়াছে। একটি করিয়া মুখ আর পরচর্চার মালমশলা তো সকলে সঙ্গে করিযাই আনে।

একটা আড্ডা পাইয়া সকলেই খুশি। সুব্রতা যেন মেয়েদের একটা ছোটোখাটো ক্লাব সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। কাজটা পাড়াব যে কোনো বাড়ির যে কোনো মেয়ে ইচ্ছা করিলেই করিতে পারিত কিন্তু এতদিন কারও তা খেয়ালও হয় নাই যে মাঝে মাঝে এ বাড়ি ও বাড়ি করার বদলে এক জায়গায় সকলে এক সঙ্গে মিলিয়া পাড়া বেড়ানোর সাধ মিটাইবার এ রকম একটা সহজ উপায় আছে। অবশ্য নিজের বাড়িতে রোজ এতগুলি মেয়েমানুষের সমাগম সকলের পছন্দ হইত না। তবে একত্র হইতে চাহিলে কি আর স্থানের অভাব হয় !

প্রথম প্রথম কেউ আসিয়াছিল নিছক ভদ্রতার খাতিরে, কেউ মনের খেয়ালে, কেউ কৌতূহলের বশে। আসিবার আগে কেউ ভাবেও নাই যে, তাদের জন্য তাদের নিয়াই সুব্রতা যশোদার বাড়িতে এমন একটি আকর্ষণ সৃষ্টি করিতেছে।

অল্পদিনে সুব্রতাব নামহীন, উদ্দেশ্যহীন, কমিটি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি-হীন মহিলা সংঘ গড়িয়া উঠিল। যশোদা রাগ করিবে কী খুশি হইবে বুঝিয়া উঠিবার সময়ও পাইল না। ব্যাপারটা ভালো করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবার আগে নিজেই সে সংঘে যোগ দিয়া বসিল। নানাবয়সি মেয়েদের মধ্যে প্রয়োজনীয় শ্রেণি বিভাগের জন্য সুব্রতাকে যে কৌশল অবলম্বন করিতে হইল, এটা হইল তার ফল।

গোরু আব বাছুর একসঙ্গে বসলে কি জমে দিদি ?

না দিদি, জমে না।

কাল তাহলে আমি বিনু, উমি, সাবু এদের আমার ঘরে ডেকে নিয়ে যাব, তুমি বড়োদের নিয়ে বসবার ঘরটাতে থাকবে, কেমন ?

সুব্রতা ভাড়া নিয়াছে একটি ঘর, কিন্তু মেয়েদের বসানোর জন্য আর একটি ঘরকে বসিবার ঘরে পরিণত করিতে তার বাধে নাই। যশোদাকে জিজ্ঞাসা করাও দরকাব মনে কবে নাই।

তারপর যশোদা বয়স্কাদের আসরে ভিড়িয়া গিয়াছে। কেউ মোটা, কেউ রোগা, কেউ দুয়ের মাঝামাঝি, কিন্তু সকলেই শিথিল। কেউ এখনও সচেতন গর্বের সঙ্গেই ফরসা চামড়ার স্তিমিত রূপের ঝাঁজ বিকীর্ণ করিতেছে, রূপের অভাব আসিয়া যাওয়ায় বয়সটা পার হইয়া কেউ স্বস্তি বোধ করিতেছে। কারও গায়ে গয়না বেশি, কারও গায়ে কম গয়নার ফ্যাশন গয়নার চেয়ে স্পষ্ট। কারও মুখে পান, কারও মুখে ভাঙা বাঁকা দাঁতগুলি রোজ সকালে কয়লার গুঁড়ার ঘষামাজা পায় বলিয়া বেশ সাদা।

কয়েকটি মুখ যশোদার অপরিচিত। চাবিদিকে অনেক নতুন বাড়ি উঠিযাছে, অনেক নতুন লোক শহরতলিতে বাস করিতে আসিয়াছে। সুব্রতা হয়তো এতদূর হইতে দু-একজনকে টানিয়া আনিয়াছে, শহরতলির পুরানো বাসিন্দা হইলেও যার মুখ চেনার সুযোগ যশোদার ঘটে নাই। চেনা হোক, অচেনা হোক, যশোদা এদের চেনে। এরা সকলেই মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের গিন্নি। কপালে থাকিলে যশোদা নিজেই হয়তো এতদিনে এদের মতো একজন গিন্নি হইয়া দাঁড়াইত।

কিন্তু কোথায় যশোদার চাঁদ ? আত্মীয়স্বজনভরা সংসার ? সংসার না থাকিলে কি গিন্নি হওয়া চলে ! মজুরদের নিয়া সে সংসার গড়িয়া গিন্নি হইয়া বসিয়াছিল, সত্যপ্রিয় সে সংসারও তার ভাঙিয়া দিয়াছে।

যশোদার দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগ রাগ দ্বেষ হিংসা গ্লানি সব কিছুর উপব চিরদিন স্থায়ী একটা প্রলেপ থাকিত—মজা লাগার। জিভের ঘায়ে মধুমাখা মলমের প্রলেপের মতো। সেই প্রলেপের অভাবে যশোদার মনের সবগুলি আঘাতের ক্ষত আজকাল কটকট করে।

যশোদার কিছুই করিবার নাই।

সর্বদা পরের বিপদ ঘাড়ে করা, পরের সমস্যার মীমাংসা করা, বাঁচিয়া থাকার মর্মান্তিক প্রচেষ্টায় আহত অনেকগুলি অশিক্ষিত ও অমার্জিত বয়স্ক শিশুর সেবায় মশগুল থাকা, সব ঘুচিয়া গিয়াছে। রাজেন তাই তাকে শ্রমিক নেতাব কাছে টানিয়া নিয়া গিয়াছে, বাড়িতে ভাড়াটে আনিযা দিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। যা নিয়া যশোদা ছেলেব শোক ভুলিয়াছিল, আত্মীয় পরিজনের অভাব ভুলিয়াছিল, নিজেকে বিকাশ কবার সুযোগ পাইয়াছিল, এ সব কৃত্রিম খেলনায় কি সে অভাব মেটে ?

অপরের দেখাইয়া দেওয়া আদর্শের দিকে অপরের সৃষ্টিকর্মের নালায জীবনস্রোতকে বহাইয়া দিবার সাধ যশোদার কোনোদিন ছিল না। ও সব তার ধাতে সহ্য হয় না। সে যেমন আর তার যা আছে তেমনই থাকিয়া আব সেই সব নিয়া অনেকগুলি পছন্দসই পরেব জীবনের ঘনিষ্ঠ আবেষ্টনীব মধ্যে সে নিজের নিয়মে বাঁচিতে চায।

ভদ্রলোক নামে যে এক শ্রেণিব মানুয আছে তাদেব পুত্রকন্যা প্রসব কবিয়া আব সংসাব চালাইয়া মাঝ বয়সেই যে সব গিন্নিদের দেহ, মন, মুখ, এমন কী শাড়ির আঁচল আর ব্লাউজ শেমিজ পর্যন্ত শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাদের সঙ্গে কয়েকটা দুপুর আড্ডা দিয়াই যশোদার হাঁপ ধরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। তার বদলে হঠাৎ সে যেন আহত মনের ক্ষতে মিষ্টি মলমের মৃদু একটা স্বাদ অনুভব করিতে লাগিল।

তার বাড়িতে আসিয়া তার ঘরে বসিয়া একেবারে তার চোখের সামনে পাড়াব এতগুলি স্ত্রীলোক নিজেদেব শ্যাওলা-ধরা জীবন মেলিয়া ধবে আর উপেক্ষা, অবহেলা বা বিতৃষ্ণার বদলে যশোদার মনে জাগে মমতা। অজানা কিছু নয়, নতুন কিছু নয। যশোদা এদের জানে, এদেব জীবন-যাত্রার পবিচয়ও রাখে। এদের দূরেও সে রাখিত সেই জন্যই। তবে দূরে রাখিয়া মোটামুটি ধাবণা পোষণ করা এককথা। এক ঘরে ঘণ্টাব পর ঘণ্টা ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া অসংখ্য খুঁটিনাটি বিকৃতি আব ব্যর্থতা আবিষ্কার করিয়া মমতা বোধ করার সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য।

কেবল অসুখেব সময় গিয়া সেবা করিযা, বিপদের সময় গিয়া সাহস দিয়া আব উৎসবের সময গিয়া খাটিয়া আসিয়া যশোদা যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল যে এবাও মানুষ।

চাঁদ মরিয়া যাওয়াব পর সে যেমন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়াছিল, নগেন ডাক্তারের ফরসা মোটা বউ অতসী ছেলের শোকে তেমনিভাবে কাঁদিয়াছে।

অতসীর এখনও তিনটি ছেলে আর দুটি মেয়ে আছে। বড়ো ছেলে রমেন ডাক্তারি পড়ে। বড়ো ম্লান মুখখানা ছেলেটার, বড়ো বিষণ্ণ স্তিমিত দৃষ্টি। দেখিলেই যশোদার মনটা কেমন করিয়া ওঠে। কদিন আগে দুপুরবেলা কী দরকারে সে মাকে ডাকিতে আসিয়াছিল, তখন তার চোখে যশোদা যেন দেখিতে পাইয়াছিল, একটা চাপাপড়া লাজুক ভাবপ্রবণ ক্ষুধা।

বল গে যা, আসছি বলিয়া ছেলেকে বিদায় দিয়া হাতের তাস নামাইয়া সকলের দিকে চাহিয়া অতসী তৃপ্তির হাসি হাসিয়াছিল—সগর্বে।—আর বছর ডাক্তারি পাশ করবে। এক বাড়িতে দুজন ডাক্তার হবে, রুগিকে আর ফিরতে হবে না—একজন বাড়ি না থাক আর একজন তো থাকবে, কী বলেন ? পাশ করেই অবিশ্যি ওনার মতো চার টাকা ফি করলে চলবে না, প্রথম দু-চারবছর দু টাকা করে, তারপর পশার বাড়লে চার টাকা। উনি হয়তো তদ্দিনে আট টাকা ফি করে ফেলবেন, এখন থেকেই বলছেন, চার টাকায় আর পোষায় না—

নন্দর কাছে রমেন কীর্তন শিখিতে আসিত। তখনও তাকে দেখিয়া যশোদার মনে হইত, ডাক্তারি বিদ্যার চাপে ছেলেটা যেন দিন দিন কুঁকড়াইয়া যাইতেছে। দেহতত্ত্ব জিজ্ঞাসু বৈষ্ণবের ছাঁচে ঢালিয়া মানুষ করিয়া ছেলেকে মড়া কাটিতে পাঠানোর জন্য অতসীর গর্ব দেখিয়া একটা দুর্বোধ্য বন্ধনের অনুভূতিতে যশোদাকে ব্যাকুলভাবে একবার জোরে শ্বাস টানিতে হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পর যশোদার মনে হইয়াছিল, কেবল রমেন তো নয়। সুন্দরী বড়ো মেয়েটাকে আই সি এস বরের উপযোগী লেখাপড়া চালচলন শিখাইয়া তার চেয়ে অশিক্ষিত মাঝবয়সি গেঁয়ো রাজার রানি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কেবল অতসীও তো নয়। একে একে অন্য গিন্নিদের ছেলেমেয়ের কথাও যশোদার মনে পড়িয়াছিল। মনে হইয়াছিল, যেন এক ধরনের জীবনযাপনের জন্য সকলেই যেন অন্য ধরনের জীবনযাপনের উপযোগী কবিয়া ছেলেমেয়েগুলিকে মানুষ করে।

যশোদা বড়োই মমতা বোধ করিয়াছিল। এদিক দিয়া কুলিমজুরেবাও ভালো। আধমরা পশুর মতো জীবন হোক, ছেলেমেয়েগুলি তাদের আধমরা পশুর মতো জীবনযাপনের জন্যই জন্ম হইতে তৈরি হয়।

সুকুমার উকিলের স্ত্রী বনলতাও ফরসা এবং মোটা। সর্বদা পান খায়। সুযোগ পাওয়া মাত্র রোয়াকে দাঁড়াইয়া মুখভরা পান চিবাইতে চিবাইতে চুপিচুপি সে যশোদাকে বলে, চাব টাকা না চারশো টাকা। যা মুখে আসে বললেই হল। পশার তো ভারী, সারাদিন হাঁ করে বসে থাকে রুগির জন্য, একটা টাকা দিলেই ছুটে আসবে। চাব টাকা কোথায় আদায় করে জানো চাঁদেব মা ? অন্য ডাক্তার ডাকবার সময় নেই, এদিকে রুগির যায় যায় অবস্থা, তখন। আবার বলে আট টাকা করবে ! এমন হাসি পায় মাগির কথা শুনলে।

হাসিবার জন্যই বোধ হয় যশোদার ঝকঝকে উঠানের একটা কোণ পিক ফেলিয়া ভাসাইয়া দেয়। তিন-চারদিন আগে অতসী তার ডাক্তাব স্বামীর ফি-র সম্পর্কে কথা বলিয়াছিল, যশোদাব কাছে সে কথার ফাঁকি ধরাইয়া দেওয়ার জন্য আজ পর্যন্ত বনলতা সযত্নে কথাগুলি মনেব মধ্যে পুষিয়া রাখিয়াছে। এমনই চুপিচুপি আরও কতজনকে বলিয়াছে কে জানে, হয়তো আরও সপ্তাহখানেক ধরিয়া বলিয়াই চলিবে।

যেখানে সেখানে পানের পিক ফেলার স্বভাবের জন্য একটা কড়া কথা বলিতে গিয়া যশোদা চুপ করিয়া গেল। হঠাৎ তার মনে হইয়াছে, বনলতার মাথাটা যেন একটু খারাপ। বাড়িতে যাবা আসিতেছে তাদের সকলের মানসিক অবস্থাই কমবেশি অস্বাভাবিক, কিন্তু বনলতার মন যেন স্বাভাবিকতার স্তর পার হইয়া একটু বেশি রকম আগাইয়া গিয়াছে।

অতসীর সঙ্গে বনলতার খুব ভাব, তাস খেলার লড়াইয়ে প্রায় রোজই তারা দুজনে মিলিয়া একটি পক্ষ গঠন করে। বনলতা কথা বলে না অনুরূপার সঙ্গে। অনুরূপা প্রফেসর সুনীল সেনের স্ত্রী। মানুষটা একটু হাবাগোবা ধরনের, বড়োই নিরীহ। যে যা বলে তাই সে মানিয়া নেয়, কারও সঙ্গে ঝগড়া করে না। এ রকম গোবেচারা মানুষের সঙ্গে বনলতার কথা বন্ধ করার কারণটা যশোদা কোনোমতেই ভাবিয়া পায় না।

এ রকম খাপছাড়া যুক্তিহীন ব্যাপার যশোদাকে পীড়া দেয়। কতকটা নিজের বিরক্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যেই সে ভাবে, কারণ যাই থাক, দুজনের মধ্যে ভাব করাইয়া দিলে দোষ কী ?

জিজ্ঞাসা করিতে বনলতা বলে, কথা বলব না কেন, বলি তো ?

যশোদা বুঝিতে পারে অনুরূপার সঙ্গে সে যে কথা বলে না তাও বনলতা স্বীকার করিবে না, কথাও বলিবে না। এ চাল যশোদা জানে, তাই বনলতার সঙ্গে সময় নষ্ট না করিয়া সে ধীরে ধীরে

অনুরূপার পাশে গিয়া বসে, বনলতা পিক ফেলিতে উঠিয়া গেলে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করে, সেনগিন্নির সঙ্গো বুঝি আপনার বনে না ?

অনুরূপা অপরাধীর মতো ভয়ে ভয়ে বলে, বনবে না কেন, তবে কী জানেন—

সুব্রতার ঘরে তখন মধুর কণ্ঠে গান আরম্ভ হইয়াছে। অনুরূপার মেয়ে অলকা চমৎকার গান গায়। বড়ো রাস্তার কাছাকাছি সামনে ছোটো বাগানওয়ালা দোতলা বাড়িটিতে তারা উঠিয়া আসিয়াছে বছরখানেক আগে এবং আসিয়াই অলকা পাড়ার গায়িকাদের খ্যাতি ম্লান করিয়া দিয়াছে।

আপনার মেয়ে বড়ো সুন্দর গান গায়—অনুরূপাকে এই কথা বলিবার জন্য যশোদা মুখ খুলিয়াছে, পিক ফেলিয়া আসিয়া পানের পিকের মতোই মুখ লাল করিয়া বনলতা উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলে, ওই রে, ছুঁড়ি আবার গান ধরেছে। শুনছেন ? ফের প্যানপ্যানানি শুরু করেছে।

অবিনাশ চাটুজ্যের বউ প্রভা মিনতি করিয়া বলে, আহা, একটু শুনতে দিন না ?

বনলতা যেন খেপিয়া যায়। —কী শুনবে ভাই ? ও কী গান নাকি ? মিনমিন করে কাঁদলেই যদি গান হত—

ইনশিয়োরেন্স এজেন্ট জগদীশের দ্বিতীয় পক্ষের বউ অমলা হঠাৎ বলিয়া বসে, খুকুর চেয়ে তো ভালো গায়।

বনলতা ধপাস করিয়া বসিয়া পড়ে।—খুকুর চেয়ে ভালো গায় ? এত বড়ো বড়ো ওস্তাদ রেখে খুকুকে গান শেখালাম, খুকুর চেয়ে ভালো গায় ?

বনলতা হাউহাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। কাঁদিতে কাঁদিতে মেঝেতে শুইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়।

অতসী তীব্র ভর্ৎসনার সুরে অমলাকে বলে, ওর পেছনে লাগবার কী দরকার ছিল আপনার ?

এই সব গোলমালের মধ্যে ও ঘরে গান বন্ধ হইয়া যায় এবং যশোদা এক গেলাস জল আনিয়া বনলতার তালুতে একটু একটু করিয়া থাপড়াইতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বনলতা শান্ত হইয়া উঠিয়া বসে।

যশোদা জানে এ শুধু ঈর্ষা আর অহংকারের ব্যাপার নয়, নিজের মেয়ের চেয়ে অন্য একজনের মেয়ে ভালো গান গায় বলিয়া সুস্থ মানুষ এ রকম করে না। ভিতরে বিকার আছে আর সেই বিকার এই রকম খাপছাড়া উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

এ ধরনের বিকার শুধু এদের মধ্যেই দেখা যায়, কুলিমজুরদের বউরা এ হিস্টিরিয়ার ধার ধারে না। অভাবের চাপে আর ঝাঁঝালো নিষ্ঠুর বাস্তবতার তাপে তারা শুকাইয়া যায়, এদের মতো পচিতে শুরু করে না।

যশোদার চিন্তিতভাবকে সুব্রতার মনে হয় গাম্ভীর্য। সন্ধ্যার পর মন খারাপ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করে, কী ভাবছ দিদি ?

যশোদা প্রথমে বলে, ভাবছি ? কই, কিছুই তো ভাবছি না ভাই ? তারপর বলে, ও হ্যাঁ, একটা কথা ভাবছি। মেয়েদের গান শেখাবার ইস্কুলের মতো করলে হয় না একটা ? ঘরোয়া ইস্কুলের মতো, মাইনে টাইনের দরকার নেই, দুপুরবেলা পাড়ার মেয়েরা এসে গান শিখে যাবে। যন্ত্রপাতি কিনবার যদি দরকার হয় তখন বরং সকলের কাছ থেকে চাঁদার মতো কিছু কিছু নিলেই হবে। কী বলো।

প্রস্তাবটি শুনিয়াই সুব্রতা খুশি হইয়া ওঠে, নিশ্চয়, ঠিক। আমিও ভাবছিলাম ওই রকম কিছু করতে হবে। বসে বসে শুধু গল্প করলে চলবে কেন ?

তুমি, অলকা আর খুকু গান শেখাবে।

অলকা আর খুকু ? সুব্রতার মুখে দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসে, তবেই তো মুশকিল !

যশোদা হাসিয়া বলে, সে আমি ঠিক করে দেব।

প্রথমে যশোদা গেল প্রফেসর সুনীল সেনের বাড়ি। অনুরূপা তার সব কথাতেই সায় দিয়া গেল, সব প্রস্তাবেই রাজি হইয়া গেল। কেবল অলকা একটু মুখভাব করিয়া বলিল, খুকু আর আমি ? ও মেয়েটা বড়ো হিংসুটে।

কিন্তু যশোদার কাছে এতটুকু মেয়ে কেন মুখভার করিয়া থাকিতে পারিবে, বিশেষত নিজের তাগিদে একটা কিছু করার ভার গ্রহণ করিয়া হঠাৎ যখন যশোদার শরীর মন হালকা মনে হইতে আরম্ভ করিয়াছে ? অলকাকে জয় করিতে তার কয়েক মিনিট সময় মোটে লাগে। খুকু তো ঠিক হিংসুটে নয়, বোকা। তাছাড়া, অলকার গান শুনিয়া গান-জানা কোন মেয়ের না হিংসা হয় ?

খুকুকে না ডাকলেও তো চলবে না দিদি ! সারেগামা শেখানো, গলা সাধানো, সোজা গান শেখানো এ সব তো একজনের করা চাই ? এমন গান কর তুমি, তোমায় কী এ সবের জন্য বলতে পারি ? তোমার সময়ই বা কই ? মাঝে মাঝে তুমি গিয়ে দু-একখানা ভালো গান শেখাবে, বাস—!

তেল মাখাইতেও যশোদা কম পটু নয়, গর্বে আর আনন্দে অলকার মুখখানা তেল মাখানো মুখের মতোই চকচক করিতে থাকে।

তখন যশোদা যায় বনলতার বাড়ি, মা ও মেয়েকে বুঝাইয়া বলে,—আসলে খুকুই আমাদের গান শেখাবে, সব ভার থাকবে খুকুর ওপরে। অলকা মাঝে মাঝে আসে তো আসবে, দু-একখানা গান শিখিয়ে যাবে। মিহি গলা থাকলেই তো গান শেখানো যায় না, গান শেখাতে হলে সুর তাল শেখাতে হয়, নয় দিদি ?

খুকু গদগদ ভাবে বলে, আরও কত কী আছে—গান শেখা কী সহজ !

একটি হারমনিয়াম, একটি এসরাজ আর পাঁচ-ছটি ছাত্রী নিয়া যশোদার ঘরোয়া সংগীত বিদ্যালয় আরম্ভ হয়। সকলের যে খুব বেশি উৎসাহ জাগিয়াছে তা নয়, সকলে ভাবিতেছে, যশোদার মতলবটা কী ? কিন্তু যশোদা জানে বিনা পয়সায় মেয়েদের গান শেখানোর সুযোগ কেউ ছাড়িবে না, মেয়েদের গান-বাজনার চর্চা যারা পছন্দ করে না তারাও নয়। দু-চারদিনের মধ্যে মেয়ের ভিড়ে তার ঘর ভরিয়া উঠিবে। এই তো সবে শুরু।

সকলেই আজ এক ঘরে। অন্য সকলে এলোমেলোভাবে যে যেখানে পারে বসিয়াছে, একটি আস্ত পাটি কেবল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে গানের শিক্ষয়িত্রী আর ছাত্রীদের। হারমনিয়ামের একদিকে বসিয়াছে ছাত্রীরা, অন্যদিকে পরস্পরের যতটা পারে তফাতে সরিয়া বসিয়াছে অলকা আর খুকু। কিন্তু এত কাছে বসিয়া, একই কাজ করিতে বসিয়া, পরামর্শ না করিয়া চুপচাপ শুধু বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? বিশেষত সকলে যখন কীভাবে গান শেখানো আরম্ভ হয় দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। তারা যে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে না, তাদের মায়েরাও বলে না, এটা তাই তখনকার মতো তাদের ভুলিয়া যাইতে হয়।

প্রথমে অলকা বলে, কী শেখানো যায়? গান ?

তখন খুকু বলে, গলা কী করে সাধতে হয় শেখালে হত না ?

অলকা বলে, গলা তো সাধবেই, একটা সোজাসুজি গান দিয়ে আরম্ভ করলে বোধ হয় ভালো হয়।

খুকু বলে, একেবারে গান দিয়ে আরম্ভ করলে—

পরামর্শের সুবিধার জন্য নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তারা পরস্পরের একটু কাছে সরিয়া আসে।

ছয়-সাতটি নানা পর্দায় গলার বেমিল, বেসুরো, হঠাৎ-জাগা হঠাৎ-থামা আওয়াজে ঘরটা গমগম করিতে থাকিলে যশোদা বনলতা আর অনুরূপার মুখের দিকে তাকায়। এই দুটি জননীর মধ্যে ভাব জমানোর যে তুচ্ছ খেয়াল হইতে এই সুরচর্চার উৎপত্তি হইয়াছে, যশোদা তা ভোলে নাই।

সুরচর্চা অবশ্য যশোদা আর থামিতে দিবে না, আরও ব্যাপক ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চর্চা করাইবে, কিন্তু ওদের দুজনের ভাব হওয়াটা তো দরকার ?

হঠাৎ যশোদা উঠিয়া যায়, ঘরের এক প্রান্ত হইতে হাত ধরিয়া অনুরূপাকে অন্যপ্রান্তে বনলতার কাছে টানিয়া আনে, বনলতার পাশে তাকে বসাইয়া দুজনের হাতে হাত মিলাইয়া দিয়া আবেগ-কম্পিত গলায় বলে, আপনাদের দুটি মেয়েই রত্ন। ওদের জন্যই আমার সাধ মিটল। ওরা যদি আমার মেয়ে হত !

বনলতা প্রায় কাঁদিয়া ফেলে।—কত ওস্তাদ রেখে কত চেষ্টায় মেয়েকে আমি গান শিখিয়েছি !

অনুরূপা বলে, আপনার মেয়ে সত্যি শেখার মতো করে শিখেছে।

বনলতা কাঁদিয়া ফেলে।—ওর গলাটা যদি তোমার মেয়ের মতো মিষ্টি হত ভাই।

তিন মাসের মধ্যে পথের ও দিকে এ বাড়ির মুখোমুখি যশোদার অন্য বাড়িতে একটি রীতিমতো সংগীত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া গেল। বাড়ির সামনে ছোটো একটি কাঠের ফলকে নামটা লিখিয়া টাঙাইয়া দেওয়াও হইল। বাড়িটি যশোদা কোনোদিন আর ভাড়া দিবে না ঠিক করিয়াছিল। তবে ভাড়া দেওয়া আর কাজে লাগানোর মধ্যে তফাত আছে।

বনলতা একদিন চুপিচুপি যশোদাকে বলে, স্কুল তো দিব্যি চলছে চাঁদের মা। খুকু তো প্রাণ দিয়ে খাটছে তোমার স্কুলের জন্য, এবার ওর জন্য কিছু ব্যবস্থা করে দাও ? বনলতা পান চিবাইতে চিবাইতে হাসে, মাইনের কথা বলছি না, অত খাটছে মেয়েটা, হাতখরচ বাবদ কিছু—তারপর হঠাৎ হাসি বন্ধ করিয়া গম্ভীর হইয়া বলে, ওস্তাদ রেখে গান শেখাতে জলের মতো টাকা ঢেলেছি কিনা, তাই বলছি।

তবু যশোদা ভুল করে না যে বনলতার মাথা আসলে সকলের চেয়ে বেশি খারাপ নয়।

পাঁচ

ছেলে বা জামাই কেউ সত্যপ্রিয়ের মনের মতো নয়। আত্মীয়-পরিজন কেউ যে তার মনের মতো তাও অবশ্য নয়, তবু সেটা কোনোরকমে সহ্য হইয়া যায়। বড়ো ছেলে আর বড়ো মেয়ের জামাই যে তার অপদার্থ এই আপশোশ মাঝে মাঝে মানুষটাকে একেবারে কাবু করিয়া ফেলে। সকলকে বড়ো বড়ো উপদেশ দেয়, মানুষের শিক্ষাদীক্ষার মারাত্মক ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া সকলকে জানাইয়া দেয়, মানুষকে গড়িয়া তুলিবার সহজ সরল পথ কী তাই নিয়া গবেষণা করে, আর তার ছেলে আর জামাই এমন ! না জানি লোকে কী ভাবে ? না জানি তার সব অকাট্য যুক্তিগুলিকে সকলে তার ছেলে আর জামাইয়ের কথা ভাবিয়া অনায়াসে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দেয় কিনা ?

মেয়েটি সত্যপ্রিয়ের খুব সুশ্রী নয়, কিন্তু অনেক খুঁজিয়া অনেক টাকা খরচ করিয়া জামাই আনা হইয়াছে রূপবান। কী রং জামাইয়ের ! যেন সোনার ওজনে সোনার পুতুলই সত্যপ্রিয় কিনিয়া আনিয়াছে মেয়ের জন্য।

একজন আত্মীয়, যে কখনও সত্যপ্রিয়ের কাছে টাকা প্রত্যাশা করে না, সত্যপ্রিয় যাচিয়া দিতে গেলেও বোধ হয় যে বিশেষ দরকারের সময়ও তার টাকা নিবে না, সম্বন্ধ ঠিক করার সময় সে একবার বলিয়াছিল, আরেকটু চলনসই পাত্র আনলে হত না ?

সত্যপ্রিয় মুখভার করিয়া বলিয়াছিল, কেন ?

কী জানো, তোমার মেয়েকে যদি ছেলেটির পছন্দ না হয় ? নিজের চেহারার জন্যেই এ সমস্ত ছেলের মাথা গরম হয়ে থাকে, টাকার লোভে যদি বা বিয়ে করে, খুব সুন্দরী মেয়ে না পেলে নিজের সঙ্গে মানায়নি ভেবে মনটা হয়তো খুঁতখুঁত করবে।

সবাই কি তোমার মতো ভাবপ্রবণ ভাই !

তা মানুষ একটু ভাবপ্রবণ বইকী। টাকা দিয়ে গরিবের ছেলে কিনছ, ছেলে তোমাদের সকলের অনুগত হয়ে থাকবে বটে, কিন্তু তাতে কি ছেলে আর মেয়ের মনের মিল হবে ? আর মনের মিল যদি না হল—

কিন্তু সত্যপ্রিয় বুঝিতে পারে নাই। সে যাকে কিনিয়া আনিতেছে, বাড়িতে রাখিতেছে, জীবিকার উপায় করিয়া দিতেছে, তার মেয়ের মনে কষ্ট দেওয়ার মতো স্পর্ধা কখনও তার হইতে পারে ! বিবাহের এক বছরের মধ্যে মেয়ের মুখের হাসি নিভিয়া যাইতে দেখিয়া সে তাই অবাক হইয়া গিয়াছিল। তারপর তার চোখের সামনে চিরস্থায়ী বিষাদ মেয়ের মুখকে আশ্রয় করিয়াছে, কেমন যেন উদাস চাহনি হইয়াছে মেয়ের।

অথচ যামিনীর স্বভাব খুব নম্র, তার মতো শান্তশিষ্ট নিরীহ গোবেচারি জামাই পাওয়াই কঠিন। সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে কখনও মুখ তুলিয়া কথা বলে না। বাড়ির কারও সঙ্গে কখনও তর্ক করে না। বউয়ের সঙ্গে একটা দিনের জন্যও কোনোদিন সে কলহ করিয়াছে বলিয়া কেউ শোনে নাই। চরিত্রও তার খারাপ নয়, হঠাৎ বড়োলোকেব জামাই হইয়া অনেক টাকা পাইয়াও বাহিরে স্ফূর্তি করার দিকে তার একটুকু টান দেখা যায় না।

তবে ? যোগমায়া মাঝে মাঝে লুকাইয়া কাঁদে কেন ?

নিরুপায় আপশোশে সত্যপ্রিয়ের হাত-পা কামড়াইতে ইচ্ছা করে। কিছুই করিবার নাই, কিছুই বলিবার নাই। যামিনী যদি মেয়েকে তার মারিত, মদ খাইয়া মাতলামি করিত, কিংবা অন্য কোনো স্পষ্ট অপরাধে মেয়ের চোখের জল আনিত, সে তাকে উপদেশ দিতে পারিত, শাসন করিতে পারিত, চাপ দিয়া সিধা করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু এখানে যে কোনো প্যাঁচ পর্যন্ত খাটানোর উপায় নাই ! যামিনীর হাতখরচের টাকাটা কোনো ছুতায় বন্ধ করিয়া দিলে কি কিছু লাভ হইবে ? মেয়ের মনে বরং তাতে কষ্ট হইবে আরও বেশি।

তা ছাড়া সমস্যা তো ও রকম নয়। যে উদ্ধত নয় তাকে নরম করা চলিবে কেমন করিয়া ?

•

একদিন যামিনীর একটু জ্বর হইয়াছে, সামান্য সর্দিজ্বর, ব্যস্ত হওয়াব কিছুই ছিল না। কিন্তু সত্যপ্রিয় যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ব্যাকুল হওয়াটাই সত্যপ্রিয়ের পক্ষে খাপছাড়া ব্যাপার, এমন সামান্য ব্যাপাবে তাকে ব্যাকুল হইতে দেখিয়া যামিনীও ভয় পাইয়া গেল যে, অসুখটা বুঝি তাব ভয়ানক কিছুই হইয়াছে।

নিজে মোটরে করিয়া সত্যপ্রিয় যামিনীকে ডাক্তারের কাছে নিয়া গেল।

ফোনটা তুলিয়া নিয়া একটা করিয়া হুকুম দিলে যার বাড়িতে ডাক্তারেব ভিড় জমিয়া যাওয়ার কথা, জামাইকে দেখানোর জন্য সে নিজে ডাক্তারেব বাড়ি যাইবে, এ ব্যাপারটা সকলের বড়োই অসাধাবণ মনে হইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সকলে ঠিক করিল, হয়তো যামিনীর এমন কোনো অসুখ হইয়াছে যা পরীক্ষা করিতে বিশেষ কোনো যন্ত্রপাতি লাগে, যেসব যন্ত্রপাতি নিয়া ডাক্তারের বাড়িতে আসিবার উপায় নাই। কিন্তু সত্যপ্রিয় নিজে গেল কেন ? যদি বা গেল, কাউকে সঙ্গে নিল না কেন ? এ ভাবে সে তো কখনও কোথাও যায় না !

ডাক্তারের বাড়ি দেখিয়া যামিনী অবাক। মারাত্মক রোগ হইয়াছে তার, মস্ত এক ডাক্তারের বাড়িতে তাকে নিয়া যাওয়া হইতেছে, এই ভাবনায় মুখখানা যামিনীর সর্দিজ্বরের টসটসে ভাবের মধ্যেও শুকনো দেখাইতেছিল। কিন্তু বড়ো ডাক্তার কি গলির মধ্যে এমন একটা ছোটো রংচটা বাড়িতে থাকে, এমন চেহারা হয় তার বসিবার ঘরের ? পুরানো একটা ওষুধের আলমারি, কয়েকখানা কাঠের চেয়ার আর একটা ময়লা কাপড়-ঢাকা কাঠের টেবিল, তাতে পাঁচ-ছখানা ডাক্তারি বই। ঘরের মাঝখানে সবুজ রংকরা চটের পার্টিশন দেওয়া, তার ও পাশে বোধ হয় রোগীকে পরীক্ষা করা হয়।

ডাক্তার সম্ভবত প্রতীক্ষা করিতেছিল, সত্যপ্রিয়কে দেখিয়া খুব বেশি বিস্মিত হইল না। কেবল মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, আসুন, আসুন, বসুন।

একজন মাত্র রোগী বসিয়াছিল, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি যুবক। চেহারাটি শীর্ণকায়, চোখের নীচে কালিপড়া, মুখখানা তেলতেলা। তাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য ডাক্তার বলিল, আচ্ছা, আপনি দিন সাতেক পবে আবার আসবেন। যা যা বললাম করবেন আর ওষুধ দুটো নিয়ম মতো খাবেন।

রাত্রে ঘুম হবে তো ডাক্তারবাবু ?

যুবকটির গলা খুব মোটা কর্কশ কিন্তু কী যে গভীব হতাশা তার প্রশ্ন আর প্রশ্নেব ভঙ্গিতে ! বাত্রিব ঘুমের কথা ভাবিয়া, এখন, এই সকাল বেলাই, সে যেন আতঙ্কে আধমরা হইয়া গিয়াছে।

ডাক্তাব বলিল, হবে। শোবার আগে যে ওষুধটা দিয়েছি, ওটাতেই ঘুম হবে। ঘুম যদি না হয় কাল সকালে একবাব আসবেন।

সত্যপ্রিয় বলিল, তোমার রাত্রে ঘুম হয় না ?

অপবিচিত মানুষের অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে ছেলেটি এমন করিয়া চমকাইয়া উঠিল যেন স্নায়ুর কেন্দ্রে ঘা লাগিয়াছে, চোখেব পলকে মুখখানা তার ফ্যাকাশে হইয়া গেল। সত্যপ্রিয়ের মুখের দিকে এক নজর তাকাইযাই চোখ নিচু করিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

সত্যপ্রিয় প্রচণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ছেলেবেলা থেকে ব্রহ্মচর্যের অভাব ঘটলে তো এ রকম হবেই। কত ছেলে যে এমনি করে আত্মহত্যা করছে ! তাদেরই বা দোষ কী, সব শিক্ষার দোষ। মা-বাপ যদি না খেয়াল রাখে, তারা ছেলেমানুষ, তাদের কী জ্ঞানবুদ্ধি আছে যে ভবিষ্যৎ ভেবে নিজেদের সামলে চলবে ! কী বলেন ডাক্তাববাবু ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বইকী।

ছেলেটি উঠিযা দাঁড়াইযা বলিল, আচ্ছা, আজ আসি ডাক্তারবাবু। বুঝা গেল, পালানোর জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সত্যপ্রিয় বলিল, বোসো একটু, তোমাব ঘুমের জন্য একটা কথা বলে দিই। ওষুধেব চেয়ে এতে তোমাব বেশি কাজ হবে। শোয়াব আগে এক কাজ করবে, মেঝেতে জোড়াসন হয়ে মেবুদণ্ড সিধা করে বসবে। এইখানে তোমার নাভিপদ্ম আছে জানো বোধ হয ? এখানে বাঁহাত দিযে এইভাবে আস্তে স্পর্শ করে থাকবে—আঙুলগুলি যেন সোজা থাকে আর পরস্পবের সঙ্গে লেগে থাকে, বুঝলে ? ডান হাতটি এইভাবে মাথার তালুতে রাখবে। তারপর চোখ বন্ধ করে ভাববে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যত জীবিত প্রাণী আছে সব ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে নিয়ো, কেউ যেন ঘরে না আসে। আর—

ছেলেটি কাতরভাবে বলিল, আজ্ঞে, আমার ঘরে আমার চারটি ভাইবোন শোয়, আমার বাপ-মাও ও ঘরে থাকেন। ঘরে সব সময় লোক থাকে।

অন্য ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করে নিয়ো।

আবেকটা ঘরে দাদা-বউদি শোয়। আর ঘর নেই আমাদের।

ছেলেটি আর দাঁড়াইল না, এক রকম পলাইয়া গেল। এই অবহেলাতেই সত্যপ্রিয় জ্বালা বোধ করে সবচেয়ে বেশি। কেউ শুনিতে চায় না, তার এত দামি দামি কথাগুলি সাধ করিয়া কেউ ধৈর্য ধরিয়া শুনিতে চায় না। না শুনিয়া যাদের উপায় নাই শুধু তারা শোনে, অন্য সকলে পালানোর জন্য ছটফট করে। এত হালকা মানুষের মন ? ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া সত্যপ্রিয় বলিল, এই সব অপদার্থ ছেলের জন্যই দেশটা রসাতলে গেল।

ডাক্তার সায় দিয়া বলিল, নিশ্চয়। ওদের কথা আর বলবেন না।

তারপর পরীক্ষা হইল যামিনীর। তাকে সঙ্গে করিয়া চটের পার্টিশনের ও পাশে গিয়া মিনিট পনেরো পরে আবার ডাক্তার ফিরিয়া আসিল। যামিনীর সুন্দর মুখখানা তখন টুকটুকে লাল হইয়া গিয়াছে। এদিকে আসিয়া সে ঘাড় নিচু কবিয়া সত্যপ্রিয়ের পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্যপ্রিয় বলিল, তুমি গাড়িতে বোসো গিয়ে যামিনী। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে আসছি।

যামিনীকে পরীক্ষা করিল অজানা অচেনা গরিব এক ডাক্তার কিন্তু চিকিৎসা আরম্ভ করিল সত্যপ্রিয়ের পরিচিত মস্ত নামকরা কবিরাজ। যামিনীর জন্য নানা অনুপানের সঙ্গে পাথরের খলে কবিরাজি বড়ি পেষণ করা হইতে লাগিল, অনেক রকম সুপাচ্য ও পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা হইল।

ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা সত্যপ্রিয় সমস্তই মানিয়া নিল, কিন্তু একটা বিষয়ে কবিরাজের সঙ্গে তার মতের মিল হইল না। চিকিৎসার সময়টা যোগামায়াকে আত্মীয়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাবে কবিরাজ ঘাড় নাড়িল।

ভালোর চেয়ে তাতে মন্দই বেশি হবে মনে হয়।

কিন্তু চিকিৎসকেরও সব কথা স্বীকার করা সত্যপ্রিয়ের পক্ষে অসম্ভব, এ যুগের চিকিৎসকরা কী জানে ? জানিলেও সত্যপ্রিয়ের চেয়ে তো বেশি জানে না!

ব্রহ্মচর্য পালন না করলে শুধু ওষুধ আর পথ্যে কী ফল হবে কবরেজ মশায় ?

কবিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিল, স্বামী-স্ত্রীকে গায়ের জোরে তফাত করলেই কি ব্রহ্মচর্য পালনের ব্যবস্থা হয়ে যায় ? ওদের দেখাসাক্ষাৎ হতে না দিলে ফলটা খারাপ হবে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কবিরাজ একটু ভাবিল, তারপর বলিল, তা ছাড়া, আমার মনে হয় সবটাই আপনার অনুমান, আপনার জামায়ের কোনো চিকিৎসার দরকার ছিল না। শ্রীমানের স্বাস্থ্য তো এমন কিছু খারাপ নয় ! ওর মানসিক স্বাস্থ্যই বরং একটু খারাপ যাচ্ছে !

তা বলতে কী বুঝাচ্ছেন ?

বুঝাচ্ছি যে শ্রীমানের মনটা একটু বিকারগ্রস্ত, কোনো আঘাত-টাঘাত পেয়েছে মনে কিংবা অনেকদিন থেকে কোনো দুঃখকষ্ট সহ্য করে আসছে। ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা না করে খুব হইচই ফুর্তি করে দিন কাটাবার ব্যবস্থা করলেই বোধ হয় ভালো হত।

হইচই ফুর্তিটা কী রকম ?

এই মনের আনন্দে থাকা আর কী। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হাসি-তামাশা করা, খেলাধুলা ভালো লাগলে তাই করা, দেশ-টেশ বেড়ানো, ভালো লাগলে শিকার-টিকারে যাওয়া—কী জানেন, সবাইকার তো এক জিনিস পছন্দ নয়, যার যেদিকে মন যায়। একেবারে মদটদ খেয়ে গোল্লায় যাবার ব্যাপার যদি না হয়, বেশি বাঁধাবাঁধির চেয়ে অল্পবিস্তর অসংযমও ভালো। শ্রীমান বড়ো বেশি ভয়ে ভাবনায় দিন কাটায়—

কীসের ভয় ভাবনা ?

সত্যপ্রিয়ের মুখ দেখিয়া কবিরাজ কথার মোড় ঘুরাইয়া নিল। যে চিকিৎসা চায় উপদেশ চায় না, তাকে যাচিয়া উপদেশ দিয়া লাভ কী !

কবিরাজের সঙ্গে আলোচনার কয়েক দিন পরেই সত্যপ্রিয় মেয়েকে দেশে পাঠানোর আয়োজন করে। দেশের বাড়িতে আত্মীয়স্বজন আছে। সত্যপ্রিয়ের এক পিসতুতো বোন স্বামী-পুত্র নিয়া অনেকদিন হইতে এখানে আছে, হঠাৎ তার দেশে গিয়া বাস করার শখ চাপিল। সত্যপ্রিয়ের ইঙ্গিতে অনেকের মনে অনেক রকম শখই জাগিয়া থাকে। ঠিক হয়, যোগমায়াও এদের সঙ্গে যাইবে।

প্রথমে যোগমায়া কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দেয়, তারপর যখন বুঝিতে পারে তাকে দেশে পাঠানোর ইচ্ছাটা সত্যপ্রিয়ের, তখন সে মুখভার কবিয়া বলে, না বাবা, আমি এখন কোথাও যাব না।

সত্যপ্রিয় বলে, কদিন বেড়িয়ে আয়। বিয়ের পর দেশের সবাই তোকে দেখতে চাচ্ছে।

শুনিয়া যোগমায়া আর আপত্তি করে না। মেয়েজামাইকে দেশের আত্মীয়স্বজনকে দেখাইবার ইচ্ছা যদি সত্যপ্রিয়ের হইয়া থাকে, সে তো ভালো কথা। স্বামীর সঙ্গে সর্বত্র যাইতেই সে রাজি আছে।

দুশো টাকা দেবে বাবা আমায় ?

বিয়ের পর তুই যে হরদম টাকা নিচ্ছিস !—কী কববি টাকা দিয়ে ?

নতুন রকম একটা গয়না কিনব। আজকেই দাও বাবা—আজকেই কিনব।

বিবাহের পর বাপের ভয়টা যেন যোগমায়ার একটু কমিয়াছে—সব মেয়েরই কমে। বিবাহেব পর খুব কড়া মেজাজের বাপও মেয়ের সঙ্গে একটু খুশি মেজাজেই মেলামেশা কবে, মেয়েকে কিছু স্বাধীনতা দেয়। বাপ ও মেয়ের মধ্যে অতিরিক্ত একটা সম্পর্ক যেন কোথা হইতে কীভাবে গড়িয়া উঠে।

কিন্তু যোগমায়া যখন টের পায় তাকে একাই যাইতে হইবে যামিনী সঙ্গে যাইবে না, তখন সে হঠাৎ বাঁকিয়া বসে। না, তার যাইতে ইচ্ছা করিতেছে না, সে যাইবে না। শরীরটা ভালো নয় তাব। এই গা ম্যাজম্যাজ করিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে, আরও অনেক কিছু হইয়াছে।

সন্তানেব এ বকম মুখোমুখি অবাধ্যতার অভিজ্ঞতা সত্যপ্রিয়ের জীবনে এই প্রথম। প্রথমটা সে কেমন থতোমতো খাইয়া যায়। তারপর ক্রোধে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে থাকে।

পিসতুতো বোন বলে, কী করব দাদা, যাব ! মায়া তো কিছুতে যেতে রাজি নয়। যামিনীর এমন অসুখের সময় ওকে ফেলে কোথাও যেতে চায় না।

তোমাদের সকলেব মাথায় গোবর ভবা।

নিজের দোষটা বুঝিতে না পারিলেও পিসতুতো বোন মন্তব্যটায় সায় দিয়া চুপ করিয়া থাকে।

দিন তিনেক পবে সত্যপ্রিয় জামাইকে তার ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলে, যামিনী।

যামিনী বলে, আজ্ঞে ?

তোমার ভালোর জন্যেই বলা।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

জীবনে উন্নতি করতে হলে অভিজ্ঞতা চাই।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমাদের দিল্লি ব্রাঞ্চের সাব-ম্যানেজার ক-মাসের ছুটি নিয়েছে। তার জায়গায় তুমি গিয়ে কাজ করে আসতে পারবে না ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পারব বইকী।

ক্রুদ্ধ আহত মনে যামিনীর বিনয়ে একটু শান্তি বোধ হয়। নিজের মেয়ের চেয়ে পরের ছেলেই ভালো। শ্বেতপাথরের মেঝেতেই দুজনে বসিয়াছিল, যামিনী ঘাড় নিচু করিয়া উশখুশ করিতে থাকে। কী যেন বলিতে চায় কিন্তু বলিতে পারে না।

কবে যেতে হবে ?

কালকেই রওনা হয়ে যাও। নিয়মমতো ওষুধপত্র খেয়ো। কবরেজমশায়কে বলে দেব, ডাকে ওষুধ পাঠিয়ে দেবেন। আর সকাল সন্ধ্যায় একটু যে যোগাভ্যাস শিখিয়ে দিয়েছি—

আমার কিছু টাকার দরকার ছিল।

সত্যপ্রিয় হঠাৎ চুপ করিয়া যায়। কতগুলি বিষয়ে বুদ্ধিটা খুবই ধারালো, হঠাৎ তার মনে হয় জামাইয়ের সম্বন্ধে একটা নতুন তথ্য যেন আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছে।

কত টাকা ?

পাঁচশো।

খুব লজ্জার সঙ্গে ভয়ে ভয়েই যামিনী টাকার আবেদন জানাইয়াছে, তবু সত্যপ্রিয়ের মনে হয় মাঝে মাঝে দু-একজন তাকে ফাঁদে ফেলিয়া যেভাবে টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করে, যামিনীর টাকার দাবিটা যেন কতকটা সেই ধরনের। আপিসে নামমাত্র কাজের জন্য হাতখরচ বাবদ যামিনীকে মাসে মাসে দুশো টাকা দেওয়া হয়। খরচ তার কী যে দুশো টাকাতেও কুলায় না ? গম্ভীর হইয়া সত্যপ্রিয় একটু ভাবে, তারপর চেক বই বাহির করিয়া পাঁচশো টাকার চেক লিখিয়া দেয়।

সারাটা দিন তার কেবলই মনে হইতে থাকে, চঞ্চলভাবে ছুটাছুটি করিতে করিতে হঠাৎ যেন দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া সে শান্ত হইয়া গিয়াছে। একটা অদ্ভুত স্তব্ধতাভরা শান্তির শান্তভাব।

যামিনী দিল্লি রওনা হইয়া যায় আর অতদূরে অসুস্থ স্বামীকে কাজ করিতে পাঠানোর জন্য বাপের ওপর রাগ করিয়া যোগমায়া বাড়ির সকলের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দেয়। শুনিয়া সত্যপ্রিয় নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, সকলে কী অকৃতজ্ঞ ! যার ভালোর জন্য যা করি তাতেই তার রাগ হয়।

মাস দুই পরে পিসতুতো বোন একদিন সত্যপ্রিয়কে একটা খবর দেয়। শুনিয়া প্রথমটা সত্যপ্রিয় কথাটা বিশ্বাস করিতেই চায় না।

কার ছেলে হবে ?

মায়ার। এই চার মাস।

সংবাদটা এমন খাপছাড়া মনে হয় যে সত্যপ্রিয় তবু বোকার মতো আবার জিজ্ঞাসা করে, ভুল হয়নি তো তোমাদের ?

দিল্লির সাব-ম্যানেজার তিন মাসের ছুটি নিয়াছিল। যামিনী তিন মাস কাজ করিবার জন্য সেখানে গিয়াছে। দু-চারদিনের মধ্যেই তাকে সেখানে স্থায়ী করার নির্দেশপত্র পাঠানোর কথাটা সত্যপ্রিয় ভাবিতেছিল। এবার একেবারে চুপ করিয়া যায়। সহজে সত্যপ্রিয় লজ্জা পায় না, হঠাৎ যেন মেয়ের কাছে মুখ দেখাইতে তার লজ্জা করিতে থাকে। কেবল মেয়ের কাছে নয়, আরও অনেকের কাছে। জানিয়া বুঝিয়া ইচ্ছা করিয়া সত্যপ্রিয় অনেক ব্যাপারে বাহাদুরি করিয়াছে, এমন অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে যেদিকে তার তাকানোই উচিত ছিল না, কিন্তু কারও কাছে কোনোদিন এতটুকু সংকোচ বোধ করে নাই। মনে মনে বরং নিজের সর্বব্যাপী প্রভুত্বে গর্বই অনুভব করিয়াছে। কিন্তু মেয়ে আর জামাইয়ের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়া এত বড়ো একটা ভুল করার জন্য সংকোচ বোধ না করার ক্ষমতা সেও নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পায় না।

ছি, কী কদর্য ভুল !

মাসখানেক পরে যামিনী ফিরিয়া আসিল। শোনা গেল, যোগমায়ার মুখে নাকি হাসি ফুটিয়াছে।

দিন পনেরো পরে একদিন সকালে যামিনী মুখ কাঁচুমাচু করিয়া সত্যপ্রিয়ের কাছে শ-তিনেক টাকা চাহিল। তার বিশেষ দরকার।

সত্যপ্রিয় বলিল, সেদিন তোমায় পাঁচশো টাকা দিয়েছি যামিনী।

সন্ধ্যার পর যোগমায়া আসিয়া আবদার করিয়া বলিল, আমায় তিনশো টাকা দেবে বাবা ?

সত্যপ্রিয় বলিল, সেদিন তোকে দুশো টাকা দিয়েছি মায়া।

পরদিন শোনা গেল, যোগমায়ার মুখ নাকি কালো হইয়া গিয়াছে। চোখ দেখিয়া বুঝা গেল, রাত্রে খুব কাঁদিয়াছে। ঘুম ভাঙার পর হইতে যামিনীর আপিস যাওয়া পর্যন্ত একবার ধারেকাছেও ঘেঁষিল না দেখিয়া বুঝা গেল, দুজনে ঝগড়া হইয়াছে।

সন্ধ্যার পর মেয়েকে ডাকিয়া সত্যপ্রিয় তিনশো টাকার একখানা চেক তার হাতে দিল। যোগমায়া নীরবে চেক হাতে করিয়া চলিয়া গেল।

আপিসে সেদিন একজন লোক সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। মহীতোষ তার কাছে সাড়ে তিন হাজার টাকা ধার নিয়াছিল, যতদিন পারে অপেক্ষা করিয়া একেবারে শেষদিন লোকটি অগত্যা সত্যপ্রিয়ের কাছে আসিয়াছে।

কোটিপতি মানুষ আপনি, আপনার ছেলের নামে এ কটা টাকার জন্য নালিশ করব ? আমি কি পাগল ? আমি জানি আপনার কাছে এসে দাঁড়ালেই টাকা পাওয়া যাবে। দুমাস ছমাস অপেক্ষা করব তাতে আর কথা কী ? তবে কী জানেন, হঠাৎ বড়ো দরকার পড়ে গেল টাকাটাব—আজকের মধ্যে না পেলে নয়।

পরদিন কোর্টে নালিশ বুজু না কবিলে দেনাটা তামাদি হইয়া যাইবে।

সত্যপ্রিয় নীরবে একটা চেক লিখিয়া দিয়াছিল।

অন্ধকার ঘবে চুপ করিয়া বসিয়া সত্যপ্রিয ভাবিতে থাকে। দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতির সমস্যার কথা নয়। অন্যকথা।

বুদ্ধিটা সত্যপ্রিয়েব সত্যই তীক্ষ্ণ। কিন্তু কতকগুলি ব্যাপারে মানুষেব তীক্ষ্ণবুদ্ধি বুঝিবার কাজেই শুধু লাগে. মানুষ বুঝিতে চায় না। সত্যপ্রিয় জানে, একই মানুষের মধ্যে এ বকম সমাবেশ ঘটে না, তবু সে আশা করে গরিব মা-বাপকে পাঠানোর জন্য জামাই তার যদিও বা যোগমায়াকে কষ্ট দিয়া তার কাছে টাকা আদায় করার উপায়টা অবলম্বন কবিয়াছে, মানুষটা সে আসলে ভালো. মনটা তাব নিশ্চয় নবম, টাকার ব্যবস্থার জন্য ছাড়া অন্য কোনো কারণেই তার মেয়েকে হয়তো কষ্ট দেয় না। যামিনী যে বাপকে পাঠানোর জন্য টাকা আদায় কবে সম্প্রতি এটা সত্যপ্রিয় টের পাইয়াছে।

টাকা আদায় করিবার উপায় থাকিলে, তা সে স্ত্রীর উপর চাপ দিয়াই হোক আর যেভাবেই হোক, টাকা আদায় করাকে সত্যপ্রিয় বিশেষ সৃষ্টিছাড়া ব্যাপাব বলিয়া মনে করে না, খুব বেশি অন্যায় বলিয়াও গণ্য করে না। যত মানুষকে সে চেনে তারা সকলেই টাকা টাকা করিয়া পাগল। কেবল নিজের মেয়েজামাইয়ের ব্যাপারে বলিযাই তার একটু খারাপ লাগিতেছে।

নরনারীর সম্পর্কে যে মনের মিল বলিয়া একটা খুব বড়ো রকমেব ব্যাপার আছে, সোজাসুজি অবিচার অত্যাচার না করিয়া, এমনকী রীতিমতো ভালো ব্যবহাব করিযাও যে একজন আবেকজনকে অবহেলা কবিতে পাবে, মিষ্টি ভদ্রতার সম্পর্ক আর স্নেহ-মমতার সম্পর্কের মধ্যে যে তফাত অনেক, সত্যপ্রিয় তা প্রায় ভুলিযাই গিয়াছে। পুরুষমানুষ যদি অকাবণে মেয়েমানুষকে মারধোর গালাগালি না করে, তবে আর মেযেমানুষের সুখের জন্য কী দবকার হইতে পারে সে বুঝিতে পারে না।

কিন্তু যোগমায়ার অসুখী মন আজকাল নানাদিক দিযা নানাভাবে আসিয়া তাকে ক্রমাগত আঘাত করে। সাধারণ অবস্থায় হয়তো সে খেয়ালও করিত না, কিন্তু এদিকে এখন তার মন গিযাছে। দেশের স্বাধীনতা চাহিলে যে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না বরং না চাইলেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাওয়া যায় এই সমস্যার মতো, কন্যার বিবাহিত জীবনটাও তার কাছে এখন একটা সমস্যা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মেয়ে যে অসুখী হইয়াছে এর চেয়ে তার যেন বেশি যন্ত্রণা বোধ হয় এই ভাবিয়া যে সে মেয়েকে সুখী করিবার জন্য নিজে পাত্র ঠিক করিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়াছে, অথচ মেয়ে সুখী হয় নাই।

ব্যাবসার একটি সমস্যার মতো ব্যাপারটাকে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে করিতে কয়েক দিনের মধ্যেই খুব ভালো একটি সমাধান আবিষ্কার করিয়া ফেলে। ব্যাপারটা তো মূলত এই। মেয়েকে সুখী করার ভার সে জামাইয়ের উপর ছাড়িয়া দিয়াছে এবং সে জন্য খরচ করিয়াছে অনেক টাকা। তার মেয়েকে সুখী করার দায়িত্বটা জামাইয়ের। জামাই যদি কাজটা না পারিয়া থাকে, তাকে বুঝাইয়া

দেওয়া দরকার দায়িত্বটা সে পালন করিতে পারে নাই। সেই সঙ্গে এটাও বুঝাইয়া দেওয়া দরকার, দায়িত্বটা ভালোভাবে পালন না করিলে তার নিজের অবস্থাটাও সুবিধা দাঁড়াইবে না। অনেক কর্মচারী আর এজেন্টের ভোঁতা মাথায় এই জ্ঞানটুকু ঢুকাইয়া দিয়া অনেক দায়িত্বপূর্ণ কঠিন কাজ সে করাইয়া নিয়াছে।

এই সহজ কথাটা এতদিন কেন মনে হয় নাই ভাবিয়া সত্যপ্রিয় একটু আশ্চর্য হইয়া যায়। একদিন যামিনীকে ডাকিয়া বলে, বাবা, তোমার মনের অবস্থাটা বড়ো খারাপ দেখছি। তোমার মুখ দেখে যোগমায়ার মুখখানাও সব সময় শুকিয়ে থাকে। তা তুমি এক কাজ করো, কদিন বাপ-মার কাছে থেকে এসো গে। আজকেই চলে যাও, এই বেলা, এইমাত্র—জিনিসপত্র থাক।

যামিনী আমতা আমাত করিয়া বলিবার চেষ্টা করে, আজ্ঞে, আমার মনের অবস্থা—

পথের খরচ ব'বদ এই চার টাকা দিলাম—গাড়িভাড়া তিন টাকা চোদ্দো পয়সা, নয় ? মন সুস্থ না করে, মানে, মনের অবস্থা না বদলে এসো না।

একঘণ্টার মধ্যে জামাই বিদায় হইয়া গেল।

জামাইকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ভাবিতে গেলে সকলের মাথা ঘুরিয়া যায়। তাও কি সম্ভব ? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সকলে ভাবে, ভিতরে কিছু আছে। কোনো কাজে যামিনীকে পাঠানো হইয়াছে, কোনো উদ্দেশ্যে। সত্যপ্রিয়ের অদ্ভুত কাজ আর উদ্দেশ্যের তো অন্ত নাই।

কিন্তু কাজটা কী ? কী উদ্দেশ্য সত্যপ্রিয়ের ?

রওনা হওয়ার সময় সত্যপ্রিয় যামিনীকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, তোমায় কেন পাঠিয়ে দিচ্ছি বুঝতে পেরেছ তো বাবাজি ?

আজ্ঞে না, ঠিকমতো—

এত করিয়াও যদি না বুঝানো গিয়া থাকে তবে আর এ অপদার্থের কাছে কী আশা করা যায় ! সত্যপ্রিয় বড়োই ক্ষুণ্ণ হয়।

বুঝতে পারলে লিখে জানিয়ো। আমি সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থা করব ফিরে আসাব।

আজ্ঞে হ্যাঁ, জানাব বইকী, নিশ্চয়।

যামিনী চলিয়া গেলে সত্যপ্রিয় ভাবে, মাসে মাসে এতগুলি টাকা হাতে পাইয়া আর এমন আরাম ও উৎসবের মধ্যে দিন কাটাইয়া গিয়া টাকা আর আরামের অভাবটাও যদি সেখানে তাকে আসল ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতে না পারে, তবে আর কিছু না বুঝাইলেও চলিবে।

তবু, কয়েক দিন পরেই সে যামিনীর কাছে একখানা পত্র পাঠাইয়া দেয়। জামাইয়ের কাছে এ রকম কবিত্বপূর্ণ পত্র লেখা সত্যপ্রিয়ের মতো মানুষের পক্ষে শুধু নয়, অনেকের পক্ষেই উদ্ভট আর খাপছাড়া। সত্যপ্রিয়ের পত্রের মর্ম এই যে, বিবাহের পর হইতে মেয়ের মুখ তার বিষণ্ণ, যাই হোক, এবার যামিনী ফিরিয়া আসিবার পর বোধ হয় তার মুখে হাসি ফুটিবে : অন্তত যামিনী যে হাসি ফুটাইবে তাতে সন্দেহ নাই।

ছয়

যশোদা ভাবিয়াছিল, শ্রমিকদের সঙ্গে তার সম্পর্ক বুঝি চিরকালের জন্য চুকিয়া গিয়াছে। বহুদিন নিজের বাড়ি দুটিতে অনেকগুলি ওই শ্রেণির নরনারীকে আশ্রয় দিয়া, দুবেলা কুড়ি-বাইশজনের জন্য ভাত রান্না করিয়া, এখানে-ওখানে দু-চারজনের কাজ জুটাইয়া দিয়া, বিপদে-আপদে পরামর্শ দিয়া আর সাহায্য করিয়া তার মনে একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল, ঠিক ও ভাবে ছাড়া এ সব মানুষের সঙ্গে আর কোনোরকম সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে না।

সম্পর্কটা গড়িয়া উঠিয়াছিল আপনা হইতে, স্বাভাবিকভাবে। প্রথমে ওদের কেবল ভাড়াটে হিসাবে যশোদা বাড়িতে থাকিতে দিয়াছিল মাত্র, ওদের সুখদুঃখ ভালোমন্দের ভাবনাটাও যে তাকে একদিন ভাবিতে হইবে সে তখন এ কথাটা কল্পনাও করিতে পারে নাই। চোখের সামনে এই শ্রেণির জীবগুলির কয়েকজন প্রতিনিধির জীবনযাপনের প্রক্রিয়া দেখিতে দেখিতে যশোদা টের পাইয়াছিল, এরা সব বয়স্ক শিশুমাত্র, অভাবে আর চাপে খানিকটা বিগড়াইয়া গিয়াছে। একটু একটু করিয়া তখন মায়া জাগিয়াছিল যশোদার মধ্যে। একটু একটু করিয়া তারপর সে জড়াইয়া গিয়াছিল ওদের জীবনের সঙ্গে। চাঁদের জন্য সব সময় যশোদার মনটা তখন হুহু করিত, এতগুলি বয়স্ক শিশুকে পাইয়া শোকটা তার কমিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু ওরা তাকে ত্যাগ করিয়াছে। সত্যপ্রিয়ের কারসাজিতে আর তাকে ওরা বিশ্বাস করে না। তাকে শত্রু জানিয়া, তাব সংস্পর্শে আসিলে বিপদ জানিয়া, সকলে তফাতে সবিয়া গিয়াছে। ওদের ভালোবাসিবার ভান করিয়া সে উপরওয়ালাদের স্বার্থসাধনের সাহায্য করে, ওদের ন্যায্য দাবি ত্যাগ করায়, ধর্মঘট ভাঙিয়া দেয়, কাজ হইতে তাড়ায়। এতকাল পরে যশোদার সম্বন্ধে ওদের এই ধারণা জন্মিয়াছে !

অর্থহীন অভিমানকে প্রশ্রয় দেওয়াব মানুষ যশোদা নয়, কোনো ব্যাপাবকে ব্যক্তিগত কল্পনাব বাম্পে সে ফাঁপাইয়া তোলে না। বাঁচিয়া থাকাটাই যাদের পক্ষে একটা বীভৎস সংগ্রাম, অত কৃতজ্ঞতার ধার ধারিলে কি তাদের চলে ? কৃতজ্ঞতাও ওদের যথেষ্ট আছে। কাজ না থাকার সময় দুদিন যাকে যশোদা খাইতে দিয়াছে, কাজ পাওয়ার পরেও যশোদার একটি ধমকে সে যে কাঁদো-কাঁদো হইয়া যাইত, বসিয়া বসিয়া যশোদা দু-দণ্ড সুখদুঃখের গল্প করিলে সকলে যে কৃতার্থ বোধ করিত, এ কি কৃতজ্ঞতা নয় ? কিন্তু যখন জানা গেল যশোদা তলে তলে তাদের ক্ষতিই করে, যশোদার বাড়িতে থাকিলে কাজ থাকে না, শ্রমিক সমিতি হইতেও যখন উপদেশ দেওয়া হইতে লাগিল যশোদাকে বর্জন করিবার, ওদের তখন আর কী করিবার ছিল ?

এ সব কথা যশোদা ভাবিয়াছে। কিন্তু মন তার অবুঝ হইয়া পড়িয়াছে, কিছুই আর মানিতে চায় না। সুবর্ণকে নিয়া উধাও হইয়া গিয়া নন্দ তাকে আরও বেশি কাবু করিয়া দিয়াছে। নিজেকে যশোদার কেমন অপবাধী মনে হয়। মনে আর জোর পায় না। যুক্তিতর্ক দিয়া মনকে বুঝাইয়া মনের জোর তো আর বাড়ানো যায় না।

তাই, কেবল শ্রমিকরা যে তাকে ত্যাগ করিযাছে তা নয়, সেও এক রকম ওদের ত্যাগ করিয়াছে। সত্যপ্রিয় মিলেব কেউ না আসুক, অন্য মিলের অনেকে মাঝে মাঝে যশোদার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, কেউ আসিয়াছে বিপদে পড়িয়া, কেউ আসিয়াছে কাজের সন্ধানে, কেউ আসিযাছে নিছক দু-দণ্ড যশোদার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিবার জন্য। সকলে যে তাকে ত্যাগ করে নাই তার এতবড়ো একটা প্রমাণও যশোদাকে কিন্তু খুশি করিতে পারে নাই।

সোজাসুজি কড়া সুরে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কী চাই ?

কী চাই অর্ধেকটা শুনিতে না শুনিতে বলিয়াছে, আমি পারব না। আমার কাছে এসেছ কেন ?

মনটা যশোদার সত্যিই একটু বিগড়াইয়া গিয়াছে।

তবু মনের কোণে হয়তো যশোদার ক্ষীণ একটু আশা বা ইচ্ছা ছিল, একদিন আবার বাড়িতে তার কুলিমজুরেরা বাসা বাঁধিবে, আবার সে দুবেলা ওদের ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইবে। কিন্তু রাজেনের প্ররোচনায় বাড়িতে ভদ্র ভাড়াটেদের আনিবার পর সে আশাও যশোদার ঘুচিয়া গিয়াছে। তাছাড়া, যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তার বাড়ির চারিদিকের শহরতলিতে, তাতে কুলিমজুরদের এখানে আর বাস

করাও বোধ হয় সম্ভব নয়। চারিদিকের শহুরে ভদ্র আবহাওয়ার চাপে বেচারাদের দম আটকাইয়া আসিবে, এক মুহূর্তের স্বস্তি থাকিবে না।

কিন্তু আবার অন্যদিক দিয়া কুলিমজুরদের সঙ্গে যশোদার যোগাযোগ টিকিয়া গেল।

একদিন রাজেন মাঝবয়সি এক ভদ্রলোককে আনিয়া হাজির, যশোদার সঙ্গে আলাপ করিবে। কেন আলাপ করিবে, মানুষটার নাম কী, কী করে, কিছুই রাজেন প্রথমে বলিল না। লোকটিও ঘণ্টাখানেক এ-বিষয়ে সে-বিষয়ে এলোমেলো আলোচনা করিয়া উঠিয়া গেল। আলাপ করিতে যে আসিয়াছে সে শুধু আলাপ করুক, যশোদার তাতে কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু এ কোন দেশি আলাপ ? একেবারে যেন অনেকদিনের পরিচয় ছিল, খানিকক্ষণ বসিয়া বাজে গল্পে আনন্দ করিয়া চলিয়া গেল। লোকটি বসিয়া থাকিতে থাকিতে যশোদা কয়েকবার রাজেনের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কিন্তু লোকটি বিদায় হওয়ার আগে তার কাছে একটি কথাও শুনা গেল না।

'আসছি' বলিয়া লোকটির সঙ্গে উঠিয়া গিয়া রাজেন ফিরিয়া আসিল।

কেমন লাগল লোকটিকে চাঁদের মা ?

তা যেমনি লাগুক, আগে বলো তো শুনি মানুষটা কে ?

খুব নামকরা লোক গো—বিধুবাবু।

বিধুবাবুর নাম যশোদাও শুনিয়াছে, শ্রমিক নেতা হিসাবে লোকটি সত্যই এতখানি বিখ্যাত যে এভাবে বাড়ি আসিয়া যশোদার সঙ্গে আলাপ করিয়া যাওয়া সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার !

বিধুবাবু ! বিধুবাবু আমার সঙ্গে আলাপ করতে এলেন কেন ?

রাজেনের চেয়ে সে কথা বিধুবাবুই যশোদাকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া বলিল, দিন তিনেক পরে। আবার তেমনিভাবে অসময়ে আসিয়া আলগোছে একটি মোড়াতে বসিয়া বলিল, তাহলে পরশুর সভাতে যাচ্ছ তো দিদি ?

আগের দিন বিধুবাবু তাকে তুমিও বলে নাই, দিদিও বলে নাই। যশোদা আশ্চর্য হইয়া বলিল, কীসের সভা ?

বিধুবাবু আরও বেশি আশ্চর্য হইয়া বলিল, কেন, রাজেন বলেনি ?

কই, না ?

সঙ্গে সঙ্গে বিধুবাবুর হাসির শব্দে যশোদার বাড়ি সরগরম হইয়া উঠিল।—তা রাজেন ওই রকম মানুষই বটে ! আমি কে তা তো বলছে, না তাও বলেনি ?

প্রথমে বলেনি, আপনি যাওয়ার পর বলেছে।

যশোদারও হাসি আসিতেছিল। প্রথম দিন বিধুবাবুর তবে ধারণা ছিল যশোদা তার নামধাম আর দেখা করিতে আসার উদ্দেশ্য সমস্তই জানে, তাই পরিচয়ও দেয় নাই, কাজের কথাও বলে নাই। লোকটিকে যশোদার ভালো লাগিতে থাকে। এ রকম লোক ভালো, যারা অকারণে প্রথম পরিচয়ের দিন অনাবশ্যক ব্যগ্রতার সঙ্গে বড়ো বড়ো কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া আরও বড়ো প্রয়োজন যে চেনা হওয়া, তাতে বাধা সৃষ্টি করিয়া বসে না।

দুদিন পরে শ্রমিকদের একটি সভা হইবে, সাধারণ সভা। প্রথমে কর্মীদের সভা, তারপর শ্রমিকদের। বিধুবাবু যশোদাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়া যাইতে চায়, ব্যাপারটা একটু দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া আসিবে। তারপর যশোদার যদি ইচ্ছা হয়, সমিতির মধ্যে ভিড়িয়া গিয়া একটু কাজ করিতে চায় সে তো আনন্দের কথা। আর ভিড়িতে যদি না চায় নাই ভিড়িবে। একবার গিয়া দেখিয়া আসিতে দোষ নাই।

সমিতি-টমিতির সঙ্গে কী আমার বনবে বিধুবাবু ? সমিতির লোকেরা আমার ওপর চটে আছে, কত কথাই রটিয়েছে আমার নামে:

ও সব লোকেশবাবুর কাজ দিদি। লোকেশবাবুর একটু বাড়াবাড়ি আছে কিনা সব বিষয়ে, সমিতির মেম্বার না হয়ে কেউ শ্রমিকদের ভালো করবে তা পর্যন্ত সহ্য হয় না। আগের কথা ভুলে যাও দিদি, তোমাকে আমাদের চাই।

অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিয়া যশোদা সভায় যাইতে রাজি হইয়া গেল।

বিদায় নেওয়ার আগে যশোদা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আমার কথা শুনলেন কার কাছে ? রাজেন বলেছে বুঝি ?

বিধুবাবু বলিল, সত্যপ্রিয় মিলের কাণ্ডটার সময় আমি ছিলাম পশ্চিমে। এসে অনেক রকম কথা শুনলাম। তোমার কথা তো আগে থেকে সব জানতাম দিদি, তাই শুনে মনে হল, এ তো বড়ো খাপছাড়া ব্যাপার হচ্ছে। তারপর রাজেন একদিন আমায় বললে বসে বসে মরচে ধরায় বড়ো নাকি কষ্ট পাচ্ছ। আমারও একটু দরকার ছিল, তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম। সত্যপ্রিয় মিল বড়ো করেছে জানো ?

শুনেছি।

বিধুবাবু খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যশোদার মুখের ভাব দেখিতে থাকে। বড়ো ধারালো দৃষ্টি বিধুবাবুর, দেখিলেই বুঝা যায় মানুষটা সে ভয়ানক নিষ্ঠুর। তবে এটুকু যশোদা আগেই বুঝিয়াছিল, অন্যাকে কষ্ট দিয়া আনন্দ পাওয়ার নিষ্ঠুরতা এটা নয়, এ নিষ্ঠুরতা জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া, যে প্রতিক্রিয়ায় মনের কোমলতা আর ভাবপ্রবণতা গোড়াসুদ্ধ উপড়াইয়া যায়। সাধারণ আলাপেই এটা বেশ বোধগম্য হয়। তাছাড়া, যেভাবে বিধুবাবু হাসে তার মধ্যেও তার মনের এ পবিণতির প্রমাণ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এ রকম হাসির সঙ্গে যশোদার পরিচয় আছে, তার পরিচিত আবেক জন লোক এ ভাবে হাসিত। সমস্ত ব্যাপারে যারা কৌতুক বোধ করে, মর্মান্তিক বেদনায় কাঁদিবার সময়ও একজনকে খাপছাড়া মুখেব ভঙ্গি করিতে দেখিয়া যাদের হাসি পায়, কেবল তারাই এ রকম হাসি হাসিতে পারে।

এ রকম লোককে কিন্তু এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস কবা যায়। এদেব আব যাই থাক, কিছুমাত্র স্বার্থপরতা থাকে না। পরের জন্য বেশি মন না কাঁদুক, নিজের ভাবনাটা এরা একেবারেই ভাবে না।

সেদিন খাওয়াব সময় সুব্রতা বলিল, আমরাও আজ এক জায়গায় যাচ্ছি দিদি।

অজিত তাকে আজ সিনেমায় নিয়া যাইবে। খববটা দেওযার সময় সুব্রতা মুচকি মুচকি হাসে। যশোদাও হাসে।

আমায় নিয়ে যাবে না ?

তুমি না কোথায় যাচ্ছ আজকে ?

ও, তাই আজ তোমরা সিনেমায় যাচ্ছ, আমায় ফাঁকি দেবার সুযোগ পেয়ে !

বলিয়া প্রচণ্ড শব্দে যশোদা হাসিতে থাকে। এই সামান্য পরিহাসে এত জোরে হাসিবার কী ছিল সেই জানে, হাসিটা বিধুবাবুর মতো হইতেছে খেয়াল করিয়া হঠাৎ সে থামিয়া যায়।

তারপর সুব্রতা যে খবরটা দেয় সেটা একটু মারাত্মক। একজনের গাড়িতে তাবা সিনেমায় যাইবে, এদিকেই কোথায় সত্যপ্রিয় বলিয়া একজন মস্ত বড়োলোক থাকে, তার ছেলের গাড়িতে। কবে যেন অজিত তার সঙ্গে কোন স্কুলে পড়িয়াছিল, হঠাৎ কদিন আগে দেখা হইয়া গিয়াছে। তারপর তাদের পরামর্শ হইয়াছে পরস্পরের বউকে নিয়া আজ তারা একসঙ্গে সিনেমায় যাইবে, আলাপ পরিচয়ও হইবে, একটু আনন্দও করা হইবে।

পাকা গিন্নির মতো মুখ করিয়া সুব্রতা বলিতে থাকে, আমার কি আর সিনেমা-টিনেমায় যাওয়ার শখ আছে দিদি ? কী করব, বন্ধু বড়ো ধরেছে। ও কী বলছিল জানো দিদি ? বন্ধুর বাপ নাকি বউকে নিয়ে ছেলের কোথাও যাওয়া দুচোখে দেখতে পারে না, ভীষণ চটে যায়। সেকেলে ভূত আর কী। বাপ নাকি কোথায় গিয়েছে কদিনের জন্য, ছেলেও বউকে নিয়ে খুব বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

মহীতোষকে যশোদা জানে, ছেলেটার বুদ্ধি একটু কাঁচা। সকলে তাকে সেকেলে, গেঁয়ো আর অসভ্য মনে করে ভাবিয়া বড়োই মনের কষ্টে সে দিন কাটায়। বাহিরের লোকের সঙ্গে কথায় ব্যবহারে সে বিনয়ের অবতার, যশোদার সঙ্গে পর্যন্ত এমন মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কথা বলে যে দেখিলে হাসিও পায়, মমতাও হয়। রাতে ঘুমের মধ্যেও হয়তো বাপের ভয়ে মহীতোষ চমকিয়া জাগিয়া ওঠে, কিন্তু বাড়িতে যারা আশ্রিত ও আশ্রিতা, আফিসে ও কারখানায় যারা জীবিকার প্রত্যাশী তাদের সঙ্গে তার ব্যবহার বড়ো খারাপ। কথায় কথায় কারণে অকারণে রাগিয়া যায়, অপমান করে। অজিতের সঙ্গে মহীতোষের বন্ধুত্ব না হয় আছে, কিন্তু মহীতোষ কি জানে না বন্ধু তার যশোদার বাড়িতে থাকে ? যশোদার বাড়ির ভাড়াটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার সাহস সে পাইল কোথায় ?

শ্রমিক সমিতির সভায় গিয়া যশোদা যে বিশেষ খুশি হইল তা বলা যায় না, তবে তেমন খাবাপও তার লাগিল না। পরিচালক সমিতির সভায় বড়ো বেশি তর্ক চলে, নিজের নিজের মতামতটা জাহির করিবার জন্য অনেকে বড়ো ব্যস্ত। বড়ো বড়ো কথাও অনেক বলা হয়, একেবারে নাটকীয় ভঙ্গিতে, অবরুদ্ধ একটা উত্তেজনা যেন বক্তার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তবে সকলে এ রকম নয়, শান্ত ও সংযত মানুষও কয়েকজন আছে, ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়াই যারা কথা বলে। কিন্তু এদেরও আসল বক্তব্যটা যশোদা আগাগোড়া ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। খানিকক্ষণ হয়তো কথাগুলি জলের মতো পরিষ্কার বুঝা যাইতে লাগিল তাবপর হঠাৎ কখন কীভাবে যে সমস্ত বিষয়টা জটিল আর দুর্বোধ্য হইয়া গেল, কিছুই যশোদার মাথায় ঢুকিল না। তবে সে জন্য এদের সে দোষ দিল না, অপরাধটা ধরিয়া নিল নিজের বুদ্ধির।

এরা সমস্ত জগতের শ্রমিকদের অবস্থা জানে, শ্রমিক সমস্যা এরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়াছে, এদের সমস্ত তর্কবিতর্ক পরিষ্কার বুঝিবার মতো জ্ঞান সে কোথায় পাইবে ? তাব মতো ঠেকনা দিয়া দশ-বিশজন শ্রমিককে কোনো রকমে খাড়া রাখিবার ব্রত এদের নয়, ধনিকতন্ত্রের চোরাবালির গ্রাস হইতে সমস্ত শ্রমিককে বাঁচাইয়া শক্ত মাটিতে তাদের দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা এদের কাজ।

সে কাজের বিরাটত্ব কল্পনা করিয়া যশোদার মাথা ঘুরিয়া যায়। কুলিমজুরের সঙ্গে সে মিশিয়াছিল, তাঁদের কয়েকজনকে ভালো বাসিয়াছিল, একটা শ্রেণি হিসাবে তাদের কথা কখনও ভাবিয়া দ্যাখে নাই। আজ সকলের আলোচনা হইতে শ্রমিক সমস্যার স্বরূপ তার কাছে যতটুকু প্রকট হইয়া উঠিল তাতেই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

শ্রমিকসভার বক্তৃতাগুলি যশোদার ভালো লাগিল না। প্রত্যেকটি বক্তা প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসই শুধু বিতরণ করিয়া গেল, কোনো বিষয়েই একটু ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা কারও দেখা গেল না। বক্তৃতাগুলি জোরালো হইল সন্দেহ নাই, শ্রমিকদের উপর যথেষ্ট প্রভাবও দেখা গেল বক্তৃতার, কিন্তু এ রকম প্রভাব কি স্থায়ী হয়? কাজে লাগে ?

হয়তো লাগে। যা ওদের করা উচিত সেটা কেন করা উচিত বুঝাইয়া দেওয়ার বদলে এমনি বক্তৃতার সাহায্যে করাইয়া নেওয়াই হয়তো সহজ ও সম্ভব ?

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে রাত প্রায় নটার সময় বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া যশোদার চোখে পড়িল, তাদের গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে সত্যপ্রিয়ের প্রকাণ্ড গাড়ি। ভিতরে একা বসিয়া আছে একটি অল্পবয়সি বউ। পাশ কাটাইয়া যশোদা গলির মধ্যে ঢুকিতে যাইতেছিল, বউটি ক্ষীণস্বরে ডাকিয়া বলিল, চাঁদের মা, ও চাঁদের মা, শুনুন।

বউটি কে এবং এখানে গাড়ির মধ্যে একা কেন বসিয়া আছে যশোদা আগেই অনুমান করিয়াছিল। কাছে আসিতে মহীতোষের বউ বলিল, ওঁকে একটু শিগগির পাঠিয়ে দেবেন চাঁদের মা ?

তা দিচ্ছি, কিন্তু তোমায় একা বসিয়ে রেখে কী বলে নেমে গেল বাছা ?

কথা কইতে কইতে এগিয়ে গেছেন।

বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়াইয়া মহীতোষ, অজিত আর সুব্রতার মধ্যে তখনও কথা চলিতেছিল। অজিত বা সুব্রতা যে মহীতোষকে আটকাইয়া রাখে নাই, মহীতোষ দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে বলিয়াই দুজনে তারা ভিতরে যাইতে পারিতেছে না বুঝিতে যশোদার দেরি হইল না। ছেলেমানুষ তনজনেই এবং মহীতোষের বুদ্ধিটা সত্যই একটু কাঁচা। সুব্রতাই বা কী, এদিকে তো মুখে তার কথা ছোটে তুবড়ির মতো, ভদ্রতা বজায় রাখিয়াই একটু ইঙ্গিতেও কী সে মহীতোষের মনে পড়াইয়া দিতে পারিল না, গলির মোড়ে বউটাকে সে একা ফেলিয়া আসিয়াছে ?

যশোদাকে দেখিয়া মহীতোষ বলিল, কেমন আছেন চাঁদের মা ? আজ এঁদের নিয়ে—

একা বসে থাকতে বউমার ভয় করছে।

অ্যাঁ ? ও, হ্যাঁ, যাই।

বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া যে যার ঘরে কাপড় ছাড়িতে গেল। ধনঞ্জয় যশোদার বিছানা দখল কবিয়া শুইয়া আছে।

তুমি এখানে যে ?

ধনঞ্জয় জবাব দিল না।

ভাত খেয়েছ !

খেয়েছি।

সাবাদিন রাগে গজগজ করিতে করিতে কুমুদিনী আজ এখানে আসিয়া রাঁধিয়া দিয়া গিয়াছে। কথা ছিল, কুমুদিনীর ননদ আসিয়া রাঁধিয়া দিবে, কিন্তু শত্রুর বাড়িতে নিজে রাঁধিয়া দিতে না আসিলে কুমুদিনীর বোধ হয় তৃপ্তি হয় না।

বাহিরে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া যশোদা তিনজনের ভাত বাড়িল, তারপর ধনঞ্জয়কে ডাকিয়া বলিল, এখানে এসো না, আমাদের খাওয়া দেখবে আর গল্প শুনবে কোথায় গিছলাম ?

ধনঞ্জয় সাড়া দিল না বটে কিন্তু খানিকক্ষণ পরে মুখ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া আসিল। সকলে তখন খাইতে বসিয়াছে। কাঠের পা ঠকঠক করিতে করিতে সে বাড়ির বাহিরে চলিয়া গেল। সুব্রতা বলিল, ওঁর ঠকঠক করে হাঁটা দেখলে এমন লাগে আমার ! কী হল দিদি তোমার ওখানে ?

কী আর হবে, কুলিমজুরের মিটিং হল। তোমরা কেমন বায়োস্কোপ দেখলে বলো।

বায়োস্কোপের চেয়ে মহীতোষ আর তার বউয়ের সঙ্গে পরিচয়ের কাহিনি বলিতে আর দুজনের সমালোচনা করিতে সুব্রতার বেশি আগ্রহ দেখা গেল, ওদের কথাতেই খাওয়া শেষ হইয়া গেল। একবার মুখ খুলিলে সুব্রতা আর থামিতে পারে না। আঁচাইয়া উঠিয়া ছবির গল্প আরম্ভ করিয়া বলিল, দেখবে দিদি বইটা ? নাম-টাম আছে, অনেকের ছবিও আছে।

বাংলা চলচ্চিত্র। সুব্রতার কথা শুনিতে শুনিতে যশোদা ছাপানো প্রোগ্রামটির পাতা উলটাইতেছিল। এক পাতায় দুজন অভিনেতা অভিনেত্রীর ছবি দেখিয়া তার চোখের পলক বন্ধ হইয়া গেল।

নন্দ আর সুবর্ণ সিনেমায় অভিনয় করিতেছে ?

সুব্রতা বলিল, কী হল দিদি ? কার ফটো দেখেছ ? ওঃ, ওই ছেলেটার ! এমন সুন্দর গান করলে দিদি ছেলেটা, কী বলব তোমায় !

সাত

যামিনী ফিরিয়া আসিল এবং পরাধীনতায় অভ্যস্ত মানুষও যেমন বড়োরকম একটা ঘা খাওয়ার সময় কিছুক্ষণের জন্য গা নাড়া দিয়া উঠিয়া স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেয়, চার টাকা পথখরচ দিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য সেইরকম একটা গোলমাল বাধাইয়া দিল।

আমাদের স্বাধীন করো বলাটাই এ ধরনের আন্দোলনের প্রচলিত প্রথা। যামিনীও রাগ করিয়া সত্যপ্রিয়ের কাছে দাবি করিয়া বসিল, সত্যপ্রিয় তার ভিন্ন থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিক।

ভিন্ন থাকবে ? মেসে ?

আজ্ঞে না। অন্য একটা বাড়ি নিয়ে—

সত্যপ্রিয় সমস্তই বুঝিতে পারিতেছিল তবু জামাইয়ের ছেলেমানুষি রাগ কমানোর জন্য মৃদু একটা হাসিয়া পরিহাসের সুরে বলিল, আমার তো আর বাড়ি নেই বাবা, এই একটা ছাড়া ?

ছোটোখাটো একটা বাড়ি ভাড়া নেওয়ার কথা বলছিলাম।

এবার একটু গম্ভীর হইয়া সত্যপ্রিয় বলিল, বেশ তো, সে জন্য ব্যস্ত হবার কী আছে ! কিছুদিন যাক না !

যামিনী একগুঁয়ের মতো বলিল, আজ্ঞে না, দু-চারদিনের মধ্যে একটা বাড়ি ঠিক করে চলে যাব ভাবছিলাম।

সত্যপ্রিয় এবার রীতিমতো গম্ভীর হইয়া গেল।

দু-চারদিনের মধ্যে চলে যাবে ভাবছিলে ? তা বেশ। একটা বাড়ি দেখে নাও, কলকাতায় বাড়ির অভাব নেই। কিন্তু, একা একজনের জন্য একটা বাড়ি না নিয়ে মেসে হোটেলে থাকলেই সুবিধে হত না ?

তখন যামিনী স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিল যে একা বাড়ি ভাড়া করিয়া থাকিবার কথা সে ভাবিতেছে না, সকলকে সঙ্গে নিয়া যাওয়াই তার ইচ্ছা।

সত্যপ্রিয় বলিল, আমাকে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে, এই কথা বলছ তো ? মাসে মাসে বাড়িভাড়াটাও দিতে হবে নিশ্চয় ?

আমার মাইনেটা কিছু বাড়িয়ে দিলে—

কীসের মাইনে ? একজনকে বসিয়ে বসিয়ে মাসে দুশো টাকা হাতখরচা দিলে কি আপিস চলে বাপু ? কাজকর্ম শিখলে হয়তো একদিন মাইনে হবে তোমার, এখন আমার পকেট থেকে যে হাত-খরচার টাকাটা দিচ্ছি, সেটা আর বাড়াতে পারব না। কমিয়ে দিতে হবে কিনা কে জানে,—বড়ো টাকার টানাটানি চলছে আমার।

খুব সকালে যামিনী আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, ঝগড়ার পর না খাইয়াই আবার বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বিকালে অজিতের সঙ্গে সে গেল যশোদাব বাড়ি।

সত্যপ্রিয় চার টাকা পথখরচ দিয়া জামাইকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছে যশোদা এ খবরটা জানিত। অজিত খবর দিয়াছিল। অজিত মহীতোষের বন্ধু, বুদ্ধিটাও মহীতোষের তেমন ধারালো নয় যে ঘরের কোনো কোনো খবর যে বন্ধুর কাছেও চাপিয়া যাওয়া উচিত এটুকু তার খেয়াল থাকিবে। সত্যপ্রিয়ের মনের কোনো কথা কেউ কোনোদিন ঘুণাক্ষরে টের পায় না, মহীতোষের মনেব কথাগুলি বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়।

যামিনীকে দেখিয়া যশোদা একটু অবাক হইয়া যায়, তারপর তার প্রস্তাব শুনিয়া যশোদার একেবারে চমক লাগে।

আমার এখানে থাকবেন মানে কী গো জামাইবাবু ?

অজিত বুদ্ধিমানের মতো একটু তফাতে সবিয়া গিয়াছিল। যামিনী গম্ভীরভাবে বলিল, শ্বশুরের অন্ন আর কতকাল ধ্বংস করব চাঁদের মা ? তাই ভাবছি, অজিতবাবুর মতো আপনার এখানে ঘর ভাড়া করে থাকব।

একা ?

উহুঁ, সবাইকে নিয়ে থাকব—অজিতবাবুর মতো।

যশোদা হাসিয়া ফেলিল। সত্যপ্রিয়ের মেয়েকে নিয়া যামিনী তাব বাড়িতে ঘবভাড়া করিয়া থাকিবে ! এমন ছেলেমানুষি কথা যশোদা জীবনে কখনও শোনে নাই।

ঝগড়া হয়েছে বুঝি শ্বশুরেব সঙ্গে।

ঠিক ঝগড়া নয, ওখানে আর বাস করা যায় না। কী কুক্ষণেই যে বড়োলোকেব মেয়ে বিয়ে করেছিলাম চাঁদের মা !

প্রথমটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও শেষ পর্যন্ত যশোদা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিতে পারে। একটু সহানুভূতি পাইয়াই যামিনীর মুখ খুলিয়া যায়, ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া বাড়াইয়া কমাইয়া অবিরাম সে বড়োলোকের, বিশেষ করিয়া সত্যপ্রিযের মেয়েকে বিবাহ করার ট্র্যাজেডি বর্ণনা কবিয়া যায়. দুর্ভাগ্যের ইতিহাস যেন তার শেষ হইবে না।

ব্যাপারটা বুঝিতে যশোদার বিশেষ কষ্ট হয় না, সত্যপ্রিয়কে সে তো চেনেই. যামিনীর মতো ছেলেরাও তার অজানা নয় ! অন্য কারও ঘরজামাই হইলে যামিনীকে সে আমল দিত কিনা সন্দেহ, সস্ত্রীক যামিনীকে বাড়িতে থাকিতে দিলে যে হাঙ্গামা আরম্ভ হইবে সেটা সে বেশ অনুমান করিতে পারে। তাছাড়া, বেশি দিন বড়োলোক শ্বশুবকে অবহেলা কবিয়া শ্বশুরবাড়ির আরাম ছাড়িয়া এখানে বাস করিয়া থাকিবার মানুষও যামিনী নয়, তার বড়োলোক শ্বশুরের কন্যাটিও নয়। সত্যপ্রিয়ের কাছ হইতে একবার ডাক আসিলেই দুজন ফিরিয়া যাইবে। সত্যপ্রিয়কে একটু নরম করার জন্য দুদিনেব জন্য এ বিদ্রোহ।

তবু দুদিনেব জন্যও সত্যপ্রিয়কে একটু বিপাকে ফেলা চলিবে শুধু এই জন্যই যশোদা যামিনীর প্রস্তাবে রাজি হইয়া গেল।

প্রতিহিংসা ?

তাছাড়া আর কী বলা চলে ! মুখোমুখি দুটি বাড়িতে পঁচিশ-ত্রিশটি মানুষ নিয়া যশোদার ছিল গুছানো সুখের সংসার, সত্যপ্রিয় সে সংসার ভাঙিয়া দিয়াছে। সত্যপ্রিয়কে জ্বালাতন করার সুযোগ কী সহজে ছাড়া যায় !

ক্ষতি করার জন্য মানুষকে কষ্ট দিয়া সুখ পাওয়া স্বভাব যশোদার নয়, সত্যপ্রিয়কে আঘাত দেওয়ার জন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনো উপায় আবিষ্কার করার কথাটা তার মনেও আসে নাই। যামিনী বাড়ি বইয়া আসিয়া প্রতিশোধের এ রকম একটা সুযোগ হাতে তুলিয়া না দিলে যশোদা কোনোদিন কিছু করিত না। তাছাড়া, মেয়েজামাইকে এ ভাবে বাড়িতে রাখিলে সত্যপ্রিয়ের ধনসম্পদ নষ্ট হইবে

না, হাত-পাও ভাঙিবে না। হয়তো শুধু সহ্য করিতে হইবে নিছক একটু মানসিক অশান্তি। যশোদার অশান্তির তুলনায় সেটা কিছুই নয়।

উনি কি মেয়েকে ছেড়ে দেবেন আপনার সঙ্গে ?

উনি ছেড়ে না দিন, ওঁর মেয়ে আসবে।

মেয়েকে চুরি করবেন ! বলিয়া যশোদা হাসে !

যশোদা তামাশা করুক, যামিনীর সমস্যা কিন্তু দাঁড়াইয়াছিল তাই, সত্যপ্রিয়ের মেয়েকে চুরি করিবে, অথবা সকলের সামনে বুক ফুলাইয়া তার হাত ধরিয়া সত্যপ্রিয়ের বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিবে ? সত্যপ্রিয়কে আগে হইতে জানাইয়া তার মেয়েকে নিয়া বাড়ি ছাড়া সহজ ব্যাপার নয়, যদিও সে মেয়ে যামিনীর আইন আর শাস্ত্রসম্মত স্ত্রী।

যোগমায়ার সঙ্গে সে দেখা করে দুপুরে, সত্যপ্রিয় যখন বাড়ি থাকে না। পরপর তিনটি দুপুর পরামর্শের পর যোগমায়া মনস্থির করিতে পারে। গরিবের মতো কিন্তু স্বাধীনভাবে থাকিবার অর্থ যোগমায়ার জানা নাই, সেটা তার কাছে একটা কাল্পনিক উত্তেজনাময় নতুনত্ব মাত্র, যশোদার বাড়িতে থাকিবার কথায় সে খুঁতখুঁত করিতে থাকে। কলিকাতায় এত বাড়ি থাকিতে যশোদার বাড়িতে কেন ? তাছাড়া বাপের বাড়ির এত কাছে যশোদার বাড়িতে থাকাটা কি উচিত হইবে, না, ভালো দেখাইবে ? নাটক ছাড়া মানায় না এমন অনেক বড়ো বড়ো আবোল-তাবোল কথা বকিয়া যশোদার বাড়িতে বাস করিতে যোগমায়াকে যামিনী যদি বা রাজি করাইতে পারে, চুপিচুপি বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে যোগমায়া কিছুতেই রাজি হয় না।

কেন, আমি কি পাপ করছি ? স্বামীর সঙ্গে স্বামীর ঘর কবতে যাব, তা লুকিয়ে চুরিয়ে যাব কেন ?

যোগমায়া এখনও স্বামীর ঘর করিতে যায় নাই, সে অভিজ্ঞতাও তার নাই। সে শুধু শুনিয়াছে, স্বামীর ঘর করিতে যাওয়াটা মেয়েদের মহা গৌরব ও সৌভাগ্যের কথা।

বাবা যেতে দেবেন না।

খুব দেবেন।

আসল কথা, যোগামায়ারও শখ চাপিয়াছিল, একটু বেড়াইয়া আসিবে, জীবনে একটু নতুনত্ব আনিবে। রাজপ্রাসাদের মতো এত বড়ো বাগানঘেরা বাড়ি, ঘরভরা গাদাগাদা আপনজন আব আত্মীয়-স্বজন, এত সব দামি আসবাব আর দাসদাসী, নানা উপলক্ষে প্রায়ই লোকজনকে খাওয়ানোর হইচই, কর্তার মেয়ে বলিয়া সকলের উপর এতখানি কর্তৃত্ব, তবু যেন যোগমায়ার সব একঘেয়ে লাগে।

বিবাহের অনেক আগে হইতেই একঘেয়ে লাগে, বাড়ির বাহিরে খেলা করিতে যাওয়া সত্যপ্রিয় যখন রদ করিয়া দিয়াছিল। বিবাহ হইলে ভালো লাগিবে ভাবিয়াছিল, যামিনীর সঙ্গে রাত কাটাইতে ভালো লাগেও বটে, কিন্তু তাতে কি মানুষের মন ওঠে, বাস্তবতার সঙ্গে সংশ্রববিহীন অল্পবয়সি একটি মেয়ের মন ?

যোগমায়ার রাগও হইয়াছিল। যামিনীকে দেশে পাঠানোর জন্য নয়, চার টাকা পথখরচ দিয়া যামিনীকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এই গুজবটা রটিয়াছে বলিয়া। তার স্বামীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করে তার বাবা, সকলের কাছে তার স্বামীকে এমনভাবে অপমান করে ! স্বামীর সঙ্গে ভাঙা ঘরে সে উপবাস করিবে (কিছুদিন করিবে, সত্যপ্রিয় ব্যস্ত হইয়া ফিরাইয়া আনিতে গেলেই ফিরিয়া আসিবে) তবু আর সে এমন বাপের বাড়িতে থাকিবে না।

সুতরাং সত্যপ্রিয়ের বাড়িতে একদিন সত্যই হইচই পড়িয়া গেল।

মেয়েদের মধ্যে ফিসফাস গুজগাজের শেষ রহিল না। সকলেই বুঝিতে পারিল যে যামিনী রাগ করিয়া যোগমায়াকে নিয়া যাইতেছে, তবু যোগমায়া বাড়ির যেখানে যায় সেখানেই যেন তাকে ঘিরিয়া

জিজ্ঞাসু মেয়েদের সভা বসিতে লাগিল। কেবল সত্যপ্রিয়ের অনুমতি চাহিতে যাওয়ার সময় কেউ তার সঙ্গে গেল না।

যামিনী দুপুরবেলা তার অনুপস্থিতির সময় আসা যাওয়া করিতেছে শুনিয়া সত্যপ্রিয় মনে মনে একটু হাসিয়াছিল। আর দু-একদিনের মধ্যেই যামিনী আসিয়া পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে। আসল ব্যাপারটা তার কানে গিয়াছিল সকালে যোগমায়া অনুমতি চাহিতে যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায়। তারপর সত্যপ্রিয় মনে মনে আর হাসে নাই বটে, মেজাজটাও গরম করে নাই।

খবরটা দিতে আসিয়াছিল তার ভগ্নিপতি, খবর দিয়া আপশোশের শব্দ করিয়া বলিয়াছিল, আচ্ছা বিপদ হল তো !

সত্যপ্রিয় আশ্চর্য হওয়ার ভান করিয়া বলিয়াছিল, কীসের বিপদ ?

তার সঙ্গে লড়াই করিবে তার টাকা দিয়া কেনা জামাই ? সত্যপ্রিয়ও লড়াই করতে জানে।

দুরুদুরু বুকে ঘরে গিয়া যোগমায়া দ্যাখে, সত্যপ্রিয় মেঝেতে যোগাসনে বসিয়া সামনে খবরের কাগজ বিছাইয়া ঝুঁকিয়া কাগজ পড়িতেছে।

কীভাবে কথাটা বলা যায় ? কীভাবে বাপকে জানানো যায়, আমি তোমার বাড়ি ছাড়িয়া চলিলাম ? মাথা ঘুরিয়া, গা কাঁপিয়া যোগমায়া অস্থির হইয়া পড়ে, কীভাবে যে শেষ পর্যন্ত কথাটা বলিয়া বসে নিজেই ঠিকমতো বুঝিতে পারে না।

সত্যপ্রিয় আগেই মুখ তুলিয়াছিল, সহজভাবে বলে, যামিনী নিয়ে যাবে ? আচ্ছা। কবে যাবি ?

যোগমায়া বলে, আজ।

সত্যপ্রিয় বলে, বেশ।

যোগমায়ার পৃথিবী অন্ধকার হইয়া যায়। শুধু আশা নয়, যোগমায়ার বিশ্বাস ছিল সত্যপ্রিয় কখনও তাকে পাঠাইতে রাজি হইবে না, রাগ করিবে, বকুনি দিবে, তাকে বুঝাইবে—আব সে তখন কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিবে, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবে যে, তোমার জন্যেই তো সব গোলমাল, তুমি কেন ওকে অপমান করলে ! তার বদলে, একী ! এককথায় তাকে অনুমতি দিয়া দিল ? এখন তো আর না গিয়া উপায় থাকিবে না।

সত্যপ্রিয় খবরের কাগজ পড়িতে মন দেয়।

কাঁদিতে কাঁদিতে যোগমায়া বলে, আমি কিন্তু আর ফিরে আসব না বাবা, আমায় আর আসতে দেবে না।

সত্যপ্রিয় অন্যমনে বলে, বেশ তো।

যামিনী আসিলে খবরটা দিয়া যোগমায়া চোখ বড়ো বড়ো করিয়া প্রশ্ন করে, কী উপায় হবে এখন ?

এত সহজে অনুমতি পাইয়া যামিনীরও ভালো লাগিতেছিল, না, তবু সে জোর করিয়া বলে, ভালোই তো হল।

ছাই হল ! তোমার মাথা হল !

যোগমায়া কাঁদিতে থাকে, কাঁদিতে কাঁদিতে মাথা নাড়িয়া বলে, আমি যাব না।

রাগ করিয়া যামিনীর সঙ্গে কদিনের জন্য চলিয়া যাওয়ার কল্পনায় যোগমায়া যত মজা আবিষ্কার করিয়াছিল তার একটাও এখন আর সে খুঁজিয়া পায় না। যা ছিল ছেলেমানুষি তাই এখন ভয়ানক বিপদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে !

যাবে না মানে ?

না না, যাব না। কোথায় যাব আমি বাবাকে ছেড়ে ?

যামিনী আহত হইয়া বলিল, বেশ। যাওয়া ঠিক করে এখন উলটো গাইছ।

তুমিই তো কুপরামর্শ দিয়ে মাথা ঘুলিয়ে দিলে আমার ?

যামিনীর সঙ্গে যোগমায়ার ঝগড়া হইয়া যায়।

বাপকে গিয়ে যোগমায়া বলে, না বাবা, আমি যাব না। তোমাদের মনে কষ্ট দিয়ে—

সত্যপ্রিয় বলে, আমাদের আবার কষ্ট কীসের !

যোগমায়া থমকিয়া যায়। সামলাইয়া উঠিয়া আবার বলে, আমি জানি তোমার ইচ্ছে নেই বাবা, তোমার মনে ব্যথা দিয়ে—

নিজে না গলিলে এ জগতে কারও ক্ষমতা নেই সত্যপ্রিয়কে গলায়। তেমনই স্নেহহীন কণ্ঠে নির্বিকারভাবে সে বলে, আমার মনে ব্যথা দিবি কেন ?

বাপের ব্যবহারে মর্মাহত যোগমায়ার দারুণ অভিমানে আবার মনে হয়, যামিনীর সঙ্গে যাওয়াই ভালো, সত্যপ্রিয় যতদিন নিজে না আনিতে যায় ততদিন না আসাই ভালো।

তবু, কোনোরকমে চোখ-কান বুজিয়া সে বলে, তুমি যদি ওকে একটু মিষ্টি করে বুঝিয়ে বলো বাবা—

সত্যপ্রিয় বলে, তোরা দুজনেই বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস, মাথায় চড়ে গেছিস দুজনে।

অগত্যা যামিনীর সঙ্গে যোগমায়া যশোদার বাড়িতে গিয়া উঠিল। রওনা হওয়ার সময় সত্যপ্রিয় বাড়িতেই ছিল। যোগমায়া ইচ্ছা করিয়াই দেরি করিয়া সত্যপ্রিয় বাড়ি ফিরিবার পর রওনা হইয়াছে। যাওয়ার সময় সত্যপ্রিয় যদি নরম হয় ? মেয়েকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মন কেমন করিয়া উঠিলে সে যদি একটু নত হইয়া যামিনীকে মিষ্টিকথায় বুঝাইয়া শান্ত করিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেয় ?

আগে পরে দুজনে সত্যপ্রিয়কে প্রণাম করিল। সত্যপ্রিয় যামিনীকে বলিল, সাবধানে থেকো আর যোগমায়াকে বলিল, সাবধানে থাকিস।

কয়েক মিনিট পরেই যশোদার বাড়ি। যশোদা হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিল, সুব্রতা হাত ধরিয়া যোগমায়াকে ভিতরে নিয়া গেল, পাড়ার যেসব মেয়েরা যশোদার বাড়িতে সত্যপ্রিয়ের মেয়ের পদার্পণ দেখিবার জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল তারা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

যশোদাকে যোগমায়া চেনে, তার বাড়িটি কোনোদিন দ্যাখে নাই। ভিতরে ঢুকিয়া সেও যেদিকে চোখ পড়িতে লাগিল সেইদিকেই হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতে লাগিল। ঘর দেখিয়া সে যেন মরিয়া গেল। কী সর্বনাশ, এই ঘরে তাকে থাকিতে হইবে নাকি ? খাটপালঙ্ক, আলমারি, ড্রেসিংটেবিল এ সব না থাক, কিন্তু এ কী দেয়াল, এ কী মেঝে, এ কী দরজা জানালা ! কতটুকু ঘর !

সুব্রতা আনন্দে ডগমগ হইয়া বলিল, যাক, অ্যাদ্দিনে একজন মনের মতো সঙ্গী জুটল। তোমার ভাইয়ের কাছে তোমার কথা এত শুনেছি ভাই !

তুমি আমার ভাইকে চেনো ?

চিনি না ? কবে থেকে চিনি।

কী করে চিনলে ?

প্রশ্ন শুনিয়া মনের মতো সঙ্গী সত্যই জুটিয়াছে কিনা সে বিষয়ে বড়োই সন্দেহ জাগায় সুব্রতা একটু দমিয়া গেল।

ওর সঙ্গে পরিচয় আছে। তোমার দাদা ওঁর বন্ধু।

তাই নাকি ? তা তো জানতাম না।

যশোদা যোগমায়াকে দেখিয়াই দমিয়া গিয়াছিল। পাড়ার মেয়েদের আস্তে আস্তে বিদায় করিয়া সে যামিনীকে নিয়া পড়িল।

আপনার কেমন ধারা বিবেচনা জামাইবাবু ?

কেন চাঁদের মা ?

দুদিন বাদে ওর ছেলেপিলে হবে, ওকে নিয়ে এ সময় টানাহ্যাঁচড়া হাঙ্গামা আরম্ভ করেছেন ? প্রথমবার লোকে কত সাবধানে রাখে, মন ভালো রাখার জন্য বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়, আর আপনি এমন একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। বয়স তো কম হয়নি আপনার ?

যামিনী আমতা আমতা করিয়া বলিল, এখনও দেরি আছে।

যশোদা ফোঁস করিয়া উঠিল, ছাই আছে। ও দু-চারমাস সময় কোন দিক দিয়ে কেটে যাবে টেরও পাবেন না। দেরি থাকলেই বা কী, এ সময় কেউ এমনি হাঙ্গামা করে ?

যশোদার বড়ো অনুতাপ হয়। সত্যপ্রিয়কে খোঁচা দেওয়ার সুযোগ পাইয়া খুশি হওয়াব সময় তার মেয়ের কথাটা মনে রাখা উচিত ছিল। সে অবশ্য জানিত না যোগমায়ার এ রকম অবস্থা, তবু এতটুকু একটা মেয়ের মনে এই ধরনের হাঙ্গামার ব্যাপার কী রকম আঘাত দিতে পারে সেটা অনুমান করা তো তার পক্ষে কঠিন ছিল না। মানুষকে হিংসা করিলে এমনই হয়, একজনকে হিংসা করিতে গিয়া মনেও থাকে না আরও অনেকে তার ফলভোগ করিবে।

কী আর করা যায়, যোগমায়ার মনটা একটু ভালো করার জন্য যশোদা চেষ্টা আরম্ভ করে। গল্প জুড়িয়া দেয়, হাসিতামাশা করে, গম্ভীরমুখে বলে, দুদিনের জন্য বেড়াতে তো এলে দিদি, দুদিন বাদে বাপ যখন গাড়ি পাঠিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, ঘর যে তখন আমার খালি হয়ে যাবে বাছা ?

বাবা আর আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না যশোদাদিদি। যোগমায়া কাতরভাবে বলে।

যশোদা হাসিয়া বলে, থামো বাছা তুমি। বাপ কখনও মেয়েকে ত্যাগ করতে পারে ?

আমার বাবাব ভীষণ রাগ, তুমি জানো না। চলে আসতে যখন দিয়েছে, কখখনো আর ফিবে যেতে দেবে না।

দেবে—আমি বলছি দেবে। বাপ-মাব রাগ কদিন টেঁকে ? দুদিন বাদে রাগ জল হয়ে গেলে যখন মন কেমন করতে আরম্ভ করবে, নিজে এসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তোমাদেব।

কুমুদিনী প্রথম হইতে একপাশে মুখ বুজিয়া বসিয়াছিল, এবার সে সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা কবে, রাগারাগি করে এসেছে বুঝি ?

যশোদা বলে, কীসের রাগাবাগি ? সংসাবে অমন কথা কাটাকাটি হয়।

যামিনী ও সত্যপ্রিয়ের কলহের ব্যাপারটাই যশোদা একেবারে তুচ্ছ করিয়া উড়াইযা দিতে চায়। যামিনী শ্বশুরের সঙ্গে আর সত্যপ্রিয় জামাইয়ের সঙ্গে যেন একটু ছেলেখেলা করিতেছে. যশোদাব ভাবটা এই রকম। যোগমায়াকে সাহস দেওয়ার জন্য এটা শুধু যশোদার ছলনা নয়। সত্যপ্রিয়কে সে জানে। পুতুল কথা না শুনিলে ছোটোছেলে যেমন তার অত সাধের পুতুলটি ঠুকিয়া ঠুকিয়া ভাঙিয়া ফেলে, সত্যপ্রিয়ও তেমনই তার অবাধ্য প্রিয়জনকে পিষিয়া ফেলিতে পারে অনায়াসেই। তবু যশোদা বিশ্বাস করিতে পারে না সত্যপ্রিয় মেয়েকে ফিরাইয়া নেওয়ার ব্যবস্থা না করিয়া বেশিদিন চুপ করিয়া থাকিবে।

যোগমায়া যশোদার সঙ্গে যেন একেবারে আঁটিয়া যায়। অনেকদিন আগে, যশোদার বাড়িতে যখন শুধু কুলিমজুরের আস্তানা ছিল, আর সত্যপ্রিয় হঠাৎ যশোদাকে খাতির করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, একদিন সত্যপ্রিয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া বেয়াদবি করার জন্য যশোদা যোগমায়াকে আচ্ছা করিয়া শাসন করিয়া দিয়াছিল। সাপের মতো ফোঁসফোঁস করিয়াছিল সেদিন যোগমায়া। আজ যখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসে বিদ্যুতের আলো জ্বলে না, ঘরের দেয়াল সরিয়া সরিয়া আসিয়া চাপ দিতে থাকে, দম আটকাইয়া আসে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার মনে হয়, যোগমায়া যশোদার কাছে সরিয়া সরিয়া আসে, পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ায়।

ঘরটা গুছিয়ে নাও ? যশোদা বলে।

আমার কী হবে যশোদাদিদি ! যোগমায়া বলে।

ধনঞ্জয় ঘরে আর রোয়াকে বসিয়া বসিয়া সব দেখিতেছিল, একফাঁকে চুপিচুপি যশোদাকে জিজ্ঞাসা করে, ওরা এখানে থাকবে নাকি চাঁদের মা ?

যশোদা বলে, না।

পরদিন খুব ভোরে উঠিয়া যশোদা উনুন ধরাইতেছে, যামিনী উঠিয়া আসিল। মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে, চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু।

ঘুমোচ্ছে।

হ্যাঁ। এই তো ঘুমোলো চারটের সময়।

যশোদা তা জানিত।

খুব কেঁদেছে, না ?

শুধু কান্না ! কী বিপদেই যে পড়লাম চাঁদের মা।

যশোদা তাও জানিত। একটা আপশোশের শব্দ করিল।

যামিনী মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, একটা বড়ো দেখে বাড়ি ঠিক করে উঠে যাব চাঁদের মা ?

যামিনীর কাছে শ-খানেক টাকা আছে, যোগমায়ার কাছেও আছে সাতাত্তর টাকা। যোগমায়ার গায়ে আর বাক্‌সে গয়না আছে অনেক। কিন্তু যশোদা সংক্ষেপে বলিল, বড়ো বাড়ি দিয়ে কী হবে ? কটা দিন যাক।

যশোদা ভাবিয়াছিল, দু-একদিনের মধ্যেই সত্যপ্রিয়ের কোনো আত্মীয় মধ্যস্থ হইয়া আসিবে। কিন্তু চার-পাঁচদিন কাটিয়া যায় কারও পাত্তা মেলে না। সত্যপ্রিয় যেন সত্যই মেয়েজামাইকে ত্যাগ করিয়াছে। যোগমায়ার অবস্থা দিন দিন কাহিল হইতে তাকে, যশোদা না থাকিলে ইতিমধ্যেই হয়তো তার নার্ভাস ব্রেকডাউন ঘটিয়া যাইত। যশোদা তাকে আদর করে, ধমক দেয়, নানাভাবে বুঝাইয়া শান্ত করিয়া রাখে। কিন্তু মনের যার জোর নাই একেবারে, কতটুকু মনের জোর তার মধ্যে সংক্রামিত করা যায় ? ধার-করা মনের জোর কতক্ষণ কাজে লাগে মানুষের ?

যশোদা যখন বলে, এ রকম যদি করবে, এলে কেন ?

যোগমায়া বলে আমি আসিনি, আমায় জোর করে এনেছে।

যামিনী যখন বলে, এমন জানলে তোমায় আমি আনতাম না।

যোগমায়া বলে, আমাকে মেরে ফেলে বাবাকে কষ্ট দেবে বলে তুমি আমায় জোর করে এনেছ।

চলো তবে তোমায় রেখে আসি ?

বাবা না ডাকলে কী করে যাব ?

শুধু এই একটি বিষয়ে সত্যপ্রিয়ের মেয়ের মতোই তার তেজ দেখা যায়। অথবা সত্যপ্রিয়ের মেয়ে বলিয়াই হয়তো সে হিসাব করে যে না ডাকিতে ফিরিয়া গেলে ভবিষ্যতে প্রায় চলিয়া যাওয়ার ভয় দেখানোর সুবিধা থাকিবে না।

সাতদিনের দিন সকালে মহীতোষ আসিল। অজিত আর সুব্রতার সঙ্গে মহীতোষ মাঝে মাঝে আড্ডা দেয়, তবে সেটা তার নিজের গাড়িতে অথবা মাঠে ঘাটে হোটেল সিনেমায়, যশোদার বাড়ির মধ্যে নয়। এবার কোথা হইতে পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে একটা পিঁড়ি দখল করিয়া বসিল।

যোগমায়া তো আনন্দে প্রায় পাগল হওয়ার উপক্রম। —দাদা ! দাদা এসেছ ! তুমি কোত্থেকে এলে দাদা ? বাবা পাঠিয়েছে ?

মহীতোষ নিষ্ঠুরের মতো নির্বিকার হাসি হাসিয়া বলিল, বাবা পাঠাবেন বইকী ! কাউকে আসতেই বাবা আরও বারণ করে দিয়েছেন, বাবা পাঠাবেন !

যোগমায়া দমিয়া গেল।—বারণ করে দিয়েছেন !

করবেন না ? যা কীর্তিটাই তোমরা করলে !

যশোদা মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলিল, আহা, কেন মিছে ঘাবড়ে দিচ্ছেন ওদের ? রাগ করবেন সে তো জানা কথা—ও রাগ কী টেকে ? সব ঠিক হয়ে যাবে।

মহীতোষ সায় দিয়া বলিল, তা যাবে—তা যাবে। নিশ্চয় যাবে। তবে কিনা—তা ঠিক, সব ঠিক হয়ে যাবে বইকী।

অন্য সবাই বলে না আমার কথা ?

বলে বইকী।

কী বলে বলো না দাদা ?

নিন্দে করে, আবার কী বলবে।

শুনিয়া যোগমায়া স্তব্ধ হইয়া যায়। নিন্দা করিবে বইকী, স্পর্ধা কী কম সকলের ! কবুক, যত পারে নিন্দা করুক। ফিরিয়া গিয়া নিন্দা করার মজাটা সকলকে সে যদি টের না পাওয়াইয়া দেয়—

যোগমায়ার মন যতই খাবাপ থাক আর বাড়িঘরের অবস্থার জন্য যতই লম্বা করিয়া কান্না আসুক, এটা তো ধরিতে গেলে এক রকম তার নিজের বাড়ি, এখানকার কুঁড়েঘরেও তারই তো সংসার। মহীতোষকে যে কী দিয়া অভ্যর্থনা আর আদর-যত্ন কবিবে সে ভাবিয়া পায় না। শেষে, একরাশ বাজারের খাবার আনাইয়া তাকে খাইতে দেয় আর খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাড়ির সব খবর জিজ্ঞাসা করে। কদিন আর সে বাড়ি ছাড়িয়াছে, কদিনের মধ্যেই কতগুলি বছর যেন কাবার হইয়া গিয়াছে। জবাব দিতে দিতে মহীতোষ বিব্রত আর বিরক্ত হইয়া বলে, সবাই ভালো আছে, সব ঠিক আছে। যেমন ছিল তেমনি সব আছে। কেন ভাবছিস ?

যেমন ছিল সব তেমনি আছে ? সে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া এতটুকু পরিবর্তন হয় নাই ? একটু কাঁদাকাটাও করে নাই কেউ ? যোগমাযা দুঃখে অভিমানে ফোঁসফোঁস করিয়া কাঁদিতে থাকে।

আরও বেশি বিব্রত হইয়া কয়েক মিনিট বসিয়াই মহীতোষ উঠিয়া পড়ে।

যোগমায়া কান্না থামাইয়া আবদার জানায় : রোজ একবার করে এসো কিন্তু দাদা।

আসব।

আর শোনো বাবা যদি জিজ্ঞেস করে আমার কথা—

বাবা কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আমি এসেছিলাম জানতে পেরে আমায় না খেয়ে ফেলে।

মেয়ের খোঁজখবর নিতে সকলকে বারণ করিয়াছে ? মেয়েজামাইকে ঘরে ফিরানোর চেষ্টাটা সত্যপ্রিয়ের দিক হইতে আরম্ভ হইবে এটা বোধ হয় তবে আর আশা করা যায় না। আশা কেন যশোদা করিয়াছিল, যশোদা নিজেই জানে না। মেয়েজামাই অন্য কোথাও গেলে হয়তো সত্যপ্রিয় কিছু করিত, তারা যশোদার বাড়িতে আসিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় সে গুম খাইয়া গিয়াছে। এবং হয়তো গুম খাইয়াই থাকিবে। অথবা হয়তো এমন কিছু করিবে যাতে মেয়েজামাই তার যশোদার বাড়ি ছাড়িয়া তার পায়ের উপর গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িবে আর যশোদার হইবে সর্বনাশ। কীভাবে সত্যপ্রিয়ের পক্ষে এটা করা সম্ভব যশোদা ভাবিয়া না পাক, সত্যপ্রিয়ের মগজে ও রকম অনেক মতলব ঠাসা থাকে, সাধারণ মানুষের কাছে যা দুর্বোধ্য কল্পনাতীত।

কিন্তু আগে মেয়েজামাইয়ের একটা ব্যবস্থা না করিয়া সে কি যশোদার কিছু করিবে ? কে জানে, হয়তো যার উপর রাগ হইয়াছে তাকে পিষিয়া মারার জন্য মেয়েজামাইয়ের ভালোমন্দের

কথাটাও সে ভাবিবে না। মেয়েজামাইকেই হয়তো যশোদাকে জব্দ করার কাজে ব্যবহার করিবে। ওদের উপরেও তো সে কম রাগে নাই।

যশোদার মনটা খারাপ হইয়া থাকে। আবার সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে লড়াই আরম্ভ হইয়া গেল ? একটা তুচ্ছ বাজে উপলক্ষে ? আদর্শবাদের ব্যাপারটা যশোদা একেবারেই বোঝে না, তবু তার সহজ বুদ্ধিতেই সে বুঝিতে পারে, এবারকার লড়াইটা একেবারে অর্থহীন, জগতে কারও এতে কোনো উপকার হইবে না।

যোগমায়ার মনটা খারাপ হইয়া গেল বীভৎস রকমের। তার রকম-সকম দেখিয়া যশোদাও ভড়কাইয়া গেল। কোনো বিষয়ে ভড়কাইয়া যাওয়া যশোদার বড়ো অপছন্দ। বিরক্ত হইয়া যোগমায়াকে একেবারে সে আচ্ছা করিয়া ধমকাইয়া দিল, তারপর অনেক আদর করিল, তারপর নিজের বিষাদের স্বপ্ন ঝাড়িয়া ফেলার মতো মাথা ঝাঁকি দিয়া বলিল, কী মন খারাপ করে আছি আমরা সবাই মিছিমিছি ! বাড়িতে যেন মড়া জমেছে ক-গন্ডা। এসো তো বাছা সবাই মিলে একটু ফুর্তি করি আজ। কী করা যায় বলো তো ?

সুব্রতাই ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, সিনেমায় যাবে দিদি সবাই মিলে ?

সিনেমা থিয়েটার যাওয়া ছাড়া ফুর্তি করার আর কোনো উপায়ের কথা সুব্রতার জানা আছে কিনা সন্দেহ।

যশোদা না ভাবিয়াই বলিল, তাই চলো।

শহরতলিতে থাকিয়াও কতকাল যশোদা সিনেমায় যায় নাই তার নিজেরও মনে নাই। নন্দ আর সুবর্ণকে পর্দায় দেখিতে যাওয়ার ইচ্ছাটা আজকাল জোরালো হইয়া উঠিয়াছিল, যাই যাই করিয়াও এতদিন যাওয়া হয় নাই। ভাবপ্রবণ ব্যাকুলতাকে যশোদা বড়ো ভয় করে। নন্দকে পর্দায় নড়িয়া চড়িয়া কথা বলিতে দেখিলে আর তার গান শুনিলে হয়তো সে ব্যাকুল হইয়া পড়িবে। এই আশঙ্কাটা যশোদাকে আটকাইয়া দিয়াছিল। সাধ করিয়া ও রকম ব্যাকুল হইয়া লাভ কী—ও তো মদ খাইয়া মাতাল হওয়ার শামিল !

আজ সে সুব্রতাকে বলিল, সেই ছবিটা দেখতে যাব—সেই যে সেদিন দেখে এসে আমায় বললে, একটা ছেলে চমৎকার গান গায় ?

সুব্রতা বলিল, সেটা তো আমি দেখেছি। একটা নতুন ছবি হচ্ছে, খুব ভালো বই, সেটা দেখবে চলো।

যশোদা বলিল, না, ওই ছবিটা দেখব। এক ছবি দুবার দেখলে তুমি মরবে না। ইচ্ছে না হয়, যেয়ো না।

আট

সকলে সিনেমায় গেল দল বাঁধিয়া। যশোদার বাড়িতে যারা বাস করিতেছিল তারা তো গেলই, বাহির হইতে আসিয়া যোগ দিল কুমুদিনী আর কেদার।

যোগমায়া শেষ মুহূর্তে হঠাৎ বাঁকিয়া বসিয়াছিল।

সকলে তখন সাজগোজ করিয়াছে, কেদার আর কুমুদিনীও আসিয়া হাজির হইয়াছে। যশোদার সিনেমায় যাওয়ার উপযুক্ত বেশভূষা করা নিয়া একটু হাঙ্গামা বাধিয়াছিল—সে রকম কাপড় কই, ব্লাউজ কই ? সুব্রতা যাচিয়া যশোদাকে কাপড় আর ব্লাউজ ধার দিতে গিয়াছিল, বলিয়াছিল, আমার এই কাপড়টা পরো না দিদি, আর এই ব্লাউজটা।

অনেকদিনের পুরানো তোরঙ্গ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে যশোদা বলিয়াছিল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? তোমার জামা আমার হাতে ঢুকবে কিনা সন্দেহ, গায়ে দেব !

আচ্ছা, কাপড়টা পরো তাহলে।

না দিদি, আমার যা আছে তাই ভালো।

সুব্রতার মুখখানা ম্লান হইয়া গিয়াছিল।

জানো দিদি, তোমার এই স্বভাবের জন্য তোমায় কেউ দেখতে পারে না।

চওড়া পাড় পরিষ্কার একখানা সাদা শাড়ি পরিয়া যশোদা নিজেই একটু হাসিয়াছিল। রঙিন কাপড় পরার বয়েস কি আর আছে বোন ? তোমার এমনি সাদাসিদে কাপড় থাকলে পরতাম। তোমার ওই কাপড় পরে বউ সাজি, আর আমায় দেখে সং ভেবে সবাই হাসুক, অত বোকা তোমার দিদিকে পাওনি।

রঙিন কাপড় পরলে লোকে হাসবে, এত বুড়ি তুমি হওনি দিদি। তোমার বয়েসে সবাই সাজগোজ করে।

জামাকাপড়ের এই আলোচনায় বোধ হয় যোগমায়ার খেয়াল হইয়াছিল, একে একে সে চাহিয়া দেখিয়াছিল সকলের দিকে। তারপর চাহিয়াছিল নিজের জমকালো শাড়িখানাব দিকে। এদেব সঙ্গে সে সিনেমা দেখিতে যাইবে, এদের সঙ্গিনী হিসাবে ? কী ভাবিবে লোকে ? চেনা লোকে যদি তাকে এদেব সঙ্গে দেখিতে পায় ? এ পাড়াটা পার হইয়া যাওয়ার সময় তো অনেক চেনা লোকের চোখে পড়িয়া যাইবে, সত্যপ্রিয় চক্রবর্তীর মেয়ে সে, কে না তাকে চেনে এ পাড়ায় ?

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া যোগমায়া কাপড় ছাড়িয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। একটু পরে রওনা হওয়ার সময়েও তাকে ঘরের বাহির হইতে না দেখিয়া সুব্রতা ডাকিতে গেল।

যোগমায়া বলিল, আমি যাব না, যেতে ইচ্ছে করছে না আমার।

কেন ? হঠাৎ তোমাব কী হল, যাবার জন্য তৈরি হয়ে ?

বললাম তো ইচ্ছে করছে না।

সুব্রতা মুখভার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, ও যাবে না দিদি। কাপড়চোপড় ছেড়ে বসে আছে।

তখন ব্যাপার বুঝিতে গেল যশোদা।

মুখভার করিয়া যোগমায়া চৌকিতে বসিয়া আছে, বিনা দোষে কে যেন তাকে তিরস্কার করিয়াছে অনেক।

কী হল হঠাৎ, যাবে না কেন ?

ভালো লাগছে না যশোদা দিদি।

যশোদা একটু হাসিল, বলিল, সেজেগুজে রওনা হওয়ার সময় হঠাৎ এ রকম ভালো না লাগা তো ভালো কথা নয়। চলো লোকে কিছু ভাববে না। যদি ভাবে তো ভাববে যে, আমরা তোমার চাকর-দাসী—তুমি কোথাকার রাজরানিটানি হবে, পাঁচ-সাতজন চাকর-দাসী নিয়ে বায়োস্কোপ দেখতে এসেছ।

যোগমায়া চোখও তোলে নাই, আর কথাও বলে নাই।

যশোদা গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, তার চেয়ে এক কাজ কর না ? সাদাসিধে একখানা কাপড় পরে চলো, এ কাপড়টা তোলা থাক। আমাদের সঙ্গে একেবারে মিশে যাবে—মনের খুঁতখুঁতানিটা যদি চাপতে পার কোনোরকমে, কী ফুর্তিটা হবে বল তো ?

পাশে বসিয়া যোগমায়াকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, নতুন কিছু একটা করেই দ্যাখো না আমার কথায়—খেলা মনে করে করে দ্যাখো একবার ? শখ করে !

সাদাসিধে একখানা শাড়ি পরিয়াই শেষে যোগমায়া দলে ভিড়িয়াছিল। সকলেই হাসিখুশি, অল্পবিস্তর উত্তেজিত—উত্তেজনা ছাড়া তো আনন্দ হয় না। কেবল যোগমায়ার উত্তেজনার মধ্যে আনন্দ নাই, যশোদার হুকুমে সে সকলের সঙ্গে আসিয়াছে কিন্তু মন কেন খুশি হওয়ার হুকুম মানিবে ?

টিকিট আগেই করা ছিল, সকলে ভিতরে গিয়া বসিল। আরম্ভ হইতে তখনও আধঘণ্টার উপরে দেরি। তবে তাতে কিছু আসে যায় না। অজিত আর যামিনী নিয়মিত সিনেমা দ্যাখে, তারা ছাড়া, এ আধঘণ্টা সকলের কাছেই উপভোগ্য, যে আনন্দ টিকিটের দামে কেনা হইয়াছে তার ফাউ। একেবারে অপরিচিত না হোক এই আলো-ঝলমল গুঞ্জনধ্বনি-মুখরিত ঘনীভূত আধুনিকতার জগতে সময় কাটানোর অভ্যাস যশোদার নাই। সকলের আগে যশোদার মনে হয় চারিদিকের দেয়াল আর ছাদগুলি যেন শিশুকে ভুলানোর জন্যে মুখে রংমাখা সুন্দরী মেয়ের মতো অসহ্য কৌতুকের উদ্ভট মুখভঙ্গি করিয়া আছে। ঘরের দেওয়ালে আনাচে-কানাচে সর্বত্র হাস্যকর অনিয়ম। কোণগুলি কোণ নয়, রেখাগুলি সাপের মতো আঁকাবাঁকা, এখানে ওখানে দু-চারহাত সমতল স্থান যদি বা থাকিয়া গিয়াছে রঙের কায়দায় সেখানটাও দেখাইতেছে উঁচুনিচু। কেমন পছন্দ মানুষের কে জানে, এমন খাপছাড়া ভঙ্গিতে ঘর তৈরি করে আর ঘর সাজানোর মধ্যে এমন কুৎসিত অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে !

হল ইতিমধ্যেই প্রায় ভরিয়া গিয়াছিল, এখনও ক্রমাগত লোক ঢুকিতেছে—ছোটোবড়ো গৃহস্থ পরিবার, স্কুল কলেজের যুবক ও বৃদ্ধ। মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যাই বেশি, রঙিন শাড়ি আর গয়নায় সাজানো পুতুলের মতো বউ আর তার স্বামী, কোনো কোনো স্বামীর কোলে একটি শিশু, আবার অনেক দলে অল্পবয়সি মেয়ে বউয়ের সঙ্গে বাড়ির বয়স্কা গৃহিণীও আছে, সাজগোজটা তার একেবারে তুচ্ছ নয়।

যশোদার মনে হয়, এরা সকলেই যেন তার চেনা মানুষ—ঠিক সামনের সিটের গল্প-বিভোর প্রেমিক প্রেমিকা দুটিকে যেমন চেনে, খানিক তফাতে পাশাপাশি প্রায় তিন গন্ডা সিট দখল করিয়া যে পরিবারটি বসিয়াছে তাদেরও তেমনই চেনে। সবাই যেন তার প্রতিবেশী, পাশের বাড়ির লোক।

কুমুদিনী বলিল, ভিড় হয়েছে তো খুব।

সুব্রতা সগর্বে বলিল, বলিনি ভালো ছবি ? কতদিন হল চলছে, এখনও ভিড় হয়।

যোগমায়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সে শুধু চারিদিকে চাহিতেছিল আর কেউ তার দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে চাহিয়া নাই বলিয়া জ্বালা বোধ করিতেছিল। জমকালো শাড়ি গয়নার অভাবে তার মনে হইতেছিল ভিড়ের মধ্যে সে যেন একটু উলঙ্গ হইয়া বসিয়া আছে। কী ভাগ্যে চেনা কারও সঙ্গে দেখা হইয়া যায় নাই !

যশোদাও চুপ করিয়াছিল। ছবি আরম্ভ হওয়ার আগে হইতেই সে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, কখন নন্দ পর্দায় আসিবে !

কত দেরি হবে শুরু হতে ?

এইবার শুরু হবে।

যশোদার আগ্রহে সুব্রতা মনে মনে একটু হাসিল। যারা কখনও সিনেমায় আসে না, তারা এই রকম অধীর হইয়া পড়ে।

তারপর ঘর অন্ধকার করিয়া ছবি আরম্ভ হইল। যশোদা অন্ধকারে নিশ্চিন্তমনে ব্যাকুল আগ্রহের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে পর্দায় নন্দের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় নন্দ ? এলোমেলো কতগুলি নরনারী পর্দায় নড়াচড়া করিয়া আবোল-তাবোল কী সব বলিয়া গেল, তারপর আবার আলো জ্বলিয়া উঠিল। সুব্রতা কি ভুল করিয়াছে ?

যশোদা সুব্রতাকে জিজ্ঞাসা করিল, কই সেই ছেলেটা তো গান করল না ?

সুব্রতা সবজান্তার মতো বলিল, বই তো এখনও আরম্ভ হয়নি। বেশি বড়ো বই হলে হাফ-টাইমের আগে দেয়। ছোটো বই হলে শিগগিব হাফ-টাইম দিয়ে, পরে দেয়। কমিকটা সুন্দর হয়েছে, না ?

যোগমায়া সব-ভুলিয়া-যাওয়া উজ্জ্বল হাসির সঙ্গে বলিল, সত্যি কী জব্দই হল ছেলেটা মেয়েটার কাছে ! বিয়ে করে তবে রেহাই।

কুমুদিনী বলিল, জব্দ হল কিনা কে জানে !

যোগমায়ার হাসি আরও উছলিয়া উঠিল : সত্যি ! ঠিক ! বিয়ে করতেই তো চাইছিল।

কমিক ? বিয়ের কমিক ? যশোদা রাগ করিয়া সোজা হইয়া বসে। এমন কেন হইয়াছে আজকাল, চোখের সামনে যা ঘটে তাও চোখে পড়ে না ? মনে কষ্ট পাওয়ার কারণ ঘটিয়াছে, মনে কষ্ট হোক, তাতে যশোদার আপত্তি নাই। হাল ভাঙা নৌকার মতো দিশেহারা হইলে চলিবে কেন ?

আসল ছবি আরম্ভ হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নন্দের আবির্ভাব ঘটিল। নন্দই বটে, কিন্তু যেন কোন দেশি নন্দ, একেবারে চেনাই যায় না। সায়েব বাড়ির একটা ঘরে বাঙালি বাড়ির একটা মেয়ে অর্গান বাজাইয়া গান গাহিতেছিল, এমন সময় আসিল সায়েবি পোশাক পবা নন্দ। গান শেষ হওয়া পর্যন্ত মেয়েটি টেরও পাইল না কেউ ঘরে আসিয়াছে, তারপর চমকমারা, লজ্জাভরা আনন্দময় বিস্ময়ের সঙ্গে তাড়াতাড়ি অর্গান ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। তারপর অনেকক্ষণ একটি অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে আর অতি বুদ্ধিমান ছেলের কথাকাটাকাটি, হাসিতামাশা অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি চলিতে লাগিল। প্রথমেই নন্দ একটা গান শোনানোর অনুরোধ জানাইয়াছিল এবং মেয়েটি বলিয়াছিল নন্দর মতো গায়কের সামনে সে কিছুতেই গান করিবে না ; ধেৎ, তাই কী সে পারে, তার লজ্জা করে না বুঝি ? মনে হইতে লাগিল, এ তর্কের জের যেন তাদের মিটিবে না। কথায় কথায় অন্যকথা আরম্ভ করিয়া নিজেদের সম্বন্ধে কত কথাই যে তারা দর্শকদের জানাইয়া দিতে লাগিল, মাঝে মাঝে কত বাড়িব লোক আর বাহিরের কত বন্ধু ও বান্ধবী বাজে ছুতায় আসিয়া দর্শকদেব কাছে কৌশলে নিজেদের পরিচয় জানাইয়া চলিয়া গেল, তারপরেও দুজনের মধ্যে কে আগে গান করিবে এ সমস্যা ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

কেন শুনতে চাইছ গান ?

তোমার গান বলে।

তার মানে আমি গাইতে পারি না। আমার গান বলে কোনোরকমে শুনবে।

তোমার চেয়ে গান দামি, গানের চেয়ে তুমি দামি। গানে গানে সুরের মূর্ছনায় তুমি যখন জগৎ ভরে দাও, আমি নিজেকে ভুলে যাই।

আমিও। তুমি আগে গাও।

না, তুমি আগে।

কী মানে দুজনের এই কথা কাটাকাটির ? যশোদা ভাবিয়া পায় না। সে তো জানে না দুজনের গান সম্বন্ধে দর্শকের কৌতূহল বাড়ানোর এটা কৌশল।

তখন নন্দ বলিল, দুজনে মিলে সেই গানটা গাই এসো।

অর্গানের ধারেকাছেও কেউ গেল না, নেপথ্যে কোথায় যেন গান আরম্ভ হওয়ার আগেই বাজনা বাজিয়া উঠিল—বাঁশি, বেহালা, হারমনিয়াম, তবলা ইত্যাদির ঐকতান।

পালা করিয়া দুজনে গান গায়, কাছাকাছি আসিয়া পরস্পরকে ধরাধরি করে, চোখে চাহিয়া থাকে, হঠাৎ পাক দিয়া তফাতে সরিয়া যায়। সকলে মুগ্ধ হইয়া দ্যাখে আর শোনে।

যশোদা যাত্রায় এ রকম ডুয়েট গান অনেক শুনিয়াছে, তবে এতটা খাপছাড়া আর মার্জিত নয়। যাত্রার ডুয়েট গান যেন কাহিনি আবেষ্টনী আর অভিনয়ের সঙ্গে বেশ মানায়।

তবে এখানে নন্দ আছে।

পর্দার কাহিনি আগাইয়া চলে, কোন দেশের মানুষের কোন দেশি কাহিনি বুঝিয়া উঠিতে গিয়া যশোদার ধাঁধা লাগিয়া যায়। যে ঘটনা ঘটা উচিত সে ঘটনা ঘটে না, যার যে কথা বলা উচিত সে সে কথা বলে না, অথচ মাঝে মাঝে ঘরোয়া ঘটনা উঁকি দিয়া যায়, ঘরোয়া কথা কানে আসে।

আগাগোড়া সবটা রূপকথা হইলে বোধ হয় যশোদা এতটা বিব্রত হইয়া পড়িত না। রূপকথাতেও আগাগোড়া একটা সামঞ্জস্য থাকে। যশোদা যখন ভাবে, এইবার নন্দ রাগ করিবে, নন্দ তখন হালকা হাসি হাসে, নন্দর হাসি দেখিবার আগ্রহে যশোদা যখন সামনে একটু ঝুঁকিয়া পড়ে, নন্দ তখন রাগে আগুন হইয়া ওঠে।

যশোদার নিজেরই তখন রাগ হয়।

তারপর দেখা দেয় সুবর্ণ। সুবর্ণ একটি অপ্রধান পার্টে নামিয়াছে, অল্পবয়সি বউয়ের পার্টে। এই পার্টটিই বোধ হয় সে ভালো অভিনয় করিতে শিখিয়াছে।

যশোদাকে সহজে চমক দেওয়া যায় না, সে ধীরে ধীরে নাড়া খায়। সুবর্ণের উপর যশোদা বিশেষ খুশি ছিল না, ছবি শেষ হওয়ার আগেই মেয়েটার জন্য তার যেন বেশ মায়া জন্মিয়া যায়। মনের তলে একটা আশা যশোদার ছিল বইকী যে একদিন নন্দ আর সুবর্ণ ফিরিয়া আসিবে, দুজনকে সে ক্ষমা করিবে আর ভাই ও ভাইয়ের বউকে নিয়া সংসার করিয়া চলিবে সুখে। এখন মনে হইতে থাকে, নন্দ যেন তার সে আশা চিরদিনের জন্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে, তার ঘরের বউকে করিয়া দিয়াছে সিনেমার অভিনেত্রী। জীবনে আর কোনোদিন সে তার বাড়িতে বউ সাজিয়া থাকিতে আসিবে না।

যশোদা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, আমার মতো ভাগ্যবতী সংসারে কেউ নেই। আমি যা ধরতে যাই তাই ফসকে যায়। যে সুখ আমাব জোটা উচিত ছিল, তা জোটে না। মরণও হচ্ছে না সেই জন্য ?

বাড়ি ফিরিবার পথে সুব্রতা জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে দিদি ? যশোদা সংক্ষেপে বলে, বেশ।

রাজেন গম্ভীর চিন্তিত মুখে মাঝে মাঝে যশোদার মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু কিছু বলে না। মন্তব্য করে কুমুদিনী।

বলে, ছেলেটা ঠিক আমাদের নন্দর মতো নয় ? গলার আওয়াজটা পর্যন্ত এক রকম। প্রথমটা আমি তো—

কেদার বলে, আহা, চুপ করো না ?

কুমুদিনী ফোঁস করিয়া ওঠে, কেন, চুপ করব কেন ?

যশোদা ধীরে ধীরে বলে, নন্দর মতো নয়, ওই আমাদের নন্দ।

ওমা সে কী কথা গো ?

প্রথমে খানিকক্ষণ কুমুদিনী পলক না ফেলিয়া চাহিয়া থাকে, তারপর যেন প্রকাণ্ড একটা সমস্যা সমাধান করিয়া ফেলিয়াছে এইরকমভাবে বারকয়েক মাথা নাড়িয়া বলে, হুঁ, তাই তো বলি, জনে জনে কী এমন মিল থাকে ! কেমনধারা সাজপোশাক করেছে তাই, নইলে কী আর চিনতে একদণ্ড দেরি হত। নন্দ বায়োস্কোপ করছে !

যোগমায়া ধীরে ধীরে বলে, আমি দেখেই চিনেছিলাম।

এ সব আলোচনা যশোদার সহ্য হয় না। সে বিরক্ত হইয়া বলে, চেনা মানুষকে চিনবে, তাতে আশ্চর্যের কী আছে ? কী যেন আরম্ভ করে দিয়েছ তোমরা।

মনে মনে যশোদা ভাবে, নন্দকে চিনিতে পারিল, সুবর্ণকে কেউ চিনিতে পারিল না কেন ?

সমস্ত পথ গম্ভীর হইয়া কী যেন ভাবে কুমুদিনী, বাড়ি ফিরিয়া যশোদাকে একান্তে টানিয়া নিয়া বলে, বলি চাঁদের মা, একটি বউ দেখলাম জ্যোর্তিময়বাবুর বোনের মতো, সে বুঝি—

সে সুবর্ণ।

মাগো ! এ সব কী !

কুমুদিনীর মুখ দেখিয়া মনে হয় সে বুঝি শুধু আশ্চর্য হয় নাই, ভয়ও পাইয়াছে।

পরদিন সকালে রাজেনকে ডাকিয়া যশোদা বলিল, একটা কাজ করে দেবে ?

এ রকম ভূমিকা করা যশোদার স্বভাব নয়। রাজেন একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

কী কাজ ?

নন্দর ঠিকানাটি জেনে আসবে ?

নন্দর ঠিকানা জেনে করবে কী চাঁদের মা ?

যশোদা হাসিল। বেশ মানুষ বটে তুমি, বেশ কথা সুধোচ্ছো।

রাজেন ইতস্তত করিয়া বলিল, মানে কী জান চাঁদের মা, আসবাব হলে নন্দ নিজেই আসত আগে। বায়োস্কোপে পার্ট করলে নাকি ঢের পয়সা পাওয়া যায় শুনেছি, ওর তো পয়সার অভাব নেই—

পয়সার কথা নয়, নিজে থেকে ফিরে আসতে হয়তো সাহস পাচ্ছে না।

তখন নন্দর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া আনিবার কথা দিয়া রাজেন চলিয়া গেল, যশোদা গেল সত্যপ্রিয়র বাড়ি।

হঠাৎ তার মনে হইয়াছে, অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে ঝোঁকের মাথায় বাড়ি ছাড়িয়া গেলে যে অনেক সময় সাধ থাকিলেও ফিরিয়া আসিতে ভরসা পায় না, এ কথাটা সত্যপ্রিয়কে বুঝাইয়া বলা দরকার।

যামিনী স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াক, বউকে নিয়া নিজের ভিন্ন সংসার পাতুক, যশোদার তাতে কোনো আপত্তি ছিল না। মানুষের মধ্যে এ রকম তেজই সে পছন্দ করে। কেবল যোগমায়ার সন্তান সম্ভাবনার জন্য এ সময়টা তাকে নিয়া এ রকম টানাহ্যাঁচড়া করা সঙ্গত নয় বলিয়া প্রথমটা সে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এতকাল যে অনায়াসে শ্বশুরের অন্নধ্বংস করিয়াছে আর কয়েকটা মাস সে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না ? বীরত্ব বা মনুষ্যত্ব তো পাগলামি নয়। বেহিসাবি তেজ দেখানো গোঁয়ারতুমির শামিল।

প্রথমে যামিনী বুক ফুলাইয়া বলিত, কুঁড়েঘরে না খাইয়া দিন কাটাইবে তবু আর জীবনে কখনও শ্বশুরের অন্নধ্বংস করিতে যাইবে না। কিন্তু এখন মুখেও আর সে ও সব কথা বলে না। কিছুদিন পরে সে হঠাৎ একদিন যাচিয়া গিয়া সত্যপ্রিয়ের পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িবে, তাকে কোনোমতেই আটকানো যাইবে না। নিজের পায়ে ভর দিয়া কুঁড়েঘরে স্বাধীন জীবনযাপন করিবার মানুষ সে নয়—একটু নরম হইয়া থাকিলেই সত্যপ্রিয়ের রাজপ্রাসাদে আরামে জীবন কাটানোর সুযোগটা অন্তত যতদিন সামনে উপস্থিত আছে। যোগমায়ারও এ জীবন সহ্য হইতেছে না। এ রকম অবস্থায় ওদের এখানে রাখিয়া কষ্ট দিয়া লাভ কী ? ফিরিয়া যদি যাইতে হয়, ক-মাস পরে যাওয়ার চেয়ে, যোগমায়ার দিক হইতে ধরিলে, এখন যাওয়াই ভালো।

তাছাড়া আর একটা কথাও যশোদার মনে হইতে থাকে—ওদের দুজনকে বাড়িতে রাখিয়া সত্যপ্রিয়কে খোঁচা দেওয়া যাইবে ভাবিয়া নিজের খুশি হওয়ার কথা। প্রতিহিংসার জন্য ওদের কেন সে কষ্ট দিবে ? এই অন্যায় কল্পনা মনে আসিয়াছিল বলিয়া এখন তাহার মনে হয়, ওদের ফিরিয়া যাওয়ার উপায়টা তারই করিয়া দেওয়া উচিত।

সত্যপ্রিয় কাগজ পড়িতেছিল, মুখ তুলিয়া একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই বলিল, এসো চাঁদের মা।

খানিক তফাতে মেঝেতে জাঁকিয়া বসিয়া যশোদা নির্বিকারভাবে বিনা ভূমিকায় বলিল, মেয়েকে এবার ফিরিয়ে আনুন ?

মেয়েকে ফিরিয়ে আনব ? আমি ?

তাতে দোষ কী বলুন ? বাপ তো আপনি ? বড়ো কাঁদাকাটা করছে খুকি। এ সময়টা খুকির পক্ষে—ছেলেমেয়ে হবে ওর জানেন না বোধ হয় ?

জানি।

শুনিয়া যশোদা একটু চুপ করিয়া রহিল।

জেনেও ওদের যেতে দিলেন ?

আমি যেতে বলিনি। ওরা নিজেরাই গেছে।

আটকানো উচিত ছিল আপনার।

কী করে আটকাতাম ? পায়ে ধরে ?

যশোদা তাড়াতাড়ি বলিল, ছি, ও কথা বলতে নেই। অকল্যাণ হয়। যা হবার হয়ে গেছে, এবার ওদের ক্ষমা করুন। ছেলেমানুষ তো, ওরা কী বোঝে ? ফিরে আসবার জন্য মেয়েজামাই আপনার পাগল হয়ে আছে, কেবল না ডাকলে ভরসা পাচ্ছে না আসতে। আপনি যদি ডেকে পাঠান—

সত্যপ্রিয় তার পরিচিত মৃদু হাসির সঙ্গে বলিল, ডেকে পাঠালেই তো ওরা মাথায় চড়ে বসবে, চাঁদের মা।

যশোদা অবাক হওয়ার ভান করিয়া বলিল, মাথায় চড়ে বসবে ? আপনার ? আপনার সামনে মুখ তুলে কথা কইবার সাহস ওদের আছে কিনা সন্দেহ, মাথায় চড়বে ! তা ছাড়া, বেয়াদবি যদি একটু করেই, মেয়েজামাইকে সিধে রাখতে পারবেন না ?

সত্যপ্রিয় ভাবপ্রবণতার চিহ্নও দেখাইল না, শান্তভাবে বলিল, ওরা নিজে থেকেই আসবে।

যশোদাও তা জানিত, কিছুক্ষণ সে আর বলিবার কিছু খুঁজিয়া পাইল না। সত্যপ্রিয়ের নির্বিকার ভাব যশোদাকে সত্যসত্যই দমাইয়া দিয়াছিল। সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে কথা বলার এই একটা মস্ত অসুবিধা, এত সহজে সে মানুষের মধ্যে নিজের প্রয়োজনীয় অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতে পারে, উত্তেজনা, ভয়, আনন্দ, উৎসাহ, হতাশা এ সব যেন নিজের ইচ্ছামতো পরের মধ্যে সংক্রামিত করিবার ক্ষমতা তার আছে। সত্যপ্রিয়ের উদাসীনতা দেখিয়া মনে হয়, মেয়েজামাইয়ের কথাটা আলোচনা করাও সে প্রয়োজন মনে করে না। অতি সাধারণ একটা ব্যাপার, সংসারে এমন অনেক হয়, আপনা হইতেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। এ জন্য মাথা ঘামানোর কিছু নাই। যশোদারও মনে হইতে থাকে, ব্যাপারটা সে যত গুরুতর মনে করিয়াছে, হয়তো তেমন কিছুই নয়। এ বিষয়ে আর কিছু না বলাই উচিত। তবে কোনো কাজ আরম্ভ করিয়া মাঝখানে হাল ছাড়িয়া দেওয়া যশোদারও স্বভাব নয়।

তা হয়তো আসবে, কিন্তু তার তো দেরি আছে। খুকির মুখ চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনাই ভালো। আপনার ছেলেকে যদি পাঠিয়ে দেন—

সত্যপ্রিয় মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি কাউকে পাঠাতে পারব না।

কথাটা সে এমন স্পষ্টভাবেই বলিল, যে মাথা নাড়িবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। যশোদা হাঁটু গুটাইয়া মেঝেতে ডান হাতের তালু পাতিয়া একটু কাত হইয়া মেঝেতে মেয়েদের বসিবার চিরন্তন ভঙ্গিতে বসিয়াছিল। উঠিয়া দাঁড়ানোর ভূমিকা হিসাবে সে এবার সোজা হইয়া বসিল। আর তার কিছুই বলিবার নাই।

সত্যপ্রিয় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, ওরা বুঝি তোমায় পাঠিয়েছে ?

যশোদা বলিল, না।

সত্যপ্রিয় এতক্ষণ অন্যদিকে চাহিয়াছিল, কথা বলিবার সময় সে কদাচিৎ শ্রোতার মুখের দিকে তাকায়। এবার যশোদার চোখে চোখ মিলাইয়া সে খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল,

তারপর মৃদুস্বরে বলিল, অন্য কেউ এ কথা বললে বিশ্বাস করতাম না চাঁদের মা। তবে তোমাব কথা আলাদা। তুমি কখনও মিথ্যা বল না।

সত্যপ্রিয়ের দৃষ্টি দেখিয়া যশোদা এক মুহূর্তের জন্য শিহরিয়া উঠিয়াছিল। যশোদার স্নায়ুগুলি এ রকম শিহরনের উপযোগী করিয়া তৈবি হয় নাই ; বাতদুপুরে হঠাৎ বাড়ির অন্ধকারে একটা ভূত দেখিলেও সে ভালো করিয়া চমকাইযা ওঠে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সত্যপ্রিয়ের দৃষ্টিতে যে ভাষা তার স্পষ্ট চোখে পড়িয়াছে ভূত দেখার চেয়ে তা চমকপ্রদ। ধনঞ্জয়ের চোখে একদিন যশোদা এ ভাষা দেখিয়াছিল, তবে সত্যপ্রিয়ের চোখের এমন বিশ্বগ্রাসী মারাত্মক ক্ষুধার সঙ্গে ধনঞ্জয়ের সেই মৃদু কামনার অভিব্যক্তির তুলনাই হয় না। হঠাৎ যশোদার একটা অদ্ভুত ধরনেব লজ্জা বোধ হয়, অনেক দিন সে রকম লজ্জার সঙ্গে তার পরিচয় ঘুচিয়া গিয়াছিল।

চোখের অস্বাভাবিক দীপ্তি নিভাইয়া সত্যপ্রিয় বলিল, তবু, মেয়েজামাইকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি কিছু করতে পারব না চাঁদের মা। তুমি নিজে যখন এসেছো, আমাব মেয়েব ভালোর জন্য এসেছো, তোমার জন্য আমি এইটুকু করতে পারি—ওদের ক্ষমা করলাম। তুমি গিয়ে ওদের বলতে পার, ওরা যদি ফিরে আসে আমি ওদেব কিছু বলব না।

বাড়ি ফিরিয়া যশোদা নিজের বিস্ময়ে নিজেই হতবাক হইয়া থাকে। তার জীবনে কখনও এমন সমস্যা উদয় হয় নাই। যা সে দেখিয়া আসিয়াছে সত্যপ্রিয়ের চোখে, তাই কী ঠিক ? অন্য আব কী হইতে পারে ? যেভাবে সত্যপ্রিয় তাকে দু-চোখ দিয়া গ্রাস করিতে চাহিয়াছিল তাব তো অন্য কোনো ব্যাখ্যা সম্ভব নয় ? কিন্তু সত্যপ্রিয়েব পক্ষে কী ওটা সম্ভব ? বিশেষত তাকে দেখিয়া ? তাব মতো বিবাটকায মাঝবয়সি রমণীকে সামনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সত্যপ্রিয়েব মতো প্রৌঢ় মানুষেব মধ্যে জোয়ারেব আকস্মিক বন্যাব মতো প্রচণ্ড কামনার উদ্রেক হইতে পারে, এ তো বিশ্বাস কবার মতো কথা নয়।

চোখ বুজিযা বাস্তবকে এড়ানোব ছেলেমানুষি যশোদার মধ্যে নাই। সে জানে, সত্যপ্রিয়েব মতো সবল সুস্থ সংযমী মানুষ প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিযাছে বলিযাই নিভিয়া যায় না। আকস্মিক এবং হয়তো ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের অসংযমকে একেবারে বর্জন করা মানুষের পক্ষে কঠিন। রামাযণ মহাভারতে যশোদা মুনিঋষিরও অনেক অসংযমের কাহিনি পড়িযাছে। কিন্তু সে সব হঠাৎ-জাগা ভালোবাসা জাগাইত অনন্যসাধারণ রূপবতী যুবতি মেযেরা। যশোদাকে দেখিলে রাস্তার গুন্ডাও যে ভড়কাইযা যায় !

সত্যপ্রিয়কে যশোদা ভালো করিয়াই চেনে, এক এক সময় ব্যাপারটা তার বড়োই কৌতুকজনক মনে হয়, আবার পরক্ষণে সে বুঝিতে পারে এর মধ্যে কৌতুকের কিছু নাই, বিষয়টা অতীব গুরুতর। সত্যপ্রিয় যা কিছু চায়, প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গেই চায়। প্রত্যেকটি কামনার এ রকম অস্বাভাবিক প্রচণ্ডতাই সত্যপ্রিয়কে এ রকম হৃদযহীন, নিষ্ঠুর করিয়াছে। বিরক্তি বোধ করিলে ভূমিকম্পেব জন্য সত্যপ্রিয় পৃথিবীকে পদাঘাত করিয়া ছাড়ে। পায়ে একটা কাঁটা ফুটিলে হয়তো জগতের সমস্ত কাঁটা নষ্ট করিয়া ফেলা সম্ভব কিনা এই কল্পনাকেও সে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু সে ভাববিলাসী নয়, বাস্তবকে সে এড়াইয়া চলে না—তার মতো হিসাবি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ফন্দিবাজ, সংযমী আর স্বার্থপর মানুষ যশোদা খুব কমই দেখিয়াছে। মানুষকে পায়ের নীচে চাপিয়া রাখাব কামনা সম্বন্ধে হয়তো সে অসংযত, নিজের মতামত প্রচার করার স্বপ্ন দেখিবার বেলা হয়তো সে অবাস্তব, অসম্ভব কল্পনার ক্রীতদাস—কিন্তু তাও যে ইচ্ছাকৃত দুর্বলতা, জানিয়া বুঝিয়া নিজেকে একটু খেলার সুযোগ দেওয়া।

অথবা মোটের উপর মানুষটা আসলে পাগল ?

এই সব চিন্তায় কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। তারপর একদিন সকালে পিয়ন আসিয়া একখানা খাম দিয়া গেল যশোদার নামে। খামের মধ্যে কারও ব্যক্তিগত চিঠি ছিল না, ছিল একটি নোটিশ। শহরতলির উন্নতির জন্য যশোদার বাড়ির উপর দিয়া নূতন রাস্তা যাইবে, যশোদার বাড়ি আর

শহরতলি উপন্যাস সূচনার খসড়া

অহিংসা

অহিংসা প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

এক

সদানন্দ সাধুর আশ্রমের তিন দিকটা তপোবনের মতো। বাকি দিকটাতে একটা নদী আছে। আশ্রম ঘিরিয়া অবশ্য তপোবনটি গড়িয়া ওঠে নাই, স্থানটি তপোবনের মতো নির্জন আব শান্তিপূর্ণ দেখিয়াই আশ্রম গড়িয়া তোলা হইয়াছে। আশ্রমের বয়স আর কত হইবে, বছর পাঁচেকের বেশি নয়। তপোবনের বড়ো বড়ো গাছগুলির কোনো কোনোটা হয়তো শতাব্দীর বেশি সময ধবিয়া নিবিড় ছায়া বিলাইয়া আসিতেছে।

তপোবনের সমস্তটা আশ্রমের সম্পত্তি নয। দলিলপত্রের হিসাবে দেখা যায়, আশ্রমের ভূমির পরিমাণ শখানেক বিঘার কাছাকাছি। তপোবন আরও বিস্তীর্ণ—উত্তবে বাসুপুরের গা-ঘেঁষা প্রকাণ্ড কলাবাগান এবং দক্ষিণে সাতুনার বাগদিপাড়া পর্যন্ত এলোমেলাভাবে ছড়ানো আরও বড়ো আমবাগানটা ধরিলে আশ্রমের ভূমির দশ-বারোগুণ। তবে দলিলপত্রে ছাড়া আশ্রমের সীমানা ভালো করিয়া কোথাও দেখানো নাই কিনা, তাই বন, উপবন, আমবাগান, কলাবাগান সমস্তই আশ্রমের তপোবন বলিয়া মনে হয়।

নদী পুবদিকে।

একটি শাখানদীর এই উপশাখাটিকে স্থানীয় লোক আদর করিয়া ডাকিত রাধা বলিয়া, বোধ হয় আদরের আতিশয্যেই একটা ইকার জুটিয়া এখন হইয়াছে রাধাই।

বড়ো আশ্চর্য নদী। প্রতি বছর বাঁচে আর মরে। আকাশে যেই কালো কালো মেঘ জমিয়া থমথম করে, লোকে জল আটকানোব জন্য চালেব ফুটা আর ছাতির ফুটা মেরামত না করিয়া আর উপায় খুঁজিয়া পায় না, রাধাই নদীতে অমনি দেখা দেয় ঘোলা জলের স্রোত। ক-মাস ধরিয়া রোদে যে বালি তাতিয়াছে সে বালি যায় ঢাকিয়া, স্থানে স্থানে যে আবদ্ধ জল পচিয়া উঠিতেছিল সে জল যায় ভাসিয়া। সকলে অবাক হইয়া একবার তাকায় আকাশের দিকে, একবার তাকায় রাধাই নদীর দ্রুতবর্ধনশীল জীবনসঞ্চারের দিকে। বড়ো রহস্যময় মনে হয় ব্যাপারটা সকলেব কাছে। বৃষ্টি আর হইযাছে কতটুকু, ক-দিনের ছাড়া ছাড়া বর্ষণে পথঘাট ভালো করিয়া ভেজে নাই পর্যন্ত। কোনো পুকুরে জল বাড়ে নাই, কোনো ডোবায় জল জমে নাই। রাধাই এত জল পাইল কোথায় ?

দূর দেশে কোথায় ইতিমধ্যে প্রবল বর্ষা নামিয়াছে, কোনো বড়ো নদী সেই জল বহিয়া আনিয়া কোনো শাখানদীকে দিয়াছে, আর কোনো শাখানদীর দানে তাদের এই নদীতে দেখা দিয়াছে নবযৌবনের আবির্ভাব, এতসব রহস্যের সন্ধান কজনে আর রাখে। চোখের সামনে মরা নদীকে বাঁচিতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হয।

নদীর একেবারে ধারে প্রকাণ্ড চালাটায় বিকালের দিকে সাধুজির দর্শনকামীদের সমাগম হয়। আশ্রমের সকলে তো উপস্থিত থাকেই, কাছাকাছি গ্রাম হইতে অনেকে আসে, দূরের গ্রাম ও শহর হইতেও আসে। সদানন্দ সকলকে দর্শন দেয়, দর্শনের মনোমতো ব্যাখ্যাও শোনায়।

এবার যেদিন প্রথম রাধাই নদীর বুকে স্রোত দেখা দিল, সেদিন অহিংসা ও প্রেমের কথা বলিতে বলিতে সদানন্দ হঠাৎ আনমনে চুপ করিয়া গেল। নদীর স্রোতের দিকে পলকহীন চোখে এমনভাবে চাহিয়া রহিল যে, কারও বুঝিবার উপায় রহিল না, অন্যমনস্ক সে ইচ্ছা করিয়া হইয়াছে। আজ কথা জমিতেছিল না। যার কথা মনের মধ্যে কাঁটার মতো বেঁধে, মধুর মতো মাখা হইয়া যায়, মধুপের মতো গুঞ্জন করে, শুনিতে শুনিতে থাকিয়া থাকিয়া হয় রোমাঞ্চ, আজ যেন তার কথায় জোর নাই, সুর নাই—নিছক কতকগুলি নীরস ভোঁতা শব্দমাত্র পরিবেশন করিতেছে। অস্বস্তি বোধ করিতে

করিতে এতক্ষণে কারণটা টের পাইয়া সকলে স্বস্তিলাভ করে। তাই বটে, সাধুজি আজ অন্যমনস্ক হইয়া আছেন। কথায় সাধুজির মন নাই।

পুরুষরা চুপ করিয়া রহিল, মেয়েদের মধ্যে শোনা গেল ফিসফিস কথার গুঞ্জন। এখানে মেয়ে-পুরুষের বসিবার পৃথক ব্যবস্থা নাই, সদানন্দ পুরুষ ও নারীর পার্থক্য স্বীকার করে, পৃথক রাখিবার প্রয়োজন স্বীকার করে না। এই সভায় যারা বসে তাদের মধ্যে যেমন ছোটোবড়ো নাই, জানা-অজানা নাই, আপন-পর নাই, তেমনই মেয়ে-পুরুষও নাই। অন্তত সাধুজির তাই নির্দেশ। তবু, মেয়েরা দল বাঁধিয়া একপাশে তফাতে সরিয়া বসে, ব্যবধানটা ঘুচাইবার চেষ্টাও পুরুষদের মধ্যে কখনও দেখা যায় না। চালার নীচে স্থানাভাব ঘটিলেও নয়।

চালার কাছে খানিকটা জায়গা গাছপালা কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখানে গাছের ছায়া নাই। তপোবনের মাথা ডিঙাইয়া বাঁকাভাবে রোদ আসিয়া মেয়েদের বসিবার জায়গায় পড়িয়াছে, বড়ো তেজ এখানকার রোদের। ঘামে সকলে ভিজিয়া গিয়াছে, তবু সরিয়া ছায়ায় গিয়া বসিবার সাহস কারও নাই। একটি কমবয়সি বিধবা, গায়ের রংটা যার আশ্চর্যরকমের ফরসা, মুখখানা সিঁদুরের মতো রাঙা করিয়া চোখ বুজিয়া পাশের ঘোমটা-টানা বউটির গায়ে নির্লজ্জ ভঙ্গিতে হেলান দিয়া আছে, হয় মূর্ছা গিয়াছে, নয় যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে।

আনমনে নদীর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই সদানন্দ বলিল, মেয়েদের গায়ে রোদ লাগছে বিপিন।

বিপিন সদানন্দের বন্ধু, শিষ্য এবং আশ্রমের জেনারেল ম্যানেজার। একদিন সে সদানন্দের নাম ধরিয়াও ডাকিত, হাসিতামাশাও করিত। আজও অন্তরালে করিলে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু দশজনের সামনে আনমনে হঠাৎ ভুল করিয়া বসিবার ভয়ে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সব সময়েই সে শিষ্যত্বের খোলসটা বজায় রাখিয়া চলে।

বিপিন হাতজোড় করিয়া বলিল, কী করব প্রভু ?

ছায়ার ব্যবস্থা করে দাও।

দিই প্রভু।

হোগলার বেড়া আনিয়া চালার খুঁটিতে ঠেস দিয়া দাঁড় করাইয়া বিপিন অল্পক্ষণের মধ্যেই ছায়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল। আগেও কদিন মেয়েরা রোদে কষ্ট পাইয়াছে, রৌদ্র নিবারণের এমন সহজ উপায় থাকিতে আগে কেন এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই, কে তা অনুমান করিবে ! হয়তো কারও খেয়াল হয় নাই—সদানন্দেরও নয়। হয়তো তফাতে জমাট বাঁধিয়া বসিবার জন্য মেয়েদের উপর সদানন্দের রাগ হইয়াছিল, তাই কদিন তাদের রোদে ভাজা করিয়া শাস্তি দিয়াছে। আজ বিধবা মেয়েটির রাঙা মুখখানা দেখিয়া মায়া হইয়াছে। কিন্তু রাগ কি সদানন্দের আছে ? শাস্তি কি কারোকে সে দেয় ? মায়া কি তার হয় ? শুধু তাকে দর্শন করিয়া আর তার দর্শনের ব্যাখ্যা শুনিয়া কে তা অনুমান করিতে পারিবে !

মেয়েরা ছায়া পাওয়ামাত্র সদানন্দ মুখ ফিরাইল। মেয়েদের মৃদু গুঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেল। প্রেম ও অহিংসা সম্বন্ধে না জানি সাধুজি এবার কী বলিবে ?

নদীতে এবার অনেক আগে জল এল, না বলাই ?

কোথায় প্রেম ও অহিংসা, কোথায় রাধাই নদীতে জল আসা। কোথায় শতরঞ্চি জোড়া ভদ্রলোকের ভিড়, কোথায় এককোণে মাটির আসনে সাতুনার মূর্খ দোকানদার বলাই। বলাই নামে একজন যে আসিয়া আসরের একপাশে বসিয়াছে, তাই বা এতক্ষণ কজনে খেয়াল করিয়াছিল ? বলাই কৃতার্থ ও নির্বাক হইয়া রহিল।

তার হইয়া জবাব দিল শ্রীধর, অনেক বয়স হইয়াছে শ্রীধরের, ষাটের কাছাকাছি। সাতুনায় সে সম্পন্ন গৃহস্থ, তিন-তিনটা রোজগেরে ছেলে লইয়া মস্ত সংসার পাতিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত পাঠ

করিতে সে অদ্বিতীয়, সুতাবাঁধা চশমা আঁটিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বাড়িতে সে বামায়ণ মহাভারতের বাছাবাছা অংশ পাঠ করে, মাঝে মাঝে থামিয়া অতি সবল ও সহজবোধ্য কাহিনির রসালো ব্যাখ্যা করিয়া শোনায়। তার বাড়িতে প্রায়ই এ রকম সভা বসে, তবে এত বড়ো নয়। আর সে সভায় ভদ্রলোক আসে না, সে শুধু চাষি-মজুর তেলি-তাঁতি কামার-কুমোরের সভা।

বিপিনের অনুকরণে হাতজোড় করিয়া শ্রীধর বলিল, চারবাদলা নেমে গেছে আজ্ঞা।

চারবাদলা নামার সঙ্গে বাধাই নদীতে জল আসার সম্পর্ক কী ? চারবার বৃষ্টি হইয়া গেলেই রাধাই নদীতে জল আসে। চিরদিনের নিয়ম। টিপটিপ কবিয়া দু-চার ফোঁটা জলই পড়ুক আর ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি-ভাসানো বাদলাই নামুক, চারবার বর্ষণ হইয়া গেলে নদীতে জল আসিবেই আসিবে। সদানন্দ মৃদু হাসে। জবাব দিয়াছে শ্রীধর, কিন্তু স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সকলকে তিরস্কাব কবিয়া বলে, এ সব ধারণা পোষণ করা কেন, এ ধরনের সব কুসংস্কার ? সাধুজির স্নেহমধুর আবেগভরা ধমক শুনিয়া মনে হয়, আর যে সব কুসংস্কার তাদের আছে সে সব যেন কিছু নয়, এটাই তাদের কুসংস্কারের চরম। মনে মনে এই কুসংস্কার পুষিয়া বাখিয়া ইহকাল পরকাল সব তারা নষ্ট কবিয়াছে। তারপব শুষ্ক নদীতে হঠাৎ স্রোত দেখা দিবাব কারণ সে ব্যাখ্যা করে। ব্যাখ্যা করিতে করিতে আসে রহস্যময়ী প্রকৃতির আসল রহস্য কোথায় মানুষ যে তার সন্ধান জানে না, এ কী সহজ আপশোশেব কথা ! অজানার মধ্যে মানুষ প্রকৃতিব বহস্যকে খুঁজিয়া মরে—রাধাই নদীতে জলসঞ্চাবের কারণ না জানা'ভাবে, এই বুঝি তবে প্রকৃতিদেবীর দুর্বোধ্য লীলার অভিব্যক্তি। জানামাত্র যখন অজানার সমস্ত রহস্যের আববণ খসিয়া যায়, অজানার জন্য মাথা ঘামানো কেন ? জানার মধ্যে যে যতটুকু জানে তাবই মধ্যে, প্রকৃতির সবটুকু বহস্যের খনি নিহিত থাকে। বাধাই নদীতে জলস্রোত আসিবার কারণ নাই বা জানিলে, জলস্রোত যে আসিয়াছে এটুকু তো জানো ? এই জানাটুকুর মধ্যে সন্ধান করো, রহস্যানুভূতির অজ্ঞাত জগতেব দিগন্তে আত্মজ্ঞানের ছায়া নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বের সংকেতে তোমায সাড়া দিতেছে দেখিতে পাইবে।

সকলে মশগুল হইয়া শোনে। এতক্ষণে আসব জমিয়াছে। শুধু সদানন্দের বলিবাব কৌশলে প্রত্যেকেব মনে হয় দুর্বোধ্য কথাগুলি যেন জলের মতো বুঝিয়া ফেলিয়াছে। কী বুঝিয়াছে এ কথা কেউ ভাবে না, বুঝিতে পারিয়াছে এই ধাবণাব উন্মাদনায় বিভোর হইয়া থাকে। বিপিনেব শীর্ণ ম্লান মুখে আনন্দেব ছাপ পড়ে। আজ প্রণামি জুটিবে ভালো।

মাঝে মাঝে দু-একজন নতুন শ্রোতা আসিয়া চুপিচুপি আসবের একপাশে বসিয়া পড়িতেছিল। দেরি হওয়ায় তারা গ্রাম হইতে ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিযা আসিযাছে, কিন্তু তপোবনে ঢুকিবার পর আর তাদের ব্যস্ততা নাই। সমস্ত তপোবন পাব হইয়া চালায় পৌঁছিতে হয়, সেই অবসরে তপোবন তাদের শান্ত করিয়া দিয়াছে। না, তাড়াহুড়া করিবার কিছু নাই। সাধুজির কথা যদি শেষ হইয়া যায়, তাতেই বা কী ? আবেক দিন সময়মতো আসিলেই হইবে। সদানন্দেব কথা শুনিবার আগ্রহে যারা ছুটিয়া আসে তাদের সকলের মনেই তপোবন কমবেশি প্রায় এই রকম প্রভাব বিস্তার করে, সমস্ত আগ্রহ, সমস্ত অধীরতা যেন জুড়াইয়া যায়, আশা-আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা থাকে না। পতঙ্গ যেমন মধুতে ডুবিয়া চাপল্য হাবায়, তপোবনের উদ্ভিদগুলির রক্ষণাবেক্ষণে যে নিবিড় শান্তি আছে তার অদৃশ্য ঘনত্বের কবলে আসিয়া পড়ামাত্র মানুষের মনের বিভিন্ন গতিগুলি তেমনই সংযত হইয়া যায়।

তবে সকলের নাগাল তপোবন পায় না। কত অনন্যমনস্ক জীব আছে জগতে, কত মন ইন্দ্রিয়ের মৃদুতর উপচারগুলি নির্বিচারে প্রত্যাখ্যান করে, কত মানুষ নিজের চারিদিকে লইয়া বেড়ায় দুর্ভেদ্য আবরণ।

আট বেয়ারার হুমহুম শব্দে তপোবনকে কিছুক্ষণের জন্য নিছক জঙ্গলে পরিণত করিয়া একটি পালকি একেবারে আশ্রমের ভিতরে আসিয়া থামিল, সদানন্দের তিনমহাল কুটিরের সামনে। আসর

বসিবার চালা হইতে সদানন্দের কুটির বেশি তফাতে নয়, একটা বাঁশঝাড় এবং কয়েকটা জাম ও বকুলগাছের জন্য চোখে পড়ে না।

না দেখিয়াও অনুমান করা গেল কে আসিয়াছে। মহীগড়ের রাজা ছাড়া আট বেয়ারার পালকিতে আর যারাই চাপুক, আশ্রমে তারা আসে না। সদানন্দের কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিপিন ব্যস্ত হইয়া নিবেদন করিল, রাজাসাহেব দর্শনলাভ করতে এসেছেন প্রভু।

এখানে আসতে বলো।

এখানে প্রভু ?

সদানন্দের আকস্মিক বিদ্রোহ বিপিন প্রত্যাশা করে নাই, মুখে অনেকগুলি রেখা সৃষ্টি করিয়া সে চাহিয়া রহিল। হোক গুরুদক্ষিণা, আশ্রমের ভূমি তো রাজাসাহেবের দান, নিজে সে আশ্রমে পায়ের ধুলা দিয়াছে তাই কি যথেষ্ট নয় ? তার প্রজাদের এই আসরে তাকে ডাকিয়া আনার তো কোনো মানে হয় না ! যার কলমের এক খোঁচায় আশ্রম উঠিয়া যাইতে পারে, সে শিষ্য হইলেও তাকে একটু, খুব সামান্য একটু, খাতির করিলে দোষ কী ?

রাধাই নদীর ঘোলাটে জলস্রোতই যেন আজ সদানন্দকে আনমনা করিয়া দিতেছে। বিপিনের প্রশ্নের মানে বুঝিতে দুবার শুনিতে হয় না, মুখের রেখা, চোখের দৃষ্টির মানে বুঝিতে দুবার চাহিতে হয় না। আনমনা হইয়া না-বুঝার ভান করাই সবচেয়ে সহজ।

হ্যাঁ, বলো গে আমি এখানে আছি।

বহুকাল শিষ্যত্বের অভিনয় করিতে করিতে কীভাবে যেন বিপিনের সংযম অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তা ছাড়া মানুষটা সে বড়ো চালাক, ভাবিয়া-চিন্তিয়া ফন্দি না আঁটিয়া কখনও সে কিছু করে না, যদি বা করে অন্তরালে করে। জীবনের সমস্ত অসংযম তার গোপনীয়। সদানন্দের বোকামিতে রাগে গা জ্বলিয়া গেলেও তাই সে শুধু বলিল, প্রভু ?

সদানন্দ চুপ। আনমনে কথা বলার চেয়ে নীরবে আনমনা হওয়া ঢেব সহজ। একটু অপেক্ষা করিয়া বিপিন কুটিরের দিকে চলিয়া গেল। আর ফিরিয়া আসিল না। সূর্য নামিয়া গেল তপোবনেব গাছের আড়ালে, মেয়েদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল, সকলকে পা ছুঁইয়া প্রণাম করিবার ও প্রণামি দিবার অনুমতি দিয়া সদানন্দ ঠায় বসিয়া রহিল রক্তমাংসের দেবতার মতো। দেবতার মতোই তার মূর্তি, বটতলার ছবির মহাদেবের ছাঁচে ঢালিয়া যেন তার সৃষ্টি হইয়াছে। আসন করিয়া বসায় ভুঁড়ি গিয়া প্রায় ঠেকিয়াছে পায়ে এবং তাতেই যেন মানাইয়াছে ভালো। নয় তো এই বৃষস্কন্ধ বিশালদেহ পুরুষের চওড়া বুক আর পেশিবহুল সুডৌল বাহু দেখিয়া মনে হইত, দেহের শক্তি ভিন্ন আর বুঝি তার কিছু নাই। কথায় তাহা হইলে মানুষ মুগ্ধ হইত, কারও ভক্তি জাগিত কিনা সন্দেহ। মাথায় জটা নাই বলিয়াই ভক্তেরা অনেকে মনে মনে আপশোশ করে। যার সৌম্য প্রশান্ত মূর্তি স্থৈর্যের নিখুঁত প্রতীক, জটা ছাড়া কি তাকে মানায় ?

সদানন্দের কুটিরে সদর আর কিছুই নয়, বড়ো একখানা ঘর। মেঝে লাল সিমেন্ট করা, দেয়াল গেরুয়া রঙের, বাদামি ভাবটা একটু প্রকট। আশ্রমের ছোটোবড়ো সমস্ত ঘরই এই ধরনের, উপরের ছাউনি ছাড়া বাকি সব চুনসুরকি ইটকাঠের ব্যাপার। কিন্তু বিপিনের ভাষায় এগুলি সব কুটির।

সদরের ঘরখানায় কতকটা বৈঠকখানার কাজ চলে, মাঝে মাঝে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ছোটোখাটো সভাও বসে। তবে সে সভা হয় অনেকটা ঘরোয়া মজলিশের মতো, সকলে অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা পায়। সদানন্দকে যেমন ব্যক্তিগত সুখদুঃখ দ্বিধাসন্দেহ নিবেদন করা চলে, তেমনই চলে নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা, এমন কী উঁচু গলায় তফাতের মানুষকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করা চলে, কেমন আছ ভায়া। শিষ্য ও ভক্তের ব্যক্তিত্বকে এখানে সদানন্দ প্রশ্রয় দেয়, নদীর

ধারে আটচালার নীচে এদের সঙ্গে তার যে ব্যবধানটা থাকে প্রায় দেবতা ও অধঃপতিতের, এখানে সেটা হয় অবতার ও মানুষের। কত তুচ্ছ বিষয়েই মাথা ঘামায় সদানন্দ, কত তুচ্ছ মানুষের কত তুচ্ছ পারিবারিক জীবনের কত তুচ্ছ খবরই যে জানিতে চায়। আগ্রহ দেখায় না বটে, দুঃসংবাদে বিচলিতও হয় না, সুসংবাদে খুশিও হয় না, তবু নির্বিকার সহিষ্ণুতার সঙ্গে কান পাতিয়া সব কথা তো শোনে, মুখ ফুটিয়া তো বলে, তাই নাকি অথবা বেশ বেশ।

সদর পার হইয়া আসিলে অন্দরের উঠান, ফুলের চারায় ও ফলের গাছে বাগানের মতো। একপাশে প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো ইঁদারা, জল বড়ো মিষ্টি আর ঠান্ডা। গরমের দিনে সূর্য যখন পাতার উপরে থাকে আর ইঁদারার নতুন সিমেন্ট করা গোলাকার চওড়া বাঁধটা হইয়া থাকে আগুন, হামাগুড়ি দিয়া একটিবার শুধু ক্ষণেকের জন্য ভিতরে উঁকি দিলে মনে হয়, জলে ডুবিয়া মরাই বুঝি ভালো। পূর্ণিমার চাঁদের আলোতেও অত নীচের জল তো দেখা যায় না, গরমের দিনে রাত্রে তাই যেভাবেই হোক মরার সাধ জাগানোর জন্য খালি গায়ে ঠান্ডা সিমেন্টে গা এলাইয়া দিতে সাধ যায়। ফুরফুরে হাওয়া থাক, অথবা দারুণ গুমোট হোক, রাশি রাশি ফুলের ঘন মিশ্রিত গন্ধে প্রথমে মন কেমন করিয়া ঘুম আসিয়া পড়ে, এইটুকু যা অসুবিধা। একদিনও কী সদানন্দ পুরা একটা ঘণ্টা জাগিয়া থাকিতে পারিয়াছে!

উঠানের একদিকে সদর, বাকি তিন দিকেই প্রায় ঘর—কোনো ঘরের সামনে বারান্দা আছে, কোনো ঘরের সামনে নাই। অন্দর পার হইয়া নদীর দিকে অন্তঃপুর। অন্তঃপুরেও উঠান আছে, তবে অন্দরের উঠানটির তুলনায় আকারে অনেক ছোটো আর আগাগোড়া সিমেন্ট করা। না আছে ফুলের চারা, না আছে ফলের গাছ, শুধু ঝকঝকে তকতকে মাজাঘষা পরিচ্ছন্নতা। এককোণে কেবল একটা তালগাছ আকাশে মাথা তুলিয়াছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় বুঝি জীবন্ত কিছু, চিরদিনের জন্য সদানন্দের অন্তঃপুরে বন্দী হওয়ায় ব্যাকুল আগ্রহে মাথা উঁচু করিয়া বাহিরের জগতে উঁকি দিতেছে। গাছটায় ফল ধরে না, কোনোদিন নাকি ধরিবেও না।

অন্তঃপুরে ঢুকিবার একটি খিড়কি পথ আছে। নদীর দিকে প্রাচীরের গায়ে বসানো ছোটো একটি দরজা। ঘরের জানালা দিয়া সারাদিন সদানন্দ আজ রাধাই নদীতে জলের আবির্ভাব দেখিয়াছিল, তারপর খিড়কির দরজায় বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া গিয়াছিল আটচালার সভায়। এখন মন্থরপদে ফিরিয়া আসিয়া শিকলতোলা দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, বাহিরের মায়া-মদপায়ী মাতালের মতো ভুঁড়ির উপর দুটি হাত রাখিয়া সামনে পিছনে একটুখানি টলিতে টলিতে। বিড়বিড় করিয়া কী যে বলিতে লাগিল, নিজের কানেই তা গেল না। নিজের কথা শুনিবার স্পৃহাও আর নাই। মনে তার শান্তি নাই কেন, এত মানুষকে সে শান্তি বিলাইতেছে? এত ক্ষোভ কেন তার, এমন আকস্মিক ক্রোধের সঞ্চার? কারও সে ক্ষতি করে নাই, কারও উপরে তার হিংসা নাই, বিদ্বেষ নাই, বিপিনের কাণ্ডে মাঝে মাঝে রাগও হয়, ঘৃণাও জাগে বটে, কিন্তু বিপিনকে সে ভালোই বাসে, এ জগতে বিপিন তার সবচেয়ে আপন, একমাত্র প্রাণের বন্ধু। এমন জ্বালাভরা অস্থিরতা তবে সে বোধ করে কেন? ভাবিতে ভাবিতে বাহিরের মায়ার নেশা যেন গাঢ় হইয়া আসে, আশ্রমে ঢুকিতে অনিচ্ছা বাড়িয়া যায়। শিকল খুলিয়া সদানন্দ তাই গায়ের জোরেই অন্তঃপুরে ঢুকিয়া পড়ে, সশব্দে ভিতর হইতে খিল বন্ধ করিয়া দেয়।

উঠানের তালগাছে ঠেস দিয়া একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সদানন্দের বিরক্তির সীমা থাকে না। রাগ করিয়া বলে, কে গা তুমি? কী করছ এখানে?

চুপ। আমি কেউ না।

কথাগুলি জড়ানো কিন্তু গলাটি মিষ্টি—অল্পবয়সি মেয়ে। দক্ষিণের বড়ো ঘরের বারান্দায় আর পশ্চিমের ছোটো ঘরখানার রোয়াকে দুটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে, মেয়েটির গায়ে আলো পড়িয়াছিল যথেষ্ট।

সদানন্দ চাহিয়া দেখে নাই, নতুবা বুঝিতে পারিত, মেয়েটি আশ্রমের কেউ নয়। এত কমবয়সি মেয়েও আশ্রমে কেউ থাকে না, আশ্রমে মেয়েদের বেশভূষাও এ রকম নয়।

কাণ্ডটা বিপিনের বুঝিতে পারিয়া সদানন্দের বিরক্তি আরও বাড়িয়া গেল। আগে হইতে কিছু না জানাইয়া বিপিন যে কোথা হইতে এ রকম এক একটি খাপছাড়া মেয়েকে আনিয়া হাজির করে ! গত বৈশাখের মাঝবয়সি স্ত্রীলোকটিকে ধরিলে এটি বিপিনের সাত নম্বরের ম্যাজিক। পালকিতে তবে মহীগড়ের রাজাসাহেব আসে নাই, আসিয়াছেন ইনি। বৈশাখের ব্যাপারে সদানন্দ ভয়ানক রাগ করায় বিপিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর এ সব ঘটিবে না, কোনোদিন নয়। ক-মাসের মধ্যেই বিপিন প্রতিজ্ঞার কথাটা তাহা হইলে ভুলিয়া গিয়াছে। ভুলিয়া যাওয়ার আগে একটু আভাস দেওয়াও দরকার মনে করে নাই, তাকে যে কথা দিয়াছিল সেটা মানিয়া চলা সম্ভব হইবে না। দুঃখে অপমানে নিজেকে সদানন্দের একান্ত অসহায় বলিয়া মনে হয়। বিনামূল্যে কিনিয়া বিপিন যেন তাকে ক্রীতদাস করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এবার সে ছাড়িবে না, এবার একটা চরম বোঝাপড়া করিতে হইবে বিপিনের সঙ্গে।

খুব বেশি বিব্রত বোধ না করিলে অন্তঃপুরের উঠানে খাপছাড়া নিঃসঙ্গ তালগাছটার গুঁড়িতে মেয়েটাকে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সদানন্দের হয়তো মনে হইত, মন্দ মানায় নাই। কবে কে দা-কুড়াল কিছু একটা অস্ত্র দিয়া আঘাত করিয়াছিল গাছটার গুঁড়িতে, সেই ক্ষতের চিহ্ন, মাটি ঘেঁষিয়া কয়েকটা সরু সরু শিকড়ের ইঙ্গিত, সিমেন্টে বিপিন কবে আনমনে পানের পিক ফেলিয়াছিল তার প্রায় মুছিয়া যাওয়া দাগ, হাত দেড়েক তফাতে নর্দমার কাছে এক বালতি জল আর একটা ঘষামাজা ঘটি আর এই আবেষ্টনীর মধ্যে অতিরিক্ত একটি মেয়ে। কিন্তু রাগে সদানন্দ অন্ধকার দেখিতেছিল।

রাগ চাপিয়া কোনোরকমে সে বলিল, এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন বাছা, ঘরে গিয়ে বোসো ?

আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি, তোমার কী ?

জড়ানো সুরে কথাগুলি বলিয়া গাছের আশ্রয় ছাড়িয়া সদানন্দের ঝকঝকে তকতকে সিমেন্ট করা উঠানে হিলতোলা জুতা ঠুকিয়া মেয়েটি আগাইয়া আসিল কাছে, খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিল সদানন্দের হাত। হয়তো টাল সামলানোর জন্য।

তুমি সাধুজি, না ?

মুখে তীব্র মদের গন্ধ, যে গন্ধে সদানন্দের চিরকাল বমি আসে। জবাব না পাইয়াও আহ্লাদে মেয়েটি যেন গলিয়া গেল, দুহাতে সদানন্দের গলা জড়াইয়া গদগদ হইয়া বলিল, শোনো, আমি কেউ নয় বললাম না এক্ষুনি তোমাকে, তা সত্যি নয়। আমি মাধবী, মাধবীলতা—লতাটা কেটে বাদ দিয়েছি একদম।

বলিয়া খিলখিল করিয়া মাধবীর কী হাসি ! গলায় জড়ানো হাতের বাঁধন খুলিয়া সদানন্দ তাকে ঠেলিয়া দিয়া ঘরে চলিয়া গেল। পড়িয়া গিয়া আঘাতের ব্যথায় মাধবীলতা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাধবীলতার কান্না শুনিয়া পুবের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল বিপিন আর সাহেবি পোশাক পরা একটি যুবক, দুজনে ধরাধরি করিয়া মাধবীলতাকে লইয়া গেল ঘরে। মাধবীলতা কাঁদিতে কাঁদিতে কেবলই নালিশ করিতে লাগিল, সাধুজি আমায় মেরেছে, ঠেলে ফেলে দিয়েছে। আমি এখানে থাকব না, আমায় নিয়ে চলো।

আট বেয়ারার পালকি চাপিয়া মহীগড়ের রাজা আজ আসে নাই। আসিয়াছে রাজপুত্র। মাধবীলতাকেও সঙ্গে আনিয়াছে সেই। আনিয়াছে পালকির মধ্যে এককোণে লুকাইয়া। একেবারে অন্দরে ঢুকিয়া পালকি থামিয়াছে, রাজাসাহেব স্বয়ং রানিসাহেবাকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে আসিলে যেখানে থামে। রাজপুত্রের গায়ে ভর দিয়া মাধবীলতা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে।

অন্দর তখন এক রকম ফাঁকাই ছিল, তবু মহীগড়ের রাজার বদলে রাজপুত্র আব রানিব বদলে মাধবীলতার আগমন কারও নজরে পড়িয়াছে কিনা বলা শক্ত। এ রকম অবস্থায় তাকে আশ্রমে কয়েকদিনের জন্যও রাখা সঙ্গত হইবে কিনা, বিপিন ও রাজপুত্রের মধ্যে এতক্ষণ সেই পরামর্শই চলিতেছিল। বিপিন বারবার অনুযোগ দিয়া বলিতেছিল, এ বকম প্রকাশ্যভাবে মাধবীলতাকে আশ্রমে আনা সত্যই বড়ো অন্যায় হইয়াছে রাজপুত্রেব। আগে একটা খবব যদি সে পাঠাইত বিপিনকে, বিপিন সব ব্যবস্থা কবিয়া দিত, এতটুকু হাঙ্গামাও হইত না, রাজপুত্রের ভাবনাবও কিছু থাকিত না।

রাজপুত্রের নাম নাবাযণ। দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুদর্শন চেহারা, মাঝে মাঝে মুখে অনাচার অত্যাচারের যে ছাপটুকু পড়ে সেটা স্থায়ী হয় না, দুদিন বিশ্রাম করিলেই মুছিয়া যায়, মুখে আবার স্বাস্থ্যের অমলিন জ্যোতি ফুটিয়া ওঠে। এখন মুখখানা উত্তেজনা ও ভয়ে অস্বাভাবিক রকম পাণ্ডুর দেখাইতেছে, চাউনি দেখিলেই টের পাওয়া যায় মানুষটা এখন বিহ্বল।

বিপিনের অনুযোগেব জবাবে সেও অনেকবার বলিযাছে, কী করব বলুন, এমন একগুঁয়ে বলবার নয়। সব ব্যবস্থা আমিই ঠিক করে ফেলেছিলাম, ওব জন্যই সব ভেস্তে গেল। শেষ মুহূর্তে কোথায় যাই, তাই এখানে ছুটে এলাম।

বিপিন তখন আশ্বাস দিয়া বলিয়াছে, যাক যাক, কী আর হবে, ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাধবীলতাকে শান্ত কবিতে বেশি সময লাগিল না, ছোটো ঘরখানায় চৌকির উপর বিছানো ময়ূর আঁকা মাদুরে সে গুম খাইয়া বসিয়া বহিল। রাজপুত্র নাবায়ণ তখন পুবেব ঘবে আসিয়া সদানন্দকে প্রণাম করিল। সদানন্দ কোনোদিন কাহাকেও আশীর্বাদ কবে না, বিড়বিড় কবিযা মুখে একটা আওযাজ কবে মাত্র। আজ তাও কবিল না।

ঘবেব আলোটা সদানন্দ কমাইয়া দিযাছিল, বিপিন বাড়াইয়া দিল। দেখা গেল, নাবায়ণের মুখের পাংশু বিবর্ণ ভাবটা বড়ো বেশি বকম স্পষ্ট হইযা উঠিযাছে। সদানন্দকে সে কোনোদিনই বিশেষ খাতিব করে না, ভয় ভক্তি করাব দরকাবও কোনোদিন বোধ কবে নাই। আজ তাব সবটুকু তেজ আব বেপরোয়া ভাব উবিযা গিযাছে।

বিপিন নিবেদন কবিল, বাজাসাহেব আসেননি প্রভু। নারায়ণবাবু একটি নিরাশ্রয় মেযেকে আশ্রমে ভর্তি করে দিতে এনেছেন। মেয়েটিব কেউ নেই প্রভু।

থাকবাব ব্যবস্থা কবে দাও। আব তোমবা যাও বিপিন।

আসনে বসবেন প্রভু ?

যেতে বললাম যাও না বিপিন, আমায একটু একা থাকতে দাও।

বিপিনের মুখ দেখিয়া রাগ বোঝা যায না, কেবল তার কপালে কয়েকটা বেখার সৃষ্টি হয় আর চোখের পলক পড়া অনিয়মিত হইযা যায। নারায়ণকে সঙ্গে করিযা বিপিন ঘব হইতে চলিয়া গেল। ঘণ্টা দুই পবে সে যখন আবার ঘরে আসিল, সদানন্দ ঘুমের ভান করিয়া খাটের উপব গদির বিছানায় পড়িয়া আছে। গায়ে ঠেলা দিয়াও তাব ঘুম ভাঙাইতে না পারিয়া চাপা গলায় তাকে একটা কুৎসিত গাল দিয়া বিপিন চলিয়া গেল। সদানন্দের বড়ো ক্ষুধা পাইয়াছিল, সেবার ব্যবস্থাটাও আজ একটু বিশেষ রকমের হইয়াছে, কাছাকাছি একটা গ্রাম হইতে মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে কে যেন আজ নানারকম সুখাদ্য পাঠাইয়া দিয়াছে আশ্রমে। বিপিনের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভয়ে না খাইয়াই আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দ এক সময ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙিল খুব ভোরে, ভালো করিয়া তখনও চারিদিক আলো হয় নাই। পাশ না ফিরিয়াই বোঝা গেল কে যেন পিঠের সঙ্গে শুইয়া আছে। মশারি ফেলিতে সদানন্দের মনে ছিল না, কে যেন মশারি ফেলিয়া সযত্নে গুঁজিয়া দিয়াছে। উঠিয়া বসিয়া সদানন্দ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মাধবীলতার

শুইবার ভঙ্গিটি মনোরম নয়, তা ছাড়া তার নিজের দেহের উপর মাঝরাত্রি পর্যন্ত তার নিজেরই ছটফটানির ঝড় বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এদিকে সদানন্দও প্রায় একযুগ হইল সকালে ঘুম ভাঙিয়া পিঠের সঙ্গে মেশা কুণ্ডলীপাকানো পুঁটুলির মতো নারীদেহ চাহিয়া দেখে নাই। হঠাৎ চোখ ফিরাইতে পারিল না।

তা ছাড়া, বিপিন যে মাধবীলতাকে আশ্রমে আনিয়াছে এ অপমানের জ্বালা আছে, প্রতিকার নাই, প্রতিকারহীন অপমানের আছে শুধু প্রতিশোধের কামনা। বিপিন যে কতদূর ছোটোলোক এই চিন্তার ছেদ দিয়া দিয়া ছাড়া ছাড়া ভাবে সদানন্দ ভাবিতে থাকে, আহা, মেঘলা ভোরে মেয়েটি শীতে কেমন জড়োসড়ো হইয়া গিয়াছে দ্যাখো। গরমে নিজের দেহ যে ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে এটা সদানন্দের খেয়ালও হয় না, শীতের জন্যই মাধবীলতার এমন অদ্ভুত শোয়ার ভঙ্গি, এই অকাট্য যুক্তির কাছে গরমের অনুভূতি হার মানে। এইভাবে মাধবীলতাকে দেখিতে দেখিতে মনের আকাশ-পাতাল আলো-অন্ধকার কীভাবে যেন ধীরে ধীরে ঝাপসা হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল, অতীত হইতে ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত হওয়ার বদলে সময় বর্তমানকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতে খাইতে আবর্ত রচনা করিতে লাগিল। মনটা বিদ্রোহ করিয়া বসিল সদানন্দের, একবার চাহিল রুদ্ধ দরজার দিকে, একবার চাহিল জানালা দিয়া খানিক তফাতে রাধাই নদীর দিকে, তারপরে দুহাত বাড়াইয়া পুতুলের মতো মাধবীলতাকে তুলিয়া লইল বুকে।

তখন অবশ্য মাধবীলতার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কিন্তু সে কিছুই বলিল না। পুতুলটি যেন অন্য কেউ এমনিভাবে কৌতূহলী চোখ মেলিয়া মহাপুরুষ নামে বিখ্যাত প্রৌঢ়বয়সি দৈত্যটির পুতুলখেলার মুখভঙ্গি দেখিতে লাগিল।

দুই

[লেখকের মন্তব্য : ভাবিয়া দেখিলাম, গল্পের মধ্যে ইঙ্গিতে পরিস্ফুট করিয়া তোলার পরিবর্তে মাধবীলতা সম্বন্ধে সদানন্দের অবিষ্কার ও মনোভাব পরিবর্তনের কথাটা আমার বলিয়া দেওয়াই ভালো। সংক্ষেপে বলাও হইবে, নীরস অশ্লীলতার ঝাঁঝও এড়ানো চলিবে। সদানন্দের ধারণা হইয়াছিল, মেয়েটি ভালো নয়। মাধবীলতার প্রতিবাদহীন আত্মদান এই ধারণাকে সমর্থনও করিত। কিন্তু সদানন্দ জানিতে পারিল, মাধবীলতা কুমারী।

একটা কথা স্পষ্ট বলিয়া রাখি। মাধবীলতা ভালো কী মন্দ এটা তার প্রমাণ দিবার চেষ্টা নয়, আমার মতামতের কথা বলিতেছি না। সদানন্দের ধারণার কথা হইতেছে। আমার মন্তব্য হইতে মাধবীলতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হিসাবে বড়ো জোর এইটুকু অনুমান করিয়া লইবার অনুমতি দিতে পারি যে, পুরুষ সম্বন্ধে মাধবীলতার অভিজ্ঞতা ছিল না। নয় তো অবসাদে যতই কাবু হইয়া পড়ুক, চাঁদ-হারানো মাঝরাত্রির অন্ধকারে অচেনা-অজানা জায়গায় আনাচেকানাচে যত ভয়ই জমা থাক, বিপিন আর নারায়ণের চেয়ে বিখ্যাত সাধু সদানন্দকে যতই নিরাপদ মনে হোক, সদানন্দের শয্যায় গিয়া সদানন্দের পিঠ ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িবার মধ্যে, কোনো যুক্তি থাকে না। মশারি ফেলিয়া দিলে যে মশা কামড়াইবে না এ জ্ঞানটা তো মাধবীলতার বেশ টনটনে ছিল।]

আশ্রমের খানিক তফাতে নদীর ধারে একটা মোটা কাঠের গুঁড়িতে সদানন্দ মাঝে মাঝে বসিয়া থাকে। সেইখানে বিপিন তাকে আবিষ্কার করিল। তখনও সূর্য আকাশে বেশি উঁচুতে ওঠে নাই। নদীর জল রাতারাতি আরও বাড়িয়াছে, ঘোলাটে জলের স্রোতে এখনও অনেক জঞ্জাল ভাসিয়া যাইতেছে, শুকনো নদীতে অনেকগুলি মাস ধরিয়া যেসব আবর্জনা জমা হইয়াছিল, কাছাকাছি ছোটো একটি আবর্তে কয়েকবার পাক খাইয়া একটা মরা কুকুর ভাসিয়া গেল। বড়ো আপশোশ হইতেছিল

সদানন্দের, অনুতাপ মিশ্রিত গ্লানিবোধ। তবু শরীর মন যেন হালকা হইয়া গিয়াছে। করুণা ও মমতার ব্যথায় হৃদয় ভাবাক্রান্ত, তবু আনন্দের একটা অক্ষয় প্রলেপ পড়িয়াছে, মৃদু ও মধুর। ব্যাপারটা সদানন্দ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অন্যায়ের শাস্তি ও পুরস্কার কি এমনিভাবে একসঙ্গে আসে ?

বিপিন পাশে বসিতে বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু বিপিন বোঝাপড়া করিতে আসে নাই, ভাব করিতে আসিয়াছে। এ কাজটা বিপিন ভালো পারে না, বন্ধুত্বের ফাটল ঝালাই করার কৌশল তার জানা নাই। রাজপুত্রের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সদানন্দের ঘরে মাধবীলতার রাত কাটানো লইয়া একটু পরিহাস করিতে যায়, তারপর সদানন্দের মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া বলে, বড়ো ছেলেমানুষ তুই, রাগিস কেন ? তুই ছাড়া আর কারও ঘরে ওকে থাকতে দিতাম ? তোর কাছে ছিল বলেই নারাণবাবুরও ভাবনা হয়নি, আমারও ভাবনা হয়নি।

এত বড়ো তোষামোদেও সদানন্দ খুশি হইল না দেখিয়া বিপিন মনে মনে রাগিয়া গেল। বিপিন রাগিলেই সদানন্দ সঙ্গে সঙ্গে সেটা টের পায়, দুজনের মধ্যে একটা আশ্চর্য ঘনিষ্ঠতা আছে তাদের, একটা অতীন্দ্রিয় যোগাযোগ আছে, বোধ হয় ইন্দ্রিয়ের যখন বিকাশ হইতে থাকে সেই শৈশব হইতে পরস্পরকে তারা ভালোবাসিয়া আর ঘৃণা করিয়া আসিতেছে, এ জন্য। কতবার ছাড়াছাড়ি হইয়াছে জীবনে কিন্তু এ জগতে নূতন আর একটি বন্ধুও তারা খুঁজিয়া পায় নাই। ছাড়াছাড়ি যখন হইয়াছে, অপরজন মরিয়া আছে না বাঁচিয়া আছে এ খবরও যখন তারা দীর্ঘকাল পায় নাই, কারও মন এতটুকু খারাপ হয় নাই, আবার যখন দেখা হইয়াছে তখনও হয় নাই আনন্দ। কয়েকটা দিনরাত্রি কেবল তখন একসঙ্গে কাটিয়া গিয়াছে—পরস্পরের মধ্যে মশগুল হইয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলিয়া আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করিয়া থাকিয়া।

সদানন্দ ঘাড়ে হাত রাখিবামাত্র বিপিন ঘাড় ফিরাইয়া অন্যদিকে তাকায়, একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় বিপিনের এই ভাবপ্রবণতা, তার ক্রোধে অভিমানের এতখানি ভেজাল।

তুই যা ভাবছিলি তা ঠিক নয় সদা, মেয়েটা সত্যি ভালো, ওকে না জানিয়ে নারাণবাবু চলে গেছে বলে সেই থেকে খালি কাঁদছে।

নারাণ আর আসবে না।

আসবে,—ও বেলা, নয় তো কাল সকালে। চার-পাঁচ[illegible]র মধ্যে একটা ব্যবস্থা করে মাধবীকে নিয়ে চলে যাবে, এ কটা দিন একটু রয়েসয়ে কাটিয়ে দে সদা, দোহাই তোর। আর কেউ হলে কি আশ্রমে উঠতে দিতাম ? রাজা সাহেবের ছেলে, দুদিন পরে নিজে সব কিছুর মালিক হবে, ওকে তো চটানো যায় না, তুই বল, যায় ?

সদানন্দ গম্ভীরমুখে বলিল, বড়োলোকের পা চাটা আর টাকা রোজগারের ফন্দি আঁটবার জন্য কি আশ্রম করেছিলি বিপিন ? তা হলে ব্যাবসা করলেই হ[illegible] ?

বিপিন তর্ক করিল না, হাতজোড় করিয়া হাসিয়া বলিল, এ ব্যাবসা মন্দ কী প্রভু ?

সদানন্দ মাথা নাড়িয়া বলিল, তামাশা রাখ, ভালো লাগে না। দিন দিন তুই যে কী ব্যাপার করে তুলছিস বুঝতে পারি না বিপিন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আশ্রম করা হয়েছিল সব চুলোয় গেছে, তোর খালি টাকা টাকা টাকা ! টাকা ছাড়া কিছু হয় না বলেছিলি, টাকা তো অনেক হয়েছে, আবার কেন ? এবার আসল কাজে মন দে না ভাই—এ সব ছেড়ে দে। আর টাকাই যদি তোর বড়ো হয়, তুই থাক তোর আশ্রম নিয়ে, আমি চলে যাই। দিন দিন আমার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমার আর সয় না।

নালিশটা নতুন নয়, সদানন্দের বলিবার সকরুণ ভঙ্গিতে বিপিন আশ্চর্য হইয়া গেল। একটু ভাবিয়া সে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল জোরে, যতদূর সম্ভব মর্মাহত হওয়ার ভঙ্গিতে বলিতে লাগিল, টাকা ? টাকা দিয়ে আমি করব কী ? তুই কি ভাবিস টাকার লোভে আমি টাকা রোজগারের

ফন্দি আঁটি ? কতবার তোকে বলেছি সদা, তুই বুঝবি না কিছুতে, টাকা ছাড়া কিছু হয় না। কত লোক আশ্রমে এসে থাকতে চায়, থাকবার ঘর নেই, ঘর তুলবার টাকা নেই। দক্ষিণের আমবাগানটা কিনে ফেলা দরকার, টাকা আছে কিনবার ? এবার যদি নারাণবাবু কিনে দ্যান। তুই আদর্শ জানিস সদা, কীসে কী হয় জানিস না। বড়ো কাজ করতে চাইলেই কি করা যায় ? করতে জানা চাই। ভেবে দ্যাখ, এই যে আশ্রমটা হয়েছে, এতগুলি লোক আশ্রমে বাস করছে, দলে দলে লোক এসে তোর উপদেশ শুনে যাচ্ছে, আমি ফন্দি না আঁটলে এটুকুও কি হত ? রাস্তায় রাস্তায় চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ তোর কথা শুনত না। ভালো উদ্দেশ্যে দুটো মিথ্যে কথা, একটু ভড়ং এ সবে দোষ হয় না। নারাণবাবু একটা মেয়েকে বার করে এনেছে তো আমাদের কী ? আমরা আশ্রমে উঠতে দিলেও বার করে আনত মেয়েটাকে, না দিলেও বার করে আনত। আমরা শুধু এই সুযোগে আশ্রমের একটু উন্নতি করে নিচ্ছি। এ সব কথা নিয়ে মাথা ঘামাস না, তোর কাজ তুই করে যা, আমার কাজ আমি করে যাই, একদিন দেখবি আমাদের এই আশ্রমের নাম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে।

বিপিনের এত বড়ো বক্তৃতার জবাবে সদানন্দ শুধু বলিল, আশ্রমের নাম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাবার জন্য আমার তো ঘুম আসছে না।

ঘুম তোর খুব আসে, মোষের মতো ঘুমোস সারারাত। তোর মতো শুয়ে বসে আরামে দিন কাটাতে পারলে আমারও ঘুম আসত।—বলিয়া বিপিন রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

খানিক পরে সদানন্দ ভিতরে গেল। ছোটো ঘরের চৌকিতে সেই ময়ূর আঁকা মাদুরে মাধবীলতা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বিপিন বোধ হয় তাকে চা আর খাবার আনিয়া দিয়াছে, কিন্তু সে খায় নাই। কথা বলিতে গিয়া প্রথমে সদানন্দের গলায় শব্দ আটকাইয়া গেল, তারপর এমন কথা বলিল যার কোনো মানে হয় না।

এখানে একা বসে আছ ?

একটু ইতস্তত করিয়া চৌকিতেই একপাশে বসিল। মুখখানা তার অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর ও ম্লান হইয়া গিয়াছে। মাধবীলতা একবার চোখ তুলিয়া চাহিল, সরিয়াও বসিল না, কথাও বলিল না। সদানন্দের ইচ্ছা হইতেছিল অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে তার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দেয় আর কিছুক্ষণের জন্য তার আঙুলগুলি যেন হইয়া যায় পাখির পালকের চেয়ে কোমল।

খাবার খাওনি কেন ?

খিদে পায়নি।

কাল রাত্রে খেয়েছিলে কিছু ?

মাধবী মাথা নাড়িল।

তা হলে খেয়ে নাও কিছু। চা-টা বোধ হয় জুড়িয়ে গেছে, গরম করে দিতে বলব ?

না, কিছু খাব না। বমি হয়ে যাবে।

মাধবীলতা যেন একটু বিস্ময়ের সঙ্গে সদানন্দের মুখের ভাব দেখিতে থাকে। সদানন্দের মনে হয়, তুচ্ছ খাওয়ার কথা লইয়া এত বেশি মাথা ঘামানোর জন্য বিরক্ত হইয়া চোখের দৃষ্টি দিয়া সে তাকে ভর্ৎসনা করিতেছে। সদানন্দ কাঠের পুতুলের মতো বসিয়া রহিল। মাধবীলতাকে তার কী বলার আছে ? ভাবিতে গিয়া মনে পড়িল, একটা কথা বলা যায়, মাধবীলতার ভুলের কথা।

এমন কাজ কেন করলে মাধবী, কেন বাড়ি ছেড়ে এলে ? দুদিন পরে নারাণ যখন তোমাকে ফেলে পালাবে কী করবে তখন তুমি ? সমস্ত জীবনটা নষ্ট করে ফেলেছ নিজের, একটু ভুলের জন্য। এমন ছেলেমানুষি করে !

শুনিতে শুনিতে মাধবীলতার দু-চোখ জ্বলজ্বল করিতে থাকে, মুখ আরক্ত হইয়া যায়। ইতিমধ্যে সে কখন স্নান করিয়াছে, ভালো করিয়া মোছা হয় নাই বলিয়া চুল এখনও ভেজা। ভেজা চুলের

জলপটি থাকা সত্ত্বেও এমন মাথা গবম হইযা যায় মাধবীলতার যে প্রথমে সে খাবারের প্লেট আর চায়ের কাপটা সদানন্দকে ছুঁড়িয়া মারে, তারপর বাঘিনির মতো ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া সদানন্দের মুখে রক্ত বাহির করিযা দেয়। তারপব সদানন্দের কোলে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে আরম্ভ কবে।

এই ধরনের কাণ্ড সদানন্দ আরও প্রত্যক্ষ করিয়াছে, একযুগেরও বেশি আগে আরেকজনকে এমনিভাবে শান্ত ও সংযত অবস্থা হইতে চোখেব পলকে উন্মাদিনীতে পরিণত হইযা যাইতে দেখিত মাঝে মাঝে। তবে সে এভাবে খাবারের প্লেট, চায়ের কাপ ছুঁড়িয়া মারিত না, কোলে মুখ গুঁজিয়া এভাবে কাঁদিতও না, দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া নিজেকে আহত করিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইত। হঠাৎ সদানন্দের মনে হইল, এতক্ষণে সে যেন বাস্তব জগতে নামিয়া আসিল, এতক্ষণে বোঝা গেল ব্যাপারখানা কী। হাত বাড়াইয়া র‍্যাক হইতে একটি গেরুয়া কাপড় টানিয়া আনিযা মুখে আঁচড়ের রক্ত আর গায়ে লাগা চা ও খাবার খানিক খানিক মুছিয়া ফেলিল। মাধবীলতার গায়ে মাথায় পাখির পালকের মতো কোমল আঙুল বুলাইবার সাধটা এখন মেটানো যায়, কিন্তু ও ধরনের কবিত্বপূর্ণ সাধ আর সদানন্দের নাই। মাধবীলতাব পিঠে একখানা হাত রাখিযা সে তাকে কাঁদিতে দিল। কাঁচা বক্তমাংসে গড়া এতটুকু একটা কোমল মেয়ে, এত কাণ্ডেব পর ওকে কাঁদিতে না দিলে চলিবে কেন ?

কান্না কমিয়া আসে, মাধবী মুখ তোলে না, আবও জোরে সদানন্দকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। বাপ-মাব আশ্রয় ছাড়িয়া সে আসিয়াছে কিনা কে জানে, বাপ-মা তার আছে কিনা তাও সদানন্দের জানা নাই, তবু এটুকু সদানন্দ অনুমান করিতে পারে, তারই মতো একজনেব আশ্রয় ছাড়িয়া মাধবীলতা আসিয়াছে। হয়তো সে ছিল নির্মম, স্নেহ তার কাছে মাধবীলতা পায নাই, শুধু নির্যাতন সহিযাছে, হয়তো সে ছিল পরম স্নেহবান, তার আদবে জীবনেব সমস্ত বৈচিত্র্য গলিয়া গিয়া মাধবীলতাব জীবন একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সেই ছিল একমাত্র আশ্রয়, আর কাবও কথা মাধবীলতা জানে না। প্রেমিক ? এতটুকু মেযে, কুমাবী মেয়ে, সে প্রেমের কী জানে, প্রেমিকেব দাম তাব কাছে কতটুকু ? খেলার সাথি হিসাবে শুধু তার প্রয়োজন হয একটু, না হইলেও চলে, একটু মন কেমন করাব মধ্যেই সে অভাবেব পূরণ হয।

মুখ তোলো মাধবী, উঠে বোসো। ভয় নেই, আমি সব ঠিক করে দেব।

মাধবী উঠিযা বসিল। আঁচলে ভালো করিয়া চোখ মুছিবার পব তাব মুখ দেখিয়া কে বলিবে এইমাত্র সে খেপিয়া গিয়াছিল !

আশ্রমে অনেক মেয়ে থাকে, চলো তোমাকে তাদের কাছে দিয়ে আসি।

মাধবীলতা সঙ্গে সঙ্গে উঠিযা দাঁড়াইয়া বলিল, চলুন।

সদানন্দ একটু হাসিয়া বলিল, আগে মুখ ধুয়ে কাপড়টা বদলে এসো, গালে তোমার সন্দেশ লেগে আছে, কাপড়ে চা ভর্তি।

মুখ ধুইয়া কাপড় বদলাইযা মাধবী প্রস্তুত হইলে সদানন্দ তাকে সঙ্গে করিয়া খিড়কির পথেই বাহির হইল। বিপিন বোধ হয় সদবেব দিকে কোথাও আছে, তার সামনে পড়িবার ইচ্ছা ছিল না। গোলমাল বিপিন কবিবেই, তবে সেটা এখন মাধবীলতার সামনে না ঘটাই ভালো। আশ্রমের দুটি অংশের মধ্যে পায়ে পায়ে দু-তিনটি আঁকাবাঁকা সরু পথ আপনা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। আর কোনো পথ নাই। মাধবীলতা যেন বেশ উৎসাহের সঙ্গে জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিতে থাকে, তপোবনের শোভা দেখিয়া সে যেন খুশি হইয়াছে, ভিজা মাটিতে পা ফেলিয়া হাঁটিতে যেন আরাম পাইতেছে। বলা মাত্র সে যে তাব সঙ্গে নূতন একটা আশ্রয়ে যাইতে রাজি হইয়া যাইবে, এটা সদানন্দের কাছে আশ্চর্য ঠেকে নাই। এখন তার ভাবনা, ঝোঁকের মাথায় রাজি হইয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত আশ্রমে সে থাকিতে চাহিবে কি না। হয়তো নারায়ণ আসিয়া ডাকিলে তার মনে হইবে, আশ্রমে থাকিয়া জীবনটা নষ্ট করার বদলে তার সঙ্গে চলিয়া যাওয়াই ভালো।

তখনও আশ্রমের সকলের ধ্যানধারণা সাধনভজন শেষ হয় নাই। গুরুদেবের পদার্পণে অনেকেরই কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হইয়া গেল বটে, কয়েকজন আরও বেশি আসন কামড়াইয়া চোখ বুজিয়া রহিল। গুরুদেব খোঁজ করিয়া জানিবেন, সকলে ইতিমধ্যেই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছে কিন্তু তারা ধ্যানধারণায় এখনও মশগুল, গুরুদেবের আবির্ভাব পর্যন্ত টের পায় না এমন আত্মহারা। জানিয়া গুরুদেব নিশ্চয় খুশি হইবেন, এরাই তাঁর খাঁটি শিষ্য। আশ্রমে এ রকম অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ জন সাতেক অন্ধভক্ত বাস করে, অন্য সকলের তুলনায় এদের ভক্তির বাড়াবাড়িতে সদানন্দকে মাঝে মাঝে রীতিমতো বিব্রত হইতে হয়। দুজন বিধবা মহিলা আছে এই রকম, কী যেন একটা সম্পর্কও আছে দুজনের মধ্যে, পিসি-ভাইঝির সম্পর্কের মতো। একজনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, শুষ্ক শীর্ণ চেহারা, অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজ। বউরা সকলে ধীরে ধীরে খোলস ছাড়িয়া একে একে অবাধ্য হইতে আরম্ভ করায় এবং ছেলেরা সকলে একজোট হইয়া বউদের পক্ষ নেওয়ায়, ছেলে বউ নাতি নাতনিতে ভরা প্রকাণ্ড সংসার ছাড়িয়া আশ্রমে আসিয়া ডেরা বাঁধিয়াছে।

অপরজনের বয়স কম, বছর ত্রিশেক হইবে। গোলগাল ফরসা রসালো চেহারা, হঠাৎ অপদস্থ হইলে মানুষের মুখের ভাব যেমন হয়, সব সময় মুখে সেই রকম একটা সকাতর লজ্জার ভাব ফুটিয়া থাকে। সংসারত্যাগী বয়স্কা মহিলাটির সঙ্গে সে থাকে এবং সকল বিষয়ে তাকে অনুকরণ করিয়া চলে। ঘুম হইতে ওঠে একই সময়ে, স্নান ও জপতপ সারে একই সময় ধরিয়া, আহার করে একই খাদ্য, পরিমাণটা পর্যন্ত সমান রাখিতে চেষ্টা করে।

বয়স্কা মহিলাটি অন্য সব অনুকরণে সায় দেয়, গোলমাল করে কেবল খাদ্যের পরিমাণটা লইয়া। বলে, মরণ তোমার ! আমি অম্বুলে রুগি, যা দাঁতে কাটি তাতেই বুক জ্বলে, আমার সাথে পাল্লা দিয়ে খেলে তুই বাঁচবি কেন শুনি? নে, দুধটুকু গিলে ফ্যাল দিকি ঢক করে।

অপরজন মিনতি করিয়া বলে, বমি হয়ে যাবে পিসিমা—অত দুধ খেলে নিশ্চয় বমি করে ফেলব।

দুধ তাকে খাইতে হয়, সমস্তটাই। খানিক পরে একটা খোঁচাও খাইতে হয়,—কই লো রত্নী, বমি হয়ে যাবে? বাঁচতে সাধ না থাকে বিষ খেয়ে মরবি যা, নয়তো গলায় দড়ি দে—না খেয়ে শুকিয়ে মরা চলবে না বাবু আমার কাছে।

এর নাম রত্নাবলী। পিসিমা কখনও ডাকে রত্নী, কখনও বলে রতন। পিসিমার নাম উমা। সদানন্দ ছাড়া এ জগতে তার নাম ধরিয়া ডাকিবার আর কেউ নাই,—একজন ছিল, মাঝে মাঝে নাম ধরিয়া ডাকিত, মস্ত সংসারটা গড়িয়া দিয়া অনেকদিন আগে বিদায় লইয়াছে, উমা যে সংসার ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছে, ছেলে বউ নাতি নাতনিতে ভরা বিরাট সংসার।

মাধবীলতাকে সদানন্দ এদের কাছে জমা করিয়া দিল। বলিল মেয়েটি আজ আশ্রমে ভর্তি হল, মেয়েটির কেউ নেই উমা।

রত্নাবলী খুশি হইয়া উঠিল, উমা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মাধবীলতার দিকে চাহিতে লাগিল। বোঝা গেল, আশ্রমে হঠাৎ এই বয়সি একটি মেয়ের আবির্ভাবে তার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হইতেছে, সদানন্দের কাছে যেগুলি মুখে উচ্চারণ করিবার সাহস তার নাই।

ঘরের সম্মুখে কার্পেটের আসন পাতিয়া সদানন্দকে বসিতে দেওয়া হইয়াছিল। কোলের উপর ডান হাতের তালুতে বাঁ হাতের তালু রাখিয়া মেরুদণ্ড সিধা করিয়া দেবতার মতো সদানন্দ বসিয়াছে, আনন্দ বেদনার অতীত ধীর স্থির বিকারহীন একস্তূপ মূর্তিমান শক্তির মতো—সংহত ও সচেতন। সোজা উমার মুখের দিকে চাহিয়া বজ্রগম্ভীর ধমকের আওয়াজে সদানন্দ বলিল, তুমি কী ভাবছ উমা ?

আর কী ভাবছ উমা, ধুলায় গড়া ভঙ্গুর পুতুলের মতো উমা চুরমার হইয়া গিয়াছে। পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া উমা অসংবদ্ধ প্রলাপ বকিতে থাকে, মুমূর্ষু জন্তুর মতো জীর্ণশীর্ণ দেহটা থরথর

করিয়া কাঁপে। গুরুদেবের সম্বন্ধে অন্যায় কথা মনে আসিয়াছে, গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে তাহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এ কী আকস্মিক সর্বনাশের সূচনা !

রত্নাবলীর মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছে, আশ্রমবাসী আরও যে কয়জন নরনারী ইতিমধ্যে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল, তাদের মুখও বিবর্ণ। মাধবীলতা সভয় বিস্ময়ে একবার ভূলুণ্ঠিতা উমার দিকে, একবার সদানন্দের মুখের দিকে চাহিতে থাকে। মানুষের উপর যে মানুষের এতখানি প্রভাব থাকে, একটিমাত্র ধমকে যে কেহ উমার বয়সি নারীকে পায়ের নীচে লুটাইয়া দিতে পারে, মাধবীলতার তা জানা ছিল না। তার নিজের বুকের মধ্যেও ঢিপঢিপ করিতেছে দেখিয়া সে আরও অবাক হইয়া গেল।

সদানন্দ মৃদুস্বরে বলিল, উঠে বোসো উমা।

উমা উঠিয়া বসিলে তেমনই মৃদু ও শান্ত কণ্ঠে বলিল, মনকে সংযত রেখো। মন হল ঘরের মতো, ধুলোবালি এসে জমা হয়, ঝাঁট দিয়ে সে সব সর্বদা সাফ করে নিতে হয়, নইলে ঘর যেমন আবর্জনায় ভরে উঠে, মনও তেমনি কুচিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

উমা মাথা নিচু করিয়া শুনিয়া যায়। সদানন্দের সাংঘাতিক নির্মমতার এই প্রকাশ্য অভিব্যক্তি মাধবীলতাকে ভীত ও সকাতর করিয়া তোলে। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হইয়া সদানন্দের কথা শুনিতেছিল, দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া মাধবীলতা মেঝেতেই বসিয়া পড়িল।

তখন সদানন্দ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া বলিল, মেয়েটি তোমাদের কাছে থাকবে উমা, তোমরা ওকে দেখাশোনা কোরো। বোসো তোমরা,—আর সকলে কোথায় ?

একজন শিষ্য তাড়াতাড়ি আশ্রমের সকলকে ডাকিয়া আনিতে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আশ্রমের সকলে উমা ও রত্নাবলীর কুটিরের সম্মুখে আসিয়া জমা হইল, আসনে বসিয়া যে ঈশ্বরকে ডাকিতেছিল সেও। ঈশ্বরকে ডাকার চেয়ে গুরুদেবের ডাক বড়ো।

তিন

মাধবীলতাকে নিয়া বাহিরে কিছু হইচই হইল না। রাজপুত্র নারায়ণের আশঙ্কাটা দেখা গেল নিছক তার নিজেরই কল্পনা,—অন্যায়ে অনভিজ্ঞ মনের স্বাভাবিক ভীরুতার ফল। যাদের কাছ হইতে চুরি করিয়া আনা হইয়াছে মাধবীলতাকে, চোর বা বমাল সম্বন্ধে তাদের কিছুমাত্র মাথাব্যথার লক্ষণ টের পাওয়া গেল না। দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, জীবনের আকস্মিক গতি পরিবর্তনের ধাক্কায় আহত ও বিব্রত মাধবীলতার রক্তমাংসের ক্ষয় বন্ধ হইয়া বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে ফিরিয়া আসিতে লাগিল স্বাভাবিক ইক্ষুদণ্ডের রং,—তাদের কোনো সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না যাদের কথা ভাবিয়া মাধবীলতাকে প্রকাশ্যে আশ্রমে আনার জন্য বিপিন নারায়ণকে অনুযোগ জানাইয়াছিল, অত পরামর্শ দরকার হইয়াছিল দুজনের।

নারায়ণ গোলমাল করিল না। হয়তো সাহস পাইল না, হয়তো ভাবিয়া দেখিল গোলমাল করা মিছে, অথবা হয়তো ঘাড়ের বোঝা নামিয়া যাওয়ায় নিশ্বাস ফেলিল স্বস্তির। আশ্রমে ভর্তি করার জন্যই মেয়েটিকে সে আনিয়াছে প্রথমে এই কথা বলা হইয়াছিল সদানন্দকে, তার কাছে এই ঠাটই বজায় রাখিয়া চলিতে হইল আগাগোড়া। দেখা গেল, ঠাট বজায় রাখিতে সদানন্দও কম ওস্তাদ নয়। এসো বাবা বোসো, বলিয়া রাজপুত্রকে সে বসাইল কাছে। রাজপুত্রের বেলা নির্বিকার ভাবটা কমাইয়া একটু স্নেহ জানাইবার জন্য বিপিনের যে অনুরোধ ও উপদেশ এতকাল কিছুতেই স্মরণ রাখিতে পারিত না, আজ যেন সেই অনুরোধ ও উপদেশের মর্যাদা সুদে-আসলে দিবার জন্যই নির্বিকার ভাবটা

বিসর্জন দিয়া জানাইল গভীর স্নেহ। বলিল, হ্যাঁ যাও, বেড়িয়ে এসো গে একটু নদীব ধার থেকে দুজনে। কবে আবার দেখা হয় তোমাদের ঠিক তো নেই। কেন যাবে না মাধু, যাও। শিগগির ফিরো —সন্ধ্যার আগে।

মাধবীলতাকে চোখের দেখা দেখিতে না দিয়াই সদানন্দ রাজপুত্র নারায়ণকে ফিরাইয়া দিতে পারিত, কারও ক্ষমতা ছিল না বাধা দেয়। বিপিন তো বাগ করিয়াছেই, না হয় আরও খানিকটা বেশি রাগ করিত। কিন্তু দুজনকে নির্জনে একটু আলাপ করিতে দেওয়াই সদানন্দ ভালো মনে করিল। দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার বলিয়া নয়,—বোঝাপড়া হইবে না, এ রকম অবস্থায় বোঝাপড়া হয় না, বোঝাপড়ার কিছু নাই। একটু আবোল-তাবোল বকিবার সুযোগ পাক দুজনে। সদানন্দের জোর-জবরদস্তির অভিযোগ যেন ঘুণাক্ষরেও মনে না জাগে কারও : মাধবীলতা আশ্রমে থাকিতেছে স্বেচ্ছায়, নারায়ণ তাকে আশ্রমে রাখিয়া যাইতেছে স্বেচ্ছায়, এর মধ্যে আর কারও কর্তৃত্ব নাই। বিপিনও হয়তো একটু ঠান্ডা হইবে ব্যাপার বুঝিয়া, জোর দিয়া বলা চলিবে বিপিনকে যে, মাধবী থাকতে চাইলে আমি কী করব বিপিন ?

এত সব ভাবিয়া সদানন্দ দুজনকে নদীর ধারে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিল। তবু একান্ত যুক্তিহীনভাবেই মনটা একটু উতলা হইয়া রহিল বইকী! বর্ষাব গোড়ায় এ কী অপবাহ্ন আসিয়াছে আজ। দীপ্তি সংবরণ করিয়া বর্ণচ্ছটা বিতরণের আর কী দিন জুটিত না অকালে ক্লান্ত সূর্যেব। মন্থর গতিতে নদীতীরের কোনখানে ওরা দুজনে পৌঁছিয়াছে, কী বলাবলি করিতেছে নিজেদের মধ্যে। কত অভিমান আর অনুনয় না জানি রাজপুত্র প্রকাশ করিতেছে কথায়, সুরে, মুখের ভাবে, চোখেব বিষাদে। অনুযোগ হইয়া উঠিতেছে মিনতি। মন যদি না মানে মাধবীর ? মোড় যদি ঘুবিয়া যায় তার মনের ? যদি সে তুলনা করে এই বিবাট দেহ শ্রীহীন দরিদ্র প্রৌঢ়ের সঙ্গে বূপবান ধনবান সঙ্গী যুবকটির, আর তুলনা করিয়া যদি তার মনে খটকা বাধে যে কী হইবে ধার্মিকেব মুখোশ পরা নরপিশাচটার আশ্রমে বাস কবিয়া, তার চেয়ে রাজপুত্রেব হাত ধবিয়া উধাও হইয়া যাওয়া ঢেব ভালো, যা হোক তা হোক ফলাফল? সকাতব ক্লিষ্ট ঔৎসুক্যেব সঙ্গে সদানন্দ দুজনেব ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষা করে, নিজেকে নিজেই মনে মনে বলে, আমি কী, অ্যাঁ ?—অভ্যস্ত আত্মাদব যেন দীনভাবেব আধিক্যে কোথায় তলাইয়া যায় কিছুক্ষণের জন্য এবং এতক্ষণে প্রকৃত পুণ্যবানেব মতো অস্থায়ীভাবে বিনা প্রতিবাদে মাধবীলতা সম্পর্কে নিজেকে বিশ্বাস করিয়া ফেলে—পাপী। তেজস্বী কম নয় সদানন্দ। গোঁয়ার নয় বলিয়া বিপিন জানে মানুষটা সে নরম,—খুঁটিনাটিতে যে সর্বদা হাব মানে মোটামুটিতে কবে তার প্রচণ্ড তেজস্বিতা প্রকাশ পাইয়াছিল সে কথা মনে কবিয়া রাখে কে ? তেজস্বীর কাছে দুঃখ বেদনা সহজে আমল পায় না। কিন্তু অন্যায়েব ক্ষণিক উৎসমুখে নিবিড় মমতাব এক অপবূপ মাধুর্য উৎসারিত হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে, তার আপশোশ বড়ো দুরন্ত। আহা, কী মিষ্টিই ছিল মাধবীলতাকে উমার জিম্মা করিয়া দিয়া আসিবাব পর হইতে, প্রায় সমস্ত বাত্রির অযাচিত জাগরণের ছটফটানি রীতিমতো আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত, সেই বীভৎস কবুণ পাশবিক মায়ার স্বাদ! অনাস্বাদিতপূর্ব সেই মাধুর্যের লোভেই হাল ছাড়িয়া দিয়া ধৈর্যহীন ক্লেদাক্ত দুঃখে কী কাবুই হইয়া পড়ে মহাতেজস্বী সদানন্দ।

সন্ধ্যা পার হইয়া যায়, দুজনের ফিরিবার নাম নাই। নিজের সঙ্গে নিজের বিযাক্ত আত্মীয়তা স্থাপনের মজাটা সদানন্দ পরিষ্কার টের পাইতে থাকে। তারপর যখন খবর আসে নারায়ণ চলিয়া গিয়াছে, মাধবীলতা উমা ও রত্নাবলীর কুটিরে ফিরিয়া গিয়াছে, তখন খুশি হইবার ক্ষমতাও থাকে না এমনই নিস্তেজ আর ভোঁতা হইয়া পড়ে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, বিপিনও গোলমাল করিল না। অন্তত সদানন্দ যে রকম ভাবিয়াছিল, সে রকমভাবে করিল না। পরের উত্তেজনা নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া উত্তেজিত হওয়ার মতো

প্রথমটা একেবারে খেপিয়া উঠিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই ঠান্ডা হইয়া গেল। ফাটো ফাটো বোমার মতো অবস্থায় সদানন্দের কাছে আসিয়া দাবি করিল, এর মানে ?—সদানন্দ জবাব দেওযা মাত্র বোমাব মতো ফাটিয়া গেল। বাস্। আর কিছুই নয়। নিজের বিস্ফোরণে নিজেই যেন সে দারুণ আহত হইযাছে, রাগ করিবারও আর ক্ষমতা নাই।

তারপর আশ্রমের কারও কাছে কিছু না বলিয়া সে যে কোথায় চলিয়া গেল সেই জানে। মাধবীলতার সঙ্গে নদীর ধাবে একটু পায়চাবি করিযা নাবায়ণ যেদিন ফিরিযা গেল, বিপিন আশ্রমে অনুপস্থিত। আরও দুদিন পবে সে ফিবিয়া আসিল। গম্ভীর চিন্তিতমুখে সদানন্দকেই জিজ্ঞাসা কবিল, মাধবী নারায়ণবাবুকে কী বলেছে ?

আমি তো জানি না বিপিন। মাধবী যেতে চায় না, আমিই বলে কয়ে দুজনকে নদীর ধারে পাঠিয়ে দিলাম। ওদের মধ্যে কী কথা হয়েছে আমি কী করে বলব ?

বিপিন হঠাৎ হাসিয়া বলিল, তোব পাতানো মেয়ে, তুই ছাডা কে বলবে ? বাবা বলে ডাকে না তোকে ?

বিপিন কিছু সন্দেহ করিযাছে নিশ্চয় এবং এটা তাব নিছক সন্দেহমূলক কদর্য পবিহাস নয়। কিন্তু সদানন্দ ধরা দিল না। উদাসভাবে হাই তুলিয়া বলিল, পাতানো মেয়ে আবাব কীসেব !

ভিতরটা রিরি করিতে লাগিল। একটা যেন খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল বিপিনের সঙ্গে, যাতে জয়-পবাজয়েব পার্থক্য নাই, তবু জয়ী হইলেই বেশি ক্ষতি। বিপিন হাত কচলায় আর ঠিক যেন মুখেব হাসিটাকেই চিবাইতে চিবাইতে অশ্রুনিরোধের অভিনয় কবিতে থাকে। কিছু ভাবিতেছে এমন কথা মনেও করা যায় না, জিহ্বা যেন আড়ষ্ট হইয়া গিযাছে চুপচাপ থাকিবার ভঙ্গিটা এমন খাবাপ। হঠাৎ হুঁ বলিয়া যেন ভাবিতে লাগিল তামাশা কবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবে কিনা।

সদানন্দ ধৈর্য হারাইয়া বলিল, কী ভাবছিস শুনি ?

কিছুই ভাবছি না।

কথাটা কিন্তু সত্য নয়। বিপিন যা ভাবিতেছিল, বলিবে কিনা ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সংকোচটা কীসের তাও সে নিজেই ভালো বুঝিযা উঠিতে পারিতেছিল না। কীসে যেন বাধিতেছে—একটা অর্থহীন অকাবণ বাধা। খানিক পবে হঠাৎ মবিয়া হইযা বলিয়া বসিল, মাধবীকে ফিবিয়ে রেখে আসি তবে কাল পবশু ?

কোথায ?

যেখান থেকে এসেছে, ওর মামাব বাড়ি।

সদানন্দ মাথা নাড়িয়া জোরের সঙ্গে বলিল, না। এইখানে থাকবে মাধবী, কোথাও যাবে না।

ছোটো একটি নুড়ি পাথর বিপিন হাতে নাডাচাড়া করিতেছিল, উপরেব দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া আবার সেটিকে লুফিযা লইয়া সে হঠাৎ মুচকি হাসিয়া বলিল, কেন মিছে বালিব ঘব বাধছ বাবা ! রাজপুত্তুরকে ছেড়ে তোমার দিকে ঝুঁকবে তেমন মেয়েই ও নয়। গুরু সেজে বড়ো জোর গায়ে মাথায হাত বুলিয়ে আদর করে গালটা টিপে দিতে পাব, তাব বেশি কিছু—

তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে বিপিন ?

বিপিন ধৈর্যহারা হইয়া বলিল, মাথা আমার খারাপ হযনি, হযেছে তোর। কচি একটা মুখ দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে গেছিস ! ঢং করে রত্নীর ওখানে রাখা হল কেন, নিজের কাছে বাখলেই হত, বুকে করে ?

সদানন্দকে কথাটি বলিবার সুযোগ না দিয়া বিপিন গটগট করিয়া চলিয়া গেল। সেদিন আর কাছেই ঘেঁষিল না সদানন্দের। খবর আসিল মাধবীলতাকে সে অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে জেরা করিয়াছে। চালচলনে যেন কেমন একটু রহস্যের আমদানি হইয়াছে বিপিনের। কাজ ও কথা হইতেছে

খাপছাড়া, প্রতিক্রিয়া হইতেছে অপ্রত্যাশিত। পরদিন দেখা হইলে সদানন্দ তাকে একটু বুঝাইয়া বলিতে গেল যে, দোষটা যখন সদানন্দের, আশ্রমে থাকিবার জন্য মাধবীলতাকে পীড়ন করাটা কি সঙ্গত হইবে ? এ কথায় বিপিন রাগ করিবে সদানন্দ তা জানিত, কিন্তু রাগটা যে তার এমন অদ্ভুত রকমের হইবে সে তা কল্পনাও করে নাই।

শেষ পর্যন্ত মাধবীকে পীড়ন করব তাও ভাবতে পেরেছিস সদা ? ভয় নেই, তোর প্রেমের পথে কাঁটা হয়ে থাকব না, আমি বিদায় হচ্ছি।

মুখচোখের কী ভঙ্গি বিপিনের, সর্বাঙ্গে কী থরথর কম্পন ! দেখিলে মনে হয় ভিতর হইতে কী যেন তাকে জ্বালাও দিতেছে, ধরিয়া নাড়াও দিতেছে। সদানন্দ তার বাহুমূল চাপিয়া ধরিল। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তোর অসুখ করেছে নাকি বিপিন ?

বিপিন বলিল, হাত ছাড়। আমার হাতটা লোহা দিয়ে তৈরি নয়।

তারপর আর কিছুই বিপিন বলিল না, কোথায় যেন চলিয়া গেল। চলিয়া গেল ? কোথায় চলিয়া গেল বিপিন তার এই আশ্রম ছাড়িয়া, তার প্রাণের বন্ধু সদানন্দকে ছাড়িয়া ? কারোকে প্রশ্ন করিবার উপায় নাই, সদানন্দকে চুপ করিয়া থাকিতে হয়। বিপিন কোথায় গিয়াছে সদানন্দই যদি না জানে, সে তবে কেমন কথা হয় ? গুরুদেবকে না জানাইয়া গিয়াছে নাকি বিপিন ! সদানন্দের মনের মধ্যে নানা চিন্তা পাক খায়, নানা দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসে, বাহিরে গম্ভীর হইয়া থাকে, যথারীতি নিজের কাজ করিয়া যায়। নিয়ম-কানুন বাঁধাই আছে আশ্রমে, কোনো ব্যবস্থারও অভাব নাই, তবু বিপিন না থাকিলে যেন চলে না, আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অবাধ গতি ঠেকিয়া ঠেকিয়া থামিয়া থামিয়া চলিতে থাকে—অসুবিধা সৃষ্টি হয়, গোলমাল বাধিয়া যায়, অনুষ্ঠান নিখুঁত হয় না, ঠিক যেন গৃহিণী বিহীন বৃহৎ সংসার। বিশেষভাবে সব ঠিকঠাক করিয়া দিয়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোথাও গেলেও বিপিনের অনুপস্থিতি সব সময়েই অনুভব না করিলে চলে না, এবার তো সে কিছু না বলিয়া কহিয়া হঠাৎ চলিয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ সদানন্দকে বিপিনের খবর জিজ্ঞাসা করে।

সদানন্দ সংক্ষেপে ভাসাভাসা জবাব দেয়, আসবে, দু-চারদিনের মধ্যে আসবে।

দু-তিনটা দিন কাটিয়া যাওয়ার পর বিপিনের জন্য সদানন্দের মন কেমন করিতে থাকে। অনেক রকম মনোভাবের মিশ্রণে প্রথমে মনের মধ্যে যে খিচুড়িটা তৈরি হইয়াছিল সেটা হজম হইয়া যাওয়ার পর ক্ষুধার মতোই অভাববোধটা ক্রমেই যেন হইয়া উঠিতে থাকে জোরালো। এটা একটু আশ্চর্য। কতবার তো ছাড়াছাড়ি হইয়াছে বিপিনের সঙ্গে, মাস কাটিয়াছে, বছর কাটিয়াছে, বিপিনের জন্য এ রকম মন খারাপ হইয়াছে কবে ? তবে এ ভাবে ছাড়াছাড়ি হয় নাই কোনোবার। একসঙ্গে চলিতে চলিতে দুজনের পথ চলিয়া গিয়াছে দুদিকে, দুজনে তাই চলিয়াও গিয়াছে দূরে। এবার বিপিন রাগ করিয়াছে, মনে আঘাত পাইয়াছে, ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাকে। কে ভাবিতে পারিয়াছিল এমন হইবে ? রাগিয়া কলহ করিবে না, বোঝাপড়ার চেষ্টা করিবে না, নতুন নতুন মতলব আঁটিয়া প্রকারান্তরে নিজের জিদ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবে না, কেবল বলিবে চললাম, আর বলিয়া গটগট করিয়া চলিয়া যাইবে ! এমন কী ঘটিয়াছে যার জন্য এমন ভয়ানক আঘাত পাইল বিপিন, এমন কাণ্ড করিয়া বসিল ?

সদানন্দের সবচেয়ে দুর্বোধ্য মনে হয়, সমস্ত ফেলিয়া গেল বিপিন, কিন্তু এই চরম চালটা কোনো দিক দিয়া কাজে লাগানোর চেষ্টা করিল না। চলিয়া যাওয়ার ভয় দেখাইয়া কাবু করিয়া চলিয়া যাওয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাধবীলতা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে রাজি হওয়ার সুযোগ দিয়া সদানন্দকে বশ করিবার চেষ্টা করিলে এবং চলিয়া যাওয়ার পরেও সদানন্দকে মত পরিবর্তন করিয়া তাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া আনিবার উপায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গেলে, তবেই যেন কাজটা বিপিনের

প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইত। এ ভাবে চলিয়া যাওয়া তো সম্ভব বলিয়াই মনে হয় না বিপিনের পক্ষে।

বিপিনের কি চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল ? ভালো লাগিতেছিল না আশ্রমের শিষ্য, ম্যানেজার, মন্ত্রী, সংগঠক ও বন্ধুব জীবন ? এ ধরনের সন্দেহ মনে আসিলে সদানন্দ সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়িয়া ফেলে। আশ্রম সম্বন্ধে বিপিনেব মমতার কথা তার চেয়ে কে ভালো কবিয়া জানে। যেখানেই গিয়া থাক বিপিন, আশ্রমের জন্য মন যে তার ছটফট করিতেছে তাতে সন্দেহ নাই।

বিপিন ফিরিয়া আসিবে। রাগের মাথায় দুদিনের জন্য কোথাও গিয়াছে, আবার ফিরিয়া আসিবে। একদিকে মন কেমন করা যেমন চাপা যায় না, অন্যদিকে বিপিনের ফিবিযা আসিবাব আশাটাও অসংখ্য যুক্তি ও অন্ধবিশ্বাসেব আশ্রয়ে পবিপুষ্ট হয়। সমগ্রভাবে বিচাব কবিয়া নিজের অবস্থাটা সদানন্দ মোটামুটি বুঝিতে পাবে। বিপিন যেমন হোক, বিপিনকে ছাড়া তার চলিবে না।

বুঝিতে পরিয়া রাগ হয। এই আশ্রমেব এতগুলি মানুষের মধ্যে যাকে ইচ্ছা একটি মুখের কথায় সে মাটিতে লুটাইয়া দিতে পাবে, শতাধিক মানুষ বাহির হইতে সপ্তাহে তিন দিন তার উপদেশ হাঁ করিয়া শুনিযা যায়, দেশের চাবিদিকে নিকটে ও দূবে জানা-অজানা কত ভক্ত তার ছড়াইয়া বহিয়াছে, বিপিনকে ছাড়া তাব চলিবে না ? এ তো ভালো কথা নয়।

আশ্রম পবিদর্শন ও পবিচালনার ভারটা সদানন্দ নিজেব হাতে গ্রহণ কবিবার চেষ্টা কবে। বিপিন গিয়াছে যাক।' সকালে ঘুম ভাঙিয়া বিপিন আশ্রমে নাই ভাবিযাই বুকটা ছ্যাঁত কবিয়া ওঠে—করুক। আশ্রমবাসী ও আশ্রমবাসিনীদেব উপদেশ ও নির্দেশ দিতে, দর্শনার্থীকে দর্শন দিতে, আশ্রমের কাজ ও জিনিসপত্রের হিসাব বাখিতে, নদীর ধারে কাঠের গুঁড়িটাতে বসিয়া আশ্রমেব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিকল্পনা গড়িয়া তুলিতে, এমন কী রাত্রে বিশ্রামের জন্য শয়ন করিতে পর্যন্ত বিপিনকে মনে পড়িয়া মন খাবাপ হইয়া যায়—যাক। বিপিন যেমন চলিয়া গিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে, তাকে ছাড়া তার চলিবে না, সেও তেমনই আশ্রমকে নিখুঁতভাবে চালাইযা, আশ্রমেব উন্নতি কবিযা দেখাইয়া দিবে বিপিনকে ছাড়াও তার চলে।

কয়েকদিনেব মধ্যেই সে টেব পাইল, উন্নতি দূরে থাক, বিপিন এতকাল যেভাবে চালাইয়া আসিয়াছে ঠিক সেইভাবে আশ্রম চালানোব কাজটাও যেমন কঠিন, তেমনই জটিল। বিপিন যে বলিয়াছিল, সে কিছু বোঝে না, কেবল তার আদর্শ নিযা থাকে, মনের মধ্যে আদর্শ পোষণ করা এক কথা আব সেটা কার্যে পরিণত কবা আলাদা কথা—এবার বিপিনেব সে কথার আসল মানেটা হাড়ে হাড়ে টের পাইতে লাগিল। কিন্তু সদানন্দ ক্ষুব্ধও হইল না, নিরুৎসাহও হইল না। এমন তো হইবেই। কাজ করার অভ্যাস চাই, জানা চাই কী হইলে কী হয়, কী করিতে কী করা দরকার। এক হিসাবে ভালো হইয়াছে বিপিনের চলিযা যাওয়াতে। বিপিনের উপব বড়ো বেশি নির্ভরশীল হইযা পড়িয়াছিল, বড়ো বেশি দূরে সরিয়া যাইতেছিল আশ্রমের পরিচালনা ও সংগঠনের খুঁটিনাটি হইতে। এবার সব বুঝিয়া মনের মতো করিয়া আশ্রম চালাইতে পারিবে, আশ্রমকে গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

বিপিনের অনুপস্থিতির জন্য যতটা না হোক, সদানন্দের অপটু ম্যানেজারির ফলে আশ্রমে আরও বেশি বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগিল। বিপিন ফিবিযা আসিল দশ-বারোদিন পরে, এই সময়েব মধ্যেই কত নিয়ম যে ভাঙিয়া পড়িল, কত ব্যবস্থা যে উলটাইয়া গেল, সৃষ্টি হইল নূতন নিয়ম। ফলটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াইত বলা যায় না। পরিবর্তনের সময় বিশৃঙ্খলা আসিবেই। আশ্রমে সে একটা গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছে, আশ্রমবাসী নরনারী একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গিয়াছে, টের পাইয়াও সদানন্দ বিশেষ ব্যস্ত হয় নাই। সাজিয়া ঢালিতে গেলে এ সব যে অবশ্যম্ভাবী সে তা জানে। সদানন্দের ব্যবস্থায় আশ্রমের জীবন হয়তো এতদিনকার কতগুলি কৃত্রিমতার খোলস ছাড়িয়া আরও উঁচু স্তরেই উঠিয়া যাইত শেষ পর্যন্ত, কে বলিতে পারে ! অন্তত কড়া বিধিনিষেধগুলি যে

শিথিল হইয়া আসিত, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভালো করিয়া গড়িবার উদ্দেশ্যে সদানন্দের ভাঙন ভালোরকম আরম্ভ হইবার আগেই বিপিন ফিবিযা আসিল। কযেক ঘণ্টাব মধ্যে আশ্রমও যেমন ছিল হইয়া গেল তেমনই।

সদানন্দ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাঁচলাম ভাই। বলা নেই কওয়া নেই কোথা গিয়েছিলি তুই ? আশ্রম চালানো কী আমার কাজ !

বাহাদুরি করতে তোকে কে বলেছিল ? যা আরম্ভ করেছিলি তুই—চমৎকার !

কথাটার খোঁচা লাগিল সদানন্দের। একবার ইচ্ছা হইল সত্যসত্যই বাহাদুরি কবিয়া বলে, কয়েকটা মাস পরে ফিরিয়া আসিলে আশ্রমের উন্নতি দেখিয়া বিপিনের তাক লাগিয়া যাইত। বিপিন রাগিয়া যাইবে ভাবিয়া ইচ্ছাটা দমনও করিল, নিরীহভাবে একটু শান্ত হাসিও হাসিল।

কোথায় গিয়াছিল বিপিন ? আমবাগানটা বাগাইতে—একেবারে দানপত্র পাকা কবিয়া আসিয়াছে। একটা খবর দেয় নাই কেন বিপিন ? কেন দিবে, সদানন্দ যখন চায যে বিপিন আর তার এত সাধের আশ্রম সমস্ত চুলোয় যাক ! কী গবজ বিপিনের খবর দিবার ! না না, ঠিক তা নয়, খুব ব্যস্তও ছিল বটে বিপিন, একটু মজাও দেখিতেছিল বটে। হঠাৎ সে জন্মেব মতো বিদায হইয়া গেলে সদানন্দ কী কবে দেখিবার সাধটা বিপিনের অনেকদিনেব।

চার

বর্ষাকালে সদানন্দ অবসব পায বেশি। বড়ো চালাটার নীচে সর্বসাধাবণের জন্য সভা বসে মাঝেমধ্যে, লোকজন আসেও খুব কম। সামান্য জলকাদা ভক্তদের উৎসাহ কমাইযা দেয় দেখিয়া সদানন্দ ক্ষুণ্ণ হয়। নানারকম খটকা জাগে মনে। লোক কী তার কথা শুনিতে আসে হুজুগে পড়িযা, সময কাটানোব জন্য ? একটু কষ্ট স্বীকাব করিবার দরকার হইলেই অনায়াসে আসাটা বাতিল করিযা দেয় ? কিন্তু আশ্রমের ভান্ডারে দান হিসাবে প্রণামি তো তাকে প্রায় সকলেই দেয, কেউ দেয যতবার আসে ততবারই, কেউ দেয় মাঝে মাঝে। ঘরের কড়ি পরকে দেওয়া ত্যাগ বইকী। বিনিময়ে পুণ্য অবশ্য তারা পায। কিন্তু বর্ষাকালে পুণ্যেব দরকারটা এত কমিয়া যায কেন ওদেব ? পুণ্যও কি বাজারের ভালো মাছ তরকারির শামিল ওদের কাছে, জলকাদা ভাঙিয়া জোগাড় করার চেয়ে ঘরে যা আছে তাই দিয়া কাজ চালাইয়া দেয় ? সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ হয় সদানন্দের, বর্ষার জল ভক্তদের কাছে তাঁর আকর্ষণকে জোলো করিয়া দিতে পারে বলিয়া। অহংকার বড়ো আহত হয। এদিকে আশ্রমেব কাজেও বর্ষাকালে শৈথিল্য আসে। নিজের নিজের কুটিরে বসিয়া উপাসনা জপতপ পূজার্চনা যার যত খুশি করে, যার যত খুশি করে না, সকলকে একত্র করিয়া সদানন্দ উপদেশ বিতরণ করিতে আসে কম। কোনোদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, কোনোদিন থাকে মুষলধাবে বর্ষণ। সদানন্দ হয়তো মেঘে ঢাকা আকাশকে উপেক্ষা করিয়া নদীব ধারে খানিকটা ঘুরিয়া আসে, হয়তো বাহির হইয়া যায় কেবল বৃষ্টিতে ভিজিতে। অথবা হয়তো নিজেব ঘরে শুইয়া বসিয়া পড়ে বই। আশ্রমের নরনারীদের উপদেশ দিতে যায় খুব কম।

মাধবীলতা মাঝে মাঝে আসে। উপদেশ শুনিয়া যায়।

হিল তোলা জুতা খটখট করিয়া হাজির হয় সে একেবারে সদানন্দের অন্তঃপুরে। এটা আশ্রমের নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু সদানন্দ নিজেই যখন অনুমতি দিয়াছে, নিয়ম-অনিয়মের প্রশ্ন কে তুলিবে। বিপিন তুলিতে পারে, সদানন্দকে পাগল করিয়া দিতে পারে প্রশ্নের প্রশ্ন তুলিয়া, কিন্তু সে চুপ করিয়া থাকে। একদিন দুপুরবেলা মাধবীলতা আসিবার পর সদানন্দকে জানাইয়া হঠাৎ সে চলিয়া গিয়াছিল বাহিরে, বলিয়া গিয়াছিল ফিরিতে সন্ধ্যা হইবে। আধঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়াছিল হঠাৎ।

না, বুকে সদানন্দ মাধবীলতাকে টানিয়া নেয় নাই। খাটের একপ্রান্তে পা ঝুলাইয়া মাধবীলতা যেভাবে বসিয়াছিল, এখনও বসিয়া আছে তেমনিভাবেই, তেমনই মনোযোগের সঙ্গে শুনিতেছে সদানন্দের কথা। কেবল সদানন্দের দৃষ্টি বড়ো কোমল, বাস্তব মমতার স্পষ্ট অভিব্যক্তি যেন কোনো কিছুর রূপ ধরিয়া দু-চোখে ফোয়ারার মতো উৎসারিত হইয়া উঠিবে, মুখের কথা শেষ হওয়ার শুধু অপেক্ষা।

মাধবীলতার মুখখানা টসটস করিতেছে জীবনীশক্তির রসে। আর হ্যাঁ, চোখ দিয়াও টসটস করিয়া জল পড়িতেছে বটে মেয়েটার।

মাধবী বলছিল এখানে থাকতে ওর ভালো লাগছে না বিপিন। কদিন থেকে ওর মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে—রাত্রে ঘুমোতে পারে না।

তাই নাকি ! বলিয়া বিপিন এমন একটা আপশোশের শব্দ করিল যে ঘরের করুণ আবহাওয়াটা বীভৎস প্রতিবাদে ওই সামান্য শব্দটুকুরও মধ্যে বজ্রের মতো গর্জিয়া উঠিল। কী বললি ? বলিয়া সদানন্দ যে গর্জন করিয়া উঠিল সে শব্দটা তুলনায় শোনাইল যেন ক্ষীণকণ্ঠের ফিসফিসানি কথা।

তারপর কিছুক্ষণ তিনজনই চুপ। একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছে, ঘর হইতে চলিয়া গিয়া আরেকটা ভুল বিপিন করিল না। ঠিক সময় মতোই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, অন্যকথা ভাবছিলাম।

সদানন্দ বলল, ও।

এখানে থাকতে তোমার ভালো লাগছে না মাধবী ?

লাগছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনটা বড়ো খারাপ হয়ে যায়।

কেন ? মাঝে মাঝে মন খারাপ হইয়া যায় কেন মাধবীর ? বাড়ির জন্য ? না, বাড়িতে এমন কে আছে মাধবীর যার জন্য মন কাঁদিবে ! তবে ? মাধবী শুধু মাথা নাড়ে, মুখ ফুটিয়া শুধু বলে, জানি না। বাহিরে আকাশ ছাইয়া মেঘ করিয়াছে, ঘরের ভিতরটাও যেন ওই রকম ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে। চুরি করিয়া আনা একটি যুবতি মেয়ের মন খারাপ হয় কেন, প্রশ্ন করিয়া আবিষ্কার করা কী সহজ ব্যাপার ! অন্য কোথাও যাইতে চায় মাধবী ? না, এইখানেই মাধবী থাকিবে, চিরকাল থাকিবে, যতদিন তার দেহে প্রাণ থাকে ততদিন।

সদানন্দ ও বিপিন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। গুমোটে সদানন্দ ঘামিয়া গিয়াছে, এবার বিপিন ঘামিতে আরম্ভ করে ভিতরের উত্তেজনায়। ভুল বিপিন সহজে করে না, মাধবীলতার সম্বন্ধে কেবলই ভুল হইয়া যাইতেছে। ছোটো একটা টুলে বসিয়াছিল বিপিন, জানালা দিয়া বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সে মৃদুস্বরে বলে, আশ্রমে আটকা পড়ে গেছ কিনা, সেই জন্য খারাপ লাগছে। কদিন বাইরে থেকে ঘুরে এলে বোধ হয় ভালো লাগত। নারাণবাবু আমায় নেমন্তন্ন করেছেন পরশু, যাবে আমার সঙ্গে মহীগড়ে ? বেশ জায়গাটা।

মাধবীলতা মাথাও নাড়ে, মুখেও বলে, না।

বিপিনকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে শুনিয়া সদানন্দ একটু অবাক হইয়া যায়, রাজপুত্র নারায়ণের জন্য মাধবীলতার মন কেমন করিতেছে না এ জন্য বিপিনের খুশি হওয়ার কারণটা তাঁর বোধগম্য হয় না।

চলো একটু বেড়িয়ে আসি আমরা নদীর ধার থেকে। বলিয়া বিপিন উঠিয়া দাঁড়ায়, সদানন্দের দিকে চাহিয়া বলে, আমরা যাই প্রভু ?

সদানন্দ গম্ভীরভাবে বলে, যাও।

সেই দিন হইতে বিপিনের সঙ্গে কী ভাব মাধবীলতার ! সদানন্দ স্পষ্ট বুঝিতে পারে, দুজনের মধ্যে কী যেন একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে, গড়িয়া উঠিয়াছে কেমন এক নতুন ধরনের আত্মীয়তা।

বিপিন শীত মানে না, গ্রীষ্ম মানে না, বর্ষা মানে না, বছরের সকল ঋতুতেই সে সমান ব্যস্ত, কাজে তার কখনও ঢিল পড়ে না। আমবাগানে গাছ কাটিয়া কুটির তুলিবার স্থানগুলি বর্ষা শেষ হইবার আগেই সাফ করিয়া ফেলিবে ঠিক করায় তার কাজ বাড়িয়াছে। পূজার মধ্যে সমস্তগুলি কুটির তুলিয়া আশ্রমের নূতন অংশটিকে সে সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এত কাজের মধ্যেও বিপিন মাধবীলতার সঙ্গে গল্প করিবার সময় পায়, তাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে যাইবার সময় পায়, সে যাতে আশ্রমের ছোটোখাটো কাজ করিয়া সময় কাটাইতে পারে তার ব্যবস্থা করিয়া দিবার সুযোগও পায়।

সদানন্দের কাছে আসে মাধবীলতা। মাঝে মাঝে আসে। শান্ত শিশুর মতো চুপ করিয়া বসিয়া তার কথা শোনে, একটা অভিনব নম্রতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তার সঙ্গে আলাপ করে। আর সমস্তক্ষণ মুখখানা তার টসটস করিতে থাকে জীবনীশক্তির রসে। তবে চোখ দিয়া অন্য কিছু আজকাল আর টসটস করিয়া গড়াইয়া পড়ে না।

সন্তর্পণে একদিন সদানন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করে, বিপিনের সঙ্গে তোমার বেশ আলাপ হয়েছে, না ?

বেশ লোক উনি। আমায় খুব স্নেহ করেন।

আশ্রমে থাকতে তোমার এখন ভালো লাগছে ?

তা লাগছে। ভালো সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

কী ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ?

এই—যাতে সময় কাটে, আশ্রমের কাজকর্ম করতে পাই, ঘুরে বেড়াতে পাই—

মাঝে মাঝে দুটি একটি প্রশ্ন করিয়া জবাবগুলি সদানন্দ গম্ভীর মুখে শুনিয়া যায়। একটা দিক ধীরে ধীরে তার কাছে পরিষ্কার হইয়া যায়। তার কাছ হইতে মাধবীলতাকে দেখাশোনা করার হুকুম পাইয়া এতদিন দেখাশোনার একেবারে চরম করিয়া ছাড়িয়াছিল উমা ও রত্নাবলী, সর্বদা চোখে রাখিয়া কী ভয়ানক আদর-যত্নটাই দুজনে যে করিয়াছিল তাকে ! সে যেন শিশু, সে যেন ভঙ্গুর, সে যেন দুষ্প্রাপ্য কিছু, সেবায় স্নেহে খাতিরে শাসনে মাথায় করিয়া তাকে না রাখিলে চলিবে না। বিপিন তাকে মুক্তি দিয়াছে। এক রকম কিছুই করে নাই বিপিন, উমা আর রত্নাবলীকে বলিয়া দিয়াছে মাধবীলতা যা করিতে চায় তাই যেন করিতে পায় আর মাধবীলতাকে দিয়াছে কয়েকটা দায়িত্ব। আশ্রমের একপ্রান্তে আছে গোয়ালঘর, সকালে বিকালে দুধ দোয়ার সময় সে হাজির থাকিবে, যে কুটিরে যতটা দুধ যাওয়ার কথা বাঁটিয়া দিবে। আশ্রমের মেয়েরা দুজন দুজন করিয়া রান্না করে, মাধবী তাদের তরকারি কুটিয়া দিয়া সাহায্য করিবে, আর যদি কেউ অসুস্থ থাকে আশ্রমে তার জন্য প্রস্তুত করিবে দরকারি পথ্য। এমনই সব ছোটো ছোটো কয়েকটা কাজ।

আপনি আমায় বলছিলেন না আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা, ভালো বুঝতে পারিনি, বিপিনবাবু ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

কী বলেছেন বিপিনবাবু ?

কথা আর কথার ভঙ্গি মাধবীলতাকে একটু দমাইয়া দিল। সন্দিগ্ধভাবে বলিল, কীভাবে সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকা যায় মানুষকে তাই বুঝিয়ে দেওয়া, ধর্মের মধ্যে যে বিকার এসেছে সংশোধন করা, সমাজ-গঠনে—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। জীবন, ধর্ম, সমাজ, দেশ এই সবের জন্য বড়ো বড়ো কাজ করা আশ্রমের উদ্দেশ্য।

এ ভাবে বলছেন যে ? তাই উদ্দেশ্য নয় আশ্রমের ?

আহা, চোখ দুটি ছলছল করে মাধবীলতার। আঘাত পাইবে জানিয়া টসটস করিয়া জল ঝরানোর জন্য চোখ দুটিকে যেন প্রস্তুত করিয়া নিতেছে। হঠাৎ একটা তীব্র সন্দেহের স্পর্শে সদানন্দের

মন হাত দিয়া আগুন ছোঁয়ার মতো ছ্যাঁতছ্যাঁত করিয়া ওঠে। মনে হয়, মাধবীলতা যেন ভান করিতেছে। বোকামির ভান, সরল বিশ্বাসের ভান, শব্দ-সংজ্ঞাগুলির অর্থ না বুঝিযাও তৎসংক্রান্ত চিরন্তন আদর্শবাদের যে অসংখ্য পূজারিনি আছে, সেও তাদেরই একজন,—

অথবা তার নিজেরই ভুল ? যেটা মাধবীর ভান মনে হইতেছে মাধবী আসলে তাই, সে নিজেই মাধবীলতা সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি কবিয়া রাখিয়াছে ? মাধবী প্রশ্নভরা শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে বলিল, মোটামুটি তাই। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে আশ্রমের, এখানে কিছুদিন থাকলেই আস্তে আস্তে সেটা বুঝতে পারবে, আরেক দিন তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেব।

মাধবীর স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতাবোধ অত্যন্ত স্পষ্ট। নিজের অস্বস্তি ও দুর্বোধ্য জ্বালাবোধ সদানন্দকে পীড়া দিতে থাকে। সে চিত হইয়া শুইয়া পড়ে। মাধবীলতা সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল সে, সেই করিয়া দিয়াছিল তার আশ্রমবাসের ব্যবস্থা। মাধবী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল মাধবীর, রাত্রে ঘুম হইতেছিল না। চোখের পলকে বিপিন তার জীবনকে সহজ ও সানন্দ করিয়া দিয়াছে। আশ্রমের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা কতবার সদানন্দ বলিযাছে মাধবীকে, বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে কাতর হইয়া পড়িয়াছে মাধবী। বিপিন দু-কথায় সব তাকে বুঝাইয়া দিয়াছে, হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে মাধবী।

পা টিপে দেব ?

সদানন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে মাধবীর ঔৎসুক্য মুছিয়া যায়, চোখ নামাইয়া জড়োসড়ো হইয়া সে বসে। প্রথমে এখানে আসিয়া শেষরাত্রে সদানন্দের পিঠের সঙ্গে মিলিয়া যেভাবে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়াছিল, লজ্জায় সংকোচে যেন তেমনই কুণ্ডলী পাকাইয়া যাইবে। কৈফিয়ত দেওয়ার মতো ভয়ে নিজে হইতে সে বলে, বিপিনবাবু বলছিলেন, আপনার একটু সেবা করতে। আপনি নাকি কারও সেবাযত্ন নেন না, বড়ো কষ্ট হয় আপনাব।

না, পা টিপতে হবে না। বৃষ্টি আসছে। তুমি এবার যাও মাধবী।

আহত হইয়া মাধবী চলিয়া যায়। রাগে সদানন্দের গা জ্বালা করিতে থাকে। মাধবীকে এ কী করিয়া দিয়াছে বিপিন : নিজে আড়ালে থাকিয়া এ কী সম্পর্ক সে গড়িয়া তুলিতেছে তার আর মাধবীর মধ্যে ? বিপিনের সঙ্গে কথা বলিবাব সময় কত হাসে মাধবী, আশ্রমেব জীবন নাকি তাব হালকা হাসিখুশিতে ভরিয়া উঠিয়াছে, অজস্র কথা বলে, মনের আনন্দে চঞ্চলপদে ঘুরিয়া বেড়ায়, কাজের ফাঁকে ফাঁকে গুনগুন করিয়া গানও নাকি শোনা যায় তার সময় সময়। প্রথম প্রথম সদানন্দের কাছেও তো প্রায় এই রকমই ছিল মাধবী, আকস্মিক অবস্থা পরিবর্তনের ধাক্কায় একটু যা কেবল হইয়া পড়িয়াছিল কাবু। এখন সামনে পড়িলে মনোভাবের সবগুলি উৎসমুখে সে যেন তাড়াতাড়ি ছিপি আঁটিয়া দেয়, খোলা রাখে কেবল সভয় শ্রদ্ধাভক্তির উৎসটা, আর—

এইখানে একটু খটকা লাগে সদানন্দের। আর কী ? আর কী উথলাইয়া পড়ে তার সান্নিধ্যগত মাধবীর সর্বাঙ্গীণ অস্তিত্ব হইতে ? পবিণত নারীর সেবা ও স্নেহের সাধ ? কিন্তু সেটা কেমন হয় ! সেই সহজ ও সাধারণ সাধটা তাকে কেন্দ্র করিয়া মাধবীর মধ্যে যদি অস্বাভাবিক রকম জোরালো হইয়া উঠিয়াও থাকে, এইভাবে কি তা আত্মপ্রকাশ করে, এমন দুর্বোধ্য ও রহস্যময় প্রণালীতে ? সর্বদা যেন আত্মসচেতন মাধবী, সর্বদা সংযত— গভীর দীনভাবে সর্বাঙ্গে তার একটানা ছেদহীন রোমাঞ্চ।

বৃষ্টি নামি নামি করিয়া বহুক্ষণ আকাশে আটকাইয়া ছিল। হয়তো শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি আজ নামিবেই না। একবার ডাকিয়া পাঠাইলে কেমন হয় মাধবীকে, একটু সেবা করিবার অনুমতি দিলে? কোমরে আঁচল জড়াইয়া হয়তো মাধবী কুটিরের মেঝে ঝাঁট দিতেছে—শাড়ি-শেমিজ এলোমেলো, চুল এলোমেলো, কথা এলোমেলো, হাসি এলোমেলা। ডাক পৌঁছিলে হাত ধুইয়া কোমরে বাঁধা আঁচল

খুলিবে, চুলটা তাড়াতাড়ি ঠিক করিয়া লইবে, কথা ও হাসি দিবে বন্ধ করিয়া। তার সেই হিলতোলা জুতাটি পায়ে দিয়া এই উঠান পর্যন্ত আসিবে তাড়াতাড়ি—ঠকঠক শব্দ স্পষ্ট কানে আসিবে সদানন্দের। তারপর জুতা শাড়িটা এখানে ওখানে একটু টানিয়া, দু-হাতে কপাল হইতে আলগা চুল কয়েকটি শেষবারের মতো উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া বলিবে, ডাকছিলেন ?

সদানন্দ উঠিয়া অন্দরে গেল। অন্দরে কেউ নাই। সদরে গিয়া দাঁড়াইতে চোখে পড়িল, কিছু দূরে ছোটো ফুলের বাগানটিতে আশ্রমের কয়েকটি মেয়ে ফুল তুলিতেছে। তাদের একজন মাধবী। তাই তো বটে, বিশ-বাইশ বছর আগে একজনকে কোমরে আঁচল জড়াইয়া ঘর ঝাঁট দিতে দেখিয়াছিল বলিয়া মাধবীকেও যে ঘরই ঝাঁট দিতে হইবে তার কী মানে আছে !

সদানন্দকে চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মেয়েরা কাছে আসিল। অঞ্জলি ভবিয়া পায়ে ফুল ঢালিয়া করিল প্রণাম। নীরবে নির্বিকারভাবে প্রণাম গ্রহণ করিয়া সদানন্দ ভিতরে চলিযা গেল। পায়ে ঢালিয়া দেওয়া ফুলগুলি কুড়াইয়া মেয়েরা আবার ফিরিয়া গেল ফুল তুলিতে।

পরদিন দুপুরবেলা সদানন্দ নিজেই ডাকিয়া পাঠাইল মাধবীলতাকে।

মাধবী ঘরে ঢুকিবামাত্র তার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল বুকে। মাধবী বিবর্ণমুখে কাঠ হইয়া রহিল। এটা বাধাও নয়, প্রতিবাদও নয়, সদানন্দও তা জানে। কিন্তু কল্পনা ও বাস্তবেব মধ্যে কী আকাশ-পাতাল পার্থক্য। হাতেব বাঁধন আপনা হইতেই ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া গেল।

আমাকে তুমি ভয় কর মাধবী ?

মাধবী অস্ফুটস্বরে বলিল, না।

মাথায় হাত বুলাইয়া সদানন্দ তাকে একটু আদর করিল, এ ছাড়া স্নেহ-মমতা জানানোব শারীরিক প্রক্রিয়া আর কী আছে। একটু আদব কবিয়া বুক হইতে নামাইয়া দিল—মেয়েটার দম প্রায় আটকাইয়া আসিয়াছে।

কাল তোমায় বকেছিলাম বুঝি ?

মাধবী পুনর্জীবিতার মতো অদ্ভুতভাবে হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ। কাল যে হঠাৎ কেন রেগে গেলেন—

রাগিনি—আমি কখনও রাগি না। তুমি আমার সেবা করতে চাও—কী সেবা করবে বলো তো ?

আপনি যা বলবেন।

পাকা চুল তুলে দেবে ?

মাধবী হাসিল। পাকা চুল বাছিয়া দিবাব সময় তার কোলে মাথা রাখিয়া সদানন্দ চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল সমস্তক্ষণ। মাধবী চলিয়া যাওয়াব পর মনে হইল, অসময়ে আজ যেন ঘুম আসিয়াছে। উঠিয়া জানালায় গিয়া দাঁড়াইল। রাধাই নদীর বুক আরও ভরিয়া উঠিয়াছে। কালকের মতো আজও নামি নামি করিয়া আকাশে আটকাইয়া রহিয়াছে বৃষ্টি। স্তিমিত দৃষ্টিতে বিকলের মতো সদানন্দ চাহিয়া থাকে। এত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সদানন্দের, এত তেজ ও সংযম, জীবনকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে কী তীক্ষ্ণই হইয়াছে তার বিচারবুদ্ধি, এখন যেন জানিবার-বুঝিবার ক্ষমতাটুকুও আর নাই। অন্ধ আবেগের মতো, অমর সংস্কারের মতো, কেবল একটা কথা মনে জাগিতেছে, তবে কী সত্যই দেবতা কেউ আছেন অন্তরালে, মানুষ যাকে সৃষ্টি করে নাই, পাপপুণ্য যাচাইয়ের একটি করিয়া কষ্টিপাথর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দিয়া মানুষকে যিনি স্বাধীনতা দিয়াছেন কিন্তু বিচারের ক্ষমতাটা রাখিয়াছেন নিজের হাতে, অহরহ পাপপুণ্যের ওজন করিয়া মানুষকে যিনি শাস্তি আর পুরস্কার দিতেছেন— ? নয়তো মাধবীকে বাহুবন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া তার কেন মনে হইতেছে নিজে সে মুক্তি পাইয়াছে—একটা অদৃশ্য দানবের নিবিড় আলিঙ্গনের অকথ্য যন্ত্রণা হইতে ?

সন্ধ্যার সময় আশ্রমেব সকলকে আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের সম্পর্ক লইয়া উপদেশ দিবার কথা ছিল। সদানন্দ গেল না। পরদিন আশ্রমেব সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল, সাতদিন গুরুদেব বিশেষ সাধনায় ব্যাপৃত থাকিবেন, কেহ দর্শন পাইবে না।

বিপিন বলিল, মাঝে মাঝে তোর পাগলামি দেখে—

তুই আমার সর্বনাশ করবি বিপিন।

মাঝে মাঝে তোর পাগলামি দেখে—

পাঁচ

বাগবাদা গাঁয়ের সেই যে মহেশ চৌধুরি, যার ছেলে বিভূতি গিয়াছে আসল সরকারি জেলে, যার দুটি মেয়ে গিয়াছে শ্বশুরবাড়ি নামক নকল সামাজিক জেলে, যাব উপর রাজা সাহেবেব ভয়ানক বাগ, আশ্রমে যে একেবারেই আমল পায় না, সুযোগ পাইলেই সকলের সামনে যাকে অপদস্থ করিবার জন্য সদানন্দকে বিপিন বিশেষভাবে বলিযা রাখিয়াছে, মানুষটা সে একটু খাপছাড়া কিন্তু তুচ্ছ নয়। তুচ্ছ নয় বলিয়াই অবশ্য তার উপর রাজা সাহেবের এত রাগ, আশ্রমে তাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার জন্য বিপিনের এত চেষ্টা। চারিদিকের অনেকগুলি গ্রামে মহেশ চৌধুরির যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, যেটা গড়িয়া তুলিবার জন্য কারও চেষ্টা করিতে হয় নাই, মহেশ চৌধুরিব জীবনযাপনেব একনিষ্ঠ প্রক্রিয়া বহুকাল ধবিয়া তিলে তিলে যার জন্ম দিয়াছে। লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে, ভালোবাসে। কীভাবে জানিয়াছে, কেন জানিয়াছে, জেরা কবিলে কেহ বলিতে পারিবে না, কিন্তু সকলেই জানে, মনে মনে মহেশ চৌধুরি সকলের মঙ্গল কামনা কবে, লোকটার ভক্তি ও নিষ্ঠা আন্তরিক, সকল সময় সকল বিষয়ে নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়। লোকটা বুদ্ধিমান কিন্তু চালাক নয়, ভিতবে বাহিরে মিল আছে লোকটাব—দৈনন্দিন জীবনের কাববাবে মানুষেব সঙ্গে মানুষেব যে অসংখ্য দেওযা নেওযা চলে তার মধ্যে মহেশ চৌধুবির কাছে পাওনা গ্রহণ করিতে আশাভঙ্গেব সম্ভাবনা নাই।

[লেখকের মন্তব্য : কোনো মানুষ সম্বন্ধে জনসাধাবণের ধারণা অসংখ্য ব্যক্তিগত ধারণাব সমষ্টি কিন্তু ধারণাগুলি নির্দিষ্ট পর্যায়ভুক্ত, সীমাবদ্ধ, বৈচিত্র্যহীন। যার ব্যক্তিত্বেব দুটি-একটি বিশিষ্ট দিক মাত্র অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্থূলভাবে মানুষেব কাছে আত্মপ্রকাশ কবে, যার সম্বন্ধে মানুষ নিজের ধারণা কটির মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায়, নিজের মনে যতগুলি বিভিন্ন 'টাইপ' সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা মানুষের থাকে তার মধ্যে কোনো একটি টাইপের সঙ্গে মানুষ যাকে মোটামুটি মিলাইযা লইতে পারে, কেবল তারই ব্যক্তিত্বকে মানুষ স্বীকার করে। ব্যক্তিত্ব আসলে পরাশ্রয়ী, ব্যক্তিত্বের বিকাশে পবধর্মানুশীলনের প্রয়োজন, এই জন্য জোরালো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের পক্ষে এটা ভয়াবহও বটে ! যার ব্যক্তিত্বের প্রভাব যত বেশি, তাকে বেশি পরের ইচ্ছায় চলিতে হয়, নেতার চেয়েও সে পরাধীন। ব্যক্তিত্বকে প্রভাবশালী করিবার মূলমন্ত্র পরের মনে ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া, সে ছোটো আমি বড়ো, তার যা কিছু আছে কম আমার সে সব আছে অনেক বেশি। সুতরাং পরের ছোটোবড়ো কমবেশির সংস্কাব ও ধারণা অনুসারে আমার ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত না হইলে সেটা নিছক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে পরিণত হয় মাত্র। এ পর্যন্ত মোটকথা, কোনো জটিলতা নাই। গোলমাল আরম্ভ হয় বিশ্লেষণ যখন সেই স্তরে পৌঁছায়, যেখানে ব্যক্তিত্বের সংগঠনে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন মালমশলাগুলি পৃথক করিতে হয়, সমগ্র প্রক্রিয়াটার পিছনে কতখানি ক্রিয়াশক্তি অচেতন ও কতখানি সচেতন তাও পৃথক করিতে হয়।

আমার এ সব কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই। সদানন্দ ও মহেশ চৌধুরির ব্যক্তিত্বের একটি মৌলিক সামঞ্জস্যের কথা আমি সোজাসুজি আপনাদের বলিয়া দিতে চাই। সদানন্দ, বিপিন, মাধবীলতা এদের ব্যক্তিত্বের যেসব দিক আমি ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছি এবং চাই গল্পের মধ্যেই তা আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। কিন্তু মহেশ চৌধুরি ও সদানন্দের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে সামঞ্জস্যটা আমি দেখাইতে চাই, গল্পেব মধ্যে আপনা হইতে সেটা পরিস্ফুট করিয়া তোলা আমার সাধ্যাতীত। কারণ, দুজন মানুষকে কাছাকাছি টানিয়া আনিয়া অথবা দুজনের মধ্যে একটি মধ্যস্থ খাড়া করিয়া একজনের ব্যক্তিত্বরূপী সচেতন মননশক্তির সঙ্গে অপরজনের ব্যক্তিত্বরূপী অচেতন মননশক্তির পার্থক্য সহজেই স্পষ্ট করিয়া তোলা যায়, কিন্তু সামঞ্জস্য কোনোরকমেই দেখানো যায় না। যাই হোক, বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। কেবল বলিয়া দিই। মহেশ চৌধুরির মধ্যে যে অচেতন মননশক্তি সকলের প্রীতি অর্জন করিয়াছে এবং সদানন্দের মধ্যে যে সচেতন মননশক্তি সকলেব মধ্যে জাগাইয়াছে সভয় শ্রদ্ধা, মূলত তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই।]

মহেশ চৌধুরি প্রত্যেক দিন আশ্রমে যাতায়াত করে, সাধারণত বিকালের দিকে। সকালেও মাঝে মাঝে আশ্রমে তার আবির্ভাব ঘটে, খুব ভোরে। রাত্রে সে ঘুমায় কিনা অনেকের সন্দেহ আছে, প্রাতঃভ্রমণে বাহির হয় একরকম শেষরাত্রে। লাঠি হাতে চার মাইল পথ হাঁটিয়া হাজির হয় আশ্রমে, আবছা আলো-অন্ধকারে এদিকে খোঁজে ওদিকে খোঁজে, রাত্রি শেষে কার সঙ্গে যেন খেলিতেছে লুকোচুরি খেলা, খেলার সাথিটি তার কুটিরের পিছনে, গাছের আড়ালে, ঝোপের মধ্যে কোথাও গা-ঢাকা দিয়াছে। খুঁজিতে খুঁজিতে যায় নদীব ধারে। কোনোদিন হয়তো সদানন্দের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। তৎক্ষণাৎ প্রণাম করিয়া মহেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সদানন্দ যদি প্রথমে কথা বলে তো বলে, নতুবা মহেশ চৌধুরির মুখ খোলে না।

কে, মহেশ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু। বড়ো জ্বালা প্রভু মনে, বড়ো কষ্ট পেয়েছি সমস্ত বাত। তাই ভাবলাম, ভোরবেলা প্রভুর চরণ দর্শন করে—

সদানন্দের ধাবণা জ্বালা তারও আছে। সে বলে, তোমায় না আশ্রমে আসতে বাবণ কবে দিয়েছি ?

না এসে পারি না প্রভু।

বটে ? বেশ, বেশ। তোমার মতো আর দু-একটি ভক্ত জুটলেই আশ্রম ছেড়ে আমায় বনে-জঙ্গলে পালাতে হবে। তা তোমার আসল মতলবটা কী বল তো শুনি ?

চরণে ঠাঁই চাই প্রভু—মনে শান্তি চাই।

পাগল ? মাথা খারাপ মহেশ চৌধুরির ? এ রকম অন্ধভক্ত সদানন্দের আরও আছে, কিন্তু এমন নাছোড়বান্দা কেউ নাই। বাড়াবাড়ির জন্য ধমক দিলে ভাবপ্রবণ ভক্ত দমিয়া যায়, মুখ হইয়া আসে কালো, ভক্তিও যেন উবিয়া যায় খানিকটা। কিন্তু মহেশ চৌধুরি কিছুতেই দমে না, কিছুতেই হাল ছাড়ে না। সদানন্দের অবজ্ঞা, অবহেলা, কড়া কথা এ সবও যেন তার কাছে পরম উপভোগ্য। বড়ো রাগ হয় সদানন্দের—বড়ো আনন্দ হয়। মনে হয়, আসলে মহাপুরুষ সে কেবল এই একজন মানুষের কাছে, প্রায় দেবতার সমান। আর সকলে তাকে ঠকায়, শুধু দাম দেয়, শুধু তার দাবি মেটায়। তারই বলিয়া দেওয়া মন্ত্রে পূজা করে তার। কিন্তু মহেশ চৌধুরি কিছু জানে না, কিছু মানে না, নিজের রচিত একটি মাত্র মন্ত্র বলিয়া সে পূজা করে—তুমি আমায় চাও বা না চাও দেবতা, আমি তোমায় চাই।

একটু ভয়ও করে সদানন্দের মহেশ চৌধুরির কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে, তার সঙ্গে কথা বলিতে। বাস্তব অভিজ্ঞতার মালমশলায় জীবনের যে আদর্শ সে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে নিজের জন্য,

সে আদর্শ অবাস্তব কল্পনা কিনা, অর্তহীন স্বপ্ন কিনা, আজও এ বিষয়ে সদানন্দের সন্দেহ মেটে নাই। যে আত্মপ্রত্যয়ের নীচে এ সন্দেহ চাপা থাকে, মহেশ চৌধুরির দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, চোখের দৃষ্টিতে, মুখের কথায় তা যেন উবিয়া যাইতে থাকে—দেবতার সামনে পূজারির মতো মহেশ চৌধুরি দাঁড়াইয়া থাকে, পোষা কুকুরের মতো তাকায়, স্তব করার মতো কথা বলে—তবু। মনে হয়, আর যত ভক্ত তার আছে, যাদের মধ্যে অনেকে মনে মনে তার সমালোচনাও করে কমবেশি, তাদের ভুলাইতে কোনোদিন তার কষ্ট হইবে না, ভুলিবার জন্য শিশুর মতো তারা উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে, কিন্তু এই অন্ধ ভক্তটিকে ভুলানোর ক্ষমতা তার নাই। মহেশ চৌধুরির পূজা গ্রহণ করিলে বর দিবার সময় ফাঁকি চলিবে না, ভেজাল চলিবে না। অবাস্তব পাগলামির পুরস্কারকে করিয়া তুলিতে হইবে বাস্তব। কাব্যের জন্য কবিকে যেমন নারীকে দিতে হয় খাঁটি রক্তমাংসের দেহটি।

তোমার ছেলে ছাড়া পেয়েছে মহেশ ?

আজ্ঞে না। ও কি আর ছাড়া পাবে।

অ্যাঁ ? সে কী কথা—ছাড়া পাবে বইকী, দুদিন পরেই ছাড়া পাবে। ভেবো না।

এই কি বাস্তব পুরস্কারের নমুনা ? ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুটি মিষ্টি কথা বলা, একটু অনিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া, হিসাব করিলে যার দাম কানাকড়িও হয় না কিন্তু মহেশ চৌধুরির কাছে যা অমূল্য ?

কোনোদিন সদানন্দ কথা না বলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়, মহেশ চৌধুরি ঠায় দাঁড়াইয়া যতক্ষণ দেখা যায় তাকে দেখে তারপর আবার আপন মনে তপোবনে ঘুরিয়া বেড়ায় আর সদানন্দের সম্মুখে পড়ে না। এখানে সে অনাহূত অবাঞ্ছিত আগন্তুক, বিপিনের শাসনে আশ্রমের কেউ তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না, মাঝে মাঝে রীতিমতো অপমানও জোটে, তবু মোহাচ্ছন্নের মতো সে আশ্রমের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, ধীরে ধীরে আশ্রমের জাগরণ লক্ষ করে।

সদানন্দের অজ্ঞাতবাসের খবরটা মহেশ চৌধুরি পাইল সাতুনার শ্রীধরের বাড়িতে। বাগবাদায় নিজের বাড়ি হইতে আশ্রমে যাওয়ার পথে শ্রীধরের বাড়ি পড়ে, মহেশ চৌধুরি এখানে কিছুক্ষণ বসিয়া যায়। বিশ্রামও হয়, জানাশোনা অনেকের সঙ্গে কথা বলাও হয়, অনেকের খবরও পাওয়া যায়। আজ শ্রীধরের সদরের বড়ো ঘরটার দাওয়ায় লোক জুটিয়াছে অনেক। যারা অপরাহ্ণে যাইবে ভাবিয়াছিল সদানন্দ সাত দিন দর্শন দিবে না শুনিয়া তাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীধরের এখানে আসিয়া জুটিয়াছে। শ্রীধর একটি নূতন বই সংগ্রহ করিয়াছে কোথা হইতে, কামরূপের এক রোমাঞ্চকর প্রামাণ্য উপন্যাস। কাল চারটি পরিচ্ছেদ পাঠ করা হইয়াছিল, আজ সকলে আসিয়া জুটিলেই বাকি অংশটুকু পড়া আরম্ভ হইতে পারিবে।

মহেশ চৌধুরি বলিল, কেউ দর্শন পাবে না ?

শ্রীধর বলিল, বিপিনবাবু তাই বললেন চৌধুরি মশাই। প্রকৃত ভক্ত ছাড়া কেউ দর্শন পাবে না—প্রভুর জন্য যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে, জীবন বিসর্জন দিতে পারে, কেবল সেই দর্শন পাবে।

প্রভুর জন্য তোমরা সর্বস্ব ত্যাগ করতে পার না, জীবন বিসর্জন দিতে পার না শ্রীধর ?

উৎসুক দৃষ্টিতে মহেশ চৌধুরি সকলের মুখের দিকে চাহিতে থাকে, সকলে অস্বস্তি বোধ করে, চোখ নামাইয়া নেয়। বৃদ্ধ শ্রীধরের স্তিমিত চোখ দুটি বোধ হয় তামাকের ধোঁয়াতেই বুজিয়া যায়।

আমি প্রভুর চরণ দর্শন করতে যাব শ্রীধর।

সকলে স্তব্ধ হইয়া থাকে। অহংকারের কথা নয়, মহেশ চৌধুরির অহংকার আছে কিনা সন্দেহ। সকলে তা জানে। কিন্তু একটা কথা প্রায় সকলের মনেই খচখচ করিয়া বিঁধিতে থাকে, কঠিন একটা

সমস্যা। সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, জীবন বিসর্জন দিতে পারে, এত বড়ো ভক্তই যদি মহেশ চৌধুরি হয়, সদানন্দ তাকে আমল দেয় না কেন, কেন তাকে শিষ্য করে না ? এই সমস্যা আজ বহুদিন সকলকে পীড়া দিতেছে, এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তারা অনেক আলোচনা করিয়াছে, মনে মনে অনেক মাথা ঘামাইয়াছে। কারও কারও মনে এ সন্দেহও জাগিয়াছে যে, মানুষটা মহেশ চৌধুবি কি আসলে তবে ভালো নয়, তার নীতি ধর্ম ভক্তি নিষ্ঠা সব লোক দেখানো ভালোমানুষি ?

মহেশ চৌধুরি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে, যাই, একবার ঘুরে আসি আশ্রম থেকে।

কয়েকজন কৌতূহলভরে তার সঙ্গ নিলে সে তাদের ফিরাইয়া দেয়, বলে, না, আজ আব তোমাদের গিয়ে কাজ নেই ভাই। প্রভু যখন বারণ করে দিয়েছেন, মিছিমিছি গোলমাল না করাই ভালো।

আশ্রমে গিয়া মহেশ চৌধুরি যাকে সামনে পাইল তাকেই প্রভুব চরণ দর্শনের জন্য ব্যাকুলভাবে আবেদন জানাইতে লাগিল। কেউ জবাব দিল, কেউ দিল না। তখন মহেশ চৌধুরি গিয়া ধরিল বিপিনকে।

বিপিন বলিল, সাতদিন পরে আসবেন।

মহেশ চৌধুরি মিনতি করিয়া বলিল, আপনি একবার প্রভুকে গিয়ে বলুন, প্রভুব জন্য আমি সর্বস্ব ত্যাগ করব, জীবন বিসর্জন দেব। আপনি বললেই প্রভু আমায় ডেকে পাঠাবেন।

বিপিন রাগিয়া বলিল, কে আপনাকে সর্বস্ব ত্যাগ করতে, জীবন বিসর্জন দিতে সেধেছে মশায় ? কেন আসেন আপনি আশ্রমে ? যান যান, বেরিয়ে যান আমার আশ্রম থেকে।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মহেশ চৌধুরি ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিয়া গেল। ফিবিয়া আসিল শেষ রাত্রে।

সদানন্দের সদবের কুটিবের সামনে কদম গাছটাব তলায বসিযা পড়িল। কুটিরের আড়াল হইতে সূর্য উঠিলেন মাথাব উপবে, তারপর আকাশ ঢাকিয়া মেঘ করিয়া আসিযা ঘণ্টাখানেক বৃষ্টি হইয়া গেল, তারপর আবার কড়া রোদ ঢালিতে ঢালিতে সূর্য আড়াল হইলেন অন্য একটি কুটিবেব আড়ালে, গাছতলা হইতে মহেশ নড়িল না। রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিযা খাওয়া ছাড়িয়া কী তপস্যা করিতে বসিয়াছে গাছতলায় ? এত জায়গা থাকিতে এখানে তপস্যা করিতে বসা কেন ? আশ্রমের সকলে সম্মুখ দিয়া যাওয়ার সময় বিস্ময় ও কৌতূহলভরা দৃষ্টিতে তাকে দেখিতে থাকে,—তাকে দেখিবার জন্য কেউ আসে না বটে কিন্তু এদিক দিয়া যাতায়াত করার প্রয়োজন আজ যেন সকলের বাড়িয়া যায়।

বেলা বাড়িলে তিন-চারবার মহেশ চৌধুরির বাড়ি হইতে লোক আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। বর্ষণের আগে আসিয়াছিল কেবল চাকর গোমস্তা, বর্ষণের পর আসিল মহেশের ভাগনে শশধর। গাছতলায় মাটিতে উপবিষ্ট মামার জলে ভেজা মূর্তি দেখিয়া বেচারা কাঁদিয়া ফেলে আর কী ! কিন্তু সেও মহেশের তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারিল না। তবে দেখা গেল ছেলেটার বুদ্ধি আছে। নিজে হার মানিয়া সে ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু বিকালবেলা হাজির হইল একেবারে মামিকে সঙ্গে করিয়া।

ভাগনে কেবল কাঁদিয়া ফেলার উপক্রম করিয়াছিল, স্বামীর অবস্থা দেখিয়া স্ত্রী কাঁদিয়াই আকুল। কেন তার মরণ হয় না ? যার স্বামী পাগল, ছেলে পাগল, সে কেন সংসারে বাঁচিয়া থাকে নিত্যনতুন যন্ত্রণা সহ্য করিতে ? কাঁদিতে কাঁদিতে হাতের বালা দিয়া বিভূতির মা কপালে আঘাত করিল। রক্ত বাহির হইল একটু—ডান চোখের জলের ধারাটা লাল হইয়া গেল।

মহেশ চৌধুরি কাতরভাবে বলিল, শোনো শোনো, আহা এমন করছ কেন ? বাড়ি ফিরে যাও, আমি ঠিক সময়ে যাব।

খোলা জায়গার ফাঁকা গাছতলায় এমন নাটকের অভিনয় চলিতে থাকিলে দর্শকের সমাগম হইতে দেরি হয় না। একে একে আশ্রমের প্রায় সকলেই আসিয়া হাজির হয়, এলোমেলোভাবে চারিদিকে দাঁড়াইয়া দুজনকে দেখিতে থাকে। পুরুষেরা ব্যাপারটা অনেকটা হালকাভাবেই গ্রহণ করে, মেয়েদের মধ্যে দেখা দেয় চাপা উত্তেজনার চাঞ্চল্য, অনেকে ছোট্ট হাঁ করিয়া চোখ বড়ো করিয়া চাহিয়া থাকে, শেষবেলার আলোয় দাঁত করে ঝকঝক, চোখ করে চকচক। আশ্রমে দাঁতমাজার নিয়ম বড়ো কড়া, দাঁতে ময়লা থাকিলে সদানন্দ রাগ করে, মেয়েদের দাঁত তাই সত্যই ঝকঝক করে—কারও কম কারও বেশি। রত্নাবলীর দাঁতগুলি বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশি সুন্দর আর বেশি ঝকঝকে, চোখও তার বড়ো আর টানা। তবু গাছতলার ব্যাপার দেখিতে দেখিতে গায়ের আঁচল টানিয়া টানিয়া সে দু-হাতে পুঁটলি করিতে থাকে, তারপর রক্তপাত ঘটামাত্র আঁচলসমেত হাত দিয়া চাপা দেয় নিজের মুখ। কাঁদে কিনা বলা যায় না, কিন্তু সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপে। কী কুৎসিত যে দেখায় তার পরিপুষ্ট অঙ্গের অনাবৃত অংশের ঢেউ তোলা কাঁপুনি! শশধর অভিভূত হইয়া চাহিয়া থাকে। মাধবীলতা তাড়াতাড়ি মহেশ চৌধুরির স্ত্রীর কাছে গিয়া আঁচল দিয়া তার কপালের রক্ত মুছিয়া দেয়।

তারপর আবির্ভাব ঘটে বিপিনের। রাগ করিয়া লাভ নাই, সে তাই রাগ করে না, আশ্চর্য হইবার ভান করিয়া বলে, আপনি যাননি এখনও?

মহেশ চৌধুরি বলে, আজ্ঞে না। আপনাকে তো বলেছি, একবার প্রভুর চরণ দর্শন করতে না দিলে আমি উঠব না।

তা হলে সাতদিন আপনাকে এখানে থাকতে হবে।

তাই থাকব।

বিপিন একটু হাসিল, আপনার ভক্তিটা কিন্তু বড়ো খাপছাড়া চৌধুরি মশায়। প্রভুর আদেশ অমান্য করতে আপনার বাধবে না, প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য আপনি ব্যাকুল।

মহেশ চৌধুরি নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, ও আদেশ আমার জন্য নয়।

মাধবীলতা বলিল, না, সত্যি উনি জানিয়েছেন, সাতদিন কেউ দর্শন পাবে না। সাতদিন উনি এক মনে সাধনা করবেন কিনা।

আমি আড়াল থেকে একবার দর্শন করেই চলে আসব।

তা কী হয়?

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি বাড়িতে লাগিল, মহেশ চৌধুরি গাছতলায় মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিল। নিরীহ, শান্ত, ভীরু মানুষটা যে আসলে এমন একগুঁয়ে সদানন্দ ছাড়া এতকাল আর কে তা জানিত! তাকে কিছু খাওয়ানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া গেল। মাধবীলতা আর রত্নাবলী কোনোরকমে তার স্ত্রীকে একটু দুধ খাওয়াইয়া শশধরকে ডাকিয়া নিয়া গেল আশ্রমের রাত্রির আহার্যের ব্যবস্থায় ভাগ বসাইতে। রাত্রে আশ্রমে রান্না হয় না, কিন্তু পেট ভরাইতে শশধরের অসুবিধা হইল না,—দুধ, ছানা, মিষ্টি ফলমূল এ সবের অভাব নাই। খাওয়ার পর সে আসিয়া আবার মামা-মামির কাছে বসিয়া রহিল গাছতলায়। রাত্রি দশটা পর্যন্ত আশ্রমের দু-একজনকে সেখানে দেখা গেল, তারপর একজনও রহিল না। রাত্রি দশটার পর কারও কুটিরের বাহিরে থাকা বারণ—বিপিন ও সদানন্দ ছাড়া।

রাত প্রায় এগারোটার কাছাকাছি গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিও নামিল, ছাতি মাথায় বিপিনও হাজির হইল গাছতলায়। দাঁতে ব্যথা হওয়ায় বিপিন গলা, মুখ, চোয়াল, কান সমস্ত ঢাকিয়া সযত্নে কম্ফর্টার জড়াইয়াছে, ঠান্ডা লাগিলে তার দাঁতের ব্যথা বাড়ে। মুখের ঢাকা একটু সরাইয়া সে বলিল, আপনারা দাওয়ায় উঠে বসবেন। মাদুর আর বালিশ দিচ্ছি। মহেশ চৌধুরি স্ত্রীকে বলিলেন, যাও না, দাওয়ায়, যাও না তোমরা? বিষ্টিতে ভিজে যে মারা পড়বে তুমি! যাও, দাওয়ায় যাও।

বিভূতির মা বলিল, আর তুমি ?

এককথা একশোবার কেন বলছ ? বললাম না প্রভুকে দর্শন করতে না দিলে আমি উঠব না এখান থেকে ? তুমি এখানে বসে থেকে কী করবে, তাতে লাভটা কী হবে শুনি ?

তুমি এখান থেকে না উঠলে আমিও উঠব না।

সন্ধ্যা হইতে এ বিষয়ে দুজনের মধ্যে অনেক তর্ক, অনেক রাগারাগি হইয়া গিয়াছে, মহেশ চৌধুরি আর কিছু বলিল না, কেবল শশধরকে হুকুম দিল দাওয়ায় গিয়া বসিতে। শশধর দাওয়াতে গেল, বিপিন মাদুর আর বালিশ আনিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ মাদুর বিছাইয়া শুইয়াও পড়িল। আপশোশ করিয়া বলিল, বর্ষাকালে এ কী ঠান্ডা মশায়, অ্যাঁ ? এ কি শালার শীতকাল নাকি ?

বিপিনের সহানুভূতি জাগিবার লক্ষণ নাই দেখিয়া গলা নামাইয়া আবার বলিল, বউটা এসেছে কাল—ছ-মাস বাপের বাড়ি ছিল। কী গরমটা গেছে কাল রাতে, তা বউ বলে কী, না বাবু, বাদলার দিন ঠান্ডা লাগবে। বলে—

আপনি বাড়ি ফিরে যান না ?

শশধর উঠিয়া বসিল। —আমি ? মামি কাল বাড়ি ফিরেই কী করবে জানেন ? কানটি ধরে বলবে, বেরো বাড়ি থেকে। কেবল আমাকে নয় মশায়, নিজের জন্য কি আমি ভাবি, বউটাকে সুদ্ধু। গায়ে দেবার দিতে পারেন কিছু, কাপড়চোপড় যা হোক ?

বিপিন একটা চাদর আনিয়া দিল। কিন্তু বাদল রাতে সদানন্দের সদর-দাওয়ায় চাদর মুড়ি দিয়া আরাম করিবার অদৃষ্ট বেচারির ছিল না। বিভূতির মা ডাকিয়া বলিল, ও শশী, ও ভদ্রলোকের কাছ থেকে ছাতিটা চেয়ে রাখ, আর জিজ্ঞেস কর আরও যদি ছাতি থাকে একটা—

একটা কেন, আরও তিনটা ছাতি ছিল, সবগুলি আনিয়া দাওয়ায় শশধরের কাছে ফেলিয়া বিপিন ভিতরে চলিয়া গেল। দাঁতের অসহ্য যন্ত্রণায় তার মাথার মধ্যে তখন ঝিমঝিম করিতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল মাটিতে শুইয়া হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে আর চিৎকার করিয়া কাঁদে।

ছাতি নিয়া শশধর গাছতলায় গেল। একটি ছাতি খুলিয়া দিল মামির হাতে, আর একটি ছাতি খুলিয়া মহেশ চৌধুরিকে দিতে গেলে সে বলিল, না, আমার ছাতি চাই না।

স্ত্রী বলিল, কেন ? এখানে ধন্নে দিয়েছ, না খেয়ে বসে থাকবে, তা না হয় বুঝলাম—বিষ্টি যখন পড়ছে ছাতিটা মাথায় দিতে দোষ কী ?

মহেশ চৌধুরি বলিল, নিজে থেকে আমি কিছুই করব না।

তখন মহেশ চৌধুরির স্ত্রী আবার এমনভাবে নিজের মরণের জন্য আপশোশ আরম্ভ করিল যে মনে হইল আবার বুঝি আজ অপরাহ্নের মতো বালার আঘাতে নিজের কপাল কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া ছাড়িবে। কিন্তু খানিক আপশোশ করিয়া নিজের ছাতিটা বন্ধ করিয়া শশধরকে ফেরত দিল, বলিল, যা তুই, দাওয়ায় শো গে যা শশী।

শশধর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, থাক, আমিও বসে বসে ভিজি এখানে, আমিই বা বাদ যাব কেন।

তারপর মিনিট দুই সব চুপচাপ। এ অবস্থায় গাছের পাতায় বাতাসের মৃদু শোঁ শোঁ শব্দ আর গাছের পাতা হইতে জল ঝরিবার ক্ষীণ জোলো জোলো আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ কানে শোনাও পাপ। মনে অবশ্য অনেক কথা টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে এবং সেগুলি স্মৃতিও নয়।

সারাটা জীবন আমায় তুমি জ্বালিয়ে খেলে, আমার শনিগ্রহ তুমি। আমরা সব ব্যাপারে তোমার বাহাদুরি করা চাই, হাঙ্গামা বাধানো চাই। যদি শান্তি পাবার জন্যে গাছতলায় ধন্না দিয়ে পড়ে থাকি, তোমার কী তাতে, কেন তুমি এসে আমার মন বিগড়ে দেবে, কে ডেকেছিল তোমায় ? স্বামীভক্তি

দেখানো হচ্ছে—স্বামীর একটা কথা শুনবে না, স্বামীভক্তি দেখাতে গাছতলায় এসে ভেজা চাই। কী অদ্ভুত সতী রে আমার ! স্বামীর শাস্তি নষ্ট করে সতীত্ব ফলানো !

বৃষ্টি আর বাতাস দুয়েরই বেগ বাড়িতে থাকে। মহেশ চৌধুরিব রাগ আব জ্বালাবোধ কিন্তু না বাড়িয়া এই সামান্য ভর্ৎসনার মধ্যেই একেবারে ক্ষয় হইয়া যায়। আরও অনেকক্ষণ জের টানিতে পারিত, বলিতে পারিত আরও অনেক কথা, কিন্তু কিছু না বলিয়া একেবারে চুপ হইয়া গেল। অন্ধকারে এত কাছাকাছি বসিয়াও কেহ কারও মুখ দেখিতে পাইতেছে না। গাঢ় অন্ধকারে শুধু একটি আলোর বিন্দু চোখে পড়ে। কিছুদূরের একটি কুটিরে কে যেন একটি আলো জ্বালিয়া জানালা খুলিয়া রাখিয়াছে। জাগিয়া আছে না ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মানুষটা কে জানে ! এত রাত্রে চোখে ঘুম নাই এমন শান্তিহীন অভাগা কে আছে সাধু সদানন্দের আশ্রমে ? সদানন্দের যে শিষ্য, সদানন্দের আশ্রমের কুটিরে যে বাস করিবার অধিকার পায়, জীবনের সব জ্বালাপোড়ার ছোঁয়াচ তো সঙ্গে সঙ্গে তার মন হইতে মুছিয়া যাইবে, সন্ধ্যার সঙ্গে শিশুর মতো দু-চোখ ভারী হইয়া আসিবে শিশুর চোখের ঘুমে ? আলোর বিন্দুটি নিভিয়া গেলে মহেশ চৌধুরি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তাই বটে। কোনো দরকারে কেউ আলো জ্বালিয়া রাখিয়াছিল—ঘুম আসিতেছিল না বলিয়া নয়, মনের আগুন রাত্রি জাগরণের অবসাদে চাপা দিবার দরকার হইয়াছিল বলিয়া নয। দুই হাত জড়ো করিয়া মহেশ চৌধুরি মনে মনে সদানন্দের চরণে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করে। হে মহেশ চৌধুরির জীবন্ত দেবতা, মহেশ চৌধুরির কল্যাণের জন্যই তুমি তাকে অবহেলা করিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখ, দুঃখের আগুনে পুড়িয়া মহেশ চৌধুরির মন যেদিন নির্মল হইবে সেই দিন পায়ে ঠাঁই দিয়া মহেশ চৌধুরির সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া তাকে তুমি শান্তি দিবে, এ কথা জানিতে কী বাকি আছে মহেশ চৌধুরির। এই ধৈর্যের পরীক্ষায় শিষ্য না করিয়াও শিষ্যের মতোই তাকে যে প্রকারান্তরে আত্মশুদ্ধির কঠোর সাধনায় নিযুক্ত করিয়াছ, সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য মহেশ চৌধুরি জীবন দিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু আজ এই বিপদে তুমি তাকে রক্ষা করো। তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না প্রভু, মহেশ চৌধুরিকে ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য, মহেশ চৌধুরির সাধনা ব্যর্থ করার জন্য একজন কী অন্যায় আবদার আরম্ভ করিযাছে। বাতদুপুরে গাছতলায় সম্মুখে বসিয়া নীরবে বৃষ্টির জলে ভিজিতেছে ? স্ত্রী বলিয়া নয়, ছেলের মা বলিয়া নয়, একজন স্ত্রীলোকের এত কষ্ট চোখে দেখিয়া স্থির থাকার মতো মনের জোর যে মহেশ চৌধুরির নাই প্রভু।

সদানন্দ অবশ্য তখন ঘুমাইতেছিল। আজ বেশ ঠান্ডা পড়িয়াছে। কিন্তু জানা থাকিলেও মহেশ চৌধুরির কিছু আসিয়া যাইত না। পাথরের দেবতার কাছেও মানুষ প্রার্থনা জানায—ঘুমন্ত মানুষ তো জীবন্ত। নয কি ?

পরদিন চারিদিকে খবর ছড়াইয়া গেল মহেশ চৌধুরি সস্ত্রীক সাধুবাবার আশ্রমে ধন্না দিয়াছে। চারিদিক হইতে নরনারী দেখিবার জন্য আসিয়া জড়ো হইতে লাগিল—সদানন্দের আশ্রমে আসিয়া তারা আজ মহেশ চৌধুরির দর্শনপ্রার্থী।

শেষরাত্রে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সকালবেলা ভিজা পৃথিবীতে সোনালি রোদ উঠিয়াছে। মহেশ চৌধুরি ও তার স্ত্রী দুজনের গায়ে রোদ পড়িয়া দেখাইতেছে যেন মূর্তি-ধরা বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতা কিন্তু অপার্থিব জ্যোতি দিয়া আবৃত। দুজনের গায়ে আবরণের মতো পড়িবে বলিয়া রোদের রংটা আজ বেশি গাঢ় হইয়াছে নাকি ?

রত্নাবলী ও উমা আসিয়াছিল সকলের আগে, রোদ উঠিবারও আগে। রত্নাবলী চোখ বড়ো করিয়া বলিয়াছিল, সমস্ত রাত এখানে ছিলেন ?

মহেশ চৌধুরি বলিয়াছিল, থাকবার জন্যেই তো এসেছি মা।

মহেশ চৌধুরির কথা বলিবার ধরন পর্যন্ত যেন একরাত্রে বদলাইয়া গিয়াছে।

মারা পড়বেন যে আপনারা ?

মহেশ চৌধুরি করুণ চোখে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। দেবতা কি প্রার্থনা শুনিবেন, এই বিপদে তাকে পথ দেখাইয়া দিবেন না ?

কাল শেষরাত্রির দিকে কতবার যে তার মনে হইয়াছে সব শেষ কবিয়া দিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া কোনো একটি আশ্রয়ে চলিয়া যায়। মনে হইয়াছে, এমনভাবে একজনকে কষ্ট দিবার কোনো অধিকার তার নাই, সে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেই বা এ জগতে কার কী আসিয়া যাইবে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেই বা কার কী আসিয়া যাইবে, সব কি তার নিজেরই বিকৃত অহংকারের কথা নয় ? সাধুজির চরণ দর্শন না করিয়া উঠিবে না বলিয়া গাছতলায় ধন্না দিয়াছে, চরণ দর্শন হইবার আগে উঠিয়া গেলে লোকেব কাছে একটু নিন্দা হইবে, লোকে বলিবে মহেশ চৌধুরির মনের জোর নাই। নিজের কাছে নিজের দামটাও একটু কমিয়া যাইবে বটে, মনে হইবে বটে যে, আমি কী অপদার্থ, ছি ! কিন্তু নিজের কথা ভাবিয়া আর একজনকে যন্ত্রণা দিলে, মারিয়া ফেলিবাব সম্ভাবনা ঘটাইলে, তাতে কি নিজের অপদার্থতা আরও বেশি প্রমাণ হইয়া যাইবে না, নিজের মধ্যে অশান্তি কিছু কম হইবে ?

রোদ উঠিবার পর আসিল মাধবীলতা। কে জানে কেন এ আশ্রমে কোনো ব্যাপারে সকলের চেয়ে মাধবীলতার সাহসটাই সবচেয়ে বেশি হইতে দেখা যায়। বোধ হয় কোনো কোনো ব্যাপাবে সে সকলের চেয়ে ভীরু বলিয়া।

আসিয়াই মহেশকে সে দিতে আরম্ভ করিল বকুনি। বলিল, মাথা খারাপ হয়ে থাকে অন্য কোথাও গিয়ে পাগলামি করুন না ? আমরা আপনার কাছে কী অপরাধ করেছি ?

অপরাধ ? অপরাধের কথা কী হল মা ?

মহেশ চৌধুরি হাতজোড় করিল।

তফাতে শতাধিক নরনারী ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মাধবীলতাব মুখেব রং যেন বোদেব সঙ্গে মিশ খাইয়া যাইবে।

তবে আমাদের এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন ? এটা তো হাট নয়, আশ্রম তো এটা ? দেখুন তো চেয়ে কী লোক জমতে শুরু করেছে ? এর মধ্যে আশ্রমের কাজ চলে কী কবে, আমরাই বা থাকি কী কবে ? একটু শান্তি পাবে বলে যাবা আশ্রমে আসে—, সাহস মাধবীলতার একটুও কমে নাই, তবে আবেগটা বাড়িতে বাড়িতে একটু অতিরিক্ত হইয়া পড়ায় গলাটা রুদ্ধ হইযা গেল।

মহেশ চৌধুরি বলিল, তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে মা ? আচ্ছা আমি ওদের যেতে বলছি।

যেতে গরজ পড়েছে ওদের !

কিন্তু তারা গেল। মহেশ চৌধুরি ঘুরিয়া বসিয়া সকলকে চলিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইল, বলিল যে এই গাছতলায় তার মরণ হইবে এটা যদি তারা না চায় তবে যে যার বাড়ি ফিরিয়া যাক। ভঙ্গি দেখিয়া প্রথমে মাধবীলতার মনে হইয়াছিল মহেশ চৌধুরি বুঝি লম্বা বক্তৃতা দিবে, কিন্তু একটু অনুযোগ দিয়া ও নিজের মরণের ভয় দেখাইযা কয়েকটি কথায় সে বক্তব্য শেষ করিয়া দিল এবং এমনভাবে কথাগুলি বলিল যেন শ্রোতারা সকলেই তার শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সকলে আশ্রমের সীমানা পার হইয়া চলিয়া গেল। বাড়ি সকলে গেল না, আশ্রমের কাছেই খবরের লোভে ঘুরাফিরা করিতে লাগিল, কিন্তু গাছের জন্য ভিতর হইতে তাদের আর দেখা গেল না। মাঝে মাঝে দু-একজন করিয়া আশ্রমের ভিতরে ঢুকিয়া মহেশকে দেখিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, আশ্রমের মধ্যে আর ভিড় হইল না।

বিপিন ভিতর হইতে ব্যাপারটা লক্ষ করিতেছিল। দাঁতের ব্যথা এখনও তার সম্পূর্ণ কমে নাই, কিন্তু হয় রোদ উঠিয়াছে বলিয়া অথবা ব্যাপারটা দেখিয়া উত্তেজনা হইয়াছে বলিয়া, মাথায় জড়ানো সমস্ত কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া সে চুপ করিয়া বিছানায় বসিয়া রহিল।

মাধবীলতা একটা পাক দিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা আপনি কী চান ?

প্রভুর চরণ দর্শন করতে চাই।

শুনিয়া মাধবীলতা আবার পাক দিয়া আসিতে গেল।

বেলা বাড়িতে থাকে, ভিজা জামা ও কাদামাখা পরনেব কাপড় ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া যায়, গুমোট হয় দারুণ। মহেশ এক সময় স্ত্রীকে বলে, আচ্ছা, এবার তো তুমি ফিরে যেতে পার ?

বিভূতির মার চোখ জবাফুলের মতো লাল হইয়াছে, চোখের পাতা বুজিয়া বুজিয়া আসিতেছে। শুধু মাথা নাড়িল।

মহেশ চৌধুরি খানিকক্ষণ গুম খাইয়া থাকিয়া বলিল, চলো, আমিও যাচ্ছি।

শুনিয়া বিভূতির মার লাল চোখে পলক পড়া বন্ধ হইয়া গেল—সাধুজির চরণ দর্শন না করেই যাবে ?

কী করব ? নারীহত্যার পাতক তো করতে পারি না।—জ্বর এসেছে না তোমার ?

হয়তো আসিয়াছে জ্বর, হযতো আসে নাই, সেটা আর এখন বড়ো কথা নয়, বিভূতির মা এখন আর বাড়ি ফিরিয়া যাইতে চায় না। এখানে বসিবাব সময় বলিয়াছিল বটে যে স্বামী লইয়া ফিরিয়া যাইবে কিন্তু এখন আর সদানন্দেব চরণ দর্শনের আগে সেটা কবিতে চায না। স্বামীব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে ভয়ে ? ভয় সেটাই বটে, কিন্তু মহেশ যা ভাবিতেছে তা নয, স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে ভাবনায় তো বিভূতির মার ঘুম আসিতেছে না ! এখন বড়ো ভয় এই যে, এত কাণ্ডের পর তাব পাগল স্বামী সদানন্দের দর্শনলাভ না করিয়াই বাড়ি ফিরিয়া গেলে তার সঙ্গে সে ঘর করিবে কী করিয়া ? সেই তিলে তিলে দিনের পর দিন দগ্ধানোব চেয়ে এইখানেই একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাক !

যুক্তিটা যে খুবই জোরালো, তাদের সম্পর্কেব হিসাব ধরিলে প্রায় অকাট্য, মনে মনে মহেশ তা অস্বীকাব কবিতে পারিল না, কিন্তু অনাহারে অনিদ্রায় রোদে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া গাছতলায় বসিয়া বসিয়া দিবারাত্রি কাটানোর পর যুক্তিতে বেশি কিছু আসিয়া যায় না, পরের কাছে বিনয়ে কাদা হইয়া হাতজোড় করা যায় কিন্তু নিজের লোকেব অবাধ্যতায় গা জ্বলিয়া যায়। মহেশ চৌধুরিব দাঁতে দাঁত ঘষিবার প্রক্রিয়াটা কাছে দাঁড়াইয়া কেউ লক্ষ কবিলে চমকাইয়া যাইত।

তুমি থাক তবে, আমি ফিরে চললাম।

যাও।

আমি চলে গেলেও তুমি একা বসে থাকবে ?

কী করব না বসে থেকে ? এখন গেলেই চিরকাল তুমি আমায় দুষবে, বলবে আমার জন্য তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলে।

তোমায় দুষব ?

দুষবে না ?

খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো স্ত্রীব মুখেব দিকে চাহিয়া থাকিযা মহেশ চৌধুরি বলিল, আমি নিজেই যখন চলে যাচ্ছি, তোমায় দুষব কেন ?

এবার বিভূতির মা যেন একটু রাগ কবিযাই বলিল, দ্যাখো, তোমার সঙ্গে আমাব সে সম্পর্ক নয়, ও সব মারপ্যাঁচ আমাদের মধ্যে চলবে না, রাস্তার লোককে ও সব বলে বুঝিয়ো। নিজেই চলে যে যাচ্ছ তুমি, কার জন্য যাচ্ছ শুনি ? বাড়ি গিয়ে যে ছটফট করবে সেটা তলে তলে দগ্ধাবে কাকে শুনি ? তোমায় চিনতে তো আমার বাকি নেই। তুমি হলে...তুমি হলে...মাথা নত কবিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

কেঁদো না। বলিয়া মহেশ চৌধুরি বিহ্বলের মতো বসিয়া রহিল। এ জগতে কোনো প্রশ্নেরই কি শেষ নাই ? মানুষ বিচার করিবে কী দিয়া ? খুঁজিলেই সত্যের খুঁত বাহির হয়, নিজে খোঁজ বন্ধ

করিয়া দিলেও রেহাই নাই, প্রতিনিধি যদি খোঁজে, নিজের জ্ঞানবুদ্ধির হিসাবে তাতেও খুঁত বাহির হওয়া আটকায় না। নিজে যা হোক কিছু ঠিক করিয়া নিতে পারিলেই অন্যে তা মানিবে কেন, অন্যেও যা হোক কিছু ঠিক করিয়া নিতে গিয়া নূতন কিছু আবিষ্কার করিবেই। সুতরাং এখন কর্তব্য কী? যা ভালো মনে হয় তাই করা ?

কী করা ভালো ?

হে মহেশ চৌধুরির জীবন্ত দেবতা—

না, দেবতার কাছে আবদার চলিবে না। দেবতার কী জানে মহেশ চৌধুরি ? দেবতা ও তার সম্পর্কের মধ্যে কোনটা মারপ্যাঁচ আর কোনটা মারপ্যাঁচ নয়, তা কী সে নিঃসন্দেহে জানিতে পারিয়াছে, যেমন জানিতে পারিয়াছে স্বামী নামক দেবতা সম্বন্ধে তারই সম্মুখে উপবিষ্টা তারই এই স্ত্রীটি ? এ রকম না জানিলেই বা কর্তব্যনির্ণয় চলিবে কেন ? মহেশ চৌধুরির ক্লেশ বোধ হয়। দেবতাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে কিন্তু দেবতার সঙ্গে নিজের সংযোগটা কেমন সে সম্বন্ধে নিজের পরিষ্কার ধারণা নাই, এ কেমন আত্মসমর্পণ ? চোখ-কান বুজিয়া বিচার-বিবেচনা না করিয়া নিজেকে দিলেই কি আত্মসমর্পণ হয় ? কোনো প্রত্যাশা না থাকিলেই ? তবে সদানন্দের সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ণয় করিতে তাঁর এত কষ্ট হয় কেন, কর্তব্য নির্ণয় করিয়াও এক মুহূর্তের জন্যও কেন নিঃসন্দেহ হইতে পারে না যে যা ঠিক করিয়াছে তাই ঠিক ? তার সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ণয় কবিতে তার স্ত্রীর কেন একবারও দ্বিধা করিতে হয় না, ভুল করিবার ভয়ে ব্যাকুল হইতে হয় না? মহেশ চৌধুরি কি তবে স্ত্রীলোকেরও অধম ? অথবা—?

একটা প্রশ্ন যেন মনের তলায় কোনখানে উঁকি দিতে থাকে, মহেশ চৌধুরি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কেমন একটা রহস্যময় দুর্বোধ্য অনুভূতি হইতে থাকে। আসল কথা, বিভূতিব মার শেষ কথাগুলিতে সে একেবারে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল, সকল বিষয়ের মূল্য নির্ণয়ের অভ্যস্ত মানসিক প্রক্রিয়াটা একেবাবে গোড়া ধরিয়া নাড়া খাইয়াছিল। সমস্ত চিন্তাব মধ্যে ঘুরিয়া-ফিরিয়া কেবল মনে হইতেছিল, এ কথাটা তো মিথ্যা নয়, ওর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক এ জগতে আর কারও সঙ্গে তো তা নেই, কোনোরকম মারপ্যাঁচ ওর সঙ্গে আমার তো চলতেই পাবে না ? কী আশ্চর্য !

তারপর মাধবীলতা এক সময়ে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, চলুন আপনারা সাধুজিব চরণ দর্শন কববেন।

মহেশ যেন বিশেষ অবাকও হইল না, কৃতার্থও বোধ করিল না। সহজভাবে কেবল বলিল, অনুমতি দিয়াছেন ?

এ কথার জবাবে মাধবী বলিল, প্রণাম করেই চলে আসবেন কিন্তু, কথাবার্তা বলে জ্বালাতন করবেন না।

আমরা দুজনেই যাব তো ?

হ্যাঁ, আসুন।

কিন্তু বিভূতির মা স্বামীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে, সদানন্দের চরণ দর্শন করিতে আসে নাই, সে উঠিল না। বলিল, আমি এখান থেকেই মনে মনে প্রণাম জানাচ্ছি, তুমি যাও প্রণাম করে এসো।

একা যাইতে মহেশের ভালো মন সরিতেছিল না, একসঙ্গে এত দুর্ভোগ সহ্য করিবার পর সাফল্যটা ভোগ করিবে একা ? একটু অনুরোধ করিল, বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিল যে এমন একটা অনুগ্রহ পাইয়া কী হেলায় হারাইতে আছে ? কিন্তু বিভূতির মা কিছুই বুঝিল না। তখন মাধবীলতার সঙ্গে মহেশকে একাই ভিতরে যাইতে হইল। কাপড়ে কাদা লাগিয়াছিল, এখন শুকাইয়া পাঁপড়ের

মতো শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহেশ একবার ভাবিল কাপড়টা বদলাইয়া সদানন্দের সামনে যায়, তারপর আবার ভাবিল, থাক, হাঙ্গামায় কাজ নাই। সদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা বিপিনের বদলে মাধবীলতার মধ্যস্থতায় হইতেছে কেন এ কথাও মহেশের মনে হইতেছিল। ভাবিল, তার কাছে নিজে নত হইতে বিপিনের হয়তো লজ্জা করিতেছিল, তাই মেয়েটাকে দূতী করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু সদানন্দের অভ্যর্থনা এ ধারণা তার মন হইতে বলপূর্বক দূর করিয়া দিল। রাগে আগুন হইয়া সদানন্দ বলিল, এর মানে ? আমি না বারণ করে দিয়েছি সাতদিন কেউ আমার দর্শন পাবে না ?

সদানন্দ নদীর দিকে জানালার কাছে পাতা চৌকিতে বসিয়াছিল, সেইখান হইতে ক্রুদ্ধ চোখে চাহিয়া রহিল। মহেশ তখন ঘরের চৌকাঠ পার হইয়াছে, সেইখানে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মাধবীলতা তাড়াতাড়ি চৌকির কাছে আগাইয়া গেল। নিচু গলায় ফিসফিস করিয়া বলিল, আপনার পায়ে ধরছি রাগ করবেন না। অনেক ব্যাপার হয়ে গেছে, আমি সমস্ত বলছি আপনাকে। আপনি শুধু এই ভদ্রলোককে একবার প্রণাম করে চলে যেতে দিন। বলিয়া মুখ আরও তুলিয়া সদানন্দের চোখে চোখে চাহিয়া মিনতি করিয়া বলিল, দেবেন না ?

সদানন্দ বলিল, আচ্ছা।

আসুন, প্রণাম করে যান।

মহেশ নড়ে না দেখিয়া সদানন্দও ডাকিয়া বলিল, এসো মহেশ।

মহেশ অবাধ্য শিশুর মতো মাথা নাড়িয়া বলিল, না প্রভু, আপনি আমায় ডাকেননি, এই মেয়েটি আমায় ফাঁকি দিয়ে এনেছে। না জেনে আপনার কাছে আমি এ কী অপরাধ করলাম প্রভু ! আপনি ডাকেননি জানলে তো আমি আসতাম না।

সদানন্দ শান্তভাবে বলিল, তাই নাকি ? তা, এখন কী করবে ?

আমি ফিরে যাচ্ছি প্রভু। আপনি নিজে ডাকলে এসে প্রণাম করে যাব।

মাধবীর মুখখানা পাংশু হইয়া গিয়াছিল, সে ভীতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আবার গাছতলায় গিয়ে ধন্না দেবেন? মরে যাবেন যে আপনারা দুজনেই ?

মুখের চেয়ে মাধবীর চোখের পরিবর্তন ঘটিতেছিল বিচিত্রতর, এবার চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিয়া পড়িল। কত ভাবিয়া কত হিসাব করিয়া নিজের দায়িত্বে এত বড়ো একটা কাজ করিতে গিয়া বুকটা ভয়ে ও উত্তেজনায় টিপটিপ করিতেছিল, সদানন্দ দেবতা না দানব মাধবীর জানা নাই কিন্তু এমন ভয় সে করে সদানন্দকে যে কাছে আসিলেই তার দেহমন কেমন একসঙ্গে আড়ষ্ট হইয়া যায়, সদানন্দ তাকে বুকে তুলিয়া লইলেও যে জন্য সে নূতন কিছুই আর অনুভব করিতে পারে না, অনায়াসে সদানন্দের মুখের দিকে প্যাঁটপ্যাঁট করিয়া চাহিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সে তো গা এলাইয়া দেওয়ার কথা, কোনো হাঙ্গামাই তাতে নাই। এতকাল নিজের ও সদানন্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যা কিছু ঘটিয়াছে তাতে তার নিজের কিছুই করিবার বা বলিবার থাকে নাই, সদানন্দই সমস্ত করিয়াছে ও বলিয়াছে। আজ প্রথম নিজেকে মানুষটার নিষেধ অমান্য করিতে সক্রিয় করিয়া তুলিয়া ভিতরটা তার আবেগে ফাটিয়া পড়িতেছিল। তাই, তার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া মহেশ আবার গাছতলায় ধন্না দিতে যাইবে এই আশাভঙ্গের সুযোগ অবলম্বন করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। তার উদ্দেশ্যটা যথারীতি সফল হইলে, সদানন্দকে প্রণাম করিয়া মহেশ বাড়ি ফিরিয়া গেলে, অন্য কোনো উপলক্ষে সে অবশ্য কাঁদিত। উপলক্ষ না পাইলে বিনা উপলক্ষেই কাঁদিত।

সদানন্দ অপলক চোখে মাধবীলতার চোখে জল ভরিয়া উপচিয়া পড়ার প্রক্রিয়াটা দেখিতেছিল। এ দৃশ্য সে আগেও দেখিয়াছে, মাধবীর চোখ তখন তার চোখের আরও কাছে ছিল। তবু এমন স্পষ্টভাবে আর কোনোদিন কি মাধবীর চোখের কান্না দেখিয়াছে ইতিপূর্বে ?

একটু ভাবিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে সদানন্দ বলিল, মহেশ, আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলাম।

পরীক্ষা প্রভু ?

হ্যাঁ। পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। আমি সব জানি মহেশ, তুমি আসবার এক মুহূর্ত আগে আমি আসন ছেড়ে উঠেছি। দরজা বন্ধ ছিল, তুমি আসবে বলে দরজা খুলে রেখেছি। তোমায় দেখে রাগের ভান করছিলাম, আমায় না জানিয়ে কেউ কি আমার কাছে আসতে পারে মহেশ ? এখন বাড়ি যাও, কদিন বিশ্রাম করে আমার সঙ্গে এসে দেখা কোরো। দেখি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পাবি কিনা।

শুনিতে শুনিতে টলিতে টলিতে মহেশ চৌধুরি কোনোরকমে খাড়া ছিল, সদানন্দের কথা শেষ হইলে প্রণাম করিবার জন্য আগাইতে গিয়া দড়াম কবিয়া পড়িয়া গেল।

সুতরাং বিভূতির মাকেও শেষ পর্যন্ত ভিতরে আসিয়া সদানন্দের চরণ দর্শন করিতে হইল। শশধরও আসিল। বিপিন আসিয়া চুপ করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল, একবার শুধু সে চোখ তুলিয়া চাহিল সদানন্দের দিকে, তারপর আর মনে হইল না যে আশেপাশে কী ঘটিতেছে এ বিষয়ে তার চেতনা আছে।

আধঘণ্টা পরে মহেশ চৌধুরিকে একটু সুস্থ করিয়া এবং একটু গরম দুধ খাওযাইয়া শশধব ধরিয়া বাহিবে লইয়া গেল। বাহিরে দেখা গেল বিবাট কাণ্ড হইয়া আছে—শ-দুই নরনারী সেই কদম গাছটার তলে ভিড় কবিয়া দাঁড়াইয়া। শ্রীধরকেও তাহাদের মধ্যে দেখা গেল।

মহেশকে দেখিয়া জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—মহেশ চৌধুবিকী জয় !

জনতার মধ্যে একজনও অবাঙালি আছে কিনা সন্দেহ, মহেশ চৌধুবিও যে খাঁটি বাঙালি সন্তান তাও কারও অজানা নাই, তবু জয়ধ্বনিতে মহেশ চৌধুরির নামের সঙ্গে কোথা হইতে যে একটি 'কী' যুক্ত হইযা গেল !

তারপর কয়েকজন যুবক মহেশ চৌধুরিকে কাঁধে চাপাইয়া গ্রামের দিকে বওনা হইয়া গেল। কাঁধে চাপাইল একরকম জোর করিয়াই, মহেশ চৌধুরির বারণও শুনিল না, বিভূতিব মাব ব্যাকুল মিনতিও কানে তুলিল না।

যতক্ষণ দেখা গেল আশ্রমের সকলেই একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তারপর ছোটো ছোটো দলে আরম্ভ হইল আলোচনা। বিপিনও সদানন্দের কুটিরেব সামনে দাঁড়াইয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ করিয়াছিল, শোভাযাত্রা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে কাহারও সঙ্গে একটি কথা না বলিয়া সে সটান গিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল। সে যেন হার মানিয়াছে, হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, অথবা দাঁতের ব্যথায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

মাধবীলতা সদানন্দের ঘরে ফিরিয়া গেল। তাহার ব্যাখ্যা ও কৈফিয়ত বাকি আছে।

সদানন্দ সাগ্রহ অভ্যর্থনা করিল, এসো মাধবী।

কোথায় আসিবে মাধবী ? কাছে ? পাঁচ-সাতহাত তফাত হইতে এমনভাবে ডাকিলে তাই অর্থ হয়। মহেশ চৌধুরি খানিক আগে টলিতে টলিতে সদানন্দের দিকে আগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, মাধবীলতা কাঁপিতে কাঁপিতে পায়ে পায়ে আগাইতে লাগিল, মহেশ চৌধুরির মতো দড়াম করিয়া পড়িয়াও গেল না। কিন্তু কাছে যাওয়ারও তো একটা সীমা আছে ? তাই হাতখানেক ব্যবধান থাকিতে মাধবীলতা থামিয়া পড়িল।

সদানন্দ হাত ধরিয়া তাকে পাশে বসাইয়া দিল। চিবুক ধরিয়া মুখখানা উঁচু করিয়া বলিল, মাধবী, তুমি তো কম দুষ্টু মেয়ে নও !

ওঁর স্ত্রী যে মরে যাচ্ছিলেন।

তাহলে অবশ্য তুমি লক্ষ্মী মেয়ে। সদানন্দ একমুখ হাসিল।

মাধবীলতা থামিয়া থামিয়া সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা সদানন্দকে জানাইয়া দিল, নিজের কাজের কৈফিয়তে বলিল যে সদানন্দ পাছে বাজি না হয় এই ভয়ে একেবারে মহেশ চৌধুরিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল।

বলিয়া মাধবী হঠাৎ দাবি করিয়া বসিল সদানন্দের কৈফিয়ত, কাঁদো কাঁদো হইয়া বিনা ভূমিকায় সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, কিন্তু আপনি ও কথা বললেন কেন মহেশবাবুকে ?

আমি তো জানতাম না মাধবী এত কাণ্ড হয়ে গেছে। তুমি ডেকে এনেছ জানলে কী আর আমি রেগে উঠতাম ?

না, তা নয়। আপনি মিছে কথা বললেন কেন ? কেন বললেন আপনি সব জানতেন, ওকে পরীক্ষা করছেন ?

সদানন্দ বিব্রত হইয়া বলিলেন, ওটা কী জান মাধবী ?

কিন্তু মাধবী কী ও সব কথা কানে তোলে ? আকুল হইয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল আর বলিতে লাগিল, কেন আপনি মিছে কথা বললেন ! কেন বললেন !

ছয়

আকাশের মেঘ কাটিয়া গিয়া রোদ উঠিল, বিপিনের দাঁতের ব্যথা কমিয়া গেল, কিন্তু তার মুখের ব্যথিত ভাবটা যেন ক্ষুব্ধ বিষাদের মেকি ইস্পাতে গড়া মুখোশের মতো হইয়া রহিল কায়েমি। রাগ হইলে বীরবসের মধ্যে সেটা প্রকাশ করা বিপিনের অভ্যাস নয়। সদানন্দের মতো যারা তার খুব বেশি অন্তরঙ্গ তাদের কাছে কদাচিৎ তাকে রাগ করিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু সেও যেন কেমন এক খাপছাড়া ধরনের রাগ। রাগ বলিয়াই মনে হয় না। মনে হয়, ঠোঁট বাঁকাইয়া, মুখের চামড়া এখানে-ওখানে কুঞ্চিত করিয়া বাঁকা চোখে চাহিবার একটা আশ্চর্য কৌশল সে কোনো এক সময় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, আয়ত্ত রাখার জন্য রাগ করার সুযোগে প্র্যাকটিস করিতেছে। এবার বিপিনের মুখ দেখিয়া সদানন্দও বুঝিতে পারিল সে রাগ করিয়াছে, কিন্তু আগেকার রাগ করার ভঙ্গির সঙ্গে একেবারে মিল না থাকায় ভাবনায় পড়িয়া গেল।

তোর কী হয়েছে রে বিপিন ?

কিস্‌সু না। হবে আবার কী ?

বিপিনের কী হইয়াছে বোঝা গেল না, কিন্তু জবাবটা বোঝা গেল। বিপিন নিজেই জানে না তার কী হইয়াছে। এ রকম ব্যাপার সকলের জীবনে সর্বদাই ঘটিতেছে, নিজের কিছু একটা হয় কিন্তু নিজের কাছে সেটা দুর্বোধ্য থাকে, এমন কিছু গুরুতর ঘটনা এটা নয়, সদানন্দ তা জানে। তবে নিজের কী হইয়াছে বুঝিবার চেষ্টাটা প্রচণ্ড অধ্যবসায়ে দাঁড়াইয়া গেলে তখন হয় বিপদ, অধ্যবসায়টাই সাংঘাতিক গুরুত্ব পাইয়া বসে। এবং মাঝে মাঝে কমবেশি সময়ের জন্য এ রকম অধ্যবসায় মানুষের আসে বইকী। বিপিনের কি তাই হইয়াছে ?

কী ভাবছিস ভাই ?

ভাই ? সদানন্দের সম্বোধনে বিপিনের তো রীতিমতো চমক লাগেই, মনেও হয় যে সে বুঝি তাকে হঠাৎ গাল দিয়া বসিয়াছে। এমন সম্পর্ক তো তাদের নয় যে এমন গভীর স্নেহার্ত সুরে ভাই বলিতে হইবে, এতখানি আবেগময় আন্তরিকতার সঙ্গে। পরস্পরকে জানিয়া বুঝিয়া তাদের বন্ধুত্ব, পরস্পরের কাছে উলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতে যেমন তাদের লজ্জা করে না, মনের দুর্বলতা আর বিকৃতি মেলিয়া ধরিতেও তেমনই ভয় বা সংকোচ হয় না, অন্তত কিছুকাল আগে তাই ছিল। এ ভাবে দরদ

দেখানো তাদের মধ্যে চলিবে কেন ? কী হইয়াছে সদানন্দের আজ, সাতদিন ঘরের কোণে কাটাইবার পর ? বিপিন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, সে দৃষ্টির বিশ্লেষণপটুতা অসাধারণ। বিপিন উশখুশ করে, সেটা তার শারীরিক অস্বস্তিবোধের চরম প্রমাণ।

তখন দুপুরবেলা, ঘণ্টা দুই আগে দুজনেরই মধ্যাহ্ন ভোজন হইয়াছে। অনেক ভাবিয়া, অনেক দ্বিধা করিয়া, মনকে শান্ত করিবার জন্য সাতদিন ঘরের কোণে নিজেকে বন্দী করিয়া রাখিয়া মনকে আরও বেশি অশান্ত করিয়া, অতিরিক্ত জ্বালাবোধের জন্যই মাধবীলতা সম্পর্কে অত্যাশ্চর্য আত্মসংযমের মধ্যে নিজেকে সত্যসত্যই মহাপুরুষ করিয়া ফেলিবার চরম সিদ্ধান্ত সদানন্দ গ্রহণ করিয়াছিল। আজ সকালে তাই হঠাৎ মাধবীলতাকে আজই রাত্রে ঘরে আনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া বসিয়াছে। কে জানিত মাধবীলতাকে এমনভাবে সে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিবে ? সকালে নদীর ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে চোখে পড়িল স্নানরতা রত্নাবলী আর উমাকে, তাই মাধবীলতাকে খুঁজিতে সে জোরে জোরে হাঁটিতে আরম্ভ করিল আশ্রমের দিকে। মাধবীলতাকে দেখা গেল এক আমগাছের তলে। আশ্রমে যে গোয়ালা দুধ জোগায়, তার বউয়ের সঙ্গে গল্প করিতেছে। গোয়ালা বউয়ের কাঁখের শিশুটি প্রাণপণে স্তন চুষিতেছিল, দুধের কারবার করে বটে গোয়ালাবউ, নিজের বুকে যে তার সন্তানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দুধ জন্মে না, দেখিলেই সেটা বোঝা যায়।

সদানন্দকে দেখিয়া গোয়ালা বউ সরিয়া গিয়াছিল।

রাত্রে একবার আমাব ঘরে আসবে, মাধু ?

আদেশ নয়, অনুরোধ। মাধবীলতা নয়, মাধবী নয় মাধু। পবে দুপুরবেলা বিপিনকে ভাই বলার ভূমিকার মতো।

রাত্রে ? কখন ?

যখন তোমার সুবিধা হয়।

সন্দেবেলা ?

না, একটু রাত করে এসো। এই এগারোটা সাড়ে এগারোটার সময়। অনুরোধ নয়, আদেশ। এতক্ষণে মাধবীলতা বুঝিতে পারিয়াছিল, আহ্বানটা খাঁটি অভিসারের, ধর্ষণের ফলে প্রেমের জন্ম হওয়ায় এতদিন যে পূর্বরাগের পালা চলিতেছিল আজ তার সমাধি।

আজ নয়, পরশু যাব। একটা হাত বাড়াইয়া মাধবী আমগাছের গুঁড়িতে স্থাপন করিয়াছিল, যেখানে ছিল পিঁপড়াদের সারি বাঁধিয়া যাতায়াতের পথ।

না, আজ।

আদেশ নয়, প্রায় ধমক।

আজ নয়, পরশু।

মিনতি নয়, মৃদু কোমল নিরুপায় বিদ্রোহ।

সদানন্দ তখন অন্ধ আর বোকা হইয়া গিয়াছে কিনা, তাই ভাবিয়া-চিন্তিয়া পাঁচ বছরের প্রিয়াকে লজেনচুসের লোভ দেখানোর মতো কোমলকণ্ঠে বলিয়াছিল, তুমি কিছু বোঝ না মাধু। আজ ত্রয়োদশী, মেঘ-টেঘ না করলে চমৎকার জ্যোৎস্না উঠবে, জ্যোৎস্নায় বসে তোমার সঙ্গে গল্প করব। এসো কিন্তু।

পরশু কি জ্যোৎস্না উঠিবে না ? পরশু কি জ্যোৎস্নায় বসিয়া গল্প করা চলিবে না? কিন্তু প্রতিবাদের যতটুকু শক্তি মাধবীর ছিল এতক্ষণে প্রায় সবটুকুই শেষ হইয়া গিয়াছে। এবার যদি সদানন্দ রাগিয়া যায় ? দুঃশাসন জানিয়াও যা বোঝে নাই, সদানন্দ কী না জানিয়া তা বুঝিবে ? তবু মাধবী অন্যভাবে চেষ্টা করিয়াছিল।

উমাশশী, কুন্দ ওরা টের পাবে যে ? একটা কেলেঙ্কারি হবে।

আমি সে ব্যবস্থা করব।

সদানন্দ নিজেই যখন ব্যবস্থা করিবে তখন আব কার কী বলিবার থাকিতে পারে ? একটিবার পশ্চিমে উঠিবার সাধ যদি সূর্যের থাকে, একমাত্র সদানন্দের হুকুমের সুযোগেই সাধটা মিটাইবার সম্ভাবনা কি তার সবচেয়ে বেশি নয় ?

এই জন্য সদানন্দ আজ পেট ভরিয়া খাইতে পারে নাই। আহারে রুচি ছিল না। এখন সদানন্দের তাই ক্ষুধা পাইয়াছে। এদিকে দাঁতেব ব্যথা না থাকায কদিন প্রায় উপবাস করিয়া থাকিবার শোধ তুলিবার জন্যই বোধ হয বিপিন এত বেশি খাইয়া ফেলিয়াছিল যে এখন অম্বলে বুক জ্বলিতেছে। নিজেকে বিপিনেব বড়োই ভোঁতা মনে হইতেছিল। সদানন্দের আদবের জবাবে সে তাই বলিল, ভাবছি তোর মাথা।

তাবপর ঘবে আসিল মাধবী। ঘরে ঢুকিয়াই বিপিনকে সদানন্দের সঙ্গে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

সদানন্দ বলিল, কী মাধবী ?

কিছু না, এমনি এসেছিলাম। বলিয়া বোকার মতো একটু হাসিবাব চেষ্টা করিয়া মাধবী প্রায় চলিযা যায়, সদানন্দ তাড়াতাড়ি উঠিযা তাব কাছে গেল।—শোনো মাধু, শোনো।

কাছে গিযা গলা নামাইয়া বলিল, কিছু বলবে ? চলো বাইবে যাই।

দুজনে ঘবের বাহিরে চলিয়া গেল, বিপিন ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকা চোখে চাহিয়া বহিল খোলা দরজার দিকে।

মাধবীলতা বাহিরে আসিয়া মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কথা বলে না। সদানন্দ চিবুক ধরিয়া তার মুখখানা উঁচু কবিয়া ধরে। এটা সদানন্দের যেন অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

কী বলবে বলো ?

কী আব বলিবে মাধবী, সেই পুবাতন কথা। আবার খানিকটা সাহস সঞ্চয় করিয়া আজ রাত্রির অভিসার পিছাইয়া দিবাব জন্য অনুবোধ করিতে আসিয়াছে।

সদানন্দ জোর কবিয়া মাধবীব মুখ উঁচু করিয়া রাখিয়াছিল, হঠাৎ হাত সবাইয়া নেওয়ায় মাধবীব চিবুক প্রায় কণ্ঠাব সঙ্গে ঠুকিয়া গেল। কিন্তু সদানন্দের মন সত্যই একটা চিন্তার সঙ্গে ঠোক্কর খাইয়াছে। কেন যে হঠাৎ সদানন্দেব মনে হইল বড়ো পাকা মেযে মাধবীলতা, বড়ো ঝানু, প্রায বাজাবের বেশ্যাব মতো ! দেহটা যে বেশি পাকা আমের মতো কোমল আর বঙিন মাধবীর, আদর কবিয়া তাহার দেহে হাত বুলানোর সময় আঙুলগুলির যে পাখির পালকের মতো কোমল হইয়া যাওয়া খুবই উচিত, সদানন্দ তা জানে। কিন্তু মাধবীর ভিতরটা শুধু শক্ত নয, পাথব। বোঁটা-ছেঁড়া ফলের মতো বছরের পব বছব ধরিযা শুকাইয়া কুঁকড়াইয়া যাইতে পারিলে যেমন হইতে পারে সেই রকম শক্ত, এই ধরনের একটা চিন্তা মনে আসায় সদানন্দের কাছে মাধবীর দেহটা পর্যন্ত রংচটা কাঠের খেলনাব মতো কুৎসিত হইয়া গেল।

কিন্তু—

কথাটা মনে হইল মাধবীকে বিদায় দিয়া ঘরের মধ্যে বিপিনেব কাছে চৌকিতে গিযা বসিবার পর : আশ্রমে যে আসিয়াছিল কুমাবী মাধবী ? তাই তো !

ঠিক এই সময় সদানন্দ আর বিপিনের মধ্যে একটু কলহ হইয়া গেল। কত কলহ বিবাদই আজ পর্যন্ত দুজনের মধ্যে হইয়াছে, কী তীব্র ঝাঁজ সে সব ঝগড়ার, মনে হইয়াছে জীবনে বুঝি আর দুজনের মধ্যে মিল হইবে না, কেহ কাহারও মুখ পর্যন্ত দর্শন করিবে না। কিন্তু কখন আবার বিনা ভূমিকায় দুজনে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে নিজেদেরই তাদের খেয়াল থাকে নাই। আজিকার কলহটা একেবারেই সে রকম হইল না। দুজন পুরুষের মধ্যে, বিশেষত বিপিন আর

সদানন্দের মতো দুজন পুরুষ বন্ধুব মধ্যে এত মৃদু, এতখানি ভদ্রতাসম্মত কলহ হইতে পারে, এতদিন কে তা ভাবিতে পারিত !

বিপিন বলিল, ওটাকে নিয়ে বড়ো বাড়াবাড়ি করছিস সদা।

সদানন্দ বলিল, তুই তো সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি দেখিস।

বিপিন বলিল, ওকে আশ্রমে এনেছি আমি।

সদানন্দ বলিল, তাই বলে ওর ওপরে তোর অধিকার জন্মেছে নাকি ?

বিপিন বলিল, অধিকারের কথা নয়। ওর ভালোমন্দের একটা দায়িত্ব আমার আছে ?

সদানন্দ বলিল, অ ! ভালোমন্দের দায়িত্ব !

তারপর বিপিন চলিয়া গেল নিজের ঘরে, সদানন্দ বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল নদী। এ কী কলহ ? এ তো নিছক কথোপকথন, অলস মধ্যাহ্নের স্বাভাবিক আলাপ। কিন্তু নিজের নিজের ঘরে বসিয়া বিপিনের উপর সদানন্দের আর সদানন্দের উপর বিপিনের রাগে গা যেন জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। একজন আর একজনের কত অন্যায়, কত অবিচার, কত স্বার্থপরতা আজ পর্যন্ত সহিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আর সত্যই সহ্য হয় না একেবারে যেন পাইয়া বসিয়াছে।

সেদিন রাত্রে সত্যই জ্যোৎস্না উঠিল। আকাশে একেবারে যে মেঘ রহিল না তা নয়, বর্ষাকালের আকাশ তো। কিন্তু ছাড়া ছাড়া মেঘ আকাশে ভাসিয়া বেড়াইলেই তো জ্যোৎস্নার শোভা বাড়ে, অনেক দিনের বিশ্বাস এটা। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর বিপিন বাহির হইয়া পড়িল, ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল আশ্রমের এক কুটির হইতে অন্য কুটিরে। যে কোনো সময় আশ্রম পরিদর্শনের অধিকার বিপিনের আছে। রাত্রির অসংখ্য বিচিত্র শব্দ আছে, কত তুচ্ছ অদৃশ্য প্রাণী শুধু শব্দের মধ্যে প্রাণের পরিচয় ঘোষণা করিয়া চলে, তবু দিনের চেয়ে রাত্রিতে স্তব্ধতা গভীরতর। দিবারাত্রি আশ্রমকে ঘিরিয়া যে নিবিড় শান্তি বিরাজ করে, বাহিরের তপ্ত মানুষকে যা জুড়াইয়া দেয় চোখের নিমেষে, রাত্রে যেন সেই শান্তির ভাব আরও বেশি অপার্থিব হইয়া ওঠে। চোখ জুড়াইয়া যায় বিপিনের চারিদিকে চোখ বুলাইয়া, মন ভরিয়া যায় মন-জুড়ানো আনন্দে, কোনো কোনো রাত্রে নিজেকে ভুলিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য স্বপ্ন পর্যন্ত যেন সে দেখিতে আরম্ভ করিয়া দেয়—অবাস্তব, অর্থহীন, কোমল মধুর স্বপ্ন · আদর্শের যে অবাধ্য, অপরিত্যাজ্য লেজুড়কে বিপিন ঘৃণাই করে চিরদিন।

আজ স্বপ্ন দেখা দূরে থাক, একটু গর্ব পর্যন্ত অনুভব করিল না। নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া আশ্রমের ছড়ানো কুটির আর রহস্যময় ছায়ালোকবাসী নির্বাক নিশ্চল দৈত্যের মতো ছোটোবড়ো গাছগুলি দেখিয়া গভীর ক্ষোভের সঙ্গে তার শুধু মনে হইল, কী অকৃতজ্ঞ সদানন্দ, কী স্বার্থপর সদানন্দ, কী বিশ্বাসঘাতক সদানন্দ ! নিজে রাজ্য সৃষ্টি করিয়া নিজেকে বিসর্জন দিয়া সদানন্দকে রাজা করিয়াছে যে, আজ সদানন্দ তাকেই হীন মতলববাজ মানুষ মনে করিয়া তুচ্ছ করে। অন্যমনে বিপিন এক কুটিরের অধিবাসীদের সঙ্গে দুটি-একটি কথা বলিয়া অন্য কুটিরে চলিয়া যায়। কেহ শয়ন করিয়াছে, কেহ শয়নের আয়োজন করিতেছে, কেহ আসনে বসিয়া চিন্তাসাধনায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে, কেহ বারান্দায় বসিয়া করিতেছে মেঘের গতিতে চাঁদের গতি সৃষ্টির ভ্রান্তিকে উপভোগ।

উমা আর রত্নাবলীর কুটিরের সামনে আসিয়া বিপিনের অন্যমনস্কতা ঘুচিয়া গেল। বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া আছে শশধর, বারান্দায় থাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া তার সঙ্গে কথা বলিতেছে রত্নাবলী।

চিনিতে পরিয়াও বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে ?

শশধর উৎসাহের সঙ্গে বলিল, আমায় চিনলেন না ? সেই যে সেদিন—

রত্নাবলী সোজাসুজি বলিল, উনি মহেশবাবুর ভাগনে।

বিপিন বলিল, এত রাত্রে আপনি এখানে কী করছেন ?

বিপিনের গলার সুরে শশধরের উৎসাহ নিভিয়া গিয়াছিল, সে আমতা আমতা করিয়া বলিল, মহেশবাবু বললেন কিনা---

তার হইয়া রত্নাবলী কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিল, মহেশবাবুর খুব অসুখ, একশো চারে জ্বর উঠেছে ; মাধবীকে একবার দেখবার জন্য বড়ো ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। শশধরবাবু তাই বলতে এসেছেন, মাধবী যদি একবার যায়---

এত রাত্রে ? দিনের বেলা বলতে এলেই হত।

বিপিনের আবির্ভাবেই রত্নাবলী যেন বিরক্ত হইয়াছিল, জেরা আরম্ভ করায় সে যেন রাগিয়া গেল।---আপনি বুঝছেন না। দিনের বেলা অতটা ব্যাকুল হননি। এখন এত বেশি ছটফট করছেন যে শশধরবাবু ভাবলেন, মাধবীকে যেতে বলে গেছেন এ খবরটা জানালে হয়তো একটু শান্ত হবেন। তাই এখন বলতে এসেছেন। নইলে এত রাত্রে ওঁর আশ্রমে আসবার দরকার !

এত কথা একসঙ্গে রত্নাবলী কোনোদিন বলে না। চাঁদের আলোতেও বোঝা যায়, রত্নাবলীর দাঁতগুলি কী ধবধবে। ব্যাপারটা বিপিনের একটু জটিল মনে হইতে লাগিল। মহেশ চৌধুরির খুব অসুখ হইয়াছে, মাধবীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, শুধু এই ব্যাপারটুকুই কম জটিল নয়। জগতে এত লোক থাকিতে মাধবীলতাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা কেন ? কতটুকুই বা তার পরিচয় মাধবীর সঙ্গে ! মাধবীলতাকে কথাটা জানাইতে এত রাত্রে আশ্রমে আসিয়া রত্নাবলীর সঙ্গে শশধরের গল্প জুড়িয়া দেওয়াটাও জটিল ব্যাপার বইকী। উমা আর মাধবীলতার অনুপস্থিতির ব্যাপারটা আরও বেশি জটিল।

জিজ্ঞাসা করায় রত্নাবলী বলিল, ওরা খাচ্ছে।

এখনও খাওয়া হয়নি কেন ?

রত্নাবলী মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া ঝাঁজালো গলায় বলিল, কারণ আছে, ও সব মেয়েদের ব্যাপার আপনি বুঝবেন না। পারি না বাপু আর আপনার কথার জবাব দিতে !

মনে মনেও কোনোরকমেই বিপিন রাগ করিতে পারিতেছিল না, আশ্রমের নিয়মভঙ্গ করা, তার উপর এখন কড়া কথা বলা কিছুই যেন তার কাছে গুরুতর মনে হইতেছিল না। আশ্রমের নিয়মেই যেন এ সব ঘটিতেছে, আগাগোড়া যেন তার নিজেরও সমর্থন আছে। একটু ভাবিল বিপিন, তারপর কোনোরকমে গলা গম্ভীর করিয়া বলিল, আপনি ভেতরে যান, রাত্রে কেউ কোনো দরকারে আশ্রমে এলে এবার থেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আর আপনি বাড়ি ফিরে যান শশধরবাবু, মহেশবাবুকে বলুন গিয়ে মাধবীকে সঙ্গে করে নিয়ে আমি যাচ্ছি।

আজ রাত্রেই যাবেন ?

অসুখ-বিসুখের সময় কি দিনরাত্রির বিচার করলে চলে ? সময় বুঝে মানুষের অসুখ হয় না। বুড়ো মানুষ, এমন অসুখে পড়েছেন, তাঁর সামান্য একটা ইচ্ছা যদি আমরা না পূর্ণ করতে পারি, আমাদের আশ্রমে থাকা কেন ? নিজেরা সুখে থাকার জন্য আমরা আশ্রমবাস করি না শশধরবাবু।

শশধর অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বিপিন তাগিদ দিয়া বলে, দাঁড়িয়ে থাকবেন না, আপনি যান। বলুন গিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা যাচ্ছি।

শশধর চলিয়া গেলে রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল, এত দূর রাস্তা যাবেন কী করে ? হেঁটে ?

সে ভাবনা তো আপনাকে ভাবতে বলিনি ? আপনাকে যা বললাম তাই করুন, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

রত্নাবলী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, আমি সঙ্গে যাব না ?

বিপিন বলিল, না।

এত রাত্রে বিপিন একা মাধবীলতাকে সঙ্গে করিয়া মহেশ চৌধুরির বাড়ি যাইবে। মহেশ চৌধুরির বাড়ি কাছে নয়, আশ্রম হইতে প্রায় চার মাইল পথ। বিপথে মাঠ-ঘাট বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়া গেলে পথ কিছু সংক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু এখন বর্ষাকালে দিনের বেলাও সে পথে যাতায়াত করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আশ্রম হইতে বাগবাদা যাইতে হইলে সাতুনার গা ঘেঁষিয়া যাইতে হইবে, সাতুনা বেশি দূরে নয়। সাতুনা পর্যন্ত যাওয়ার আগেই পথের ধারে ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকজন গৃহস্থের খানকয়েক বাড়ি আর খেতখামার পাওয়া যায়, তাদের কারও কারও গোরুর গাড়ি আছে, বিপিন কি লোক পাঠাইয়া গোরুর গাড়ি আনাইয়া লইবে ? অথবা মাধবীকে সঙ্গে করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ কবিয়া দিবে, পথে ওই ছোটো পাড়াটিতে হোক, সাতুনায় হোক, কারও কাছে সংগ্রহ করিয়া লইবে গোরুর গাড়ি ? গোরুর গাড়ি না পাওয়া গেলে হাঁটিয়াই হাজির হইবে বাগবাদায় মহেশ চৌধুরির বাড়িতে ? এই সব ভাবিতে ভাবিতে রত্নাবলীর সর্বাঙ্গে কাঁটা দেয়, আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী ক্ষান্তবর্ষার রাত্রি রত্নাবলীকে ঘিরিয়া আছে, নির্জন পথ বাহিয়া দুজন হাঁটিয়া চলিয়াছে ঘুমন্ত গ্রামের গাঁ ঘেঁষিয়া, পথের খানিক খানিক ভিজা চাঁদের আলোয় ঢাকা আর খানিক বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় প্রায় অন্ধকার, কোথাও ঝোপঝাড় পথের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, কোথাও দুদিকেই জলভরা খেত : হাঁটিয়া চলিতে চলিতে দুজনে কখন উঠিয়া বসিয়াছে গোরুর গাড়িতে ছাউনির মধ্যে, গাড়িব দোলনে এদিক-ওদিক টলিতে টলিতে কখন তারা জড়াইয়া ধরিয়াছে পরস্পরকে, কখন শশধরেব দুটি হাত অন্ধের দুটি হাতের মতো রত্নাবলীর সর্বাঙ্গে ব্যাকুল আগ্রহে খুঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে রত্নাবলীর সর্বাঙ্গের পরিচয়— একা বিপিনের সঙ্গে একাকিনী মাধবীর এত রাত্রে মহেশ চৌধুরির বাড়ি যাওয়ার নানারকম অসুবিধা ও অসঙ্গতির কথা ভাবিতে ভাবিতে রত্নাবলীর গায়ে সত্যই কাঁটা দিয়া ওঠে ! বিপিনের কী মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে ? কাল মাধবীকে নিয়া গেলে চলিবে না মহেশ চৌধুরির বাড়ি ?

কী ভাবছেন ? খাওয়া হয়ে থাকলে মাধবীকে পাঠিয়ে দিন বাইরে।

আমিও যাই না আপনাদের সঙ্গে ?

বিপিন মাথা নাড়িয়া জোর দিয়া বলিল, না না, আপনাকে যেতে হবে না।

আমি সঙ্গে না গেলে মাধু আপনার সঙ্গে যাবে না।

মাধু যাবে কী যাবে না সেটা আপনার কাছে না শুনে মাধুব কাছেই না হয় শুনতাম ?

রত্নাবলী অধীর হইয়া বলিল, বুঝেও কি বুঝতে পারেন না আপনি ? এত রাত্রে আপনার সঙ্গে মাধুকে আমি যেতে দেব না। যদি চেষ্টা করেন নিয়ে যাবার, হইচই গণ্ডগোল বাধিয়ে দেব।

বিপিনের যে প্রতিভা কদিন হইতে মায়া-নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, বত্নাবলীর মুখে এ কথা শুনিবামাত্র সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুম ভাঙার মতো চোখের পলকে জাগিয়া উঠিল। সত্যই চোখের পলকে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পর্যন্ত পাওয়া গেল বিপিনের চোখেই। রত্নাবলী স্পষ্ট দেখিতে পাইল একবাব কী দুবার পলক পড়ার মধ্যে বিপিনের চোখ যেন জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল অন্ধকারে হিংস্র পশুর চোখের মতো, তারপর হইয়া গেল জ্ঞানের ছানিপড়া বৃদ্ধের চোখের মতো স্তিমিত।

আপনাকে নিলে আর গোলমাল করবেন না ?

না। আমি সঙ্গে গেলে—

ডাকব নাকি সবাইকে ?

রত্নাবলী ভয় পাইয়া বলিল, সবাইকে ডাকবেন ? সবাইকে ডাকবেন মানে ? কেন ডাকবেন সবাইকে ?

বিপিন গম্ভীর মুখে বলিল, পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে যাওয়া কি ভালো নয় ? আপনি এত সংকোচ বোধ করছেন কেন, আপনি প্রথম নন, আপনার মতো দু-একজন এ ভাবে আশ্রম ছেড়ে গিয়েছে।

আশ্রম ছেড়ে যাব ? এতক্ষণ রত্নাবলী দাঁড়াইয়াছিল, এবার দাওয়ায় উঠিবার ধাপটিতে বসিয়া পড়িল। বলিল, একটু বসি, পা ধরে গেছে। কী বলছেন আপনি বুঝতে পারছি না।

কথাটা সত্য নয়। রত্নাবলী বেশ বুঝিতে পারিতেছিল সব। অনেকদিন আগে, দেড় বছর দুবছরের কম হইবে না, সে তখন অল্পদিন হয় আশ্রমে বাস করিতে আসিয়াছে, বিপিন একদিন এমনিভাবে অসময়ে হঠাৎ সকলকে ডাকিয়াছিল। সীতা নামে একটি শিষ্যার আশ্রমে মন টিকিতেছে না, সে চলিয়া যাইবে, সকলেব কাছে বিদায় চাহিতেছে। সে দৃশ্য রত্নাবলীর মনে গাঁথা হইয়া আছে। কুটিরের সামনে মাটিতে বসানো দুটি লণ্ঠনের আলো সকলের মুখে পড়িয়াছে, কারও মুখে বেশি, কাবও কম। সকলে নির্বাক— পাথরের মূর্তির মতো নির্বাক। এখনকার চেয়ে শিষ্য ও শিষ্যার সংখ্যা তখন কম ছিল আশ্রমে।

সীতা কাঁদিতেছিল। দাওযায় বসিযা মুখ নিচু কবিযা নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। কয়েকদিন আগে সীতার স্বামীকে বিপিন আশ্রমেরই কী একটা কাজে দূরদেশে পাঠাইয়াছে, তিন-চারদিন পবে সে ফিরিয়া আসিবে। কল্যাণী নামে আশ্রমের একটি মেয়েকে বিপিন সেই কটা দিন সীতার সঙ্গে তার কুটিরে থাকিতে বলিয়া দিয়াছিল। বছর বাবো বয়স ছিল কল্যাণীর আর ছিল কাঠির মতো সরু চেহারা। একটু তফাতে দাওয়ার একটা খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া সে ভর্যাত চোখে চাহিযাছিল। সীতার মুখের চেয়ে কল্যাণীর সেই দৃষ্টিই রত্নাবলীব বেশি স্পষ্টভাবে মনে আছে।

সকলেই জানিত. এক ঘণ্টা আগে কল্যাণীব বাবাকে অবিলম্বে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে এবং সে গোরুর গাড়ি আনিতে গিয়াছে। কল্যাণীর বাবার মতো রূপবান পুরুষ রত্নাবলী কখনও দ্যাখে নাই। শান্তির খোঁজে ভদ্রলোক সদানন্দেব আশ্রমে আসিযাছিল, কিন্তু একটু স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ হওযায় বিপিনের সঙ্গে ক্রমাগত খিটিমিটি বাধিযা অশান্তির সৃষ্টি হইতেছিল। মানুষটাকে সকলেই পছন্দ কবিত, মেয়েকে সঙ্গে কবিযা আবাব সংসারে ফিরিয়া যাইতেছে জানিয়া সকলের দুঃখও হইযাছিল, আনন্দও হইয়াছিল, কিন্তু ঘটনাব সীতা-সংক্রান্ত আকস্মিক পবিণতিতে সকলে থতোমতো খাইয়া গিয়াছিল।

তারপর বিপিন সীতাকে বলিয়াছিল, আপনি তবে তৈরি হয়ে নিন। তখন সীতা বলিয়াছিল, আমি যাব না। উনি না ফিবে এলে এক পা নড়ব না আমি এখান থেকে।

বিপিন যেন স্তম্ভিত হইয়া বলিযাছিল, সে কী ?

সীতা প্রায় আর্তনাদ করিয়া বলিয়াছিল, উনি নেই, এ ভাবে আপনারা আমায তাড়িয়ে দিতে পারেন না।

বিপিন গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, আপনাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে কে ?

কল্যাণীর বাবা গোরুব গাড়ি আনিয়া মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বিদায় হইয়া গিয়াছিল, সীতা কয়েকটা দিন আশ্রমে ছিল। সীতার স্বামী কিন্তু আর আশ্রমে ফিবিয়া আসে নাই। বিপিন কি তাকে আশ্রমের কাজে বাহিরে পাঠাইয়াছিল ? বাহিবে থাকিতে আশ্রমের কোনো কথা কানে যাওয়ায় আর সে ফিরিয়া আসে নাই ? অথবা নিজেই সে আশ্রম ছাড়িয়া চলিযা গিযাছিল ? এই সব ছিল তখন সকলের জিজ্ঞাস্য। এখনও এ সব জিজ্ঞাস্যই রহিয়া গিয়াছে। কয়েকদিন স্বামীর প্রতীক্ষা করিয়া সীতাও যেন আশ্রম হইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

বিপিন রত্নাবলীকে লক্ষ করিতেছিল। আশ্রমের নিয়ম তো আছেই, তা ছাড়া রত্নাবলী নিজেও অত্যন্ত সাবধান, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, রত্নাবলীর দেহটাই বড়ো বেহায়া। দেখিতে দেখিতে বিপিনের মনে হয় কী, এর কাছে কোথায় লাগে মাধবীলতা, গদির কাছে কাঁথার মতো ? তবু মাধবীলতার আকর্ষণ কত বেশি। রত্নাবলীকে এতকাল সে কি দেখিয়াও কোনোদিন চাহিয়া দেখিয়াছে ? কুটিরে হোক, নদীর ঘাটে হোক, রত্নাবলী দৃষ্টিপথে পড়িলে তাকে না দেখিয়া অবশ্য থাকা

কঠিন, অন্তত তাড়াতাড়ি সরিয়া যাওয়ার আগে,—মেয়েদের দিকে তাকানো উচিত নয় মনের এই ছুতাতেও অন্তত—একটিবার রত্নাবলীকে দেখিতেই হয়, কিন্তু সে দেখা ওই দেখা পর্যন্তই। রত্নাবলী যেন আকর্ষণ করে না, কেবল মনটা বিচলিত করিয়া দেয় কিছুক্ষণের জন্য। মাধবীলতা ও রত্নাবলীর তুলনামূলক সমালোচনাটা বিপিন আগেও যে কোনোদিন করিতে পারিত, কিন্তু এই মুহূর্তের আগে কথাটা যেন তার খেয়ালই হয় নাই। কথাটা মনে পড়িয়া সে একটু আশ্চর্য হইয়া যায়। সে জানে, এখন তাকে এই দাওয়ায় বসাইয়া কুটিরের সামনে খোলা জায়গায় জ্যোৎস্নালোকে মাধবী আর রত্নাবলী যদি পরস্পরের কিছু তফাতে দাঁড়ায়, যাতে এক একটি চোখের কোণে সে এক-একজনকে আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া জ্যোৎস্নার আবরণ অঙ্গে চাপানোর প্রক্রিয়ায় ব্যাপৃতা দেখিতে পায়, দুটি চোখই তার অপলক হইয়া থাকিবে রত্নাবলীর দিকে কিন্তু মন তার পড়িয়া থাকিবে মাধবীলতার কাছে। অভদ্র কল্পনাটি বিপিনের রোমাঞ্চকর মনে হয়। বিপিনের নিজেরই একটা ধারণা ছিল যে মোটামুটি হিসাবে বছর ত্রিশেক বয়স হইবার পর মানুষের আর এ ধরনের কল্পনা ভালো লাগে না, ছেলেমানুষি মনে হয়, হাসি পায়—রাজা সাহেবের বাড়িতে দেয়ালে টাঙানো কয়েকটি নগ্না নারীর প্রকাশ্য চিত্র দেখিয়া বিপিন ওই ধারণাটি সৃষ্টি করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল যে এই ছবিগুলির দিকে কেউ তাকাইয়াও দ্যাখে না, দেখিয়া দেখিয়া আর কারও কিছুমাত্র কৌতূহল নাই, রক্তমাংসের স্ত্রীলোকের বেলাও মানুষের তাই হয়, প্রথম বয়সটা কাটিয়া যাওয়ার পর নারীদেহ সম্বন্ধে মানুষের সমস্ত কৌতূহল মিটিয়া যায়। প্রথম বয়স বিপিনের বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় বয়সটাও প্রায় কাটিতে চলিল, তবু রত্নাবলী ও মাধবীলতা সম্বন্ধে ছেলেমানুষি কল্পনা করিতে তার ভালো লাগিতেছে কেন এটা অবশ্য বিপিন ভাবিয়া দেখিল না। রত্নাবলীর পাশে বসিয়া সে হঠাৎ একটা খাপছাড়া কাজ করিয়া ফেলিল—এত জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল বলিবার নয়। রত্নাবলী আরও ভয় পাইয়া গেল। পাশে বসে কেন বিপিন ? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেন বিপিন ? অমন করিয়া তাকায় কেন বিপিন জ্ঞানীবৃদ্ধের মতো ?

আপনি বড়ো ছেলেমানুষ রতন দেবী।

গা ঘেঁষিয়া বিপিন বসিয়াছে। বিপিন যদি এবার গায়ে হাত দেয় ? যদি জড়াইয়া ধরে ? পুরুষ মানুষকে রত্নাবলী বিশ্বাস করে না। মেয়েমানুষ সব সময়েই সংযত থাকিতে পারে, কিন্তু পুরুষ মানুষের সংযম শুধু অন্যমনস্কতা, হয়তো পাঁচ-সাতবছর কোনো মেয়ের কথা মনেও পড়িল না, কিন্তু তার পাশে গা ঘেঁষিয়া বসিবার পর পাঁচ-সাতমিনিটের মধ্যে হয়তো এমন পাগলামি করিয়া বসিল যার তুলনা হয় না। বিপিনের কিছু হইবে না, বিপদে পড়িবে সে। সে যদি গোলমাল করে, সকলে যদি বুঝিতেও পারে যে দোষ আগাগোড়া বিপিনের, তবু বিপিনের এতটুকু আসিয়া যাইবে না, মারা পড়িবে সেই।

উমা মাসি আসছে বোধ হয়।

সহজভাবে স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াও কোনো লাভ হইল না, রত্নাবলীর নিজের কানেই কথাগুলি শুনাইল যেন সে চুপিচুপি ফিসফিস করিয়া প্রণয়ীকে সতর্ক করিয়া দিতেছে।

বিপিন একটু হাসিল। আসুন না, সকলেই তো আসবেন।

সকলে আসবেন কেন ! ও কথা বলছেন কেন আপনি !

কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিবে কিনা মনে মনে রত্নাবলী তাই ভাবিতেছিল, গলাটা তাই কাঁদো কাঁদো শোনাইল। মেয়েদের প্রকৃতিই এই রকম—একটা কিছু করিবে কী করিবে না ভাবিতে ভাবিতে কাজটা অর্ধেক করিয়া ফেলে। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ে নিজেকে দান করার আগে ঠিক করিয়া ফেলিতে পারে নাই আত্মদান করিবে কিনা।

[লেখকের মন্তব্য . কী কথায় কী কথা আসিয়া পড়িল। কিন্তু উপায় নাই, রত্নাবলীকে বুঝিতে হইলে কথাটা মনে রাখা দরকার। কোনো বিষয়ে আগে হইতে মনস্থির করিয়া ফেলিবার ক্ষমতাটাই মনের জোরের চরম প্রমাণ হিসাবে প্রায় সকলেই গণ্য করিয়া থাকে, আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওটা গোঁয়ারতুমিরই রকমফের। ধরাবাঁধা নিয়মগুলি জীবনে কাজে লাগে না, ধরাবাঁধা নিয়ম কি জীবনে বেশি আছে ? যেগুলিকে অপরিবর্তনীয় নিয়ম বলিয়া মনে হয়, আসলে সেগুলি মানুষের আরোপ করা বিশেষণ মাত্র, উলটোটাও অনায়াসে খাটিতে পারিত। মানুষ কী চায়, মানুষ কী করে এবং মানুষের কী চাওয়া উচিত আর মানুষের কী করা উচিত, এর কি কোনো নির্দিষ্ট ফরমুলা আছে ? অন্যের প্রস্তুত করা ফরমুলা চোখকান বুজিয়া অনুকরণ করা হয় বোকামি নয় গোঁয়ারতুমি। মেয়ে এবং পুরুষের মধ্যে যারা সুবিধাবাদী, তারা বোকাও নয় গোঁয়ারও নয়। এই জন্য তারা আগে হিসাব-নিকাশ শেষ করিয়া চরম সিদ্ধান্ত করিতে পারে না, দরকারমতো কাজ আরম্ভ করে কিন্তু মন সিদ্ধান্তের বাঁধনে বাঁধা পড়িতে চায় না। শশধরের বাহুর বাঁধন রত্নাবলী মানিয়া লইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তখনও সে কি স্বীকার করিবে নারীজন্ম তার সফল হইল অথবা মস্ত একটা ভুল সে করিয়া বসিয়াছে ঝোঁকের মাথায় ? দেহ অবশ্য তার অবশ হইয়া যাইবে, চোখ মেলিয়া চাহিবার ক্ষমতাও হয়তো থাকিবে না, মনে প্রায় এই ধরনের একটা চরম সিদ্ধান্ত সমস্ত চিন্তাকে দখল করিতে চাহিবে যে জীবনের তার অতীতও ছিল না ভবিষ্যৎও থাকিবে না, তবু সে তখনও ভাবিতে থাকিবে যে, শশধর যদি তাকে কামনা করে, নিজেকে সে কি তখন দান করিবে ? নিজেকে দান করা কি উচিত হইবে তার ?

আপনারা বোধ হয় লক্ষ করিয়াছেন যে, রত্নাবলীর এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তিটা একটু অসাধারণ। সে যেন ইচ্ছা করিয়া নিজেকে ধাঁধায় ফেলিয়া দেয়। সে যেন সব সময় সচেতন হইয়া থাকে যে, কী করিবে না করিবে ঠিক সে করিয়া উঠিতে পারিতেছে না এবং তাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না।]

বিপিন আবার মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, আপনি বড়ো ছেলেমানুষ। বলিয়া নিছক বাহাদুরি করার জন্যই গম্ভীর মুখে হাত বাড়াইয়া রত্নাবলীর গালটা টিপিয়া দিল। রত্নাবলী মাথায় ঝাঁকি দিল, আধ হাত সরিয়া বসিল এবং ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—আর কিছুই করিল না। একটু অপেক্ষা করিয়া রত্নাবলীর নিশ্চেষ্ট শান্ত ভাবে খুশি হইয়া বিপিন বলিল, মাধুকে নিয়ে যাচ্ছি, মহেশবাবুর বাড়িতে রেখে আসব বলে। এখন কয়েকদিন ওইখানেই থাকবে, তারপর যেখানকার মানুষ সেখানে ফিরে যাবে। ওর পক্ষে আশ্রমে থাকাও চলবে না, আমাদেরও ওকে রাখা চলবে না। আপনি বলছেন, আপনি সঙ্গে না গেলে ওকে আপনি যেতেই দেবেন না, আমি তাই ভাবলাম আপনিও বুঝি চিরদিনের মতো ওর সঙ্গে আশ্রম ত্যাগ করে চলে যেতে চাইছেন। তাই সকলকে ডাকার কথা বলছিলাম। আপনি তো মাধবীর মতো চুপিচুপি আশ্রমে আসেননি, আপনি কেন চুপিচুপি আশ্রম ছেড়ে চলে যাবেন—যেতে হলে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই যাবেন।

বলিয়া বিপিন হাসিতে লাগিল।

গাল টিপিয়া দেওয়ায় রত্নাবলী আধহাত তফাতে সরিয়া গিয়াছিল, এবার প্রায় হাতখানেক কাছে আসিয়া চাপা গলায় বলিল, মাধু চলে যাচ্ছে আশ্রম থেকে ?

সায় দিবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়িতে যাওয়ায় বিপিনের মুখ প্রায় রত্নাবলীর মুখের সঙ্গে ঠেকিয়া গেল। তা হোক, তাতে দোষ নাই, গোপন কথার আদান-প্রদানের সময় মানুষের মানুষের মুখ কাছাকাছিই আসে। ভিতরের কৌতূহল রত্নাবলীর চোখ দুটিকে যেন সত্যসত্যই খানিকটা বাহিরের

দিকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে। তেমনই চাপা গলায় সে জিজ্ঞাসা করিল, কী করেছে মাধু ? কার সঙ্গে করেছে ?

কী করবে ? কার সঙ্গে করবে ? ও তো আশ্রমে চিরকাল থাকবার জন্য আসেনি—কদিন বেড়িয়ে গেল, এইমাত্র।

আমার কাছে লুকোন কেন ? বলুন না ? পায়ে পড়ি, বলুন।

কী বলব ?

রত্নাবলী হতাশ হইয়া গেল। অভিমানে সরিয়া বসিল। কী করিয়াছে মাধবী ? আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে এমন কী অপরাধ মেয়েটা করিয়াছে ! এতকাল সঙ্গে থাকিয়াও জানিতে পারিল না ! জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তো মাধবীকে, মাধবী চলিয়া যাওয়ার আগে !

বসুন, ডেকে দিচ্ছি মাধবীকে।

আপনি বসুন, আমিই ডেকে আনছি।

ডাক শুনিয়া মাধবীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে !

এখুনি যেতে হবে আপনার সঙ্গে ?

হ্যাঁ, এখুনি যেতে হবে।

চলুন তবে, যাই।

যাওয়ার সময় দাওয়ায় বসিয়া রত্নাবলী ক্ষীণস্বরে একবার মাধবীলতাকে ডাকিল। মাধবী সাড়া দিল না, ছুটিয়া গিয়া উন্মাদিনীর মতো সদানন্দের গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া-কামড়াইয়া তাকে খুন করিয়া ফেলিবার জন্য তার ধৈর্য ধরিতেছিল না। বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে ডাকিয়া পাঠায় ! সে এত সস্তা, মানুষের কাছে তার মর্যাদা এত কম যে প্রকাশ্যভাবে বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে অভিসারে যাওয়ার হুকুম পাঠাইয়া দিতে পারে এমন অনায়াসে !

বিপিন আশ্চর্য হইয়া বলে, ওদিকে কোথায় চলেছ ?

মাধবীলতা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, ফপরদালালি করবেন না—আমি পথ চিনি।

শোনো, শোনো। দাঁড়াও।

পিছনে পিছনে খানিকটা প্রায় ছুটিয়া গিয়া মাধবীলতাব হাত ধবিয়া বিপিন তাকে দাঁড় করায়। মাধবী বলে, ও ! আপনি বুঝি পাওনা মিটিয়ে নেবেন আগে ? শিগগির নিন, একটু তো ঘুমোতে হবে রাত্রে ?

বিপিন কোমলকণ্ঠে বলে, তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে মাধু ? কী বকছ পাগলের মতো ?

মাধবীলতাও কোমলকণ্ঠে বলে, মাথা খারাপ হবে না ? যা আরম্ভ কবে দিয়েছেন আপনারা, এতে মাথা ঠিক থাকে মানুষের ? এর চেয়ে কুমার সাহেবের মিসট্রেস হওয়াই আমার ভালো ছিল, কিছুদিন তো মজা করে নিতাম।

এখানটা ফাঁকা, কাছাকাছি দু-একটি মোটে গাছ আছে। এদিকে এলোমেলোভাবে ছড়ানো আশ্রমের কুটিরগুলির কয়েকটি মাত্র চোখে পড়ে আর এদিকে চোখে পড়ে সদানন্দের কুটির। জ্যোৎস্নালোকে কুটির ও আবেষ্টনীর মধ্যে ফাঁকা মাঠে মাধবীলতার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে বিপিনের মনে হয়, আঙুলগুলি যদি তার পাখির পালকের মতো কোমল হইয়া না যায় আর সে যদি মেয়েটার সর্বাঙ্গে সস্নেহে আঙুল বুলাইয়া না দেয় পৃথিবীটাই রসাতলে চলিয়া যাইবে ! অকারণে নিজেকে এই মেয়েটার জন্য মহাশূন্যে বিলীন করিয়া দিবার কোনো একটা কারণ কি আবিষ্কার করা যায় না ? অসহ্য কোনো যন্ত্রণা সহ্য করা যায় না এই মেয়েটার জন্য ? অসম্ভব কোনো

কার্য সম্ভব করা চলে না ? ভাবিতে ভাবিতে মাধবীলতার মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া বিপিন মৃদুস্বরে বলে, মাধু, কে তোমার ওপর অত্যাচার করছে বলো কাল তাকে আশ্রম থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেব। এ আশ্রম আমার, দলিলপত্রে আমার নাম আছে, আমার কথার ওপর কারও কথা কইবার অধিকার নেই। কে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছে, একবার তার নামটি শুধু তুমি বলো।

কী উগ্র উদারতা বিপিনের ! এদিকে চাপিয়া ধরিয়াছে মাধবীর মাথাটা নিজের বুকে, মুখে তাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে কে অত্যাচার করিয়াছে তার উপর, কে কষ্ট দিয়াছে তার মনে ? একটু কাঁদে মাধবীলতা, একটু ফোঁসফোঁস করে। বিপিন ব্যাকুল হইয়া বলে, কেন কাঁদছ মাধু ? কেঁদো না। বলো না তুমি কী চাও ? অন্য কোথাও চলে যাবে ?

কোথায় যাব ? কার কাছে যাব ?

যেখানে যেতে চাও পাঠিয়ে দেব। নিজে আমি তোমার নামে বাড়ি কিনে দেব, ব্যাঙ্কে তোমার নামে টাকা জমা রেখে দেব—

আপনার মিসট্রেস হয়ে থাকতে হবে তো ?

বিপিন একটু ভাবিল। হাতের আঙুল পাখির পালক নয় বলিয়া আপশোশ করবার সময় সদানন্দ যেমন ভুলিতে পারিতেছিল না যে মাধবীলতার ঠোঁটের নীচে দাঁত আছে আর আঙুলের ডগায় নখ আছে আর রক্তমাংসের তলায় হাড় আছে, বিপিনও তেমনি এখন কেবলই ভুলিবার চেষ্টা করিতেছিল যে মাধবীলতা যাকে হাতের কাছে পায় তাকেই আঁকড়াইয়া ধরে।

ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিপিন তারপর জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কী বলো ?

মাধবীলতা চুপ। বিপিন সত্যই মানুষ নয়।

যাক গে, ও সব কথা পরে হবে। এখন চলো তোমাকে মহেশবাবুর ওখানে রেখে আসি।

মহেশবাবুর ওখানে ?

হ্যাঁ। এখানে তোমার থাকা চলবে না।

মাধবীলতা কাঁদিতে কাঁদিতে বিপিনের সঙ্গে নদীর ঘাটে গিয়া নৌকাটিতে উঠিয়া বসিল। ছোটো ডিঙি নৌকা, ছাউনি নাই, হাল নাই, বসিবার ভালো ব্যবস্থাও নাই। তবু পায়ে হাঁটিয়া যাওয়ার চেয়ে নৌকায় মহেশ চৌধুরির বাড়ি যাওয়া অনেক সুবিধা। বিপিন নৌকা বাহিতে জানে।

সাত

কয়েকদিন জ্বরে ভুগিয়া মহেশ চৌধুরি সারিয়া উঠিলেন। এ কয়দিন কত লোক আসিয়া যে তার খবর জানিয়া গেল হিসাব হয় না। কেবল খবর জানা নয়, পায়ের ধুলা চাই। সদানন্দের আশ্রম জয় করিয়া আসিয়া মহেশ চৌধুরিও পর্যায়ে উঠিয়া গিয়াছেন। লোকের ভিড়েই মহেশ চৌধুরির প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, মাধবীলতাকে পৌঁছিয়া দিতে আসিয়া কথায় কথায় এই বিপদের কথাটা শুনিয়া বিপিন ভালো পরামর্শ দিয়া গেল। পরদিন হইতে শশধর সকলকে একটি করিয়া তুলসীপাতা বিতরণ করিয়া দিতে লাগিল—উঠানের মস্ত তুলসীগাছটি দেখিতে দেখিতে দু-একদিনের মধ্যে হইয়া গেল প্রায় ন্যাড়া। যারা আসে তাদের প্রায় সকলেই চাষি-মজুর কামার-কুমোর শ্রেণির এবং বেশির ভাগই স্ত্রীলোক—তুলসীপাতা পাইয়াই তারা কৃতার্থ হইয়া যাইতে লাগিল।

বিপিন প্রত্যেক দিন খবর জানিতে আসে। কার খবর জানিতে আসে, মহেশের অথবা মাধবীলতার, সেটা অবশ্য ঠিক বুঝা যায় না। যদিও মহেশের কাছেই সে বসিয়া থাকে অনেকক্ষণ, আলাপ করে নানা বিষয়ে। আশ্রমে বিপিনের কাছে মহেশ বহুদিন ধরিয়া যে অবহেলা অপমান পাইয়া আসিতেছে সে কথা কেউ ভুলিতে পারিতেছিল না, এখন মহেশের খাতির দেখিয়া সকলে

অবাক হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের কদমগাছের নীচেই কি মহেশের সব লাঞ্ছনার সমাপ্তি ঘটিয়াছে ? সদানন্দ কি সত্যই এতকাল মহেশকে পরীক্ষা করিতেছিলেন, বিপিন এবং আশ্রমের অন্যান্য সকলে তারই ইঙ্গিতে মহেশের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিতেছিল ? পরীক্ষায় মহেশ সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ায় এবার বিপিন বাড়ি আসিয়া তার সঙ্গে ভাব করিয়া যাইতেছে, সেবার জন্য মাধবীলতাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছে ?

বিপিন আসে, নানা বিষয়ে আলোচনা করে, আর মহেশ চৌধুরির ভক্তদের বিশেষভাবে লক্ষ করিয়া দ্যাখে। কয়েক দিন পরে মহেশ চৌধুরির আশীর্বাদপ্রার্থীদের সংখ্যাও কমিয়া যাইতে থাকে, বিপিনের উৎসাহেও যেন ভাটা পড়িয়া যায়। প্রতিদিন আর তাকে বাগবাদায় দেখা যায় না। আসিলেও মহেশের কাছে সে বেশিক্ষণ বসে না।

মহেশ ব্যাকুলভাবে মাধবীলতাকে জিজ্ঞাসা করে, বিপিনবাবু যে আর আসেন না মা ?

মাধবীলতা বলে, কাজের মানুষ, নানা হাঙ্গামায় আছেন, সময় পান না।

বড়ো ভালো লোক। কী বুদ্ধি, কী কর্মশক্তি, কী তেজ, কী উৎসাহ—সবরকম গুণ আছে ভদ্রলোকের। এমন একটা মানুষের মতো মানুষ, জানো মা, আমি আর দেখিনি।

বিপিনের এ রকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া মাধবীলতা হাসিবে না কাঁদিবে ভাবিয়া পায় না। বুদ্ধি হয়তো আছে, বুদ্ধি থাকিলেই কি লোক ভালো হয় নাকি ? ওই স্তিমিত নিস্তেজ মানুষটার কর্মশক্তি, তেজ আর উৎসাহ !—যার মুখের চিরস্থায়ী বিষাদের ছাপ সংক্রামিত হইয়া মানুষের মনে বৈরাগ্য জাগে ?

এখানে মাধবীলতার ভালো লাগে না। মহেশ যে কদিন দক্ষিণের ভিটার ঘরটিতে দেড়শো বছরের পুরানো খাটে শুইয়া জ্বরের ঘোরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে থাকিয়া থাকিয়া বলিত, ওরা আমার কাছে আসছে কেন ? প্রভুর কাছে পাঠিয়ে দাও ওদের, সে কদিন সেবার হাঙ্গামায় এক রকম কাটিয়া গিয়াছিল, মহেশ সুস্থ হইয়া উঠিবার পর মাধবীলতার সব একঘেয়ে লাগে। গ্রামের মেয়েরা দু চারজন করিয়া সকলেই প্রায় মাধবীলতাকে দেখিয়া গিয়াছে। পাড়ার কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু এদের মাধবীলতার ভালো লাগে না। তাই নিজেও সে এদের কাউকে কাছে টানিবার চেষ্টা করে নাই, নিজে হইতে তার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া ভাব জানাইবার ভরসাও এদের হয় নাই। বেড়াইতে আসিয়া অভদ্র বিস্ময়ের সঙ্গে এরা মাধবীলতাকে শুধু দেখিয়াই যায়। আশ্রমবাসিনী কুমারী সন্ন্যাসিনী (বয়স কত হইয়াছে ভগবান জানেন) সাধারণ বেশে আশ্রম ছাড়িয়া আসিয়া মহেশ চৌধুরির বাড়িতে বাস করিতেছে, গাঁয়ের মেয়েদের কাছে সে কতকটা স্বর্গচ্যুত অপ্সরি কিন্নরীর মতো রহস্যময়ী জীব।

এখানে মানুষ নাই, বৈচিত্র্য নাই। স্নেহমমতা আদরযত্ন আছে, বিভূতির মা মেয়ের মতোই মাধবীলতাকে আপন করিয়া ফেলিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কেবল মেয়ের মতো সব সময় একজনের আপন হইতে কি মানুষের ভালো লাগে ? আশ্রমের জীবনের পর কেমন নীরস একঘেয়ে মনে হয়। আশ্রম নির্জন, কিন্তু সে অনেক নরনারীর নির্জনতা ; আশ্রমের নিয়মে বাঁধা জীবন শান্ত, কিন্তু সে নিয়মও অসাধারণ, সে শান্তিও অসামান্য। কী যেন ঘটিবার অপেক্ষায় গাছপালায় ঘেরা আশ্রমের ছোটো ছোটো কুটিরগুলিতে প্রতি মুহূর্তে উন্মুখ হইয়া থাকা যায়—মনে হয়, এই বুঝি আশ্রমের গাম্ভীর্যপূর্ণ শান্তভাব চুরমার করিয়া প্রচণ্ড একটা অবরুদ্ধ শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিবে, এমন একটা কাণ্ড ঘটিবে যা দেখিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া হাততালি দিয়া নাচা যায়। এখানে কোনোদিন কোনো কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বিপিনকে মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করে, উনি কী বললেন ?

কিছু বলেননি।

কিছুই না ? একেবারে কিছু না ?

বিপিন মাথা নাড়িয়া বলে, কী বলবে ? বলবার ক্ষমতা থাকলে তো বলবে। কী কুক্ষণে যে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল মাধু।

মাধবী ভয় ও বিস্ময়ে চুপ করিয়া থাকে। তার জন্য বিপিন আর সদানন্দের মনান্তর হইয়া গেল ? জানালা দিয়া গ্রামের পথ দেখা যায়, বর্ষায় একেবারে শেষ করিয়া দিয়া গিয়াছে, এখনও ভালো রকম মেরামত হয় নাই। পথের ধারে অবনী সমাদ্দারের বাড়ির সামনে একটি গোরু বাঁধা আছে। রোজই বাঁধা থাকে, ঘাসপাতা খায় আর কয়েকদিনের বাছুরটির গা চাটে। আজ বাছুরটি যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য না ? মাধবীলতা যেদিন যে সময় কথা পাড়িল সে চলিয়া আসায় সদানন্দের কী অবস্থা হইয়াছে, সেই দিন সেই সময় বাছুরটি উধাও হইয়া গিয়া গাভিটিকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।

আশ্রমের কীসে উন্নতি হবে সে চিন্তা ওর নেই, দিনরাত নিজের কথাই ভাবছে। আমার এটা হল না, আমার ওটা হল না, আমার এটা চাই, আমার ওটা চাই। ওকে নিয়ে সত্যি মুশকিলে পড়েছি মাধু।

কেন, উনি বেশ লোক।

মাধবীলতার মুখে এ কথা শুনিয়া বিপিন প্রায় চমকাইয়া যায়। নৌকায় উঠিবার আগে রাগের মাথায় সদানন্দের কুটিরের দিকে পা বাড়াইয়া, স্টেজে সরলা কোমলা বনবালার অভিনয় করিয়া করিয়া হয়রান হইয়া গরম মেজাজে সাজঘরে ফিরিয়া আসা বেশ্যার মতো ফুঁসিতে ফুঁসিতে মাধবীলতা যেসব কথা বলিয়াছিল বিপিন তার একটি শব্দও ভোলে নাই। জ্যোৎস্নালোকে দেখা মুখভঙ্গিও ভোলে নাই মাধবীলতার। সদানন্দের অত্যাচার মেয়েটার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তার চোখের আড়ালে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করিবার সুযোগ সদানন্দ পাইয়াছে ভাবিয়া সে রাগের চেয়ে অনুতাপের জ্বালাতেই জ্বলিয়াছিল বেশি। সে বিপিন, আশ্রমের কোথায় মাটির নীচে কোন চারার বীজ হইতে অঙ্কুর মাথা তুলিতেছে এ খবর পর্যন্ত যে রাখে, তাকে ফাঁকি দিয়া সদানন্দ এত কষ্ট দিয়াছে মাধবীলতাকে ! কী হইয়াছিল তার ? আগেই কেন সে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করে নাই ? কেন আশ্রমকে চুলায় যাইবার অনুমতি দিয়া নিজে গা এলাইয়া দিয়াছিল অসহায় শিশুর মতো ?

সদানন্দের কুটিরের সামনে একটা কদমগাছের নীচে মহেশ চৌধুরির মহাযুদ্ধ এবং মাধবীলতার মধ্যস্থতায় সে যুদ্ধের সমাপ্তির পর কয়েকটা দিন যেভাবে কাটিয়াছিল ভাবিলে বিপিনের এখন লজ্জা করে। শরীরটা একটু দুর্বল ছিল কিন্তু দাঁতের ব্যথা ছিল না। স্নায়ু ভোঁতা হইয়া থাকা উচিত ছিল বিপিনের, শ্রান্ত অবসন্ন দেহে দু-তিনদিন পড়িয়া পড়িয়া ঘুমানোই ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তার বদলে কী তীব্র মানসিক যন্ত্রণাই সে ভোগ করিয়াছে। বারবার কেবলই তার মনে হইয়াছে, সে কি ভুল করিয়াছে ? ছলে-বলে কৌশলে দিগন্তের কোল হইতে তার আদর্শের সফলতাকে আশ্রমের এই মাটিতে টানিয়া আনিবার সাধনা কি তার ভ্রান্তিবিলাস মাত্র ? এ ভাবে কী বড়ো কিছু মানুষ করিতে পারে না ? নিজের জন্য সে কিছু চায় না, এইটুকুই কি তার নৈতিক শক্তিকে অব্যাহত রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট নয় ? ন্যায় অন্যায়ের বিচারের চেয়ে কার্যসিদ্ধিকে বড়ো ধরিয়া লইয়াছে বলিয়াই কি তার এত চেষ্টা আর আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইবে ? মনে মনে নিজের দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের হিসাব করিয়া বিপিন বড়ো দমিয়া গিয়াছে। কতটুকু লাভ হইয়াছে, কতটুকু সার্থকতা আসিয়াছে ? কোনদিকে কতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছে ? আশ্রম বড়ো হইয়াছে, আশ্রমের সম্পত্তিও বাড়িয়াছে, লোকজনও বাড়িয়াছে, কিন্তু উন্নতি হয় নাই। ভালো উদ্দেশ্যে যে মিথ্যা আর প্রবঞ্চনা আর ফন্দিবাজিকে সে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, সে সব একান্তভাবে তার নিজস্ব গোপন পরিকল্পনার অঙ্গ, আশ্রমের জীবনে কেন সে সমস্তের প্রতিক্রিয়া ফুটিয়া ওঠে ? আর এদিকে মহেশ চৌধুরি, সরল নিরীহ বুদ্ধিহীন ভালোমানুষ মহেশ চৌধুরি, না চাহিয়া সে সকলের হৃদয় জয় করিয়াছে, না জানিয়া নিজের দুঃখময় ব্যর্থ জীবনকে পর্যন্ত সার্থকতায় ভরিয়া তুলিয়াছে। কী এমন মহাপুরুষ

মহেশ চৌধুরি যে তার পাগলামি পর্যন্ত মানুষকে মুগ্ধ করিয়া দেয় ? আর কী এমন অপরাধ বিপিন করিয়াছে যে, সকলে তাকে কেবল ফাঁকিই দেয়, সদানন্দ হইতে মাধবীলতা পর্যন্ত ? এইসব ভাবিতে ভাবিতে বিপিন মড়ার মতো বিছানায় পড়িয়া থাকিয়াছে—অন্য মানুষ সে অবস্থায় ছটফট করে। সেই সময়েই বিপিন ভাবিয়া রাখিয়াছিল, মহেশ চৌধুরির সঙ্গে ভাব করিয়া লোকটাকে একটু ভালোভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিবে। তবে বিশেষ উৎসাহ তার ছিল না। তারপব ধীরে ধীরে মহেশ চৌধুরিকে কাজে লাগাইবার পরিকল্পনা মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন আর আশ্রমের পরিসর বাড়ানো সম্ভব নয়, সম্প্রতি যে আমবাগানটা পাওয়া গিয়াছে তাই লইয়াই আপাতত সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সুতরাং রাজাসাহেবের ভয়ে মহেশ চৌধুরিকে এড়াইয়া চলিবার আব তো কোনো কাবণ নাই ! আশ্রমে অর্থ সাহায্য করাও রাজাসাহেব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, কিছুদিন আর পাওয়া যাইবে না। ভবিষ্যতে আবার যদি রাজাসাহেবের কাছে কিছু আদায় করা সম্ভব মনে হয়, তখন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে।

এদিকে, যাদের চাষাভুসো মানুষ বলে, জনসাধারণ নামে আশ্রমকে যারা ঘিরিয়া আছে গ্রাম আর পল্লিতে, তাদের সঙ্গে আশ্রমের একটু যোগাযোগ ঘটানো দরকার। ওদের বাদ দিয়া কোনো প্রতিষ্ঠানই গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। ওদের সঙ্গে এখন যে সংযোগ আছে আশ্রমের, সে না থাকাব মতো। কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামের নরনারী আশ্রমে সদানন্দের উপদেশ শুনিতে এবং সদানন্দকে প্রণাম করিতে আসে, প্রণামান্তে কিছু প্রণামিও দিয়া যায়—কিন্তু সে আর কজন মানুষ, সে প্রণামি আর কত ! তিন দিনের পথ হাঁটাইয়া অনেক দূরের গ্রাম হইতে মানুষকে যদি আশ্রমে টানিয়া আনিতে হয় আর এক একদিনের প্রণামির পরিমাণ দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে দেশেব সর্বত্র আশ্রমের শাখা খুলিবার ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়া দেওয়া সম্ভব করিতে হয়, তাহা হইলে অন্যকিছু করা চাই, কেবল সদানন্দকে দিয়া কাজ চলিবে না।

মহেশ চৌধুরিকে এরা পছন্দ করে—এইসব সাধাবণ মানুষগুলি।

মানুষটাও ভালো মহেশ চৌধুরি।

শিশুর মতো সরল।

কয়েকদিন আসা-যাওয়া মেলামেশা করিয়া বিপিন কিন্তু একটু ভড়কাইয়া গেল। মহেশ চৌধুরির আসল রূপটা সে আর খুঁজিয়া পায় না। ভালো মানুষ, শিশুর মতো সবল, কিন্তু জোর কই ? আশ্রমের কদমতলায় তার যে মনের জোরের পরিচয় বিপিনকে পর্যন্ত কাবু করিয়া কয়েকদিন আনমনা করিয়া রাখিয়াছিল ? ছেলের কথা বলে, ঘরের কথা বলে, নিজের কথা বলে আর এইসব কথার মধ্যে ফোড়ন দেয় ভগবানের কথার—শান্তি চাই মহেশের, শান্তি ! অনেক দুঃখ পাইয়াছে মহেশ, সে জন্য কোনো দুঃখ নাই, এবার একটু শান্তি না পাইলে যে শেষ জীবনটাও মন দিয়া ভগবানকে ডাকা হয় না মহেশের !

ভগবানকে ডাকবার জন্য আমরা আশ্রম করিনি।

মহেশ চৌধুরি কৌতুকের হাসি হাসিয়া বলে, এখনও আমার সঙ্গে ছলনা করবেন বিপিনবাবু ? ভগবানকে ডাকার জন্য ছাড়া আশ্রম হয় ! তবে ভগবানকে ডাকার সুবিধের জন্যে অন্যকিছু যদি করেন—সে সবও ভগবানকে ডাকারই অঙ্গ।

আপনি তো প্রভুর বাণী শোনেন ?

শুনি বইকী।

উনি কি কোনোদিন বলেছেন, আশ্রমে যাঁরা আছেন তাঁদের কাজ হল ভগবানকে ডাকা ?

বলেন বইকী—সব সময়েই বলেন। আমরা সবাই পাপী তো বিপিনবাবু ? প্রশ্ন শুনিয়া বিপিন গুম খাইয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরি সায় না পাইযাও বলে, মহাপাপী আমরা। আমাদের কী ক্ষমতা আছে নিজে থেকে ভগবানকে ডাকবার ? তাই যদি পারতাম বিপিনবাবু, মনে আমার এমন অশান্তি কেন—সকলের মনে অশান্তি কেন ! প্রভু আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন কী করলে ভগবানকে ডাকবার ক্ষমতা হয়, কী করলে আমরা ভগবানকে ডাকতে পারি। কাণ্ডারী একমাত্র ভগবান, কিন্তু গুরুদেবের চরণতরীই ভরসা—। তর্কের কথা নয়, তর্ক বিপিন করে না, কথায় কথা তুলিয়া মানুষটাকে বুঝিবার চেষ্টা করে। অন্য সব দিক দিয়া সে হতাশ হইয়া যায়, একটিমাত্র ভরসা থাকে মহেশের নিজের বিশ্বাস আঁকড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা। নিজে যা জানিয়াছে তার বেশি কিছু জানিতে বা বুঝিতে চায় না, সদানন্দের কথা হোক, শাস্ত্রের বাক্য হোক, তার নিজের ব্যাখ্যাই ব্যাখ্যা। এদিক দিয়া মহেশ ভাঙিবে কিন্তু মচকাইবে না।

এ রকম মানুষ দিয়া বিপিনের কাজ চলিবে কী ?

আচ্ছা, প্রভু যদি আপনাকে কোনো অন্যায় আদেশ দেন, সে আদেশ আপনি পালন করবেন ?

প্রভু অন্যায় আদেশ দিতে পারেন না।

মনে করুন দিলেন—

ও রকম ছেলেমানুষি অসম্ভব কথা মনে করে কী লাভ হবে বলুন ?

বিপিনের ধৈর্য অসীম।

ওঁর আদেশ অন্যায় আমি তা বলছি না। ধরুন, উনি ঠিক মতো আদেশই দিয়েছেন, আপনার মনে হল আদেশটা সঙ্গত নয় ; তখন আপনি কী করবেন ?

মহেশ নিশ্চিন্তভাবে বলে, আদেশ অন্যায় বলে ওঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেব।

আদেশটা পালন করবেন তো ?

উনি যদি আমার মনের ধাঁধা মিটিয়ে দিয়ে আদেশ পালন করতে বলেন, তবে নিশ্চয় করব।

আর যদি মনের ধাঁধা না মিটিয়ে শুধু আদেশ পালন করতে বলেন ?

মহেশ হাসিয়া বলে, যান মশায়, আপনার আজ মাথার ঠিক নেই। ও রকম উনি কখনও বলতে পারেন ?

যদি বলেন ?

আপনি আবার সেই অসম্ভব কল্পনার মধ্যে যাচ্ছেন।

বিপিনের ধৈর্য সত্যই অসীম।

বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যদি বলেন ? এতদিন আপনাকে সে রকম পরীক্ষা করছিলেন না, এই রকম কোনো পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি আপনাকে অন্যায় আদেশ পালন করতে বলেন ?

পরীক্ষার জন্য ? আরও পরীক্ষা করবেন ? মহেশের মুখ চোখের পলকে শুকাইয়া যায়। ভীত সন্ত্রস্ত শিশুর মতো অসহায় চোখ মেলিয়া সে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। সদানন্দের পরীক্ষায় পাস করিয়াছে কী ফেল করিয়াছে আজও মহেশ চৌধুরি ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই, শুধু জানিয়াছে যে সদানন্দ তাকে অনুগ্রহ করিয়াছে, জানিয়া এই সৌভাগ্যেই সর্বদা ডগমগ হইয়া আছে। পরীক্ষার কথা মনে হইলেই তার মুখ শুকাইয়া যায়।

বিপিনের পিছনে বিভূতির মা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল। দুধের বাটি হাতে করিয়া আসিয়াছে। দুধটা বেশি গরম ছিল, এমনিভাবে ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকাতেও আস্তে আস্তে ঠান্ডা হইতে কোনো বাধা হইতেছে না তাই এতক্ষণ দুজনের অপরূপ আলাপে বাধা দেয় নাই। এবার বলিল, বিপিনবাবু, ওঁর সঙ্গে আপনি কথায় পারবেন না। গুরুদেবের সমস্ত আদেশ উনি চোখ কান বুজে মেনে চলবেন—ভাববেন না।

তবু বিপিনের ভাবনার শেষ হয় না। এমন সমস্যায় সে আর কখনও পড়ে নাই। একটা মানুষকে গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত ঠিক করিয়া ফেলিতে যে এত ভাবিতে হয় বিপিনের সে ধারণা ছিল না। আশ্রমে যদি স্থান দেওয়া হয় মহেশকে, কাজে কি তার লাগিবে মহেশ ?

মাধবীলতাকে পর্যন্ত অন্যমনে একসময় সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, মহেশবাবু লোক কেমন মাধু ?

মাধবীলতা সংক্ষেপে বলে, ভালো নয়।

সদানন্দকে মাধবীলতা ভালো লোক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিল। মনে পড়াতেও বিপিনের হাসি আসিল না। মাধবীলতা অন্য মানদণ্ড দিয়া বিচার করিতেছে—ভালো শব্দটায়ও অনেক রকম মানে আছে।

গম্ভীরমুখে সে জিজ্ঞাসা করে, আশ্রমে ফিরে যাবে মাধু ?

যাব।

কী করবে আশ্রমে গিয়ে ?

এ প্রশ্নের জবাব মাধবীলতা দিতে পারিল না।

আট

বিপিন ভাবিতেছিল, মাধবীলতাকে প্রথমে আশ্রমে ফিরাইয়া আনিবে, তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া মহেশকেও আশ্রমে আসিয়া বাস করিতে বলিবে কিনা ঠিক করিবে। ভাবিতে ভাবিতে দিন কাটিতে লাগিল। সদানন্দের নাগালের মধ্যে আবার মাধবীলতাকে আনিয়া ফেলিতে বিপিন আর সময়ই পায় না। নিজেই সে বুঝিতে পারে না মাধবীলতাকে ফিরাইয়া আনিবে ঠিক করিয়াও মহেশের ওখানে মেয়েটাকে কেন ফেলিয়া রাখিয়াছে। এবার অবশ্য সে মাধবীলতার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিবে, নিজেও সতর্ক থাকিবে, তবু যেন ভয় হয়।

সদানন্দ বড়ো ভয়ানক মানুষ। (বিপিনের মতে)

সদানন্দের মানুষ বশ করার যে ক্ষমতাকে অসামান্য গুণ মনে করিয়া বিপিন এতদিন আশ্রমের কাজে লাগাইয়াছে, আজ সেই ক্ষমতাকে অনিষ্টকর ভয়ানক কিছু বলিয়া গণ্য করিতে বিপিনের দ্বিধা হয় না। বিজ্ঞানের সুবিধাভোগীরা যেভাবে বিজ্ঞানকে অভিশাপ দেয়, সদানন্দকেও বিপিন আজকাল তেমনইভাবে কাজ ফুরানো পাজির দলে ফেলিয়াছে। কেবল মাধবীলতার জন্য এ বিরাগ নয়, সদানন্দের কাজ প্রকৃতপক্ষে ফুরায় নাই, মনে হইয়াছিল সদানন্দকে বাদ দিয়াও আশ্রম চালানো যাইবে কিন্তু কল্পনাটা কার্যে পরিণত করিবার নামেই নানারকম আশঙ্কা মনে জাগায় আপনা হইতেই বিপিন টের পাইয়াছে যে সদানন্দকে সে বিদায় দিতে চায় বটে কিন্তু এখনও সেটা সম্ভব নয়।

যে কোনো বুদ্ধিমান উৎসাহী লোক সদানন্দকে সামনে দাঁড় করাইয়া এ রকম একটি আশ্রম গড়িয়া তুলিতে পারিবে—সদানন্দকে বিদায় করার পক্ষে এই এখন সব চেয়ে বড়ো বাধা। সদানন্দ শুধু চলিয়া গেলে আরও বেশি কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া আশ্রমকে সে চালাইয়া নিতে পারিবে, কিন্তু প্রতিহিংসার উদ্দেশ্যে সদানন্দ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিলে পারিবে না। হয়তো পারিবে, কোনো বিষয়েই নিজেকে বিপিন অক্ষম ভাবিতে পারিবে না, কিন্তু সাধ করিয়া সে হাঙ্গামা টানিয়া আনিবার সাহস বিপিনের নাই।

বিপিনের সাহস কি কম ? বিপিন কি ভীরু ?

মাধবীলতা তাই বলে। বলে, বিপিনবাবু ? উনি অপদার্থ ভীরু কাপুরুষ—

বলে মহেশকে। প্রাণ খুলিয়া বিপিনের নিন্দা করিতে পারে। মহেশ চৌধুরির উপর বিরক্তিটা তার এত বেশি বাড়িয়া গিয়াছে, লোকটাকে দেখিলেই গায়ে যেন আজকাল তার জ্বর আসে। কিছুদিন আগে মাধবীলতা বিপিনকে বলিয়াছিল, মহেশ চৌধুরি লোক ভালো নয়। তখন বিপিনের সাহচর্য সে সহ্য করিতে পারিত না। আজকাল মহেশ চৌধুরির একসুরে বাঁধা মনোবীণার একঘেয়ে ঝংকারগুলি একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তোলায় বিপিনের মধ্যেও হঠাৎ সে কিছু কিছু বৈচিত্র্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। বিপিনের কাছে আর তাই মহেশ চৌধুরির সম্বন্ধে কোনো রকম মন্তব্য করে না, মহেশ চৌধুরির কাছে বিপিনকে বিশেষণের পর বিশেষণে অভিনন্দিত করিয়া চলে—চালবাজ, মিথ্যুক, লোভী, অসংযত প্রভৃতি কত সংজ্ঞাই যে বিপিনকে সে দেয়।

বিপিনের প্রশংসায় মহেশ কিন্তু পঞ্চমুখ। কারও সম্বন্ধে মহেশ কখনও কোনো কারণেই মত বদলায় না—অন্তত স্বীকার করে না যে নিন্দা প্রশংসায় কারও সম্বন্ধে তার ধারণার কিছুমাত্র পরিবর্তন হইয়াছে। নিন্দা সে জগতে কারও করে না, একবার যার সে গুণগান করিয়াছে চিরকাল সমান উৎসাহের সঙ্গে তার সেই গুণকীর্তনই করিয়া যায়।

মাধবীলতার মুখে বিপিনের বিশেষণগুলি শুনিয়া সে একে একে বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিতে বসে যে, মাধবীলতা ভুল করিয়াছে, ও সব বিশেষণ বিপিনের প্রতি প্রয়োগ করা চলে না। বিপিন মহান, উদার, আত্মত্যাগী মহাপুরুষ—চাল বিপিনের নাই, মিথ্যা সে কখনও বলে না, লোভী সে নয়, সংযমের তার তুলনা নাই। বিপিনের ভীরুতার অপবাদটিরও মহেশ প্রতিবাদ করে।

মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলে, বিপিনবাবু ভীরু কাপুরুষ? কী যে তুমি বলো মা! ওঁর মতো বুকের পাটা কটা মানুষের থাকে?

মাধবীলতা রাগিয়া বলে, কী যে দেখেছেন আপনি বিপিনবাবুর মধ্যে! উনি যদি ভীরু কাপুরুষ নন, কে তবে ভীরু কাপুরুষ? শুনুন বলি তবে। আশ্রমের ক্ষতি করবেন ভয়ে আপনাকে উনি আশ্রমে নিতে ভরসা পাচ্ছেন না।

রাগের মাথায় ভিতরের মস্ত বড়ো কথা যেন ফাঁস করিয়া দিয়াছে এমনই গর্বভরা অনুতাপের ভঙ্গিতে মাধবীলতা একদৃষ্টে মহেশ চৌধুরির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। মহেশ চৌধুরি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া যায়। মনে হয়, ভিতরের আসল কথাটা জানিতে পারিয়া বুঝি চটিয়াই গিয়াছে! কিন্তু কথা শুনিয়া বুঝা যায় এত সহজে খেইহারা হইবার মানুষ সে নয়।

ভয় তো বিপিনবাবুর মিথ্যে নয় মা! আমাকে আশ্রমে ঠাঁই দিলে আশ্রমের ক্ষতির আশঙ্কা আছে বইকী! আমি হলাম মহাপাপী, আমার সংস্পর্শে—

বিপিনের ভীরুতার প্রমাণটি ফাঁসিয়া যায়। চালের উপরেই বিপিন চলে এ ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে কিন্তু উদাহরণ দাখিল করিতে গিয়া বিপিনের চালবাজির একটি দৃষ্টান্তের কথাও মাধবীলতা আগে এতদিন অনেক চেষ্টাতেও মনে করিতে পারে নাই। বিপিনের ভীরুতার কয়েকটি জোরালো দৃষ্টান্ত আজ সে কোনো রকমেই স্মরণ করিতে পারে না। বিপিন ভীরু সন্দেহ নাই, কিন্তু কবে কোথায় সে ভীরুতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে?

ভাবিতে গেলে সত্যই বড়ো বিস্ময় বোধ হয়। বিপিনের কি তবে দোষ বলিয়া কিছুই নাই? অভাব কেবল তার গুণের? সদগুণ একেবারে নাই বলিয়াই লোকটার চালচলন এমন নিন্দনীয় মনে হয়? সংসারে মানুষ হয় ভালোমন্দ মেশানো, কারও মধ্যে ভালো থাকে বেশি কারও মধ্যে কম, কিন্তু বিপিনের মধ্যে ভালোর নামগন্ধও নাই। তাই কি বিপিনকে মনে হয় খারাপ লোক, যদিও তার মধ্যে মন্দের ভাগটাও খুঁজিয়া মেলে না? কথাটা যেন দাঁড়াইয়া যায় ধাঁধায়—ভালোও নাই মন্দও নাই, কী তবে আছে বিপিনের মধ্যে? কীসের মাপকাঠিতে মানুষ তাকে মানুষ হিসাবে বিচার করিবে? তাকে কি ধরিয়া নিতে হইবে নিন্দা প্রশংসার অতীত মহামানব বলিয়া?

বিপিন মহামানব ! ভাবিলেও মাধবীলতার হাসি আসে। কিন্তু ধারণা দিয়া—আপনা হইতে মনের মধ্যে যে সব ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে সেই ধারণাগুলি দিয়া—বিপিনের বিচার না করিলে, বিপিনের দোষগুণ নিরপেক্ষভাবে ওজন করিতে বলিলে, বিপিন সত্যই পরিণত হয় মহামানবে।

নিজের সমস্যাগুলি নিয়া অত্যন্ত বিব্রতভাবে বিপিনের দিন কাটিতেছে, মাধবীলতার খবর নেওয়ার সময়ও বিশেষ পাইতেছে না, এমন সময় বিভূতি একদিন বাড়ি ফিরিয়া আসিল। মহেশের অসুখ উপলক্ষে তাকে বাড়ি ফিরিতে দেওয়া হইয়াছে। না বলিয়া গ্রাম ত্যাগ করিতে পারিবে না, সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত বাড়িতে থাকিবে।

ছেলের চেহারা দেখিয়া বিভূতির মা কাঁদিয়াই আকুল। মহেশ বলিল, কাঁদছ কেন ? পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না ?

বিভূতি বলিল, খিদে পেয়েছে মা, খেতে দাও। খালি খেতে দাও, দিনরাত শুধু খেতে দাও, আর কিছু নয়।

পরদিন ভোরবেলা মহেশ ছেলেকে নিয়া সদানন্দের চরণ বন্দনা করিতে বাহির হইল। চরণ বন্দনার উদ্দেশ্যে আশ্রমে যাইতেছে এ কথা অবশ্য বিভূতিকে জানাইল না, শুধু বলিল, আমাদের একবার আশ্রম থেকে ঘুরিয়ে আনবি চল তো।

কী হবে আশ্রমে গিয়ে ? অ্যাদ্দিন পরে এলাম, গাঁয়ের সকলের সঙ্গে দেখাটেকা করি ?

পরে দেখা করিস। আগে আশ্রম থেকে ঘুরে আসবি চল।

কিন্তু বিভূতির কাছে আশ্রমের কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। গ্রামের চেনা মানুষগুলির সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই মনটা তার ছটফট করিতেছিল। তার আসিবার খবরটা সে আসিয়া পৌঁছিবার অনেক আগেই গ্রামে ছড়াইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই, তবু কাল কেউ তাকে দেখিতে আসে নাই বলিয়া বিভূতি একটু আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে। তার সংস্পর্শে আসিতে কয়েকজনের ভয় হওয়া সম্ভব, অন্তত ভয় ভাঙিতে কিছুদিন সময় লাগিবে, কিন্তু চোবা গাইয়ের সঙ্গে কপিলা গাইয়ের বাঁধা পড়িবার আতঙ্কটা কি সকলের মধ্যেই এত বেশি প্রচণ্ড যে একজন তার খবর নিতেও আসিল না ?

না আসুক, বিভূতি নিজেই সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া ভয় ভাঙাইয়া দিয়া আসিবে। আশ্রমে যাওয়ার প্রস্তাবে সে তাই ইতস্তত করিতে থাকে।

আশ্রমে যাওয়ার নামে মাধবীলতা আনন্দে ডগমগ হইয়া বলে, তাই চলুন, আশ্রম দেখে আসবেন।

বিভূতি হাসিয়া বলে, আশ্রম দেখা কী আর আমার বাকি আছে, ঢের দেখেছি।

সে আশ্রম আর নেই, কত পরিবর্তন হয়েছে দেখে অবাক হয়ে যাবেন।

বিভূতির জেলে যাওয়ার আগে সদানন্দের আশ্রম কেমন ছিল এবং তারপর আশ্রমের কী পরিবর্তন হইয়াছে মাধবীলতার জানিবার কথা নয়, এটা তার শোনা কথা। মাধবীলতার উৎসাহ দেখিয়া বিভূতি আর আপত্তি করিল না, তিনজনে আশ্রমের দিকে রওনা হইয়া গেল—মহেশ, মাধবীলতা আর বিভূতি। বিভূতির মা গেল না, বলিল, আশ্রম মাথায় থাক, তোমরা ঘুরে এসো।

বাড়ির সামনে কাঁচাপথ ধরিয়া তিনজনে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে, শশধর আসিয়া জুটিল। আশ্রমে যাওয়ার একটা সুযোগও শশধর ত্যাগ করে না।

মহেশ মাধবীলতাকে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁটতে পারবে তো মা ?

মাধবীলতা হাসিয়া বলিল, আমাকে জিজ্ঞেস না করে বরং আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন।

মহেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দুর্গা, দুর্গা। সত্যি ওর চেহারাটা বড়ো খারাপ হয়ে গেছে।

আশ্রমে পৌঁছিয়া প্রথমেই দেখা হইয়া গেল রত্নাবলীর সঙ্গে। মাধবীলতাকে দেখিয়া সে একগাল হাসিয়া বলিল, বেঁচে আছিস ?

মহেশ তাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ মা ?

কাছেই একটা মোটা গাছের গুঁড়ি পড়িয়াছিল, কদিন আগে গাছটা কাটা হইয়াছে। বিভূতি গুঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া পড়িল, কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া সে আর নড়িবে না।

মাধবীলতা বলিল, কাঠপিঁপড়ে হুল ফুটিয়ে দেবে কিন্তু।

বিভূতি বলিল, দিক, গোখরো সাপ কামড়ালেও এখন আমি নড়ছি না।

তখন সেইখানে কাঠের গুঁড়িতে বসিয়া সকলে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল। শীতের সকালের প্রথম মিষ্টি রোদ আসিয়া পড়িতে লাগিল সকলের গায়ে। আরামে এমন জমিয়া উঠিল আলাপ যে মনে হইতে লাগিল, সদানন্দের চরণ বন্দনার কথাটা মহেশও ভুলিয়া গিয়াছে ! কিছুক্ষণ পরে কুটির হইতে বাহির হইয়া তাদের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার সময় স্বয়ং সদানন্দকেও কেউ দেখিতে পাইল না। খেয়াল হইল সদানন্দ যখন সামনে আসিয়া রোদ আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

প্রথমে প্রণাম করিল মহেশ, তারপর মামার অনুকরণে শশধর। রত্নাবলী প্রণাম করায় মাধবীলতাও ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম ঠুকিয়া দিল।

সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ মাধু ?

মাধবী বলিল, ভালোই আছি।

মহেশ বিভূতিকে বলিল, এঁকে প্রণাম করো।

আগের কথা সদানন্দের মনে ছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, থাক, থাক।

মহেশ জোর দিয়া আবার বলিল, প্রণাম করো বিভূতি, এঁর আশীর্বাদে তুমি ছাড়া পেয়েছ।

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিভূতি উঠে নাই। বসিয়া থাকিয়াই সে দু-হাত একত্র করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল, নমস্কার, ভালো আছেন ? অনেকদিন পরে দেখা হল। আপনার আশীর্বাদ গবর্নমেন্টকেও টলিয়ে দিতে পারে তা তো জানতাম না !

সদানন্দ শান্তভাবে বলিল, আমার বলে নয়, আশীর্বাদ আন্তরিক হলে ভগবানকে পর্যন্ত টলিয়ে দিতে পারে বাবা।

বিভূতি আরও বেশি শান্তভাবে বলিল, ভগবানের কথা বাদ দিন, তিনি তো সব সময়েই টলছেন মাতালের মতো। টাল সামলাতে প্রাণ বেরোচ্ছে আমাদের।

মাধবীলতা চোখ বড়ো বড়ো করিয়া বিভূতির দিকে চাহিয়া থাকে। রত্নাবলীর সাদা দাঁতগুলি ঝকঝক করে। অস্থির হইয়া ওঠে মহেশ। কী করিবে ভাবিয়া না পাইয়াই যেন প্রথম দিকে ব্যাকুলভাবে শুধু বলিয়া চলে, 'আহা', 'ওকি' আর 'ছি ছি'। তারপর হঠাৎ রাগ করিয়া, সোজা আর শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া, গম্ভীরকণ্ঠে ডাকে, বিভূতি !

বসা অবস্থাতেই সোজা আর শক্ত হইয়া বিভূতি বলে, কেন ?

পায়ে হাত দিয়ে এঁকে প্রণাম করো, নিজের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও।

এঁকে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছা হয় না বাবা। ক্ষমা চাওয়ার মতো অন্যায় কথা কিছু বলিনি।

এঁকে আমি দেবতা মনে করে পূজা করি, আমার ছেলে তুই, এঁকে তোর প্রণাম করতে ইচ্ছা হয় না ? যা মনে এল বলে বসলি মুখের ওপর, তবু তোর কথা বলা হল না ?

বিভূতি নীরবে মাথা নাড়িল।

করবি না প্রণাম ?

না।

এবার প্রশান্তকণ্ঠে সদানন্দ বলিল, মহেশ, কী ছেলেমানুষি আরম্ভ করে দিলে তুমি ?

ছেলেমানুষি প্রভু ?

তুমি কী ভাব ওর প্রণাম পাওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে আছি ?

তা ভাবিনি প্রভু। ও প্রণাম করুক না করুক আপনার তাতে কী আসবে যাবে—সর্বনাশ হবে ওর নিজের। ও যে আমার সন্তান প্রভু ?

সদানন্দ অভয় দিয়া বলিল, ভয় নেই, ওর কিছু হবে না। প্রণাম নিয়ে আমি আশীর্বাদ বিক্রি করি না মহেশ, আশীর্বাদ করাটা আমার ব্যাবসা নয়, ভুলে যাও কেন ? ছেলেমানুষেব কথায় যদি আমি রাগ করি, আমি যে ওর চেয়েও ছেলেমানুষ হয়ে যাব।

মহেশ ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিল, তা কী জানি না প্রভু ? আপনি দেবতা, আপনার কি বাগদ্বেষ আছে ? কিন্তু আপনাকে প্রণাম না করলে ওর অকল্যাণ হবে।

অনিচ্ছায় প্রণাম করার চেয়ে না করাই ভালো, মহেশ।

না প্রভু। প্রণম্যকে প্রণাম করতেই হয়। প্রণাম করতে করতে মনে ভক্তি আসে। বিভূতি, প্রণাম করো এঁকে।

বিভূতি নীরবে মাথা নাড়িল।

মহেশ আবার বলিল, বিভূতি প্রণাম করো। এই দণ্ডে যদি প্রণাম না করো এঁকে, আমি যেমন আছি তেমনিভাবে যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যাব, কোনোদিন আব ফিরব না।

বিভূতি শুকনো মুখে কোনো রকমে বলিল, আমি পারব না বাবা।

মাধবীলতাব সব কথাতেই ফোড়ন দেওযা চাই। পিতার আদেশ আব মিনতি যেখানে ব্যর্থ হইয়া গেল, যেদিকে দু-চোখ যায় চলিয়া যাওয়ার ভয় প্রদর্শন পর্যন্ত কাজে লাগিল না, সেখানে কাতরকণ্ঠে বিভূতিকে অনুরোধ না জানাইযা সে পাবিল না, আহা, এমন করে বলছেন সবাই, করুন না প্রণাম একবারটি ?

এমন সময় আসিল বিপিন।

কারও দিকে বিপিন চাহিয়াও দেখিল না। সোজাসুজি মাধবীলতাব কৈফিয়ত দাবি করিয়া বলিল, আমায না জানিয়ে আশ্রমে এলে যে মাধু।

বিপিনের মুখ দেখিয়া আর গলার আওযাজ শুনিযা মাধবীলতার মুখ দিযা কথা বাহিব হইল না। মহেশ বলিল, আমি ওকে এনেছি বিপিনবাবু।

বিপিন তীব্রস্বরে ধমক দিয়া বলিল, চুপ করুন, আপনাকে আমি কিছু জিজ্ঞাসা কবিনি।

প্রকাশ্যভাবে কেউ কোনোদিন বিপিনকে উঁচু গলায কথা বলিতে শোনে নাই—বিশেষত সদানন্দের সামনে।

সকালবেলাই এমন একটা জটিল অবস্থা সৃষ্টি হইবে কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। মনে মনে সকলেই একটা শঙ্কা-জড়িত অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। বিভূতি সদানন্দকে প্রণাম করিতে অস্বীকার করায় যে খাপছাড়া কাণ্ড ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল, বিপিনের আবির্ভাবে এখনকার মতো সেটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্য ? মহেশ চৌধুরি ছাড়িবার পাত্র নয়। সে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে, বিভূতি সদানন্দের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম না করিলে যেদিকে দু-চোখ যায় চলিয়া যাইবে। বিপিনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হইয়া গেলেই সে আবার ছেলেকে নিয়া পড়িবে।

কিন্তু কী বোঝাপড়া হইবে বিপিনের সঙ্গে ? মহেশ চৌধুরি কি চুপ করিয়া থাকিবে বিপিনের ধমক সহ্য করিয়া ? ধমকটা সদানন্দ দিলে সকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিত, সদানন্দ এমন প্রচণ্ড শব্দে ধমক দিলে এতটা খারাপ শোনাইত না। মহেশ চৌধুরির মতো ভক্তকে ধমক দিবার অধিকার সদানন্দের মতো মহাপুরুষের থাকে এবং আগেও অনেকবার অনেক ছুতায় মহেশ চৌধুরিকে সে

অপমান করিয়াছে। সদানন্দের অপমান অনেকটা গা-সহা হইয়া আসিয়াছে মহেশ চৌধুরির। কিন্তু বিপিনের অপমান সে সহ্য করিবে কেন ? দুজনে যদি এখন কলহ বাধিয়া যায় !

মহেশ চৌধুরি কী বলে শুনিবার জন্য সকলে উৎকর্ণ হইয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরির মুখ দেখিয়া বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। বিপিনের ধমকটা তার কানে গিয়াছে কী না এ বিষয়েও যেন কেমন সন্দেহ জাগে ! চাহিয়া সে থাকে মাধবীলতার মুখের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য তার দৃষ্টি এমন তীক্ষ্ণ ও অস্বাভাবিক মনে হয় যে, এতদিনেব ঘনিষ্ঠ পবিচয়ের পর তার একটা নতুন রূপ আবিষ্কারের সম্ভাবনায় শশধর ও সদানন্দের কেমন ধাঁধা লাগিয়া যায়।

মহেশ চৌধুরির মুখ ধীরে ধীরে গম্ভীর হইয়া আসে। আকাশের দিকে একবার মুখ তুলিয়া উদাস কণ্ঠে সে বলে, মাধু আশ্রমে আসতে পাবে না হুকুম দিয়েছিলেন, আমি জানতাম না বিপিনবাবু !

মহেশ চৌধুরির ভঙ্গিটাই মারাত্মক। তার উপর হুকুম শব্দটা সকলের কানে যেন বিঁধিয়া যায়।

মাধবীলতার অপরাধক্লিষ্ট মুখের ম্লানিমায় স্নায়বিক মূঢ়তার ভাবটাই এতক্ষণ স্পষ্ট হইয়াছিল, তবে মহেশ চৌধুরি ছাড়া সেটা কেউ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছিল কিনা সন্দেহ। নিজের প্রয়োজনে কে আব ও ভাবে তবুণী মেয়ের মুখ দেখিতে শেখে ? সোজাসুজি ভীরুতা আর কোমলতার অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া নেওয়ায় কত ভালো লাগিতেছিল সকলেব, কেমন দরদ সকলে বোধ করিতেছিল মেয়েটার জন্য ! কিন্তু ও রকম বর্বরের মতো মায়া করা মহেশ চৌধুরিব ধর্ম নয়, ও বকম সংকীর্ণ স্বার্থপবতা ৩ার নাই। মানুষের এই স্বগত রসানন্দবূপী পিপাসা-সৃষ্টির আগ্রহ ক্ষয় হইযা যাওয়ায় অসংখ্য ছোটো ছোটো মুক্তির মধ্যে মহেশ শক্তি সঞ্চয় কবিয়াছে। মাধবীলতার ভীরু কোমল কাঁদো কাঁদো মুখখানা দেখিয়া মহেশ চৌধুরি ছাড়া আর কে বুঝিতে পারিত তার ভয় বা দুঃখ হয় নাই, আকস্মিক স্নায়বিক উত্তেজনায় সে একটু দিশেহারা হইয়া গিয়াছে ? খোঁচা দিয়া তাব আত্মমর্যাদার জ্ঞান জাগাইয়া তুলিবার এবং তার অবরুদ্ধ তেজকে মুক্তি দিবাব বুদ্ধি বা সাহস আর কার হইত ? সোনালি রোদের মতোই মাধবীলতার মুখে লালিমার আবির্ভাব ঘটিতে দেখিযা মহেশ আবাব বলে, এবাবকার মতো ওকে মাপ করুন বিপিনবাবু। আপনি ওকে বাবণ করেছেন জানলে—বিপিনের আদেশ অমান্য করায় মাধবীলতার যে অকথ্য অপবাধ হইয়াছে তার বিরাটত্ব অনুভব কবিয়া মহেশ চৌধুবি নিজেই যেন সংকুচিত হইযা যায, কোনো রকমে এবারকার মতো মেয়েটাকে বিপিনের ক্ষমা পাওয়াইয়া দিবার ব্যাকুলতায় যেন দিশেহাবা হইয়া যায। মাধবীলতার হইয়া সে যেন বিপিনেব পায়ে ধরিয়া বসিবে।

এবার মাধবীলতা ফোঁস করিয়া উঠে, বাবণ করেছেন মানে ? উনি বাবণ করবার কে ? বেশ করেছি আমি আশ্রমে এসেছি।

বিপিন বলে, আশ্রমটা বেড়াবাব জায়গা নয় মাধু।

মাধবীলতা ব্যঙ্গ কবিযা বলে, কী করবেন, মারবেন ?

সদানন্দ বলে, আহা, কী আরম্ভ করে দিয়েছ তোমরা ?

সে কথা কানে না তুলিয়া বিপিন রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলে, ছেলেমানুষি কোরো না মাধু। আমার সঙ্গে এসো।

মহেশ তাড়াতাড়ি সায় দিয়া বলে, যাও মা, যাও। বিপিনবাবুর সঙ্গে যাও।

মহেশ চৌধুরি ফোড়ন না দিলে হয়তো মাধবীলতার উদ্ধত ভাবটা ধীরে ধীরে নরম হইয়া আসিত। বিপিনের সংযমহারা রাগ দেখিতে ভিতরে ভিতরে তাব যেন কেমন ভালো লাগিতেছিল। সেদিন রাত্রের কথা মাধবীলতার মনে পড়িয়া গিয়াছে, বিপিন যখন তাকে মহেশ চৌধুরির বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছিল। সে রাত্রের স্মৃতি ভুলিবার নয়, মাধবীলতা ভুলিয়াও যায় নাই। হঠাৎ তার

খেয়াল হইয়াছে, সে রাত্রে বিপিন তার সঙ্গে যে আশ্চর্য ব্যবহার করিয়াছিল, তার মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সে যেখানে যাইতে চায় পাঠাইয়া দিবে, তাকে বাড়ি কিনিয়া দিবে, তার নামে ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবে, মাঝখানে কয়েকদিনের ছেদ দিয়া আজ দিনের আলোয় বিপিন যেন সেই ব্যবহারেরই জের টানিয়া চলিয়াছে। তফাত কেবল এইটুকু যে, মাঝখানের সময়টাতে সে যেন সত্যসত্যই নিঃসন্দেহে বিপিনের হইয়া গিয়াছে। বিপিনের রাগ আর ধমক দিয়া জোর গলায় কথা বলার মধ্যে পর্যন্ত মাধবীলতা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে বিপিন জোর খাটাইতেছে আত্মীয়তার, অন্য কিছু নয়। সে যেন বিপিনের মেয়ে বা বউ বা ওইরকম একটা কিছু।

কিন্তু মহেশ চৌধুরি ফোড়ন কাটায় এতগুলি মানুষের সামনে বিপিনের ব্যবহারে মেজাজটা তার চড়িয়াই যাইতে থাকে। সকলের সামনে এ ভাবে শাসন করিতে গেলে মেয়ে বা বউ চটিয়া যায় বইকী।

মাধবীলতা বিভূতির সামনে গিয়া দাঁড়াইল, বিপিনের দিকে পিছন ফিরিয়া।

চলুন আমরা ফিরে যাই বিভূতিবাবু। যাবেন ?

আমার ওখানে একবার আসবে না মাধু ?—সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিল।

মহেশ সঙ্গে সঙ্গে বলিল, যাও মা যাও, প্রভুর মন্দিরে একবার যাও।

মাধবীলতা জবাবও দিল না।

বিভূতি এতক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। মাধবীলতাকে সঙ্গে করিয়া সে বাড়ির দিকে রওনা হওয়ার উপক্রম করে, সকলে দাঁড়াইয়া থাকে কাঠের পুতুলের মতো। বিভূতি অস্বীকার করিয়াছে প্রণাম করিতে, মাধবীলতা ফিরিয়া চলিল আদেশ অমান্য করিয়া ! চারিদিকে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে নাকি সদানন্দের বিরুদ্ধে ? আশ্রমে দাঁড়াইয়া সদানন্দকে এ ভাবে অপমান আর অমান্য করা ! দাঁতের বদলে রত্নাবলীর চোখ দুটি চকমক করে। শশধর বোকার মতো হাঁ করিয়া থাকে। কী করিবে বুঝিতে না পারিয়া বিপিন অসহায় ক্রোধ দমন করার জন্য একটা বিড়ি ধরায়। সদানন্দের ভীতিকর গাম্ভীর্য ঘনীভূত হইয়া আসে। বিপিন আর সদানন্দ দুজনের মনেই প্রায় এক ধরনের অদম্য ইচ্ছা জাগে—ছুটিয়া গিয়া মাধবীলতাকে বগলদাবা করিয়া বিভূতিকে আথালিপাথালি প্রহার করা।

মহেশ ডাকে, বিভূতি।

বিভূতি দাঁড়ায় এবং মুখ ফিরাইয়া তাকায়। মাধবীলতা দাঁড়ায় কিন্তু মুখ ফিরায় না।

মহেশ বলে, এখানে এসো।

বিভূতি কাছে আসে এবং হাই তোলে। মাধবীলতা সঙ্গে আসে কিন্তু মুখ নিচু করিয়া থাকে।

মহেশ বলে, প্রভুকে প্রণাম করো।

সদানন্দ বলে, তুমি বড়ো বাড়াবাড়ি করছ মহেশ। সদানন্দের গলা কাঁপিয়া যায়।

মহেশ হাতজোড় করিয়া বলে, বাড়াবাড়ি প্রভু ? ও যদি আপনাকে এখন প্রণাম না করে আমার যে যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যেতে হবে প্রভু !

সদানন্দ বলে, তাই যাও তুমি, বজ্জাত কোথাকার ?

মহেশ তখনও হাতজোড় করিয়া বলে, ওকে প্রণাম না করিয়ে কেমন করে যাব প্রভু ?

সদানন্দ বাক্যহারা হইয়া থাকে। মহেশ বলে, বিভূতি প্রণাম করো প্রভুকে।

বিভূতি নড়ে না। সদানন্দ আগাইয়া গিয়া সশব্দে মহেশের গালে বসাইয়া দেয় এক চড়।

কিছু দূরে চালার নীচে আশ্রমের অধিকাংশ নরনারী জমা হইয়াছিল ; দু-চারজন করিয়া তখনও আসিয়া জুটিতেছিল। সদানন্দ আজ আত্মজ্ঞান লাভের প্রক্রিয়ায় ব্রহ্মচর্যের স্থান সম্বন্ধে উপদেশ দিবে। সকলে নিঃশব্দে সদানন্দের প্রতীক্ষা করিতে করিতে কাঠের গুঁড়িটার কাছে এদের লক্ষ করিতেছিল। ততদূর হইতে কথা বুঝা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু সকলের চলাফেরা আর অঙ্গভঙ্গির

নির্বাক অভিনয় দেখিয়া বেশ অনুমান করিতে পারিতেছিল যে রীতিমতো একটি নাটকীয় ব্যাপারই ঘটিতেছে। সদানন্দ আগাইয়া গিয়া মহেশ চৌধুরির গালে যে চড় বসাইয়া দিয়াছে, এটা তারা স্পষ্টই দেখিতে পাইল। হঠাৎ একটা জোরালো গুঞ্জনধ্বনি উঠিয়া আবার তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল।

সদানন্দ সকলের আগে একবার চাহিয়া দেখিল চালার দিকে। অনেক সাক্ষীর সামনেই মহাপুরুষ সদানন্দ সাধু মহেশ চৌধুরিকে মারিয়া বসিয়াছে বটে। এখন কেবল ঘটনাটা সকলের চোখে পড়িল, পরে বিস্তারিত বিবরণ শুনিবে।

রত্নাবলীর চোখ আর দাঁত দুইই তখন চকচক করিতেছে। মাধবীলতা একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়াছে ডান হাতেব চারটি আঙুল—ছেলেবেলায় মাধবীর এই অভ্যাসটা ছিল, বড়ো হইয়া কোনোদিন এ ভাবে সে মুখে আঙুল ঢুকাইয়া দেয় নাই।

থতোমতো খাইয়া গিয়াছিল সকলেই, কিন্তু দেখা গেল অবাধ্য বিভূতি বাপের অপমানের প্রতিকার করিতে বড়োই চটপটে। মহেশ চৌধুরির মোটা বাঁশের ছড়িটি কাঠের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া রাখা ছিল। চোখের পলকে লাঠিটা তুলিয়া নিয়া সে সদানন্দের দিকে আগাইয়া আসিল। দেশের জন্য মানুষ খুন করার কেবল পরামর্শ করাব জন্য এতগুলি বছর সে আটক থাকিয়া আসিয়াছে, আজ বাপের জন্য হয়তো সত্যসত্যই মানুষ খুন করিয়া বসিত। বাধা দিল মহেশ।

ছি বিভূতি, ছি !

বিভূতির হাতের লাঠি ছিনাইয়া নিয়া সদানন্দের পদতলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মহেশ চৌধুরি তার মাথা গুঁজিয়া দিল।

আপনাকে রাগিয়েছি, আমায় মাপ করুন প্রভু। ছেলে আমার আপনাকে লাঠি নিয়ে মারতে উঠেছিল, আমায় মাপ করুন প্রভু।

প্রায় আর্তনাদ কবার মতো চিৎকাব করিয়া বিভূতি বলিল, তোমার কী লজ্জাশরম নেই বাবা ?

কী বকছিস তুই পাগলের মতো ? প্রণাম কর বিভূতি, প্রভুকে প্রণাম কর। ও বিভূতি, শিগগির প্রণাম কর প্রভুকে। আমি না তোর বাপ বিভূতি ? আমার দেবতাকে মারবার জন্য তুই লাঠি তুলেছিস, হাত যে তোর খসে যাবে রে, কুষ্ঠ হবে যে তোর হাতে ! শিগগির প্রণাম কর বিভূতি, প্রভুকে শিগগির প্রণাম কর।

পাগল হইয়া গিয়াছে মহেশ চৌধুরি ? বিভূতি সভয় বিস্ময়ে সদানন্দের পদতলে বাপের সর্বাঙ্গীণ আত্মোৎসর্গ চাহিয়া দেখে আর তার অভিনব মন্ত্রোচ্চারণ শুনিয়া যায়। মাধবীলতা কানের কাছে ফিসফিস করিয়া বলে, প্রণাম করে নিন। তারপর ওঁকে নিয়ে বাড়ি যাই চলুন।

বিভূতি একটু ইতস্তত করিয়া সদানন্দকে প্রণাম করিবার জন্য আগাইয়া যায়। মহেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সদানন্দের পা দুটিকে মুক্তি দেয়। হাত জোড় করিয়া নিবেদন জানায়, প্রভু আশীর্বাদ কবুন ছেলের যেন আমার সুমতি হয়।

নয়

বিকালে মহেশ চৌধুরির বাড়িতে সকলে পিঠা পায়েস খাইতে বসিযাছে। খাওয়ার জন্য বিভূতির লুব্ধ ব্যাকুলতা দেখিয়া তার মার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। ছেলে বাড়ি ফেরার পর বিভূতির মা আজকাল কেবল নানা রকম খাবারই তৈরি করে। বিভূতি খাইতে পারে না, সামান্য কিছু খাইলেই তার পেট ভারিয়া যায়, দুর্ভিক্ষ পীড়িতের মতো উগ্র খাওয়ার লোভের তার তৃপ্তি হয় না। তার চাহনি দেখিয়া কত কথাই যে মাধবীলতার মনে হয়। হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া মাথায় সে একটা ঝাঁকুনি দেয়।

ভিতরের চওড়া বারান্দায় অর্ধচন্দ্রাকারে সকলে বসিয়াছে, মুখোমুখি হওয়ার সুবিধার জন্য। বৈকালিক জলখাবার শেষ হইতে কোনো কোনো দিন দু-ঘণ্টা সময়ও লাগিয়া যায়। রাজ্যের কথা আলোচনা হয় এই সময়। আজ কথাবার্তা তেমন জমিতেছিল না। সকালের ঘটনায় একমাত্র মহেশ চৌধুরি ছাড়া সকলেই কমবেশি অস্বস্তি বোধ করিতেছে।

হঠাৎ বিভূতি বলিল, আচ্ছা বাবা, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ?

মহেশ চৌধুরি হাসিয়া বলিল, কে আগে কথা তোলে দেখছিলাম। পাগলামি মনে হয়েছে তোদের, না ? কেন বল তো ? পাগলের কথা কাজ কোনো কিছুব মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, আমি তো খাপছাড়া কিছু বলিয়োনি, কিছু করিয়োনি।

বলোনি ? করোনি ?

না। আমি আবোল-তাবোল কথা কোনোদিন বলি না, খাপছাড়া কাজ করি না। মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যেতে পারে, তা সেটা সবারই হয়।

এ রকম অহংকার তো কখনও দেখিনি তোমার ! নিজেকে প্রায় মহাপুরুষ দাঁড় করিয়ে দিচ্ছ।

মহেশ চৌধুরি মাথা নাড়িল, তা করিনি, একটা সোজা সত্যকথা বলেছি। তোর অহংকার মনে হল কেন জানিস ? তোর সঙ্গে কথা বলার সময় আমাব মনে আছে তুই আমার ছেলে, কিন্তু আমাব বিচার করার সময় তুই ভুলে যাচ্ছিস যে আমি তোর বাপ। কথাটা প্রভুকে বললে অন্যভাবে বলতাম—শুনলে আমার বেশি বিনয় দেখে তুই চটে যেতিস, তখন তোর খেয়াল থাকত যে আমি তোর বাপ, আর নিজের বাপের আত্মমর্যাদা জ্ঞানের অভাব দেখে লজ্জায় দুঃখে অপমানে তোর মাথা হেঁট হয়ে যেত।

এ ভাবে মহেশ চৌধুরিকে কথা বলিতে মাধবীলতা কখনও শোনে নাই। সে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে মহেশ চৌধুবির কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মহেশ চৌধুরি আবার বলিল, আত্মমর্যাদা বলতে তোরা কী বুঝিস জানিস ? ফাঁকা গর্ব, গোঁয়ারতুমি। মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষ ছাড়া তোদের আত্মমর্যাদা টেকে না, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের ঠোকাঠুকি লাগবে, দরকার হলে প্রকাশ্যেও হাতাহাতি হয়ে যাবে, লাঠি মারতে উঠবি, তবে তোদের আত্মমর্যাদা খাড়া থাকতে পারবে। কী বলো মাধু, তাই নয় ?

মাধবীলতার মুখ ভর্তি ছিল, খাবারটা গিলিয়া কথা বলিতে হওয়ায় বড়োই সে লজ্জা পাইল। কী জানি, ও সব বড়ো বড়ো দার্শনিক কথা ভালো বুঝি না।

মহেশ চৌধুরি হাসিয়া বলিল, বড়ো বড়ো দার্শনিক কথা আবার কখন বললাম ? জানলে তো বলব ! আচ্ছা, কথাটা বুঝিয়ে বলছি তোমাকে।

থাক না, আমার না বুঝলেও চলবে।

উঁহুঁ, তা চলবে না। কথাটা তোমায় না বুঝিয়ে ছাড়ব না।

মহেশ চৌধুরির একগুঁয়েমিতে মাধবীলতার হঠাৎ বড়ো হাসি পায়। মনে হয়, সে যদি কথাটা না বুঝে, সদানন্দের চরণ দর্শনের জন্য একদিন যেমন ধন্না দিয়াছিল, আজ সকালে যেভাবে বিভূতিকে সদানন্দের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করাইয়াছে, তেমনই একটা কিছু কাণ্ড মহেশ চৌধুরি আরম্ভ করিয়া দিবে।

বুঝেও যদি না বুঝি ?

মহেশ চৌধুরি শান্তভাবে বলিল, হেসো না, হাসতে নেই। বুঝবে বইকী, বললেই বুঝবে। শোনো বলি। সকালে বিপিনবাবুর সঙ্গে যে ঝগড়া করলে, মানুষটার মনে কষ্ট দিয়ে বাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করলে, আত্মমর্যাদা বাঁচাবার জন্য তো ? তুমি ভাবলে, বিপিনবাবুর সঙ্গে ভালোভাবে কথা বললে সবাই তোমাকে ভীবু অপদার্থ মনে করবে, লোকের কাছে তোমার অপমান হবে।

ব্যাপারটা কী বিশ্রী দাঁড়িয়ে গেল বলো তো ? তুমিও উলটে-পালটে সারাদিন ওই কথাই ভাবছ, বিপিনবাবুও ভাবছেন। তোমাদের দুজনের মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি যদি হাসিমুখে দুটো মিষ্টিকথা বলতে, একমুহূর্তে বিপিনবাবুর রাগ জল হয়ে যেত। তুমিও চাইছিলে ঝগড়া না হয়ে বিপিনবাবুর সঙ্গে ভাব হোক, বিপিনবাবুও তাই চাইছিলেন—আত্মমর্যাদা বাঁচাবার জন্য তোমাদের ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। তোমরা সকলকে হিংসা কর কিনা তাই এমন হয়। নিজের যাতে কোনো ক্ষতি নেই পরের জন্য সেটুকু ত্যাগও করতে পার না।

মাধবীলতা কথা বলিল না।

বিভূতি বলিল, গালে যে চড় মারে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ার চেয়ে ও রকম ঝগড়া ঢের ভালো।

মহেশ চৌধুরি বলিল, গালে চড় মেরেছেন, প্রভুর সঙ্গে আমার কি শুধু এইটুকু সম্পর্ক বিভূতি ? আমি তো চিরদিন প্রভুর পায়ে লুটিয়ে আসছি ? প্রভুকে যদি আগে থেকে দেবতার মতো ভক্তি না করতাম, আজ গালে চড় মারার পর মানুষকে আমার ক্ষমা আর সহিষ্ণুতা দেখাবার জন্য প্রভুর পায়ে ধরতাম, তা হলে অন্যায় হত। তার মানে কী দাঁড়াত জানিস ? আমি যেন প্রভুর চেয়ে বড়ো। কিন্তু প্রভুর সম্বন্ধে আমার অহংকার নেই, দীনতা নেই, উদারতা নেই—আমি সোজাসুজি তাঁকে দেবতার মতো ভক্তি করি। গালে যখন উনি চড় মারলেন, আমি বুঝতে পারলাম উনি ভয়ানক রাগ করেছেন। আমার মনে বড়ো কষ্ট হল, তাই ওঁর পায়ে ধরলাম। উনি আমায় বড়ো ভালোবাসেন বিভূতি—আমায় মারার জন্য না জানি মনে মনে কত কষ্ট পাচ্ছেন।

বিভূতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, মানুষের পক্ষে মানুষকে দেবতার মতো ভক্তি করা—

মহেশ চৌধুরি সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া বলিল, উচিত নয়। মানুষ কখনও মানুষকে দেবতার মতো ভক্তি করে না। কিন্তু সংসারে কটা মানুষ আছে বলো তো ? যে মানুষ নয় সে মানুষকে দেবতার মতো ভক্তি করবে না কেন বলো তো ? সবাই যদি মানুষ হত বিভূতি, পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে যেত।

এবারও বিভূতি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার কথা ঠিক নয় বাবা। একজন মানুষ আর একজনকে দেবতার মতো ভয়ভক্তি করে বলেই সংসারে এত বেশি অমানুষ আছে—সবাই মানুষ হতে পারছে না। একজন মানুষের চাপে আর একজন কুঁকড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে কথা থাক—আমাকে কেন তুমি জোর করে ওঁকে প্রণাম করালে ? আমি তো ওঁকে দেবতার মতো ভক্তি করি না। বরং—

মহেশ চৌধুরি তাড়াতাড়ি বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। তুই আমার ছেলে বলে তোকে প্রণাম করিয়েছি। তুই ভক্তি করিস বা না করিস সে কথা ভিন্ন, তোকে দিয়ে ওঁকে প্রণাম করাবার ক্ষমতা থাকতেও যদি প্রণাম না করাতাম, আমার পক্ষে সেটা অন্যায় হত। অন্য কাউকে তো আমি জোর করে প্রণাম করাই না !

বিভূতি মুখভার করিয়া বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর হঠাৎ স্বয়ং সদানন্দ মহেশ চৌধুরির বাড়ি আসিল।

সকলে ভাবিল, বুঝি সকালবেলা মহেশ চৌধুরির গালে চড় মারার প্রতিবিধান করিতে আসিয়াছে। ভক্তকে সদানন্দ আজ অনেক আদর করিবে।

মহেশ চৌধুরি তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া বলিল, প্রভু ?

সদানন্দ বলিল, মহেশ, বিপিন আমাকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই তোমার কাছে এলাম। তোমার বাড়িতে থাকব।

দশ

এ কথা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল যে সদানন্দ সাধুর আশ্রম হইতে সদানন্দ সাধুকেই তাড়াইয়া দেওয়া হইবে ! অন্য সকলের মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝা গেল, কথাটা সত্যই কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই, কেবল মহেশের ভাব দেখিয়া মনে হইল না সে বিশেষ অবাক হইয়াছে। সে যেন এ রকম একটা কিছু প্রত্যাশাই করিতেছিল। বিস্ময় প্রকাশ করার বদলে সে দেখাইল রাগ !

বটে ! বিপিনবাবুর স্পর্ধা তো কম নয় !

তারপর সদানন্দের সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাতজোড় করিয়া ঊর্ধ্বমুখে সদানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, আপনি আমার এখানে থাকবেন প্রভু ? আমার এত বড়ো সৌভাগ্য হবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আজ জীবন সার্থক হল। এ বাড়ি আপনার, এ বাড়ির মেয়েপুরুষ আপনার দাসদাসী।

ব্যাপারটা কী হইয়াছে, কেন বিপিন হঠাৎ সদানন্দকে আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, এ ক্ষমতা বিপিন কোথায় পাইল, সকলের মনে এ ধরনের কত যে প্রশ্ন জাগিতেছিল হিসাব হয় না। কিন্তু সদানন্দকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সাহস কারও নাই। ভরসা না পাওয়ার জন্যই হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক মহেশ চৌধুরিও এ বিষয়ে একেবারে মুখ বুজিয়া ছিল।

অন্য কেউ কথা তুলিবে ভাবিয়া মাধবীলতা একটু অপেক্ষা করে, তারপর খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া বলিয়া বসে, আপনাকে তাড়িয়ে দিলেন কেন বিপিনবাবু ?

সদানন্দ কিছু বলিবার আগেই মহেশ চৌধুরি বলে, কী যে তুমি বল মাধু ? তাড়িয়ে আবার কে দেবে প্রভুকে ? উনি রাগ করে চলে এসেছেন তাও বুঝতে পার না ?

সদানন্দ বলে, না মহেশ, বিপিন আমায় তাড়িয়েই দিয়েছে।

মহেশ বলে, তাই কী হয় প্রভু ! আপনাকে তাড়াবার ক্ষমতা কারও নেই।

সদানন্দ বলে, তা আছে বইকী। আশ্রমটা বিপিনের সম্পত্তি। আমি আশ্রমের শিক্ষক হিসাবে ছিলাম, ক-বছরের মাইনে ছাড়া আর কিছু দাবি করতে পারব না। বিষয়বুদ্ধি তো নেই---

আপনার বুদ্ধির কাছে বিপিনবাবুর বিষয়বুদ্ধি ! মহেশ চৌধুরি একগাল হাসে, ক-বিঘা মেঠো জমি বিপিনবাবু নিজের নামে লিখে নিয়েছেন, আপনি জয় করেছেন মানুষগুলিকে। আশ্রম কখনও বিপিনবাবুর সম্পত্তি হতে পারে প্রভু ? আপনাকে নিয়ে তবে তো আশ্রম ! আপনি যেখানে থাকবেন সেখানটাই হবে আশ্রম। আপনি যখন চলে এসেছেন, আপনার সঙ্গে আশ্রমও চলে এসেছে।

সজোরে নিশ্বাস ফেলিয়া গভীর আপশোশের সঙ্গে মহেশ আবার বলে, প্রথমটা রাগ হয়েছিল, এখন আবার বিপিনবাবুর জন্য মায়া হচ্ছে। বুদ্ধির দোষে মানুষ কী সর্বনাশটাই নিজের করে।

মহেশ চৌধুরি সদানন্দের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিল। মহেশ চৌধুরির ঘরবাড়ি সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, ঘষা-মাজা ধোয়া-মোছা নিয়া বিভূতির মা সব সময়েই ব্যস্ত হইয়া আছে। সবচেয়ে ভালো ঘরখানায় তাড়াতাড়ি সদানন্দের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। পিতামহের আমলের প্রকাণ্ড খাটে আনকোরা নতুন তোশক পাতা হইল—একটু ছোটো হইল তোশকটা। তা হোক, লোকের ব্যবহার করা তোশক তো আর সদানন্দকে দেওয়া যায় না। তোশক ঢাকা পড়িল গায়ে দেওয়ার মুগার চাদরে। বালিশের বদলে দেওয়া হইল ঝালর দেওয়া তাকিয়া, কেবল বিশেষ উপলক্ষে আসর পাতা হইলে যেগুলি কাজে লাগে। ঘরের এককোণে পড়িল ঘরে বোনা কার্পেটের আসন, দুপাশে জ্বলিতে লাগিল ধূপধুনা আর কোণ ঘেষিয়া একটি মস্ত ঘিয়ের প্রদীপ। অভ্যর্থনার আরও কত ছোটোবড়ো আয়োজনই যে মহেশ চৌধুরি করিল ! কিছুকাল আগেও মহেশ চৌধুরির বাড়ি ছিল

নিস্তব্ধ, মহেশ আর তার ভাগনে শশধর এবং তাদের দুজনের দুটি স্ত্রী চুপচাপ এ বাড়িতে দিনরাত্রি কাটাইয়া দিত, কারও মধ্যে যেন প্রাণ ছিল না। তারপর মাধবীলতা আসিয়াছে, বিভূতি আসিয়াছে, আজ আসিল সদানন্দ—মাধবীলতার পদার্পণের পর সেই যে একটু জীবনেব সাড়া জাগিয়াছিল বাড়িতে, আজ যেন তা চরমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে বিশেষ একটি উৎসবে।

সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য আসিয়াছে, মুখে ফুটিয়াছে কথা। একজন কেবল আগেও যেমন চুপচাপ ছিল এখনও তেমনই চুপচাপ থাকিয়া গিয়াছে। সে শশধরেব ঘোমটা-টানা বউ। কোন ফাঁকে কখন বাড়ির কোন আড়াল হইতে আসিয়া সে যে সদানন্দের সামনে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল এবং আবার নিজের অন্তরালে চলিয়া গেল, কেউ খেয়ালও করিল কিনা সন্দেহ। শশধরের বউ যে বাড়িতে থাকে অধিকাংশ সময়ে তা টেরও পাওয়া যায় না।

মহেশ কেবল একবার একরাশি বাসন হাতে খিড়কি পুকুরে যাওয়ার সময় উঠানের কোণে পিছন হইতে তাকে পাকড়াও করিয়া বলিল, বউমা, তুমিই প্রভুর জন্য রান্না কোরো। চান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যেমন করে ঠাকুরদেবতার ভোগ রান্না কর না, ঠিক তেমনি করে।

শশধরের বউ মামাশ্বশুরের সঙ্গে কথা বলে না। ডাক শুনিযা মহেশ চৌধুরির দিকে পিছন করিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক সেই অবস্থাতেই ঘোমটাব মধ্যে মাথা নত করিয়া সে নীরবে সায় দিল। মহেশ চৌধুরি সরিয়া গেলে আর কিছু বলিবার নাই জানিযা আবার চলিতে আরম্ভ কবিল খিড়কির পুকুরের দিকে।

তারপর মহেশ জিজ্ঞাসা কবিতে গেল, শশধরের বউ স্নান করিয়া ভোগ রান্না করিযা দিলে সদানন্দের আপত্তি নাই তো ?

সদানন্দ বলিল, বাড়াবাড়ি কোরো না মহেশ, বাড়াবাড়ি কোরো না।

মহেশ বলিল, না, প্রভু।

সকলের জন্য যা রান্না হবে আমিও তাই খাব। আমার ও সব নেই জান তো ?

আপনি অনুমতি দিলে একটু বিশেষভাবেই বান্নাটা কবাই প্রভু। আশ্রমের কথা আলাদা, এখানে—

সদানন্দ হাসিয়া বলিল, তুমি আমায় টিকতে দেবে না মহেশ।

মহেশও হাসিয়া বলিল, আপনাকে আমি আব ছাড়ব না প্রভু, আজ থেকে আপনি আমার হয়ে গেলেন।

অন্য কেহ হইলে হযতো এ কথার জবাবে তামাশা করিয়া বলিত, আজ তোমাব সম্পত্তি হয়ে গেলাম মহেশ ? কিন্তু ও সব রসিকতা সদানন্দের আসে না। মহেশ যে তাকে সত্যসত্যই স্থায়ীভাবে এখানে আটকাইয়া ফেলিবার বিরাট আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে সদানন্দের এটা যেন ভালো লাগিতেছিল না। বিপিন একবার রাগ করিয়া আশ্রম হইতে কয়েকদিনের জন্য কিছু না বলিয়া যখন চলিয়া গিয়াছিল, আশ্রমের পাশের আমবাগানটি যেবার সে বাগাইয়া আনে, তখন বিপিনের জন্য তার কী রকম মন কেমন করিয়াছিল সদানন্দের মনে আছে। আজ নিজে রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াও তার তেমনই মন কেমন করিতেছে। সেবার যেমন কেবলই মনে হইত বিপিন ফিরিয়া আসিবে, আজ তেমনই আশা হইতেছে বিপিন হয়তো ডাকিতে আসিবে, হাতে পায়ে ধরিয়া তাকে ফিরাইয়া নিয়া যাইবে।

মহেশ চৌধুরি বলে, আশ্রম থেকে আপনার জিনিসপত্র সব আনিয়ে নিই প্রভু ?

সদানন্দ বারণ করিয়া বলে, না, না, এখন থাক। তাড়াতাড়ির কী আছে !

জন্মের মতো আশ্রম ত্যাগ করিয়া সদানন্দ চলিয়া আসিয়াছে, বলিয়া আসিয়াছে জীবনে আর কোনোদিন বিপিনের ওই জমিদারিতে সে পা দিবে না। আশ্রমের সঙ্গে আর তার কীসের

সম্পর্ক ? তবু তার নিজস্ব জিনিসপত্রগুলি যতক্ষণ আশ্রমে আছে একটু যেন যোগাযোগ বজায় রহিয়াছে ততক্ষণ আশ্রমের সঙ্গে, ওই যোগাযোগটুকুও ঘুচাইয়া ফেলিতে সদানন্দের ইচ্ছা হয় না। তা ছাড়া, সদানন্দের একটু ভয়ও হয়। জিনিসপত্রগুলি আনাইয়া নিলে বিপিন যদি আরও রাগিয়া যায়, তাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া নিয়া যাওযাব সাধ থাকিলেও যদি ওই কারণেই সে মতটা বদলাইয়া ফেলে !

মহেশ চৌধুরিও বোধ হয় এ সব কথা অনুমান করিতে পারে। সদানন্দের আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের পথে আরও একটু বাধা সৃষ্টি করিতে তার আগ্রহ দেখিয়া অন্তত তাই মনে হয়। জিনিসগুলি আনাইবার অনুমতি পাওয়ার জন্য সে পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। পরে আনাইলেও অবশ্য চলিবে, কিন্তু এখন আনাইলেই বা দোষ কী ? এক মুহূর্তের জন্যই বা সদানন্দ সামান্য একটু অসুবিধা ভোগ করিবে কেন ? মহেশের তো তা সহ্য হইবে না !

কিন্তু সদানন্দ কিছুতেই অনুমতি দেয় না। বলে, আজ থাক মহেশ। কাল যা হয় করা যাবে।

বিপিন তাকে হাতে পায়ে ধবিয়া ফিরাইয়া নিতে আসিবে সদানন্দের এ রকম আশা করাব একটু কারণ ছিল। বিপিন সতাই তাকে তাড়াইয়া দিযাছে। সহজ ভাষায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে, আমার আশ্রম ছেড়ে চলে যাও। সদানন্দও রাগ করিয়া চলিয়া আসিযাছে। তাকে এ ভাবে তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য বিপিনের মন খারাপ হওয়া আশ্চর্য নয়, তাকে ফিরাইয়া নিতে আসাও আর্শ্চয নয়।

সেদিন সকালে বিপিনের বিনা অনুমতিতে মাধবীলতাব আশ্রমে আসা এবং সদানন্দেব পায়ে বিভূতিকে প্রণাম করানো নিয়া যে কাণ্ডটা হইয়া গিয়াছিল তারপব সারাদিন বিপিন আর সদানন্দেব দেখা হয় নাই।

অনেক রাত্রে বিপিন সদানন্দের ঘরে আসিয়াই বলিয়াছিল, সদা, একটা কথা জিজ্ঞেস কবতে এলাম তোকে। আগের মতো আমার কথা শুনে চলবি কি চলবি না তুই ?

আমি কি তোর মাগনায় কেনা চাকব যে তোর সব হুকুম মেনে চলব ?

ও সব বাজে কথা থাক। তোর সঙ্গে কোনোদিন আমি ও বকম ব্যবহার করিনি, সে সম্পর্ক আমার নয় তোর সঙ্গে। আমার কথা শুনে চল মানে আমার হুকুম মেনে চলা নয়। নিজেই ভেবে দ্যাখ, আমি বুদ্ধি খাটিয়ে আশ্রমের উন্নতির ব্যবস্থা কবব, তুই আমাব একটা কথা মানবি একটা কথা মানবি না, তাহলে কি আশ্রম চলে ? আশ্রমের জন্য তোকে দরকাব আছে, কিন্তু আশ্রম চালাবার ক্ষমতা তোর নেই, তুই যদি—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। আসল কথাটা শুনি ?

বিপিন একটু চুপ করিয়া থাকিয়াছিল। রাগ করিবে না এবং তর্ক করিবে না ঠিক করিয়াই সে এখন সদানন্দের কাছে আসিয়াছে, কিন্তু আজকাল কথায় কথায় সদানন্দের সঙ্গে তর্ক করিতে ইচ্ছা হয়, ঝগড়া করিবার সাধ জাগে।

আসল কথাটা এই। আগে যেমন সব বিষয়ে আমার কথা শুনে চলতিস তেমনিভাবে যদি না চলিস, তোকে দিয়ে আমার কাজ হবে না।

না হলে কী কববি ?

তোকে বিদেয় দেব।

বিদেয় দিবি ! তোর তো স্পর্ধা কম নয়। তোকে কে বিদেয় দেয় ঠিক নেই—

আমার আশ্রম থেকে আমাকে কে বিদেয় দেবে ? বিপিন হাসিয়াছিল।

সদানন্দ সগর্বে বলিয়াছিল, আমি একটা মুখের কথা বললে সবাই তোকে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলবে তা জানিস ?

বিপিন নির্বিকারভাবেই বলিয়াছিল, বলেই দ্যাখ না মুখের কথাটা ?

কথাটার ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। সদানন্দ হুকুম দিলেও আশ্রমের কেউ বিপিনের বিরুদ্ধে যাইবে না। এ বিষয়ে সদানন্দের মনেও বরাবর একটা খটকা আছে। সকলে তাকে ভক্তি করে বটে কিন্তু তার সাধুতার মধ্যে যেমন ফাঁকি আছে, সকলের ভক্তির মধ্যেও তেমনই একটা ফাঁকি আছে বলিয়া সদানন্দের সন্দেহ হয়।

বিপিন একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিয়াছিল, তুই বড়ো বোকা সদা। সবাই ঢিপঢিপ করে প্রণাম করে আর তুই ভাবিস তোর জন্য প্রাণ দিতে সবাই ছটফট করছে। প্রাণ পাওয়া অত সহজ নয় রে ! আমি তোকে ভড়ং শিখিয়েছি, সেই ভড়ং করে লোকেব মনে তুই জন্মিয়েছিস একটা ভয়। তুই থাকিস একটা ধোঁয়ার আড়ালে, তোর সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না, সকলের সামনে মহাপুরুষেব মতো চলিস ফিরিস, সবাই তাই তোকে মহাপুরুষ ভেবে বেখেছে। কল্পনা জগতের অবাস্তব প্রমাণ দেখিয়ে দেখিয়ে তোকে আমার মহাপুরুষ দাঁড় কবাতে হয়েছে। তুই যে মহাপুরুষ নোস তার একটা বাস্তব প্রমাণও কেউ যাতে না পায় সেই জন্যই তোকে আমার লুকিয়ে রাখতে হয়। সকলে তোকে কী রকমেব ভয়ভক্তি করে জানিস ? কাল যদি আমি রটিয়ে দিই তোর অত্যাচারে মাধুকে আশ্রম ছাড়তে হয়েছে, সবাই তাই বিশ্বাস করে বসবে। মাধুকে নিয়ে কয়েকটা যে বোকামি করেছিস, সেগুলি হবে তার বাস্তব প্রমাণ। এত বড়ো সাধু তুই, কিন্তু তোর সাধুত্বের বাস্তব প্রমাণ নেই কিনা, তাই মাধুর সম্বন্ধে তোব বোকামির ওই কটা তুচ্ছ প্রমাণেই তোর সাধুত্ব ফেঁসে যাবে।

মাধুকে নিয়ে কী বোকামি কবেছি ?

জানিস না ? তা, নাও জানতে পাবিস ! চোর কী করে জানিস, যখন দরকার নেই তখন বেশি বেশি সাধু বনে থাকে, আব চুরি করার সময় ভাবে কেউ জানতে পারছে না। তবু চোর ধরা পড়ে জেলে যায়। আজ সকালেই তো সকলেব সামনে কেঁদে কেঁদে বললি, একবার আমাব ঘরে আসবে না মাধু ? আহা, একটা মেয়ের কাছে কী করুণ মিনতি মহাপুরুষ সদানন্দের ! মাধু মুখ ফিরিয়ে গটগট কবে চলে গেল। কথাটা কেউ মনে আনছে না তাই, কিন্তু একবাব যদি কেউ সুর তোলে, কারও দুবার ভাবতে হবে না কীসের মানে কী।

এবার সদানন্দ রাগ কবিযাছিল। বলিযাছিল, বিপিনের মনটাই কদর্য। কতদূব কদর্য, লাগসই উপমা দিযাও বুঝাইয়া দিয়াছিল। বিপিন যা ভাবে কেউ তা ভাবিবে না। সকলে তো বিপিন নয়, বিপিনেব মতো কুৎসিত মন তো নয় সকলেব, বিপিন যেমন বড়োলোকেব পা-চাটা, ফন্দিবাজ, হীন, বিশ্বাসঘাতক মানুষ—

তিন দিনের মধ্যে তুই আমার আশ্রম ছেড়ে চলে যাবি। আমি যাই হই, আশ্রমেব কুটোটি পর্যন্ত আমাব তা মনে রাখিস। তুই সত্যি আমাব চাকব—তোকে থাকবার কোয়ার্টার দিয়েছি, খেতে পরতে দিয়েছি, চাইলে মাইনে বাবদ কিছু টাকা পাবি, বাস। আর কোনো কিছু অধিকার তোব নেই।

আচ্ছা, রাজাসাহেবের সঙ্গে সে বোঝাপড়া হবে।

রাজাসাহেব ? বাজাসাহেব কী করবেন ? দুদিন আগে রাজাসাহেবেব যা খুশি করার ক্ষমতা ছিল, এখন আর নেই। এখন সমস্ত কিছুর মালিক আমি। তুই কী ভাবিস সেবার গিযে আমি শুধু আমবাগানটা বাগিয়ে এনেছি ? সব নিজের দখলে এনেছি। টাকা পয়সার মালিক তো ছিলাম প্রথম থেকেই, এবার জমিজমারও মালিক হয়েছি। কী করবেন বল রাজাসাহেব, ক-বিঘা জমিব জন্য ছেলেকে তো আর জেলে পাঠাতে পারেন না।

জেল !

আমি না বাঁচিয়ে দিলে মাধুর জন্য নারাণবাবুর জেল হত বইকী।

ও !

সদানন্দ চুপ করিয়াছিল অনেকক্ষণ।

আশ্রমের আয়ে প্রথম থেকে তোর অধিকার ছিল ?

ছিল বইকী। আমার নামে আশ্রম হল। আশ্রমের আয় আমার হবে না ? লোকসান হলেও অবশ্য আমার ঘাড়ে চাপত। প্রথমে ক-জনকে নিয়ে কতটুকু আশ্রম হয়েছিল মনে আছে সদা ? তখন তোরা ভাবতেও পারিসনি একদিন আশ্রম এত বড়ো হবে---দিনরাত কেবল কানেব কাছে ঘ্যানঘ্যান করতি, আশ্রম চলবে না, আশ্রম চলবে না। রাজাসাহেবও আশ্রমের এ রকম উন্নতির কথা ভাবতে পারেননি, তাই প্রথম দফার অল্প জমি আমাকে একেবারে দান করে দিয়েছিলেন। পরের দফায় যখন জমি দিলেন, তখন করলেন কী জানিস, এত সব অধিকার চেয়ে বসলেন যে আশ্রম নিয়ে যা খুশি করতে পারেন। আমি তাতেই রাজি হয়ে গেলাম। জানতাম, একদিন সমস্ত ক্ষমতা আবার আমার হাতেই ফিরে আসবে।

এক মুহূর্তের জন্য বিপিন থামিয়াছিল, তারপর আবার বলিয়াছিল, এ সব কথা তোকে বলতাম না, তোকে আর রাখা চলবে না বলেই বললাম। আমার আশ্রম ছেড়ে তুই চলে যা ভাই, দোহাই তোর। গোলমাল তুই করতে পারিস, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না, যেতে তোকে হবেই। গোলমাল না করে যদি চলে যাস, আশ্রমের এতদিনের লাভের একটা ভাগ বরং তোকে দেব, যতই হোক, এতদিন তো তুই আশ্রমের উন্নতিতে সাহায্য করেছিস, কিছু দাবি তোর আছে। ওই টাকায় যেখানে খুশি নিজের একটা ছোটোখাটো আশ্রম তুই খুলতে পারবি।

রাত্রি বাড়িবার জন্যই ঘরের আলোটার জ্যোতি যেন একটু ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল। দুজনে চুপ করিয়া থাকিয়াছে। বিপিন একবার ভালো করিয়া মুখখানা দেখিয়াছে সদানন্দের, সদানন্দ একবার ভালো করিয়া মুখখানা দেখিয়াছে বিপিনের। ব্যাপারটা গুরুতর তাই তারা ভিন্ন কে বুঝিবে কী গুরুত্ব সেই দেখার ! দুজনে তারা বন্ধু, বন্ধুর মধ্যে ছাড়া এমন ব্যাপার ঘটে না, এ রকম বিচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় না। সদানন্দ কী বলিত অনুমান করা কঠিন, বিপিন একটা খাপছাড়া কথা বলিয়া বসায় সে আর মুখ খোলে নাই।

আরও একটা জিনিস তোকে দিলাম সদা। মাধুকে তুই নিস। ওকে দিয়ে আমার আর দরকার নেই।

বিপিনের শেষ কথাটার কোনো মানে হয় ? মাধবীলতাকে সে দান করিয়া দিল, মাধবীলতা যেন তার সম্পত্তি ! আশ্রমটা সম্পূর্ণরূপে নিজের দখলে আনার জন্য এতদিন মাধবীলতাকে তার দরকার ছিল, এখন আর দরকার নাই তাই বন্ধুকে দিয়া দিয়াছে। কেমন লাগে কথাটা ভাবিতে ? মনটা কী রকম জ্বালা করে ? কে বলিয়াছে বিপিনকে, মাধবীলতাকে তার দরকার আছে ?

তবু বিপিনের কথার একটা ইঙ্গিত নিন্দনীয় অভিপ্রায়ের ধারাবাহিক অবাধ্যতার মতো মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়ায়। মাধবীলতাকে নিয়া সদানন্দ এবার যা খুশি করিতে পারে, বিপিনের দিক হইতে এতটুকু বাধার সৃষ্টি হইবে না। মাধবীলতাকে বিপিন আশ্রমে আনিয়াছিল কিন্তু ওর সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব তার শেষ হইয়া গিয়াছে। হয়তো এতটুকুই ছিল বিপিনের আসল বক্তব্য। মাধবীলতার সম্বন্ধে বন্ধুকে অভয় দেওয়া।

মহেশ যখন সদানন্দকে তার ঘরে একা বিশ্রাম করিবার সুযোগ দিয়াছে, সকলকে বারণ করিয়া দিয়াছে ঘরে যাইতে, তখন মাধবীলতা আসিয়া হাজির হয়।

ব্যাপার কী বলুন তো ?

এসো মাধু। বোসো।

বসছি, কিন্তু ব্যাপারটা কী হল ?

ব্যাপার আর কী হবে, ঝগড়া করে চলে এলাম। ও রকম স্বার্থপর ছোটোলোকের সঙ্গে মানুষের পোষায় ? এতদিন সহ্য করেছিলাম, আর সহ্য হল না।

মাধবীলতা মুখ গম্ভীর করিয়া বলে, আপনাদের দিয়ে কোনো ভালো কাজ হতে পারে না। খালি নিজেদের মধ্যেই মারামারি করবেন তো কাজ হবে কী। ছি ছি, নিজের নিজের স্বার্থচিন্তাই যদি করবেন দিনরাত, এ সব কাজে কেন আসেন আপনারা ?

সদানন্দ গম্ভীরভাবে একটু হাসিয়া বলে, স্বার্থচিন্তাই যদি করতাম মাধু, আশ্রম ছেড়ে আজ চলে আসতে হত না। বিপিনের বদলে আশ্রমটা আমিই দখল করতাম।

পারলে তা করতেন।

মাধবীর মন্তব্যে সদানন্দ রাগ করিয়া বলে, আমাকে কি তুমি বিপিনের মতো অপদার্থ ভাব ?

বিপিনবাবুকে আমি অপদার্থ ভাবি না।

মহাপুরুষ ভাব বুঝি ?

সদানন্দের ব্যঙ্গের জবাবে মাধবীলতাও ব্যঙ্গ করিয়া বলে, বিপিনবাবু কেন মহাপুরুষ হবেন, মহাপুরুষ তো আপনি !

মাধবীলতা আর সে মাধবীলতা নাই। সদানন্দের কাছে সব রকম চাপল্য হারাইয়া আর সে জড়সড় হইয়া যায় না, ভয়ে ভয়ে হিসাব করিয়া কথা বলে না, অনায়াসে ব্যঙ্গ করে। মাধবীলতার সঙ্গে সদানন্দের ব্যবহারও অবশ্য বদলাইয়া গিয়াছে। বাহিরের সকল ভক্তের সঙ্গে আলাপ করার অভ্যস্ত ভঙ্গিতেই প্রথম প্রথম সে মাধবীলতার সঙ্গে আলাপ করিত, মাঝে মাঝে সব গোলমাল হইয়া যাইত বটে কিন্তু তাও যেন ছিল ছেলেমানুষি ভাবপ্রবণতার আবরণে মানবীকে দেবতার প্রশ্রয় দেওয়া, দেবতার বাড়াবাড়ি অন্তরঙ্গতার জবাবেও যাতে মাথা তুলিবার সাহস মানবীর হয় না। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে মাধবীলতার সঙ্গে আলাপ করাটা তার নামিয়া গিয়াছে বিপিনের সঙ্গে আলাপ করার স্তরে।

মাধবীর আগের মন্তব্যে সদানন্দ রাগ করিয়াছিল, এবারকার ব্যঙ্গে হাসিয়া বলে, তোমার কাছে তাই বটে। আমাকে মহাপুরুষ না ভেবে তো তোমার উপায় নেই !

কেন ?

তোমাকে যে তাহলে দ্বিচারিণী হতে হবে।

মুখ মাধবীর লাল হয় না, বিবর্ণ হইয়া যায়। ধীরে ধীরে উঠিয়া সে বাহিরে চলিয়া যায়।

সদানন্দ নিচু গলায় ব্যগ্রভাবে বলে, রাগ করলে মাধু ? শোনো, শুনে যাও---

কিন্তু মাধবীলতা আজকাল বড়োই অবাধ্য হইয়াছে, কোনো কথাই শুনিতে চায় না।

সদানন্দ যতই আশা করুক, বিপিন তো আসেই না, আশ্রম হইতে কোনো শিষ্যও আসে না। সদানন্দ কারও কাছে কিছু বলিয়া আসে নাই, আশ্রমের শিষ্যদের কিছু জানাইবার কথা ভাবিতেও তার সংকোচ হইতেছিল। বিপিন তাদের কী বুঝাইয়াছে সেই জানে। হয়তো আশ্রমের কেউ এখনও জানিতেই পারে নাই, সদানন্দ চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে অথবা সদানন্দ রাগবাদায় মহেশ চৌধুরির বাড়িতে গিয়া উঠিয়াছে। হয়তো বিপিন তাদের বুঝাইয়াছে, সদানন্দ বিশেষ কারণে কিছুদিন মহেশ চৌধুরির বাড়িতে বাস করিতে গিয়াছে, তাকে গিয়া কারও দর্শন করা বারণ। বিশেষ কারণটাও হয়তো বিপিন সকলকে ইঙ্গিতে জানাইয়া দিয়াছে। মাধবীলতার আকর্ষণ।

মহেশ চৌধুরির বাড়িতে আসিয়া উঠিলে বিপিন যে এমন একটা ইঙ্গিত করার সুযোগ পাইবে, এখানে আসিবার আগে সদানন্দের সেটা খেয়াল হয় নাই। যাই হোক, এখন নানাভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথাটা সে ভাবে। মাধবীলতা এখানে আসিবার কয়েকদিন পরে সেও আসিয়া হাজির হইয়াছে, মাধবীলতার সঙ্গে তার নাম জড়াইয়া কলঙ্ক রটানোর পক্ষে এ একটা জোরালো যুক্তিই

বটে। ভাবিতে ভাবিতে মাথা গরম হইয়া উঠিলে এই বলিয়া সদানন্দ নিজেকে সান্ত্বনা দেয় যে, বিপিন কী বলিয়াছে কী বলে নাই না জানিয়া নিজের মনের অনুমান নিয়া বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ হয় না। হয়তো ক্ষতিকর কিছুই বিপিন বলে নাই, সদানন্দের অন্তর্ধানের একটা সাধারণ ও সঙ্গত কারণই সকলকে জানাইয়াছে। আর যদি সত্যসত্যই তাকে ফিরাইয়া নিয়া যাওয়ার ইচ্ছা বিপিনের জাগিয়া থাকে, তবে হয়তো সেই সঙ্গে এ কথাও সকলকে জানাইয়া দিয়াছে যে কয়েকদিন পরেই সাধুজি আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

আশ্রমের কেউ না আসুক, আশেপাশের গ্রামের নরনারী দলে দলে সদানন্দকে দর্শন ও প্রণাম করিতে আসে। প্রথমে ঝোঁকের মাথায় সদানন্দ এখানে সকলের কাছে নিজের আশ্রম ত্যাগের ভিতরের ব্যাপারটা ঘোষণা করিয়া ফেলিয়াছিল, তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া মহেশ চৌধুরিকে বলিয়া দিয়াছে, কথাটা কয়েকদিন যেন বাহিরে প্রকাশ না পায়।

এখন সকলকে জানিয়ো, আমি এমনি কয়েকদিন তোমার এখানে থাকতে এসেছি।

প্রভু ?

সদানন্দ বুঝিতে পারিয়াছে।

না, মিথ্যে কথা তোমায় বলতে বলিনি মহেশ। তোমরা যে জানো আমি কেন আশ্রম ছেড়ে এসেছি এ কথা অস্বীকার করবে কেন ? শুধু বলবে যে কারণটা এখন প্রকাশ করা হবে না।

পরদিন সকালেই দলে দলে দর্শনার্থীর সমাগম ঘটায় মহেশ বারণ না মানিয়া সব কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে ভাবিয়া সদানন্দ প্রথমটা বড়োই রাগিয়া যায়।

মহেশ চৌধুরি বলে, আজ্ঞে না, আমি কিছুই বলিনি। আপনি এখানে এসেছেন জেনে সকলে প্রণাম করতে আসছে।

আমি এখানে এসেছি এ কথাটাও এত তাড়াতাড়ি নাই বা ছড়িয়ে দিতে মহেশ ? দুদিন একটু শান্তিতে থাকতাম।

আপনি এসেছেন এ কথা কী ছড়িয়ে দেবার দরকার হয় প্রভু ? মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে যায়। সূর্যকে কী লুকিয়ে রাখা চলে প্রভু ! কাল সকালে যখন এলেন, তখনই গাঁয়ের অর্ধেক লোক জেনে গেছে আপনি এসেছেন। কালও অনেকে এসেছিল, আমি আপনাকে বিরক্ত করতে দিইনি। আজ আসতে বলে দিয়েছিলাম।

সকলে আসে, প্রণাম করিয়া যায় এবং অনেকে প্রণামিও দেয়। মাধবীলতা কাছে উপস্থিত থাকিলে কেউ কেউ কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকে দ্যাখে, কৌতূহলের সঙ্গে মেশানো থাকে ভয়। কে জানে মাধবীলতার সম্বন্ধে তাদের মনে কী কল্পনার ছায়া ভাসিয়া আসিতে শুরু করিয়াছে। মেয়ে দরকার হয় এমন সাধনাও তো সাধু পুরুষেরা করে, শবসাধনার মতো যে সব সাধনার কাল্পনিক বিবরণ শুনিলেই সাধারণ মানুষের রোমাঞ্চ হয়।

প্রণামি নিয়া একটু বিপদ হয়। প্রণামি নেওয়া হইবে কিনা সদানন্দও ঠিক করিতে পারে না, মহেশও ঠিক করিতে পারে না। প্রথমে মুখ খোলে মহেশ।

কী করব প্রভু ?

তুমি কী বলো মহেশ ?

আমার মনে হয় প্রণামি এখন না নেওয়াই ভালো। এখন প্রণামি নিলে যেন নিজের জন্য নেওয়া হবে প্রভু। আশ্রম খোলা হলে তখন আশ্রমের জন্য প্রণামি নিলে দোষের হবে না।

শুনিয়া সদানন্দ ভাবে, মহেশ তবে তাকে নিয়া নূতন একটি আশ্রম খুলিবার কল্পনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে ? কে জানে প্রথম হইতেই মনে মনে মহেশের এ মতলব ছিল কিনা ! হয়তো এ রকম একটা উদ্দেশ্য নিয়াই তাকে বাগানোর জন্য এতকাল মহেশ হাজার অপমান সহিয়াও আশ্রমে

যাতায়াত করিয়াছে, অতিভক্তির বন্যায় তাকে ভাসাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে। প্রথম প্রথম মহেশকে একটু বোকা মনে হইত, কিন্তু এখন সময় সময় তাকে সদানন্দের বিপিনের চেয়েও চালাক মনে হয়।

না, ঠিক বিপিনের চেয়ে চালাক নয়, বিপিনের চেয়ে বুদ্ধিমান মনে হয়। বিপিনের সঙ্গে মহেশের পার্থক্য এত বেশি প্রকট যে দুজনের বুদ্ধিকে এক শ্রেণিতে ফেলিতে মনে খটকা লাগে। মহেশও হয়তো বিপিনের মতোই ভালো উদ্দেশ্যে ভড়ং করে, মিথ্যার আশ্রয় নেয়, মনে মনে ধারণা পোষণ করে যে রোগীকে আর শিশুকে ভুলানোর মতো জগতের পীড়িত বয়স্ক শিশুগুলিকেও দরকার মতো ভুলাইলে দোষ হয় না, তবু যেন বিপিনের বেলা এ সব মনে হয় অন্যায় কিন্তু মহেশের বেলা অন্যায়ের প্রশ্ন মনেও আসে না।

তবে, এ কথাও সত্য যে বিপিনের ঘোরপ্যাঁচ বুঝা যায়। উদ্দেশ্য তার অতি মহৎ এটা বুঝা গেলেও প্যাঁচ যে কষিতেছে সে অতি জটিল, তাতে আর সন্দেহ থাকে না। মহেশের উদ্দেশ্য না বুঝিলেও কখনও জোর করিয়া ভাবা চলে না তার মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ আছে, মতলব হাসিল করিবার জন্য তলে তলে সে চালিতেছে চাল।

কেন এমন হয় ? দশজনের ভালোর জন্য একজনের সর্বনাশ করাটা বিপিন অন্যায় মনে করে না কিন্তু কারও সামান্য একটু ক্ষতি করার চিন্তা মহেশের পক্ষে মনে আনাও সম্ভব নয়, এই জন্য ? সদানন্দের মনে হয়, আরও অনেক কারণ আছে। মহেশের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ আছে, বিপিনের যা নাই। বিপিনের মধ্যে এমন কতকগুলি দোষ আছে, মহেশের যা নাই। কিন্তু আসল গুণ বা দোষ, যার শাখাপ্রশাখাই মানুষের মধ্যে ছোটোবড়ো নানারকম দোষগুণের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, মানুষের তো দশটা থাকে না ? কী সেই গুণ মহেশের এবং কী সেই দোষ বিপিনের অথবা কী সেই দোষের অভাব মহেশের এবং কী সেই গুণের অভাব বিপিনের যার জন্য দুজনের মধ্যে এতখানি পার্থক্য সম্ভব হইয়াছে ?

ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দ আনমনে বলে, আচ্ছা, এখন তবে প্রণামি নিয়ো না।

মনে হয়, সাধু সদানন্দ যেন মহেশ চৌধুরিকে এই কয়েকটি কথার মধ্যে নূতন একটি আশ্রম খুলিবার অনুমতিই দিয়া ফেলিয়াছে, মহেশ চৌধুরির মুখখানা আনন্দে এমনই উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

এগারো

দিন কাটিয়া যায়, আশ্রম হইতে বিপিনও আসে না, কোনো শিষ্যও আসে না। সদানন্দ আকাশ-পাতাল ভাবে মন খারাপ করিয়া। শিষ্যদের না আসিবার কারণটা যে সদানন্দ মোটামুটি অনুমান করিতে পারে না তা নয়। বিপিনের কোনো কারসাজি আছে নিশ্চয়। কিন্তু আশ্রমে কী এমন ভক্ত তার একজনও নাই বিপিনের কোনো কথায় কান না দিয়া যে তার সঙ্গে দেখা করিতে আসাটা দরকার মনে করে ? মুখখানা তার বড়ো বিমর্ষ দেখায়। কেউ সেটাকে ভাবে গাম্ভীর্য, কেউ মনে করে গভীর চিন্তার ছাপ। যে বুঝিতে পারে সাধু সদানন্দের মুখখানা বিষণ্ণ দেখাইতেছে সে ভাবে, সাধু-সন্ন্যাসী মানুষের আবার মন খারাপ হওয়া কেন ? মাধবীলতা মনের দুঃখে মাথা নাড়িয়া ভাবে, নাঃ, লোকটার একটুও মনের জোর নেই।

একদিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় বিনা খবরে রত্নাবলী আসিয়া হাজির হয়। সঙ্গে কেউ নাই। কার একটা মোটা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া একাই এতখানি রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়াছে।

মাধবীলতা চোখ কপালে তুলিয়া বলে, কী করে এলি !

রত্নাবলী হাসিয়া বলে, এলাম।

মাধবীলতা খুঁতখুঁত করিয়া বলে, দিনের বেলা এলেই হত, নয়তো কাউকে সঙ্গে নিয়ে—

চুপিচুপি এলাম যে লুকিয়ে।

কেন, লুকিয়ে কেন ?

বিপিনবাবু টের পেলে তাড়িয়ে দেবে না আশ্রম থেকে ?

দেয় দেবে তাড়িয়ে, এখানে এসে থাকবি তুই।

আহা, সেটা জানতে হবে তো আগে ? এখানে থাকতে পাব কিনা না জেনে আগে থেকে ওখানকার আশ্রয়টা তো আর ঘুচিয়ে দিতে পারি না।

রত্নাবলী গোড়া হইতে হাসিতেছিল, এবার হাসিল শশধরের দিকে তাকাইয়া।

ঘরে অনেক লোক, কিছুক্ষণ আগে মহেশ চৌধুরির চেষ্টায় এ ঘরে বাড়িব সকলের ঘরোয়া মজলিশ বসিয়াছে। হাতেপায়ে ধরিয়া সদানন্দকেও মহেশ এ মজলিশে টানিয়া আনিয়াছে। শতরঞ্চি বিছানো প্রকাণ্ড চৌকিতে অন্য সকলে বসিয়াছে, কিছু তফাতে অন্য একটি ছোটো চৌকিতে ঘরে বোনা সুদৃশ্য আসনে সদানন্দের বসিবার ব্যবস্থা। আশ্রমে সদানন্দের কুটিবে মাঝে মাঝে শিষ্য ও ভক্তদের মজলিশে সদানন্দ উপস্থিত থাকিত, নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করা, সদানন্দকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, এ সব অধিকার ভক্তদেব কিছু কিছু থাকিত, তবু সে মজলিশের সঙ্গে এ মজলিশেব অনেক তফাত। যেটুকু স্বাভাবিক হওযার স্বাধীনতা সেখানে সকলকে দেওয়া হইত, সদানন্দের সামনে সেটুকু স্বাধীনতা কাজে লাগানোর সাহস কারও হইত না, সকলে কথা বলিত ভয়ে ভয়ে। এখানে মহেশ নিজেই বাজেগল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, রত্নাবলী যখন ঘরে ঢোকে বিভূতি রস দিয়া দেশের কাহিনি বলিতেছে, সকলে মন দিয়া শুনিতেছে তার কথা, সদানন্দের দিকে কারও নজর নাই ! বিপিন সদানন্দকে আড়ালে বাখিত তার অসাধারণত্ব অটুট রাখিবার জন্য, মহেশের সব ব্যবস্থাই যেন উলটা, সে যেন সকলের সামনে আনিযা আনিয়া সদানন্দের কৃত্রিম অসাধারণত্বের আবরণটি ঘুচাইয়া দিতে চায়। বিভূতির গল্প শুনিতে শুনিতে সদানন্দ এই কথাটাই ভাবিতেছিল। বিভূতির মাও ঘরে আসিয়াছে, ছেলের দুর্দশাব রসালো কাহিনি শুনিতে শুনিতে তার চোঁখ ছলছল কবিতেছিল। ঘবে আসে নাই কেবল শশধরের ঘোমটা-টানা বউ। তবে তাব অনুপস্থিতিটা কেউ একবাব খেয়াল কবিয়াছে কিনা সন্দেহ। বাড়ির কাবও চেতনায় নিজের অস্তিত্বের সাড়া না তুলিয়া বাঁচিযা থাকিবার কঠিন সাধনায় বউটি প্রায় সিদ্ধিলাভ কবিযা ফেলিয়াছে।

বত্নাবলীর কথার জবাবে মহেশ চৌধুবি বলিল, তুমি তো আমাব মেযে, মা ? এখানে থাকতে পাবে কিনা তাতে তো তোমার সন্দেহ থাকা উচিত নয় মা !

রত্নাবলী এবার হাসিল না। —না না, এমনি কথাটা বলেছিলাম মাধুকে তামাশা করে। থাকতে পাব বইকী এখানে।

তুমি এখানে এসে থাকলে আমরা বড়ো সুখী হব মা।

আমি তো যখন খুশি আসতে পারি, কেবল উমা মাসির জন্যে— রত্নাবলী একটু হাসিল।

মহেশ বলিল, প্রভু যখন এখানে আছেন, ওঁকে বললে উনি এসে এখানে থাকতে রাজি হবেন না ?

মনে তো হয় না। উনি বড়ো চটেছেন।

রত্নাবলী আসিয়া সদানন্দকে প্রণাম করে নাই। সদানন্দ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এবার জিজ্ঞাসা করিল, উমা চটেছে কেন ?

আজ্ঞে, আপনি সন্ন্যাস ছেড়ে দিলেন বলে।

সন্ন্যাস ছেড়ে দিলাম ? সন্ন্যাস ছেড়ে দিলাম মানে ?

সন্ন্যাস ছেড়ে দিয়ে চলে আসেননি আপনি ?

বিপিন বলেছে বুঝি ?

রত্নাবলী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, বলিল, তা ছাড়া, সন্ন্যাস না ছাড়লে গেরস্তের বাড়ি তিন রাত্রির বেশি বাস করছেন কী করে।

সদানন্দের তীব্র দৃষ্টিপাতে রত্নাবলী মাথা হেঁট করে, সকলে স্তব্ধ হইয়া থাকে। মহেশ চৌধুরি চোখ বুজিয়া হাঁটুতে হাত বুলায়। মাধবীলতা চাহিয়া দেখিতে থাকে সকলের মুখের দিকে।

হঠাৎ সদানন্দ বলিল, তাই বুঝি তুমি আজ আমায় প্রণাম করলে না ?

রত্নাবলী মাথা হেঁট করিয়া রাখিয়াই বলিল, আজ্ঞে না। আমার আজ কাউকে প্রণাম করতে নেই।

ওঃ ! বলিয়া সদানন্দ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। আর কী বলেছে বিপিন আমার নামে ?

মহেশ চৌধুরি হাতজোড় করিয়া বলিল, প্রভু ?

সদানন্দ অধীর হইয়া বলিল, না মহেশ, আমায় শুনতে দাও। বলো রতন, বলো আর কী বলেছে বিপিন ?

রত্নাবলী বলিল, আমি আর কী বলব, ও তো সবাই জানে।

তবু তুমিই বলো না শুনি।

রত্নাবলী মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি জানেন না কিছু ?

সদানন্দ বলিল, না। কী জানি না ?

তবে তো সত্যি নয় ! খুব সম্ভব রত্নাবলীর বিস্ময় আরও বাড়িয়া যায়, কিন্তু সেটা মুখে ভালো করিয়া ধরা পড়ে না, হাসি ছাড়া আর কিছুই রত্নাবলীব মুখে ভালো করিয়া পরিস্ফুট হয় না। — ওমা, আমি তো সত্যি কিনা জানতেই ছুটে এলাম ! সত্যি নয় তবে ! কী কাণ্ড মা, অ্যাঁ ! এমন করেও বলতে পারেন বিপিনবাবু !

কী ছ্যাবলামি করছ রতন ? কী সত্যি নয় ? কী বলেছে বিপিন ?

সদানন্দের ধমকে রত্নাবলী মুষড়াইয়া গেল, আমতা আমতা করিয়া বলিল, আর আমি তা উচ্চারণ করতে পারব না। সত্যি যখন নয়, ছি ছি.

কিন্তু আর কী এখন উচ্চারণ না করিলে চলে ? কদিন ধরিয়া আশ্রম আর বিপিনের কথা ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দের মাথা গরম হইয়া গিয়াছে, তার উপর রত্নাবলীর এতক্ষণের ভণিতা ! সদানন্দ সিধা হইয়া বসিয়া ডাকে, রতন !—আর সে ডাক শুনিয়া ঘরের সকলের বুক কাঁপিয়া ওঠে।

আমার দিকে মুখ করে বোসো।

রত্নাবলী সদানন্দের দিকে মুখ করিয়া বসে।

চোখের দিকে তাকাও আমার।

রত্নাবলী সদানন্দের চোখের দিকে তাকায়।

এইবার বলো।

রত্নাবলী বলে, তবে বলার আগে চোখ নামাইয়া নেয়। প্রথমে আশ্রমে রটিয়াছিল সদানন্দ সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়াছে। তারপর কয়েকদিন আগে রটিয়াছে, সদানন্দ নাকি মাধবীলতাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে। সন্ন্যাস ত্যাগ করার উদ্দেশ্যও তাই। খবরগুলি অবশ্য রত্নাবলী সোজাসুজি বিপিনের কাছে শোনে নাই। তবে আশ্রমে বিপিন ছাড়া এ সব খবর আর কে ছড়াইবে ?

আশ্রমের কেউ আসে নাই কেন ? বিপিন একদিন আশ্রমের সকলকে একত্র করিয়া বলিয়া দিয়াছে, যে কারণেই হোক, সদানন্দ যখন কারও কাছে বিদায় না নিয়া আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়া উচিত হইবে না। যতই হোক, এতদিন তো সদানন্দ তাদের শ্রদ্ধেয় গুরুদেব ছিলেন ! যুক্তিটার জন্য যত না হোক, বিপিনের হুকুমের বিরুদ্ধে কেউ

আসিতে সাহস পায় নাই। বিপিন এইরকমভাবেই হুকুম দেয়। তা ছাড়া, মনেও সকলের প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে, কয়েকজন খুব কাঁদিয়াছে।

সদানন্দ সিধা হইয়াই বসিয়া থাকে কিন্তু নিজেকে তার বড়োই দুর্বল অসহায় মনে হইতে থাকে। সে ছাড়া এ জগতে আর সকলেই কি অবস্থা বুঝিয়া হিসাব করিয়া নিজেকে বাঁচাইয়া নিজের কাজ হাঁসিল করিয়া চলিতে পারে, সেই কেবল সব সময় ঠকিয়া যায়, না পারে গুছাইয়া কোনো একটা কাজ করিতে, না পারে নিজেকে বিপদের হাত হইতে বাঁচাইয়া চলিতে ? বিপিন যখন ওদিকে তার নামে নানাকথা রটাইয়া আটঘাট বাঁধিয়া নিতেছে, সে তখন ভাবিতেছে কখন বিপিন আসিবে হাতেপায়ে ধরিয়া তাকে ফিরাইয়া নিতে—অনুতপ্ত, লাঞ্ছিত বিপিন ! বিপিন যে বলিযাছিল বাস্তব জগতে তার কোনো দাম নাই, কথাটা তো মিথ্যা নয় ! কত হিসাব করিয়া বিপিন কাজ করে, প্রত্যেকটি সুযোগ-সুবিধা কীভাবে কাজে লাগায়, সে শুধু বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবে। গৃহস্থের বাড়ি তিনরাত্রির বেশি বাস করা যে সন্ন্যাস ত্যাগের কত বড়ো একটা প্রমাণ সাধারণ মানুষের কাছে, আর এ ক্ষেত্রে সন্ন্যাস ত্যাগের কারণ হিসাবে মাধবীলতাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়ার উদ্দেশ্য যে কত জোরালো সমর্থক যুক্তি, কিছুই বিপিনের ভাবিতে বাকি থাকে নাই ! আর এখানে আসিবার পরে তার শুধু একবার খেযাল হইয়াছিল মাত্র যে, মাধবীলতার সঙ্গে তার নাম জড়াইয়া বিপিন কুৎসা রটনার সুযোগ পাইবে।

এখন সদানন্দ বুঝিতে পারে, এর চেয়ে কুৎসা রটানো ঢের ভালো ছিল। কারও কারও মনে একটু খটকা লাগিত মাত্র। মহেশ চৌধুরির এ বাড়িতে আজ কত যুগ ধরিয়া একটি পারিবারিক জীবনের ধারা বহিতেছে, বাড়িতে গৃহিণী আছে, একটি বউ আছে, মেয়েরা মাঝে মাঝে আসাযাওয়া করে, এখানে মাধবীলতা আর সাধু সদানন্দের বাস করাটাই তো নিন্দনীয় হইতে পারে না। মাধবীলতার পিছনে পিছনে সদানন্দও মহেশ চৌধুবির বাড়িতে আসিয়া হাজির হইয়াছে, কুৎসাব সপক্ষে শুধু এই যুক্তি। কিন্তু ও যুক্তি বাতিল হইয়া যাইত দুদিনে, সদানন্দ যখন ঘোষণা কবিয়া দিত আশ্রম সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—অনাচার ও ব্যভিচারে ভরা বিপিনেব টাকা রোজগাবের উপায় যে আশ্রম ! কিন্তু বিপিন তার নিন্দা করে নাই, তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে নাই, কেবল এত বড়ো সাধু যে সদানন্দ তার সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া সংসারী হওয়ার ইচ্ছাব জন্য বড়ো বড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে। এ গুজবও মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যাইবে, কিন্তু লোকের মনে একটা ছাপ থাকিযাই যাইবে। কত কথাই মনে হইবে লোকের। কেউ ভাবিবে, কোনো কারণে বিবাহ ভাঙিয়া গেল। কেউ ভাবিবে, বিবাহটা বোধ হয় দরকার হইল না, বিবাহ ছাড়াই—

মাধবীলতা সদানন্দের সম্পত্তি, সদানন্দের কোনো রোমাঞ্চকর গোপন সাধনাব জন্য মাধবীলতাকে প্রয়োজন হয়, এ সব কল্পনাও যে ইতিমধ্যে অনেকেব মনে দেখা দিয়াছে আশেপাশেব গ্রামে, সে খবরটা সদানন্দ জানিত না। নিজে সাধু বনিয়া থাকিয়া সাধুসন্ন্যাসীর সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা যে কী রকম সে বিষয়ে সদানন্দের পরিষ্কার ধারণা নাই। স্ত্রী সঙ্গে থাকিলেও সাধু-সন্ন্যাসীর কিছু আসিয়া যায় না, স্ত্রীও যদি সন্ন্যাসিনী সাজিয়া থাকে। তখন লোকে তাকে বলে 'মাতাজি' এবং ঢিপঢিপ করিয়া তার পায়েও প্রণাম করে। সাধুসন্ন্যাসীর নামে স্ত্রীলোক সংক্রান্ত কুৎসা বলিয়া কিছু হয় না। সাধুসন্ন্যাসী তো সামাজিক জীব নয়, সাধারণ মানুষ নয়। তাদের কথাই আলাদা। স্ত্রীলোক ছাড়াও তাদের সাধনা চলে, স্ত্রীলোক নিয়াও সাধনা চলে। যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, যে মুক্তপুরুষ, তার আবার ব্যভিচার কীসের ? কত বদমেজাজি সাধু থাকে, কথায় কথায় রাগে আগুন হইয়া অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয়, মারিতে ওঠে—কিন্তু সে জন্য কে মনে করে এই সাধুটি ক্রোধ রিপুর বশ, রিপুই যখন দমন করিতে পারে নাই এ আবার সাধু কীসের ? রাগারাগি গালাগালির জন্যই বরং লোকের ভয়ভক্তি আরও বাড়িয়া যায়। কামও তো একটা তুচ্ছ রিপুমাত্র।

তবে জটাভস্মবিবর্জিত, প্রচলিত কুসংস্কার ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রচারকারী আদর্শবাদী সাধু সম্বন্ধে লোকের মনে অনেক বকম খুঁতখুঁতানি থাকে। এ সব সাধু চমকপ্রদ কিছু করে না কিনা, ওষুধ দেয় না, বোগ ভালো করে না, মরা মানুষকে বাঁচায় না, ভবিষ্যৎ গুনিয়া দেয় না, বৃষ্টি নামায় না, হিমালয়ের দুর্গম গুহায় দিন যাপনের কাহিনি শোনায় না, মাটির নীচে কিছুদিনের জীবন্ত সমাধির পর জ্যান্ত হইয়া উঠিয়া আসে না—এক রকম কিছুই করে না। শুধু বলে, এই কোরো না, ওই কোরো না।

তবে সদানন্দকে লোকে অবিকল এই ধরনের সাধুর পর্যায়ে ফেলে না। সদানন্দের কিছু কিছু অলৌকিক শক্তি আর কার্যকলাপের বিজ্ঞাপন বিপিন আগে প্রচার করিয়াছিল।

সকলের আগে কথা বলিল মহেশ চৌধুরি।

বিয়ের কথাটা মিথ্যে নয় মা। তবে বিপিনবাবু একটু ভুল শুনেছেন। মাধুর বিয়ে হবে আমাদের বিভূতির সঙ্গে।

মাধবীলতাব সঙ্গে সদানন্দের বিবাহের গুজব রটিয়াছে শুনিয়া সকলে হতবাক হইয়া গিয়াছিল, মহেশ চৌধুরির কথা শুনিয়া চমকাইয়া গেল। সকলে এমনভাবে মুখ ফিরাইল মহেশ চৌধুরির দিকে যে ঘাড়ে একটু ঝাঁকুনি লাগিল সকলেরই, বিভূতিব পাট করা চুলের কিছু অংশ সিঁথির লাইন ডিঙাইয়া ও পাশে চলিয়া গেল, মাধবীলতার কানে বিভূতির মার আদর করিয়া পবাইয়া দেওয়া দুল দুটি কানেব সামনে আর পিছনে জোরে জোরে আঘাত করিয়া দুলিতে লাগিল, রত্নাবলীব এলো খোঁপা খুলিয়া গেল।

তারপব খোঁপা ঠিক কবিতে করিতে রত্নাবলী বলিল, সত্যি ?

মহেশ চৌধুবি হাসিযা বলিল, সত্যি বইকী মা। এখন একটি শুভদিন দেখে—

দিন ঠিক হয়নি ?

বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে আর দিন ঠিক হতে কতক্ষণ লাগে মা ?

অন্য সকলে এতক্ষণ চুপ করিযা ছিল। এবাব সদানন্দ বলিল, মহেশ ?

প্রভু ?

সদানন্দ কিছুই বলিল না।

রত্নাবলী বলিল, কিন্তু তুই কী মাধু ? আমায জানাসনি কিছু ?

মাধবীলতাও কিছু বলিল না।

রত্নাবলী একবার এদিক ওদিক চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মাধবীলতার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া এক বকম টানিতে টানিতেই তাকে সঙ্গে নিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

তখন বিভূতি গম্ভীর মুখে ডাকিল, বাবা ?

মহেশ চৌধুরি বলিল, বুঝেছি, তুমি কী বলতে চাও। কিন্তু এখন নাই বা বললি ? ভেবে-চিন্তে কথা বলতে কিছু দোষ আছে ? যদি কিছু বলার থাকে, কাল না হয় পবশু বলিস, কেমন ?

বিভূতি খুব সম্ভব বলার কথাটা ভাবিয়া দেখার বদলে কথাটা এখনই বলিয়া ফেলিবে না ভাবিয়া চিন্তিয়া কাল পরশু বলিবে গম্ভীর মুখে প্রচণ্ডভাবে তাই ভাবিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সদানন্দ বলিল, তোমার ব্যাপাব কিছু বুঝতে পাবছি না মহেশ।

প্রভু ?

মুখখানা একবার একটু বিকৃত করিয়া সদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল, বাহিরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, ঘরে গেলাম মহেশ। ঘণ্টাখানেক পরে একবার শুনে যেয়ো।

মিনিট দুই বসিয়া থাকিয়া বিভূতিও উঠিয়া গেল।

বিভূতির মা তখন বলিল, তুমি আর মেয়ে পেলে না ?

কেন, মাধু তো বেশ মেয়ে।

আমার অমন ছেলে, তার জন্যে কুড়োনো মেয়ে !

অন্য মেয়েকে তোমার ছেলে বিয়ে করলে তো। দ্যাখো, হয়তো শেষ পর্যন্ত না বলে বসবে। কথাটা ভেবে দেখতে রাজি হয়েছে, এইটুকু যা ভরসা। আমি তো ভাবলাম, মুখের উপরেই বুঝি বলে বসে—চোখ বুজিয়া মহেশ একটা নিশ্বাস ফেলিল। পরক্ষণে চোখ মেলিয়া বিভূতির মার ডান হাতটি বুকের উপর রাখিয়া বলিল, এখনও বুক কাঁপছে দ্যাখো।

রত্নাবলীকে আশ্রমের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসিতে গেল শশধর। এতক্ষণে মাধবীলতা যেন এত রাতে লুকাইয়া রত্নাবলীর একা এখানে আসার কারণটা বুঝিতে পারিল। একা আসিলেও তাকে যে কেউ পৌঁছিয়া দিয়া আসিতে যাইবে তা কী আর রত্নাবলী জানিত না ? এবং সঙ্গে যে যাইবে তার শশধর হইতেই বা বাধা কী ?

অন্য সময় মাধবীর মনে ব্যাপারটা পাক খাইয়া বেড়াইত, আজ তার এমন একটা বিষয়েও মাথা ঘামানোর ক্ষমতা ছিল না। কী উদ্ভট মানুষ মহেশ চৌধুরি ! কেমন অনায়াসে বলিয়া বসিল বিভূতির সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে ! কাউকে একবার জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করিল না। এক মুহূর্ত আগে এ রকম একটা সম্ভাবনার কথা কী কারও কল্পনাতে ছিল ?

অথবা আগেই কথাটা সকলে আলোচনা করিয়াছিল, সেই কিছু জানে না ? তাকে না জানাইয়াই সকলে তলে তলে বিভূতির সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে ? কিন্তু, তাও কী সম্ভব !

কী হইবে এবার ? মহেশ চৌধুরি তো যা মুখে আসিল বলিয়াই খালাস, ফলটা দাঁড়াইবে কী ? সদানন্দ কী বলিবে ? কী করিবে সদানন্দ ? সদানন্দের সেদিনকার সেই কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মাধবীলতার মনে ভাসিয়া আসিতে থাকে ; আমাকে মহাপুরুষ না ভেবে তো তোমার উপায় নেই, তোমাকে যে তাহলে দ্বিচারিণী হতে হবে !

সদানন্দের ভয়টাই মাধবীলতার মনে সবচেয়ে বড়ো হইয়া দেখা দেয়। বিভূতিকে বিবাহ করার কথা সে কখনও ভাবে নাই, এ রকম একটা সম্ভাবনার কথা তার কল্পনাতেও আসে নাই। আজ এ বিষয়ে মাথা ঘামানোই তার পক্ষে উচিত ও স্বাভাবিক ছিল সবচেয়ে বেশি, কিন্তু কথাটা যে বিবেচনা করা দরকার, নিজের মনে তারও যে এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিতে হইবে আজকালের মধ্যে, এটা যেন তার খেয়ালও হইল না। বিভূতির জীবনসঙ্গিনী হইতে নিজে সে রাজি আছে কি না নিজেই সে তা এখনও জানে না। তবু সদানন্দ কী ভাবিবে, সদানন্দ কী বলিবে, সদানন্দ কী করিবে কল্পনা করিয়া সর্বাঙ্গে যেন রীতিমতো অপরাধমূলক ভয়ের ঢিপঢিপানি অনুভব করিতে থাকে।

নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া মাধবীলতা ভাবিতেছিল, কে যেন পাশে আসিয়া বসিল সন্তর্পণে, চোরের মতো। মুখ ফিরাইয়া মাধবীলতা দেখিল শশধরের বউ। ঘোমটা কমাইয়া দিয়াছে, তবু কপাল প্রায় সবখানিই ঢাকা।

দিদি ?

আজ সে প্রথম ঘোমটা কমাইয়া মাধবীলতার সঙ্গে কথা কহিল, এতদিন কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও মাধবীলতা তাকে কথা বলাইতে পারে নাই। হাত দেখিয়াই বোঝা যায় বউটির রং খুব সুন্দর, মুখের রং আরও টুকটুকে।

ঠাকুরপোর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে দিদি ?

এমন সুন্দর মুখের এত আনন্দের কথা কী যে বিশ্রী শুনাইল বলিবার নয়। বউটি ফোকলা।

সদানন্দ বলে, তবে কী তুমি বলতে চাও, ওদের মধ্যে কোনো কথাই হয়নি, বিভূতি আর মাধুর মধ্যে ?

মহেশ বলে, আজ্ঞে না। তবে দুজনে বেশ ভাব হয়েছে সেটা তো বোঝাই যায়।

সদানন্দ বলে, ভাব তো আর প্রণয় নয় মহেশ ! দুজনে সর্বদা মেলামেশা করছে, ওদের ভাব হওয়াটা আশ্চর্য কী। কিন্তু বিয়ে হল আলাদা ব্যাপাব। সকলের সামনে কথাটা বলার আগে ওদের একবার জিজ্ঞাসা করা তো তোমার উচিত ছিল ? আমার সঙ্গেও তো পরামর্শ করতে পারতে একবার ?

সময় পেলাম না যে প্রভু ? আপনার নামে অমন একটা কুৎসিত কথা রটেছে শুনে মনে হল, বিয়ে যখন এদের হবেই, আর দেরি না করে মেয়েটিকে কথাটা জানিয়ে দেওয়াই ভালো। মাধুর সম্পর্কে আপনার নামে আর কোনো কথাই তাহলে উঠতে পাবে না।

বিয়ে যখন ওদের হবেই মানে ?

আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে বিয়েটা ওদের নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে প্রভু। ছেলেটার মাথাও একটু ঠান্ডা হবে, মেয়েটাও সুখী হবে।

শুনিলে মনে হয় না, বিভূতি আব মাধবীলতার বিবাহ যে হইবেই সে বিষয়ে মহেশ চৌধুরির কিছুমাত্র সন্দেহ আছে, কারও মত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, কারও সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নাই, যাদের বিবাহ দুঘণ্টা আগেও তাদের ইঙ্গিতেও ব্যাপারটা জানানো হয নাই, তবু যেন মহেশ চৌধুরি জানে এ বিবাহ হইয়া যাইবে। রাগে সদানন্দের গা যেন জ্বলিয়া যায়। একটু ভয়ও হয়। মহেশ চৌধুরির একগুঁয়েমির কিছু কিছু পরিচয় সে পাইয়াছে।

জানো মহেশ, তোমার ব্যাপার ভালো বুঝতে পারছি না। বিভূতির একটা বিয়ে দিতে চাও, ভালো কথা। কিন্তু মাধুর সঙ্গে বিয়ে হবে কী করে ? মাধু আশ্রমে এসেছে, সংসার ওর ভালো লাগেনি বলে, সেবা আর আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়ে ওর জীবনটা কাটিয়ে দেবার ইচ্ছা। আমি ওকে দীক্ষা দেব, নিজে ওকে সাধনপথে চালিয়ে নিয়ে যাব। ওব বিয়ের প্রশ্নই তো উঠতে পারে না।

প্রভু ?

তুমি বুঝতে পার না মহেশ, ও মেয়েটির মধ্যে খাঁটি জিনিস আছে ? আমি কী সাধে ওকে বেছে নিয়েছি ! একদিন ও অনেক উঁচুতে উঠে যাবে, হাজার হাজাব মানুষের জীবনে একদিন ও সুখশান্তি এনে দেবে। এমন একটা খাঁটি জিনিস নষ্ট হতে দেওয়া যায় !

প্রভু ?

বলো না, কী বলতে চাও ? আলোচনা করবার জন্যই তো ডেকেছি তোমায।

বিয়ে না হলে মেয়েটিব মন শান্ত হবে না, প্রভু। বিয়ের জন্য মেয়েটি ছটফট করছে।

সদানন্দ ব্যঙ্গ করিয়া বলে, তোমায বলেছে নাকি, তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দিয়ে দিন, বিয়েব জন্য আমি ছটফট করছি মহেশবাবু ?

মহেশ হাতজোড় করিয়া বলে, আপনাব তো অজানা কিছু নেই প্রভু ! কেন মনে কষ্ট দিচ্ছেন আমার ? কোনো মেয়েই অমন করে বলেও না, পারেও না। কিন্তু মেয়েমানুষের মন কি বোঝা যায় না ? রাজাসাহেবের ছেলে তো ওকে বিয়ের লোভ দেখিয়ে বার করে এনেছিল।

ছেলেমানুষ হঠাৎ একদিন মনের ভুলে কী করেছিল—

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও তো তাই বলি। নইলে নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইতাম ? বিয়ে করে সংসারী হবার ইচ্ছা মেয়েটির মনে প্রবল।

কিন্তু মহেশ—

আজ্ঞে হ্যাঁ। বিয়েটা হয়ে যাক, দুজনকেই আপনি দীক্ষা দিয়ে পায়ের তলে আশ্রয় দেবেন। যেমন চান তেমনই করে গড়ে তুলবেন দুজনকে। আপনার কাজে দুজনে জীবন উৎসর্গ কববে। ওরা তো আপনারই সন্তান প্রভু ?

সদানন্দের মনে হয়, মহেশ যেন তাকে ভক্তি-মাখা চাবুক মারিয়াছে।

বারো

এ বিষয়ে বিভূতি সত্যই বড়ো ছেলেমানুষ—বিবাহ করার বিষয়ে। এতটুকু অভিজ্ঞতা নাই। মেয়েদের সম্বন্ধে কোনোদিন সে যে মাথা ঘামায় নাই তা নয়, তবে সেটা খুবই কম। অস্পষ্ট একটা ধারণা তার মনে আছে যে, দেখিলেই ভালো লাগে এমন চেহারার আর মিশিলেই মিষ্টি লাগে এমন স্বভাবের একটি চালাকচতুর চটপটে মেয়ের সঙ্গে একদিন না একদিন প্রেম তার হইবেই, বাস্, তারপরেই মালাবদল। কিন্তু মাধবীলতা কি তার কল্পনার সেই মেয়ে ? দুদিন ভাবিয়া জবাব দিবে বলিয়াছিল, সাতদিন ভাবিয়াও কিছু ঠিক করিতে পারিল না। তারপর মনে হইল, মাধবীলতার সঙ্গে পরামর্শ করিলে দোষ কী ?

মাধবীলতা সোজাসুজি জবাব দিল, আমি কী জানি !

অর্থাৎ মাধবীলতার আপত্তি নাই। মনে মনে বড়ো অভিমান হয় মাধবীলতার, তাকে জিজ্ঞাসা করা কেন, কী করা উচিত ? ইচ্ছা না থাকে, বাতিল করিয়া দিলেই হয় ! সে তো আর পায়ে ধরিয়া সাধে নাই !

সদানন্দ অনেকবার মাধবীলতাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, সে যায় নাই। কী করিবে গিয়া ? সদানন্দ কী বলিবে সে ভালো করিয়াই জানে। আর ও সব কথা শুনিবার সাধ মাধবীলতার নাই। নিজে সে অনেক ভাবিয়াছে—এখনও ভাবিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে মাথার মধ্যে যখন একটা যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, মনে হয় মাথার ঘিলুগুলি গলিয়া গলিয়া তালুর কাছ হইতে টপটপ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে (মোমের মতো), তখন হঠাৎ একসময় দুকানে তার তালা লাগিয়া গিয়া সমস্ত জগৎ বদলাইয়া যায়। স্তব্ধ ও শান্ত চারিদিক। ভাবনার তো কিছু নাই ? আত্মগ্লানির কোনো কারণ তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ? সব ভালো, সব মিষ্টি, সব সুন্দর। জীবনে সুখী হওয়ার পথে একটা বাধাও আর নাই। কত আনন্দ জীবনে। আপশোশ শুধু এই যে সে জানে, আবার গোড়া হইতে সব শুরু হইবে, দুর্ভাবনা, অস্বস্তিবোধ, আত্মগ্লানি আর মাথার অনির্দিষ্ট দুর্বোধ্য যাতনা। প্রথমে সামান্যভাবে আরম্ভ হইয়া বাড়িতে বাড়িতে কয়েকদিনে উঠিয়া যাইবে চরমে, তখন আবার দুকানে তালা লাগিয়া পাওয়া যাইবে শান্তি ও স্তব্ধতা। ব্যাপারটা মাধবীলতা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এ কী কোনো অসুখ ? মাথার অসুখ ? পাগল-টাগল হইয়া যাইবে না তো ?

সদানন্দ একদিন বিভূতিকে দিয়াই তাকে ডাকিয়া পাঠাইল। মাধবীলতা নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল, যাব ?

যাবে বইকী, বাঃ রে !

একা একা যেতে আমার কেমন ভয় করে।

ভয় আবার কীসের ?

সদানন্দের সামনে নিজেকে মাধবীলতার সত্যই কেমন যেন পুতুলের মতো অসহায় মনে হয়। তাকে নিয়া যা খুশি করার ক্ষমতা যেন এই লোকটির কেমন করিয়া জন্মিয়া গিয়াছে।

আমাকে একেবারে ত্যাগ করে দিলে মাধু ?

মাধবীলতা পুতুলের মতোই চাহিয়া থাকে। এই তো সবে আরম্ভ, আরও কত কথা সদানন্দ বলিবে ! কিন্তু সদানন্দও কথা না বলিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া খানিক পরে সে সত্যই আশ্চর্য হইয়া যায়। তখন মাধবীলতা মাথা নিচু করে, অনেক ভাবিয়া আস্তে আস্তে বলে, আপনি যদি বারণ করেন—

সদানন্দ ভাবিতেছিল সেদিনকার কথা, আঙুলগুলিকে সেদিন পাখির পালকের চেয়ে কোমল করিয়া মাধবীলতার গায়ে বুলাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। আজ মারিতে ইচ্ছা হইতেছে। এমন কোমল,

এমন মোলায়েম গা মাধবীলতার, দেখিলেই মনে হয় চামড়ার উপর বুঝি আর একটা অপার্থিব আবরণ আছে (এটা সদানন্দ অনেকবার কল্পনা করিয়াছে), আগে স্পর্শ করিবার কল্পনাতেই রোমাঞ্চ হইত, আজ কাটিয়া ছিঁড়িয়া রক্তপাত করিয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইচ্ছা হইতে হইতে হঠাৎ উঠিয়া গিয়া সদানন্দ দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়া দেয়। সত্যই কি মাধবীলতার শরীরটা সে ছিঁড়িয়া ফেলিবে না কি ? চোখ দেখিয়া মাধবীলতাব সর্বাঙ্গ অসাড় হইয়া আসে। পাগল না হইযা গেলে কী মানুষেব এমন চোখ হয় ? কী করিবে সদানন্দ ? খুন-টুন করিয়া ফেলিবে না তো ?

কাছেই বসে সদানন্দ, ডান হাতে শক্ত করিযা তার বাঁ-হাতের কবজির কাছে চাপিয়া ধরে। মায়ামমতা যে আজ সদানন্দের মনে এক ফোঁটা নাই, বাগে দুঃখে অপমানে মানুষটা গরগর কবিতেছে, মাধবীলতা অনেক আগেই সেটা টেব পাইযাছিল। এতক্ষণে সে বুঝিতে পারে, ভয়ংকর একটা আঘাতে দেহে মনে তাকে চিবদিনের জন্য পঙ্গু করিয়া দিবার সাধটাই সদানন্দেব মনে মাথা চাড়া দিয়া উঠিযাছে। এতদিন মনে মনে সদানন্দ কী ভাবিযাছে কে জানে, হয়তো এইরকম একটা কল্পনাই মনে মনে নাড়াচাড়া করিয়াছে। আজ আর কোনো রকমেই ঠেকানো যাইবে না। গলা টিপিয়া তাকে মারিয়া ফেলাও সদানন্দের পক্ষে আজ আশ্চর্য নয়। মাধবীলতা জানে বাঁ-হাতেব কবজিটা তার ভাঙিয়া গিয়াছে, কিন্তু মাথাব মধ্যে এমন ঝিমঝিম করিতেছে যে ব্যথাটা ভালোরকম অনুভব করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বিস্ফারিত চোখ দুটি সদানন্দের চোখের সঙ্গে মিলাইবাব চেষ্টা করিতে করিতে মাধবীলতা জ্ঞান হারাইয়া সদানন্দের গায়েই ঢলিয়া পড়িয়া গেল।

ঘরেই কুজায় জল ছিল, মাথায় খানিকটা জল চাপড়াইয়া দিয়া সদানন্দ দরজা জানালা খুলিয়া দিল। খানিক তফাতে হাত গুটাইয়া বসিয়া বিড়বিড় বকিতে লাগিল। বোধ হয়, আত্মরক্ষার এত বড়ো অস্ত্র আয়ত্ত কবিযা বাখাব জন্য মাধবীলতাকে গালাগালি।

মাধবীলতাব জ্ঞান হওযাব পর সদানন্দ উদাসভাবে বলিল, আচ্ছা তুমি যাও মাধু।

আপনি কী কবলেন আমাব ?

কিছুই করিনি।

মাধবীলতা সে কথা বিশ্বাস করিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। গেল একেবাবে বিভূতির কাছে। নালিশ যদি করিতে হয়, হবু স্বামীর কাছে করাই ভালো।

বিভূতি শুনিয়া অবাক। অপমান করেছেন ? কী অপমান করেছেন স্বামীজি তোমাকে ?

মাথার মধ্যে কতকগুলো বড়ো অদ্ভুত প্রক্রিয়া চলিতেছিল মাধবীলতার, স্থান ও কালেব কতকগুলি নিয়ম যেন ঢিল হইয়া গিয়াছে। মাথার মধ্যে, অথচ ঠিক যেন মাথার মধ্যেও নয়, মাথার পিছন দিকে একটা বাড়তি অঙ্গ আছে, সেইখানে কত কী জিনিস একসঙ্গে সরু আব মোটা হইযা যাইতেছে, কয়েকদিন পরে পবে কানে যে তার তালা লাগে সেই বীভৎস স্তব্ধতা সর্বব্যাপী আলোড়নের মধ্যে ঢেউ তুলিয়া এমন একটা এলোমেলো গতি লাভ করিয়াছে যা চোখে দেখা যায়, আর এমন একটা অকথ্য ভয় (অনির্দিষ্ট ভয়ের যে এমন একটা অবর্ণনীয় রূপ থাকে মাধবীলতার জানা ছিল না)—ব্যাপারটা বুঝিবারও নয়, বুঝাইবারও নয়। অথচ মস্তিষ্কের সাধারণ অংশটা এদিকে বেশ কাজ করিতেছে। সমস্ত ঘটনাটা অনায়াসে গড়গড় করিয়া সে বিভূতিকে বলিয়া গেল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া হাত ধরিয়া টানিবার সময় ভয়ে অজ্ঞান হইয়া যাওয়ায় আজ কীভাবে রাক্ষসটার হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

তুমি যদি এর প্রতিকার না কর—

বিভূতির বুকে মুখ গুঁজিয়া দিয়া মাধবীলতা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিভূতি কথা বলে না দেখিয়া খানিক পরে মুখ তুলিয়া চাহিয়াই সে চমকাইয়া গেল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ

করিয়া আসিয়া হাত চাপিয়া ধরিবার সময় সদানন্দের মুখ যেমন হইয়াছিল, বিভূতির মুখও তেমনই দেখাইতেছে।

একটু বোসো, আমি আসছি।

মাধবীলতা সভয়ে তার হাত চাপিয়া ধরিল, কী করবে ? থাকগে, কিছু করে কাজ নেই। যা হবার তা তো হলই—

কিন্তু আর কি বিভূতিকে আটকানো যায় ? হাত ছাড়াইয়া সে চলিয়া গেল। সদানন্দের ঘরে গিয়া সদানন্দের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, মাধুর সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করার মানে ?

দ্যাখো বিভূতি, তুমি ছেলেমানুষ—

বাকি কথাগুলি সে বলিয়া উঠিতে পারিল না, বিভূতির ঘুঁষিতে নাকটা ছেঁচিয়া গেল। বিভূতি আরও মারিত, কিন্তু পিছন হইতে মহেশ তাকে জড়াইয়া ধরায় আর কিছু করিতে পারিল না।

ছেড়ে দাও বাবা, বজ্জাতটাকে আমি খুন করব।

ছি বিভূতি, ছি !

আমাকে ছি করছ ? জানো ও কী করেছে ?

জানি বইকী।

জানো ? বিভূতি এতক্ষণ ছাড়া পাওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করিতেছিল, এবার স্তব্ধ হইয়া গেল।

নাক দিয়া রক্ত পড়া বন্ধ হইল প্রায় আধঘণ্টা পরে, সেবা বেশির ভাগ করিল শশধরের বউ। কখন কোন ফাঁকে সে যে আসিয়া জুটিয়াছিল কেউ টেরও পায় নাই। বিভূতি একদিকে ছোটো একটা টুলে বসিয়া ব্যাপার দেখিতেছিল আর থাকিয়া থাকিয়া মুখ বাঁকাইতেছিল। এখনও তার রাগ কমে নাই, বেশ বুঝা যায় একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্যই সে বসিয়া আছে। মাঝখানে একবার সে একটা মন্তব্য করিতে গিয়াছিল, মহেশ হাতজোড় করিয়া বলিয়াছিল, দোহাই তোর, একটু থাম। তারপর হইতে সে চুপ করিয়া আছে।

বুঝা যায়, মহেশ ভাবিতেছে।

ভাবিবার কী আছে বিভূতি বুঝিতে পারে না। তার বিরক্তির সীমা থাকে না। মহেশ যদি সব জানেই, তবে আর এই পাষণ্ড সম্বন্ধে কর্তব্য স্থির করিতে তো এক মুহূর্ত দেরি হওয়া উচিত নয়। এত সেবাযত্নই বা কী জন্য ? ঘাড় ধরিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিলেই হয় !

সদানন্দ একটু সুস্থ হইলে মহেশ বলিল, বিভূতি, বড়ো ঘরের রোয়াকে ভাঙা কাঠের বাক্সোটা আছে না, তার থেকে বড়ো হাতুড়িটা নিয়ে আসবে ?

হাতুড়ি দিয়ে কী করবে ?

একটু কাজ আছে।

বিভূতি হাতুড়ি আনিয়া দিল। লোহায় মরিচা ধরিয়া গিয়াছে। হাতুড়ি হাতে করিয়া মহেশ চৌধুরি বলিল, প্রভু আমার ছেলের হয়ে আমি আপনার কাছে মাপ চাইছি। ছেলে আমার প্রায়শ্চিত্ত করবে না, ওকে বলা বৃথা। ছেলের হয়ে আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি, আপনি তাই মঞ্জুর করুন।

বলিতে বলিতে মহেশ চৌধুরি করিল কী, হাতুড়িটা দিয়া নিজের নাকের উপর সজোরে মারিয়া বসিল। সকলে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, কেবল শশধরের বউ আবার সেবা আরম্ভ করিয়া দিল মহেশের। সে যেন এইরকম কাণ্ড ঘটিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সদানন্দের চেয়ে মহেশের যে জোরে লাগিয়াছিল তাতে সন্দেহ নাই, রক্ত আর বন্ধ হইতে চায় না। মহেশের বারণ না মানিয়া বিভূতি পাড়ার সুবিমল ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিল। ডাক্তার আসিয়া কিছু করিতে পারিল না কিছুই, থেঁতলা নাকটা পরীক্ষা পর্যন্ত নয়। মহেশ তাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া অতিকষ্টে খোনাসুরে বলিল, না না, আমার কর্মভোগ আমায় ভোগ করতে দিন।

সুবিমল ডাক্তারের কাছে পাড়ার লোক জানিতে পারিল, সাধু সদানন্দ আর মহেশ চৌধুরিব মধ্যে ভয়ানক রকমের একটা হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে। দুজনেই দারুণ আহত। মহেশ চৌধুরির এখন ভয়ানক অনুতাপ হইয়াছে, বিনা চিকিৎসায় মরিয়া যাইতে চায়।

হাতাহাতি হইল কেন ? প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর হাতাহাতি ! ও রকম তো ওদেব মধ্যে লাগিয়াই আছে। অন্যদিন কথা কাটাকাটির মধ্যেই সমাপ্তি হয়, আজ হাতাহাতি পর্যন্ত গড়াইয়াছে।

কথাটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত রূপ নিল অন্যরকম। ঘটনাটা অপরাহ্নের, সন্ধ্যার পর অনেকে খবর জানিতে আসিল। সদানন্দ তখন নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে, তার দেখা কেউ পাইল না। মহেশ চৌধুরির সমস্ত মুখটাই ফুলিয়া গিয়াছে, কথা বলিতেও কষ্ট হয়। তবু সেই সংক্ষেপে ব্যাপারটা সকলকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিল। গোঁয়ারগোবিন্দ একটা ছেলে আছে তার সকলে জানে তো ? একটা ভুল বোঝার দরুন হঠাৎ রাগের মাথায় সে সদানন্দকে অপমান করিয়া বসে। ছেলের হইয়া মহেশ চৌধুরি তাই শাস্তি গ্রহণ করিয়াছে।

রসিক ভট্‌চায মহেশ চৌধুরির বন্ধু। সে বলিল, তুমি কী উন্মাদ মহেশ ?

কাল পরশু তোমার সঙ্গে ও বিষয়ে তর্ক করা যাবে, কেমন ? বলিয়া মহেশ চৌধুরি শয়ন করিতে ভিতরে গেল।

যে দশ-বারোজন উৎসাহী ও কৌতূহলী পরিচিত লোকের কাছে মহেশ চৌধুবি কথাগুলি বলিল, তা'রা তখন ডাকাইয়া আনিল বিভূতিকে। কী হইয়াছিল ? সদানন্দকে সে কী অপমান করিয়াছিল ? কেন অপমান করিয়াছিল ? কী দিয়া সদানন্দ মহেশ চৌধুরিকে আঘাত করিয়াছে ?

কিন্তু বিভূতি তেমন ছেলেই নয়, সে সংক্ষেপে শুধু বলিল, আমি কিছু জানি না। আপনারা এবাব যান তো।

সকলে দয়া করিয়া তাব বাড়িতে পাযেব ধুলা দিয়াছে, সকলকে বসাইয়া রাখিয়া বাড়িব ভিতবে যাইতে মহেশ চৌধুরির কত সংকোচ, কত আপশোশ ! আর তার ছেলে কিনা সোজাসুজি সকলকে বিদায় করিয়া দিল ! ছেলেটা সত্যই গোঁয়ার।

পরদিন অনেক দূবের গ্রামে পর্যন্ত রটিয়া গেল, ছেলেটাকে বাঁচাইতে গিয়া মহেশ চৌধুরি সদানন্দের হাতে ভয়ানক মার খাইয়াছে। একটি টুঁ শব্দও কবে নাই মহেশ চৌধুবি, সদানন্দ মার বন্ধ করিলে রক্তাক্ত শরীরে সদানন্দের পায়ে মাথা ঠেকাইয়া ছেলের হাত ধরিয়া ঘবের বাহির হইয়া আসিয়াছে। ডাক্তার ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু মহেশ চৌধুরি বলিয়াছে, প্রভুর প্রহাবের চিকিৎসা ? ছি !

শেষ কথাটাতে সকলে যে কী মুগ্ধ হইয়া গেল বলিবার নয়। এমন ভক্তি মহেশ চৌধুরির যে মার খাইয়া মরিতে বসিয়াছে তবু চিকিৎসা করিবে না—গুরু মারিয়াছে বলিয়া ! সকলেব কানে যেন বাজিল, মারলি মারলি কলসিকানা, তাই বলে কী প্রেম দিব না।

না জানি কত বড়ো মহাপুরুষ সদানন্দ যার জন্য মহেশ চৌধুরির এমন অলৌকিক ভক্তিভাবের উদয় হইয়াছে, এমন মহৎ প্রেরণা আসিয়াছে। সদানন্দের উপর মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা যেন সভয় বিস্ময়ে হু-হু করিয়া বাড়িয়া গেল। অনেকের মনে হইতে লাগিল, সদানন্দ হয়তো মানুষ নয়, মানুষের রূপধারী—

ফিসফিস করিয়া অন্তরঙ্গ মানুষের কানেকানেই শুধু কথাটা বলা যায়। কয়েকটি ভাঙা কুঁড়ের ভিতরে, গেঁয়ো পথের ধারে কয়েকটি জমকালো গাছের ছায়ায় দেবতার আবির্ভাবের কথাটা কানাকানি হয়। অকালবার্ধক্যের ছাপমারা কয়েকটি ক্লিষ্ট মুখে উত্তেজিত আনন্দের বিস্ময়কর আবির্ভাব ঘটে।

কয়েকটা দিন একরকম একা একা ঘরের কোণে কাটাইয়া দিবার পর সদানন্দই প্রথম কথাটা পাড়ে। বলে, আমি বরং কোথাও চলে যাই মহেশ।

মহেশ চৌধুরি বলে, আর ও কথা কেন প্রভু ? সেদিন তো ক্ষমা করেছেন, ও ব্যাপার তো চুকে গেছে ?

চুকে গেছে বললেই কী সব ব্যাপার চুকে যায় মহেশ ?

আজ্ঞে তা যায় বইকী। আমরা এখন ভাবব ও ঘটনাটা যেন ঘটেইনি, মন থেকে একেবারে মুছে ফেলব। মনের বাইরে তো কোনো কিছুর জের চলতে পারে না প্রভু।

মাঝে মাঝে মহেশ চৌধুরি এমনভাবে কথা বলে, মনে হয় ঠিক যেন সদানন্দকে উপদেশ দিতেছে। প্রথম প্রথম সদানন্দ অতটা খেয়াল করিত না, আজকাল মন দিয়া শোনে। উপদেশের মতোই কথাগুলি সে গ্রহণ করে এবং পালন করিবার চেষ্টাও করে। মহেশ চৌধুরির এখনকার উপদেশ, সেদিনকার ব্যাপারটা মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কথায় ব্যবহারে এমন ভাব দেখাইতে হইবে যেন কিছুই ঘটে নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া সদানন্দ সেই চেষ্টাই করে। কয়েকদিন গম্ভীর ও বিষণ্ণভাবে ঘরের কোনায় কাটাইবার পর হঠাৎ সেদিন হাসিমুখে গিয়া হাজির হয় সান্ধ্য মজলিশে।

সকলেই উপস্থিত আছে। বিভূতি এবং মাধবীলতাও। প্রথমটা সদানন্দের ভয় হয়, বিভূতি হয়তো রাগ করিয়া উঠিয়া যাইবে, হয়তো একটা কেলেঙ্কারি করিয়া বসিবে। মাধবীলতা হয়তো তেমন কিছু করিবে না, সে সাহস তার নাই, কিন্তু কথায় ব্যবহারে সহজ ভাব কি ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে মেয়েটা ? মহেশ চৌধুরি তো বলিয়া খালাস সব চুকিয়া বুকিয়া গিযাছে, কিন্তু ওদের দুজনের পক্ষে কি চুকিয়া বুকিয়া যাওয়া সম্ভব ?

কিছুক্ষণ কাটিয়া যাওয়ার পর সদানন্দ বুঝিতে পারে, ব্যাপারটা সত্যসত্যই সকলে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে—যতটা মুছিয়া ফেলা সম্ভব। বিভূতি আর মাধবীলতা যে একটু সংকোচ আর অস্বস্তি বোধ করিতেছে প্রথম দিকে এটা পরিষ্কার বুঝা গিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে দুজনেই অন্যদিনের মতো সহজভাবে সকলের হাসি গল্পে যোগ দিয়াছে।

সদানন্দের খুশি হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু মনটা তার হঠাৎ বড়ো খারাপ হইয়া গেল। আর একবার সে যেন মহেশ চৌধুরির কাছে হারিয়া গিয়াছে। অতি শোচনীয় কুৎসিত পরাজয়। সেদিনকার ব্যাপারে মহেশ চৌধুরির কাছে সে যে ছোটো হইযা গিয়াছে আজ এই সান্ধ্য মজলিশে আসিয়া প্রথম সেটা সদানন্দের খেয়াল হইল।

তার মনে হইতে লাগিল, এই উদ্দেশ্যই ছিল মহেশ চৌধুরির, তাকে হীন করার জন্যই সে হাতুড়ি দিয়া সেদিন নিজের মুখে আঘাত করিয়াছিল। এখনও মহেশ চৌধুরির মুখ অল্প অল্প ফুলিয়া আছে—কী সাংঘাতিক মানুষ মহেশ চৌধুরি !

তেরো

যাই হোক, একদিন যথারীতি বিভূতি আর মাধবীলতার বিবাহটা হইয়া গেল। প্রকাশ্য জীবনটা যেমন কাটিতেছিল প্রায় সেই রকমই কাটিতে লাগিল দুজনের, বেশভূষার কিছু পরিবর্তন দেখা গেল মাধবীলতার এবং চেহারাটাও যেন তার বদলাইয়া যাইতে লাগিল। এমন পরিবর্তন যে দেখিলে মনে প্রশ্ন জাগে, এতদিন কি অসুখী ছিল মেয়েটা, এবার সুখী হইতে আরম্ভ করিয়াছে ?

বিবাহে বিপিন আসিয়াছিল, পরে আর একদিন আসিয়া সে অনেকক্ষণ সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া গেল, সদানন্দ ছাড়া। আমল দিলে সদানন্দের সঙ্গেও হয়তো সে ভাব জমাইয়া যাইত—শত্রুতা ভুলিয়া যাওয়ার প্রয়োজনে মানুষ মানুষের সঙ্গে যে রকম ভাব জমায়। মহেশ চৌধুরি সদানন্দকে কেন্দ্র করিয়া নতুন একটি আশ্রম খুলিতেছে এ খবরটা বিপিন পাইয়াছিল কিন্তু রাগ দুঃখ বা হিংসার বদলে তার উৎসাহই দেখা গেল বেশি। নিজেই কথা তুলিয়া সে মহেশ চৌধুরিকে বলিয়া

গেল যে, রেষারেষি আশঙ্কা করিবার কোনো কারণই অনুমান করা যায় না, বিপিন আর মহেশের আশ্রমের উদ্দেশ্য হইবে সম্পূর্ণ পৃথক।

আপনার আশ্রমের উদ্দেশ্যটা কী বিপিনবাবু ?

প্রশ্নটা অসংগত। এতকাল যে আশ্রম চলিতেছে, চারিদিকে যে আশ্রমের বেশ নামও একটু আছে, তার মালিককে বাড়িতে পাইয়া একেবারে আশ্রমের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এ রকম একটা প্রশ্ন না করিলেই ভালো হইত। মহেশ চৌধুরিকে বিপিন কোনোদিন পছন্দ করিত না, আশ্রমে লোকটাকে সে চিরদিন দমাইয়া রাখিবার চেষ্টাই করিয়াছে, এখন হঠাৎ অতীতের কথা ভুলিয়া বাড়ি বহিয়া আসিয়া এ রকম খাতির জমানোর চেষ্টাতেই মহেশের কৃতার্থ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। আশ্রমের উদ্দেশ্য ? কে না জানে বিপিনের আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা ! জিজ্ঞাসা করাটাই বাহুল্য।

বিপিনের কোনো জবাব না পাইয়া মহেশ চৌধুরি আবার বলিযাছিল, সত্যি কথাটা বলি, এতকাল আপনার আশ্রমে যাতায়াত করছি কিন্তু উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝতে পারিনি। প্রভু যতকাল ছিলেন ততকাল তবু একটা কারণ ছিল, ওঁর জন্যে—

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিযাছিল, প্রভুই বটেন !

মহেশ চৌধুরি দুই কানে আঙুল দিয়া বলিয়াছিল, ছি বিপিনবাবু, ছি !

তবু তো সর্বজনবিদিত আশ্রমের উদ্দেশ্যটা বিপিন পর্যন্ত মহেশকে ঠিকভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিল না। নিজের মনেও তার ধারণা ছিল কথাটা অত্যন্ত সহজ ও সরল। বলার সময় দেশ, সমাজ ও ধর্মের মধ্যে বক্তব্যটা দিশেহারা হইয়া গেল। দেশ, সমাজ ও ধর্মের কল্যাণ তো বটেই, কিন্তু কোনদিকে, কীভাবে ?

আহা, আশ্রমে কী হয় না হয সে তো আপনার জানাই আছে।

মহেশ চৌধুরি সবিস্ময়ে বলিযাছিল, কিন্তু আশ্রমে তো আপনার একরকম কিছুই হয় না ? ভালো একটা জাযগা দেখে কয়েকজন লোককে শুধু থাকতে দিয়েছেন। প্রভু যখন ছিলেন, তখন তবু মাঝে মাঝে দশজন এসে সদুপদেশ শুনবার সুযোগ পেত, এখন—

এখনও পায়।

কে বলেন ?

আমি বলি। আশ্রমে যাঁরা আছেন, তাঁরাও বলেন।

লোকজন আসে ? মহেশ চৌধুরি সন্দিগ্ধভাবে বলিয়াছিল, শুনলাম লোকজনের আসা অনেক কমে গেছে ?

মহেশ চৌধুরির আশ্রম স্থাপিত হওয়ার পর বিপিনের আশ্রমে লোকজনের যাতায়াত আরও কমিয়া গেল—একরকম বন্ধই হইয়া গেল বলা চলে। নূতন আশ্রমের উদ্‌বোধন উৎসবটা হইল বেশ জমকালো। শহর হইতে দু-চারজন নামকরা লোক আসিল, খবরের কাগজে বিস্তারিত বিবরণও বাহির হইল। বিপিনের আশ্রমে যারা সদানন্দের উপদেশ শুনিতে যাইত তারা সকলে তো আসিলই, কাছে ও দূরের আরও অনেক গ্রামের নারী-পুরুষ ছেলেমেয়ের আবির্ভাবও ঘটিল। ভিড় হইল ছোটোখাটো একটি মেলার মতো। তার উপর আবার ছিল কাঙালি ভোজনের ব্যবস্থা। ক-দিন ছোটোখাটো গ্রামটির উপর দিয়া যে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার প্রবাহ বহিয়া গেল তা সত্যই অভূতপূর্ব। উৎসব শেষ হইয়া গেল, দূরের যারা আসিয়াছিল সকলেই প্রায় ফিরিয়া গেল, আশ্রমের চিহ্ন হিসাবে খাড়া রহিল কেবল মহেশ চৌধুরির বাড়ির পাশে বাগানের পিছনের মাঠে মস্ত একটা নতুন চালা আর বাগানের বাঁশের গেটের উপরে এক টুকরা আলকাতরা মাখানো চারকোনা কাঠে সাদা অক্ষরে লেখা 'শ্রী শ্রী সদানন্দ স্বামীর আশ্রম'। নতুন আশ্রমে মানুষের ভিড় কিন্তু কমিল না, মানুষের মুখে

নতুন আশ্রমের আলোচনাও থামিল না। প্রত্যেক দিন দলে দলে লোক আসিয়া নতুন চালার নীচে বসে, মহেশ চৌধুরির সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও সদানন্দের বিস্তারিত উপদেশ শোনে, দলে দলে সদানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সদানন্দ যতদিন বিপিনের কাছে ছিল সাধারণ মানুষের পক্ষে তার শিষ্যত্ব লাভ করা প্রায় অসম্ভব ছিল, অনেক বাছাবাছির পর বিপিন কদাচিৎ যাকে উপযুক্ত মনে করিত তাকেই কেবল সদানন্দ শিষ্য করিত। এখানে সব বাছবিচার তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যে আসে তাকেই সদানন্দ আলিঙ্গন দেয়।

আলিঙ্গনটাই শিষ্যের দীক্ষা। এখানে মহেশ চৌধুরির পরামর্শে অথবা অনুরোধে এই নতুন প্রথায় দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। মেয়েদের জন্য ব্যবস্থাটা অবশ্য অন্যরকম, দু-পায়ের পাতার উপর মেয়েরা মাথা নামাইলে সদানন্দ মাথার উপর দুটি হাত রাখিয়া তাদের শিষ্যত্ব দান করে। বিভূতি আশ্রমের ম্যানেজার। প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো খাতায় সে সকলের নাম, ঠিকানা এবং প্রণামির পরিমাণটা লিখিয়া রাখে।

মন্ত্রশিষ্যও করা হয় কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। মন্ত্রের জন্য বিশেষভাবে যারা আবেদন করে ও আগ্রহ জানায়, কেবল তাদেরই কানে সদানন্দ মন্ত্রদান করে।

মহেশ চৌধুরিই একদিন সবিনয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া সদানন্দকে বুঝাইয়া দিয়াছিল, হাতজোড় করিয়া বলিয়াছিল, প্রভু, গুরু অনেকের আছে, গুরু ত্যাগ করাটা ঠিক উচিত কাজ হয় না। মন্ত্র দেওয়া তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শুধু মন্ত্র নিয়ে শিষ্য হবার নিয়ম করলে যারা আগেই মন্ত্র নিয়েছে তাদের বড়ো মুশকিল হবে। এমনই শিষ্য হতে দোষ নেই, উপদেশ শুনবে, সাধন ভজন পূজা অর্চনার নিয়মকানুন জেনে যাবে, সৎকাজে যোগ দেবে, আশ্রমের নিজের লোক হয়ে থাকবে, তাই যথেষ্ট। এ ভাবে শিষ্য করলে কারও আশ্রমে যোগ দিতে কোনো অসুবিধা থাকবে না।

সদানন্দ একটু খুঁতখুঁত করিয়া বলিয়াছিল, কিন্তু নির্বিচারে সকলকে—

মহেশ চৌধুরি বলিয়াছিল, বেশি বাছাবাছি করে লাভ কী প্রভু ? সবাইকে নিলে আমাদের ক্ষতিও কিছু নেই। ফাঁকিবাজ বাজে লোক হয়, খাতায় শুধু তার নামটা থাকবে। শিষ্য হলেও শিষ্য হয়েছে বলেই বিশেষ কোনো অধিকারও দেওয়া হবে না যে ক্ষতি করবার সুবিধা পাবে। ক্ষতি কবার ইচ্ছা যদি কারও থাকে, শিষ্য হিসাবে খাতায় নাম উঠলেও যতটা সুযোগ পাবে শিষ্য না হয়েও ততটা সুযোগ পাবে।

শুনিতে শুনিতে সদানন্দের মনে হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরি বুঝি তাকে আশ্রম পবিচালনার কায়দাকানুন শিখাইয়া দিতেছে—গুরু যেমন শিষ্যকে শিখায়। মহেশ চৌধুরির মুখে বিনয় ও ভক্তির স্থায়ী ছাপ থাকে, জোড়হাতে দেবপূজার মন্ত্রোচ্চারণের মতো করিয়া সে কথা বলে, তবু আজকাল প্রায়ই সদানন্দের এ রকম মনে হয়। মনে হয়, এর চেয়ে বিপিন যেন ভালো ছিল, অন্তরালে সে তর্ক করিত, উপদেশও দিত, হুকুমও দিত, কিন্তু সে সব ছিল বন্ধুর মতো, তার কাছে নিজেকে এতটা অপদার্থ মনে হইত না।

আরও একটা ব্যাপার সদানন্দ লক্ষ করে। তার নামে আশ্রম করা হইয়াছে, সেই একরকম ভিত্তি এই আশ্রমের অথচ খাতির যেন লোকে তার চেয়ে মহেশ চৌধুরিকেই করে বেশি। লোকের কাছে নিজের দামটা আগের চেয়ে যে কমিয়া গিয়াছে এটা সদানন্দ স্পষ্টই অনুভব করিতে পারে। সকলের মুখে আর যেন আগের সেই সভয় ভক্তির ছাপটা খুঁজিয়া মেলে না, সকলের কথায় ও ব্যবহারে মানুষের বদলে নিজেকে আর দেবতা হিসাবে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায় না। মহেশ চৌধুরির উপরে লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা যেন হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে দিন দিন। এত যে ন্যাকামি মহেশ চৌধুরি করে, সকলের কাছে সব সময় মোসাহেবের মতো নত হইয়া থাকে,—তবু !

মাঝে মাঝে সদানন্দ সন্দেহমূলক ক্ষীণ একটা অনুভূতির মধ্যে নিজের চালচলনের ভাঙনধরা পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। আগের মতো তেজ কী আর তার নাই ? আগের সেই সহজ

আত্মবিশ্বাস ? একটু একটু ভয় কি সে করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে সাধারণ তুচ্ছ মানুষগুলিকে ? মানুষের সংস্পর্শে আসিলে মাঝে মাঝে হঠাৎ সদানন্দ নিজেকে যাচাই করিবার চেষ্টা করে, কোথায় কী ঢিল হইয়া গিয়াছে তার নিজের মধ্যে যা সকলে টের পাইয়া যাইতেছে ? টেরও কি পাইয়া যাইতেছে সত্যসত্যই ? আর কিছুই সে ভালো করিয়া বুঝিতে পারে না, মৃদু একটা অস্বস্তিবোধের স্থায়ী অস্তিত্ব ছাড়া, আত্মবিশ্লেষণের অন্যমনস্কতা সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইবার পব যেটা আরও বেশি জোরালো হইয়া পড়ে। সদানন্দ জানে, খুব ভালো করিয়াই জানে, এমন কোনো পরিবর্তন তার বাহিরে প্রকাশ পায় না কারও পক্ষে যেটা লক্ষ করা সম্ভব। তবু মনটা কেন যে খুঁতখুঁত কবিতে থাকে ! আগে কথা বলাব মধ্যেও একটা বিস্ময়কর আনন্দ ছিল, নিজের কথা শুনিতে শুনিতে নিজেই সে মুগ্ধ হইয়া যাইত, সকলের অভিভূত ভাব দেখিয়া নিজেব মধ্যে একটা অপার্থিব শক্তির সঞ্চার অনুভব কবিত। এখন কথা হযতো সে বলে আগেই মতোই, সামনেব ভীরু, অসহায় আর অসুখী শিষ্যগুলিকে সুখ ও শান্তির সন্ধান দিবার অনন্যসাধাবণ ক্ষমতা যে তার আছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই হয়তো বলার সময়টা তার থাকে না, কিন্তু তারপব একসময তার মনে হইতে আবম্ভ হয়, সমস্ত জড়াইয়া ফলটা সুবিধাজনক হইল না। এই ভীরু অসহায় আর অসুখী শিশুগুলির মনে তার ব্যক্তিত্ব ও উপদেশের প্রভাব আগের মতো কাজ কবিতেছে না। করা সম্ভবও নয়, কাবণ নিজেই কী সে বুঝিতে পারিতেছে না যে আব সব ঠিক আগের মতো থাকিলেও সমগ্রভাবে ধবিলে তার ব্যক্তিত্ব ও উপদেশের প্রভাবটা আব আগেব মতো নাই ?

ব্যাপাবটা সদানন্দের বড়োই দুর্বোধ্য মনে হয়। কোনো কারণ খুঁজিয়া পায় না। কখনও সে ভাবে, সব কী তাব নিজের কল্পনা, আজকাল একটু কল্পনাপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে ? কখনও ভাবে, এখানকার প্রকাশ্য খোলাখুলি জীবন ভালো লাগিতেছে না বলিয়া, সব বিষয়ে বিরক্তি জাগিতেছে বলিয়া, এ বকম হইতেছে ? বিপিনের মতো একজন তাকে আড়াল কবিয়া রাখে না, অধিকাংশ সময় নিজের একটি কুটিরেব অন্তরালে নিজেব মনে একা থাকাব সুযোগ পায না, সেই জন্য কি আনন্দ, উৎসাহ, শান্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে ? অথবা মাধবীলতার জন্য মন কেমন করিতেছে, চিবদিনেব জন্য মেয়েটা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া ?

কিন্তু মাধবীলতার জন্য বিশেষ কোনো কষ্ট হইতেছে তাও সদানন্দের মনে হয় না। প্রথমটা সত্যই বড়ো রাগ হইয়াছিল, পছন্দসই একটা খেলনা হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া ফসকাইয়া গেলে ছোটো ছেলের যেমন অবুঝ রাগ হয়, খেলনাটা একেবারে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিবার সাধ জাগে, কিন্তু সে সব সাময়িক প্রতিক্রিয়া কি মিটিয়া যায় নাই ? মাধবীলতাকে দেখিলে এখন কী একটা বিতৃষ্ণার ভাবই জাগে না তার ?

অন্য একটা কাবণেও মাধবীলতার উপব আজকাল মাঝে মাঝে সদানন্দের রাগ হয়। মাধবীলতা প্রাণপণে তাকে এড়াইয়া চলে। কথা তো বলেই না, সামনে পড়িলে তাড়াতাড়ি সরিয়া যায়। মাঝে মাঝে মহেশ চৌধুবির পাবিবারিক সান্ধ্য মজলিশে বাধ্য হইয়া যদিবা হাজির থাকে, সদানন্দের যতটা তফাতে সম্ভব, পারিলে একেবারে পিছন দিকে, বসিবার চেষ্টা করে।

একদিন খুব ভোরে বারান্দায় মাধবীলতাকে একা দেখিয়া সদানন্দের একটু আলাপ করার শখ চাপিয়াছিল। নিছক আলাপ, আর কিছু নয়। হাসিমুখে সে বলিয়াছিল, এই যে মাধু। তোমার যে আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না।

আমার বিয়ে হয়ে গেছে জানেন ? বলিয়া মাধবীলতা তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করিয়াছিল। মাধবীলতার বাড়াবাড়িতে সদানন্দের বড়ো জ্বালা বোধ হয়, সেই সঙ্গে হাসিও পায়। এত অবিশ্বাস কেন তাকে ? এ রকম হীন অমানুষ মনে করা ? কী ছেলেমানুষ মাধবীলতা ! তাই বটে, মেয়ে জাতটাই এ রকম উদ্ভট হয় বটে !

এ সব ছাড়াও সদানন্দের মানসিক জগতে আরও একটা ব্যাপার ঘটে, যেটা আরও গুরুতর, আরও মারাত্মক, আরও বিস্ময়কর, আরও গভীর এবং আরও অনেক কিছু। অন্য কেউ নিজের মনের এ রকম একটা অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলে সে সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়া নিত লোকটার মাথা খারাপ হইয়াছে, কিন্তু নিজের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটায় সে বেশ বুঝিতে পারে মাথা খারাপ হওয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নাই, এটা মনোবিকার নয়, মনের মধ্যে তার এলোমেলো হইয়া যায় নাই কিছুই। যা কিছু অজানা ছিল, বুদ্ধির অগম্য ছিল, দুর্বোধ্য সংকেতের মতো সে সব অস্পষ্ট স্পষ্টতা লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এতকাল নিজের সমগ্র নিজস্বতা বলিয়া যা সে জানিত, পরিবর্তনহীন বিচ্ছিন্নতা বজায় থাকিয়াও ওই অভিনব স্পষ্টতার সঙ্গে একটা আতঙ্কময় ফাঁপর-ফাঁপর ভাবের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সদানন্দ জানে সব সে বুঝিতে পারিতেছে, তবু বারবার নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে ব্যর্থ হইয়া যায়। বুঝাইবার চেষ্টাটা হয় নানাভাবে। ধরা যাক, প্রকাণ্ড গভীর একটা বন, যার মধ্যে আনুমানিক আবছা অন্ধকার, বাঘ ভালুক সিংহ, চিরস্থায়ী ভয় ও বিষাদ—বনের ঠিক বাহিরে ঝলমলে সূর্যালোকে দাঁড়াইয়া অজ্ঞাত কারণের অসহ্য শোকে শান্ত ও নির্বিকার সদানন্দ চুপচাপ গা এলাইয়া দিয়া মাটি হইতে কয়েক হাত উঁচুতে বাতাসে ভাসিতেছে। এ রকম আরও কয়েকটা ইচ্ছাকৃত স্বপ্নের সাহায্যে সদানন্দ নিজেব কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করে, নিজের মনের অপূর্ব ব্যাপারটা বুঝিতে পারে বলিযা তার যে ধারণা আছে, সেটা মিথ্যা নয়। কিন্তু স্বপ্ন দেখার সময় স্বপ্ন যা থাকে এবং জাগিয়া থাকার সময় স্বপ্ন যা হইয়া যায়, তাব পার্থক্যটা ঘুচাইয়া দিবার মতো ক্ষমতা তার হয় না, তাই ঘুমন্ত অবস্থার স্বাভাবিক স্বপ্নকে জাগ্রতাবস্থায় ব্যাখ্যা হিসাবে সামনে খাড়া করিয়া জাগ্রত অবস্থার স্বাভাবিক স্বপ্নের সঙ্গে কোনো মিল সে খুঁজিয়া পায় না। জাগ্রত অবস্থার কল্পনার স্বপ্ন হইলেও কথা ছিল, বিশেষ প্রশ্রয় না দিলেও বিচিত্র, উদ্ভট আর অসম্ভব অনেক কিছুকে সম্ভব ধরিয়া নিয়া খাপছাড়া আনন্দ উপভোগের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সদানন্দের পরিচয় আছে। কিন্তু সে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

একবার কেবল সদানন্দের মনে হইয়াছিল, এই কী প্রেম, প্রিয়কে হারানোব পর প্রেম যা হয়, আসল খাঁটি প্রেম ? মাধবীলতাকে হাবানোর পর হইতেই তো তার মধ্যে এ রকম হইতেছে ? কিন্তু নিজের কাছে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া ব্যাকুলতা এত সহজে মিটাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই। অজানা ও দুর্বোধ্য স্মৃতি হোক, উপলব্ধি হোক, ক্ষয়িতমূল আত্মবিকাশের বিচ্ছিন্ন অংশ হোক, অথবা আর যাই হোক, স্পষ্টতর হওয়ার যে প্রক্রিয়া চলিতে থাকে তার সঙ্গে মাধবীলতার কোনো সম্পর্ক নাই। মাধবীলতা সম্বন্ধে মানসিক দুর্বলতা ঘটিবাব একটা আশঙ্কা মনে আসিযাছিল, সেই আশঙ্কাটার জন্যই এ ধরনের কথা সদানন্দের মনে আছে।

একসময় হঠাৎ দরজা বন্ধ করিয়া সদানন্দ ঘরের কোণে মাটিতে বসিয়া পড়ে, আসন থাকিলেও মনে থাকে না। মেরুদণ্ড সিধা করিয়া বসে, চোখ বন্ধ করে, হাতজোড় করে—ইচ্ছায়ও নয় অনিচ্ছায়ও নয়। বিড়বিড় করিয়া বলিতে থাকে—হে ঈশ্বর, দয়া করো। ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাক, এ সময় আমায় দয়া করো। তুমি তো জানো আমি স্বীকার করি না তুমি আছ, তবু যদি থাক, দয়া করো। তুমি তো সব জানো—তুমি তো জানো কী উদ্দেশ্যে আমি এখন মেনে নিচ্ছি যে তোমায় আমি স্বীকার করি না—তোমায় স্বীকার করি না মেনে নেওয়ার উদ্দেশ্যটা কেন মেনে নিচ্ছি তাও তো তুমি জানো—কথা জড়াইয়া সদানন্দের কথা বন্ধ হইয়া যায়। মাথাটা প্রণাম করার ভঙ্গিতে মাটিতে ঠেকাইয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে।

এমনিভাবে ভাবোচ্ছ্বাসের নেশায় সদানন্দ অন্যমনস্কও হয়, নিজেকে শ্রান্ত ও শান্ত করিয়া ঘুমও পাড়ায়।

আশ্রমের বড়ো চালাটার পাশে সদানন্দের জন্য একখানা নতুন ঘর তোলা হয়। সদানন্দ হাসিয়া বলে, বাড়িতে রাখতে ভরসা হচ্ছে না মহেশ ?

মহেশ আহত হইয়া বলে, প্রভু ?

আহা, এত সহজে ঘা খাও কেন বলো তো মহেশ ? তামাশা বোঝ না ?

স্তব্ধ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মহেশ হঠাৎ বলে, না প্রভু, আমি সত্যই বড়ো অপদার্থ। আপনি যা বললেন ওই জন্যই আপনাকে সরিয়ে দিচ্ছি।

মহেশ চৌধুরির মুখে কথাটা এমন খাপছাড়া শোনায বলিবার নয। অন্তঃপুরে তাকে স্থান দিতে সাহস না হওয়াও মহেশের পক্ষে যেমন আশ্চর্য, তার সামনে এ ভাবে স্বীকার করার সাহস হওযাও তার চেযে কম আশ্চর্য নয়। এই মহেশ চৌধুরিই না হাতুড়ি দিয়া নিজের মুখে আঘাত করিয়াছিল, মাধবীলতাকে অপমান করার জন্য সদানন্দের উপর ছেলের রাগ হওযার প্রায়শ্চিত্ত বাবদে ?

আমায় তুমি আর বিশ্বাস কর না, না মহেশ ?

বিশ্বাস করি বইকী প্রভু, আপনি তো দেবতা। তবে সাধনার যে স্তরে আপনি পৌঁছেছেন, এখন আর আপনাকে ঘরগেরস্থালির মধ্যে রাখতে ভরসা হয না। আপনার জন্যে সারাদিন আমার বুকের মধ্যে কাঁপে প্রভু। আমি এ অবস্থাটা পার হতে পারিনি প্রভু, তবে আমি তো অপদার্থ বাজে লোক, আমার সঙ্গে আপনার তুলনাই হয় না,—আপনি পারবেন। আপনি নিশ্চয পার হয়ে যাবেন।

সদানন্দ ভ্রু কুঁচকাইয়া মহেশ চৌধুরির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, বুঝিয়াও যেন বুঝিয়া উঠিতে পারে না মানুষটাকে, দ্বিধা সন্দেহ ভয় শ্রদ্ধা মমতা প্রভৃতি কত বিভিন্ন মনোভাব যে পলকে উদয় হয় তার হিসাব থাকে না। যা বলিল মহেশ চৌধুরি তাই কি তবে ঠিক? মিথ্যা কথা তো মহেশ বলে না। কেমন করিয়া লোকটির সম্বন্ধে এই ধারণাটা তার নিজের মনেই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল নিজেই সদানন্দ তা জানিতে পারে নাই, কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে এই ধারণাটি আর সব মনোভাবকে যখন চাপা দিয়া মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখন সদানন্দ এক অদ্ভুত কাজ করিয়া বসে। হঠাৎ মহেশের পায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, মহেশ, আমায় তুমি রক্ষা করো—বাঁচাও আমায়।

তিন সন্ধ্যা পরম ভক্তিভরে যার পায়ের ধুলা মাথায় ঠেকায় তাকে এ ভাবে পায়ে পড়িতে দেখিয়া মহেশ চৌধুরির মূর্ছা যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মানুষটা সে সত্যই খাপছাড়া। আরও কত তুচ্ছ কারণে কতবার যে ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু এখন ব্যাকুলতার বদলে আত্মপ্রতিষ্ঠাই যেন তার বাড়িয়া যায়। সহজভাবেই সে বলে, প্রভু, এ রকম করবেন না। এই জন্যই তো গেরস্থালির ভেতর থেকে আপনাকে সরিয়ে দিচ্ছি। আপনাকে রক্ষা করার ক্ষমতা কী আমার আছে প্রভু ? নিজেকে আপনার নিজেরই রক্ষা করতে হবে—ভেবে দেখুন, নিজেকে আপনার নিজেরই রক্ষা করতে হবে।

তারপর সদানন্দ উঠিয়া বাগানে চলিয়া যায়, লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ সদানন্দ ! গেরস্থালি ! কতবার মহেশ কথাটা উচ্চারণ করিয়াছে। মানুষটা কী কম চালাক মহেশ, কম ফন্দিবাজ ! মেয়েমানুষ নয়, গেরস্থালি ! গেরস্থালির মধ্যে সদানন্দকে আর রাখিতে ভরসা হইতেছে না, তাই মহেশ তাকে সরাইয়া দিতেছে ! বাগান হইতে সদানন্দ মাঠে যায়, সেখানে নেংটি পরা কে যেন একটা মানুষ একটা বাঁধা গোরুকে প্রাণপণে মারিতেছিল। দেখিয়াই প্রাণপণে ছুটিতে ছুটিতে কাছে গিয়া সদানন্দ লাঠিটা ছিনাইয়া নিয়া লোকটাকে এক ঘা বসাইয়া দেয়। এমন করে মারছিস, লাগে না গোরুটার ? তারপর লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া লোকটার যেখানে মারিয়াছিল সেখানে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলে, আহা, তোমার লেগেছে বাবা ? তারও পরে লোকটিকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া মহেশকে বলে, একে একটা টাকা দিয়ে দাও তো মহেশ।

গরিব চাষাভুসা মানুষ সাধুসন্ন্যাসী দেখিয়াই ভড়কাইয়া যায়। তার উপর, সাধুটি কে তাও তার অজানা ছিল না। থতোমতো খাইয়াই ছিল, এতক্ষণে বলিল, মোটে একটা, আজ্ঞে ?

শুনিয়াই তো সদানন্দ চটিয়া গেল। ওরে হারামজাদা, যা করে মারছিলি গোরুটাকে, তোকে খুন করে ফেলা উচিত ছিল। তার বদলে একটা টাকা দিচ্ছি, তাতে তোমার পোষাল না ? যা এখান থেকে, ভাগ, কিছু পাবি না তুই।

আজ্ঞে না কর্তা, যা দিবেন মাথা পেতে লিব।

কিছু দেবে না তোকে—একটি পয়সাও নয়। যা এখান থেকে—গেলি ? দিয়ো না মহেশ, খপরদার দিয়ো না।

রাগের মাথায় সদানন্দকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া টাকার আশা ছাড়িয়া লোকটি তখনকার মতো পালাইয়া যায়। টাকাটা কোমরে গুঁজিয়া সদানন্দ দাঁড়াইয়া থাকে। ঘণ্টাখানেক পরে আশ্রমের চালার নীচে মস্ত আসর বসিলে সকলের সামনেই জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সদানন্দ বলে, আমার মনটা বড়ো দুর্বল হয়ে গেছে, মহেশ।

মহেশ চৌধুরি ভরসা দিয়া বলে, তা তো যাবেই প্রভু ?

ভরসা পাওয়ার বদলে সদানন্দ কিন্তু আবার ভয়ানক চটিয়া ধমক দিয়া বলে, যাবেই মানে ? কী যে তুমি পাগলের মতো বলো তার ঠিক নেই।

চোদ্দো

সদানন্দ ভাবে : আমি নিজে যে কী সাধনা করছি, আমি নিজে তা জানি না কেন ? সাধনার কোন স্তরে আমি পৌঁছেছি আমার চেয়ে মহেশ চৌধুরি তা বেশি জানে কেন ? ব্যাপারখানা কী ?

নিজের কাছে ফাঁকি খুব ভালোরকমেই চলে কি না, সদানন্দ তাই ভাবিয়া পায় না ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় কীভাবে কোন সাধনাটা সে কবে করিয়াছে। আসন করিয়া অনেক সময় বসিয়া থাকিয়াছে বটে, আবার অনেক সময় বসিয়া থাকেও নাই। কিন্তু আসন করিয়া বসিয়া থাকিলেই কী সাধনা হয়, আর কোনো রীতিনীতি নিয়মকানুন সাধনের নাই ? আসন করিয়া বসিয়াই থাক আর বিছানায় চিত হইয়া পড়িয়াই থাক, চিন্তা সে যে একরকম সব সময়েই করে, জীবনের তুচ্ছতম বিষয়টির মধ্যে রহস্যময় দুর্বোধ্যতা আবিষ্কার করা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট রহস্যগুলির ফাঁকি ধরিয়া ফেলা পর্যন্ত নানা ধরনের বিচিত্র চিন্তায় মশগুল হইয়া সে যে দিন কাটাইয়া আসিতেছে, এটা তার খেয়ালও হয় না। দিনের পর দিন নিজেকে নতুন চেনায় চিনিয়াছে, আবার নতুন অচেনায় আত্মহারা হইয়া গিয়াছে। এ ব্যাপারটাকে সদানন্দ সাধারণ বাঁচিয়া থাকার পর্যায়েই ফেলে। এক-একজন মানুষ থাকে যারা ঘরে বসিয়া এলোমেলো লেখাপড়া করে, আগে শেষ করে দ্বিতীয় ভাগ তারপর ধরে প্রথম ভাগ, জ্ঞান হয়তো তাদের জমা হয় অনেক ডিগ্রিধারী নামকরা জ্ঞানীর চেয়ে বেশি, কিন্তু জ্ঞান বলিয়া কিছু যে তারা সংগ্রহ করিয়াছে এ ধারণাটাই তাদের মনে আসে না। ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভাঙিয়া যেখানে উঠিতে হয়, বাঁশের খুঁটি বাহিয়াও যে সেইখানেই উঠিয়া পড়িয়াছে, উঠিবার পরেও অনেকে তা বিশ্বাস করিতে চায় না। সাধুসন্ন্যাসীর যোগ সাধনার বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ হইলেও বরং কথা ছিল, এ সব যে ছেলেখেলা নয় সদানন্দ তা ভালো করিয়াই জানে। নিজের অজ্ঞাতসারে সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া চলা এবং কঠিন ও বিপজ্জনক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছানো যে কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে কোনোমতেই তার মাথায় ঢুকিতে চায় না।

রাত দুপুরে ঘুম আসে না। অনেকক্ষণ ছটফট করিয়া মহেশ চৌধুরিকে ডাকিয়া পাঠায়।

ভয় করছে প্রভু ?

প্রশ্ন শুনিবামাত্র সদানন্দ টের পায়। এতক্ষণ ভয়ই করিতেছিল বটে। একটা দুর্বোধ্য বীভৎস আতঙ্ক মনের মধ্যে চাপিয়া বসিয়াছে।

তবু সাহস করিয়া সদানন্দ বলে, তুমি ভুল করছ মহেশ। আমি তো কোনোদিন সাধনভজন কিছু করিনি।

রাত দুপুরে জেগে বসে এই যে হিসাব করছেন সাধনভজন কিছু করেছেন নাকি, এটা কী প্রভু ?

সদানন্দ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে।

জোড়হাতে সবিনয়ে মহেশ চৌধুরি সদানন্দকে নানারকম উপদেশ দেয়। সদানন্দ নিজে কেন জানে না সে সাধক ? কেন জানিবে! সাধক যে নিজেকে সাধক বলিয়া জানে, সেই জানাটা কী, সদানন্দ কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছে ? অনন্যসাধারণ প্রক্রিয়াগুলি ওই জ্ঞানের জন্ম দেয় আর যতদিন সাধক ওই জ্ঞানকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে না পারে ততদিন সিদ্ধিলাভের কোনো ভরসাই থাকে না। সদানন্দের জানিবার তো কোনো কারণ ঘটে নাই যে সে সাধনা করিতেছে, প্রক্রিয়া সে ঠিক করিয়া গিয়াছে নিজে, ও সব তার কাছে বাঁচিয়া থাকারই অঙ্গস্বরূপ। তা ছাড়া, যে রকম সাধনা সে কোনোদিন করে নাই লোকের কাছে নিজেকে সেই রকম সাধক বলিয়া পরিচিত করার ফলে মনে মনে একটা তার ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, সাধনার ব্যাপারে সে ফাঁকিবাজ। আসলে কিন্তু—

আমি যে ফাঁকিবাজ তাও দেখছি তুমি জানো, মহেশ ?

ফাঁকিবাজ তো আপনি নন প্রভু !

সদানন্দ চটিয়া বলে, এই বলছ লোককে ফাঁকি দিই, সঙ্গে সঙ্গে আবার বলছ ফাঁকিবাজ নই, তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারি না মহেশ।

আজ্ঞে, দশজনকে জানিয়েছেন, আপনি সাধু—তাতে তো ফাঁকিবাজি কিছু নেই। দশজনের ভালোর জন্য নিজেকে সাধু ঘোষণা করাও সাধু ছাড়া অন্যের দ্বারা হয় না প্রভু। নিজের জন্য তো চাননি, লোকে সাধু ভাবুক অসাধু ভাবুক আপনার বয়ে গেল।

সদানন্দ সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িয়া বলে, নিজের জন্য চেয়েছিলাম কিনা কে জানে !

না, প্রভু, না। তাই কি আপনি পারেন ?

খানিক পরে প্রকারান্তরে সদানন্দ মহেশ চৌধুরিকে এখানে শুইয়া থাকার অনুরোধ জানায়, কিন্তু মহেশ রাজি হয় না। বলে যে, ভয়কে এড়াইবার চেষ্টা করিলে তো চলিবে না, ভয়কে জয় করিতে হইবে।

মহেশ চৌধুরির তুলনায় নিজেকে সদানন্দের অপদার্থ মনে হয়।

গভীর হতাশায় মন ভরিয়া যায়, রাগের জ্বালায় দেহের মধ্যে কী যেন সব পুড়িয়া যাইতে থাকে। মহেশ চৌধুরির বাঁচিয়া থাকার কোনো মানে হয় না, এই ধরনের উদ্ভট চিন্তা অসংখ্য খাপছাড়া কল্পনার আবরণে আসিয়া ভিড় করে। ক্রমে ক্রমে একটা বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার সে লক্ষ করে। মহেশ চৌধুরির একটা বড়ো রকম ক্ষতি করার চিন্তাকে প্রশ্রয় দিলেই হঠাৎ নিজেকে যেন তার সুস্থ মনে হইতে থাকে, দেহমনের একটা যন্ত্রণাদায়ক অসুস্থ অবস্থা যেন চোখের পলকে জুড়াইয়া যায়। যে আতঙ্কময় ফাঁপর ফাঁপর ভাবটা আজকাল তাকে থাকিয়া থাকিয়া আক্রমণ করে, আর যেন তার পাত্তাই পাওয়া যায় না। মহেশ চৌধুরিকে মনে মনে হিংসা করিবার সময়টা জাগ্রত স্বপ্নের প্রভাব হইতে সে মুক্তি পায়, মাথার ঝিমঝিমানি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বাতাসে ভাসিয়া বেড়ানোর বদলে হঠাৎ যেন শক্ত মাটিতে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া টের পায়।

মহেশ চৌধুরিকে তীব্রভাবে ঘৃণা করিয়া, দশজনের কাছে তাকে হীন প্রতিপন্ন করার সম্ভব অসম্ভব মতলব আঁটিয়া আর নিজেকে তার চেয়ে ছোটো মনে করার প্রতিক্রিয়ায় জর্জরিত হইয়া গিয়া সদানন্দ আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। অন্তত তার তাই মনে হয়। ভয়টা যে এড়ানো যায়, রক্ত চলাচল

শ্লথ করিয়া দেওয়ার মতো উত্তেজনাবিহীন সর্বগ্রাসী ভয়, তাও কি কম ? মহেশ চৌধুরি অবশ্য ভয় এড়ানোর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এ সব ব্যাপারের সে কী বোঝে, কী দাম আছে তার উপদেশের ? সদানন্দকে উপদেশ দিতে আসে, স্পর্ধাও কম নয় লোকটার !

দিন কাটিয়া যায়। মহেশ চৌধুরি শান্ত চোখে সদানন্দের চালচলন আর ভাবভঙ্গি লক্ষ করে ! মুখখানা যেন তার দিনদিন অল্পে অল্পে বিষণ্ণ ও গম্ভীর হইয়া উঠিতে থাকে।

একদিন মহেশ চৌধুরি বলে, প্রভু ?

সদানন্দ একটা শব্দ করে, যেটা জবাব হিসাবেও ধরা যায়, আবার অবজ্ঞা হিসাবেও ধরা যায়।

আর এগোতে পারছেন না প্রভু, না ?

কীসের এগোতে পারছি না ? কে বললে তোমাকে এগোতে পারছি না ?

মহেশ চৌধুরির চোখ ছলছল করিতে থাকে, এগোতে না পারলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, পিছিয়ে আসছেন কেন প্রভু ? এখন পিছু হটতে শুরু করলে কী আর উপায় আছে ! প্রথমটা একটু ভালো লাগে, কিন্তু দুদিন পরে নিজের হাত পা কামড়াতে ইচ্ছা হবে। এমন যন্ত্রণা পাবেন এখন তা ভাবতেও পারবেন না।

তোমার উপদেশ বন্ধ করো তো মহেশ।

উপদেশ নয়, কথাটা মনে পড়িয়ে দিচ্ছি। নিজেই বুঝে দেখুন, কী বিপদ ঘটাচ্ছেন নিজেব।

সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও সদানন্দ কিছু কিছু বুঝিতে পাবে। মহেশ চৌধুরির সম্মুখ হইতে ছুটিয়া পালানোর এ রকম জোরালো ইচ্ছা আগে তার হইত না এবং মহেশ চৌধুরির দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবার কাজে এতটা শক্তিক্ষয়ও করিতে হইত না ! নতুন একটা অনুভূতি আজকাল তার কাছে ধরা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, মানুষের জীবনের ব্যর্থতার অনুভূতি। অনুভূতিটা একেবারে নূতন, এ পর্যন্ত চাপা পড়া সংকেতের মতোও কোনোদিন অনুভব করে নাই। মানুষের জীবনেব ব্যর্থতার কথা অবশ্য সে অনেক ভাবিয়াছে, মাঝে মাঝে গভীর বিষাদে হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে যেন ছিল অন্য জিনিস। রোগে শোকে একজন মানুষকে কষ্ট পাইতে দেখিলে সহানুভূতির মধ্যে যে বিষাদ জাগিত, সমস্ত মানুষের জীবনের মূল্যহীনতা জাগাইয়া তুলিত সেই বিষাদ। কিন্তু এখন সে যা অনুভব করে সেটা যেন ঠিক বিষাদ নয়। মানুষের বাঁচিয়া থাকার কোনো অর্থ নাই, তার নিজের জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত লোক বাঁচিয়া ছিল তাহাদের জীবনও ব্যর্থ এবং ভবিষ্যতে যত লোক পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে তাদের জীবনও ব্যর্থ— কিন্তু তাতে যেন কিছু আসিয়া যায় না। ব্যর্থতার চেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য আর নাই, জীবনের প্রতিকারহীন জীবনব্যাপী ব্যর্থতা—। অথচ তাও যেন সদানন্দের কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। নির্বিকার ভোঁতা একটা ক্ষোভ শুধু সে অনুভব করে। জ্বর আসিবার আগে শরীর ম্যাজম্যাজ করার মতো এটা কি ভয়ানক কিছুর সূচনা ?—মহেশ চৌধুরির আলোচনা এই প্রশ্ন আর ভয় তার মধ্যে জাগাইয়া দেয়।

মহেশ চৌধুরির ভক্তিশ্রদ্ধা ক্রমে ক্রমে যেন কমিয়া আসিতে থাকে। জোড়হাতে ছাড়া সদানন্দের সঙ্গে যে একরকম কথাই বলিত না, আজকাল হাত জোড় করিতে ভুলিয়া যায়। প্রভু শব্দটাও তার মুখে শোনা যায় কদাচিৎ। মহেশ চৌধুরির ভক্তি শেষের দিকে সদানন্দকে বিশেষ কিছু তৃপ্তি দিত না, কিন্তু ভক্তির অভাব ঘটায় আজকাল তার ভয়ানক রাগ হয়।

সভায় কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে সকলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দ্যাখে। মহেশ চৌধুরির মতো অন্য সকলের ভক্তি শ্রদ্ধাও কি কমিয়া গিয়াছে ? এতকাল যাদের সে শিশু মনে করিয়া আসিয়াছে, মতামত নিয়া কোনোদিন মাথা ঘামায় নাই, আজকাল তাদের তাকানোর ভঙ্গিতে অনুকম্পা আর অবজ্ঞা আবিষ্কার করিয়া বুকের মধ্যে হঠাৎ তার ধড়াস করিয়া ওঠে। কী করিয়াছে সে ? কার কাছে কী অপরাধ করিয়াছে ? কার সঙ্গে কীসের বাধ্যবাধকতায় সে আটক

পড়িয়া গিয়াছে ? দেহবাদী এইসব অপদার্থ মানুষ কেন তাকে সর্বদা ইঙ্গিত করিতে   আমরা কাপুরুষ, কিন্তু হে মহাপুরুষ, তোমার চেয়ে কত সুখেই আমরা বাঁচিয়া আছি !

নিছক ভাবপ্রবণতা ? যে জিনিসটা চিরদিন সে এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে ? বুঝিয়াও সদানন্দ যেন বুঝিতে পারে না। কোনটা মনের দুর্বলতা জানিবার পরেও সেটাকে দমন করা যে এমন কঠিন ব্যাপার এতকাল তার জানা ছিল না। আগে ঘরেব কোণে নিজের ছেলেমানুষির কথা ভাবিয়া তার হাসি পাইত, এমন তুচ্ছ একটা বিষয়কে এত বড়ো করিয়া তুলিয়াছে কেন ভাবিয়া অবাক হইয়া যাইত--আজকাল ছেলেমানুষিকে প্রশ্রয় দেওয়ার দুর্ভাবনায় মাথা যেন তার ফাটিয়া যাওযার উপক্রম করে। হাত পা নাড়ায় বাধা দিলে শিশু যেমন খেপিয়া যায, ছেলেমানুষিকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া সদানন্দেব সেই রকম উন্মাদের মতো আতর্নাদ করিতে ইচ্ছা যায়।

একবার বিপিন আসিয়া বলে, তোর চেহারাটা বড়ো খারাপ হযে গেছে সদা।

সদানন্দ রাগিয়া বলে, গেছে তো গেছে, তোর কী ?

বিপিন উদাসভাবে বলে, আমার আবার কী ! তুই মরলেই বা আমার কী।

ফিরিয়া যাওয়ার সময় মহেশ চৌধুরির সঙ্গে বিপিনের দেখা হয়। বিপিন হাসিয়া বলে, সাধুজিকে খেতে দেন না নাকি ? মুখের চামড়া যে কুঁচকে যেতে আরম্ভ করেছে মশায় ?

মহেশ চৌধুরি বলে, না খেলে কি মুখের চামড়া কুঁচকে যায় ভাই ? নিজের মনকে কুঁচকে দিচ্ছেন, মুখেব চামড়াব কী দোষ ! বিষণ্ণভাবে মহেশ চৌধুরি মাথা নাড়ে, অনেক আশা কবেছিলাম, সব নষ্ট হয়ে গেল। কী খেলাই যে ভগবান খেলেন ! এমন একটা মানুষ আমি আর দেখিনি বিপিনবাবু, অবতার বলা চলত। কী যে হল, নিজেকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলেছেন।

বিপিন অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে।

মহেশ চৌধুবি আবাব বলে, গুবুব নির্দেশ মেনে সাবা জীবন প্রাণপাত করে বড়ো বড়ো যোগী ঋষি যে স্তরে উঠতে পারেন না, উনি নিজের স্বাভাবিক প্রেরণায় বিনা চেষ্টায় সেই স্তরে পৌঁছেছিলেন। এক-একবার আমি ভাবি কী জানেন, আমিই ভুল করলাম নাকি ? আমি সচেতন কবিয়ে দিয়েছি বলে কি বিগড়ে গেলেন ? যেমন অবস্থায় ছিলেন তেমনি অবস্থায় থাকলে হয়তো নিজের চেষ্টায় আপনা থেকে সামনে এগিয়ে চলতেন।

মহেশ চৌধুরিব আপশোশ দেখিয়া বিপিন আরও অবাক হইয়া যায। এতকাল লোকটাকে একটু পাগলাটে বলিযা তাব ধারণা ছিল. আজ হঠাৎ যেন ধারণাটা নাড়া খায়। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিযা মহেশ চৌধুরি আবার বলে, এ সব লোকের মধ্যে প্রচণ্ড তেজ আর শক্তি থাকে। যেই জেনেছেন সাধনার পথে এগোতে হবে, অমনি বিদ্রোহ করে বসেছেন। সামনে এগিযে দেবার জন্য আমি একটু আধটু ঠেলা দিয়েছি বলেই বোধ হয় রাগ করে পিছু হটতে আরম্ভ করেছেন। কী সর্বনাশটাই আমি করেছি বিপিনবাবু ?

যা করেছেন ভালো উদ্দেশ্যেই তো করেছেন।

তবু আমার ধৈর্য ধবে অপেক্ষা করাই হয়তো উচিত ছিল।

দিন দশেক পরে মহেশ চৌধুরি একদিন সকালে বিপিনের আশ্রমে গেল। বিপিন আশ্রমে ছিল না, উমা আর রত্নাবলী মহেশকে আদর করিয়া বসাইল। আজকাল মহেশ চৌধুরির সম্মান বাড়িয়াছে—মাধবীলতা তার ছেলের বউ।

রত্নাবলী বলিল, আপনার ওখানে এবার আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিন ?

মহেশ হাসিয়া বলিল, আমাদের ওখানে কী কারও থাকবার ব্যবস্থা আছে ?—গিয়ে থাকতে হয়।

উমা বলিল, আমাদের যেতে দিতে আপনি আপত্তি করছেন কেন বুঝতে পারি না।

আপত্তি ? আপত্তি কীসের ! তবে কী জানেন, আপনারা গেলে বিপিনবাবু রাগ করবেন কিনা তাই আপনাদের নিয়ে যাইনি।

বিপিনবাবু রাগ করবেন বলে ইচ্ছে হলেও আমরা কোথাও যেতে পারব না ! আমরা কি বিপিনবাবুর কয়েদি নাকি ?

উঁহু, তা কেন হবেন। আপনাদের ইচ্ছে হলে আপনারা যেখানে খুশি যাবেন, কিন্তু আমার কি নিয়ে যাওয়া উচিত ? সে রকম ইচ্ছেও আপনাদের হয়নি যাওয়ার, হলে আপনারা নিজেরাই যেতেন, জোর করে যেতেন।

থাকতে দিতেন গেলে ?

থাকতে দিতাম বইকী।

রত্নাবলী একটু খোঁচা দিয়া বলিল, কিন্তু বিপিনবাবু যে রাগ করতেন ?

মহেশ সহজভাবেই বলিল, রাগ করলে কী আর করতাম বলুন। আমি আপনাদের নিয়ে যাইনি, আপনারা নিজের ইচ্ছায় গিয়েছেন তাতেও যদি বিপিনবাবু রাগ করতেন—করতেন।

আপনি আশ্চর্য মানুষ ! উমা বলিল।

উচিত অনুচিত জ্ঞানটা আপনার যেন একটু বেশি রকম সূক্ষ্ম। সব ব্যাপারেই কি এমনি করে বিচার করেন ? রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল।

বিবেক বড়ো কামড়ায় কিনা, বিচার না করে উপায় কী ? বিবেকের কামড় এড়াবার এত সহজ উপায় থাকতে জেনেশুনে সাধ করে কামড় খাওয়া কি বোকামি নয় ?

জীবনটা একঘেয়ে লাগে না আপনার ? রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল।

কেন, একঘেয়ে লাগবে কেন ? সবাই বিচার করে কাজ করে, আমিও করি। অন্য দশজনে নিজের নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মতো কর্তব্য ঠিক করে, আমিও তাই করি। কেউ জেনেশুনে ভুল করে, কেউ বুদ্ধির দোষে ভুল করে, কেউ কেউ আবার ভুল করছে কি না করছে গ্রাহ্যও করে না। আমি একটু চালাক মানুষ কিনা তাই সব সময় চেষ্টা করি যাতে ভুল না হয়। তবু আমিও অনেক ভুল করে বসি। আমার যদি একঘেয়ে লাগে, তবে পৃথিবীর সকলেরই একঘেয়ে লাগবে।

আপনিও তবে ভুল করেন ?

করি না ? মারাত্মক ভুল করে বসি। সাধুজিকে নিয়ে গিয়ে একটা ভুল করেছি।

উমা ও রত্নাবলী দুজনেই একসঙ্গে বলে, বলেন কী!

আজ্ঞে হ্যাঁ। জীবনে এমন ভুল আর করিনি।

উমা ও রত্নাবলী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।—কিন্তু বিপিনবাবু ওঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বলেই তো আপনি—

মহেশ চৌধুরি মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, তাড়াবেন কেন। দুজনে একটু মনোমালিন্য হয়েছিল, বন্ধু কি না দুজনে। বিপিনবাবু তাই রাগ করে—যাকগে, কী আর হবে ও সব কথা আলোচনা করে ?

ঘণ্টাখানেক পরে বিপিন ফিরিয়া আসিলে মহেশ চৌধুরি তাকে আড়ালে ডাকিয়া নিয়া গেল। তাকে আশ্রমে দেখিয়াই বিপিন অবাক হইয়া গিয়াছিল, প্রস্তাব শুনিয়া তার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

ওকে ফিরিয়ে আনতে বলছেন ?

আজ্ঞে, হ্যাঁ। আগের অবস্থায় ফিরে এলে হয়তো আত্মসংবরণ করতে পারবেন।

ও কি ফিরে আসবে ?

আসবেন বইকী।

বিপিন চুপ করিয়া থাকে। মাঝে মাঝে চোখ তুলিয়া তাকায় আর চোখ নামাইয়া নেয়। তারপর হঠাৎ বলে, দেখুন, আপনাকে সত্যি কথা বলি। মাঝে মাঝে আমি যে আপনার ওখানে যেতাম,

আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। সদা চলে যাওয়ার পর আমার কতগুলি ভারী মুশকিল হয়েছে, তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকে আমরা বন্ধু, ওকে ছেড়ে থাকতেও কেমন কেমন লাগছে। তাই ভেবেছিলাম, বলে কয়ে আবার ফিরিয়ে আনব। আমি অনেক বলেছি, ও কিন্তু রাজি হয়নি।

মহেশ চৌধুরি বলিল, তা জানি। আমিও ওই রকম অনুমান করছিলাম।

বিপিন চোখ বড়ো বড়ো করিয়া চাহিয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরি আবার বলিল, এতকাল রাজি হননি, এবার বললেই রাজি হবেন। এখানে উনি ভয়ানক যন্ত্রণা পাচ্ছেন।

পনেরো

বলামাত্র সদানন্দ রাজি হইল না, তবে শেষ পর্যন্ত রাজি সে হইয়া গেল। তবে একটা চুক্তি সে করিল বড়ো খাপছাড়া। প্রথমটা আরম্ভ করিল যেন একটু সলজ্জভাবে, সংকোচের সঙ্গে, বিপিনের হাঁটুর দিকে তাকাইয়া :

আমার সব কথা শুনে চলবি ?

না।

আর খানিকটা চোখ তুলিয়া সদানন্দ বলিল, কোনো বিষয়ে আমায় জ্বালাতন করবি না ?

করব।

আরও খানিকটা তুলিয়া : আমার কাছে কিছু গোপন করবি না ?

করব।

তখন সোজাসুজি চোখের দিকে চাহিয়া সদানন্দ বলিল, আর একটা কাজ করতে হবে আমার জন্যে। মাধুকে আমার চাই।

মাধুকে তোর চাই ? কী করবি মাধুকে দিয়ে—ও !

বিপিন হাঁ করিয়া সদানন্দের দিকে চাহিয়া রহিল। এ রকম সদানন্দের সঙ্গে তার কোনোদিন পরিচয় ছিল না। মাধবীলতার জন্য আকর্ষণ অনুভব করা অবস্থা বিশেষে সদানন্দের পক্ষে সম্ভব, অবস্থা বিশেষে হঠাৎ মাথাটা তার মাধবীলতার জন্য খারাপ হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়, কিন্তু এ ভাবে কোনো মেয়েমানুষকে চাওয়ার মানুষ সে নয়। যদি বা মনে মনে চায়, লজ্জায় দুঃখে ঘৃণায় লোকের কাছে মুখ দেখাইতে তার অস্বস্তি বোধ হওয়া উচিত। বিপিন নিজেই দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে, সে স্পষ্টই বুঝিতে পারে, মাধুকে পাওয়া সম্বন্ধে চেষ্টা করিবার কথা না দিলে সদানন্দ ফিরিয়া যাইবে না।

কিন্তু মাধুর যে বিয়ে হয়ে গেছে ?

তাতে কী ?

তাতে কী ? তাতে কী ? তুই একটা পাঁঠা সদা, আস্ত পাঁঠা। আগে বলিসনি কেন, বিয়ের আগে ? তোর কথায় যখন উঠত বসত ?

সদানন্দের চোখ জ্বলিয়া উঠিল—এ জ্যোতি বিপিন চেনে। মানুষকে খুন করবার আগে মানুষের চোখে এ জ্যোতি দেখা দেয়। কী জানিস বিপিন, আগে মেয়েটাকে বড়ো মায়া করতাম, তখন কী জানি এমন পাজি শয়তান মেয়ে, তলে তলে এমন বজ্জাত ! একটা রাত্রির জন্যে ওকে শুধু আমি চাই, বাস, তারপর চুলোয় যাক, যা খুশি করুক, আমার বয়ে গেল। ওর অহংকারটা ভাঙতে হবে।

এবার বিপিন যেন ব্যাপারটা খানিক খানিক বুঝিতে পারে। মাধবীলতা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, জীবনের সীমানার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তাই সদানন্দের এত জ্বালা। নিজে সে যাচিয়া

মাধবীলতাকে প্রত্যাখ্যানের অধিকার দিয়াছে তাই আজ প্রত্যাখ্যানের জ্বালা সহ্য হইতেছে না, নয়তো তাকে অবহেলা করার অধিকার কোনো মেয়ের আছে এ ধারণাই সদানন্দের মনে আসিত কিনা সন্দেহ। নিজে সে মাধবীলতাকে বড়ো করিয়াছে, মাধবীলতাকে অধিকার দিয়াছে অনেক, নিজের উপভোগের স্বাদ বাড়ানোর জন্য নিজের কামনাকে জোরালো করিয়াছে, ব্যাপক করিযাছে। নয়তো কে ভাবিত মাধবীলতার কথা—কেবল মাধবীলতার কথা নয়, সে কী করে না করে আর ভাবে না ভাবে তা পর্যন্ত ! বড়ো জোর একদিন তার কাছে মুচকি হাসির সঙ্গে আপশোশ করিয়া বলিত, ছুঁড়িটা বড়ো ফসকে গেল রে বিপিন !

নূতন কবিয়া সদানন্দকে আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করিয়া এই ব্যাপারটা নিয়াই বিপিন মাথা ঘামায়। সদানন্দের সম্বন্ধে মহেশ চৌধুরির কয়েকটা মন্তব্যও সে যেন কমবেশি বুঝিতে পারে। সদানন্দের সংযম সত্যই অসাধারণ ছিল, কারণ তার মধ্যে সমস্তই প্রচণ্ড শক্তিশালী, অসংযম পর্যন্ত। কেবল তাই নয়, সংযমও তাব মাঝে মাঝে ভাঙিয়া পড়ে। কামনার যার এমনিই জোব নাই, ভিতর হইতে যার মধ্যে বোমা ফাটিবার মতো উপভোগের সাধ কোনোদিন ঠেলা দেয় নাই, আত্মজয়ের তো তার প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু সদানন্দের মতো মানুষ, অতি অল্পবয়সেই যারা নিজেব উপর অধিকার হারাইয়া বিগড়াইয়া যাইতে আরম্ভ করে, তার পক্ষে তো হঠাৎ কদাচিৎ অন্যায় কবিয়া ফেলিয়াও অন্যায় না করিযা বাঁচিয়া থাকা, অন্যায় করার অসংখ্য সুযোগের মধ্যে অন্যায় করার সাধ দমন করিয়া চলা, আত্মোপলব্ধির সাংঘাতিক সাধনায় ব্যাপৃত থাকার মতো মনেব জোব বজায রাখা তো সহজ ব্যাপার নয়। সদানন্দের অনেক দুর্বলতা, অনেক পাগলামির একটা নতুন অর্থ বিপিনের কাছে পরিষ্কার হইয়া যায়। সে বুঝিতে পারে মহেশ চৌধুরির কথাই ঠিক, ও সব দুর্বলতা শক্তিব প্রতিক্রিয়া, ও সব পাগলামি অতিরিক্ত জ্ঞানের অভিব্যক্তি। নিজে সদানন্দ জানিত না সে সত্যসত্যই মহাপুরুষ, তাই ভাবিত লোকের কাছে মহাপুরুষ সাজিযা লোককে ঠকাইতেছে। শত শত মানুষ যে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অভিভূত হইয়া যায়, সামনে দাঁড়াইয়া চোখ তুলিয়া মুখের দিকে চাহিতে পাবে না, তাও সে ধরিয়া নিয়াছিল শুধু তার নানারকম ছল আর মিথ্যা প্রচাবের ফল। এত বড়ো বড়ো আদর্শ সে পোষণ কবিত (হয়তো এখনও করে) যে, নিজের অসাধাবণত্বকে পর্যন্ত তার মনে হইত (হয়তো এখনও হয়) সাধারণ লোকের তুচ্ছতার চেয়েও নিচু স্তরের কিছু।

বন্ধুর জন্য বিপিন একটা শ্রদ্ধার ভাব অনুভব করে, বন্ধুর আধুনিকতম এবং বীভৎস ও বিপজ্জনক প্রস্তাবটাও যার তলে চাপা পড়িয়া যায়। যোগাযোগটা তার বড়ো মজার মনে হয়। মহেশ চৌধুরি যখন সদানন্দকে মনে করিত দেবতা তখন তার জন্য বিপিনের মনে ছিল প্রায় অবজ্ঞারই ভাব, তারপর সদানন্দের অধঃপতনের জন্য মহেশ চৌধুরিব ভক্তি যখন উবিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন বিপিনের মধ্যে জাগিয়াছে শ্রদ্ধা ! মানুষেব সঙ্গে মানুষেব যোগাযোগেব নিয়মকানুনগুলি খাপছাড়া নয় ?

বিপিনের আশ্রম ত্যাগ করা, মহেশ চৌধুরির বাড়িতে বাস করা, নতুন আশ্রম খুলিয়া নতুনভাবে জীবনযাপন করা এবং তারপর আবার নিজের পুরাতন আশ্রমে ফিরিয়া আসা, নাম ছড়ানোর দিক দিয়া এ সমস্ত খুবই কাজে আসিল সদানন্দের। মহেশ চৌধুরির আশ্রমে সমবেত নারী-পুরুষের ভক্তিশ্রদ্ধা হারানোর যে ভয়টা সদানন্দের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দিতেছিল সেটা অবশ্য নিছক ভয়, সকলেই শিষ্যত্ব অর্জনের এবং তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার অধিকার আর সুযোগ পাওয়ায় তার সম্বন্ধেই লোকের অস্বাভাবিক ভয়টা কমিয়া আসিতেছিল। বিপিনের সাহায্যে নিজের চারিদিকে সে যে কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল, মহেশের চেষ্টা ছিল সেটা ভাঙিয়া ফেলিয়া সকলের সঙ্গে তার সম্পর্কটা সহজ করিয়া তোলা। সম্পর্কটা সত্যসত্যই সহজ হইয়া আসিতে থাকায় সদানন্দের মনে হইয়াছিল, লোকের কাছে সে বুঝি নীচে নামিয়া যাইতেছে।

হয়তো নামিয়া যাওয়াই। সংস্কার-নাড়া-দেওয়া ভয়ের ভিত্তি হয়তো দেবতার সর্বোচ্চ আসন পাতা সম্ভব।

সদানন্দের সঙ্গে মহেশ চৌধুরির আশ্রমের জনপ্রিয়তা যেন শেষ হইয়া গেল, যেদিন পুরাতন আশ্রমে সদানন্দ নতুন পর্যায়ে আসর বসাইল প্রথমবার, সেদিন মহেশ চৌধুরির আশ্রমে লোক আসিল মোটে দশ-বারোজন। সকলে সদানন্দের উপদেশ শুনিতে গিয়াছে—আগে যত লোক আসিত তার প্রায় তিনগুণ। সদানন্দ ভাবিয়াছিল এবার হইতে যতটা সম্ভব মহেশ চৌধুরির নিয়মেই আশ্রম পরিচালনা করিবে, শিষ্য করিবে সকলকেই, নাগালের মধ্যে আসিতে দিবে সকলকেই, কথা বলিবে সহজভাবে। এক নজর তাকাইয়াই আর নারী বা পুরুষকে অপদার্থ করিয়া দিবে না। কিন্তু ভিড় দেখিয়া হঠাৎ তাব কী যে জাগিল উল্লাস আর গর্ব মেশানো একটা নেশা, মুখের গাম্ভীর্যের আর তুলনা রহিল না, যেন গোপন পাপ সব আবিষ্কার করিয়া ফেলিতেছে দৃষ্টির তীব্রতায় এমনই অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল অনেকের, আর কথা শুনিতে শুনিতে অনেকের মনে হইতে লাগিল তার পায়ে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে মরিয়া যায়।

প্রণামি দিতে গিয়া দু-একজন পায়ে আছড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সুবিধা হইল না।

প্রথম জনকে সদানন্দ বলিল : উঠে বোসো। তিনমাস মাছমাংস মেয়েমানুষ ছুঁয়ো না। এবার যাও—যাও !

দ্বিতীয় জনকে সংক্ষেপে বলিল : পাঁচ বছরেব মধ্যে তুমি আমার কাছে এসো না।

আগে কেউ বাড়াবাড়ি করার সাহস পাইত না, ভাবপ্রবণতার নাটকীয় অভিব্যক্তি সদানন্দ পছন্দ করে না। মাঝখানে অনেকগুলি ব্যাপাব ঘটায় আর সদানন্দ নিজের নতুন পরিচয় দেওয়ায় কয়েকজনের সাহস হইয়াছিল, নতুন লোকও আজ আসিযাছিল অনেক। কিন্তু পায়ে আছড়াইয়া পডার (তিন টাকা প্রণামি দেওয়ার পরে) আব হাউহাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করার (প্রণামি—আড়াই টাকা) ফল দেখিয়া সকলের সাহস গেল। সকলের বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, সদানন্দ যেন কোথাও কোনোদিন যায নাই, মাঝখানে প্রায় বছরখানেকের ফাঁক পড়ে নাই, এইখানে আগে যেমন সভা বসিত আজ একটু বড়ো ধরনে সেই রকম সভাই বসিযাছে।

কিন্তু দোকানে ফিরিয়া গিয়া শ্রীধর সেদিন সন্ধ্যার পর মুখখানা যেন কেমন একটু ম্লান করিয়া বলিল : ঠাকুরমশায় কেমন যেন বদলে গেছেন। ঠাকুরমশায়ের রাগ তো দেখিনি কখনও, সত্যিকারের রাগ ?

ঠিক সেই সময় আশ্রমে নিজের গোপন অন্তঃপুরে সদানন্দ বিপিনকে বলিতেছিল : উমা আর রতনকে দিয়ে মাধুকে আনাতে হবে। এই ঘরে মাধুকে বসিয়ে রেখে ওরা চলে যাবে, তারপর আমি না ডাকলে কেউ আমার মহলে আসবে না।

উমা আর রতন ? ওরা কেন রাজি হবে ?

হবে। আমি বললেই হবে।

তা হবে না। এ রকম মতলবেব কথা শুনলেই ওদের মন বিগড়ে যাবে, আশ্রম ছেড়েই হয়তো চলে যাবে।

সে আমি বুঝব।

কিন্তু বুঝা বিপিনের পক্ষেও প্রয়োজন, সে তাই সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়ে। তারপর অন্য কথা বলে, কিন্তু মহেশ বা বিভূতি যদি পুলিশ ডেকে আনে ?

আনে তো আনবে।

আনে তো আনবে ? তোর খারাপ মাথাটা আরও খারাপ হয়ে গেছে সদা।

তুই বড়ো বোকা বিপিন। পুলিশ আশ্রমের ধারে আসা মাত্র উমা, রতন আব আশ্রমের আরও পাঁচ-সাতটি মেয়ে মাধুকে ঘিরে বসবে। পুলিশ এসে দেখবে কেউ মাধুকে আটকে রাখেনি, মেয়েদের সঙ্গে ফাঁকা জায়গায় বসে গল্প করছে। তবু যদি জেলে যেতে হয়, আমি যাব, সব দোষ আমি নিজে মেনে নেবখন।

কিন্তু দরকার কী শুনি এত হাঙ্গামায় ?

সে তুই বুঝবি না।

বুঝুক না বুঝুক বিপিন ভয় পাইয়া গেল। একদিন চুপিচুপি গিয়া মাধবীলতাকে সাবধান করিয়া দিয়া আসিল। সব কথা সে ফাঁস করিয়া দিল তা নয়, আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে সদানন্দ বড়ো চটিযাছে, সে যেন কখনও কোনো অবস্থায় আশ্রমে না যায়।

যেই নিতে আসুক, যে উপলক্ষেই নিতে আসুক, যেয়ো না। উমা বা বতন এলেও নয়। বুঝেছ ?

মাধবীলতা সায় দিয়া বলিল, বুঝেছি, সব বুঝেছি। আপনি না বললেও আমি যেতাম না।

কয়েকদিন পরে উমা আর বত্নাবলী মাধবীলতাকে আনিতে গেল। সদানন্দ যেন কোথায় গিয়াছে, আশ্রমে মেয়েদেব কী যেন একটা ব্রত আছে, কী যেন একটা বিশেষ কারণে বিপিন তাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছে। মহেশ চৌধুরি আর বিভূতির অবশ্য নিমন্ত্রণ আছে।

মাধবীলতা আসিল না, বিভূতিও নয়। মহেশ চৌধুরি শুধু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল। ব্রতের কোনো আয়োজন নাই দেখিয়া সে আশ্চর্যও হইয়া গেল না, কিছু জিজ্ঞাসাও করিল না। মেয়েদের ব্রত কোনো ঘরের কোণে, গাছের নীচে বা পুকুরঘাটে কীভাবে হয় মেয়েরাই তো ভালো করিয়া জানে ! নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া কেউ কিছু খাইতে দিল না দেখিয়াই সে একটু আশ্চর্য হইয়া গেল। কে জানে, হয়তো ব্রত শেষ না হইলে খাইতে দিতে নাই। কিন্তু বেলা তিনটাব সময়ও যদি ব্রত শেষ না হয়, না খাওয়াইয়া বসাইয়া রাখিবার জন্য কেবল তার বাড়ির তিনজনকে নিমন্ত্রণ করিবাব কী দবকাব ছিল ?

সদানন্দ যেখানেই গিয়া থাক, ফিরিয়া আসিয়াছে। মহেশ চৌধুরি তার কাছে গিয়া বসে। এদিকে বিপিন ভাবে, উমা আর রত্নাবলী যখন সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে তাবাই মহেশের খাওয়ানোব ব্যবস্থা করিবে। উমা আর রত্নাবলী ভাবে, বিপিন যখন নিমন্ত্রণ কবিয়া আনিতে বলিয়াছে, সেই জানে অতিথিকে কী খাইতে দেওয়া হইবে। বিপিন নিশ্চিন্ত মনে কাজে বাহির হইয়া যায়। সদানন্দের কুটিরে মহেশকে খাইতে দেওয়া হইয়াছে ভাবিয়া উমা আর বত্নাবলী নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করে।

সদানন্দ বলে, কী খবব মহেশ ?

মহেশ বলে, আজ্ঞে, খবর আর কী ?

মহেশ যেন প্রভু শব্দটা উচ্চারণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

কিছু উপদেশ দেবে না কি ?

কী আর উপদেশ দেব বলুন ?

এই আমার কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়—

মহেশ একটু ভাবিয়া বলে, উপদেশ তো নয়, পরামর্শ দিতে পারি। কথাটা মনে রাখলে কাজ দেবে। মানুষ যখন উঁচু পাহাড়-পর্বতে ওঠে, কত যত্নে কত সাবধানে প্রাণপণ চেষ্টায় তিল তিল করে ওঠে, সময়ও লাগে অনেক। কিন্তু মানুষ যখন উঁচু থেকে হাত-পা এলিয়ে নীচে পড়ে, পড়বার সময় কোনো কষ্টই হয় না, সময়টা কেবল চোখের পলকে ফুরিয়ে যায়।

সদানন্দ গম্ভীর হইয়া বলে, পড়বার সময়টা ফুরিয়ে গেলেও অনেক সময় কষ্ট হয় না মহেশ। বরং উঁচু থেকে পড়লে চিরকালের জন্য কষ্ট ফুরিয়ে যায়।

ফুরিয়ে যায় না শুরু হয়, কে তা জানে বলুন ?

আমি জানি। যে সীমার মধ্যে কষ্ট সে সীমাই যদি পার হয়ে গেলাম তবে আর কষ্ট কীসের ? যারা বোকা তারাই বেঁচে থেকে রোগের জ্বালা শোকের জ্বালা সহ্য করে। অথচ আত্মহত্যা করা এত সহজ !

আত্মহত্যা করা সহজ ? আত্মরক্ষা করা সহজ বলুন। আত্মহত্যা করা সহজ হলে মানুষের জীবনটাই আগাগোড়া বদলে যেত, সমাজ ধর্ম রীতিনীতি সুখ দুঃখ ভাবনা চিন্তা অনুভূতি সব অন্যরকম হত। ব্রহ্মচারী দু-চারজন আছে কিন্তু ব্রহ্মচর্য কি সহজ না মানুষের পক্ষে সম্ভব ? আত্মহত্যা দু-চারজন করে, কিন্তু সেটাও সহজ নয়, মানুষের পক্ষে সম্ভবও নয়। আপনি তো যন্ত্রণায় খেপে যাবার উপক্রম করেছেন, একবার দেখুন তো আত্মহত্যা করতে গিয়ে পারেন কি না ? কষ্ট পাবেন, বেঁচে থাকার সাধ থাকবে না, তবু বেঁচে থেকে কষ্ট ভোগ করবেন। এই সমস্যা আছে বলেই তো বেঁচে থাকার এত নিয়মকানুনের আবিষ্কার। আসল সাধু কী ঈশ্বরকে চায়, স্বর্গ চায়, পরকালের কথা ভাবে ? সাধু চায়, বিশেষ কতকগুলি অবস্থায় বাঁচতে যখন হবেই, বাঁচার সবচেয়ে ভালো উপায় কী তাই আবিষ্কার করতে। অনেক যুক্তিই লাগসই মনে হয়, কিন্তু সব যুক্তি কি খাটে ? অতি তুচ্ছ বিষয়ে যুক্তি খাড়া করবার সময় বিচার করে দেখবেন, কত অসংখ্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্তিটার যোগ আছে। কোন যুক্তিটা সবচেয়ে বেশি খাটবে কোনটা সবচেয়ে কম খাটবে ঠিক করতে নিরপেক্ষ মন নিয়ে জগতের সমস্ত যোগাযোগ বিচার করতে হয়। ওটা হল মহাপুরুষের কাজ। মূল্য যাচাই করার ক্ষমতা অর্জন করবার নাম সাধনা। এই জন্য সাধনা এত কঠিন। মানুষকে জানেন তো, মরুভূমিতে তৃষ্ণায় মরবার সময় পর্যন্ত এক গ্লাস জল আর একদলা সোনার মধ্যে বেছে নিতে বললে—

আমি তাই করেছি না ? সদানন্দ ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ, একেই পাপ বলে।

পাপ ? অনুতাপ না হলে আবার পাপ কীসের ?

অনুতাপ যদি না হয় তবে আর পাপ কীসের ? হজম করতে পারলে আর শরীরের পুষ্টি হয়ে স্বাস্থ্য বজায় থাকলে রাশি রাশি অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়ার আর দোষ কী ! কিন্তু মুশকিল কী জানেন, অনুতাপ হয়। ভগবান দেন বলে নয়, লোকে বলে বলে নয়, অনুতাপ হওয়ার কথা বলেই অনুতাপ হয়। একটা কাজ করলে যদি আনন্দ হয়, আর একটা কাজ করলে নিরানন্দ হতে পারে না ?

সাধারণ লোকের হতে পারে, সকলের হয় না। মনকে যদি বশ করা যায়, আপশোশ হতে না দিলে কেন হবে ?

সে তো বটেই, কিন্তু মনকে বশ করা চাই তো। অনুতাপ হয় এমন কাজ যারা করে তাদের মনটা কিছুতেই বশ হয় না। অনুতাপ বড়ো ভীষণ জিনিস, মনকে একেবারে ক্ষয় করে দেয়। অনুতাপ এড়িয়ে চলাও বড়ো শক্ত, একটা নখ কাটার জন্য পর্যন্ত অনুতাপ হতে পারে কি না। যাই করুক মানুষ, হয় সুখ পাবে নয় কষ্ট পাবে, উঠতে বসতে চলতে ফিরতে এর দুটোর একটা ঘটবেই ঘটবে। মহাপুরুষেরা এর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটাবার উপায় দেখিয়ে দেন। অনুতাপ হবেই, তবে মারাত্মক রকমের না হয়। মারাত্মক অনুতাপ যাতে হয় তাকেই লোকে পাপ বলে। যেমন ধরুন, আপনি যদি গায়ের জোরে মাধুর ওপর অত্যাচার করেন—

সদানন্দ চমকাইয়া বলে, তার মানে ?

মহেশ শান্তভাবেই বলে, কথার কথা বলছি, একবার মাধুকে ধরে টানাটানি করেছিলেন কি না, তাই কথাটা বলছি। ও রকম কিছু করলে আপনার অনুতাপ হবেই। হিসাব করে হয়তো দেখলেন ও জন্য অনুতাপ করা মনের দুর্বলতা, প্রকৃতির নিয়ম ধরে বিচার করলে ও কাজটা আপনার পক্ষে কিছুমাত্র অন্যায় হয়নি, তবু অনুতাপে আপনি ক্ষয় হয়ে যাবেন। উচিত হোক আর অনুচিত হোক, এ প্রতিক্রিয়াটা ঘটবেই। মনকে যদি এমনভাবে বদলে দিতে চান যাতে ও রকম পাপ করেও অনুতাপ হবে না, তখন বিপদ হবে কী জানেন, যতদিন পাপ করার ইচ্ছা না লোপ পাবে মনটা বদলাবে না।

যোগসাধনার মূলনীতি এই। সাধারণ জীবনে উঠতে বসতে আমরা অসংখ্য ছোটোবড়ো পাপ করি আর অনুতাপ ভোগ করি, সব সময় টেরও পাই না। সেই জন্য যোগসাধনার নিয়ম এত কড়া—কবার নিশ্বাস নিতে হবে তা পর্যন্ত ঠিক করে দেওয়া আছে। কামের চুলকানি জয় করলেই লোকে যোগী-ঋষি হয় না, পিঠের চুলকানি পর্যন্ত জয় করতে হয়—নইলে মন বশে আসে না। তেইশ ঘণ্টা উনষাট মিনিট তপস্যা করেও হয়তো এক মিনিট শিষ্যকে দিয়ে ঘামাচি মারানোর জন্য তপস্যা বিফল হয়ে যায়।

গায়ে ছাই মেখে যে তপস্যা—

মহেশ মৃদু হাসে, আপশোশের ভঙ্গিতে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলে, আপনাকে বলা বৃথা, আপনি আমার কথা বুঝবেন না। গায়ে ছাই মেখে হাত উঁচু করে বসে থাকা কি তপস্যা ? না আমি সে তপস্যার কথা বলছি ? আমি বলছিলাম আপনার তপস্যার কথা, আপনি যে তপস্যায় দিন দিন সফল হচ্ছিলেন।

এবার সদানন্দ অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকে, তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে, আমার আর কোনো উপায় নেই ?

মনে তো হয় না। তবে তেমন গুরু যদি খুঁজে বার করতে পারেন—

শেষ বেলায় উপবাসী মহেশ বাড়ি ফিবিয়া গেল। খাইতে চাহিল মাধবীলতার কাছে।

মাধবীলতা অবাক হইয়া বলিল, এ আবার কোন দেশি ব্যাপার, নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে খেতে না দেওয়া !

যে ব্যাপার সে জানিত, তার চেয়ে এ ব্যাপারটা তার খাপছাড়া মনে হয়। তার সম্বন্ধে সদানন্দের খারাপ মতলব আঁটা আশ্চর্যের কিছু নয়, কিন্তু ডাকিয়া নিয়া গিয়া মহেশ চৌধুরিকে খাইতে না দেওয়ার কোনো মানে হয় ?

বড়ো পাজি লোক ওরা।

ছি মা, রাগ করতে নেই। কোনো একটা কাবণ নিশ্চয় ছিল, বিব্রত করার ভয়েই তো আমি বললাম না, নইলে চেয়ে খেয়ে আসতাম।

দুজনে এ সব কথা বলাবলি করিতেছে, শশধরেব বউ খাবার আনিয়া হাজির। কোথায় সে থাকে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু সব সময়েই বোধ হয় আশেপাশে আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া সকলের কথা শোনে।

মাধবীলতা কিন্তু হঠাৎ বড়ো চটিয়া গেল।

সব ব্যাপারে তোমার বড়ো বাড়াবাড়ি। আমিই তো দিচ্ছিলাম ?

আড়ালে গিয়া শশধরের বউ ঘোমটা ফাঁক করিয়া তাকে দেখাইয়া একটু হাসিল, হাতছানি দিয়া তাকে কাছে ডাকিল

মাধবীলতা কাছে গেলে ফিসফিস করিয়া বলিল, তোমার না আজ কিছু ছুঁতে নেই।

মাধবীলতা চুপ করিয়া রহিল। সদানন্দের আশ্রমে নিমন্ত্রণ রাখিতে না যাওয়ার মিথ্যা অজুহাতের কথাটা তার মনে ছিল না।

এদিকে আশ্রমে তখন সদানন্দ বিপিনকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

মাধু এল না কেন ?

উমা আর রত্নাবলীর কাছে বিপিন যা শুনিয়াছিল জানাইয়া দিল। সদানন্দ বিশ্বাস করিল না। দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, ও সব বাজে কথা, আসল কথা আসবে না। না আসুক, আমিও দেখে নেব কেমন না এসে পারে। তোকে বলে রাখছি বিপিন, ওর সর্বনাশ করব, মহেশকে পথে বসাব, তবে আমার নাম সদানন্দ।

কয়েকদিন পরে মহেশের বাড়িঘর বাগান আর আশ্রম পুলিশ তন্নতন্ন কবিয়া খানাতল্লাশ করিয়া গেল। বিভূতির সঙ্গে যখন সংস্রব আছে, মাঝে মাঝে হঠাৎ এ রকম পুলিশেব হানা দেওয়া আশ্চর্য নয়। তবু, বাহির হইতে তাগিদ না পাইলে এ সময়টা পুলিশ হয়তো বিভূতির নতুন আশ্রম নিয়া মাথা ঘামাইত না। বিভূতিকে যে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিল, খবরটা সেই ফাঁস করিয়া দিয়া গেল। পুলিশের লোকটি একদিন সদানন্দকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল, কথায় কথায় সদানন্দ নাকি এমন কতকগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল যে তাড়াতাড়ি একটু অনুসন্ধান না করিয়া উপায় থাকে নাই।

সত্যি, সত্যি, কিছু আরম্ভ কবেছেন নাকি আবার ? উনি তো মিথ্যে বলবাব লোক নন।

উনিই মিথ্যে বলবার লোক।

পুলিশের লোকটি সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, বিয়ে-থা করেছেন, একটু সাবধানে থাকবেন। আর কি ও সব ছেলেমানুষি পোষায় ?

পুলিশের খানাতল্লাশের পব মহেশের আশ্রমে লোকের যাতায়াত আরও কমিয়া গেল। এতদিন পরে লোকের মুখে মুখে কী করিয়া যে একটা গুজব রটিয়া গেল, মহেশ চৌধুবি লোক ভালো নয় বলিয়া সদানন্দ তাকে ত্যাগ করিয়াছে, সাধু সদানন্দ।

ষোলো

ক্রমে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে দেখিতে বিভূতি বলিল, দেখলে বাবা তোমাব দেবতার কীর্তি ?

মহেশ বলিল, ওর অধঃপতন হয়েছে।

বিভূতি নাক সিঁটকাইয়া বলিল, ও আবাব ওপরে উঠল কবে যে পতন হবে ? ও লোকটা চিবকাল ভেতরে ভেতরে এমনই বজ্জাত। সাধে কী ওকে ঘুষি মেরেছিলাম।

ছেলের সে অপবাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে মহেশকে হাতুড়ি দিয়া নিজেকে আঘাত করিতে হইয়াছিল, ব্যাপাবটা সহজে ভুলিবাব নয়। মহেশ জিজ্ঞাসা করিল—

ঘুষি মেরে লাভ কী হয়েছিল ?

তোমার জন্যে—

আমার কথা বাদ দিয়ে বলো। আমি কিছু না করলেও তোব লাভটা কী হত ? চারিদিকে বিচ্ছিরি একটা কেলেঙ্কারি বেধে যেত, গাঁয়ের লোক আমাদের মারতে আসত, নিজে তুই বাগেব যন্ত্রণায় ছটফট করতিস—

মহেশের যুক্তিতর্ক কোনোদিনই ভালো করিয়া বিভূতির মাথায় ঢোকে না, তার মনে হয় ছেলেবেলা হইতেই সে যা বলে আর ভাবে মহেশ ঠিক তার উলটো কথাটা বলিয়া আসিতেছে। রক্তটা বিভূতির একটু গরম, ন্যায়অন্যায়ের বিচারবোধ আর কর্তব্যপ্রবণতা বাপের জীবন্ত দেবতার নাকে ঘুষি মারানোর মতো উদ্ধত, মানুষের চাপে পৃথিবীতে মানুষ কষ্ট পায় বলিয়া তার আপশোশের সীমা নাই। তার আদর্শগুলি এমন যে কাজে কিছু করার সুযোগ না পাইলেও কেবল একটা দলে কয়েক মাস মেলামেশা করাব জন্যই পুলিশ তাকে কয়েকটা বছর আটকাইয়া রাখিয়াছিল। মনটা যে বিভূতির একটু নরম হইয়াছে, সংসারের অন্যায়গুলির সঙ্গে রফা করিযাই বাঁচিয়া থাকিতে সে যে প্রস্তুত হইয়াছে, মাধবীলতাকে বিবাহ কবিয়া সংসারী হওয়াটাই তার প্রমাণ। তবু, মানুষেব মন মানে না, কাজে না পারিলে তর্কে নিজেকে জাহির করে।

তুমি বুঝি ভাব, তোমার জন্যে চুপ করে গিয়েছিলাম বলেই আমার রাগ কমে গিয়েছিল ?

ক্ষমা চাওয়ার জন্যে তো কমেছিল।

তুমি আমাকে দিয়ে জোর করে ক্ষমা চাওয়ালে, তাতে কখনও রাগ কমে ?

কমে বইকী, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ক্ষমা চাইলেই মানুষের রাগ কমে যায়। তখন কী মনে হয় জানিস, মনে হয় এবারকার মতো চুলোয় যাক, আবার যদি লোকটা কিছু করে তো দফা নিকেশ করে দেব। আমি জোর করে ক্ষমা চাওয়ালে কী হবে, নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা তো তোকে সত্যি সত্যি চাইতে হয়েছিল। ক্ষমা চাওয়ার পর আগের মতো জোরালো রাগ পুষে রাখতে মানুষের বড়ো বিরক্তি বোধ হয়।

বিভূতি বিশ্বাস করিল না। আগেরবারের চেয়েও এবার তার বেশি রাগ হইয়াছিল। তার চলাফেরার দিকে পুলিশ একটু নজর রাখিবে, মাঝে মাঝে বাড়িঘর খানাতল্লাশ করিবে, এ সব বিভূতির কাছে খাপছাড়া ব্যাপার নয়। এতকাল আটক রাখার পর তাকে পুলিশ একেবারে জন্মের মতো ত্যাগ করিবে, বিভূতি নিজেও তা বিশ্বাস করে না। ছাড়া পাওয়ার পর সব সময়েই তার মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া আছে, কখন আবার ডাক আসে। এমনি পুলিশ যাকে বাগে পাওয়ার জন্য ওত পাতিয়া আছে, তার নামে মিথ্যা করিয়া পুলিশের কাছে লাগানো ! বিভূতির মনে ভয় ছিল, সকলের মনেই এ অবস্থা থাকে, রাগের জ্বালায় তাই তার মনে হইতে লাগিল, ভোঁতা একটা দা দিয়া সদানন্দের গায়ের মাংস কাটিয়া নেয়।

এই অসম্ভব কাজটার বদলে একবার আশ্রমে গিয়া সদানন্দকে একটু ধমক দিয়া আসিবে কি না ভাবিতে ভাবিতে বিভূতি অন্যমনস্ক হইয়া থাকে।

রাত্রে মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করে, কী ভাবছ ?

বিভূতি বলে, না। কিছু ভাবছি না।

মাধবীলতা গভীর আদরের সঙ্গে তাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলে, বলো না, কী ভাবছ ?

দিনের বেলা মেলামেশা চলে, কিন্তু দিনের বেলা ভালোবাসার খেলা মাধবীলতার পছন্দ হয় না। মাঝে মাঝে স্বামীর পাগলামির বিষয়টা খেয়াল না থাকিলে এমনও হয় যে, ফাঁকতালে একটু সোহাগ করিতে আসিয়া দু-হাতের জোরালো ঠেলায় বিভূতি চমকিয়া যায়। তখন অবশ্য মাধবীলতার খেয়াল হয়, মৃদু তিরস্কারের সুরে সে বলে, কী যে করো তুমি, চাদ্দিকে লোক রয়েছে না ? ওমা দরজা বন্ধ করে দিয়েছ ! বেশ লোক তো তুমি ? তবু, দিনেরাত্রে সব সময় মাধবীলতাকে নিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিবার অধিকার জন্মানোর অল্পদিনের মধ্যেই বিভূতি টের পাইয়া গিয়াছে, দিনের বেলা মিলনের আনন্দ ভোগ করার ক্ষমতাটা মাধবীর যেন ভোঁতা হইয়া যায়। ব্যাপারটা তার বড়োই দুর্বোধ্য মনে হয়, কারণ, রাত্রে মাধবীর তীক্ষ্ণতায় তাকেও মাঝে মাঝে বিব্রত হইতে হয়, ঘুম পর্যন্ত যেন মাধবীর চলিয়া যায়, বিভূতির ঘুম আসিলেও তাকে সে ঘুমাইতে দেয় না, প্রাণের চেয়ে যে প্রিয়তর তাকে পর্যন্ত ভালোবাসিতে ভালোবাসিতে শ্রান্ত হইয়া বিভূতি ঝিমাইয়া পড়িলে মাধবীলতা অক্লান্ত চেষ্টায় যেভাবে আবার তাকে বাঁচাইয়া তোলে, মানুষের বাস্তব জীবনে যে সে ধরনের অপরূপ কাব্যের স্থান আছে বিভূতি কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

বিভূতি বলে, পুলিশের কথা ভাবছিলাম। আবার যদি আমায় ধরে নিয়ে যায় ?

এক নিমেষে মাধবীলতা বদলাইয়া যায়, রুদ্ধশ্বাসে বলে, মাগো, পুলিশ দেখে আমার যা হচ্ছিল !

পুলিশ চলিয়া যাওয়ার পর আরও তিন-চারবার এমনিভাবে সে প্রায় এই কথাগুলিই বলিয়াছে। হঠাৎ একবার বিভূতির মনে হয়, সব কি মাধবীলতার ন্যাকামি, বাড়াবাড়ি, হিস্টিরিয়া ? কিন্তু এই টাইপের খাঁটি ন্যাকামি আর বাড়াবাড়ি আর হিস্টিরিয়া ঠিক কী রকম সে বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায় সন্দেহের চোখে মাধবীলতার ভীত চোখ দুটি দেখিতে গিয়া সে মুগ্ধ হইয়া যায়। কত জন্ম তপস্যা করিয়া সে এমন বউ পাইয়াছে, কত ভাগ্য তার !

তখন মাধবীলতার ভয় দূর করবার জন্য তাকে ভিতরের সব কথা খুলিয়া জানাইয়া দেয়, আশ্বাস দিয়া বলে যে, সমস্তটাই সাধু সদানন্দের কারসাজি, সদানন্দ পিছনে না লাগিলে পুলিশ আর তাকে জ্বালাতন করিতে আসিত না। ভয় নাই, মাধবীলতার কোনো ভয় নাই, পুলিশ আর বিভূতিকে ধরিবে না, বউকে এমনিভাবে বুকে করিয়া, বিভূতি জীবন কাটাইয়া দিবে।

শুনিয়া, ভয়ে না যত হইয়াছিল মাধবীলতার চোখ তার চেয়ে বেশি রকম বিস্ফারিত হইয়া গেল।

উনি ! উনি এমন কাজ করলেন !

কেন, ও কি এমন কাজ করতে পারে না ?

মাধবীলতা সায় দিয়া বলিল, পারে, ও লোকটা সব পারে। ওর অসাধ্য কাজ নেই। ওর মতো ভয়ানক মানুষ—

মাধবীলতার ক্ষোভ-দুঃখের বাড়াবাড়ি দেখিয়া আবার বিভূতির মনে হইল সে যেন বাড়াবাড়ি করিতেছে। ভালোবাসিতে আজ যেন মাধবীলতার ভালো লাগিল না, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বারবার সে ওই কথাই আলোচনা করিতে লাগিল। প্রথমটা কয়েক মুহূর্তের জন্য বাড়াবাড়ি মনে হইলেও তার বিচলিত ভাব দেখিয়া বিভূতি আবার মুগ্ধ হইয়া গেল। কী ভালোই মাধবীলতা তাকে বাসে !

বিভূতির এই কৃতজ্ঞতাই মাধবীলতাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করিয়াছিল। বড়ো সহজে বিভূতির মন ভুলানো যায়। একটু আদরযত্ন করা, রূপের সামান্য একটু বিশেষ ভঙ্গি দেখানো, বিভূতির কাছে এ সমস্ত যে কত দামি বুঝিতে পারিয়া মাধবীলতা নিজেই অবাক হইয়া যায় ! কত সহজে কত গভীর আনন্দ সৃষ্টি ও উপভোগ করা যায় মাঝে মাঝে খেয়াল করিয়া নিজের অফুরন্ত মন-কেমন-করার অভিশাপ তার যেন অসহ্য ঠেকে। ভয়ানক কিছু, বীভৎস কিছু, প্রচণ্ড কিছুর জন্য কামনা যেন স্বপ্নানুভূতির মতো মৃদু অথচ মানসিক রোগের মতো একটানা হইতে পারে, মাধবীলতার তা জানিবার বা বুঝিবার কথা নয়, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গে উঠিতে-নামিতে তার প্রাণান্ত হইতে থাকে বলিয়া জীবনের প্রত্যেকটি [illegible] সুখ ও আনন্দের জন্য বিভূতিকে মনে মনে সে প্রায় পূজা করে। বিচলিত ভাবটা যতক্ষণ না [illegible] ততক্ষণ অবশ্য বিভূতিকে বড়ো করবার কথাটা তার খেয়ালও হয় না এবং বিচলিত ভাবটা কমিতে কমিতে মাঝরাত্রি প্রায় কাবার হইয়া যায়। তখন হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ায় আপশোশের তার সীমা থাকে না। বিভূতির কপালে হাতের তালু ঘষিয়া দিতে দিতে সে ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, না না, তুমি ভেবো না, ও তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না।

এতক্ষণ পরে নিজের দেওয়া আশ্বাস ফিরিয়া পাইয়া গভীর ঘুমের আক্রমণ আর বিভূতিকে কাবু করিতে পারে না, মাধবীলতার গোলামি করার একটা রোমাঞ্চকর সাধ বরং তাকে ছোটো ছেলের মতো লজ্জার হাসি হাসাইয়া দেয়।

তার মাথাটা সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মাধবীলতা বলে, তোমার কিছু হলে আমি মরে যাব।

বিভূতি চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে।

লণ্ঠনের বাদামি আলোয় মশারির ভিতরে ও বাহিরে গভীর রাত্রি রূপ নিয়াছে, লণ্ঠনের কাছের কয়েকটা জিনিস ছাড়া মশারির জন্য বাহিরের আর কিছু ভালো দেখা যায় না, রঙিন কুয়াশায় যেন একটু ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। স্টোভের পাশেই স্পিরিটের বোতলটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে আবেগের ভাঙনপ্রবণতার জন্য মাধবীলতার চোখে যেন জল আসিয়া পড়ে। এমন কোমল কেন বিভূতি, এত বেশি ভাবপ্রবণ আর মমতাময় ? এত অল্পে সে সন্তুষ্ট কেন, এত কম সে চায় কেন, এত কম সে নেয় কেন, কেন সে এত ব্যগ্র শুধু দেওয়ার জন্য ? জেল আর ফাঁসির ভয় তুচ্ছ করিয়া সে বুক-কাঁপানো কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, অনায়াসে সে সদানন্দের নাকে ঘুষি মারিতে পারে, সে যেন মাটির পুতুল, মায়ের কোলের শিশু !

তা হোক। তাই ভালো।

আরও জোরে বিভূতির মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া জোরেই যেন মাধবীলতা স্পিরিটের বোতলটার দিক হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আনে।

ঘুমাবে না ?

তোমার ঘুম পেয়েছে ?

হাতের চাপ একটু আলগা করিয়া মাধবীলতা মৃদু হাসে ; আমার ঘুম দিয়ে কী করবে, আমি তো দিনে ঘুমোই। তোমার ঘুম পেয়েছে কি না তাই বলো।

পরদিন দুপুরে ঘুমানোর বদলে মাধবীলতা শশধরের বউকে সঙ্গে করিয়া সদানন্দের আশ্রমেব উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল। গেল প্রতিবেশী মনোহর দত্তের গোরুর গাড়িতে। আশ্রমে যাইবে শুনিয়া মনোহর দত্তের বুড়ো মা, বয়স তার প্রায় সত্তরের কাছে গিয়াছে তাড়াতাড়ি নামাবলি গায়ে জড়াইয়া তাদের সঙ্গ নিল।

মনোহর দত্তের বউ দেড়মাসের ছেলে কোলে কবিয়া আপশোশ করিয়া বলিল, আমিও যেতাম বাছা তোমাদের সঙ্গে, কিন্তু আমার কপালে কী আর ধম্মোকম্মো আছে !

আগে মাধবীলতা শশধরের বউকে কিছু বলে নাই, বাহির হওয়াব একটু আগে কেবল খবরটা দিয়াছিল। শশধরের বউ তো শুনিয়া অবাক।

আশ্রমে যাবে ? সাধুবাবাকে তুমি এত ভক্তি কব তা তো জানতাম না ভাই !

ভক্তি না তোমার মাথা। যাচ্ছি তার মুন্ডুপাত করতে। আমাদের বাড়িতে পুলিশ লেলিয়ে দেয়, এমন আস্পর্ধা !

শশধরের বউ থতোমতো খাইয়া গিয়াছিল, একটু ভয়ও পাইয়াছিল। বলিয়াছিল, বাড়িতে ওঁবা জানতে পারলে কিন্তু বড্ড রাগ করবেন।

বাবাকে বলে এসেছি।

চুপিচুপি কারও কাছে কিছু না বলিয়া যাইবে অথবা মহেশ চৌধুরিব অনুমতি নিয়া যাইবে, সমস্ত সকালটা মাধীবলতা আজ এই সমস্যাব মীমাংসা করিযাছে। মহেশ চৌধুরি তাকে সদানন্দের আশ্রমে যাইতে দিতে রাজি হইবে কি না এ বিষয়ে মাধবীলতার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু বলিযা যাওযাই ভালো মনে কবিয়া অনুমতি চাহিতে গিয়া তাব বিস্ময়েব সীমা থাকে নাই।

মহেশ চৌধুরি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হইয়া বলিয়াছিল, আশ্রমে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে মা ? বেশ তো। তারপর হাসিয়া বলিয়াছিল, পুরনো সাথিদের দেখতে সাধ হচ্ছে ?

মহেশ চৌধুরিই যে সদানন্দকে তাড়াইয়া দিয়াছে, সদানন্দকে ভক্তি করার বদলে সে যে এখন তার অধঃপতনের জন্য আপশোশ করে, এ সব মাধবীলতার অজানা নয়। একটা প্রশ্ন পর্যন্ত জিজ্ঞাসা না করিয়া হাসিমুখে তাকে সদানন্দের আশ্রমে যাইতে অনুমতি দেওয়া মহেশ চৌধুরির মতো মানুষের পক্ষেও মাধবীলতা সম্ভব ভাবিতে পারে নাই। সদানন্দের অধঃপতনে বিশ্বাস হইয়াছে, কিন্তু তাকে যে সদানন্দ সত্যই অপমান কবিয়াছিল মহেশের মনে কি এ বিষয়ে একটু খুঁতখুঁতানিও জাগে নাই ? যে কাণ্ডের ফলে নিজেকে তার হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিতে হইয়াছিল ?

দুপুরবেলা আশ্রমে যে যার ঘরে বিশ্রাম করিতেছিল, উমা ছিল রত্নাবলীর ঘরে। শশধরের বউ আর মনোহর দত্তের মাকে সঙ্গে করিয়া মাধবীলতা প্রথমে সে ঘরে গেল তারপর সঙ্গী দুজনকে সেখানে বসাইয়া রাখিয়া একা দেখা করিতে গেল সদানন্দের সঙ্গে।

রত্নাবলী বলিল, একটু বোসো না ভাই, দুদণ্ড গল্প করি। সেদিন তো কথা বলারই সময় পেলাম না।

সদানন্দের নির্দেশে উমার সঙ্গে মাধবীলতাকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া রত্নাবলী একাই প্রায় তিন ঘণ্টা মাধবীলতার সঙ্গে গল্প করিয়াছিল। কিন্তু যে রকম রোমাঞ্চকরভাবে মাধবীলতার বিবাহ হইয়াছে তাতে দু-চারঘণ্টার গল্পে কি মনের কথা সব বলা হয় ?

মাধবীলতা বলিল, না ভাই, চট করে আগে দেখাটা করে আসি। সেদিন আসিনি বলে বড্ড চটে আছেন।

তুই কী করে জানলি চটে আছেন ?

ওকে চিনি না আমি ?

সদানন্দের মহলে ঢুকিতে গিয়া আগে দেখা হইল বিপিনের সঙ্গে। বিপিন তাকে দেখিযাই বলিল, কী সর্বনাশ, তুমি এখানে !

ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

কেন ?

আমার দরকার আছে।

কী দরকাব ?

আছে।

বিপিন খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল, সেদিন তোমাকে অত করে বুঝিয়ে বলে এলাম—

মাধবীলতার নিজেরও বুকের মধ্যে অকথ্যরকমের টিপটিপ করিতেছিল, তবু সে মুখে সাহস দেখাইয়া বলিল, আপনার ভয় নেই, উনি আমার কিছু করতে পারবেন না। আপনার যত সব উদ্ভট ধারণা—উনি সে রকম মানুষ নন।

ইতিমধ্যে বিপিন একটু আত্মসংবরণ করিযাছিল, সে গম্ভীর মুখে বলিল, আমার যেমন ধারণাই থাক, ওঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। চলো তোমাকে বাইরে রেখে আসি।

কেন ?

কেন আবাব কী ? আমার আশ্রমে আমি যদি তোমায় ঢুকতে না দিই, তুমি কি গায়েব জোরে ঢুকবে ?

কথা হইতেছিল সদানন্দেব ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়াইয়া। মাধবীলতার গলা শুনিয়া সদানন্দ আগেই দরজার কাছে উঠিয়া আসিয়া দুজনেব কথা শুনিতেছিল, এবাব ডাকিয়া বলিল, এসো মাধু, ভেতরে এসো। বিপিন তুমি একটু বাইরের দরজার কাছে বসোগে যাও তো, কেউ এসে আমাদের বিরক্ত না করে।

আগাইয়া আসিয়া বিপিনেব চোখের সামনে মাধবীলতার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সদানন্দ তাকে ঘরের মধ্যে নিযা গেল, বিপিনের মুখের উপব বন্ধ করিয়া দিল দরজা।

মাধবীলতার আর্তকণ্ঠেব চিৎকার শোনা গেল, বিপিনবাবু ! ও বিপিনবাবু ! তারপব স্পষ্টই বুঝা গেল সদানন্দ তার মুখে হাত চাপা দিয়াছে।

দরজার কাছে সরিয়া গিয়া বিপিন চাপা গলায় বলিল, সদা, তুই কি আমাদের সকলকে না ডুবিয়ে ছাড়বি না ? দরজা খুলে দে—ওকে ছেড়ে দে।

সদানন্দ ভিতর হইতে বলিল, কেন ভাবছিস তুই ? কিচ্ছু হবে না, তোর কোনো ভাবনা নেই। যদি হয়, তোর বোকামির জন্যে হবে।

তোর পায়ে পড়ি সদা—

পায়ে পড়িস আর যাই করিস কিছু লাভ হবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাধার মতো কেন সময নষ্ট করছিস, একজন কেউ এসে পড়লে ভালো হবে ? এই সোজা কথাটা তুই বুঝতে পারছিস না

নচ্ছাব, মাধু একা ফিরে গেলে ও কারও কাছে কিছু বলবে না। কিন্তু অন্য কেউ জানতে পারলে, না বলে মাধুর উপায় থাকবে না ?

বিপিন জানিত মানুষটা সদানন্দ ভয়ানক, কিন্তু এতটা সেও ভাবিতে পারে নাই। এর চেয়ে ঢের বেশি অমানুষিক কাণ্ড সর্বদাই সংসারে ঘটে কিন্তু নিজের সামনে না ঘটা পর্যন্ত নিজের জানাশোনা মানুষের সম্বন্ধে কে তা সম্ভব ভাবিতে পাবে ! বিপিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। সদানন্দ যা বলিতেছে তাই করাই হয়তো ভালো, তা ছাড়া আর কী উপায় আছে !

ভিতর হইতে সদানন্দ বলিল, বিপিন, গেলি ?

বিপিন বলিল, যাচ্ছি।

ধীরে ধীরে বিপিন সদরের দরজার দিকে আগাইয়া যায়, মাথার মধ্যে তার যেন সব গোলমাল হইয়া যাইতে থাকে। দরজা বন্ধ না করিয়া খোলা দরজার সামনেই সে বসিয়া থাকে। মাথাব মধ্যে তার যত গোলই পাকাইয়া যাক, এ বুদ্ধিটার তার থাকে যে দবজা বন্ধ করার চেয়ে দবজা খুলিয়া বাখিয়া নিজে বসিয়া সকলের পথ আটকানো ভালো।

আশ্রমের একজন সামনে দিয়া যাওযার সময় জিজ্ঞাসা কবে, এখানে বসে আছেন ?

এমনি। উনি একজনকে বিশেষ উপদেশ দিচ্ছেন---আমারও একটু দরকার আছে ওনাব সঙ্গে।

বেলা পড়িয়া আসে, সামনে দিয়া আশ্রমের শিষ্য-শিষ্যার যাতায়াত বাড়িয়া যায়। কেউ কেউ বিপিনকে এখানে এ ভাবে বসিয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা কবে, কেউ দুদণ্ড দাঁড়াইয়া বাজেকথা বলিয়া যায়। চালার নীচে নিত্যকার সভার জন্য গ্রামবাসী নরনারী একে একে আসিযা জমা হইতে থাকে। তৃষ্ণায় বিপিনের বুক ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হয় কিন্তু উঠিয়া গিয়া এক গ্লাস জল যে খাইয়া আসিবে সে সাহসও হয় না, কাউকে এক গ্লাস জল আনিয়া দিতে বলিতেও ভবসা পায় না।

শেষ বেলায় চালার নীচে সকলে সমবেত হইযা অধীব আগ্রহে যখন সদানন্দের প্রতীক্ষা করিতেছে, উমা আর রত্নাবলী শশধরের বউকে সঙ্গে করিয়া মাধীবলতাব খবব নিতে আসিল।

বিপিন পাংশু মুখে বলিল, উনি মাধুর সঙ্গে কথা বলছেন।

এখনও কথা বলছেন ! রত্নাবলী বলিল।

বিপিন হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, মাধুকে উনি একটু বেশি পছন্দ করেন। তা ছাড়া, অনেকবার আমায় বলেছিলেন, বিবাহিত জীবনেব কর্তব্য সম্বন্ধে মাধুকে কিছু বলবেন। সে সব কথা বলছেন বোধ হয।

রত্নাবলী বলিল, এতদিন এক বাড়িতে থেকে বললেন না, এখন---

বিপিন বলিল, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিলে কী হবে ? উনি আ্যাদ্দিন ইচ্ছে করেই কিছু বলেননি। আজ মাধু নিজে শুনতে চাইল---

আমরাও একটু শুনে আসি বলিয়া রত্নাবলী ভিতরে ঢুকিয়া যায়, বিপিন ব্যস্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিল, না না, যেয়ো না। উনি কাউকে যেতে নিষেধ করেছেন।

কিন্তু রত্নাবলীকে আটকাইবার মতো গায়ের জোর বিপিনের ছিল না, তাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া রত্নাবলী ভিতরে চলিযা গেল।

রত্নাবলীর মনটা একটু সন্দিগ্ধ।

সদানন্দের ঘরের সামনে রত্নাবলী একটু দাঁড়াইল। সন্দিগ্ধ মনে সাহস থাকে না, থাকে কৌতূহল। দরজা বন্ধ না খোলা ? ঠেলা দিলেই যদি খুলিয়া যায় ? সদানন্দ দরজা খুলিয়া যদি জিজ্ঞাসা করে, কী চাই ? বিপদ হিসাবে কোনোটাই কম নয়।

সাহস যে মনে নাই, কৌতূহল দমন করার মতো মনের জোর সে মন কোথায় পাইবে ? দরজাটা ভেজানোই ছিল।

সদানন্দ খাটে বসিয়া আছে, পা ঝুলাইয়া। দুপাশে হাতেব তালু দিয়া খাটে চাপ দিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় হাতের উপরেই শরীরেব ভর দিয়া যেন সদানন্দ বসিয়াছে। মাধবীলতা বসিয়াছে মেঝেতে তার ঝুলানো পায়ের কাছে, ঊর্ধ্বমুখী, উত্তেজিতা, শব্দময়ী মাধবীলতা। উপদেশ দেওয়ার কথা সদানন্দের, কিন্তু সে রীতিমতো অস্বস্তির সঙ্গে মাধবীলতার বক্তৃতা শুনিতেছে।

সদানন্দের চোখে না পড়িলে রত্নাবলী হয়তো চোরের মতো পলাইয়া যাইত, সদানন্দ তাকে দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে আহ্বান করিয়া বসায় সে সুযোগটা আর পাওয়া গেল না।

এসো রতন।

মাধবীলতা মুখ নামাইয়া ভালো করিয়া গা ঢাকিযা কুঁজো হইয়া বসিল। পায়ে পায়ে আগাইয়া আসিয়া রত্নাবলী তার কাছে বসিল, সন্তর্পণে। মনের মধ্যে তার ওলটপালট চলিতেছিল। অবস্থা-বিশেষে কত রকম সন্দেহই মনে জাগে।

তুমি একা এসেছ রতন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাবলাম যে একবার—

দেখে আসি ওবা কী কবছে ? সদানন্দ হাসিল। রত্নাবলীব বিব্রত ভাব দেখিযা আবার বলিল, বন্ধুর জন্য ভাবনা হচ্ছিল, চাবুক মারছি না গায়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছি, ভেবে পাচ্ছিলে না, কেমন ? আশ্রম ত্যাগ কবাব জন্য আমি কাউকে শাস্তি দিই না বতন। যাব গলায় খুশি মালা দিয়ে তুমিও যেদিন ইচ্ছা আশ্রম ছেড়ে চলে যেয়ো, আমি কিছু বলব না।

সত্যমিথ্যায় জড়ানো কথা, না-চাওয়া কৈফিয়তের মতো। সদানন্দের ভাবটা যেন নতুন জামাইয়ের মতো, শালিব সঙ্গে ফাজলামি করিতেছে। রত্নাবলী কিছুই বুঝিতে পারে না, কারণ, বুঝিবাব মতো কী যেন একটা জ্ঞান মনের অন্ধকার তলা হইতে উপরে উঠিতে উঠিতে চাকায লাগা নোংরা কিছুব মতো পাক খাইয়া নীচে তলাইয়া যায়। সে চুপ করিযা বসিয়া থাকে।

সকলে চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে কেন ? মাধবীলতা তাই বলে, এবাব থেকে মাঝে মাঝে আশ্রমে আসব ভাই। ওঁকে প্রণাম কবে যাব।

তাবপর আবাব তিনজনেই চুপ করিযা থাকে, তবে বেশিক্ষণেব জন্য নয। একটু পবেই বিপিন আসিয়া গম্ভীব মুখে খবব দেয় যে, চালাব নীচে বসিযা আসিয়া অনেকে চলিয়া যাইতেছে, অনেকে অপেক্ষা কবিতেছে। সদানন্দ যদি না যায়, বিপিন তাদেব খবরটা দিতে পারে।

চলো যাচ্ছি। সদানন্দ যেন একটু ব্যস্ত হইয়াই চলিযা গেল।

তাবপর দুজনে চুপচাপ বসিযা থাকে। অনেকক্ষণ। শেষে মাধবীলতাই বলে, এখানে বসে থেকে কী হবে, চলো আমবাও যাই।

আশ্রমে থাকবে নাকি আজ ?

থাকবাব কী উপায় আছে ভাই ? তোমার ঘরে বসে নিরিবিলি দুদণ্ড কথা বলি গে চলো।

রত্নাবলীর মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন পাক খাইয়া বেড়াইতেছিল, সে খানিক খানিক জানে কিন্তু সব জানে না। সব তাকে জানানো হয় নাই বলিয়া অভিমানে প্রশ্নগুলি গলার কাছে আসিয়া আটকাইয়া যাইতেছিল। তবে জানার সাধটা জোরালো হইলে প্রায় সব মেয়েরাই খুকখুক করিয়া একটু কাশির ধাক্কাতেই দারুণ অভিমানের বাধা ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে পারে। জিজ্ঞাসা তাই হয় আকস্মিক।

হঠাৎ এলে যে ?

হঠাৎ এলাম ? ও, হঠাৎ কেন এলাম ? এমনি এলাম আর কী।

এমনি এলে না তোমার মাথা এলে। ছি, ধিক তোকে। ঘরে যদি মন না বসে, ঘরের বউ সাজতে গেলি কেন ? কে তোর পায়ে ধরে সেধেছিল ?

একজন সেধেছিল ভাই।

ফাঁকি দেওয়া হাসি হাসি ভঙ্গির সঙ্গে হালকা কথা রতনকে রাগে যেন অন্ধকার দেখাইয়া দেয়। আশ্রমের মানুষ-দেবতার পূজার জন্য কোন গ্রামের কে যেন কী উপলক্ষে এক বোঝা নৈবেদ্য পাঠাইয়াছিল, আশ্রমের সকলেই ভাগ পাইয়াছে। ক্রুদ্ধ চোখে চাহিতে চাহিতে রত্নাবলী বন্ধুর জন্য একটা পাথরের থালায় ফলমূল আর মিষ্টান্ন সাজাইতে থাকে। সন্দেহটা মনের মধ্যে ধীরে ধীরে বিশ্বাসে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। মনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ না জানিলেও মানুষের বড়ো বড়ো ভাবপরিবর্তনের মধ্যে মনের পরিবর্তন আবিষ্কার করা যায়। ভদ্রগৃহস্থের ছেলের সঙ্গে সামাজিক বিবাহের ফলে জীবনের সমস্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটি যার কাছে এমন গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল যে প্রায় মুচকি একটু হাসি পর্যন্ত অন্যায় মনে হইত, বন্ধুর এ রকম সাংঘাতিক জেরার সময় সে যদি এমন শয়তানি ভরা ফাজলামি করিতে পারে, কিছু একটা ঘটিয়াছে বইকী। হায়, মাঝখানে কিছুদিনের ছেদ পড়িয়া সদানন্দের সঙ্গে আবার কি মাধবীলতার আগের সম্পর্ক পাতানো হইয়া গেল ?

খা।

তুইও বোস ভাই, দুজনে একসঙ্গে খাই ?

এতক্ষণে, মাধবীলতা যখন এক টুকরা ফল মুখে তুলিতেছে, রত্নাবলীর নজর পড়িল, মাধবীলতার ডান হাতের কব্জির কাছটা লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

হাতটা প্রায় ভেঙে গেছে ভাই, গায়ে কী জোর মানুষটার !

চিবানো ফলের সঙ্গে ঢোক গিলিয়া রত্নাবলী ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করে, কেন, এত জোরে হাত ধরল কেন ?

মাধবীলতা হাসিয়া বলে, রাগের চোটে, আবার কেন।

তারপর ?

তারপর আবার কী ? আমি কটমট করে তাকাতে হাত ছেড়ে দিয়ে বকবকানি আরম্ভ করে দিল।

মাধবীলতা তৃপ্তির হাসি হাসে।

সতেরো

সত্য কথা বলিতে কী, মাধবীলতা কটমট করিয়া তাকানোর অবসর বেশিক্ষণ পায় নাই। অবসর পাইলেও সে তাকানিতে বিশেষ কোনো কাজ হইত কি না সন্দেহ। মূর্ছার উপক্রম হইলে যেমন হয়, মাথাটা সেই রকম বোঁ বোঁ করিয়া পাক খাইতে আরম্ভ করায় সে চোখ বুজিয়া মূর্ছা গিয়াছিল। সদানন্দের চোখ মুখ দেখিয়া সে যেমন ভয় পাইয়াছিল, অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ ভূত দেখিলেও সে রকম ভয় পাইত কি না সন্দেহ। তার মুখের সেই বীভৎস ভঙ্গি আর চোখের মারাত্মক দৃষ্টির মধ্যে পাশবিক কামনার একটু চিহ্ন খুঁজিয়া পাইলে মাধবীলতা হয়তো মূর্ছার চরম শিথিলতা আনিয়া সদানন্দের আলিঙ্গনে গা এলাইয়া দিত না, আলিঙ্গন আর একটু জোরালো হইলেই সে দেহের কয়েকটা পাঁজর নির্ঘাত মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া যাইত। মাধবীলতা নিঃসন্দেহে টের পাইয়াছিল, সদানন্দ তাকে খুন করিবে—সঙ্গে সঙ্গেই হোক অথবা অকথ্য যন্ত্রণা দিবার পরেই হোক। খবরের কাগজে যে সব খুনের খবর বাহির হয়, সোজাসুজি সেই রকম অভদ্র অমার্জিত হত্যা, উপন্যাসের পাষণ্ডেরা যে রকম রসালো খুন করে সে রকম নয়।

মাধবীলতার ভয় পাওয়ার আর একটা কারণ ছিল।

সদানন্দ তখন মহেশ চৌধুরির বাড়িতে, তাকে নূতন আশ্রমে সরানোর আয়োজন চলিতেছে। একদিন হঠাৎ নির্জন বারান্দায় সদানন্দের সামনে পড়িয়া সে পাশ কাটাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছে, সদানন্দ ডাকিয়া বলিয়াছিল, একটা কথা শোনা মাধু।

মাধবীলতা কথা শুনিতে দাঁড়ায় নাই। তখন তীব্র চাপা গলায় সদানন্দ বলিয়াছিল, একদিন তোমায় হাতে পেলে গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেব।

তখন কথাটাব দাম ছিল না। আজ মূর্ছা যাওয়ার আগে মনে হইয়াছিল, সদানন্দের পক্ষে ও কাজটা অসম্ভব কী ?

বিভূতি জিজ্ঞাসা করে, কেন গিয়েছিলে ?

মাধবীলতা জবাব দেয়, তোমার পেছনে কেন পুলিশ লেলিয়ে দিল ?

মাধবীলতার সর্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, জাগিয়া আছে তবু ঘুমেই দু-চোখ বুজিয়া গিয়াছে। মনের মধ্যে একটা ধিক্কার ভরা আর্তনাদ গুনগুনানো গানের মতো মৃদু চাপা সুবে গুমরাইতেছে। কী হইয়াছে ? কেন হইয়াছে ? কোথায় হইয়াছে ? কবে হইয়াছে ? কিছুই যেন মনে নাই। অবসাদের যন্ত্রণা যে এমন বৈচিত্র্যময় সকলেই তা জানে, তবু সকলের পক্ষেই 'এটা কে তা ...নিত'র পর্যায়ের।

[লেখকেব মন্তব্য · কেউ বিশ্বাস করে না, তবু জীবনের একটা চরম সত্য এই যে, সমস্ত অন্যায় আব দুর্নীতির মূলভিত্তি জীবনীশক্তির দ্রুত অপচয়—ব্যক্তিগত অথবা সংঘবদ্ধ জীবনের। যতই বিচিত্র আর জটিল যুক্তি ও কারণ মানুষ খাড়া করুক, ভালো-মন্দ উচিত-অনুচিত মানুষ ঠিক করিয়াছে এই একটিমাত্র নিয়মে। অব..., মানুষেব ভুল কবা স্বভাব কি না, তাই এমন একটা সোজা নিয়ম মানিয়া জীবনেব রীতিনীতি স্থিব করিতে গিযাও কত যে ভুল করিয়াছে তার সংখ্যা নাই।

মাধবীলতাব তৃপ্তি উবিয়া যায নাই, অবসাদেব যন্ত্রণাব নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে মাত্র। এটা অনুতাপ নয়।]

সে রাত্রে আব বেশি জেবা কবা গেল না। কার... বিড়বিড় করিয়া কয়েকটা ভাঙা ভাঙা দুর্বোধ্য কথা বলিতে বলিতে মাধবীলতা ঘুমাইয়া পড়িল। পরা... সে অনেক কথাই বলিল বটে কিন্তু বিভূতি ভালো করিযা কিছুই বুঝিতে পারিল না। কারণ মাধবীলতাব অনেক কথার মানেটা দাঁড়াইল সেই একই কথায়, সে গিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া বলিয়া আসিযাছে বিভূতির পিছনে আর যেন সদানন্দ পুলিশ না লাগায়। কথাটা জটিলও নয, দুর্বোধ্যও নয়, তবু বিভূতির মনে হইতে লাগিল, মাধবীলতা যেন একটা খাপছাড়া কাজ করিয়া ব্যাখ্যা আর কৈফিয়তের বদলে একটা হেঁয়ালি রচনা করিতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে মাধবীলতা একদিন যার বিরুদ্ধে তাব কাছে নালিশ করিয়াছিল আর সে যাকে গিয়া মারিয়াছিল ঘুষি, এতকাল এক বাড়িতে আর বাড়ির কাছে আশ্রমে থাকার সময় যে মাধবীলতা তার ধারে কাছে ঘেঁষে নাই। এখন বলা নাই কওয়া নাই এত দূর আশ্রমে গিয়া তার হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিয়া আসিল সে যেন বিভূতির পিছনে আর পুলিশ না লেলাইয়া দেয় ! কচিখুকি তো সে নয় যে এটুকু জ্ঞান তার নাই, এ ভাবে তার সদানন্দের হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিতে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না ? তার ভালোর জন্য গিয়াছিল ? তার বিপদের ভয়ে দিশেহারা হইয়া ? কথাটা ভাবিতে ভালো লাগে কিন্তু বিশ্বাস যে করা যায় না ! দিশেহারা আতঙ্ক ছাড়া আর কিছুতেই প্রকাশ পায় না সে আবার কোন দেশি সৃষ্টিছাড়া প্রেম, সে প্রেম মাধবীলতা পাইলই বা কোথায় ? তা ছাড়া দিশেহারা আতঙ্কের আর কোনো লক্ষণ তো তার মধ্যে দেখা যায় নাই।

মনটা এমন খারাপ হইয়া গেল বিভূতির বলিবার নয়। আটক থাকার সময় প্রায়ই যেমন মনে হইত সব ফাঁকি আর সব ফাঁকা, কাঁটা বিছানো বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করাটাই জীবন আর মেশানো আলো-অন্ধকারের আবছা অর্থহীন উপমার মতো স্মৃতি-কল্পনা আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখের খিচুড়ি পাকানো ভোঁতা অনুভূতিগুলির মাথার মধ্যে মাথাধরার মতো টিপটিপ করাটাই বাঁচিয়া থাকার একমাত্র অভিব্যক্তি, আজ তেমনই মনে হইতে লাগিল, মাধবীলতাও যে তার আপন নয় এই সত্যটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হওয়াটাই তাকে আপন করিতে চাওয়ার একমাত্র সম্ভবপর পরিণতি। আটক থাকার সঙ্গে মাধবীলতা আপন নয় ভাবার পার্থক্য অনেক, কিন্তু মন খারাপ হওয়াটা এক রকম কেন, এই দার্শনিক সমস্যাটা মনে উদয় হওযায় বিভূতি একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল এবং সকল অবস্থার সুখদুঃখ একই রকম কি না এই কথাটা ভাবিতে আরম্ভ করায় আধঘণ্টার মধ্যে ঘটিয়া গেল স্নায়বিক বিপর্যয়। তখন, মৃদুস্বরে সে ডাকিল, মাধু ?

আজ অবসাদ কমিয়াছে, কারণ বিভূতির রকম-সকম দেখিয়া অল্প অল্প ভয়ের উত্তেজনা আসিয়াছিল। ঘুম তাই একেবারেই আসে নাই। ঘুমের ভানে মাধবীলতা এমনভাবেই সাড়া দিল যে পরমুহূর্তে আকস্মিক আবেগে বিভূতি তাকে জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু কী মৃদু আর সশঙ্ক সে আলিঙ্গন, পাঁজর যদি মাধবীলতার পাটখড়ির হইত তবু ভাঙিবার কোনো ভয় ছিল না।

অনেকগুলি দিন কাটিয়া গেলে হয়তো আবার একদিন আশ্রমে যাওয়ার সাধটা মাধবীলতাব অদম্য হইয়া উঠিত কিন্তু কয়েকটা দিন কাটিবার আগেই একদিন মহেশ চৌধুরি বলিল, চলো মা একবাব আশ্রম থেকে ঘুরে আসি।

না গেলেও চলিত, খুব বেশি ইচ্ছাও ছিল না যাওয়ার, তবু মাধবীলতা শ্বশুরের সঙ্গে আশ্রমে বেড়াইতে গেল। তখন সকালবেলার মাঝামাঝি, আবহাওয়া অতি উত্তম। এক বছর সদানন্দেব উপদেশ শোনার চেয়ে এক বছর আশ্রমে পায়চারি করিলে প্রকৃতির প্রভাবেই মনের বেশি উন্নতি হয়। মহেশ চৌধুবিকে একটু চিন্তিত দেখাইতেছিল। চিন্তা মহেশ চৌধুরি চিবকালই করিয়া থাকে কিন্তু বেশ বুঝা যায় যে এখন তার মুখের ছাপটা দুর্ভাবনার। কী হইয়াছে কে জানে !

গাছতলায় আশ্রমের সকলে সদানন্দকে ঘিরিয়া বসিযাছে। প্রাচীন ভারতেব তপোবনে শিষ্যবেষ্টিত ঋষির ছবি যার কল্পনায় আছে, দেখিলেই তার মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। মহেশ চৌধুরি ভুরু কুঁচকাইয়া বিস্ময়ের সঙ্গে চাহিয়া থাকে আর মৃত্যুর মধ্যে জীবনের কতখানি শেষ হইয়া যায় সকলকে তার হিসাব বুঝাইতে বুঝাইতে হাসিমুখে সদানন্দ মাথাটা হেলাইয়া তাকে অভ্যর্থনা জানায়। মাধবীলতা রত্নাবলীর কাছে গিয়া বসে আব সদানন্দের ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া মহেশ চৌধুরি বসে সকলের পিছনে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বেশ বুঝিতে পারা যায় একমনে সে সদানন্দের কথা শুনিতেছে, অসম্ভব কিছু সম্ভব হইতে দেখিবার বিস্ময়ের সঙ্গে।

অন্য সকলের, পুরুষ ও নারীদের বিস্ময় নাই। সকলে মুগ্ধ, উত্তেজিত। কথা শেষ করিয়া সদানন্দ হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়ায়, ধীরে ধীরে একা নদীর দিকে আগাইয়া যায়। যে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি ক্ষণকালের স্তব্ধতার শেষে শুরু হয়, তার মধ্যে অনেকগুলি আত্মসমর্পিত মনের সার্থকতার আনন্দ যেন রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের মতো প্রাঞ্জল মনে হয়। অন্তত মহেশের যে মনে হয় তাতে সন্দেহ নাই, কারণ সে আরও বেশি থতোমতো খাইয়া সদানন্দের গতিশীল মূর্তির দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে।

রত্নাবলীর সঙ্গে তার কুটিরে যাওয়ার আগে মাধবীলতা তাকে খবরটা দিতে আসিল, ফিরিবার সময় যাতে তাকে খোঁজ করার হাঙ্গামা না বাঁধে।

মহেশ চৌধুরি বলিল, আমরা আজ এখানে থাকব মাধু।

সারাদিন ?

সারাদিন তো বটেই, সারারাতও থাকতে পারি।

মাধবীলতা এই উদ্ভট সিদ্ধান্তের কারণটা জানিবার চেষ্টা আরম্ভ করার আগেই মহেশ চৌধুরি উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সদানন্দ তখন চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে। নদীর ধারে অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও তার দেখা না পাইয়া মহেশ চৌধুরি অবশ্য বুঝিতে পারিল যে নদীর দিকের খিড়কি দবজা দিয়া সদানন্দ কুটিরে ফিরিয়া গিয়াছে, কিন্তু নিজে সে কুটিরে ঢুকিল না। রত্নাবলীর কুটিরে ফিরিয়া গিয়া মাধবীলতাকে বলিল, ওঁকে একবার ডেকে আনো তো মাধু।

মাধবীলতা অবাক। ডেকে আনব ? এখানে ?

হ্যাঁ। বলো গে আমি একবাব দেখা করতে চাই।

মহেশ চৌধুরি হুকুম দিয়া ডাকিয়া আনিয়া দেখা করিবে সদানন্দের সঙ্গে। প্রতিবাদ করিতে গিয়া কিছু না বলিযাই মাধবীলতা চলিয়া গেল। হঠাৎ তাব মনে পড়িয়া গিয়াছিল মহেশ চৌধুরির পাগলামির মানে বুঝিবার ক্ষমতা এতদিন এক বাড়িতে থাকিয়াও তার জন্মে নাই।

প্রায় একঘণ্টা পরে, রত্নাবলী যখন ব্যস্ত আর বিব্রত হইয়া বারবার বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে তাব একবার গিয়া খোঁজ করিয়া আসা উচিত, মাধবীলতা ফিরিয়া আসিল। সদানন্দ বলিয়া পাঠাইযাছে, দেখা করিবার দরকার থাকিলে মহেশ চৌধুরি যেন সন্ধ্যার পর তার সঙ্গে গিয়া দেখা করিয়া আসে। শুনিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া মহেশ চৌধুরি বলিল, চলো আমরা ফিরে যাই মাধু।

সাবাদিন এখানে থাকবেন বলেছিলেন যে ?

আর থেকে কী হবে ? ভেবেছিলাম মানুষটা বুঝি হঠাৎ বদলে গেছে, কিন্তু মানুষ কী কখনও বদলায় ?

মানুষ যে বদলায় না, তার আর একটা মস্ত বড়ো প্রমাণ পাওয়া গেল ফিরিবার পথে। চরডাঙা গ্রামেব কাছাকাছি মস্ত একটা মাঠে পঁচিশ-ত্রিশজন অর্ধ উলঙ্গ নোংরা মানুষকে আত্মহত্যা করিতে বিভূতি নিষেধ কবিতেছে। মুখে ফেনা তুলিযা এমনভাবে নিষেধ করিতেছে যেন কোনো বকমে এই লক্ষ্মীছাড়া বোকা মানুষগুলোকে কথাটা একবার বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তারা হত্যা করিবে তবু আর এ ভাবে আত্মহত্যা করিবে না।

একসঙ্গে খাইতে বসিয়া মহেশ চৌধুবি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিল, আবার কি তুমি জেলে যেতে চাও ?

সাধ করে কেউ জেলে যায় ?

বিভূতির মেজাজটা ভালো ছিল না।

অমন করে ওদের খেপিয়ে তুললে জেলেই তো যেতে হয় বাবা ? একটু কিছু ঘটলেই তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

নেয় নেবে।

মহেশ চৌধুরি ডালমাখা ভাত খায় আর ভাবে। বুঝাইয়া কোনো লাভ হইবে না। এই কথাটাই অনেকবার অনেক ভাবে ছেলেকে সে বুঝাইয়াছে যে, অকারণে জেলে গিয়া কোনো লাভ হয় না, সেটা নিছক বোকামি—কাজের মতো কোনো কাজ করিয়া ছেলে তার হাজারবার জেলে যাক, হাজার বছরের জন্য জেলে যাক মহেশ চৌধুরির তাতে তো কোনো আপত্তি নাই ! কিন্তু পাহাড়ে উঠিবার উদ্দেশে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার মতো দেশ আর দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য চোখ কান বুজিয়া জেলে যাওয়ার তো কোনো অর্থ হয় না। মনে হইয়াছিল, বিভূতি বুঝি কথাটা বুঝিতে পারিয়াছে—বিভূতি চুপচাপ শুনিয়া গিয়াছে, তর্কও করে নাই, নিজের মতামত জাহির করিবার চেষ্টাও করে নাই। আজ আবার মহেশ চৌধুরির মনে হইতে লাগিল, অনেকদিন পরে বাড়ি ফিরিয়া সে শুধু বাপের সঙ্গে কথা কাটাকাটি এড়াইয়া চলিয়াছিল, কথাগুলি তার মাথায় ঢোকে নাই।

একবার ঢোঁক গিলিয়া মহেশ চৌধুরি এক চুমুকে জলের গ্লাসটা প্রায় অর্ধেক খালি করিয়া ফেলিল। ছেলেও যদি তার সহজ সরল কথা না বুঝিয়া থাকে—

অথবা এ সব কথা বুঝিবার নয় ? মানুষ যা করিতে চায় তাই করে ?

অল্প দূরে মহেশের পোষমানা বিড়ালটি ঘুপটি মারিয়া বসিয়াছিল। মাছের ঝোল পরিবেশন করিতে আসিবার সময় বেচারির লেজে কী করিয়া মাধবীলতার পা পড়িয়া গেল কে জানে, চমক দেওয়া আওয়াজের সঙ্গে লাফাইয়া উঠিয়া মাধবীলতার নতুন শাড়িখানি আঁচড়াইয়া ছিঁড়িয়া দিল। মাছের ঝোলের থালাটি মাটিতে পড়িয়া গেল, বিড়ালটির মতোই বিদ্যুৎগতিতে লাফ দিয়া পিছু হটিতে গিয়া মাধবীলতা ধপাস করিয়া মেঝেতে পড়িয়া গেল—পা ছড়াইয়া বসিবার ভঙ্গিতে। গায়ে তার আঁচড় লাগে নাই, পড়িয়া গিয়াও বিশেষ ব্যথা লাগে নাই কিন্তু চিৎকার শুনিয়া মনে হইল তাকে বুঝি বাঘে ধরিয়াছে।

কাঠের মোটা একটা পিঁড়ি কাছেই পড়িয়াছিল, দু-হাতে পিঁড়িটা তুলিয়া নিয়া এমন জোরেই বিভূতি বিড়ালটিকে মারিয়া বসিল যে মরিবার আগে একটা আওয়াজ করার সময়ও বেচারির জুটিল না।

সকলের আগে মহেশ চৌধুরির মনে হইল তার পোষমানা জীবটি আর কোনোদিন লেজ উঁচু করিয়া তার পায়ে গা ঘষিতে ঘষিতে ঘড়ঘড় আওয়াজ করিবে না। তারপর অনেক কথাই তার মনে হইতে লাগিল।

জটিল, খাপছাড়া সব রাশি রাশি কথা—চিন্তাগুলি যেন ছেঁড়া কাগজের মতো মনের ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ দমকা হাওয়ায় এলোমেলা উড়িতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এ রকম অবস্থায় মহেশ চৌধুরি কথা বলে না। তা ছাড়া আর উপায় কী আছে ? এমন অভ্যাস জন্মিয়া গিয়াছে যে বিচার-বিবেচনার পর একটা কিছু সিদ্ধান্ত দিয়া না বুঝিলে মনের ভাব আর প্রকাশ করা যায় না। আত্ম-বিরোধী মত যদি কিছু প্রকাশ করিয়া বসে ? সেটা প্রায় সর্বনাশের শামিল। কেন সর্বনাশের শামিল তা অবশ্য মহেশ চৌধুরি কখনও ভাবিয়া দেখে নাই, তবে ক্ষতির সম্ভাবনাকে আত্মরক্ষী জীবমাত্রেই ভয় করে! নিজের সুখদুঃখকে পরের সুখদুঃখের মুখাপেক্ষী করার নীতি যাকে মানিয়া নিতে হয়, অস্বাভাবিক সংযম তার একমাত্র বর্ম। রাগে দুঃখে অভিমানে বিচলিত হওয়া মহেশ চৌধুরির পক্ষে সম্ভব কিন্তু উচিত কী অনুচিত না জানিয়া পোষা একটা বিড়ালকে মারার জন্য বিভূতিকে চড় চাপড়টা মারিয়া বসাও সম্ভব নয়, গালাগালি দেওয়াও সম্ভব নয়।

কয়েকবার ঢোঁক গিলিয়া মহেশ চৌধুরি একেবারে চুপ করিয়া যায়। অন্য বিষয়েও একটি শব্দ আর তার মুখ দিয়া বাহির হয় না। খাওয়াও তখনকার মতো শেষ হয় সেইখানে।

বিস্ফারিত চোখে খানিকক্ষণ মরা বিড়ালটার দিকে চাহিয়া থাকিয়া মাধবীলতা প্রমথ ভয়ে ভয়ে কথা বলে, কেন মারলে ? কী নিষ্ঠুর তুমি !

যেখানে যেখানে আঁচড়ে দিয়েছে, আইডিন লাগিয়ে দাও গিয়ে।

আঁচড় লাগেনি।

কথাটা বিভূতি সহজে বিশ্বাস করিতে চায় না। একটুও আঁচড় দেয় নাই ? একেবারে না ? কী আশ্চর্য ব্যাপার ! তবে তো বিড়ালটাকে না মারিলেও চলিত। বোকার মতো একটু হাসে বিভূতি, মড়া বিড়ালটার দিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া নেয়। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে যেন একটু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, বিস্ময়ে নয়, ব্যথা লাগে না এমন কোনো আকস্মিক ও প্রচণ্ড আঘাতে। মহেশ চৌধুরির নির্বাক থাকার চেয়ে বড়ো সংযম যেন বিভূতির দরকার হইতেছে শুধু সহজ নির্বিকার ভাবটা বজায় রাখিতে। বিচলিত হওয়ার উপায় তো বেচারির নাই। মনের কোমল দুর্বলতা যদি প্রকাশ পাইয়া

যায় ? সেটা প্রায় সর্বনাশের শামিল। কেন সর্বনাশের শামিল তা অবশ্য বিভূতি কখনও ভাবিয়া দ্যাখে নাই, তবে অন্যায়-বিরোধী মানুষ মাত্রেই নিজের দুর্বলতাকে চাপা দিতে চায়। পরের দুঃখ কমানোর জন্য নিজের দুঃখকে তুচ্ছ করার নীতি যাকে মানিয়া নিতে হয়, অস্বাভাবিক সংযম তারও একমাত্র বর্ম। অনুতাপে থতোমতো খাইয়া যাওয়া বিভূতির পক্ষে সম্ভব কিন্তু স্ত্রীকে আক্রমণ করার জন্য তুচ্ছ একটা বিড়ালকে শাস্তি দিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

চাকর বিড়ালের দেহটা তুলিয়া নিয়া যায়, বিভূতি আবার খাইতে আরম্ভ করে। খাইতে খাইতে ধীরে ধীরে সে আত্মসংবরণ করিতে থাকে। আত্মসংবরণ কবিতে সময় তার বেশিক্ষণ লাগে না, খাওয়া-দাওয়ার পর মাধবীলতা যখন আজ শশধরের বউয়ের সঙ্গে গল্প করার বদলে পান হাতে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়, বিভূতির মন তখন কঠিন কর্তব্য সম্পন্ন করার গাঢ় আব আঠার মতো চটচটে তৃপ্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। দুপুরটা সেদিন দুজনের গভীর আনন্দে কাটিয়া গেল। পুরুষ আব নারীর প্রথম যৌবনের সব দুপুব ও রকম আনন্দে কাটে না।

বিভূতির মা ঘরে যায় দুধেব বাটি হাতে। মহেশ এক রকম কিছুই খায় নাই।

খাও।

মহেশ কথা বলে না, শুধু মাথা নাড়ে। কিন্তু শুধু মাথা নাড়িয়া পতিব্রতা স্ত্রীকে কে কবে ঠেকাইতে পারিয়াছে ? শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হইযা বলিতে হয়, কেন জ্বালাতন করছ ? এখন কিছু খাব না।

কেন খাবে না ?

বিভূতির মার নিজেরও খাওয়া হয় নাই, ক্রমে ক্রমে মেজাজ চড়িতেছিল আবার খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া মহেশ যখন সংক্ষেপে কৈফিয়ত দেয় যে, মনেব উত্তেজনার সময় খাইলে শরীর খারাপ হয়—বিভূতিব মাব মেজাজ রীতিমতো গরম হইযা উঠিয়াছে।

কচি খোকার মতো কী যে কর তুমি !

ভালো করিয়া কথা বলিলে, এমনকী রীতিমতো ঝগড়া করিলেও হয়তো বিভূতির মা তখনকার মতো শুধু রাগে গবগব কবিতে করিতে চলিয়া যাইত, এক ঘণ্টা পবে আবার ফিরিয়া আসিত দুধের বাটি হাতে। কিন্তু এ ভাবে কথা পর্যন্ত বলিতে না চাহিলে কি মানুষের সহ্য হয ? বিভূতির মা তো আব জানিত না, নিজের মনের সঙ্গে মহেশ বুঝাপড়া করিতেছে, কত যে বিচার-বিশ্লেষণ চলিতেছে তার সীমা নাই। খোলা দরজা দিয়া দুধের বাটিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিভূতির মা আগাগোড়া একটা বিছানার চাদর মুড়ি দিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া রহিল।

তখন মনটা মহেশ চৌধুরির বড়ো খারাপ হইয়া গেল। কী দোষ করিয়াছে বিভূতির মা ? অন্যের পাপে সে কেন কষ্ট পায় ? সেদিনের কথা মহেশের মনে পড়িতে থাকে, সদানন্দের কুটিরের সামনে তার সঙ্গে বিভূতির মা যখন গাছতলায় বৃষ্টিতে ভিজিতেছিল। বিছানার একপ্রান্তে পা গুটাইয়া বসিয়া মহেশ ভাবিতে থাকে। বিভূতির মাকে তুলিয়া খাওয়ানো যায়, সেটা তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কী লাভ হইবে ? বিভূতির সম্বন্ধে যা সে ভাবিতেছে তাই যদি স্থির করিয়া ফেলে, তখন বিভূতির মাকে যে কষ্টটা ভোগ করিতে হইবে তার তুলনায় এখনকার এ কষ্ট কিছুই নয়।

বিভূতিকে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে বলিবে কি না, এই কথাটাই মহেশ ভাবিতেছিল। বিড়াল মারার জন্য নয়, বিভূতির প্রকৃতি যে কখনও বদলাইবে না এটা সে ভালো করিয়া টের পাইয়া গিয়াছে বলিয়া। এখন বিভূতিকে বাড়িতে থাকিতে দেওয়ার অর্থই কি তাকে সমর্থন করা নয় ? শুধু ছেলে বলিয়া তাকে আর কি ক্ষমা করা চলে, চোখ কান বুজিয়া আর কি আশা করা চলে এখনও তার সংশোধন সম্ভব ? বিনা প্রতিবাদে এখন চুপ করিয়া থাকা আর বিভূতিকে স্পষ্ট বলিয়া দেওয়া যে সে যা খুশি করিতে পারে, এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। তার ছেলে বলিয়া বিভূতির অন্যায়

করার যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আছে, মানুষের উপর যে প্রভাব প্রতিপত্তি আছে বিভূতিকে জানিয়া শুনিয়া সে সমস্ত ব্যবহার করিতে দেওয়া আর তাব নিজের অন্যায় কবার মধ্যেই বা পার্থক্য কী ? মনে মনে মহেশ চৌধুরি স্পষ্টই বুঝিতে পারে, এ বিষয়ে আর ভাবিবার কিছু নাই, বিভূতিকে বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা উচিত কী অনুচিত এটা আর প্রশ্নই নয়, এখন আসল সমস্যা দাঁড়াইয়াছে এই যে, বিভূতি তার ছেলে। বিভূতি যে তার স্ত্রীরও ছেলে এটা এতক্ষণ মহেশের যেন খেয়াল ছিল না। বিভূতির মার চাদর মুড়ি দেওয়া মূর্তি এই আসল সমস্যাটাকে তাই একটু বেশি রকম জটিল করিয়া দিয়াছে।

বিভূতির মার ছেলেকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার অধিকার কি তার আছে ?

ভালো ছেলে, সৎ ছেলে, আদর্শবাদী ছেলে—গ্রামে আর এমন ছেলে নাই। কেবল বুদ্ধিটা একটু বিকৃত—ভালোমন্দের ধারণাটা ভুল। অনেকগুলি মানুষকে খ্যাপাইয়া তুলিবাব আনন্দ, দু-দিন পরে যখন প্রচণ্ড একটা সংঘর্ষ ঘটিয়া যাইবে, কতকগুলি মানুষ যাইবে জেলে আর কতকগুলি যাইবে হাসপাতালে আর কতকগুলির দেহ উঠিবে চিতায়, আনন্দের তখন আর তার সীমা থাকিবে না। জেল, হাসপাতাল বা চিতা এর কোনোটার জন্য নিজেরও অবশ্য তাব ভয় নাই। ছেলের এই নির্ভীকতাও মহেশের আর একটা বিপদ। নিজের কথা যে ভাবে না, স্বাধীনভাবে চলাফেবার বয়স যার হইয়াছে, ছেলে বলিয়া আর মতের সঙ্গে মত মেলে না বলিয়া তার উপর বাপের অধিকাব খাটানোর কথা ভাবিতে মনটা মহেশের খুঁতখুঁত করে।

মহেশ চৌধুরি নির্বাক হইয়া থাকে প্রায় তিন দিন। গম্ভীর নয়, বিষণ্ণ নয়, উদাস নয়, শুধু নির্বাক। বিভূতির মাও নির্বাক হইয়া থাকে, কিন্তু তাকে বড়ো বেশি গম্ভীর, বিষণ্ণ আর উদাস মনে হয়।

বিভূতি বলে, কী হয়েছে মা ?

বিভূতির মা বলে, কিছু হয়নি।

বিভূতি পিছন হইতে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কানের কাছে মুখ নিয়া চুপিচুপি বলে, শোনো, আমার জন্যে ভেবো না। ভয় নেই, আমি আর জেলে যাব না। সে সব ছেলেমানুষি বোকামির দিন কেটে গেছে।

তবু বিভূতির মার প্রথমটা মনমরা ভাব কাটিতে চায় না। বরং বাড়িবার উপক্রম হয়। কারণ একদিন মহেশ চৌধুরি সোজাসুজি বিভূতির সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্তেব কথাটা তাকে শুনাইয়া দেয়।

বিভূতির মা প্রথমটা শোনে হাঁ করিয়া, তারপর দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলে, বেশ তো, তাড়িয়ে দাও।

তুমি কী করবে ?

আমি ? গলায় কলসি বেঁধে পুকুরে গিয়ে ডুব দেব।

সত্যি ? না, তামাশা করছ ?

ছোটো ছেলেকে প্রথম ভাগ পড়ানোর মতো ধৈর্যের সঙ্গে বিভূতির মা বলে, দ্যাখো পষ্ট কথা বলি তোমাকে শোনো। তুমি না থাকলেও আমার এক রকম করে দিন কেটে যাবে, কিন্তু ছেলে ছাড়া আমি বাঁচব না বলে রাখছি।

মহেশ তা জানিত, এতদিন খেয়াল করে নাই।

এই কথা ভাবছ বুঝি কদিন ? বিভূতির মা জিজ্ঞাসা করে।

মহেশ চৌধুরি নীরবে মাথা হেলাইয়া সায় দেয়।

বিভূতির মা তার মুখের সামনে হাত নাড়িয়া বলে, কেন শুনি ? কী জন্যে শুনি ? ওর কথা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার কী শুনি ? ছেলে বড়ো হয়েছে, বিয়ে-থা দিয়েছ, তার যা খুশি

সে করুক। তোমার তাতে কী ? তোমার কাজ তুমি করে যাও, তার কাজ সে করুক—তুমি কেন ওর পেছনে লাগতে যাবে ?

মহেশ ভাবিতে ভাবিতে বলে, নিজের কাজ করার জন্যেই তো ওর পেছনে লাগতে হচ্ছে গো।

ভাবিতে ভাবিতে মহেশ চৌধুরির দিন কাটে। মানুষটার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে—সদানন্দের অধঃপতনের আঘাতে অথবা সদানন্দের সম্বন্ধে ভুল করার ধাক্কায়। আর যেন নিজের উপর সে সহজ বিশ্বাস নাই। সমস্ত প্রশ্নই আজকাল ধাঁধার মতো মনে হয়। কত সন্দেহই যে মনে জাগে ! জীবনের পথে চলিবার জন্য আত্মবিশ্বাসের একটি মাত্র রাজপথ ধরিয়া এতকাল চলিবার পর বুদ্ধিবিবেচনা যেন ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন পথের অস্তিত্ব দেখাইয়া তার সঙ্গে খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বিভূতির মার সঙ্গে আলোচনা করার পর একটা যে প্রচণ্ড সংশয় মহেশের মনে জাগে, তার তুলনা নাই। বিভূতির সম্বন্ধে কী করা উচিত স্থির করিয়া ফেলার পর সেটা করা সত্যই উচিত কি না সে বিষয়ে আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি তার মনে আসিয়াছে, প্রথমে যা খেয়ালও হয় নাই। বিভূতির সম্বন্ধে কী করা উচিত জানিয়াও তা না করা এককথা—নিজের অনেক দুর্বলতার মধ্যে একটির সম্বন্ধে সুনিশ্চিত প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা যায় আর দুঃখিত হওয়া চলে। কিন্তু এ তো তা নয় ! অনেক বিষয় বিবেচনা না করিয়াই সে যে কী করা উচিত স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। তার সমস্ত বিচার-বিবেচনাই কি অসম্পূর্ণ, একপেশে ? কেবল উপস্থিত প্রমাণ প্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া আদালতের চোখ-কান বুজিয়া বিচার করার মতো নিজের জ্ঞান আর বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই কি [illegible] নিরপেক্ষতা ? একটা প্রশ্নের সম্বন্ধে কত কথা ভাবিবার থাকে, নিজের ভাবিবার ক্ষমতা দিয়া কী সে প্রশ্নের মীমাংসা করা উচিত, যদি মীমাংসা করার আগেই সমস্ত কথাগুলি ভাবিবার ক্ষমতা না থাকে ? চিরজীবন সে কি এমনই ভুল করিয়া আসিয়াছে ? মানুষ কি এমনই ভুল করে, পৃথিবীর সব মানুষ ?

মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানে আর নূতন জ্ঞানের আলোকে এই ভুলকে আবিষ্কার করে ?

এবং হয়তো আবার নূতন জ্ঞানের আলোকে আবিষ্কার করে যে এই আবিষ্কারটাও মিথ্যা ?

সুতরাং বিষম এক জটিল সমস্যা নিয়া মহেশ চৌধুরি বড়োই বিব্রত হইয়া পড়ে। ব্যাপারটা কিন্তু হাস্যকর মোটেই নয়। জগতে এমন কে চিন্তাশীল আছে এ সমস্যা যাকে পীড়ন না করে ? এ সংশয়ের হিমালয় না ডিঙাইলে তো চরম সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

[লেখকের মন্তব্য : মহেশ চৌধুরির আসল সমস্যার কথাটা আমি একটু সহজভাবে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিই। বলার প্রয়োজনও আছে। মহেশ চৌধুরির মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইলে তার মনের অবস্থাটা বুঝা সম্ভব, ধাঁধাটা পরিষ্কার হওয়া সম্ভব নয়।

কোনো প্রশ্নের বিচারের সময় সেই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত যুক্তিতর্ক বিবেচনা করা উচিত, এই কথাটা মহেশ চৌধুরির মনে হইয়াছে। কথাটা গুরুতরও বটে, যুক্তিসঙ্গতও বটে। কিন্তু মুশকিল এই, কেবল প্রশ্ন নয়, জগতে এমন কী আছে যার সঙ্গে জগতের অন্য সমস্ত কিছু সংশ্লিষ্ট নয়? অস্তিত্বের অর্থই তাই—সমগ্রতা। বিচ্ছিন্ন কোনো কিছুর অস্তিত্ব নাই। এদিকে মানুষের মস্তিষ্ক এমন যে সেখানে এক সময় একটির বেশি সমগ্রতার স্থান হয় না—অংশও মস্তিষ্কের পক্ষে সমগ্র। জগতের অসংখ্য আংশিক সমগ্রতাকে ধারাবাহিকভাবে বিচার করিয়া কোনো প্রশ্নের জবাব পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমস্ত দর্শন তাই একটি মাত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছে—আংশিক সমগ্রতার পরিধি বাড়াইয়া চলা। দুটি অংশের একত্ব আবিষ্কার করিয়া দুটি আংশিক সমগ্রতাকে এক করিতে পারিলে জ্ঞানের পথে, চরম বা পরম সত্য আবিষ্কারের পথে, এক পা অগ্রসর হওয়া গেল। আজ পর্যন্ত কেউ বিশ্বের সমগ্রতাকে নিজের ব্যক্তিগত একটি মাত্র সমগ্রতায় পরিণত করিতে পারিয়াছে কি না, ভবিষ্যতে কোনোদিন পারিবে কিনা জানি না।

তবে, সীমাবদ্ধ জ্ঞান মানুষকে এমনিভাবে সংগ্রহ করিতে হয়, সংকীর্ণ জীবনের তুচ্ছ সমস্যার বিচারও করিতে হয় এমনিভাবে। তাছাড়া আর উপায় নাই। জন্ম হইতে সকলে আমরা করিয়াও আসিতেছি তাই। শৈশবেও সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি, আজও করিতেছি। তখন যেটুকু জ্ঞান আয়ত্তে ছিল কাজে লাগাইতাম, আজ যেটুকু জ্ঞান আয়ত্তে আছে কাজে লাগাই। তখনকার জ্ঞান হয়তো ছিল মোটে কয়েকটি টুকরা জ্ঞানের যোগফল, আজকের জ্ঞান হয়তো অনেক বেশি টুকরার মিলিত পরিণাম, কিন্তু তখনও যেমন আর টুকরাগুলির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মাথা ঘামাইতাম না, আজও ঘামাই না। জলের সঙ্গে জল মেশার মতো, আলোর সঙ্গে আলো মেশার মতো, মিলিত আংশিক জ্ঞানের পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়াছে।

সমস্ত মানুষ, মনের মধ্যে কোনো প্রশ্ন জাগিলে, সাময়িক যুক্তি বা সত্যোপলব্ধির সম্পত্তি দিয়া তার বিচার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জবাবও পায়। জবাব না মানা আর নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করা আজ নিজের ভবিষ্যৎ পরিবর্তিত যুক্তি বা সত্যোপলব্ধির কাছে আপিলেব ভবসা করা অবশ্য ভিন্ন কথা। তবে সাধারণ আপিলের ফলটাও হয়তো মন মানিতে চায় না---শেষ যুক্তি বা শেষ সত্যের আদালত খুঁজিয়া মরিতে হয়।

সীমাবদ্ধ সংক্ষিপ্ত জ্ঞানের জগতের সমগ্রতার আশীর্বাদ মানুষ ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে। সংশয়বাদের রোগ ধরিয়াছে মানুষকে। প্রত্যেক প্রশ্নের বিচার করিতে আজ তাকে সেই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খোঁজ করিতে হয়। কে জানে এমন একদিন আসিবে কিনা যেদিন কেহ আমার এই উপন্যাসটি পড়িতে বসিয়া প্রথম লাইনটি পড়িয়া ভাবিতে আরম্ভ করিবে, লাইনটির যে অর্থ মনে আসিয়াছে তাই কী ঠিক, অথবা প্রত্যেকটি শব্দের আর প্রত্যেকটি অক্ষরের অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া, ব্যাকরণের নিয়মকানুনগুলি ভালো করিয়া ঘাঁটিয়া, শব্দতত্ত্ব আর ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিয়া লাইনটির মানে যাচাই করা উচিত ?]

একটি দুপুর তো বিভূতির মাধবীলতার সঙ্গে অপরিসীম আনন্দে কাটিয়া গেল, কিন্তু রাত্রি ? পরের দিনের দুপুরটা ? তার পরের দিনরাত্রিগুলি ? দুপুরটা যেন ছিল মাতালের মাঝরাত্রির মতো, শেষ হওয়ার সঙ্গে জীবনের আর কিছুই যেন রহিল না। তারপর কয়েকদিন ধরিয়া মাতলামির ক্ষুধায় ভিতরটা যেন জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু স্নায়বিক বিকারের ভাটিখানায় বড়ো বেশি খামখেয়ালি চলে।

তাই আর কোনো কারণ, কোনো তুচ্ছতম নূতন ঘটনা, না ঘটিলেও মাধবীলতার উপর অবিশ্বাসে বিভূতির যেন প্রায় বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। অনেক যুক্তিই মনে আসিতে লাগিল, তার মধ্যে সর্বপ্রধান, সে নিজে অতি অপদার্থ, আকর্ষণহীন, কুৎসিত পুরুষ। কেবল তাকে নিয়া খুশি থাকা মাধবীলতার পক্ষে কি সম্ভব ?

হঠাৎ আবার একদিন বিভূতি জেরা আরম্ভ করে, কই সেদিন আশ্রমে গিয়েছিলে কেন, তা তো বললে না ?

মাধবীলতা ভয় পাইয়া বলে, বললাম যে ?

কই বললে ?

ওই যে সেদিন বললাম।

হুঁ বলিয়া বিভূতি চুপ করিয়া যায়।

গভীর বিতৃষ্ণায় পিছন ফিরিয়া সে শুইয়া থাকে, মাধবীলতা মৃদুস্বরে ডাকিলে বলে, বড়ো ঘুম পাইয়াছে। ঘুম কিন্তু আসে না, মনের অস্বস্তি দেহের একটা অপরিচিত যন্ত্রণার মতো তাকে জাগাইয়া রাখে। মনে হয়, ঠিক চামড়ার নীচে সর্বাঙ্গে পেটের অম্বলের জ্বালা যেন ছড়াইয়া গিয়াছে আর বাহিরের গুমোটে তাতিয়া উঠিয়াছে মাথাটা। অথচ এমন আশ্চর্য ব্যাপার, শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পরদিন

যখন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙে, মনের অবস্থাটা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। পাশে যে অসতী স্ত্রী ছিল গতরাত্রে, অবিশ্বাসের সব কিছু ঝাড়িয়া ফেলিয়া আজ সকালে সে যেন চোখের আড়ালে সংসারের কার্য করিতে গিয়াছে। আগের রাত্রের ধারণা আজ বিভূতির নিছক ছেলেমানুষি মনে হয়। এমনই তুচ্ছ মনে হয় কথাটা যে ও বিষয়ে একটু চিন্তা করাটাও তার কাছে পরিশ্রমের অপচয়ের শামিল হইয়া দাঁড়ায়। দুঃস্বপ্ন দেখিয়া যেন বিচলিত হইয়াছিল, দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে। অনুভূতির জগতে যদিবা একটা দুর্বোধ্য আতঙ্কের জের এখনও আছে, পেটে অম্বলের শত্রুতা নাই, দেহে টনটনানি নাই, মাথায় গ্রীষ্মবোধও নাই। একটু শুধু ভারী মনে হইতেছে দেহটা। বোধ হয় হৃদয়ের ঈষৎ চাপাপড়া বেদনাবোধের ভারে।

চা আর খাবার খাইয়া বিভূতি গ্রামের দিকে যায়। শেষরাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশে অল্প অল্প মেঘের জন্য রোদেরও তেমন তেজ নাই। ঘুরিতে ঘুরিতে বিভূতি গিয়া হাজির হয় শ্রীধরের দোকানে। দোকানের সামনে কাঠের বেঞ্চে বসিয়া কয়েকজন ফিসফাস করিতেছিল, বিভূতিকে দেখিয়া তারা অপরাধীর মতো চুপ করিয়া যায়।

শ্রীধর অভ্যর্থনা জানাইয়া বলে, আসেন। বসেন। বিড়ি খান? বিভূতি বসে কতকটা উদাসভাবেই মাথা নাড়িয়া বলে, বিড়ি তো আমি খাই না।

শ্রীধর সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া বলে, ঠিক বটে, শহরে ছিলেন এতকাল, আপনারা খান সিগারেট। তা তো নেই দাদাবাবু ! তারপর কোথা হইতে কী করিয়া শ্রীধর যে মারাত্মক গাম্ভীর্য মুখে টানিয়া আনে সেই জানে, একটা অদ্ভুত আপশোশের শব্দ করিয়া বলে, শহর ভালো। জানেন দাদাবাবু, মোদের এ সব লক্ষ্মীছাড়া গাঁয়ের চেয়ে শহর ঢের ঢের ভালো। বউ-ঝি নিয়ে নিভ্‌ভাবনায় ঘর তো করা চলে—ঘরের বউ-ঝিকে তো কেউ জোর করে ধরে নিয়ে যায় না।

যারা ফিসফাস করিতেছিল তারা সকলে একবাক্যে সায় দেয়। একজন, রামলোচন দে, কাঁচাপাকা চুলের বাবরিতে ঝাঁকি দিয়া বলে, আপনি তো বলে খালাস দাদাবাবু, মরি যে আমরা। হুঁ, নিজের দোষে মরি তো বটে, উপায় কী বলেন ?

ক্রমে ক্রমে নানারকম আপশোশমূলক মন্তব্য ও প্রশ্নের বাধা ডিঙাইয়া আসল ব্যাপারটা বিভূতির বোধগম্য হয়। কারও বউ-ঝি কেউ সম্প্রতি হরণ করে নাই, যদিও কিছুকাল আগে এ রকম একটা ব্যাপার এই গ্রামেই ঘটিয়া গিয়াছে। সকলের বর্তমান রাগ-দুঃখ আর আপশোশের কারণটা এই। নন্দনপুরের ভদ্রলোকেরা গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলিয়া পাকা নাটমন্দিরের অভাব মিটানোর জন্য খড়ের একটা চালা তুলিয়াছে। তার নীচে নানা উপলক্ষে, মাঝে মাঝে বিনা উপলক্ষেও যাত্রাগান, কীর্তনগান প্রভৃতি হয়। খড়ের নাটমন্দিরটিতে স্থান একটু কম, তবে সাধারণ অনুষ্ঠানের সময় সেই স্থানও সবটা ভরে না। মুশকিল হয় ভালো দলের যাত্রা বা নাম করা কীর্তনীয়ার কীর্তন বা ওই রকম কোনো প্রোগ্রাম থাকিলে, যার আকর্ষণ আছে। তখন চালার নীচে অর্ধেক লোকের বসিবার স্থান হয় না, ভিড়ের বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে হয়। তাতেও কোনো আপত্তি ছিল না, যদি ও গ্রামের ভদ্রলোকেরা এ গ্রামের ভদ্রলোকদের মাঝে মাঝে সামনে গিয়া বসিতে দিত।

জায়গা থাকলেও বসতে দেয় না দাদাবাবু। এগিয়ে গিয়ে বসতে গেলে ঠেলে পিছনে হটিয়ে দেয়। কেন আমরা শতরঞ্চিতে বসতে পারি না সামনের দিকে ? চাঁদা দিই না আমরা ? ও কি তোদের বাপের সম্পত্তি যে শুধু গাঁয়ের বাবুদের জন্যে বেদখল করে রাখিস ?

আগের দিন শ্রীধর, রামলোচন এবং আরও অনেকে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। সামনের দিকে অনেকটা জায়গা খালি পড়িয়া আছে দেখিয়া যেই বসিতে গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে গলাধাক্কা। কে একজন

শ্রীধরের পিঠে সত্যই একটা ধাক্কা দিয়াছিল এবং আর একজন রামলোচনের বাবরি ধরিয়া দিয়াছিল টান।

শেষে ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাত্রা শুনি।

বিভূতি আশ্চর্য হইয়া বলে, তারপরেও যাত্রা শুনলে ?

শুনব না ? চাঁদা দিইনি আমরা ?

বিভূতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া সকলের মন্তব্য শুনিয়া যায়, তারপর জিজ্ঞাসা করে, ওরা কী বলল, যারা তোমাদের ঠেলে সরিয়ে দিলে ?

জবাব দিল শ্রীধর। কী আব বলবে দাদাবাবু, বলল, পিছন দিকে তোমাদের জন্যে বসবার জাযগা থাকে, আগে এসে বসতে পার না ?

একটা দিন হয়তো বিশেষ কারণে—

একটা দিন ? প্রত্যেকবার এমনই হচ্ছে, একটা দিন কী দাদাবাবু ! মোদেব গাঁয়ের কেউ সামনে গিয়ে বসতে চায় না।

এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বিভূতির সাধ যায় না। মনে হয়, প্রতিবাদ করাব মতো ব্যাপারও এটা নয়। যাত্রা শুনিতে গিয়া গ্রামের কয়েকজন বসিবার স্থান পায় নাই বলিয়া কি বিচলিত হওয়া চলে ? তবু বসিবার স্থানের উপর এ গ্রামের লোকেরও অধিকার আছে, স্থান থাকিলেও যদি তাদেব বসিতে দেওয়া না হয়, সেটা অন্যায়। অন্যায়ের প্রতিকার করা কর্তব্য। নিজের চোখে দেখিয়া ব্যাপারটা ভালো করিয়া বুঝিবার উদ্দেশ্যে বিভূতি বলে, সামনেব জন্মাষ্টমীতে যাত্রাটাত্রা হবে না ?

শ্রীধর বলে, তিন রাত্তির হবে, অনেক মজা আছে দাদাবাবু।

বিভূতি বলে, তোমরা সবাই আমার সঙ্গে যেও, দেখি কেমন বসতে না দেয়।

একজন একটু সংশয ভরে জিজ্ঞাসা করে, কী করবেন ?

বিভূতি হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলে, আমি একা কী করব ? তোমবা সবাই করবে—জায়গা থাকলে সেখানে বসে পড়বে। আবার কী ?

আঠারো

নেতা হওয়া যে এত সহজ আর নেতৃত্ব করা এমন কঠিন, বিভূতি তা জানিত না। এবাব সে ব্যাপারটা ভালো করিয়া বুঝিতে পারে। শ্রীধবেব দোকানে বসিয়া মাত্র কয়েকজনের কাছে সে আবেগের সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছিল যে নন্দনপুরেব যাত্রার আসবে সামনে বসিবার অধিকার সে তাদেব আদায় করিয়া দিবে, জন্মাষ্টমীর দিন দেখা গেল নানা বয়সের প্রায় দেড়শো মানুষ তার এই অধিকার আদায়ের অভিযানে যোগ দিয়াছে। শ্রীধর বা রামলোচনের মতো যারা অন্তত ফতুয়া গায়ে দিয়া যাত্রা শুনিতে যায়, এদের অধিকাংশই সমাজের সে স্তরের মানুষও নয়। এরা যাত্রা শুনিতে যায় গামছা কাঁধে, আসরে সামনের দিকে ভদ্রলোকদের মাঝে বসিতে পাইলে বোধ হয় রীতিমতো অস্বস্তিই বোধ করে। শ্রীধর, রামলোচন প্রভৃতির মতো চাঁদা দিয়াও সামনে বসিতে না পাওয়ার অপমানে এরা ক্ষুব্ধ হয় নাই। চাঁদাই বা এদের মধ্যে ক-জন দিয়াছে কে জানে ! কোথা হইতে দিবে ? খাজনা দিতে যাদের অনেকের ঘটিবাটি বাঁধা দিতে হয়, চাঁদা দেওয়ার বিলাসিতা তাদের কাছে প্রশ্রয় পায় না।

তবু তার নেতৃত্বে যাত্রার আসর আক্রমণের জন্য সকলে যেন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। নন্দনপুরের স্থায়ী আটচালার নীচে সর্বসাধারণের যাত্রার আসর। চাঁদা দিক বা না দিক, গায়ে ফতুয়া থাক বা না থাক, এদের সকলেরই অবশ্য সে আসরে সামনে বসিবার অধিকার আছে। কিন্তু এরা

কি তাই চায ? সেই জন্যই কি এরা সকলে জড়ো হইয়াছে ? বাঁচিবার অধিকার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে এদের সে যে সব কথা বলিয়াছে, এ কি তারই প্রতিক্রিয়া ?

এই প্রশ্ন বিভূতিকে পীড়ন করিতে থাকে। তার বক্তৃতা আর উপদেশ এতগুলি মানুষের মধ্যে সাড়া জাগাইয়াছে এ কথা বিশ্বাস করিতে ভালো লাগে কিন্তু নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। গ্রামের সঙ্গে গ্রামের প্রতিযোগিতা থাকে, মনোমালিন্য থাকে—এক গ্রাম অন্য গ্রামকে অনায়াসে হিংসা করে। কে জানে এরা নন্দনপুরের অধিবাসীদের একটু জব্দ করিতে চলিয়াছে কি না ? শ্রীধর, রামলোচন আর অন্যান্য কয়েকজন ফতুয়াধারী হযতো নিজেদের কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই সব অশিক্ষিত সরল মানুষগুলিকে খ্যাপাইয়া দিয়াছে। যাত্রার আসরে হয়তো আজ একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়া যাইবে।

কিন্তু এখন আর পিছাইবার উপায নাই, মরিয়া গেলেও না। বিভূতি বারবার সকলকে আসল কথাটা বুঝাইয়া দেয়। গালাগালি হাতাহাতি চলিবে না। ধীর স্থির শান্তভাবে সকলে সামনের দিকে গিয়া জাঁকিয়া বসিয়া পড়িবে, কিছুতেই আর সেখান হইতে উঠিবে না।

একজন প্রশ্ন করে, ওরা যদি গাল দেয়, অপমান করে ? যদি মারে ? বিভূতি জবাব দেয়, তবু চুপ করে বসে থাকবে, কথাটি কইবে না। আমাদের ভদ্র ব্যবহারে ওরাই লজ্জা পাবে। ওরা যদি ছোটোলোকোমি করে আমরা কেন ছোটোলোক হতে যাব ?

বিভূতি ইচ্ছা করিযাই সকলকে সঙ্গে নিয়া যাত্রা আরম্ভ হওযার অনেক আগে আসরে গিযা হাজির হইল। মানুষ তখন জমা হইয়াছে অনেক তবে বসিবার স্থানও যথেষ্ট ছিল। সামনের বিশেষ স্থানগুলি রাখা হইয়াছিল বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের জন্য। সকলে দল বাঁধিয়া সেই স্থানগুলি দখল করিয়া বসিবার উপক্রম করিবামাত্র কয়েকজন ভলান্টিয়ার আসিয়া প্রতিবাদ করিল। বিভূতি যেখানে খুশি বসুক, বিভূতির দু-একজন বন্ধুবান্ধবও বসুক, কিন্তু সকলে বসিলে চলিবে কেন !

বিভূতি খুব অহিংসভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, কেন চলবে না ? এরা সকলেই আমার বন্ধু !

একজন ভলান্টিয়ার, বয়স তার আঠারো উনিশের বেশি হইবে না, একগাল হাসিয়া বলিল, আর আমরা বুঝি আপনার শত্রু ?

না, তা বলছি না—

একজন তিন-চারহাত তফাত হইতে বিভূতির মুখগহ্বরটিকে পিকদানি হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করিয়াছে। মুখ ভাসাইয়া পানের পিক বুকে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, বিভূতি মুছিবার চেষ্টাও করিল না। এক লাফে সামনে আগাইয়া গিযা এক হাতে অপরাধীর গলাটা টিপিয়া ধরিযা অন্য হাতে তাকে মারিতে লাগিল কিল চড় ঘুষি। আর একজন চট করিয়া বসিয়া পড়িয়া পিছন হইতে বিভূতির পা ধরিয়া মারিল এক হ্যাঁচকা টান, বিভূতি মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল।

একজন চিৎকার করিয়া উঠিল : মার শালাদের।

অনেকের মুখে প্রতিধ্বনি শোনা গেল : মার ! মার ! মার !

অধিকাংশ লোক যেন দাঙ্গার জন্যই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে এমন দাঙ্গা বাধিয়া গেল বলিবার নয়। কোথা হইতে যে এত লাঠি ইট পাটকেল আসিয়া জুটিল ! কয়েকটা মাথা ফাটিয়া গেল, অন্যভাবে আহত হইল অনেকে। হইহই রইরই হল্লা, ছুটাছুটি, মারামারি—এক গ্রামের লোক যেভাবে পারিতেছে অন্য গ্রামের লোককে আঘাত করিতেছে। নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, ভালো করিয়া দল বাঁধিয়া দাঙ্গা করিবার মতো কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত কারও নাই। একজন হয়তো পেছন হইতে অন্য একজনের মাথায় লাঠি মারিবার আয়োজন করিয়াছে এমন সময় তৃতীয় এক ব্যক্তি লোহার একটা মুখ-সরু শিক তার পিঠের মধ্যে ঢুকাইয়া দিল। এ ধরনের অস্ত্রও কেউ কেউ দু-একটা সঙ্গে

আনিয়াছিল। কেবল আজ নয়, আগের দুদিনও আনিয়াছিল। মারামারিটা যে আজ হঠাৎ লাগে নাই, এ তার একটা মস্ত বড়ো প্রমাণ।

শেষ পর্যন্ত বিভূতির স্থাপিত ব্যায়াম সমিতিগুলির সদস্যেরা আসিয়া সেদিনকার মতো সেখানকার হাঙ্গামাটা থামাইয়া দিল। মারামারিটা হইতেছিল এক গ্রামের লোকের সঙ্গে আর এক গ্রামের লোকের এবং বিভূতি ব্যায়াম সমিতি স্থাপন করিয়াছিল এক এক গ্রামে একটা করিয়া। কিন্তু এমনই আশ্চর্য ব্যাপার, মারামারিটা বন্ধ করিল ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ব্যায়াম সমিতিগুলির সদস্যেরা একসঙ্গে মিলিয়া। অধিকাংশই মাথা-গরম যুবক কিন্তু তাদের মধ্যে এমন ঘোরতর মিল দেখা গেল ঠান্ডামাথা বুড়োদের মধ্যে যা সম্ভব হয় না।

আহত বিভূতিকে তারা গোরুর গাড়িতে বাড়ি পাঠাইয়া দিল। বিভূতির আঘাত বিশেষ গুরুতর নয়, অন্তত দেহের আঘাত নয়। অন্যান্য যারা আহত হইয়াছিল তাদের কয়েকজনকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হইল কিন্তু অধিকাংশ আহত মানুষ যে কোথায় উধাও হইয়া গেল তার আর কোনো পাত্তাই মিলিল না।

মারামারি কিন্তু সেইখানে শেষ হইল না।

এক গ্রামের কয়েকজন অন্য গ্রামের একজনকে একা পাইলে ধরিয়া পিটাইয়া দিতে লাগিল। মারামারির পরদিন সকালে নন্দনপুরে গিয়া মহেশ চৌধুরি মার খাইয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। মাথাটা তার ফাটিয়া গেল এবং দাঁত ভাঙিয়া গেল কয়েকটা।

বিভূতি আহত অবস্থায় বাড়ি ফিরিলে মহেশ চৌধুরি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি গিয়ে দাঙ্গা করে এসেছ ?

বিভূতি বলিয়াছিল, না। যাতে দাঙ্গা না বাধে তার চেষ্টা করেছিলাম। কথাটা মহেশ বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু তখনকার মতো কিছু আর বলেও নাই। পরদিন সকাল হইতে না হইতে আসল ব্যাপারটা জানিবার জন্য নিজে ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু খোঁজখবর নেওয়ার সুযোগটাও সে পায় নাই। তাকে দেখিয়াই নন্দনপুরের জনপাঁচেক বদমেজাজি মানুষ বলিয়াছিল ; বিভূতির বাপ-ব্যাটা এসেছে রে !

বলিয়াই তাকে পিটাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

অনেক বেলায় খবর পাইয়া বিভূতি তাকে আনিতে গেল। বাপের অবস্থা দেখিয়া মুখ তার অন্ধকার হইয়া গেল। যাদের সে যাচিয়া আগের দিন যাত্রার আসরে সঙ্গে নিয়া গিয়াছিল, মারামারির জন্য তাদের উপরেও তার বিরক্তির এতক্ষণ সীমা ছিল না। এ রকম একটা কুৎসিত কাণ্ড ঘটার জন্য মনে মনে তার বড়োই খারাপ লাগিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, এই রকম বর্বর যদি তার দেশের মানুষ হয় আর এই রকম কারণে অকারণে পরস্পরকে হিংসা করে আর পরস্পরের সঙ্গে কলহ বাধায়, দেশের তবে হইবে কী ? আজ আহত বাপকে দেখিয়া সর্বাগ্রে তার মনে হইল, যারা তার বাপকে এ ভাবে মারিয়াছে, তাদের কিছু উত্তম মধ্যম না দিলে জীবনধারণ করাই বৃথা।

কিন্তু কে যে মহেশ চৌধুরিকে মারিয়াছে, কেউ তা জানে না। অত সকালে আটচালার দিকে বড়ো কেউ যায় নাই। একটু বেলায় মহেশকে রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া গ্রামে একটা গোলমাল বাধিয়া যায়। তখন নন্দনপুর ব্যায়াম সমিতির সদস্যেরা তাকে সযত্নে তুলিয়া আনিয়া সেবাযত্নের ব্যবস্থা করিয়াছে।

ডাক্তার দেখাইয়া পালকিতে করিয়া মহেশকে বাড়ি নিয়া যাওয়া হইল। সারাদিন সারারাত বিভূতি মহেশের শিয়রে বসিয়া রহিল, বিভূতির মা বসিয়া রহিল পায়ের কাছে। মাধবীলতাও ওই রকমভাবেই রাতটা কাটাইবার আয়োজন করিয়াছিল, বিভূতির জন্য পারিয়া উঠিল না। মাঝরাত্রে বিভূতি তাকে এমন একটা অপমানজনক ধমক দিয়া ন্যাকামি করিতে বারণ করিয়া দিল যে কাঁদিয়া ফেলিয়া মাধবীলতা উঠিয়া গেল।

মহেশ চৌধুরির জ্ঞান ফিরিল পরদিন সকালে।

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটা একটু কাটিয়া আসিলে বিভূতি মৃদুস্বরে তাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমায় কে মেরেছে বাবা ?

মহেশ চৌধুরি বলিল, একজনে কী মেরেছে—চার-পাঁচজনে।

কেন মারল ?

তোমার জন্যে। পাপ করলে তুমি, তোমার বাপ বলে আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম।

উত্তেজিত হওয়ার ফলে হঠাৎ ব্যথায় মহেশ একটু কাতর হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ সকলে চুপচাপ।

তুমি আমার বাবা বলে তোমায় মারল ? কে কে মারল ?

মহেশ চৌধুরি চোখ বুজিয়া বলিতে লাগিল, ওরা সবাই ভালো লোক, অকারণে কখনও মারত না। যোগেন, দীনু, কালীপদ, রমানাথ আর নগেনের সেজোমামা ছিল,—কী যেন নাম লোকটার ? আমি তো ওদের কোনোদিন ক্ষতি করিনি, মিছিমিছি কেন ওরা আমায় দেখামাত্র পিটাতে আরম্ভ করবে ?

নড়িতে গিয়া মৃদু একটা আর্তনাদ করিয়া মহেশ চৌধুরি চুপ করিয়া গেল।

বিভূতি দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, আমি যদি ওদের তোমার মতো অবস্থা না করি, তোমার ব্যাটা নই আমি।

কাতরাইতে কাতরাইতে চোখ মেলিয়া মহেশ চৌধুরি বলিল, তুমি যদি আবার ওদের পিছনে লাগতে যাও, তোমায় আমি জন্মের মতো ত্যাগ করব বলে রাখছি।

তা তুমি ত্যাগ কোরো। তাই বলে ঘাড় গুঁজে এ অন্যায় সহ্য করা—

কীসের অন্যায় ? যদি করেই থাকে অন্যায়, তোর কী ? মেরেছে আমাকে তোমাকে তো মারেনি, তোমার মাথা ঘামাবার দরকার ?

বাঃ, বেশ ! বলিয়া বিভূতি খানিকটা হতভম্বের মতোই বসিয়া রহিল। মহেশ চৌধুরি বলিতে লাগিল, তুমি ওদের পেছনে লাগবে, বদনাম রটবে আমার। সবাই বলবে আমি তোমায় দিয়ে ওদের মারিয়েছি।

বিভূতি বলিল, তুমি এমন কাপুরুষ !

কাপুরুষ ?

নয় তো কী ? লোকে নিন্দে করবে ভয়ে মুখ বুজে এত বড়ো অন্যায় সহ্য করে যাবে ! লোকের নিন্দা-প্রশংসা দিয়ে তোমার নীতি ঠিক হয়, আর কিছু নেই তার পেছনে !

বিভূতির মা ব্যাকুলভাবে বলিল, চুপ কর না বিভূতি ? কী যে তোরা আরম্ভ করেছিস !

বিভূতি কথাটা গ্রাহ্য করিল না, চুপচাপ একটু ভাবিয়া বলিল, নিন্দা-প্রশংসা তো আমারও আছে। আমার বাপকে ধরে পিটিয়ে দিল, আমি যদি চুপ করে থাকি, লোকে আমায় অপদার্থ বলবে। ভীরু কাপুরুষ বলবে।

মহেশ সভয়ে বলিল, কী করবি তুই ?

বিভূতি বলিল, ওদের বুঝিয়ে দেব, মারতে কেবল ওরা একাই জানে না।

তাতে লাভ কী হবে ?

ভবিষ্যতে আর এ রকম করবে না।

আরও বেশি করে করবে। তার চেয়ে সেরে উঠে আমি যদি গিয়ে হাসিমুখে এদের সঙ্গে কথা বলি, ভাই বলে জড়িয়ে ধরি, ওরা কীরকম লজ্জা পাবে বল তো ?

ছাই পাবে। ভাববে, আবার মার খাবার ভয়ে খাতির করছ।

মহেশ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আর তার তর্ক করার ক্ষমতা ছিল না। তখনকার মতো সে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু বিভূতি উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই আবার তাকে ডাকিয়া বসাইয়া বুঝাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিল। রাগ করিয়া, মিষ্টি কথা বলিয়া, মিনতি করিয়া, কতভাবেই যে সে বিভূতিকে নিবৃত্ত কবার চেষ্টা করিল। যতই সে কথা বলিতে লাগিল বিভূতির কাছে ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল তার ভয়ের পরিচয়---মার খাইয়া মহেশ চৌধুরি মার ফিরাইয়া দিয়াছে মানুষের কাছে এই রকম অসভ্য বর্বররূপে পরিগণিত হওয়ার ভয় ! মহেশ চৌধুরিকে এমন দুর্বল বিভূতি আর কখনও দেখে নাই। শেষে বিরক্ত হইয়া সে বলিল, আচ্ছা সে দেখা যাবে। বলিয়া ঘব ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল। হাতাহাতি মারামারি সে নিজেও কোনোদিন পছন্দ করে না, ও সমস্ত সত্যই নীচতা। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই কি তাই ? মহেশ চৌধুরি কোনো অপরাধ করে নাই, কেবল তাব বাবা বলিয়া তাকে যারা মারিয়াছে, উদারভাবে তাদের ক্ষমা করাটা কি উচিত ? তাকে কি উদারতা বলে ? তার চেয়ে ছোটোলোকেব মতো ওদের ধরিয়া কিছু উত্তম-মধ্যম লাগাইয়া দেওয়াই কি মহত্ত্বের পরিচয় নয়, মনুষ্যত্বের প্রমাণ নয় ? ভাবিতে ভাবিতে বিভূতি বুঝিতে পারিল, মাধবীলতা ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গতরাত্রে মাধবীলতাকে বিশ্রী ধমক দিয়া কাঁদানোর কথাটা মনে পড়ায়, ভাব করাব উদ্দেশ্যে হঠাৎ সে মাধবীলতাব কাছে পরামর্শ চাহিয়া বসিল।

মাধবীলতা চোখ বড়ো বড়ো করিয়া বলিল, ওদেব মেরে ফেলা উচিত, খুন করে ফেলা উচিত।

বিভূতি হাসিয়া বলিল, সত্যি ? কিন্তু ওরা যদি আমায় মেরে ফেলে ?

বিভূতি হাত বাড়াইয়া দিতে মাধবীলতা তার বুকেব মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এতক্ষণ যেন অধীর আগ্রহে সে এই জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। বিকারের সঙ্গে ভালোবাসার তীব্রতা বাড়িয়া গিয়াছে। বিকার ছাড়া স্বাভাবিক মায়া-মমতা জোরালো হয় না। একরাত্রিব অভিমান সংক্ষুব্ধ বিবহ মাধবীলতাকে অধীর করিয়া দিয়াছে।

হাঙ্গামার ফলে নন্দনপুরে যাত্রা আব কীর্তন বন্ধ হইয়া গেল, সেই যাত্রা আব কীর্তন প্রভৃতির ব্যবস্থা কবা হইল আশ্রমে। বুদ্ধিটা মাথায় আসিল কয়েকটি গ্রামেব মাতব্বরদের। তাবা ভাবিয়া দেখিল, আশ্রমে সব গ্রামের লোকের সমান অধিকার, সেখানে বিশেষ সুবিধাও কেউ দাবি কবিতে পারিবে না, বদমাইশি কবিয়া গোলমাল সৃষ্টি করাব সাহসও কারও হইবে না। যেদিন সকালে মহেশ চৌধুরিব জ্ঞান ফিরিয়া আসিল সেইদিন দুপুরে আরম্ভ হইল শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা কীর্তন। রাত্রি আটটা-নটার সময় যাত্রাভিনয় আরম্ভ হইবে এবং সমস্ত রাত চলিবে।

বিভূতি যখন দল বাঁধিয়া বাপেব প্রহারকারীদের খোঁজে বাহিব হইল, তখন পুরা দমে কীর্তন চলিতেছে। বাছা বাছা কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে করিয়া পাঁচটি অপরাধীর খোঁজ করিতে গিয়া বিভূতি শুনিল, তারা সকলে কীর্তন শুনিতে গিয়াছে। বিভূতি তখন সোজা আশ্রমে চলিয়া গেল।

আসর লোকে ভরিয়া গিযাছে। কীর্তনেব দলটি নামকরা, প্রধান কীর্তনিয়ার গলাটি মধুর আর আবেগ-রোমাঞ্চকব---শ্রীকৃষ্ণ কেন জন্মিবেন, যুগে যুগে তপস্যা করিয়া যোগী-ঋষিরা যার হদিস পায় না তিনি কেন নিজে মানুষের মধ্যে মানুষের রূপ ধরিয়া আসিবেন এই কথাটা সুর করিয়া বুঝাইয়া বলিতে বলিতেই সে সকলকে একেবারে মাতাইয়া দিয়াছে, গদগদ করিয়া তুলিয়াছে। কয়েকজনের চোখে জলও দেখা দিয়াছে।

সদানন্দের কিছু তফাতে অপরাধী পাঁচজন বসিয়াছিল। মনে তাদের একটু ভয় ঢুকিয়াছে, মহেশ চৌধুরি যদি মরিয়া যায়! কাছাকাছিই বসিয়া চুপিচুপি ইঙ্গিতে তারা এ বিষয়ে প্রথমে একটু

আলাপ করিয়াছিল, তারপর চুপ করিয়া কীর্তন শুনিতেছে। দলবলসহ আসিয়া বিভূতি যখন আসরের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তাদেব খোঁজেই চাবিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন কবিতেছে, তার উপর পাঁচজনেরই নজর পড়িল।

পাঁচজনকে দেখিয়া বিভূতি সঙ্গীদের বলিল, ওই যে ওরা।

সঙ্গীদের একজন একটু দ্বিধাভরে বলিল, এত লোকের মাঝখান থেকে টেনে আনা কি উচিত হবে ?

বিভূতি বলিল, প্রথমে ডাকব, যদি আসে ভালোই। না এলে ঘাড় ধরে টেনে আনতেই হবে। শাস্তিটা সকলের সামনেই দিতে হবে।

ইতিমধ্যে সদানন্দ বিভূতিকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিয়াছে—মহেশের খবর জানিবে। বিভূতিকে আশ্রমে দেখিয়া সদানন্দ সত্যই খুশি হইয়াছিল। বিভূতি মুখ তুলিয়া তার দিকে চাইতে সে একটু হাসিল। বিভূতি হাসিল না, হাসিবার মতো মনেব অবস্থা তার তখন নয়, শুধু মাথা একটু কাত করিয়া হাসির জবাব দিল।

লোকটিকে বলিল, বলো গে, একটু কাজ সেরে আসছি।

পূর্ণেন্দু নামে একটি যুবককে বিভূতি অপরাধী পাঁচজনের কাছে পাঠাইয়া দিল। পূর্ণেন্দু গিয়া বলিল, মহেশবাবুর ছেলে বিভূতিবাবু আপনাদের একটু বাইরে ডাকছেন—বিশেষ দরকার।

যোগেন ভড়কাইয়া গিয়া বলিল, আমাদের ডাকছে ? কেন ডাকছে।

দরকার আছে, আসুন।

আমাদের ডাকছে ? আমাদের কাদের ?

পূর্ণেন্দু একে একে আঙুল দিয়া পাঁচজনকে দেখাইয়া দিল, আপনাকে—আপনাকে—আপনাকে—আপনাকে—আপনাকে।

পাঁচজনেই ভড়কাইয়া গেল। আসব ছাড়িয়া কি যাওয়া যায় ? দরকার থাকিলে বিভূতি আসুক না ?

চৌধুরি মশায় কেমন আছে জানো ?

পূর্ণেন্দু বলিল, ভালো নয়।

শুনিয়া পাঁচজনে আরও ভড়কাইয়া গেল। এবং আরও স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিল যে কীর্তন যখন চলিতেছে আসর ছাড়িয়া যাওয়া কোনোমতেই সঙ্গত হইবে না। আশেপাশের দু-একজন এতক্ষণে গোলমালের জন্য অসহিষ্ণু হইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পূর্ণেন্দু উঠিয়া গেল।

তারপর ঘটিল অতি খাপছাড়া নাটকীয় ব্যাপার। লোকজনকে ঠেলিয়া সরাইয়া বিভূতি আর তার সঙ্গীরা অপবাধী পাঁচজনের কাছে আগাইয়া গেল। চার-পাঁচজনে মিলিয়া এক একজনকে ধরিয়া হ্যাঁচকা টান মারিয়া দাঁড় কবাইয়া দিল। পাঁচজনের মুখ তখন পাংশু হইয়া গিয়াছে। কীর্তন বন্ধ হইয়া গেল, সকলে অবাক হইয়া ব্যাপার দেখিতে লাগিল।

বিভূতি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সকলকে সম্বোধন করিযা বলিল, এই পাঁচটি গুন্ডা মিলে কাল সকালে আমার বাপকে বিনা দোষে মেরে প্রায খুন করে ফেলেছে। আজ সকাল পর্যন্ত বাবা অজ্ঞান হয়েছিলেন। আপনাদের সকলের সামনে আমি এদের শাস্তির বিধান করছি, চেয়ে দেখুন। বলিয়া একদিন সদানন্দের মুখে যে রকম ঘুষি লাগাইয়াছিল কালীপদর মুখে সেইরকম একটা ঘুষি বসাইয়া দিল। তারপর সকলে মিলিয়া পাঁচজনকে মারিতে আরম্ভ করিল। আরম্ভ করিল বটে কিন্তু মারটা তেমন জমিল না। ভয়ে যারা আধমরা হইয়া গিয়াছে, চোখ বুজিয়া গোঁঙাইতে আরম্ভ করিয়াছে, হাত তুলিয়া একটা আঘাত ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা পর্যন্ত যাদের নাই, একতরফা তাদের কাঁহাতক পিটানো

যায় ? এমনি মারিতে হাত উঠিতেছে না দেখিয়া বিভূতি একজনের একটা ছড়ি কুড়াইয়া নিল, তারপর সেই ছড়ি দিয়া পাঁচজনকে মারিতে আরম্ভ করিল।

এতক্ষণে চারিদিকে হইচই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মারের ভয়ে আশেপাশের সকলে তফাতে সরিয়া গিয়াছে এবং সেখানে নিরাপদে দাঁড়াইয়া চিল্লাইতেছে। সদানন্দই বোধ হয় সকলের আগে তাদের কাছে আগাইয়া আসিল। সদানন্দকে আগাইতে দেখিয়া তখন অগ্রসর হইল আশ্রমের অধিবাসীরা।

সদানন্দ বিভূতিকে ধরায় বিভূতি তাকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিল। তখন সকলের দিকে চাহিয়া বজ্রকণ্ঠে সদানন্দ বলিতে লাগিল, আমার আশ্রমে এসে একজন গুন্ডা গুন্ডামি করছে, আমায় অপমান করছে, তোমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে তাই দেখছ ? আমাকে মারল, এ অপমান তোমাদের সহ্য হচ্ছে ? আমার যদি একজন ভক্ত এখানে থাকে—

উত্তেজনা অনেকের মধ্যেই সঞ্চারিত হইয়াছিল, তার উপর সদানন্দের অনুপ্রেরণা। একটা গর্জনের মতো আওয়াজ উঠিয়া এলোমেলো গোলমালটা একেবারে ঢাকিয়া দিল। শ-চারেক লোক আগাইয়া গেল বিভূতি আর তার সঙ্গীদের দিকে। বিভূতিরা দলে যে বিশেষ ভারী নয় সেটা টের পাইয়া সকলের মধ্যেই অনেকটা সাহসের সঞ্চার হইয়াছিল। বাকি পাঁচশো-ছশো লোকের মধ্যে তিন-চারশো স্ত্রীলোক আর্তনাদ করিতে লাগিল, বাকি সকলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল মজা।

মাঝে মাঝে শোনা যাইতে লাগিল : মার শালাদের। এই মহামন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া বাঙালি দাঙ্গাহাঙ্গামা মারামারি আরম্ভ করিতে পারে না।

জনতা যখন আক্রমণ করে তখন দেরি হয় শুধু আরম্ভ করিতে, একজন যতক্ষণ আসল ব্যাপারটা হাতেনাতে শুরু করিয়া না দেয় ততক্ষণ চলিতে থাকে শুধু হইচই আস্ফালন। তবে এ রকম অবস্থায় আরম্ভ হইতেও যে খুব বেশি দেরি হয় তা নয়, দু-এক মিনিটের মধ্যেই কারও না কারও উত্তেজনা চরমে উঠিয়া যায়। ব্যাপার যে কী রকম গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে বিভূতি আর তার সঙ্গীরা ভালো করিয়াই টের পাইয়াছিল। সকলে মিলিয়া আরম্ভ করিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাদের ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এখন আর উপায় কী ? পালানোর চেষ্টা করিলে কয়েকজন বাঁচিয়া যাইতে পারে, কিন্তু পালানোর চেষ্টা তো আর করা চলে না। তার চেয়ে উন্মত্ত জনতার হাতে মরাই ভালো।

পালানোর চেষ্টা করা চলে না কেন ? বিভূতির ভক্তেরা সকলে কী মনে করিবে ! মানুষের নিন্দা-প্রশংসা সম্বন্ধে মহেশ চৌধুরির দুর্বলতা দেখিয়া সেদিন সকালে বিভূতির লজ্জা আর দুঃখ হইয়াছিল, এখন সে চোখের পলকে বুঝিতে পারে, অনুগত যুবক সমাজের নিন্দা-প্রশংসার ভাবনাই তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে আড়ষ্ট করিয়া দিয়াছে। যাদের এত বড়ো বড়ো কথা শুনাইয়াছে, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বুক ফুলাইয়া যাদের সঙ্গে করিয়া এখানে নিয়া আসিয়াছে, এখন বিপদ দেখিয়া তাদের ফেলিয়া পালানোর কথা ভাবিতেই হাত-পা অবশ হইয়া আসিতেছে। অথচ এ ভাবে মরণকে বরণ করা নিছক বোকামি। রেল লাইনে ট্রেনের সামনে দাঁড়াইয়া সাহস দেখানোর মতো।

সদানন্দও নিমেষের মধ্যে ব্যাপারটা অনুমান করিতে পারিয়াছিল। দু-হাত মেলিয়া বিভূতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া সকলকে ঠেকানোর কল্পনাটা মনের মধ্যে আসিয়াই অন্য একটা কল্পনার তলে মিলাইয়া গেল। চোখের সামনে এমন একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটিতে যাইতেছে, অথচ এই অবস্থাতেও সদানন্দের মনে পড়িয়া গেল যে জগতে মাধবীলতার একজন মাত্র মালিক আছে, তার নাম বিভূতি। বিভূতির যদি কিছু হয়, মাধবীলতার তবে কেউ কর্তা থাকিবে না। চিন্তাটা মনে আসিতে সদানন্দ একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় ঘটিল আরেকটা কাণ্ড। হাতে আর মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা মহেশ চৌধুরি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পাগলের মতো আসিয়া হাজির হইল। খানিকটা তফাত হইতেই সে প্রাণপণে চেঁচাইতে লাগিল, ওরে, রাখ, রাখ। ওরে বিভূতি, রাখ।

সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল। কতকটা বিস্ময়ে, কতকটা কৌতূহলে, কতকটা সহানুভূতিতে। বিভূতি প্রথমে সকলকে শুনাইয়া যা বলিয়াছিল, মহেশ চৌধুরিকে দেখিয়া সেই কথাগুলি মনে পড়িয়া গিয়াছে।

উনিশ

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপর আবার মারামারি আরম্ভ হইয়া গেল। এবার আরও জোরে। আসরে মহেশ চৌধুরিরও অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিল, তাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, মহেশ চৌধুবি আর্তনাদের সুরে বিভূতিকে হাঙ্গামা থামাইতে অনুরোধ করে নাই, বিভূতিকে রক্ষা করার জন্য তার অনুগতদের কাছে আবেদন জানাইয়াছে। বাপের আর্তনাদ বিভূতির কানে পৌঁছায় নাই। গোলমালের জন্য নয়, সে তখন প্রায় সদানন্দের পায়ের কাছেই উদ্ভট ভঙ্গিতে পড়িয়া আছে, বাঁ হাতটা কবজি ছাড়াও আরেক জায়গায় ভাঁজ হইয়া শরীরের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে আর ডান হাতটা টান হইয়া নিবেদনের ভঙ্গিতে আগাইয়া গিয়াছে সদানন্দের পায়ের দিকে। শরীরটা রক্তমাখা, তবে কোনো কোনো অঙ্গের নড়নচড়ন দেখিয়া বুঝা যায় তখনও মরে নাই। আরও অনেকে জখম হইয়াছে, সকলে তারা বিভূতিব সঙ্গীও নয়, সদানন্দের মান রক্ষার জন্য তার যে সব উৎসাহী ভক্তেরা আগাইয়া আসিয়াছিল তাদের মধ্যেও কয়েকজন অন্য উৎসাহী ভক্তের হাতে মার খাইয়াছে। মারামারির সময় হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায় তাকেই দু-ঘা দিতে এমন হাত নিশপিশ করে !

শুধু হাতের মার নয়, গ্রামের লোকের পথ চলিতে লাঠিব বড়ো দরকার হয়।

মারামারির দ্বিতীয় খণ্ডটা পরিণত হইয়া গেল রীতিমতো দাঙ্গায়, কেউ ঠেকাইতে পারিল না। অনেকে আগেই পালাইতে আরম্ভ কবিযাছিল, ব্যাপার এতদূর গড়াইবে না আশায় বুক বাঁধিয়া যারা অপেক্ষা করিতেছিল, এবার তাবাও ছিটকাইযা সবিযা গেল। কেউ সটান পা বাড়াইয়া দিল বাড়ির দিকে, কেউ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল মজা। কেউ মাটির ঢেলা ইট পাটকেল, হাতের কাছে যা পাইল, দূর হইতে তাই ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল যুদ্ধক্ষেত্রে—একটু আগেও যেটা ছিল শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা কীর্তনের আসর। খানিক তফাতে একটা চ্যালাকাঠের স্তূপ ছিল, আট-দশজন লোক হঠাৎ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া দু-হাতে চ্যালাকাঠ ছুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল—ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে নয়, একপাশে সেখানে তখনও সমবেত স্ত্রীলোকদের অর্ধেকের বেশি নিরুপায় আতঙ্কে কিচিরমিচির সুরে আর্তনাদ করিতেছে। কোনো অল্পবয়সি স্ত্রীলোক পুরুষ সঙ্গীর খোঁজে বিফল দৃষ্টিতে চারিদিকে প্রাণপণে চিৎকার করিতেছে বাবাগো মাগো বলিয়া আর কোনো বয়স্কা স্ত্রীলোক বসিয়া বসিয়াই মধুসূদনকে ডাকিতেছে। মেয়েদের অবস্থাই সবচেয়ে সঙ্গীন। আসরের চারিদিকে রাত্রি আর নির্জনতা, পালানোর উপায় নাই। কয়েকজন অবশ্য দাঙ্গার সূচনাতেই উন্মাদিনীর মতো যেদিকে পারে ছুটিয়া পালাইয়াছে, সকলে সে রকম উদ্‌ভ্রান্ত সাহস কোথায় পাইবে ? পুরুষ অভিভাবকরা আসিয়া অনেককে উদ্ধার করিয়া নিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন উদ্ধারের কাজটাও হইয়া দাঁড়াইয়াছে আরও কঠিন। নিজেদের সংকীর্ণ সীমানাটুকুর মধ্যে অনেকে ভয়েব তাড়নায় কয়েকটি পলাতকা উন্মাদিনীর মতোই দিশেহারা হইয়া এদিক ওদিক আরম্ভ করায় নিজেরাই হারাইয়া গিয়াছে। তারপর আছে ছোটো ছেলেমেয়ে। তারপর আছে ধাক্কা দেওয়ার, গা মাড়াইয়া দেওয়ার বচসা আর গালাগালি। যে দু-একজন অভিভারক লজ্জা ভয় ভদ্রতা ছাড়িয়া একেবারে মেয়েদের মধ্যে আসিয়া খোঁজ করিতেছে, খোঁজ পাইয়া, দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, কাছে আনাইয়া সঙ্গে করিয়া পালাইতে তারও সময় লাগিতেছে অনেকটা।

এই অবস্থায় চ্যালাকাঠগুলি আসিয়া পড়িতে লাগিল তাদের গায়ে মাথায়।

কেউ থামানোর চেষ্টা না করিলেও দাঙ্গা আপনা হইতেই থামিয়া যায়। কোনোটা তাড়াতাড়ি থামে, কোনোটার জের চলে এখানে-সেখানে ছাড়া ছাড়া হাতাহাতিতে, পিছন হইতে মাথা ফাটানোয়। এ দাঙ্গাটা থামাইয়া দিল বিপিন। আশ্রমে একটা লুকানো বন্দুক ছিল। বন্দুকের লাইসেন্স ছিল, তবু বন্দুকটা লুকানোই থাকিত। ছুটিয়া গিয়া বন্দুকটা আনিতে বিপিনের সময় লাগিল মিনিট পাঁচেক আর খানিকটা তফাতে দাঁড়াইয়া কয়েকবার আওয়াজ করিতে সময় লাগিল দু-মিনিট। শেষ মিনিটের আওয়াজ দরকার ছিল না, এ ধরনের শখের দাঙ্গা থামাইতে একটা বন্দুকে এক মিনিটে যে কটা আওয়াজ করা যায় তাই যথেষ্ট।

দাঙ্গা থামার পরে হাঙ্গামার প্রথম বীভৎস আর বিশৃঙ্খল অবস্থাটাও শেষ হইয়া গেল অল্প সময়ের মধ্যেই। এ-রকম হাঙ্গামার ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলিতে সদানন্দের আশ্রমবাসী শিষ্য-শিষ্যাদের পটুতা দেখা গেল অসাধারণ। পরিচালনার ভারটা নিতে হইল বিপিনকে, সদানন্দের কিছু করার ক্ষমতা ছিল না, সেও মার খাইয়াছে। মেয়েদের শান্ত করিয়া অভিভাবকদের সঙ্গে মিলন ঘটাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল এবং আহতদের প্রাথমিক শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হইল।

আধঘণ্টা পরে দেখা গেল আসরে আছে শুধু আশ্রমের লোক, আহত আর নিহতদের আত্মীয়স্বজন, আর আছে গহনার শোকে কাতর কয়েকজন নরনারী। মধ্যে যারা চ্যালাকাঠ ছুঁড়িয়া মারিতেছিল দাঙ্গার শেষের দিকে হঠাৎ সে কাজটা বন্ধ করিয়া মেয়েদের ভিড়ে ঢুকিয়া কয়েকজনের গলার হার, কানের মাকড়ি, হাতের চুড়ি ছিনাইয়া নিয়া তারা সরিয়া পড়িয়াছিল। সকলে পালাইতে পারে নাই, একটা চ্যালাকাঠ কুড়াইয়া নিয়া রত্নাবলী দুজনের মাথা ফাটাইয়া দেওয়ায় তারা এখনও আহতদের সারির একপ্রান্তে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে।

আনকোরা নূতন আঘাতের রক্তমাখা চিহ্ন গায়ে নিয়া সদানন্দ আর পুরানো আঘাতের ব্যান্ডেজ বাঁধা চিহ্ন গায়ে নিয়া মহেশ চৌধুরি জড়ভরতের মতো এক রকম কাছাকাছিই বসিয়া আছে, বিভূতির গা ঘেঁষিয়া। দাঙ্গা শেষ হওয়ার একটু আগে অথবা সঙ্গে সঙ্গে অথবা একটু পরে বিভূতি মরিয়া গিয়াছে। এক মিনিট স্তব্ধতার আগের তিন মিনিট আর পরের সাত মিনিট, মোট দশ মিনিটের দাঙ্গায় মারা গিয়াছে চারজন। গুরুতর আঘাত পাইয়াছে সাতজন আর সাধারণভাবে আহত হইয়াছে সতেরো জন। আরও কয়েকজন আহত হইয়াছে সন্দেহ নাই, তবে তারা এখানে নাই, আগেই সরিয়া পড়িয়াছে। সদানন্দ আর মহেশ আহতদের প্রাথমিক সেবা-শুশ্রূষার পর প্রাথমিক চিকিৎসার আয়োজন চাহিয়া দেখিতে থাকে আর শুনিতে থাকে মরা ও আধমরা মানুষগুলিকে ঘিরিয়া বসিয়া মেয়েদেব ডুকরানো কান্না আর পুরুষদের হায় হায় আপশোশ। সদানন্দের মাথার মৃদু ঝিমঝিমানির মধ্যেও মনে হয়, এতগুলি গলার কান্না আর আপশোশের শব্দ থামা সত্ত্বেও আসরটা যেন বড়ো বেশি নিঃশব্দ হইয়া গিয়াছে—মানুষের ভিড়ে যখন গমগম করিতেছিল আর খোল-করতালের সঙ্গে কীর্তন চলিতেছিল তখনও আসরে যেন ঠিক এই রকম স্তব্ধতা নামিয়া আসিয়াছিল। মেয়েদের কান্না শুনিতে শুনিতে মহেশ চৌধুরির মনে হয় অন্য কথা—এই শোকের ছড়াছড়ির মধ্যে বিভূতি যেন অন্যায় রকম ফাঁকিতে পড়িয়া গিয়াছে, তার জন্য শোক করিবার কেউ নাই।

অন্যায়টা শেষ পর্যন্ত তার বোধ হয় সহ্য হইল না, তাই মাঝরাত্রি পার হইয়া যাওয়ার অনেক পরে বিপিনকে ডাকিয়া বলিল, বাড়িতে একটা খবর পাঠাতে পার বিপিন?

পাঠাচ্ছি—সকালে পাঠালে ভালো হত না? এত রাত্রে মেয়েদের—

না, এখুনি খবরটা পাঠিয়ে দাও। মেয়েরা এসে একটু কাঁদুক।

সদানন্দ এতক্ষণ বারবার শুশ্রূষা আর চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এবার বিপিন অনুরোধ করিতেই রাজি হইয়া গেল এবং একজন শিষ্যের গায়ে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিজের তিন

মহল আশ্রমের দিকে চলিয়া গেল। সঙ্গে গেল একজন শিষ্যা। মনে হইল, এতক্ষণ অন্য সব আহতদের মতো কেবল সাধারণ শুশ্রূষা আর চিকিৎসা পাওয়া যাইত বলিয়া সে গ্রহণ করে নাই, এবার বিশেষ ব্যবস্থা করা সম্ভব হওয়ায় সকলের চোখের আড়ালে সেটা উপভোগ করিতে যাইতেছে।

এদিকে কয়েক মিনিট কাটিতে না কাটিতে মহেশের মনে হইতে লাগিল, বাড়ির মেয়েদের আসিতে বড়ো বেশি দেরি হইতেছে। তাই, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া নিজেই হাউহাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। মনে হইল, সদানন্দের সামনে ছেলের জন্য কাঁদিতে এতক্ষণ তার যেন লজ্জা করিতেছিল, এবার সুযোগ পাওয়ায় প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বিভূতির মা, মাধবীলতা আর বাড়ির সকলে আসিল প্রায় শেষ রাত্রে। কিন্তু তেমনভাবে কেউ কাঁদিল না। মাধবীলতা একরকম হাঁ করিয়া বিভূতির দিকে চাহিয়া নিঃশব্দেই বাকি রাতটুকু কাবার করিয়া দিল। বিভূতির মা এত আস্তে কাঁদিতে লাগিল যে একটা কান ব্যান্ডেজে ঢাকা না থাকিলেও পাশে বসিয়া মহেশ চৌধুরি সব সময় তার কান্নার শব্দ শুনিতে পাইল না।

পুলিশ আসিল সকালে।

পুলিশের লোকের কাছে একটা খবর পাওয়া গেল, ইতিমধ্যেই তারা তিনজনকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিয়াছে। তবে দাঙ্গার সঙ্গে তাদেব সম্পর্ক ছিল না। আশ্রমের পশ্চিম সীমানায় আশ্রমের যে ছোটো ফুলের বাগানটি আছে সেখানে পাঁচজন লোক কাল রাত্রে একটি এগাবো বছরের মেয়েকে নিয়া একটু আমোদ করিয়াছিল। তিনজন ধরা পড়িয়াছে, দুজন পলাতক।

না মরেনি, বেঁচে উঠবে বলেই তো মনে হয় মেয়েটা। তবে কী জানেন বিপিনবাবু—

মহেশ চৌধুরি শুনিতেছিল, হঠাৎ তার মনে হইল দাঙ্গার চেয়ে এই মেয়েটির আলোচনাই সকলে যেন বেশি উপভোগ করিতেছে। দাঙ্গাহাঙ্গামা সামান্য ব্যাপার, জগতের কোথাও না কোথাও সর্বদাই যে কুবুক্ষেত্রীয় কাণ্ড চলিতেছে তাব তুলনায় দাঙ্গাহাঙ্গামার ক্ষুদ্রতা আর তুচ্ছতা শোচনীয়ভাবে লজ্জাকব। কিন্তু এগারো বছরেব একটি রক্তমাংসের বিন্দুতে তীব্র আর বীভৎস অস্বাভাবিকতার সিন্ধু খুঁজিয়া মেলে, বোমাঞ্চকর লজ্জা ভয় রাগ দ্বেষ ঘৃণা আর অবাধ্য আবেগে স্নায়ুগুলি টান হইয়া যায়, কানে ভাসিয়া আসে লক্ষ কোটি পশুর গর্জন।

মহেশ চৌধুরি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া এক চোখে চারিদিকে চাহিতে থাকে। আহতদের অনেক আগেই ভালো আশ্রয়ে সবানো হইয়াছে, পড়িয়া আছে কেবল তিনটি সাদা চাদর-ঢাকা দেহ। এত বয়সে এত কাণ্ডের পর এ রকম আবেষ্টনীতে এমন অসময়ে একটা জানা কথা নূতন করিয়া জানিয়া নিজেকে তার বড়ো অসহায় মনে হইতে থাকে। চাপা দিলে সত্যই রোগ সারে না, হিমালয় পাহাড়ের মতো বিরাট এক স্তূপ সুগন্ধি ফুলের নীচে চাপা দিলেও নয়।

[লেখকেব মন্তব্য : মহেশ চৌধুরির এই অস্পষ্ট আর অসমাপ্ত চিন্তাকে মহেশ চৌধুরির চিন্তার শক্তি ও ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া স্পষ্টতর করিয়া তুলিতে গেলে অনেক বাজে বকিতে হইবে, সময়ও নষ্ট হইবে অনেক। আলপিন ফুটাইয়া খাঁড়ার পরিচয় দেওয়ার চেয়ে মন্তব্যের এই ভোঁতা ছুরি বেশি কাজে লাগিবে মনে হয়।

মোট কথা, মহেশ চৌধুরির মনে হইয়াছে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অনেকদিন হইতে রোগে ভুগিতেছে। মাঝে মাঝে দু-একজন মহাপুরুষ এবং সব সময় অনেক ছোটোখাটো মহাপুরুষ এই রোগ সারানোর চেষ্টা করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন, কিন্তু সে চেষ্টায় বিশেষ কোনো ফল হয় নাই, এখনও হইতেছে না। কারণ, তাদের চেষ্টা শুধু ভালোর আড়ালে মন্দকে চাপা দেওয়ার, কেবল দুধ-ঘি খাওয়াইয়া রুগিকে স্বাস্থ্যবান করার।

মানুষের রোগের কারণ তারা জানে না, অর্থ বোঝে না, চিকিৎসার পথও খুঁজিয়া পায় না, তারা নিজেরাও রুগি। না হইয়া উপায় কী ? মানুষ হইতে যে মানুষের জন্ম, মানুষের কাছ হইতে

খুঁটিয়া খুঁটিয়া যার আত্মসংগ্রহ, মানুষের যা আছে তা ছাড়া মানুষের যা নাই তা সে কোথায় পাইবে ? উপাদানগুলি সেই এক, ভিন্ন ভিন্ন মানুষ শুধু নিজের মধ্যে ভিন্নভাবে আত্মচিন্তার খিচুড়ি রাঁধে।

তাই মানুষের রোগের চিকিৎসার উপায় কেউ খুঁজিয়া পায় না, পাওয়া সম্ভবও নয়। তাই মানুষকে সুস্থ করার সমস্ত চেষ্টা গরিবকে স্বপ্নে বড়োলোক করার চেষ্টার মতো দাঁড়াইয়া যাইতেছে ব্যর্থ পরিহাসে।

জগতের কোটি কোটি অন্ধকে অন্ধের পথ দেখানোর চেষ্টার করুণ দিকটা মহেশ চৌধুরিকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। হতাশায়, অবসাদে সমস্ত ভবিষ্যৎ তার অন্ধকার মনে হয়। কেউ খুঁজিয়া পাইবে না, মানুষের মুক্তির পথ কেউ পাইবে না।

মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করিয়া মানুষের নিজেকে জানিবার, নিজের আর বিশ্বের সমস্ত মানুষের মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাওয়ার, একটা উপায়ের কথা যে শাস্ত্রে লেখা আছে, মহেশ চৌধুরিও তা জানে, আমিও জানি। তবে, শুধু লেখা আছে এইটুকুই আমরা দুজনে জানি।।]

দাঙ্গাহাঙ্গামার জের চলিতে লাগিল, মহেশ চৌধুরিও বিষাদ ও অবসাদের ভারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। মানুষের মুক্তি নাই, মানুষের ভালো নাই, এ কথা ভাবিলেই তার মনে হয় পৃথিবীসুদ্ধ আত্মভোলা লোক ভালোমন্দে জড়ানো জীবন নিয়া মনের আনন্দে বাঁচিয়া আছে, সেই কেবল পশুর খাঁচায় আটক পড়িয়াছে। সকলে ভাবে পুত্রশোকে মহেশ কাতর, মহেশ ভাবে, পুত্রশোকে সে যদি সকলের মতো রীতিমতো কাতর হইতে পারিত ! একটিমাত্র ছেলে, তার শোকেও আত্মহারা হইতে পারিতেছে না, এ কী ভয়ানক অবস্থা তার ? শোক বাড়ানোর জন্যই মহেশ সর্বদা বিভূতির কথা ভাবিতে চেষ্টা করে, গৃহ কেমন শূন্য হইয়া গিয়াছে অনুভব করার চেষ্টা করে, বিভূতির স্মৃতিচিহ্নগুলি ঘাঁটাঘাঁটি করে, বারবার মাধবীলতার নূতন বেশের দিকে তাকায়।

কেবল শোক বাড়ানোর জন্য। অন্য কোনো কারণে নয়।

মহেশ চৌধুরির শোক দেখিয়া বাড়ির লোকেব বুক ফাটিয়া যায়। বিভূতির মা মাথা নাড়িয়া বলে, ও আর বাঁচবে না‌ন না বাঁচুক, আর বেঁচে কী হবে ? এব আগেই যেন আমি যেতে পারি, হে মা কালী, ওর আগেই যেন—তোর মতো বেশ যেন ধরতে না হয় রাক্ষুসি।

মাধবীলতার শোকটা তেমন জোরালো মনে হয় না। তাকে কেবল একটু বেশি রকম রুক্ষ দেখায়, তেল মাখিয়া স্নান না করার রুক্ষতা নয়, ভিতর হইতে রস শুকাইয়া যাইতে থাকিলে যেমন হয়।

অনেক ভাবিয়া একদিন সে মহেশ চৌধুবির সামনে জোড়াসন করিয়া বসে, আগে মাথাব ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া বলে, ওই লোকটাই খুন করেছে বাবা।

স্বামীজি ?

'ওই লোকটা' বলিতে মাধবীলতা যে কাকে বুঝাইতেছে অনুমান করিতে মহেশের দ্বিধা পর্যন্ত করিতে হয় না।

হ্যাঁ। তুমি জানলে কী করে, তুমি তো যাওনি।

লোকের কাছে শুনেছি। আপনিও তো জানেন ? ওই তো সকলকে খেপিয়ে দিল, সকলকে ডেকে খুন করতে বলল—

খুন করতে বলেননি, বলেছিলেন—

মাধবীলতা অসহিষ্ণু হইয়া যায়, তার মানেই তো তাই। এ লোকটা আমায় অপমান করছে, তোমরা চুপ করে সহ্য করবে—ও কথা বলে সকলকে খেপিয়ে দেওয়ার আর কী মানে হয় ? কী অপমান করছে সবাই তো দেখতে পাচ্ছিল, শুনতে পাচ্ছিল ? কেউ তখন আর মারতে উঠেনি কেন ? যেই সকলকে ডাকল তখনি সবাই এসে একজনকে মারতে আরম্ভ করল কেন ?

মহেশ চৌধুরি ধীরভাবে বলে, উনি হয়তো ওকে শুধু আসর থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য সবাইকে ডেকেছিলেন।

মাধবীলতা আরও ব্যাকুল হইয়া বলে, না না, আপনি বুঝতে পারছেন না। আশ্রমের লোকেরা তাড়াতে পারত না ?

দল নিয়ে গিয়েছিল যে ?

অগত্যা মাধবীলতাকে ধৈর্য ধরিতে হয়, শান্ত হইতে হয়। সব কথা বুঝাইয়া না বলিলে মহেশ চৌধুরি বুঝিতে পারিবে না। এমন ভালো মানুষ কেন যে সংসারে জন্মায়।

তা নয়, দলে আর কজন ছিল ? ওঁকে খুন করাই ও লোকটার উদ্দেশ্য ছিল। জেলে দেবার জন্যে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিল মনে নেই ? ওঁকে জেলে পাঠালে আমার পেছনে লাগার সুবিধে হত। জেলে পাঠাতে পারল না, তাই একেবারে মেরে ফেলল।

এবার মহেশ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে। একজন স্ত্রীলোককে পাওয়ার লোভে তার স্বামীকে হত্যা করা দুর্বোধ্য ব্যাপার নয়, তবু যেন মহেশ কিছুই বুঝিতে পারিল না। ও রকম হত্যাকাণ্ডগুলি অন্যভাবে হয়। বিভূতিকে সদানন্দ জানিত না। বিভূতি নিজে হইতে গিয়া হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়াছিল। এ রকম অবস্থায় সদানন্দের সম্বন্ধে এমন একটা ভয়ানক কথা অনুমান করা চলে কেমন করিয়া ?

মহেশের মুখ দেখিয়া মাধবীলতার শরীর রাগে রিরি করিতে থাকে। এমন অপদার্থ হাবাগোবা ভালো মানুষও পৃথিবীতে জন্মায় !

বুঝতে পারছেন না ? আমার বিয়ে হবার পর থেকে দিনরাত ভাবত ওঁকে কী করে সরানো যায়, সেদিন সুযোগ পাওয়া মাত্র—যেই বুঝতে পারল যে সবাইকে খেপিয়ে দিলেই সকলে মিলে ওঁকে মেরে ফেলবে অমনি সকলকে খেপিয়ে দিল।

তা বটে, সুযোগ পাওয়া মাত্র সুযোগের সদ্ব্যবহার করা সদানন্দের পক্ষে অসম্ভব নয়। তবু—। মাথা হেঁট করিয়া মহেশ চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবে আর মাধবীলতা ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া থাকে। এই সহজ কথাটা কেন যে মানুষ বুঝিতে পারে না। বিভূতিকে বাঁচাইতে দুহাত বাড়াইয়া আগাইবার উপক্রম করিতে গিয়া হঠাৎ যে চিন্তা মনে আসায় সদানন্দ পিছাইয়া গিয়াছিল, মাধবীলতা সেই চিন্তাকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া সদানন্দের জীবনের দিনে মাসে বৎসরে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। সদানন্দ এই কথাই সর্বদা চিন্তা করিত, কী করিয়া বিভূতিকে মারিয়া মাধবীলতাকে লাভ করা যায়। মাধবীলতাকে হারানোর পর মাধবীলতাকে পাওয়ার চিন্তা ছাড়া সদানন্দের কি অন্য চিন্তা থাকিতে পারে ?

কুড়ি

প্রথমটা একটু উত্তেজিত হইয়াছিল, তারপর কিন্তু মহেশ চৌধুরি অস্বাভাবিক রকম শান্ত হইয়া পড়িল। একেবারে শান্তির প্রতিমূর্তি। মুহূর্তের জন্যও তার মুখের চামড়া কুঁচকায় না, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত হয় না, কথায় আলো প্রকাশ পায় না। আরও বেশি আস্তে চলাফিরা করে, আরও বেশি ধীরতার সঙ্গে বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনগুলি নিখুঁতভাবে পালন করিয়া যায়।

মাধবীলতা দাঁতে দাঁত কামড়ায়।—আপনি কিছুই করবেন না?

করব।

কী করবেন ?

কী করব তাই ভাবছি মা।

মাধবীলতা রাগে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে থাকে।—আপনার কিছু করা উচিত কিনা তাও ভাবছেন বোধ হয় ?

মহেশ চৌধুরির স্পষ্ট, মৃদু ও একটানা আলাপ করার সুর বদলায় না। ভাবছি বইকী। সব কথা না ভেবে কি কিছু করতে আছে ? সব কথা ভাবছ না বলেই সদানন্দের দোষের কথা ভেবে তুমি অস্থির হয়ে পড়েছ।

আগে কোনোদিন মহেশ চৌধুরি সদানন্দকে সদানন্দ বলে নাই। সে অনায়াসে নামটা উচ্চারণ করিয়া গেল, খাপছাড়া শোনাইল মাধবীলতার কানে—সে নিজেই মহেশ চৌধুরিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে ও নামটা খুনির।

স্বামীজির দোষ আছে বলেই—

দোষ তো তোমারও থাকতে পারে মা ?

মাধবীলতা বড়ো দমিয়া গেল, মুখখানা হইয়া গেল ফ্যাকাশে। মহেশ চৌধুরি কেন তাকেও দোষী করিতেছে অনুমান করা কঠিন নয়। এ দিকটা আগে সে ভাবিয়া দ্যাখে নাই।

তুমি আগেও ভাবতে সদানন্দ তোমার জন্য এমন পাগল যে বিভূতিকে খুন পর্যন্ত করতে পারে। তাই এত সহজে সদানন্দকে দোষী ভেবে নিয়ে অস্থির হয়ে পড়েছ যে—একবার একটু সন্দেহও জাগেনি। তোমার কোনো দোষ না থাকলে এ সব কথা ভাবতে কেন ?

আমি—

তোমার কী দোষ তুমি জান না ? অতি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া মহেশ চৌধুরি যেন তার অক্ষমতাকে সমর্থনই করে, সেইখানে তো মুশকিল বাছা। নিজের দোষ যদি আমরা জানতে পারতাম তবে আর ভাবনা ছিল কী। আমি কি আমার দোষ জানি ?

মাধবীলতা বড়ো দমিয়া যায়। কী ভাবিতেছে মহেশ চৌধুরি ? কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। কী ধারণা জাগিয়াছে তার সম্বন্ধে তার মৃত স্বামীর পিতার মনে ? কী সন্দেহ করিয়াছে এই হাবাগোবা ভালোমানুষটি,—মাঝে মাঝে যাকে মারাত্মক রকমের চালাক মনে হয় ? তার ছেলের বউকে পাওয়ার লোভে সদানন্দ ইচ্ছা করিয়া তার ছেলেকে হত্যা করিয়াছে শুনিয়াও মহেশ চৌধুরির অবিচলিত ভাব দেখিয়া মাধবীলতার আর রাগ করিবার সাহস হয় না। তা ছাড়া, এতক্ষণে তার মনে হইতে থাকে যে মহেশ চৌধুরির করিবারই বা কী আছে, সে কী করিতে পারে ? প্রথমে মনে হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরি আসল ব্যাপারটা অনুমান করিতে পারিলেই বুঝি সদানন্দের শাস্তির আর সীমা থাকিবে না। এখন মাধবীলতা ভাবিয়া পায় না, এমন একটা বিশ্বাস তার কেন জাগিয়াছিল। প্রতিহিংসা নেওয়ার মানুষ মহেশ চৌধুরি নয়, সে ক্ষমতাও তার নাই।

দাঙ্গার ফলে আর কিছু না হোক আশ্রমের নাম আরও বেশি ছড়াইয়া গিয়াছে। কেবল কাছাকাছি গ্রাম আর শহরের মানুষের মধ্যেই ব্যাপারটা নিয়া হইচই হয় নাই, খবরের কাগজেও বিস্তারিত বিবরণ বাহির হইয়াছে। দাঙ্গার বিবরণ শুধু নয়, আশ্রম সম্পর্কেও অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছে। একটি কাগজে লেখা হইয়াছে : এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শ্রীশ্রী সদানন্দ স্বামী দীর্ঘকাল তপস্যার পর জনসেবাই সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া জানিয়া রোগশোকদারিদ্র্যনিপীড়িত নরনারীর কল্যাণের জন্য ইত্যাদি। সকল মহৎ কর্মের বিরোধিতা করাই এক শ্রেণির লোকের প্রকৃতি, এইরূপ একদল লোক অন্যভাবে আশ্রমের ক্ষতি করিতে অসমর্থ হইয়া আক্রোশের বশে আশ্রমের বাৎসরিক প্রতিষ্ঠা উৎসবের দিন গুন্ডা ভাড়া করা ইত্যাদি। এই বিবরণটি যে কাগজে বাহির হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরির বাড়িতে সেই কাগজটিই রাখা হয়। বাড়িতে খবরের কাগজটি আসামাত্র সকলের আগে মাধবীলতা সেটিকে দখল করে। দাঙ্গাহাঙ্গামার কোনো বিবরণ তার অজানা নয়, ব্যাপারটার জের কী দাঁড়াইতেছে তাও খবরের কাগজে বাহির হওয়ার কয়েকদিন আগেই তার কানে

আসে, তবু খবরের কাগজে সংক্ষিপ্ত আর ভুল বিবরণ পড়িবার জন্য সে ছটফট করিতে থাকে। সদানন্দ, তার আশ্রম ও দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্বন্ধে অভিনব টীকা পড়িয়াই কাগজটি হাতে করিয়া সে মহেশ চৌধুরির কাছে ছুটিয়া যায়।

দেখেছেন কী আরম্ভ করেছে ওরা ? পড়ে দেখুন।

মহেশ ধীরে ধীরে আগাগোড়া পড়িয়া বলে, সদানন্দের তপস্যা আর আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা সত্য, গুন্ডা ভাড়া করার কথাটা সত্য নয়।

মাধবীলতা বোমার মতো ফাটিয়া যায়, একটা কথাও সত্যি নয়। ও লোকটা কত খারাপ আপনি জানেন না, যে সব কাণ্ড চলে—

মহেশ বলে, জানি মা সব জানি। সদানন্দ অনেক সাধনা করেছে, তবে কী জান মা, সাধকেরও পতন হয়। সদানন্দ লোক ভালো। আশ্রমটাও বড়ো উদ্দেশ্য নিয়েই স্থাপন করা হয়েছিল, তবে ঠিক সে ভাবে কাজ হয়নি। মানুষের ভুলত্রুটি হয় কি না, বুঝবার দোষ হয় কি না নানারকম—

মাধবীলতা অবাক হইয়া শুনিয়া যায়। সদানন্দ লোক ভালো ? আশ্রমের উদ্দেশ্য মহৎ ? এত কাণ্ডের পর মহেশ চৌধুরিও যে এমন কথা বলিতে পারে, কানে শুনিয়াও মাধবীলতার যেন বিশ্বাস হইতে চায় না। হঠাৎ তার মনে হয়, লোকটি বোধ হয় পাগল। প্রত্যেক উন্মাদের মতো নিজের একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া সেখানে সে বাস করিতেছে আর বাস্তব জগতের অর্থ স্থির করিতেছে তার নিজের খাপছাড়া জগতের নিয়মে।

কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাধবীলতা অভিভূতের মতো বলে, সব ঠিক হয়ে যাবে ?

মহেশ চৌধুরি একদিন আশ্রমে গেল। বিপিনের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, বিভূতির দোষে এতগুলি লোক জেলে যাবে বিপিনবাবু ?

ওরাও তো মারামারি করেছিল।

তা করেছিল কিন্তু দোষ তো ওদের নয়। বিভূতি হাঙ্গামা না বাধালে কিছুই হত না।

বিপিন চুপ করিয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য তারও মনে হয়, লোকটা কি পাগল ? দাঙ্গা করার জন্য পুলিশ যাদের ধরিয়াছে, বিভূতিকে নিজের হাতে মারিয়াছিল এমন লোকও যাদের মধ্যে আছে, তারা শাস্তি পাইবে বলিয়া এই মানুষটার দুর্ভাবনা।

সেদিন সকালেই বিপিন আর সদানন্দের মধ্যে পরামর্শ হইয়াছিল, আদালতে প্রমাণ করিতে হইবে দাঙ্গাহাঙ্গামার দায়িত্বটা ছিল বিভূতির। কিছুদিন আগে একটি আশ্রম স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে মহেশ চৌধুরি সদানন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া তার বাড়িতে নিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোনো ভালো উদ্দেশ্যের পরিবর্তে বড়ো আশ্রমটির ক্ষতি করিবার জন্য একটি বিরোধী আশ্রম স্থাপন করাই মহেশ চৌধুরির আসল উদ্দেশ্য ইহা টের পাইয়া সদানন্দ চলিয়া আসিয়াছিল। বাপের অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিভূতি এই হাঙ্গামা বাধায়। মহেশ চৌধুরিকেও দাঙ্গাহাঙ্গামার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া কিছুদিনের জন্য জেলে পাঠানোর চেষ্টা করার ইচ্ছা সদানন্দের ছিল, বিপিন কোনোমতেই রাজি হয় নাই। মহেশ চৌধুরির সম্বন্ধে বিপিনের মনের ভাব ক্রমে ক্রমে বদলাইয়া যাইতেছিল।

বিকৃত সত্য বলিয়া জানিয়া যে আদালতে প্রমাণ করার জন্য সদানন্দের সঙ্গে গোপনে চক্রান্ত করিতেছিল, মহেশ চৌধুরি নিজে আসিয়া তাই সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, সব দোষ ছিল তার ছেলের। বিভূতিকে দোষী প্রমাণ করার উদ্দেশ্য, তাদের ছিল স্বার্থরক্ষা বিভূতির দোষে কতকগুলি লোক জেলে যাইবে বলিয়া মহেশ চৌধুরির হইতেছে আপশোশ !

কিছু করা যায় না ?

কী করা যাবে বলুন ?

বিভূতির দোষটা আদালতে প্রমাণ করলে— ?

বিপিন ভাবিয়া বলিল, তাতে অন্য সবাই ছাড়া পাবে না, তবে শাস্তিটা কম হতে পারে।

মহেশ বলিল, তাই হোক। তা ছাড়া যখন উপায় নেই, কী আর করা যাবে।

সদানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যা ঠিক হইয়াছিল সেটা মনে মনে বাতিল করিয়া দিয়া বিপিন বলিল, আদালতে কী বলবেন ?

যা সত্য তাই বলব, আর কী বলব ?

যা সত্য আদালতে তাই বলা হইবে স্থির হইলেও কী বলা যাইবে সে বিষয়ে পরামর্শ করার প্রয়োজন দেখা গেল। সকলে সত্য কথা বলিলেও সত্যের খুঁটিনাটিগুলি ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে এমন পরস্পরবিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। আদালতে দাঁড়াইয়া মহেশ চৌধুরি ধীর স্থির শান্তভাবে বলিয়া গেল, বিভূতি কেমন একগুঁয়ে ছিল, মেজাজটা তার কী রকম গরম ছিল, আগে একবার সে একটা ছোটোখাটো হাঙ্গামা সৃষ্টি করিবার ফলে মহেশ কীভাবে কয়েকজনের হাতে মার খাইয়াছিল এবং বাপকে যারা মারিয়াছিল তাদের শাস্তি দিবার জন্য কীর্তনের আসরে গিয়া সে কীভাবে হাঙ্গামার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ছেলের চরিত্রের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিযা সকলকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টাও করিল যে, কর্তব্যজ্ঞান, নিষ্ঠা, তেজ, সাহস এ সব মানুষের যতই থাক ভালোমন্দ উচিত-অনুচিত ন্যায়-অন্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা না থাকিলে ও সব কোনো কাজেই লাগে না।

অনেকে হতভম্বের মতো শুনিয়া গেল, কেউ ভাবিল মহেশ চৌধুরিব মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, কয়েকজন সকৌতুকে হাসিতেও লাগিল।

বিভূতির মা বলিল, আদালতে দশজনের কাছে তুমি আমার ছেলের নিন্দে করে এলে ! এবার আমি গলায় দড়ি দেব। আমি অনেক সয়েছি, আর সইব না। বলিযা মাথা কুটিতে লাগিল।

মাধবীলতাও বলিল, আপনার মনে এই ছিল ! আমিও গলায় দড়ি দেব। বলিযা হু-হু করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

মহেশ চৌধুরি তাদের বুঝাইয়া শান্ত করিবার কোনো চেষ্টা করিল না, এতটুকু বিব্রত হইযাছে বলিয়াও মনে হইল না।

অপরাহ্ণে বিপিন আসিল। মহেশ বলিল, এসো বিপিন।

বিপিন যেন হঠাৎ তার স্নেহের পাত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সম্বোধনের তারতম্যটা বিপিনও খেয়াল করিল কি না সন্দেহ, শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষের মতো সামনে বসিয়া পড়িয়া পরমাত্মীয়ের মতোই বিনা ভূমিকায় বলিল, কিছু ভালো লাগছে না।

মহেশ সায় দিয়া বলিল, অনেকদিন থেকেই তো তোমার মন খারাপ।

ছোটো ছেলে যেমন সহানুভূতির প্রত্যাশায় গুরুজনকে দুঃখ জানায় তেমনইভাবে বিপিন বলিল, আশ্রম নিয়ে আমি পাগল হয়ে গেলাম চৌধুরি মশায়। যা ভেবেছিলাম তা তো কিছু হলই না, একটার পর একটা হাঙ্গামাই বাধছে। কত বড়ো উদ্দেশ্য নিয়ে কী রকম আশ্রমের গোড়াপত্তন করেছিলাম, দিন দিন কী দাঁড়াচ্ছে আশ্রমটা ! এত চেষ্টা করছি, কিছুতেই গোল্লায় যাওয়া ঠেকাতে পারছি না।

মহেশ বলিল, কেন, তুমি তো আশ্রমের টাকা আর সম্পত্তি বাড়াবার চেষ্টা করেছিলে, তা তো বেড়েছে ? নাম ছড়াবার চেষ্টা করেছিলে, তাও তো ছড়িয়েছে ?

বিপিন বলিল, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আশ্রম করেছিলাম তার যে কিছুই হচ্ছে না, বরং উলটো ফল হচ্ছে।

মহেশ বলিল, সে দোষটা তোমার।

বিপিন আহত হইয়া বলিল, আমার দোষ ? আমাব কী দোস ?

মহেশ বিপিনকে তার দোষগুলি বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। আগে বিপিন রাগ করিত, আজ নিঃশব্দে শুনিয়া যায়। মহেশের কথা শেষ হওয়াব আগেই তার মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া যায়, আপনাকে যদি আশ্রমে পেতাম !

পাবে।

আপনি আশ্রমে যোগ দেবেন ?

দেব। কদিন আগেই ঠিক করেছি, আশ্রমের ভারটা এবার আমিই নেব। মন দুর্বল কি না তাই ভাবছিলাম, ধীরে সুস্থে কদিন পরে আশ্রমে যাব। কিন্তু ঠিক যখন করে ফেলেছি, অনর্থক দেরি করে লাভ কী, কী বলো ?

বিপিন অভিভূতের মতো বলিল, নিশ্চয়।

মহেশ বলিল, চলো তবে আজকেই যাই।

বিপিন ভয়ে ভয়ে বলিল, কিন্তু সদানন্দের বিষয়ে কী কবা যাবে ?

মহেশ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, সদানন্দ আর মাধবীলতাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিলেই চলবে।

সদানন্দ আর মাধবীলতাকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থার অর্থ বিপিন এক রকম বুঝিয়াছিল। সদানন্দকে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা হইবে এবং মাধবীলতাকে মহেশের কোনো আত্মীয়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। মাধবীলতাকে অন্য কোথাও পাঠাইয়া দিবাব অর্থটা সে ঠিক বুঝিতে পারে নাই। মহেশের আশ্রমে যোগদানের সঙ্গে সদানন্দকে সরাইয়া দেওয়ার প্রশ্ন জাগিতে পারে, মাধবীলতাকে সরাইয়া দিবার প্রয়োজন কী, কাবণ কী ? মহেশ যে দুজনকে একসঙ্গে সবাইয়া দিবাব মতলব কবিয়াছে, বিপিন সেটা কল্পনাও করিতে পাবে নাই।

সদানন্দ অথবা মাধবীলতাও কল্পনা কবিতে পারে নাই।

রাত্রি প্রায দশটাব সময় মাধবীলতাকে সঙ্গে লইয়া মহেশ চৌধুরি আশ্রমে আসিল, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাব আসল উদ্দেশ্যটা তিনজনের কাছেই পরিষ্কার হইয়া গেল। মাঝরাত্রে আশ্রমের পিছনের ঘাটে বাঁধা নৌকায উঠিযা সদানন্দ আর মাধবীলতা চলিয়া গেল। মাধবীলতা প্রথম দিন রাত্রে আশ্রমে আসিবার সময় নৌকা হইতে এই ঘাটেই নামিয়াছিল।

নৌকা চলিয়া গেলে মহেশ বলিল, আমরা সবাই মিলে এবার আশ্রমটা গড়ে তুলব বিপিন।

অহিংসা পাণ্ডুলিপির প্রাথমিক খসড়া

ধরাবাঁধা জীবন

ধরা-বাঁধা জীবন

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
বিরচিত

ধরাবাঁধা জীবন প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

এক

একদিনে ভূপেনের বউ আর ছেলে মরিয়া গেল, কিন্তু ভূপেন কাঁদিল না। প্রথমে মরিল তার বউ, কয়েক ঘণ্টা পরে ছেলেটা।

ভূপেনের আর ছেলেমেয়ে নাই। বছর দুয়েক বয়স হইয়াছিল ছেলেটার। মাসখানেক আগে তার টাইফয়েড হয়। ছেলের সামান্য কিছু হইলেই ভূপেনের বউ বড়ো অস্থির হইয়া পড়িত। ভাবিয়া ভাবিয়া এবং কারও বারণ না মানিয়া দিনরাত ছেলের সেবা করিয়া সে বড়োই কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। আরও বড়ো একটা কারণ ছিল তার কাবু হইয়া পড়ার। মারা সে গেল সেই কারণটির শেষ ধাক্কায়—মরা একটা মেয়েকে জন্ম দিতে গিয়া।

প্রথম মরণটা যখন ঘটে, ভূপেন আনমনে একটা সিগারেট ধরাইয়া মেয়েদের কান্নার শব্দ কানে আসামাত্র আধপোড়া সিগারেটটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। ছেলের মরার সময়ও সে তেমনই আনমনে একটা সিগারেট ধরাইল এবং মেয়েদের কান্নার শব্দ নূতন আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠামাত্র আবার সিগারেটটা ফেলিয়া দিল।

বন্ধু ও প্রতিবেশী ভদ্রলোকেরা আসিয়াছিল। ভূপেনের বউ মারা গেলে তারা ভাবিল, ছেলের ভাবনায় শোক মানুষটার চাপা পড়িয়া গিয়াছে, সে পরে কাঁদিবে, ছেলের একটা কিছু হইয়া গেলে। ছেলেটা মারা যাওয়ার পর তারা ভাবিল, পরপর দুটি দুর্ঘটনায় মানুষটার ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছে, থতোমতো ভাবটা কাটিয়া গেলেই সে পাগলের মতো মাথা-কপাল কুটিয়া কাঁদাকাটা করিতে থাকিবে।

কিন্তু অল্পে অল্পে সময় কাটিয়া গেল, দেহ দুটিকে শ্মশানে নেওয়ার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল, ভূপেন কাঁদিল না। না কাঁদিলে যে সব পাগলামি করার রীতি আছে এ অবস্থায় সে রকম কোনো পাগলামিও করিল না। কেবল মুখখানা তার দেখাইতে লাগিল অস্বাভাবিক রকম বিবর্ণ। কদিন দাড়ি কামায় নাই, স্নান হয় নাই দু-তিনদিন, ভূপেনের মুখখানা এমনি শোকাতুর মানুষের মুখের মতো হইয়া গিয়াছিল। সকলে তাই আরও বেশি অস্বস্তির সঙ্গে ভাবিতে লাগিল, মুখে যার গভীর মর্মান্তিক শোকের এমন স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে সে কাঁদে না কেন ?

দুটি মানুষ যে বাড়িতে মারা গিয়াছে সদ্যসদ্য, সে বাড়িতে অসাধারণ একটা অবস্থা সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক, সে জন্য কিছু আসিয়া যায় না, অস্বাভাবিক কিছু ঘটিলেই মানুষ পীড়া বোধ করে। ভূপেনের চুপচাপ থাকা ছাড়া এ বাড়িতে আর সব ঠিক মানানসই আছে। ভূপেনের মা আর পিসিমা চিৎকার করিয়া মরাকান্না কাঁদিতেছে, ভূপেনের দিদি বিমলার ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফিট হইতেছে, ভূপেনের ছোটোবোন মেঝেতে বা দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া মাথা ফাটানোর চেষ্টা আরম্ভ করায় পাড়ার একটি বউ দুহাতে তাকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে, ভূপেনের বউদিদি ভিতরের বারান্দায় দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া গা এলাইয়া পড়িয়া আছে আর মৃদু ও মিহি গলায় গানের মতো সুর করিয়া কাঁদিতেছে, ভূপেনের দাদা পাগলের মতো একবার ভিতর ও একবার বাহির করিতে করিতে হায় হায় করিতেছে। আর শোকের এই সমস্ত প্রকাশ্য অভিব্যক্তির মধ্যে চলিতেছে মরণের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আয়োজন।

কোমরে গামছা জড়াইয়া আট-দশজন উৎসাহী ও অভিজ্ঞ মানুষ জুটিয়া গিয়াছে। হরদম বিড়ি সিগারেট পুড়িতেছে ; বয়স্ক ভদ্রলোকদের মুখে নানারকম দার্শনিক মন্তব্য শোনা যাইতেছে : বাঁচা মরার উপর মানুষের নাকি কোনো হাত নাই, ভগবান কেন যে দেন আর কেন যে কাড়িয়া নেন তিনিই জানেন, যাইতে আমাদের সকলকেই হইবে, দুদিন আগে আর পরে।

এ সমস্তের মধ্যে ভূপেনের নিঃশব্দ শোক বড়োই খাপছাড়া মনে হইতে লাগিল। প্রসন্ন অভিজ্ঞ মানুষ। চিন্তিত মুখে সে আর একজন অভিজ্ঞ মানুষকে বলিল, এ তো ভালো কথা নয়, একটু কাঁদাকাটা করা যে দরকার !

ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রসন্ন ভূপেনের কাছে গেল।

এমনি অদৃষ্ট ভাই মানুষের, সংসার করতে হলে সবাইকে এমনি করে কাঁদতে হয়, কী করবে বলো !

আমার এ কী সর্বনাশ হয়ে গেল প্রসন্নদা ? কেন আমার এমন হল প্রসন্নদা ?

কাঁদিতে কাঁদিতে মানুষ যেভাবে এ ধরনের কথা বলে অবিকল সেই রকম শোনাইল কথাগুলি। তবু বেশ বুঝা গেল ভূপেন কাঁদে নাই।

প্রসন্ন থাকে শহরের প্রায় অন্যপ্রান্তে। ভূপেনকে কাঁদাইতে না পারিয়া সে হতাশ হইয়া বাড়ি ফিরিয়া গেল। পরদিন আসিল প্রসন্নের বোন প্রভা। বাড়িতে পা দিয়াই চোখ মুছিতে মুছিতে ধরা গলায় সে দাবি করিয়া বসিল, না না, এ রকম করবেন না ভূপেনবাবু, একটু আপনি কাঁদুন। কেন চেপে রাখছেন জোর করে ?

কাঁদব ?—ভূপেন কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল।

হ্যাঁ কাঁদুন। প্রাণ ভরে কেঁদে নিন। তাতে কোনো দোষ নেই। এ রকম অবস্থায় কাঁদা যে দরকার—

নিজের কান্না বন্ধ করিতে প্রভাকে নিজের মুখে রুমাল গুঁজিয়া দিতে হইল। এ তার লোক দেখানো কান্না নয়, পারিলে না কাঁদিয়াই ভূপেনের সঙ্গে দেখা করার কাজটা সে সারিয়া যাইত। ভূপেনকে কাঁদাইতে আসিয়া ভূমিকা করিতে গিয়া নিজেই সে এমনভাবে কাঁদিয়া ফেলিবে, তার ধারণাও ছিল না। সমস্ত শরীর তার থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে আর দু-চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া পড়ে। এতখানি ব্যাকুল হইয়া প্রভা নিজে না কাঁদিলে ভূপেন হয়তো এখন কাঁদিয়া ফেলিতে পারিত, প্রভার বিকৃত মুখভঙ্গি দেখিতে দেখিতে তার মুখের এতক্ষণের কাঁদো কাঁদো ভাবটুকু পর্যন্ত ঘুচিয়া গেল।

দুবছর আগে প্রভা ডাক্তারি পাশ করিয়াছে। পাশ করার অনেক আগে হইতেই সে মাঝে মাঝে আসিয়া ভূপেনের বাড়ির ছেলেমেয়েদের চিকিৎসা করিয়া যাইত। মন তার কোনোদিন নরম ছিল না, ভাবপ্রবণতা তার নাই। মনে মনে ভূপেন বোধ হয় একটু ভয়ই তাকে করে। ভূপেন তার প্রিয়জনের পর্যায়ে পড়ে সন্দেহ নাই, ভূপেনের বউ আর ছেলেটাকেও সে স্নেহ করিত, তবু এভাবে তার কান্নায় ভাঙিয়া পড়িবার উপযুক্ত কারণ তো ভূপেনের বউ আর ছেলের মরণ নয় ! সহানুভূতির কান্না কি এমন হয় ?

ব্যাপারটা ভূপেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। প্রভাকে সে কোনোদিন কাঁদিতে দেখে নাই। বছরখানেক আগে প্রভার ছোটো ভাইটি যখন মারা যায় প্রভা নাকি তখন ভয়ানক কাঁদিয়াছিল। ভূপেন সে সময় এখানে ছিল না। আজ প্রভার কান্নার ভঙ্গিটা ভূপেনের অভিনব এবং খাপছাড়া মনে হইতে থাকে।

কান্নার বেগ কমিয়া আসিলে প্রভা বলে, কী করে সইবেন ভূপেনবাবু ? পঞ্চুর কথা মনে হলে আজও যে আমার বুক ফেটে যায় । মনে হয় আমার কেউ নেই, সব শূন্য হয়ে গেছে।

এবার কতকটা বুঝিতে পারিয়া ভূপেন ভাবে, প্রভার তো নিজের ছেলেমেয়ে নাই, তাই ছেলেকে আর ভাইকে হারানোর তফাতটা ঠিক ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ছেলে মরিয়া গেলে মানুষের কেমন লাগে, ও তার কী বুঝিবে !

একটু ভাবিয়া ভূপেন বলিল, কেঁদো না প্রভা। শোক পাওয়া সংসারের রীতি, কী করবে বলো। মানুষের তো কোনো হাত নেই !

প্রভা আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল।

আমি চেষ্টা করলে হয়তো নন্তুকে বাঁচাতে পারতুম ভূপেনবাবু।

শুনিয়া ভূপেন ভাবিল, ডাক্তার হোক আর যাই হোক, প্রভা মেয়েমানুষ তো, এ রকম আবোল-তাবোল কথা মনে হওয়া আশ্চর্য নয়।

কেবল মেয়েমানুষ বলিয়াই প্রভার উপর আজ ভূপেন যেন বিশেষ মমতা বোধ করে। এবং বোধ হয় সেই জন্যই দুপুরবেলা উদ্দেশ্যহীনভাবে বাড়ির বাহির হইয়া কী করিবে ভাবিতে গিয়া প্রথমেই ভূপেনের মনে হয়, প্রভাদের বাড়ি যাওয়ার কথা। কিন্তু মোটে কয়েক ঘণ্টা আগে প্রভা আসিয়া তার সঙ্গে দেখা করিয়া কাঁদিয়া গিয়াছে, এখন আবার তাদের বাড়ি যাইতে ভূপেনের সংকোচ বোধ হয়। অন্যসময় অন্যঅবস্থায় প্রভা আসিলেও একবার ছাড়িয়া দশবার তাদের বাড়ি যাওয়া চলিত, আজ বোধ হয় একটু খারাপ দেখাইবে গেলে। প্রভা কী ভাবিবে কে জানে।

ট্রামে উঠিয়া সে টিকিট করে শহরের অন্যপ্রান্তে যাওয়ার, যেখানে প্রভাদের বাড়ি। কিন্তু চৌরঙ্গীতে নামিয়া গাড়ি বদল করার পরিবর্তে টিকিটটা ফেলিয়া দেয়। তারপর কী ছবি দেখানো হইতেছে নাম না পড়িয়াই একটা সিনেমায় ঢুকিয়া পড়ে। টিকিট কেনার সময় সে বড়োই সংকোচ বোধ করে, ভিতরে গিয়া বোধ করে অস্বস্তি। আজ কি তার সিনেমা দেখা উচিত ? চেনা মানুষ কেউ তাকে এখানে দেখিলে কী মনে করিবে কে জানে ! কেবল তাই নয়, ভূপেনের মনে হইতে থাকে, আজ সিনেমায় আসিয়া সে যেন সরমা আর নন্তুর স্মৃতিকে কেমন অপমান করিতেছে! ওরা দুজন যে সত্যই নাই, এ চিন্তায় ভূপেন এখনও অভ্যস্ত হইতে পারে নাই। ওদের যে পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে এ কথাটা সব সময়েই মনে থাকে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে ওদের এতকালের অস্তিত্বের অনুভূতিও যেন আগের মতোই জোরালো হইয়া আছে।

পর্দায় একজনকে কাঁদিতে দেখিয়া ভূপেন ছবির দিকে মনোযোগ দিয়া কারণটা বুঝিবার চেষ্টা করে। তারপর ছবিটা তার ভালো লাগিয়া যায়, আর কিছু মনে থাকে না। কাহিনিটা উদ্ভট, অন্যসময় ভূপেনের বিরক্তি বোধ হইত, আজ অবাস্তব নরনারীর জীবনে স্রোতের মতো খাপছাড়া অসম্ভব ঘটনা ঘটিতে দেখিয়া তার এমন মজা লাগে বলিবার নয়। এবং ছবি শেষ হওয়ামাত্র তার মনে হয়, এ জগতে যখন ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম নাই, এখন তার প্রভাদের বাড়ি যাওয়ার মধ্যে দোষের কী থাকিতে পারে ?

বাড়ির মধ্যে প্রভা খুব হাসিতেছিল, বাহিরের ঘর হইতে শোনা যায় এত জোরে! শুনিয়া ভূপেনের মস্ত একটা দুর্ভাবনা যেন কাটিয়া যায়। আজ সকালে প্রভা নন্তু আর সরমার জন্য কাঁদিতেছে মনে করিয়া প্রথমটা তার কীরকম খারাপ লাগিয়াছিল এবং কান্নাটা তার নিজের ভাইয়ের জন্য জানিতে পারিয়া কীরকম নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছিল, তখন খেয়াল না হোক পরে ভূপেন সেটা বুঝিতে পারিয়াছিল। কথাটা জটিলও নয়, দুর্বোধ্যও নয়। যতই কষ্ট হোক, মুক্তির একটা অবাধ্য অনুভূতিও যে প্রথম হইতে জাগিয়া আছে সেটা না মানিয়া ভূপেনের লাভ কী? শীতকালের শেষাশেষি হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যেও হঠাৎ একদিন আবহাওয়ার পরিবর্তন অনুভব করার মতো স্ত্রী-পুত্রের শোকের মধ্যে হালকা ও ব্যাপক মুক্তির স্বাদ সে যদি পায়, প্রভার তো অভদ্র রকমের আনন্দ বোধ করাই উচিত। আহা, আজ কতকাল মেয়েটা শুধু তাকে একবার দেখিবার জন্য, তার দুটি কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে ছুটিয়া ছুটিয়া তার বাড়িতে গিয়াছে ! বছরের পর বছর বোকার মতো সে কী রকম নির্বিকারভাবে প্রভার নীরব পূজা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল ভাবিলে ভূপেনের কান

গরম হইয়া ওঠে। সরমাকে বিবাহ করিবার সময় একবার তার মনেও হয় নাই, তার বউ হওয়ার জন্য মনে মনে প্রভা ছটফট করিতেছে। ও রকম সাধারণ শ্রীহীন একটা মেয়ে যে আবার মনের মধ্যে এ ধরনের কামনা পোষণ করিতে পারে, এ ধারণাই তার ছিল না। প্রায় তিন-চারবছর পরে প্রভার মনের অবস্থা সম্বন্ধে তার প্রথম সন্দেহ জাগে,—তাও প্রভার কথা তুলিয়া সরমা মাঝে মাঝে তাকে ঠাট্টা করিত বলিয়াই কথাটা তার খেয়াল হইয়াছিল। তারপরেও ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে তার কী কম সময় লাগিয়াছে !

বুঝিয়াও যেন বুঝা যায় নাই, বিশ্বাস করিয়াও বিশ্বাস করিতে ভরসা হয় নাই। মন বড়ো শক্ত প্রভার, কথায় কাজে মনের ভাব সে সহজে ধরা পড়িতে দেয় না। তবে ক্রমে ক্রমে ভূপেনের নিজের দৃষ্টিশক্তি যেন তীক্ষ্ণ হইয়াছে, বোধশক্তি বাড়িয়াছে। প্রভার সম্বন্ধে যে কথাটা প্রথমে নিজের কাছেই উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা বলিয়া মনে হইত, পরে নানারকম যুক্তি দিয়া সেই কথাটাকেই সে সত্য বলিয়া দাঁড় করাইতে শিখিয়াছে। প্রভার চোখের দৃষ্টিতে নেশার অস্পষ্ট ইঙ্গিতের মতো একটা দুর্বোধ্য স্বপ্নময় ভাব আছে বলিয়া যেদিন প্রথম মনে হইয়াছিল, ব্যাপারটা সেদিন রীতিমতো হাস্যকর ঠেকিয়াছিল ভূপেনের কাছে। নিজের ছেলেমানুষি ভাবপ্রবণতার প্রমাণ বলিয়া মনে হইয়াছিল নিজের এই আবিষ্কার। কিন্তু আজকাল প্রভার চোখের দিকে চাহিয়া প্রায়ই সে স্পষ্ট দেখিতে পায়, কুয়াশার মতো ঘোলাটে কিছু প্রভার দৃষ্টিকে যেন নিষ্প্রভ করিয়া রাখিয়াছে। আর খাপছাড়া ঠেকে না। এ রকম হওয়াই সঙ্গত মনে হয়। এতকাল মন যদি প্রভার আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া থাকে প্রেম, চোখে তার ছাপ পড়িবে বইকী !

হাসি থামাইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া প্রভা নামিয়া আসিল, খানিকক্ষণ একেবারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে বোধ হয় ভূপেনের আকস্মিক আবির্ভাবের কারণটা বুঝিবার চেষ্টা করিল, তারপব হঠাৎ বসিয়া পড়িল নিজে।

আজ আপনি আসবেন ভাবিনি।

কোথায় আর যাব বলো ? তুমি ছাড়া আমার কে আছে।

নিজের অসহায় অবস্থাটা এমন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া ভূপেন পরম তৃপ্ত বোধ করে। অনেককাল তপস্যা করার পর ভক্তকে বর দিতে আসিয়া দেবতার কেমন লাগে ভূপেনের জানিবার কথা নয়, তবু তার মনে হইতে থাকে, সে যেন ওইরকম একটি দেবতার পদ পাইয়াছে। বরদানের ভূমিকাটিও যে বেশ লাগসই হইয়াছে প্রভার চকিত দৃষ্টিপাতে সেটুকুও সে বুঝিতে পারে। কিন্তু তারপর প্রভার মুখে যে ভয় আর ভাবনার স্পষ্ট ছাপ পড়ে, সেটা একটু দুর্বোধ্য মনে হয় ভূপেনের।

প্রভা একটু ভাবিয়া বলে, আপনার কথাই সারাদিন ভাবছিলাম।

তা জানি।

শুনিয়া ভ্রু কুঁচকাইয়া প্রভা যেন খানিকক্ষণ অবাক হইয়াই ভূপেনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

আমার কী মনে হয় জানেন ? মনে হয়, আপনি কয়েকদিন কোথা থেকে ঘুরে এলে পারেন। কী আর করবেন এখানে থেকে ?

ঘুরে আসতে বলছ ? তা যেতে পারি—তুমি যদি সঙ্গে যাও।

শুনিয়া প্রভা হঠাৎ হাসিয়া বলে, আপনি আশ্চর্য মানুষ, চা খাবেন ?

ভূপেন বলে, কেন খাব না ?

চাও খাওয়া হয়, কিছুক্ষণ গল্পগুজবও চলে। তারপর ভূপেন আবার বেড়াইতে যাওয়ার কথা তোলে। ধরা যাক ভূপেন গেল, সঙ্গে গেল ভূপেনের মা আর বোন, প্রভা কি তাদের সঙ্গে যাইতে পারে না ?

তুমি বুঝি ভাবছিলে তোমায় নিয়ে একা পালিয়ে যাবার মতলব করেছি।

প্রভা বলে, না, তা ভাবিনি। কিন্তু রুগিপত্র ফেলে আমি কী করে যাব ? এখুনি তো আমায় উঠতে হবে—একটা ডেলিভারি কেস আছে। আপনার সঙ্গে যে দু-দণ্ড গল্প করব তারও উপায় নেই।

প্রভা ডাক্তার, রুগিপত্র ফেলিয়া ভূপেনদের সঙ্গে দেশভ্রমণে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, বসিয়া যে ভূপেনের সঙ্গে একটু গল্প করিবে সে সময়ও তার নাই। বাড়ি ফিরিবার পথেই ভূপেনের নিজস্ব জগতে একটা যেন ওলটপালট হইয়া যায়। এক মুহূর্তে ভবিষ্যৎ হয় অর্থহীন, কল্পনা হয় তিতো, এমন তীব্র বিষাদ জাগে যেন কিছু পাপ করিয়াছে। এটুকু ভূপেন বোঝে যে ডেলিভারি কেসেব দায়িত্ব সহজ নয়, না গিয়া প্রভার উপায় নাই, কিন্তু বুঝিলে কী হইবে ? যত গুরুতর কাজই তার থাক, প্রভা তাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে, আমার কাজ আছে আপনি এবার যান। এ কথা এভাবে প্রভা যদি বলিতে পারে, এতদিন প্রভার সম্বন্ধে সে যা ভাবিয়া আসিয়াছে তা তো সত্য হইতে পারে না !

সেইদিন বাড়ির লোকে প্রথম টের পাইল, নিজের ঘরে আরাম কেদারায় চিত হইয়া ছেলে আর বউয়ের শোকে ভূপেন কাঁদিতেছে। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, ভূপেন চোখে হাত চাপা দিয়া শুইয়া আছে। পা টিপিয়া টিপিয়া কাছে গিয়া বউদিদি দেখিয়া আসিল, গালে জলের স্রোতের দাগ।

তাই বটে। পুরুষ মানুষ কী আর চ্যাঁচাইয়া কাঁদে !

বউদিদির কাছে খবর পাইয়া প্রায় সকলেই আসিল। চাপা আর্তনাদের কয়েকটা অদ্ভুত শব্দ কানে যাওয়ায় ভূপেন চোখ মেলিয়াই দ্যাখে, তাকে ঘিরিয়া আপনজনের ভিড়। এতক্ষণ সে ছেলে আর বউয়ের কথাই ভাবিতেছিল। সব মনে হইতেছিল শূন্য, ভিতরে পাক খাইতেছিল একটা অসহায় যন্ত্রণা। চোখ দিয়া যে জল পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে ভূপেন জানিতেও পারে নাই। এখন টের পাইয়া সে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ভূপেনের সজল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখিয়া বাড়িতে একটা বিষম কাণ্ড বাধিয়া যায়। দিদির ফিট অনেকক্ষণ বন্ধ ছিল, একটা চিৎকার করিয়া সে ঢলিয়া পড়ে। ভূপেনের ছোটোবোন অনু, দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া মাথাটা যার এবড়োখেবড়ো হইয়া গিয়াছে, খানিকক্ষণ বিস্ফারিত চোখে দিদিকে দেখিয়া সেও এবার মূর্ছা যায়।

বউদিদি কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, কী হল দ্যাখো ঠাকুরপো।

ভূপেন শান্তভাবেই বলে, হবে আবার কী, সব হিস্টিরিয়া। ওদের চিকিৎসা হওয়া দরকার। প্রভাকে ডাকব ফোন করে ?

এত রাত্রে ডাকবে প্রভাকে ?

প্রভাকে বউদিদি পছন্দ করে না।

প্রভা সব সময়েই যেন তার সমালোচনা করে। ছেলেমেয়েদের গাদা গাদা খাওয়ানো ভালো নয়, শিশু যে সব সময় ক্ষুধায় কাঁদে তা নয় পেটের ব্যথাতেও অনেক সময় কাঁদে, মার নোংরামির জন্যই অনেক সময় ছেলেমেয়েদের অসুখ হয়, এইসব। সাতটি ছেলেমেয়ে বউদিদির, কুড়ি-বাইশ বছর সে স্বামীর ঘর করিতেছে, ডাক্তারিটা পাশ করিয়াই প্রভা যেন তার চেয়ে বেশি জানে—আজ পর্যন্ত যার একটা স্বামীও জুটিল না !

মুখে জলের ছিটা দিলেই একটু পরে এরা দুজন উঠিয়া বসিবে, সে জন্য রাত এগারোটার সময় প্রভাকে ডাকিয়া পাঠানোর কোনো অর্থই বউদিদি বুঝিতে পারে না। তবে, সোজাসুজি বারণ করিবার সাহসও তার নাই। কদিন বাড়ির লোকের ব্যবহারে সে জ্বালাতন হইয়া গিয়াছে। সরমা আর নন্তুর অসুখের বাড়াবাড়ির সময় বাড়ির ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলিকে ভগবানের নামে ছাড়িয়া না

দিয়া তাদের দিকে একটু নজর রাখিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, ভূপেনের ছেলে আর বউয়ের জন্য তার একটুও দরদ নাই। দুজনে মরিয়া গেলে সে খুব কাঁদিয়াছিল, দারুণ শোকের মধ্যেও সকলে বলাবলি করিয়াছিল তার শোকের বাড়াবাড়ির কথা। ভূপেনের বউয়ের সঙ্গে তার মনোমালিন্য ছিল বলিয়া, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে কতগুলি ব্যাপারে ঠোকাঠুকি লাগিত বলিয়া, সে মরিয়া গেলেও যেন তার শোক হওয়া উচিত নয় ! শোকের প্রথম ধাক্কায় সকলে যখন নানারকম পাগলামি আরম্ভ করিয়াছে, তখনও সে শিশুগুলিকে যত্ন করিয়াছিল, সকলকে একটু সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সে জন্য দিদি যে তাকে কতবার শুনাইয়াছে ঠিক নাই : বেঁচেছিস বড়োবউ, না ? বড়োলোকের মেয়ে ছিল, সকলের আদুরে ছিল, হিংসেয় তাই জ্বলে মরতিস,—হাড়ে তোর বাতাস লেগেছে, না ?

অন্যসময় তার সম্বন্ধে এ ধরনের কথা মনে আসিলেও বাড়ির লোকে সাধারণত চুপ করিয়াই থাকে, অথবা আড়ালে দু-চারজন চুপিচুপি নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে। বাড়িতে একটা অসাধারণ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় মুখ আর কারও আটক থাকে নাই, যা মনে আসিয়াছে মুখের উপর বলিয়া বসিয়াছে। প্রভাকে ডাকিতে বারণ করিলে ভূপেন যদি কিছু ভাবিয়া বসে, আর এখনকার মনের অবস্থায়, বলিয়া ফেলে ? মেয়েদের কথা বউদিদি গ্রাহ্য করে না, কিন্তু ভূপেন অন্যায় কিছু বলিলে বড়োই অপমান হইবে। সে অপমান সহ্য করার ক্ষমতা তার হইবে না, হয়তো চটাচটিই হইয়া যাইবে ভূপেনের সঙ্গে। এখন ভূপেনের সঙ্গে চটাচটি হওয়া উচিত হইবে না। বিবাহ করার আগে ভূপেনের সঙ্গে তার বড়ো ভাব ছিল। আবার ভূপেন একা মানুষ হইয়া গেল। বিবাহ যদি আবার সে করেও,—করিবে যে তাতে অবশ্য বউদিদির কোনো সন্দেহ নাই,—দু-একটা বছর তো এমনি কাটিয়া যাইবে। এই সময়ের মধ্যে বউদিদির সঙ্গে আবার কি আগের মতো ভাব করিবে না ভূপেন ? কয়েক মাস পরে বউদিদির বড়ো মেয়েটার বিবাহে কর্তব্যবোধে যতটা করুক, ভাইঝির উপর স্নেহের বশে যতটা করুক, বউদিদির জন্য তার চেয়ে বেশি কিছু সে কি করিবে না ?

দুটি ননদকে মূর্ছা যাইতে দেখিয়া মনের দুর্বলতায় বউদিদি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। ভূপেনের শান্ত ভাব দেখিয়া আর প্রভাকে ডাকিবার কথা শুনিয়া চোখের পলকে কান্নাও বন্ধ করিয়া ফেলে, এত সব কথা তার ভাবাও হইয়া যায়। ভূপেনের পরামর্শ চাওয়ার জবাবে আমতা-আমতা করিয়া চারিদিক বজায় রাখিয়া পালটা প্রশ্ন করে। স্পষ্ট বলে না যে এত রাত্রে প্রভাকে ডাকা উচিত নয়। প্রভাকে ডাকাই যে ভালো তাও বলে না।

কিন্তু তার কথা শুনিয়া ভূপেনকে মুখ গম্ভীর করিয়া নীরবে ভাবিতে দেখিয়া বউদিদি একটু ভড়কাইয়া যায়। নিজের বক্তব্য আরও পরিষ্কার করিয়া বলে, তা তুমি যা ভালো বোঝ তাই করো। আমি ও সব কী বুঝি !

ভূপেন জিজ্ঞাসা করে, প্রভাকে তোমার কেমন লাগে বউদি ?

বউদিদি লাগসই জবাব খুঁজিতে খুঁজিতে ভূপেন আবার জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, সেদিন আমার নামে কী সব বলছিল না তোমাদের কাছে ? আমি ভীষণ শক্ত মানুষ, দয়ামায়ার ধার ধারি না, এইসব ?

বউদি বলে, কই না, ও সব কিছু তো বলেনি। ঠাকুরঝিদের কাছে যদি বলে থাকে—

এতক্ষণে অনু উঠিয়া বসিয়াছে। ভূপেন তাড়াতাড়ি প্রভাকে ফোন করিতে নীচে চলিয়া গেল। সকলে সুস্থ হইয়া উঠিলে এত রাত্রে তাকে ফোন করার আর উপলক্ষ থাকিবে না।

প্রভা আসিয়া পৌঁছিতে পৌঁছিতে রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল। দিদি এবং অনু তখন বেশ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে।

সারাদিন প্রভার দেহ এবং মন দুয়েরই অনেক পরিশ্রম গিয়াছে। বাড়ি ফিরিয়া ঘুমানোর আয়োজন করিতে করিতে ভূপেনের জোর তাগিদে উঠিয়া আসিয়াছে। বিরক্ত হইয়া মুখভার করিয়া সে বলিল, কাল সকালে ডাকলেই পারতেন।

ভূপেন বলিল, দুজনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ল কিনা—

প্রভা বলিল, ও রকম যাবা কথায় কথায় অজ্ঞান হয়, তাদের গায়ে বালতি বালতি জল ঢেলে দিতে হয়। আমি ওর কী চিকিৎসা করব !

ভূপেন নিচু গলায় আদর করিয়া বলিল, তুমি রাগ করেছ প্রভা ?

প্রভার বোধ হয় মনে পড়িয়া গেল এই মানুষটার সম্প্রতি ছেলে আব বউ মারা গিয়াছে। সেও এবার শান্ত গলায় বলিল, না, রাগ করিনি। বড়ো ঘুম পেয়েছে কিনা—

এখানেই ঘুমিয়ে থাকো ?

এ প্রস্তাবে প্রভা বাজি হইল না। নিজের বিছানাটি ছাড়া তার ঘুম আসে না। তা ছাড়া কাল ভোর হইতে না হইতে রোগী আসা আরম্ভ হইবে।

তখন ভূপেন বলিল, চলো তবে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

প্রভা বলিল, উঁহু, রাত একটার সময় আপনি আমায় অতদূরে পৌঁছে দিতে যাবেন, তার কোনো মানে হয় না। ফিরতে ফিরতে আপনার আড়াইটে তিনটে বেজে যাবে। কাল বোধ হয় সারারাত ঘুমোননি—

সঙ্গে যে দাসী আসিয়াছিল তার সঙ্গেই প্রভা ফিরিয়া গেল।

দুই

এমনিভাবে প্রভার সঙ্গে ভূপেনের একদিনে তিনবার দেখা হইয়া গেল, ছেলে আব বউয়ের শোকের প্রথম ধাক্কায় সে যখন কাবু হইয়া পড়িয়াছে। তারপর প্রভার সঙ্গে দু-একদিন অন্তর দেখা হইতে থাকে, দিন কাটিতে কাটিতে মাস কাটিয়া যায়। ভূপেন স্পষ্ট করিয়া প্রভাকে কিছু বলে না, ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে। ভাবে, কিছুদিন চুপ কবিয়া থাকাই উচিত। ছেলেবউ মারা যাওয়ার পর সময় কাটিতে না দিযা প্রভাকে বলা সঙ্গত হইবে না যে এবার তুমি আমার বউ হও প্রভা।

কেবল এই জন্যই যে ভূপেন চুপ করিয়া থাকে তা নয়। ছেলে আর বউযের শোকটাই তাকে বাধা দেয়। ভূপেন কাঁদে না, কিন্তু ভাবে। প্রায় সব সময়েই ভাবে। চোখ বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে কখনও সরমাকে কখনও নন্তুকে চোখের সামনে দেখিতে পায়, ওদের চোখের মুখের হাতের পায়ের চুলের দাঁতের এক একটি বৈশিষ্ট্য হঠাৎ এক সময় স্পষ্ট হইয়া ওঠে। ওদের হাসিকান্নার মুখভঙ্গি মনে করিতে গিযা শব্দ পর্যন্ত শুনিতে পাইয়া দু-একবার ভূপেন চমকাইয়া পর্যন্ত ওঠে।

সবমার বাক্সো আলমারি ঘাঁটিতে ভূপেনের ভালো লাগে। মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ করিয়া ঘণ্টাব পর ঘণ্টা ওই খেলাতেই সে মাতিয়া থাকে। কত বিচিত্র কাপড়-জামাই সরমার ছিল, প্রসাধনের কত বিভিন্ন সামগ্রী ! গায়ে আঁটে না এত সোনাব গয়না ছিল, তবু বাশি রাশি কাচের চুড়ি জমা করা আছে দেখিয়া ভূপেন যেন আশ্চর্য হইয়া যায়, নতুন করিয়া আজ যেন সে বুঝিতে পারে কী ছেলেমানুষই ছিল তার সরমা। দুটি দামি কাপড়ের ভাঁজে খানিকটা আচার পাওয়া যায়। সরমার চুরি করিয়া আচার খাওয়ার শখ ছিল, কবে ধরা পড়িবার ভয়ে এখানে আচার গুঁজিয়া দিয়াছিল, তারপর আর মনে ছিল না ! তিন শিশি ওষুধ একটি বাক্সের তলে লুকানো অবস্থায় পাওয়া যায়। মাস ছয়েক আগে সরমাকে শরীর ভালো করার জন্য ওষুধ দেওয়া হইয়াছিল। এতদিন পরে আজ ভূপেন টের পায় ওষুধ সরমা খাইত না, তাকে ফাঁকি দিয়াছিল। দুষ্টামিও কী কম জানিত তার সরমা।

অজস্র স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে সরমা তার স্মৃতি আর পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। বাক্সোটি খোলামাত্র যে গন্ধ নাকে লাগে তাও যেন সরমারই একটা ঘনিষ্ঠ স্থায়ী অস্তিত্ব। ভূপেন জোরে শ্বাস টানে

সরমার প্রত্যেকটি দরকারি-অদরকারি জিনিস হাতে করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দ্যাখে। কিছুক্ষণ কাটিয়া যাওয়ার পর সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে, কেমন যেন একটা নেশা হইয়াছে।

সরমার স্মৃতিচিহ্নের বেলা এ রকম হয়, নন্তুর স্মৃতিচিহ্নের ব্যাপার অন্যরকম। সরমার জামা-কাপড়ের সঙ্গেই নন্তুর কত পোশাক আছে, বাক্সে আলমারিতে তার কত খেলনা, ঘরেও কত কী জমা করা আছে এখানে-ওখানে। কিন্তু নন্তুর কোনো জিনিস যেন সহজে ভূপেনের চোখেই পড়িতে চায় না। দেখিবার বা ঘাঁটিবার বিশেষ আগ্রহও তার নাই। কখনও যদি খেয়াল হয় যে ঘরের কোণের ছোটো টেবিলটার উপরকার ছবির বইয়ের গাদাটি ছিল নন্তুর, ভূপেনের বুকের মধ্যে হুহু করিতে থাকে। এ যে নন্তুর স্মৃতিচিহ্ন, আজ নন্তু নাই বলিয়া কতগুলি আস্ত আর মলাটছেঁড়া নতুন ও পুরাতন শিশুপাঠ্য বই দেখিয়া নন্তুর কথা মনে করিয়া তার কষ্ট হইতেছে, এ সব ভূপেন ভাবে না, ছেঁড়া মলাট দেখিয়া তার মনে পড়িয়া যায় না কী দুরন্ত ছেলেই ছিল তার নন্তু, একটা প্রায় অচিন্তনীয় ও অসহ্য যন্ত্রণা তার ভিতরে মোচন দিতে থাকে।

তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। সরমার কথা মনে পড়িয়া যায়, মনে পড়িয়া যায় যে তার একটি ছেলে ছিল সে ছেলেটি মরিয়া গিয়াছে এবং এই সব কথা মনে পড়িয়া যে গভীর শোক জাগে, তার নীচে নন্তুর সম্বন্ধে মনের দুর্বোধ্য ও যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়াটা চাপা পড়িয়া যায়। শ্মশানে ভূতের ভয়ে যার মূর্ছার উপক্রম হয়, ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইয়া আসিয়া সে নিজের ঘরে বসিয়া ভূতের গল্প পড়িয়া শিহরিয়া উঠিতে পারে। ভূপেনও কতকটা সেই রকম করে।

একদিন প্রভা বলিল, আপনি নাকি ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদাকাটা করেন, বউদির কাছে শুনলাম ?

ভূপেন বলিল, না, কাঁদাকাটা করব কেন ? হইচই গোলমাল ভালো লাগে না, তাই দরজা বন্ধ করে বসে থাকি।

চুপচাপ বসে থাকেন ?

ঠিক চুপচাপ বসে থাকি না—

আরও এক মাসের ছুটি নেবেন শুনলাম ? কোথাও যদি না-ই যান, ঘরের কোণে মন খারাপ করে বসে থাকার জন্য ছুটি নিয়ে লাভ ! তার চেয়ে কাজেকর্মে মেতে থাকা ঢের ভালো।

ভূপেন একটু ভাবিয়া বলিল, এক মাস নয়, তিন মাসের ছুটির দরখাস্ত করেছি। এ তিন মাসের মাইনে পাব। তারপর তিন মাস আদ্দেক মাইনেয় ছুটি নেব, তারপর ছ-মাস বিনে মাইনেয়।

প্রভা আশ্চর্য হইয়া বলিল, কেন ?

কথা হইতেছিল প্রভাদের বাড়িতে, প্রভার ঘরে, দুপুরবেলা। সকালে প্রভা ভূপেনদের বাড়ি গিয়াছিল, ভূপেন বাড়ি ছিল না। ভূপেন তাই দুপুরবেলাই দেখা করিতে আসিয়াছে। দেরি করিয়া আসিলে অবহেলা মনে করিয়া প্রভার মনে যদি কষ্ট হয় ? দুপুরবেলা এ সময়টা প্রভার একটু ঘুমানো অভ্যাস। চোখ দুটি তার ঝিমাইয়া আসিয়াছিল। বিস্মিত হইলে প্রভা মাথাটা একটু পিছন দিকে ঠেলিয়া ঘাড়টা একটু বাঁকাইয়া আড়চোখে তাকায়, সেই সঙ্গে শরীরটাও একটু বিশেষ ভঙ্গিতে কাত হইয়া পড়ে। এটা তার চিরদিনের অভ্যাস। ভূপেনের অনেকবার দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল, কিন্তু কোনোদিন চাহিয়া দ্যাখে নাই। আজ খুঁটিয়া খুঁটিয়া বিশেষভাবে দেখিতে দেখিতে প্রভার প্রশ্নের জবাব দিতে সে ভুলিয়া গেল।

প্রভার বিস্ময় কমিয়া গেল। অস্বস্তি বোধ করিয়া সে আবার বলিল, এতদিনের ছুটি নেবেন কেন ?

তখন ভূপেন বলিল, বছরখানেক না কাটলে তো আর আমাদের বিয়েটা হতে পারবে না। আমার যা মনের অবস্থা তাতে আপিসের কাজ আমার দ্বারা হবে না প্রভা। তুমি যা ভাবছ তা কিন্তু

নয় প্রভা, তোমার জন্যই মনটা আমার বেশি অস্থির হয়ে পড়েছে। সাত-আটবছর তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি ভাবলেই—

প্রভার চোখে, মুখে এবং দেহে আবার বিস্ময়ের ভঙ্গি ফুটিয়া ওঠে। প্রভাকে কী বলিবে ভূপেন অনেকবার ভাবিয়া রাখিয়াছিল, এতদিনে মুখস্থ হইয়া যাওয়ার কথা। আজ যে বলিবে এটা অবশ্য ঠিক ছিল না, তবু ভাবিযা বাখা কথাগুলির বদলে এ সব কথা বলিয়া ফেলিল কেন ভূপেন বুঝিতে পাবে না। শান্তভাবে সরল ভাষায় প্রভাকে জানানো যে সে তাকে বহুদিন হইতে ভালোবাসে এবং তেমনই সহজ শান্তভাবে বাকি জীবনটা একসঙ্গে কাটানোর জন্য তার সম্মতি চাওয়া, এর মধ্যে সাত-আটবছর প্রভার মনে কষ্ট দেওয়ার প্রশ্ন তো নাই!

বিব্রতভাবে ভূপেন আবার বলিল, আমি বলছিলাম কী, লোকে যা ভাবে ভাবুক, আর মাসখানেকের মধ্যে আমরা বিয়েটা সেরে ফেলি এসো। এতদিন উপায় ছিল না কোনোরকমে কাটিয়েছি, এখন আর তোমায় ছেড়ে একটা দিনও থাকতে পারছি না প্রভা।

প্রভা নীরবে উঠিয়া জানালার কাছে সরিয়া গেল। জানালায় কিছুই দেখিবার নাই, কয়েক হাত তফাতেই পাশের বাড়ির দেয়াল। মাঝখানে ইটপাতা সরু গলি, পায়ে পায়ে ইটগুলি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। প্রভার মাথার পিছনে আলগা অসম্পূর্ণ খোঁপা দেখিতে দেখিতে ভূপেনের হঠাৎ আঘাত পাওয়ার মতো তীব্র লজ্জা বোধ হয়। কেবল লজ্জা নয়, ঘুম বা নেশার ঘোর কাটিয়া সচেতন হইয়া উঠিবার মতো একটা অনুভূতি এমন স্পষ্টভাবে সে অনুভব কবিতে আরম্ভ কবে যে তার মনে হয় অনেকগুলি দিন একটা অদ্ভুত আত্মবিস্মৃতিব মোহে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবার পর এই মুহূর্তে সত্য সত্যই বুঝি তাব চেতনা হইয়াছে। এই কয়েকদিন, সবমা ও নন্তুর মৃত্যুর পবের দিনগুলি, কিছুই সে সজ্ঞানে কবে নাই।

কী ভাবিতেছে প্রভা? বুড়ো বয়সে বউ মরামাত্র আবার বিবাহ করার জন্য তাকে খেপিয়া উঠিতে দেখিয়া হয়তো সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। হযতো বুঝিয়াই উঠিতে পারিতেছে না, স্ত্রীপুত্রের জন্য যার চোখের জল শুকানোব সময় পায় নাই সে কেমন কবিয়া এত সহজে আর একজনের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় আত্মবিস্মৃতির মুহূর্তে কথাগুলি সে বলিয়া ফেলে নাই, প্রভা তা জানে। সে রকম কোনো ভূমিকাই গড়িয়া ওঠে নাই। আজও নয়, আগেও নয়। প্রৌঢ় বয়সের স্বাভাবিক ধীরতার সঙ্গে প্রায় আবেগহীন ভাষায় সে ঘোষণা করিয়াছে তার প্রেম ও প্রয়োজনের প্রস্তাব। তার প্রেম ও তার প্রয়োজন। প্রভাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া সে যেভাবে প্রভাকে বলিত, তুমি না গেলে কিন্তু চলবে না প্রভা, সেইভাবে সে তাকে জানাইয়া দিযাছে তাকে ছাড়িয়া একটা দিনও সে থাকিতে পারিতেছে না। গলাটা একটু কাঁপিয়া পর্যন্ত যায় নাই।

বিয়াল্লিশ বছর বয়স হইয়াছে। বিয়াল্লিশ বছর! অথবা তেতাল্লিশ? তেতাল্লিশ হওয়াও তো আশ্চর্য নয়। ভূপেন আশ্চর্য হইয়া যায়। নিজের বয়স সম্বন্ধে তার সঠিক ধারণা নাই, মনে মনে একটা আন্দাজি হিসাব রাখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া আছে? বছরের কী এত ছড়াছড়ি জীবনে যে একটা হিসাব রাখিতেও এত অবহেলা?

প্রভার কত বয়স হইয়াছে?

সরমার বয়সটা মনে আছে। আর নন্তুর। বিবাহের সময় সরমার বয়স ছিল সতেরো, দশ বছর পরে সে মারা গিয়াছে। নন্তু বাঁচিয়া থাকিলে এই ফাল্গুনে তার ন-বছর বয়স হইত।

সরমার চেয়ে প্রভা তিন-চারবছরের বড়ো। প্রভার তবে ত্রিশের কাছে বয়স পৌঁছিয়াছে! তাই বটে। একটু তাই মোটা হইয়া পড়িয়াছে প্রভা আজকাল, একটু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে তার দেহ আর মন, কথা আর চালচলনে আসিয়াছে গাম্ভীর্য! একদিন, অনেকদিন আগে, সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া ধাপে ধাপে পা ফেলিয়া প্রভাকে নামিতে দেখিয়া তার মন ভুলিয়াছিল, মনে হইয়াছিল তার নিজের

জীবনের ছন্দ ও তরঙ্গ যেন রূপ ধরিয়া নীচে নামিয়া দূরে চলিয়া যাইতেছে। আজ সমতল মেঝেতে পা ফেলিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকার সময় প্রভাকে একটু মোটা মনে হইতেছে বটে।

বাহিরের সঙ্গে ভিতরেও প্রভার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কেবল তার নিজের পরিবর্তন নয়। ভূপেন ভাবে : এতগুলি বছর ধরিয়া চোখের সামনে ধীরে ধীরে প্রভার এই পবিবর্তন না ঘটিয়া যদি চোখের আড়ালে ঘটিত ? আজ হয়তো প্রভাকে এত সহজে মনের কথা সে বলিতে পারিত না। ইচ্ছা থাকিলেও সাহস হয়তো হইত না।

প্রভা ফিরিয়া আসিয়া সামনে একটা চেয়ারে বসিল। তার মুখ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই ভূপেনের আকস্মিক আত্মপ্রকাশ তাকে কিছুমাত্র বিস্মিত বা বিচলিত করিয়াছে। তার শান্ত নির্বিকার মুখের ভাব দেখিয়া ভূপেন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

এখন ও সব আলোচনা থাক, ভূপেনবাবু।

কালও প্রভা তাকে ভূপেনবাবু বলিয়াছে, আট-নবছর ধরিয়া বলিয়া আসিতেছে। অনেকদিন আগেই হয়তো প্রভা আপনি ছাড়িয়া তুমিতে নামিয়া আসিতে পারিত, শুধু চলিয়া আসিতেছিল বলিয়াই অভ্যাসের মতো ভূপেনবাবু বলাটাই বজায় থাকিয়া গিয়াছে। আজ সম্বোধনটা ভূপেনেব কানে বিঁধিবার কোনো কারণ ছিল না। অবুঝ শিশুর মতো ভূপেন তবু এই অর্থহীন শব্দকে যাচিয়া সংকেতের অর্থ দিয়া মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল।

কেন ?

আপনার যে রকম মানসিক অবস্থা—

আমার মানসিক অবস্থা ঠিক আছে।

তাই কি থাকতে পারে ? বউদি আব নন্তুর জন্য আপনার মন—

ওদেব কথা বাদ দাও প্রভা। ওদের আমি ভুলতে চাই।

ভুলতে চাইলেই কী ভোলা যায় ? ভুলবার কথা হলে ভুলবার জন্য চেষ্টা করতে হয় না। আপনা থেকেই মানুষ ভুলে যায়। আপনি আজ যা বললেন, কেবল আমার জন্য বলেননি। তা হলে এত শিগগির বলতে পারতেন না। ওদের জন্য আপনার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। সে কষ্ট সইতে পারছেন না বলেই এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি ভাবছেন অন্যরকম কিন্তু আপনাব মনেব তলে তাগিদ আছে, যে কোনো উপায়ে হোক কষ্টটা যাতে সহ্যের সীমায় আনা যায়।

ভূপেন আহত বিস্ময়ে প্রভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। কোনোদিন সে প্রভাকে মুখে কিছু বলে নাই, অন্যভাবে জানানোর কোনো চেষ্টাও করে নাই, তবু এতকাল তার ধারণা ছিল প্রভা সব জানে। একটা অনির্দিষ্ট সুখের মতো এই ধারণা তার মনে দিনের পর দিন স্থান পাইয়া আসিযাছে। আব কিছু না হোক, প্রভা সব জানে। কতদিন প্রভার সঙ্গে নন্তুর অসুখেব কথা আলোচনা করিতে করিতে দুজনে তারা নির্বাক হইয়া গিয়াছে, প্রভার ক্লিষ্ট মুখে গভীর শ্রান্তির ছাপ দেখিয়া সে কী করিবে ভাবিয়া পায় নাই। তারপর প্রভার মুখে ধীরে ধীরে শান্তি ও তৃপ্তির লাবণ্য ঘনাইয়া আসিতে দেখিয়া নিজেও যে কী গভীর স্বস্তি বোধ করিয়াছে বলিবার নয়। ভাবিয়াছে, হতাশার মধ্যে প্রভা এতক্ষণে সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইল, এতক্ষণে তার মনে পড়িয়া গেল যে সে একা নয়, সামনে যে মানুষটা বসিয়া আছে, সেও তাকে চায়।

আজ প্রভা তার ব্যাকুলতার মানে করিতেছে অন্যরকম। স্ত্রীপুত্রের শোকে তার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে তাই সে তাকে চায়, শোকের অসহ্য জ্বালার মলম হিসাবে। আট বছর ধরিয়া তার মনকে জানিয়া রাখিলে তার কথার এ ব্যাখ্যা করা তো প্রভার পক্ষে সম্ভব হইত না।

প্রভা আবার বলিল, ছুটি নেবেন বলেছিলেন, তাই করুন আপনি। ছুটি নিয়ে ঘুরে আসুন বাইরে থেকে। মন শান্ত হয়ে যাবে।

মন তো বিশেষ অশান্ত মনে হচ্ছে না প্রভা।

নিজেই তো বললেন।

তুমি যা বলছ আমি তা বলিনি।

আপনি কি বলতে চান বউদি আর নন্তুর জন্য আপনার একটুও কষ্ট হয়নি ? ওদের ভুলে গেছেন ?

অমন কথা বলতে চাইব কেন ?

তাই তো মানে দাঁড়ায় আপনার ব্যবহারের। হয় ওদের শোকে দিশেহারা হয়ে গেছেন, নয় ওদের মনে নেই। আর কী মানে হতে পারে বলুন ?

এতদিন পরে প্রভাকে মানে বুঝাইয়া বলিতে হইবে !

তুমি জান না মানে ?

ভেবে তো পাচ্ছি না।

অভিভূতের মতো খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ভূপেন হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। শোক-দুঃখে ভরা জীবনে তার আজ প্রথম এক যন্ত্রণাদায়ক ধাঁধা আসিয়াছে। মিথ্যা আর ভুলে ভরা এক অবিশ্বাস্য দুর্বোধ্য অভিজ্ঞতা।

যাওযার সময় প্রভা মৃদুস্বরে বলিল, রাগ করলেন ?

ভূপেন বলিল, না। রাগ করার কী আছে ?

তিন

প্রভার উপর রাগ করিয়াই ভূপেন ছুটির দরখাস্ত বাতিল করিয়া দিল। মন অশান্ত বলিয়া সে দিশেহারা হইয়া গিয়াছে, পাগলামি করিয়াছে ? প্রভা বুঝুক, মন অশান্ত হইলেও সে দিশেহারা হয না, পাগলামি করে না। দুঃখকষ্ট সহ্য করিবার জন্য তাকে ছুটি লইয়া দূরে পলাইয়া যাইতে হয় না।

সরমা আর নন্তুর জন্য শোকের তীব্রতা সাধারণ নিয়মেই কমিতে থাকে। কেবল জাগিযা থাকে একটা গভীর অভাব বোধ। আঘাতের বেদনা দিয়া সে অভাব বোধকে আর অবশ করিয়া রাখা যায় না, বৈরাগ্যের উদাসীনতা দিয়া অবহেলাও করা যায় না। রীতিমতো অসন্তোষ লইয়া দিন কাটাইতে হয়। ফাঁকার মর্যাদাহানি ঘটে এবং অপবাদ জোটে ফাঁকির · প্রথম যৌবনের কাব্যোন্মাদনাকে মহাজনব্রতী—কমবেশি যে ব্রত সকলেরই পালনীয়— যেমন গাল দেয়।

স্নেহ করার সঙ্গে সরমাকে ভূপেন শ্রদ্ধা করিত, মনে মনে তাকে একটু ভয় করার অভ্যাসও বুঝি তার জন্মিয়া গিয়াছিল। তার এই বিস্ময়কর মানসিক প্রক্রিয়ার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করা কঠিন।

প্রভাকে পাইয়া জীবনের পরিপূর্ণতা লাভের বাধা ছিল সরমা। সাত-আটবছর ধরিয়া সে জানিয়া রাখিয়াছিল, সরমার জন্যই প্রভার সঙ্গে শুধু ভদ্র ব্যবহারের সম্পর্ক বজায় রাখিয়া তাকে বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিতে হইবে। তবু কোনোদিন সে সরমার উপর বিদ্বেষ অনুভব করে নাই। বরং সর্বদা সরমার কাছেই নিজেকে তার অপরাধী মনে হইয়াছে। সরমার জন্য বঞ্চিত জীবনযাপন করিতে হইবে বলিয়া না হোক, তার কাছে এই অপরাধের অনুভূতিতেই ভূপেনের মনে বিদ্রোহ জাগা উচিত ছিল, কারণ, মানুষের মন আত্মপীড়নের উপলক্ষকে ঘৃণা করে। কিন্তু ভূপেনের মনে প্রতিক্রিয়া হইয়াছে বিপরীত, সরমার জন্য সে বোধ করিয়াছে মমতা। কারণটা বোধ হয় এই যে চিরদিন সে বিশ্বাস করিয়াছে সরমাকে কিছুদিন সত্যসত্যই সে ভালোবাসিয়াছিল এবং সরমা তাকে সর্বদা ভালোবাসে, তার মনটাও সরমার সম্পত্তি, প্রভাকে দান করার কোনো অধিকার তার নাই। সে প্রভাকে চায় জানিতে পারিলে বেচারি সরমা মনের দুঃখেই মরিয়া যাইবে, এই ছিল ভূপেনের ধারণা।

অনেক সময় সে সরমার সেই মর্মাহত অবস্থা কল্পনা করিত আর সহানুভূতি ও মমতায় সে নিজেই হইয়া পড়িত কাতর। সরমা যে অসুখী ছিল তা নয় কিন্তু নিজের এই কল্পনা ভূপেনের মনে তাকে করিয়া রাখিত বিষাদময়ী।

সাধারণ জীবনের খুঁটিনাটি সুখসুবিধা ও অভ্যাসের ব্যতিক্রমে বিরক্তি বোধ করিবার মতো মানসিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে ভূপেন অনুভব করিতে লাগিল, কতদিকে কতভাবে সরমার জীবনের সঙ্গে জীবনটা তার জড়াইয়া গিয়াছিল।

জীবনে তার প্রথমে আসিয়াছিল সরমা, তারপর মনে আসিয়াছিল প্রভা। তারপবেও সরমার সঙ্গেই তার জীবন কাটিয়াছে বছরের পর বছর, প্রভাকে সে চাহিয়াছে মনে মনে। আজও সে প্রভাকে চায় কিন্তু সরমাকে ছাড়া কী করিয়া তার দিন কাটিবে তাও সে ভাবিয়া পাইতেছে না ! সরমার সেবা, সংসারের ছোটোবড়ো ব্যাপারে সরমার সঙ্গে পরামর্শ সম্মুখে অথবা আড়ালে সবমার উপলব্ধ উপস্থিতি, এ সবও যে তার বাঁচিয়া থাকার জন্য এত বেশি প্রয়োজনীয় ভূপেন তা জানিত না। সারাটি সন্ধ্যা প্রভাকে ঘিরিয়া মনে মনে স্বপ্ন রচনা করিয়া শুইতে গেলে আজও তার সরমার অভাবেই বিছানা খালি মনে হয়, মাঝরাত্রে ঘুম তার ভাঙে সরমাকে চাহিয়া। ভূপেনের গভীর সংশয় জাগে। মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রভাকে কাছে না পাইলেও তাকে কেন্দ্র করিয়া কল্পনা ও কামনার জাল বুনিতে বুনিতে দিন যদি বা কাটানো চলে, বাস্তব জীবনে সরমার অভাব সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়।

কিন্তু প্রভাকে কেন্দ্র করিয়া কল্পনা ও কামনার জাল বুনিবার দিনও তাব শেষ হইয়া গিয়াছে ! প্রভা তার স্বপ্ন জানে না, মানে না। স্ত্রীপুত্রের জন্য নিজের ও বাড়ির মানুষেব কান্নার দিনগুলি কাটিবার আগেই তাকে লইয়া নতুন জীবন শুরু করিবার প্রস্তাব শুনিয়াই প্রভা চমকাইয়া গিয়াছে, ধরিয়া লইয়াছে এটা এক শোকার্ত মানুষের পাগলামি।

কথাটা ভাবিতে গেলেও ভূপেনের মাথা ঘুরিয়া যায়। প্রভা তাকে ভালোবাসে না, প্রভা জানে না সে তাকে ভালোবাসে ! সাত-আটবছর এমন একটা ভুল ধারণা সে পোষণ করিয়া আসিয়াছে, একী সম্ভব হয় ? দিনের পর দিন কত ঘনিষ্ঠভাবে তারা মেলামেশা করিয়াছে, তবু ভুল ধরা পড়ে নাই ?

এই চিন্তার জ্বালার সঙ্গে ভূপেন অনুভব করে, বন্ধন আলগা হইযা গিয়াছে। বাহিরে থাকিলে বাড়ি ফিরিবার তাগিদ আগেও ছিল না, যেখানে খুশি যাওয়ার বাধাও ছিল না। শুধু মনে পড়িত বাড়িতে সরমা ও নন্তু, এই দুজন আপনার জন আছে—নিজের ঘরে একটু একা থাকিবাব জন্য মনটা ছটফট করিবার সময়েও যাদের খুশিমতো কাছে আসিবার ও মনোযোগ আকর্ষণ করিবার অধিকার ছিল। মনোযোগ দাবি করিবার এখন কেউ নাই, কিছুই নাই ! জীবনের যে অংশটুকু পরাধীন ছিল, তাও স্বাধীনতা পাইয়াছে।

এই মুক্তির প্রথম প্রতিক্রিয়া, সরমা আর নন্তুর চিন্তা ঠান্ডা হওয়ার আগেই প্রভার কাছে তার বিবাহের প্রস্তাব। বারুদের মতো এই একটিমাত্র প্রতিক্রিয়ায় মুক্তির উচ্ছ্বাস-উন্মাদনা যেন শেষ হইয়া গিয়াছে। বন্ধন নাই এ অনুভূতিও অভাব বোধের মতো ভোঁতা হইয়া গিয়াছে।

একদিন দুটি পুরানো বন্ধু বহুকাল পরে ভূপেনকে দুঃখের জগতে দুঃখের জীবনে একটু আনন্দ করার আহ্বান জানায়, বলে, এখন তো বাইরে রাত কাটাতে বাধা নেই, এসো না ?

দুজনেই সংসারী, ধীর স্থির হিসাবি মানুষ, একজন সম্প্রতি মেয়ের বিবাহ দিয়া শ্বশুর হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ সংসারে নিখুঁত গার্হস্থ্য জীবন তারা যাপন করে। চর্বিস্নিগ্ধ দেহে, বেশভূষা-চালচলনে উগ্র আমোদ-প্রমোদের পিপাসার ইঙ্গিত বা অপচয়ের ছাপ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এখনও ও সব আছে নাকি তোমাদের ?

অজিত একটি ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির ম্যানেজাব, ভূপেনের সঙ্গে এককালে তারই বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল সবচেয়ে জোরালো। হতাশার স্তিমিত হাসি হাসিয়া সে বলে, মাঝে মাঝে—মাসে দু-তিনরাতের বেশি হয় না ! আগের সে দিন কী আর আছে ভাই, বড়ো একঘেয়ে লাগে, মাঝে মাঝে তাই একটু—

উৎসাহ জাগে না ! ঝড়ের বাত্রির মতো প্রথম যৌবনে কয়েকটি ফুর্তির রাত্রি আসিয়াছিল, অভ্যস্ত হইতে পারে নাই। রজনিব্যাপী বেপরোয়া উল্লাসের চেয়ে রাত্রিশেষের অবসাদের স্মৃতি মনকে আজ বিষণ্ন করিয়া দেয়। কতকটা অনাবশ্যক অপ্রিয় মুক্তির আরেকটা বড়োরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে সে রাজি হয়, অনিচ্ছার সঙ্গে।

সন্ধ্যার পর দোকানের মতো সাজানো ঘরে ঢুকিয়াই মন তার আরও দমিয়া যায়, গেলাসে প্রথম চুমুক দিবার সময় আতঙ্ক জাগে, তিনটি স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য ভিতরের অমর অনাহত লাজুক তরুণটিকে পীড়ন করে, জীবনের সময় ও জীবনীশক্তির স্বার্থপব সতর্ক প্রহরীর মতো নিজেই সে এক মুহূর্ত সময় ও একবিন্দু শক্তির অসার্থক অপচয়ের বিরুদ্ধে ক্রমাগত নিজেকে সাবধান করিয়া দিতে থাকে। মাঝরাত্রে যখন পা টলিতেছে, বিশ্বজগৎ হইয়া গিয়াছে ফেনা আর বুদবুদ, তখনও নিজের কাছে কৈফিয়ত চাওয়া চলিতে থাকে যে, লাভ কী ? আর আপশোশ করিতে হয় যে, হায়, নিজেকে ভুলিবার এত আয়োজনও যদি ব্যর্থ হইল, তবে আর বাঁচা কেন ?

শশীতারা তীক্ষ্ণগলায় গান ধরে,—গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে ভিরমি গেল সে ! সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু চোখ ঠারে। একরাত্রির জন্য ভাড়া করা চোখেব ইশারায় সাড়া দেওয়ার জন্যই যেন ভিরমি লাগিয়া ভূপেন পড়িয়া যায়। শশীতারার গায়ে নয়, তাকিযার ওপর। অভ্যাস নাই, বেহিসাবি মদ গিলিতে বন্ধুবা অনেক বারণ করিয়াছিল। অচেতন ভূপেনকে উদ্ভট ভঙ্গিতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তারা সগর্বে ভাবে, আমরা ওর মতো নই, আমাদের মাত্রাজ্ঞান আছে, ফুর্তি করতে বসেও আমরা সংযম হারাই না। একটু রাগও তাদের হয়। বড়ো একঘেয়ে জীবন, ফুর্তি কোনোদিন জমে না, ভূপেন সঙ্গে থাকায় আশা করিয়াছিল হয়তো আজ জমিবে। রাত্রির পর রাত্রি বৃথা গিয়াছে, আরেকটা বাত্রি আজ ব্যর্থ হইয়া গেল। এখন আবার অন্য একটি রাত্রিব ভরসায় বুক বাঁধিতে হইবে।

স্বর্ণ মোটাসোটা মানুষ, একবার সিঁড়ি দিয়া উঠিতেই তার হাঁপ ধরিয়া যায়। কাজ করাব বদলে সে করে সংসার পরিচালনা। তার মনটা ভালো, মাথায় বুদ্ধি আছে, স্বভাবটি মিশুক ও মিষ্টি। সবমাকে সেও স্নেহ করিত। সরমার জন্য মন কেমন করার সঙ্গে ভূপেনকে সহানুভূতি দেওযার জন্য উদ্যত হইয়া থাকিয়াও সুযোগ না পাইয়া সে বড়ো দমিয়া গিয়াছিল। তারপর ভূপেন এই সব কাণ্ডকারখানা শুরু করিয়া দেওয়ায় ভয়ে-ভাবনায় সে যেন দিশেহারা হইয়া গেল।

কেবল ভূপেনের জন্য নয়, সংসারকে স্বর্ণ ভালোবাসে, তার অখণ্ড নিযমানুবর্তী সুখের সংসার। সরমা এ সংসারের একটা দিক ভাঙিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু মরণের বিরুদ্ধে তো নালিশ নাই। সরমার মতো আরেকজনকে আনিয়া সে ভাঙন জোড়া দেওয়ার আশা ইতিমধ্যেই স্বর্ণের মনে উঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রথমে কিছুকাল শুধু সমবেদনা জানাইয়া তারপর ধীরে ধীরে নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করিবার উৎসাহ জাগাইয়া তুলিবে, এই ছিল স্বর্ণের পরিকল্পনা। ইতিমধ্যে একদিন কথায় কথায় সে ভূপেনকে বলিয়াও ফেলিয়াছে : বুড়ো হয়েছ বোলো না ঠাকুরপো। বিয়াল্লিশ বছর এমন কী বয়স মানুষের !

সরমার পরিবর্তে আরেকজনকে আনা যায় কিন্তু ভূপেন যদি নিজের সঙ্গে সংসারকেও ধ্বংস করিতে বসে, তবে তো কোনো উপায় থাকিবে না।

উপেনের উপার্জন কম, কোনো মাসে সে সংসারে সামান্য খরচ দেয়, কোনো মাসে দেয় না। সে জন্য কিছুই আসিয়া যায় নাই। সরমা কোনোদিন স্বর্ণকে তার গৃহিণীর আসন হইতে সরাইয়া নিজে কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করে নাই। কেবল ভূপেনের সেবা আর সুখসুবিধার দায়িত্বটা সে নিজের আয়ত্তে রাখিয়াছিল, তাও স্বর্ণের প্রতিনিধির মতো, স্বাধীনভাবে নয়। সমগ্রভাবে সংসারের ভার ছিল স্বর্ণের। টাকার প্রশ্ন আজও উঠিবে না, স্বর্ণ জানে। যার টাকাতেই সংসার চলুক, তাকে ছাড়া সংসার চলিবে না। নিজের কর্তৃত্ব করার সাধ মিটাইতে ভূপেনের বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী হওয়ার অধিকার খাটাইয়া গায়ের জোরে সে সংসারের গৃহিণীপদ অধিকার করে নাই, সংসার গড়িবার ও চালাইবার ভারটা আপনা হইতে তার জুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভূপেন যদি বিগড়াইয়া যায়, সংসারে যদি তার মন না থাকে, সংসার তো তবে আপনা হইতেই ভাঙিয়া পড়িবে, দেখা দিবে অভাব, বিশৃঙ্খলা আর অশান্তি।

ভয়ে-ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া একদিন সে প্রভার বাড়ি গেল। প্রভাকে সে তেমন পছন্দ করে না, ভূপেনের সঙ্গে তার মেলামেশাকে সে কোনোদিন ভালো চোখে দেখিতে পারে নাই। স্পষ্ট কিছু মনে না হইলেও মনটা তার চিরদিন খুঁতখুঁত করিয়াছে। কিন্তু এই বিপদের সময় অত ভাবিলে চলিবে কেন !

সমস্ত শুনিয়া প্রভা বলিল, কী আশ্চর্য ব্যাপার ! মাথা নিশ্চয় খাবাপ হয়ে গেছে ভূপেনবাবুর। এই বয়সে এ সব কী !

স্বর্ণ বলিল, বয়স আর এমন কী বেশি ?

প্রভা মুখভার করিয়া বলিল, তা বইকী, দেওরটি আপনার এখনও ছেলেমানুষ আছে।

স্বর্ণ বলিল, হঠাৎ ঘা খেলে মানুষের এ রকম হয় ভাই। কেউ সন্ন্যাসী হয়ে যায়, কেউ মদ ধরে। এখন ঝোঁকটা কেটে গেলে বাঁচি। আমার কিছু বলতে তো সাহস হয় না, তুমি যদি একটু চেষ্টা কর, সামলে যেতে পারে।

স্পষ্টভাবে স্বর্ণের এ অনুরোধ জানাইবার প্রয়োজন ছিল না, প্রভাও সেই কথাই ভাবিতেছিল। এ সব ব্যাপার সে ভালো বুঝিতে পারে না, মানুষের বেহিসাবি উন্মাদনা, আবেগের অসংযম। হিস্টিরিয়ার সঙ্গে তার পরিচয় আছে, অনেকের চিকিৎসাও করিয়াছে। ভূপেন সত্যসত্যই পাগল হইয়া গেলে সে তার মানে বুঝিতে পারিত, হয়তো চিকিৎসার ব্যবস্থায় সাহায্যও করিতে পারিত। একজন ধীর স্থির শান্ত মানুষের মধ্যে এ সব পাগলামি কী করিয়া আসে কে জানে !

মাঝখানে ভূপেনের সঙ্গে বার দুই তার দেখা হইয়াছে, ভূপেন সহজভাবেই তার সঙ্গে কথা বলিয়াছে, ভিতরে তার কী চলিতেছে কিছুই বুঝিতে পারা যায় নাই। প্রভার তাও ভালো লাগে নাই। সে আশা করিয়াছিল, তার সেদিনকার খাপছাড়া প্রস্তাব সম্বন্ধে আবার সে কথা তুলিবে—বিশ বছরের ভাবুক ছেলের মতো উচ্ছ্বাসের আমদানি না করিয়া সহজভাবে আলোচনা করিবে ও বিষয়ে। একটা বুঝাপড়ার জন্য প্রভা সত্যসত্যই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ভূপেনের সঙ্গে কখনও কোনো বিষয়ে তার মনোমালিন্য হয় নাই, তাদের সম্পর্কে কোনোদিন এতটুকু ভুল বোঝার স্থান ছিল না।

জীবনে অনেক রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রভা সঞ্চয় করিয়াছে, তার মধ্যে সবচেয়ে অভিনব ভূপেনের সঙ্গে দিনের পর দিন সহজ ও গভীর অন্তরঙ্গতা বজায় রাখিয়া চলিবার অভিজ্ঞতা। মানুষের অন্ধ স্বার্থপরতা আর অফুরন্ত দাবির সঙ্গে তো ভালোভাবেই পরিচয় ছিল প্রভার, ভূপেন কোনোদিন অন্যমনেও তার কাছে মেলামেশার বেশি কিছু চাহিবে না, প্রথমে এ কথা তার কল্পনাতেও ছিল না। কল্পনা করিতেও চায় নাই। একটি অধীরতার সঙ্গে অন্য কল্পনাই বরং সে আরম্ভ করিয়াছিল, কবে কথা বলিতে বলিতে ভূপেন তার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া নিবে। তারপর দিন সপ্তাহ মাস কাটিয়া গিয়াছিল, মাঝে মাঝে ভূপেনের চোখে সে দেখিয়াছিল ক্ষুধা আর কাতরতা, কিন্তু কথায় সে কিছু

বলে নাই, ব্যবহারে কিছু বুঝিতে দেয় নাই। তখনও প্রভা বিশ্বাস করিতে পারে নাই, তাদের সম্পর্কে এই সীমা বজায় রাখিয়া জীবন কাটাইয়া দিতে ভূপেন প্রস্তুত হইয়াছে, মানুষের পক্ষে যে সংযম সম্ভব। পুরুষ অবুঝ, খেয়ালি তাদের প্রকৃতি, অস্থির তাদের অগভীর সংকীর্ণ চিত্ত, দুদিনের বেশি কামনাকে তাবা চাপিয়া রাখিতে পারে না। প্রভা তখন জানিত না, ভূপেনের দিকে আত্মসংযমের প্রশ্ন ছিল না, কারণ আত্মহারা হওয়াব প্রেরণাই তাব মধ্যে ছিল অনুপস্থিত। প্রভাকে সে পাইবে না, যতদিন সরমা বাঁচিয়া আছে প্রভাকে পাওয়ার স্বপ্ন দেখাও অর্থহীন, এই ছিল তার কাছে চরম সত্য। এবং এই সত্যকেই সে মানিয়া লইয়াছিল। মেলামেশায় পাছে বাধা সৃষ্টি হয়, প্রভা পাছে দূরে সরিয়া যায়, এই ছিল তার ভয়। একটা নির্দিষ্ট সীমা সে তাই কোনোদিন অতিক্রম করে নাই।

এদিকে অসহিষ্ণু প্রভা পড়িয়া গিয়াছিল ধাঁধায়। এ অভিজ্ঞতা ছিল তার অভিজ্ঞতার বাহিরে। পুরুষ ঘনিষ্ঠ হয় যতখানি হওয়া সম্ভব, বছর পার হইয়া যায় প্রকাশ্যে আর নির্জনে কাছাকাছি হওয়ার ভূমিকা করিয়া, অথচ কিছুই ঘটে না ! এ কোন দেশি সম্পর্ক নারী ও পুরুষের ? কিছুদিনের জন্য তখন প্রভার বড়ো কষ্টকর মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে কাটিয়াছিল। জীবনের অনেক সীমাহীন সম্ভাবনার দুর্বোধ্য রহস্যময় অনুভূতি তাকে কখনও ব্যাকুল করিয়া রাখিত, কখনও সে অনুভব কবিত খাপছাড়া আনন্দ, বিষাদের চাপে জীবন কখনও হইয়া উঠিত দুর্বহ। বিষাদেব পব আসিত ক্ষোভ। দেহমন তার যেন জ্বালা করিতে থাকিত। কোনোদিন ভূপেনকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিত, কোনোদিন করিত অপমান। কোনো রকমে মানুষটাকে একবার জয় করিতে পারিলে তাকে কী শাস্তি দিবে ভাবিতে ভাবিতে তার নিদ্রাহীন রাত কাটিয়া যাইত।

একদিন শ্রান্তিব-ছলে ভূপেনের কাঁধে মাথা রাখিয়া কয়েক মিনিটে সে কয়েকটা যুগ কাটাইয়া দিয়াছিল, প্রতি মুহূর্তে পরবর্তী মুহূর্তেব অঘটন প্রত্যাশা করিয়া। নিজের সেই স্পষ্ট নির্লজ্জ পাশবিক অভিযানের কথা ভাবিলে আজও প্রভার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। ভূপেন শুধু সন্তর্পণে তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা কবিযাছিল, একটু ভালো লাগছে প্রভা ?

কিছুই যেন অপ্রত্যাশিত নয়, খাপছাড়া নয়। হঠাৎ দুর্বলতা বোধ করিয়াছে, মাথা ঘুরিয়া উঠিয়াছে, তার কাঁধে মাথা রাখিয়া তাকে আশ্রয় কবিয়া প্রভা একটু বিশ্রাম করিবে বইকী। সংকোচ বোধ কবিলেই যেন প্রভার অন্যায় হইত।

তাবপর হইতে প্রভা তাদের সম্পর্ককে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অপমানের জ্বালাটুকু পর্যন্ত আব বোধ কবে নাই।

দুপুববেলা স্বর্ণ প্রভাব কাছে গিয়াছিল, বিকালে প্রভা এ বাড়ি আসিল। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সে মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছে। মেয়েদেব সঙ্গে দুয়েকটি কথা বলিয়াই সে উপরে উঠিয়া গেল। ভূপেন এখনও শুইয়া আছে শুনিয়া একটু যে দ্বিধা মনে ছিল তাও সে এবার বাতিল করিয়া দিল।

রোগী দেখিয়া দেখিয়া প্রভার এ সব কেমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। রোগীর বিছানায় বসার মতো সে ভূপেনের বিছানায় বসে, তাপ নেওয়ার মতো কপালে হাত রাখে, নাড়ি দেখার মতো তার হাত ধরিয়া মুমূর্ষুকে ভরসা দেওয়ার মতো হাসি হাসে।

ছি, তোমার না চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে ? এ সব ছেলেমানুষি কেন আবার ?

অনুযোগ দিয়া একটি কথাও বলিবে না ভাবিয়াছিল, অনেকদিন অভ্যাসে আপনা হইতে মনের প্রধান নালিশটা অনুযোগের ভাষায় বাহির হইয়া গেল। চিকিৎসার প্রথম কিস্তি হিসাবে, আজ যাচিয়া ভূপেনকে অনেক কিছু দিবে ঠিক করিয়াছিল মনে পড়ায় ছোটো ছেলেকে আদর করার মতো ছোটো একটি চুমু দিল।

ভূপেন কিছুই করিল না, বোকার মতো শুধু কৈফিয়ত দিয়া বলিল, এই প্রথম প্রভা। বন্ধুরা জোর করে টেনে নিয়ে গেল। তুমি তো জানই ও সব অভ্যাস আমার নেই।

অভ্যাস হতে কতক্ষণ !

না, সে ভয় নেই। এমন বিশ্রী লাগছে কী বলব তোমায়। ওরা যে কী আনন্দ পায় ওরাই জানে !

গতরাত্রির বেপরোয়া উল্লাসের চেয়ে অবসাদের স্মৃতিই ভূপেনকে বিষণ্ন করিয়া রাখিয়াছে। কিছুই ভালো লাগে নাই। নিজেই সে যে সময় আর জীবনীশক্তির অসার্থক অপচয়ের এমন স্বার্থপর সতর্ক প্রহরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কাল রাত্রির আগে কখনও খেয়াল হয় নাই। গায়ের জোরে বন্ধুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিতে গিয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, এও কম লজ্জার কথা নয়। অভ্যাস নাই বলিয়াই কি তার সহ্য হয় নাই ? এখনও দেহমনের অবস্থা তার শোচনীয় হইয়া আছে। সকালে একবার এবং সারা দুপুর ঘুমানোর পর বিকালে আরেকবার স্নান করিয়াও মনে হইতেছে বাসি বেলফুলের গন্ধ যেন এখনও বাতাসে লেপটিয়া রহিয়াছে।

দুজনে অনেক কথা হয়,—অনেক। একযুগ আগে যে কথা বলা চলিত সেগুলি অবশ্য মনের মধ্যে ভিড় করিয়াই থাকে, দুজনে শুধু উচ্চারণ করিয়া যায় কথাগুলির সময়োপযোগী অনুবাদ। অনুবাদের ভাষা অতি সুবোধ্য, কিন্তু শব্দগুলির মানে এত কম যে কিছু যেন প্রকাশ করাই কঠিন। তবু কথা বলিতে বলিতেই ভূপেনের জিভের বিস্বাদ জড়তা কাটিয়া যায়। বাসি বেলফুলের গন্ধ চাপা পড়িয়া যায় প্রভার পরিচিত সেন্টের গন্ধে, বসা-সর্দির মতো মস্তিষ্কের ভোঁতা টসটসে অস্বস্তিবোধ কাটিয়া যায় প্রভার ঠান্ডা হাতের স্পর্শে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে প্রভা বলিল, এখন যাই, একটা কেস আছে। চারটের সময় যাওয়ার কথা, সন্ধে হয়ে গেল।

উঠি উঠি করিয়াও প্রভা একটু দেরি করে। ছোটো ঘড়িটির সেকেন্ডের কাঁটা চলিতেছে দেখিয়াও কানের কাছে ধরিয়া রাখিয়া পরীক্ষা করে ঘড়িটার প্রাণ আছে কিনা। তবু ভূপেনের মনে পড়ে না প্রভা আজ যাচিয়া আসিয়া ধরা দিয়াছে, তার অনেকদিন আগেকার প্রায় চাপা-পড়া প্রস্তাবের সক্রিয় জবাবের মতো বিদায় নেওয়ার সময় অন্তত তাকে একটু গ্রহণ করা তার একান্তভাবে উচিত। চিরদিন সে আসে আর চলিয়া যায়। আসার মধ্যে প্রভা নিজেই আজ নতুনত্ব আনিয়াছে, যাওয়ার মধ্যে বৈচিত্র্য আনিবার দায়িত্বটা তার। কাল সন্ধ্যায় দুঃখীর বরফ-শীতল পানীয়ে প্রথম চুমুক দিয়া উষ্ণতা বোধ করার মতো নতুন সম্ভাবনার উত্তেজনায় ভূপেন চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ভবিষ্যতের দিন ও রাত্রিব্যাপী নিবিড় মিলনের কল্পনায় ছড়ানো সে সম্ভাবনার সূচনা যে আজ এই মুহূর্তে প্রভাকে একটু আদর করায়, সেটা খেয়াল না হইলে ভূপেন কী করিবে ! চিরদিনের প্রথাতেই সে প্রভাকে বিদায় দিল।

রাত দশটার সময় প্রভা ফোন করিল।

রাজি তো হলাম, আমার কিন্তু ভয় করছে।

কীসের ভয় ?

ঠিক ভয় নয়, কেমন যেন ভাবনা হচ্ছে।

কীসের ভাবনা ?

কাল সকালে একবার এসো। বলিয়া প্রভা কথা বন্ধ করিয়া দিল।

চার

দুজনের বাড়িতেই ব্যাপারটা মোটামুটি অনুমান করিয়া সকলে শঙ্কিত ও উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। ছেলে-বউ মারা যাওয়ার পরেই হঠাৎ ভূপেন যেভাবে প্রভার দিকে ঝুঁকিয়াছিল, তাতে বউদির ভয়ের

সীমা ছিল না। মনে হইয়াছিল, শোক যে ভূপেনের হয় নাই সরমা ও নন্তুর জন্য, তার কারণও বুঝি এই। রুদ্ধনিশ্বাসে সে প্রতীক্ষা করিয়াছিল, কী হয় কী হয়। কিন্তু কিছুই তখন হয় নাই। প্রভার জন্য ভূপেনের ব্যাকুলতা কমিয়া গিয়াছিল, ছেলে-বউয়েব জন্য সে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল শোকে। প্রভার সঙ্গে ভূপেনের দেখাসাক্ষাৎও যেন কমিয়া গিয়াছিল আগের চেয়ে। তারপর কোথায় এক বানিকে সন্তান প্রসবের জন্য সাহায্য করিতে গিয়া প্রভা কিছুদিন এক রাজবাড়িতে বাস কবিয়া আসিল। তারপরেও কিছু ঘটিল না। ধীরে ধীরে সকলের দুর্ভাবনা কাটিয়া গেল। বউদি কোমব বাঁধিয়া সরমাব অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিল। দিদির ফিট পর্যন্ত একটানা অনেকদিন স্থগিত হইয়া রহিল।

হঠাৎ দুজনে আবার কী আরম্ভ করিয়া দিয়াছে দ্যাখো ! একদিনে যার ছেলে-বউ মরিয়া যায়, জানাশোনা একজন লেডি ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি বিবাহ করিয়া ফেলাটা তার পক্ষে বড়োই অশোভন হয়, এটা খেয়াল করিয়া কি দুজনে চুপ কবিয়া ছিল এতকাল ?

প্রভা বউ হইয়া এ বাড়িতে আসিলে কী অবস্থা দাঁড়াইবে ভাবিতে গেলেও বউদির বুক ধড়ফড় কবে। এমনই প্রভার যা দেমাক, বাড়িব মানুষগুলিকে সে এমনি যে রকম অবজ্ঞা কবে, তাতে একেবারে গৃহিণী হইযা আসিয়া জুড়িয়া বসিলে মানুষকে সে কি আর টিকিতে দিবে ? বিবাহ করার সাধ হইয়া থাকে সরমাব মতো আরেকটি ভীবু নরম বউ আনুক, কর্তালি করাব অভ্যাস যাব নাই, সব বিষয়ে যে বউদিব মুখ চাহিয়া থাকিবে। প্রভাকে কেন ? প্রাণ দিয়া এত যে সেবা কবে ভূপেনেব, তাকে জব্দ কবাব জন্য প্রভাকে কেন ?

এদিকে প্রসন্ন ভয়ে ভয়ে বোনকে জিজ্ঞাসা করে, ডাক্তাবি বুঝি ভালো লাগছে না প্রভা ?

ভালো লাগছে না ? কে বললে তোমায ?

দু-একদিন পরে প্রসন্ন আবাব বলে, একটা প্রফেশন নেওযাব পর সেটা ছেড়ে দিলে মেয়েরা সুখী হতে পারে না প্রভা। ভারী অগৌববের বিষয হয। পুরুষদেব সঙ্গে সমান অধিকার চায, অথচ স্বাধীনভাবে থাকবাব সুযোগ পেলেও নিজেবাই সেটা বজায় রাখতে পারে না। সাধে কী পুবুষ জাত মেয়েদের দাবিয়ে রেখেছে !

প্রভা মৃদু হাসিয়া বলে, তুমি যেমন বউদিকে রেখেছ ?

সকলেব বিপদ হইয়াছে, এখনও সবটাই নিছক সম্ভাবনাব ব্যাপার, স্পষ্ট করিয়া ভূপেন ও প্রভা কিছু ঘোষণা কবে নাই। স্পষ্ট করিয়া তাই তাদের কিছু বলাও যায় না। নিজেব চাকরির পঁচাত্তব টাকায় সংসার চালানোর কথা ভাবিলে প্রসন্নের কপাল ঘামিয়া ওঠে। প্রথম প্রথম প্রভা অবশ্য সাহায্য করিবে, কিন্তু সে আব কতদিন। তার ছেলেমেয়ে হইবে, নিজের সংসাব গড়িয়া উঠিবে, তখন কি আর মনে থাকিবে বাপ দাদা ভাইপো ভাইঝির কথা ? অথচ স্পষ্ট করিয়া ওবা কিছুই বলিবে না। এ বকম অবস্থাব মধ্যে মানুব থাকিতে পারে !

অন্যমানুষের যারা বউ তাদের চিকিৎসা করিযা শ্রান্ত হইয়া প্রভা বাড়ি ফেবে, নিজেব ঘরের নির্জনতায় পুরুষালি ভঙ্গিতে ইজিচেয়ারের হাতলে পা তুলিয়া চিত হইয়া নিজেব বধূ-জীবন কল্পনা করে। এমনই বিষণ্ণ শ্রান্তির সময় ভূপেনের বুকে মাথা রাখিয়া বিশ্রামের কল্পনায় সর্বাঙ্গে তার শিহরন জাগে, নিশ্বাস জমা হইয়া দীর্ঘ অতৃপ্তির মতো মুক্তি পায়। কিন্তু কত ভয় আর ভাবনাও যে বুক তার দুরুদুরু কাঁপাইয়া দেয় !

ভূপেনের দিক দিয়া তার ভয়ের কিছু নাই, সে তার কোনো ইচ্ছায় কোনো কাজে বাধা দিবে না, কিন্তু যে পরিবর্তনগুলি অপরিহার্য, কারও ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর যে যোগাযোগগুলি নির্ভর

করিবে না? যখন খুশি বাহির হইয়া গিয়া যখন খুশি সে ফিরিয়া আসে, দিবারাত্রি বাহিরে কাটাইলেও কেহ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পায় না সে কোথায় ছিল। আপনজনের দিকে ইচ্ছা হইলে তাকায়, ইচ্ছা না হইলে তাকায় না। ঘরের দরজার মোটা পর্দাটি টানিয়া দিলে সে একা হইয়া যায়, পর্দা সরাইয়া ঘরে উঁকি দিবার সাহস পর্যন্ত কারও হয় না। নারী ও শিশুর মঙ্গলের জন্য সমিতি গড়িয়া মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করে। অসংখ্য অভ্যাসের ভেলায় ভাসিয়া চলে জীবন স্রোতে। এ সব যদি সে বজায় রাখে, ভূপেনের বউ হওয়ার অর্থ কী? আর এই যে সব বিচিত্র উপকরণে জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে, এগুলি ছাঁটিয়া ফেলিলে ভূপেনের বউ হইয়া তার লাভ কী? শুধু অবসর মিলনের জন্য তো বিবাহের দরকার হয় না।

অথচ বিবাহ ছাড়া মিলনও তাদের বিস্বাদ হইয়া যাইবে। প্রভা ভালো করিয়াই তা জানে। তার নিজের জন্য হয়তো নয়, ভূপেনের জন্য। এই রকম প্রকৃতি ভূপেনের। শুধু প্রভাকে পাইলে তার চলিবে না, প্রভার জীবনও তার চাই।

প্রভা ঘরের চারিদিকে তাকায়। এ ঘর ছাড়িয়া ভূপেনের বাড়িতে একটা ঘরে তাকে বাস করিতে হইবে। বাহিরে বারান্দায় গিয়া প্রভা সংসারের কলরব শোনে, আপনজনের চলাফেরা চাহিয়া দ্যাখে। ভূপেন যেমন তার বাড়ির সংসারটির কর্তা, সেও তেমনি এই সংসারের কর্ত্রী। তার টাকায় তার নির্দেশে এই সংসার চলে। এবার তাকে গিয়া চালাইতে হইবে ভূপেনের সংসার। সে টাকা পাঠাইবে কিন্তু তার এই সংসারে কর্তৃত্ব করিবে অন্য একজন। তার প্রচলিত নিয়ম আর ব্যবস্থাগুলিও হয়তো বাতিল হইয়া যাইবে দুদিনের মধ্যে।

কেবল নিজের নিজের বিচার-বিবেচনাই নয়, আসন্ন বিপদের মতো তাদের মিলনের সম্ভাবনায় বাড়ির মানুষের মধ্যে যে ভয় জাগিয়াছে সেই ভয়ের উত্তেজনা সঞ্চারিত হইয়াও তাদের দমাইয়া দেয়। একটা রাত্রিও তাদের দূরে কাটাইতে ইচ্ছা করে না, ভিন্ন দুটি বাড়িতে ভিন্ন দুটি ঘরে রাত জাগিয়া তারা পরস্পরের জন্য ছটফট করে। কিন্তু তাড়াতাড়ি বিবাহটা সারিয়া ফেলিবার তাগিদও কোনো পক্ষ হইতে আসে না। আলোচনা সেদিন যতটুকু আগাইয়াছিল সেইখানেই থমকিয়া থাকে। আর তাদের দূরে থাকিবার প্রয়োজন নাই, এইটুকু বুঝাপড়া করিয়াই যেন তারা একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে। আর কিছু বলিবার বা করিবার প্রয়োজন যেন নাই। কাছাকাছি আসিলে মাঝে মাঝে বরং মনে তাদের এই অস্বস্তিই জাগিয়া উঠে যে, অন্যজন হয়তো হঠাৎ বলিয়া বসিবে, একটা দিন তবে এবার ঠিক করে ফেলা যাক?

মেজাজ দুজনেরই বিগড়াইয়া যাইতে থাকে। কাম্য মিলনকে ঠেকাইয়া রাখিতেই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা তাদের ফুরাইয়া যায়, অতি তুচ্ছ কারণে সমস্ত জগতের উপর রাগে তাদের গা জ্বালা করিতে থাকে। পরামর্শ করিয়া তারা যদি বিবাহ পিছাইয়া দিত, কোনো কথা ছিল না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার কথা ভাবিয়া মন শুধু তাদের ব্যাকুল হইয়া উঠিত। এখন তাও সম্ভব নয়। পরামর্শ করিতে হইলে এখন সবচেয়ে নিকটবর্তী শুভদিনটিতে বিবাহ চুকাইয়া ফেলিবার পরামর্শই করিতে হয়। তাই যে উদ্ভট অবস্থা তারা সৃষ্টি করিয়াছে সেই অবস্থারই জের টানিয়া চলিতে চলিতে দম যেন তাদের ফুরাইয়া যাইতে চায়।

দু-বাড়ির লোকেরাও ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে। সংসারের খরচের জন্য টাকা চাহিতে গিয়া বোনের কাছে অপমানিত প্রসন্ন কিছুক্ষণের জন্য এমন কথাও ভাবে যে, এর চেয়ে নিজের পঁচাত্তর টাকাতে সংসার চালানোর চেষ্টা করাও ভালো। ভূপেনের বাড়িতে ছেলেমেয়েদের একটু সর্দি হইলে, মেয়ে-বউয়ের একটু মাথা ধরিলে প্রভাকে ডাকা হইত, প্রভাও ডাকিলেই যাইত। এখন বউদির খোকার আটানব্বই পয়েন্ট এক জ্বরের জন্য ব্যাকুলভাবে তাকে ডাকিলে ফোনেই সে খোকাকে ঘণ্টা দুই চৌবাচ্চায় ডুবাইয়া রাখিবার উপদেশ দেয়, অনু মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে শুনিয়া বলে যে

একটা পেরেক যেন তার তালুতে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। পেরেকটা এমনি না ঢুকিলে যে হাতুড়ি ব্যবহার করা চলিবে, এটুকু বলিয়া দিবার ইচ্ছাটা পর্যন্ত সে সংবরণ করিতে পারে না।

বউদি কাঁদো কাঁদো হইয়া ভূপেনের কাছে নালিশ জানায়, প্রভা আমায় এমনি করে অপমান করবে ঠাকুরপো ?

ভূপেন বলে, বেশ করেছে। ফোন করতে গিয়েছিলে কেন ? রান্না হয়েছে ?

বউদি বলে, এই হল।

ভূপেন গর্জন করিয়া উঠে, এই হল ! আপিস যাব না আমি ?

বউদি ভয়ে ভয়ে বলে, আপিস আছে নাকি ? আমি ভাবছিলাম আজও ছুটি। কিছু তো বলোনি ঠাকুরপো ?

বলতে হবে কেন ?

আপিসের কথা ভূপেনের নিজেরও মনে ছিল না। এতক্ষণে মনে পড়িয়াছে, সাড়ে দশটার সময়। কবে ছুটি শেষ হয়, কখন আপিসের বেলা হয়, মনে করাইয়া দিবার কেউ নাই। সমস্ত জগৎ যেন তার সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করিয়াছে।

সরমা যেন জীবনের আধারটা তোবড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছে। কোনোমতে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছে না, কোথাও থাকিতেছে ফাঁক, কোথাও লাগিতেছে খোঁচা।

খাইতে বসিয়া তাড়াতাড়িতে খাওয়াটা ভূপেনের বেশি হইয়া যায়। সকলে যেন তাকে পীড়ন করার জন্যই আজকাল বেশি বেশি এটা খাও ওটা খাও বলে। সরমাই শুধু তার খাওয়ার হিসাব জানিত, সরমাই শুধু সাহস করিয়া তাকে বলিতে পারিত, রাবড়িটা থাক, ও বেলা খেয়ো। ভরপেটে দুবার সিঁড়ি ভাঙিয়া হাঁপ ধরিয়া গেলে গাড়িতে উঠিবার সময় হঠাৎ তার মনে পড়িয়া যায়, এও অন্যায়। দরকারি কিছু ফেলিয়া ঘরের বাহির হওয়ার আগেই সরমার মতো কেউ মনে পড়াইয়া দেয় না। সকলে মিলিয়া এমনভাবে তার মনটা বিগ্‌ড়াইয়া দিয়াছে যে দুবার সিঁড়ি ভাঙার আগে খেয়ালও হয় না, সে একটা হুকুম দিলেই দশবার সিঁড়ি ভাঙিবার অনেক লোক তার বাড়িতে আছে।

গাড়ির চলনটা পর্যন্ত খাপছাড়া মনে হয়। ছোকরা চালকটির ছাঁটা ঘাড়ে অনেক উঁচু পর্যন্ত চামড়া বাহির হইয়া আছে। জগতের সমস্ত মানুষের উপর এতক্ষণ যে ক্রোধ ও বিরক্তি ভূপেনের মনে গুমরাইতেছিল, এই ছাঁটা ঘাড়ের ঔদ্ধত্য যেন তার সবটুকু আকর্ষণ করিয়া নেয়।

গোরুর গাড়ি চালাচ্ছ নাকি ?

গাড়ির স্পিড বাড়িবামাত্র কিন্তু আতঙ্ক জন্মে। রাস্তায় মানুষ ও গাড়ির ভিড়, যদি অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়া যায় ?

কত জোরে চালাচ্ছ ? মাথা খারাপ নাকি তোমার ?

গাড়ি আস্তে চলিতে থাকে। ছাঁটা ঘাড় হইতে ভূপেন যেন চোখ ফিরাইতে পারে না। একবার জোরে, একবার আস্তে—ছাঁটা ঘাড়ের ও পাশে কি হাসি ফুটিয়াছে ছোকরার মুখে ?

আপিসে ঢুকিবামাত্র কিন্তু ভূপেন গভীর আরাম বোধ করে। এখানে কোনো পরিবর্তন নাই। কোনো নিয়ম, কোনো বন্ধন, কোনো দায়িত্ব এখানে শিথিল হয় নাই, নতুন রূপ নেয় নাই। গভীর স্বস্তির সঙ্গে ভূপেন ঘণ্টা বাজায়, কলম নাচায়, নাম সই করে, ধমক দেয়, পরামর্শ করে, প্রায় সমবয়সি ও প্রায় সমপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে ইয়ার্কি দেয়।

আপিস হইতে বাহির হইয়া আপিসের বাহিরের বিপর্যস্ত জীবন ভালো করিয়া তাকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার আগেই সে সোজা গিয়া হাজির হয় প্রভার কাছে।

ডাক্তারি ব্যাগের মুখ আটকাইয়া প্রভা বলে, আমি যে বেরিয়ে যাচ্ছি ? ডেলিভারি কেস—এখুনি যেতে হবে। কী ছেলেই বিয়োতে পারে বউগুলো। আর যেন তাদের কাজ নেই।

প্রভাকে বড়ো শ্রান্ত মনে হয়।

কতকাল থেকে ছেলে বিয়োনো দেখছি ! জন্মেই ছেলেগুলো কাঁদে—না কাঁদলে হয়। আমার কী মনে হয় জানো ? একটা ছেলে জন্মে যদি একটু হাসত !

তোমার ছেলে হয়তো—

প্রভা চোখ বড়ো বড়ো করিয়া বলে, আমার ছেলে ? ও সব পাবে না আমার কাছে। সময়মতো ছেলে হলেই টিকতাম কিনা সন্দেহ, এই বয়সে ছেলে বিয়োতে হলেই হয়েছে।

প্রভা ডাক্তার। প্রভা সব জানে।

ভূপেন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। আবার এক অন্ধ আশঙ্কা তার ভীরু মনের গভীরতায় লাফ দিয়া ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। প্রভা সরমার অভাব মিটাইতে পারিবে না। প্রভার কাছে সে তা চায় না। কিন্তু নন্তুকেও সে ফিরিয়া পাইবে না ? নন্তুকে আনিয়া দিতে হইলে নিজেকে প্রভার মরিতে হইবে ?

আট বছর প্রভার সঙ্গে যে সম্পর্ক সে মানিয়া আসিয়াছে, যার মধ্যে সে পাইয়াছে মনের বিশ্রাম, জীবনের বৈচিত্র্য, কল্পনার আশ্রয়, তার সমাপ্তির সম্ভাবনাতেই ভবিষ্যৎ তার কাছে কেমন যেন নীরস হইয়া গিয়াছে। প্রভার সঙ্গে এক বাড়িতে দিন আর এক শয্যায় রাত্রি কাটানোর কল্পনা পর্যন্ত তেমন উল্লাস ও উত্তেজনা জাগাইতে পারিতেছে না। নন্তুর মতো আব একজনকে পাওয়াব আশা প্রভার কাছে করা চলিবে না ভাবিয়া ভূপেন আরও বিষণ্ণ হইয়া যায়। এ যেন আরও একটা প্রমাণ যে আট-নবছর যেভাবে তারা কাটাইয়াছে তার পরিবর্তন তাদেব সহিবে না। লাভ হইবে না কিছুই, নষ্ট হইয়া যাইবে তাদের অমূল্য বন্ধুত্ব।

প্রভাও মুখ নিচু করিয়া ভাবিতেছিল, মৃদুস্বরে সে বলিল, এই একটা অসুবিধা আছে।

ভূপেন বলিল, তুমি কি এই জন্য সেদিন বলেছিলে, তোমার ভয় কবছে ?

ঠিক এই জন্য নয়। কী হবে ঠিক বুঝতে পারছি না। আমরা যদি মানিয়ে চলতে না পারি ?

আগে ভূপেন হয়তো সঙ্গে সঙ্গে এ কথার প্রতিবাদ করিত, হাসিয়া উড়াইয়া দিত কথাটা। তারা মানাইয়া চলিতে পারিবে না, সে আর প্রভা ! এখন সে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারিল না, দ্বিধাভরে শুধু বলিল, ঝগড়া আমাদের কখনও হবে না প্রভা।

প্রভা একটু হাসিল, ঝগড়া ? ঝগড়ার কথা কে ভাবছে ? ঝগড়া হবে বইকী---হওয়াই ভালো। আমি ভাবছি অন্যকথা। মনে মনে হয়তো দুজনেই বিরক্ত হব, হয়তো মনে হবে বেশ ছিলাম আমরা—

দুজনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। দুজনের মনেই যে আশঙ্কা পাক খাইয়া বেড়াইতেছিল, ভাষার মধ্যে স্পষ্ট হইয়া এতদিনে প্রকাশ পাইয়াছে। অস্বীকার কবিবার ক্ষমতা নাই, তুচ্ছ করিবার উপায় নাই।

অনেকক্ষণ পরে ভূপেন বলিল, ও সব ভয় সবারই হয় প্রভা। হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রভা বলিল, আগে হলে সব ঠিক হয়ে যেত। আমরা যে বুড়ো হয়ে গেছি।

এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দুজনে তারা সত্যই বুড়ো হইয়া পড়িয়াছে। নতুন অ্যাডভেঞ্চার শুরু করিবার বয়স তাদের আর নাই। তীব্র জ্বালা বোধের সঙ্গে ভূপেনের মনে হয়, তাদের এত ভয়-ভাবনার কারণও হয়তো তাই। জীবনের সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা হাতের মুঠায় আসিয়া পড়িলেও গ্রহণ করিতে তারা যে ইতস্তত করিতেছে, হিসাব করিতে বসিয়াছে ভবিষ্যতে কতখানি লোকসান দাঁড়াইবে, সে শুধু বয়স তাদের বেশি বলিয়া।

ও সব ভাবনা চুলোয় যাক প্রভা। যা ঘটবার ঘটবে, এখন থেকে ভেবে কোনো লাভ নেই।

তুমি তো বলছ লাভ নেই। আমি যে না ভেবে পারি না।

কথাটা ভূপেনকে আঘাত করে। এতক্ষণে তার যেন খেয়াল হয়, ভয়-ভাবনা শুধু তার একার নয়, প্রভার মনেও তারই মতো দ্বিধা জাগিয়াছে। নিজের পক্ষে তার কাছে যা ছিল একান্ত ন্যায়সঙ্গত চিন্তা, প্রভার মনে তার অস্তিত্ব তার অন্যায় মনে হয়। আনন্দে অধীর হইয়া দিন গোনার বদলে প্রভা তবে হিসাব করিতেছে সুবিধার ও অসুবিধার ? তার কথা আলাদা। তার সরমা ও নন্তু ছিল, বহুদিন সে বাধ্য হইয়া একটা বিশেষ জীবন যাপন করিয়াছে, প্রভার সঙ্গে আবার সেই পুরানো ধাঁচের জীবন নতুন করিয়া আরম্ভ করিবার আগে নানাকথা মনে আসার তার যুক্তি আছে। প্রভার কেন ভয় হইবে, ভাবনা জাগিবে ? এতকাল একা একা নিজেব ব্যর্থ অসম্পূর্ণ জীবন টানিয়া চলিয়া তার যখন সার্থকতার, পরিপূর্ণতার সময় আসিয়াছে ?

তোমার ভাবনার কী আছে বুঝতে পারি না প্রভা।

বুঝতে পারবে না। তুমি শুধু নিজের কথা ভাবছ।

হঠাৎ রাগ হল কেন ?

রাগ নয়। সেদিন রাগ হয়েছিল, কোথাও কিছু নেই হঠাৎ সেদিন এসে বলেছিলে, এক মাসের মধ্যে বিয়েটা সেবে ফেলি এসো। ও বিষয়ে যেন আমাব কিছু বলাবও নেই, করারও নেই। আমার মত আছে কিনা জিজ্ঞেস করারও দবকার মনে কবোনি।

আমি ধবে নিয়েছিলাম তোমাব মত আছে প্রভা।

তা জানি। তাই তো রাগটা কমে গেল। কিন্তু ও রকম ধরে নেবে কেন ? তুমি নিজের দিক থেকে সব কথা ভাব, আমার কথা ভাব না।

কব্জিতে বাঁধা ছোটো ঘড়িটাব দিকে চাহিয়া প্রভা চমকাইয়া উঠিল।

ইস্, কথায় কথায় দেবি হয়ে গেল।

ভূপেন বলিল, যেয়ো না প্রভা। আরও কথা আছে।

পরে কথা হবে। এখন সময় নেই।

সময় নাই। একটি নাবী বিপজ্জনক অবস্থায় ব্যথায় কাতব হইয়া পথ চাহিয়া আছে, তার সঙ্গে কথা বলিয়া সময় নষ্ট না কবাই প্রভার কর্তব্য। ভূপেন তা স্বীকার করে। বাড়ি ফিরিবার পথে সে তাই ভাবিতে থাকে, দুহাতে সে যখন প্রভাকে বুকে বাঁধিয়া রাখিবে তখনও প্রভা কি উৎকর্ণ হইয়া থাকিবে কখন টেলিফোনের ঘণ্টা বাজে ? অন্য এক নারীর সন্তান প্রসবে সাহায্য করিবার আহ্বান আসিলে মিলন স্থগিত বাখিয়া সে কি বলিবে, পবে আদর কোরো, এখন সময় নেই ?

পাঁচ

শীত শেস হইয়া আসিয়াছিল, কদিন হঠাৎ গরম পড়িয়াছে। হঠাৎ বলিয়া গরমটা অসহ্য মনে হইতেছে। শরীর কেমন জ্বালা করিতে আবম্ভ করিয়াছে। ভাঙা ভাঙা স্বপ্নময় ঘুমে বিশ্রাম না পাওয়ায় ভোঁতা আলস্য শরীরকে আশ্রয় করিয়াছে।

স্বর্ণের গায়ের রং আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ সময়েই শেমিজ সে গায়ে রাখিতে পারে না। গরমে এমন হাঁসফাঁস করে যে শাড়িখানি খুলিয়া রাখিতে পারিলেও যেন বাঁচে। মোটা হওয়ার আগে সে যে কী ভয়ংকর রূপসি ছিল ভাবিলেও মাথা ঘুরিয়া যায়। ভূপেন অবশ্য সে সময় তাকে দেখিয়াছিল, কিন্তু আজ কোনোমতেই একযুগ আগের স্বর্ণকে সে স্মরণ করিতে পারে না। তার মনে হয় স্বর্ণ যেন চিরদিন এমনই ছিল, অবিন্যস্ত একস্তূপ রূপলাবণ্যের মতো।

একটি মেয়ে একদিন জড়িত-পদে ভূপেনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, অনেকদিন আগেকার স্বর্ণ বলিয়া যাকে ভাবিলেও ভাবা যাইতে পারে। চোখ দুটি কেবল তার খুব বড়ো বড়ো সরমার যেমন ছিল।

মেয়েটিকে দেখিবার জন্যই সে যে এ বাড়িতে আসিয়াছে, ভূপেনের তা জানা ছিল না। একটা বাজে অজুহাত দিয়া অজিত তাকে এখানে ধরিয়া আনিয়াছে। বাড়ির লোকের কথাবার্তা চালচলন আর অতিরিক্ত আদর-যত্নের ভূমিকা প্রথমে তার শুধু একটু খাপছাড়া মনে হইয়াছিল। তারপর ছোটো একটি ছেলের সঙ্গে চিরপ্রচলিত প্রথায়, কোনোরকম সাজগোজ না করার সাজ করিয়া, মেয়েটি যখন নতমুখে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া ঘরে আসিয়া কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়াইয়া পড়িল, তখন সে বুঝিতে পারিল কী ঘটিতেছে। সমস্ত ব্যাপারটা এমন হাস্যকর মনে হইতে লাগিল তার ! অজিতও জানে না, এ বাড়ির উৎসুক মেয়ে-পুরুষেরাও জানে না, কত বছর ধরিয়া কনে তার ঠিক হইয়া আছে, কে তার ভবিষ্যৎ বধূ। জানিলে এই কিশোরীকে যাচাই করিবার জন্য সামনে ধরিয়া দিত না।

অজিতকে বলিলে কী চমকটাই তার লাগিবে !

কৌতুকের অনুভূতি কিন্তু তার অল্পক্ষণেই মিলাইয়া যায়। মেয়ে দেখা আর মেয়ে দেখানোর পুরানো রীতিগুলি চোখের সামনে ঘটিতে ঘটিতে তাব মনে পড়াইয়া দেয় বহুকাল আগে সরমাকে দেখিতে যাওয়ার কথা। মনে পড়ে, সেদিনও অজিত তার সঙ্গে ছিল। ঘরের আসবাব ও বসিবার ব্যবস্থাও প্রায় ছিল এই রকম, এমনিভাবে ঘরে ঢুকিয়া পুতুলের মতো দাঁড়াইয়া থাকিয়া বসিতে বলার পর এমনি সন্তর্পণে সরমাও সেদিন জড়োসড়ো হইয়া বসিয়াছিল। মুখ তুলিতে বলিলে এমনিভাবে ধীরে ধীরে সরমা মুখ তুলিয়াছিল, নাম জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দিতে গিয়া সরমার গলাও জড়াইয়া গিয়াছিল। বিন্দু বিন্দু ঘাম কী ফুটিয়াছিল সরমার মুখে ? ভূপেনের মনে নাই। মেয়েটি ঘামিয়া উঠিয়াছে।

বিবাহের পর কতদিন সবমা নিজেকে দেখানোর এই অভিজ্ঞতাব কথা বলিয়াছে। কীভাবে বুক টিপটিপ করে, মাথা ঝিমঝিম করে, দম আটকাইয়া আসে কিন্তু জোবে জোবে নিশ্বাস ফেলিতে ভয় হয়।

তোমায় ? মাগো, তখন আবার তোমায় দেখব ! আমি তখন শুধু ভাবছি, কতক্ষণে শেষ হয়, কতক্ষণে শেষ হয়।

শান্তির জন্য ভূপেন মমতা বোধ করে।

এবার ছেড়ে দাও, অজিত।

গাড়িতে উঠিয়া অজিত জিজ্ঞাসা করিল, পছন্দ হল না ? একে যদি তোমার পছন্দ না হয়—

পছন্দ হয়েছে বইকী।

হতেই হবে ! এ শর্মার আবিষ্কার তো।

এমন সুন্দরী মেয়ে খুব কম দেখা যায়।

ও বাবা, এর মধ্যে মজে গেছ ?

মজবার কথা নয় ? টুকটুকে আঙুল দিয়ে কখন পাকা চুল তুলে দেবে ভেবে ধৈর্য ধরছে না ভাই।

ও, তামাশা হচ্ছে ! তারপর ?

তারপর আর কী। ওরা জিজ্ঞেস করলে বলে দিয়ো, মেয়ে পছন্দ হয়েছে, কিন্তু পাত্র নেই। আমার ভাইপোটির বয়েস মোটে ন-বছর।

অজিত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, আধবুড়ি লেডি ডাক্তার ছাড়া তোমার পছন্দ হবে না জানলে ওদের কথা দিতাম না।

তাই উচিত ছিল।

তোমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পারছি। একটা কথা বলি শুনে রাখো। আমি এখনও মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ফুর্তি করে রাত কাটাই তবু বাড়িতে আমার সুখশান্তি আছে, তোমার

যা কস্মিনকালেও থাকবে না। তার কারণটা কি জানো ? পারিবারিক জীবনে কতগুলি নিয়ম মেনে চলি, সুখী হতে হলে সব শালাকে যে নিয়ম মানতে হয়। আরে রাখো তোমার তর্ক, ও সব জানা আছে আমার। কোথায় কী খাটে সে জ্ঞান তোমার আদৌ নেই। একটা কথার জবাব দাও তো আমার, খাওয়ার অনিয়ম করলে কদিন তোমার পেট ঠিক থাকে ? বাড়ির জীবনটা ডাল-ভাত খাওয়ার শামিল, রোজ পোলাও মাংস চলে না। সংসারী হওয়ার জন্য বিয়ে করবে, ঘরে আনবে একটা ত্রিশ বছরের লেডি ডাক্তার ! তার কোনো মানে হয় ? অন্য উদ্দেশ্যে বিয়ে করলে কোনো কথা ছিল না। প্রথম সংসার শুরু করলেও নয় বুঝতে পারতাম যাকে নিয়ে যেমন সংসার হোক খাপ খেয়ে যাবে। আনতে চাইছ নতুব মার জায়গায় আর একজনকে, যাকে আনছ তিনি একদম অন্যরকম। ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ ?

ভূপেন কথা না বলায় অজিত একটু নরম গলায় বলিল, প্রভার নিন্দে করছি না ভাই। ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে, ডাক্তারি করে, সেটা দোষের কথা নয়, আমার পিসির বয়স সাতচল্লিশ, তিনিও লেডি ডাক্তার। তবে যে যা, সে তা। তার তো কোনো উপায় নেই। তোমাদের বনবে না, এই হল আসল কথা।

বাড়ি ফিরিতেই স্বর্ণ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে ঠাকুরপো মেয়েটাকে ? ওকে দেখলে আমার কান্না আসে ঠাকুরপো।

কান্না আসে ?

আমার তো জানাশোনা, আমি জানি। ওর চালচলন কথাবার্তা সব যেন তার মতো, স্বভাবটি পর্যন্ত। কোথায় পেল কে জানে !

দেখিতে সরমার মতো নয়, সে রকম হওয়া এ জগতে কোনো মেয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়, তবে চালচলন, কথাবার্তা স্বভাব সব সরমার মতো। ভূপেন আশ্চর্য হইয়া যায়।

প্রভাকে বিবাহ করার কথা ভাবা যায় কিন্তু সরমার বিনিময়ে তাকে বাড়িতে আনিবার কথা সত্যই কল্পনা করা যায় না। এই মেয়েটিকে কিন্তু সেভাবে ভাবা চলে। বাড়ির সকলের সঙ্গে এক হইয়া যাইবে, খালি পায়ে নিঃশব্দে ঘরের কাজ করিয়া বেড়াইবে, খাটে গদির বিছানা থাকিতে দুপুরবেলা মেঝেতে আঁচল বিছাইয়া ঘুমাইবে, নিজেকে একেবারে লোপ করিয়া ধরা দিবে ঠিক সরমার মতো। প্রভা নয়, ঠিক এই মেয়েটির পক্ষেই যেন তা সম্ভব।

ঠাকুরপো, সে গিয়ে অবধি সবার বুক খালি, ঘর খালি। তার অভাব তো আর কাউকে দিয়ে পূর্ণ হবার নয়, তবু শান্তিকে তুমি ঘরে আনো, আমাদের প্রাণ একটু হালকা হোক।

বউদি ঘনঘন চোখ মুছিতে থাকে।

সন্ধ্যার পর ভূপেন প্রভাকে একবার ফোন করিল। প্রভার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাইয়া আসিবার জন্য মনটা তার উতলা হইয়া উঠিয়াছিল। প্রসন্ন খবর দিল প্রভা বাড়ি নাই, সকালে দশটার সময় বাহির হইয়া গিয়াছে, এখনও ফেরে নাই। বিকালে বাড়িতে প্রভা একবার ফোন করিয়া জানাইয়া দিয়াছে, কখন সে বাড়ি ফিরিতে পারিবে কিছুই ঠিক নাই। একটা জরুরি কেসে সে আটকা পড়িয়া গিয়াছে।

প্রসন্নর কাছে নম্বর জানিয়া ভূপেন রোগীর বাড়িতে প্রভাকে ফোন করিল।

প্রভা বলিল, কী করে ফিরব ? রোগীর আমার এখন তখন অবস্থা। কী কষ্ট যে পাচ্ছে বউটা, দেখলে তোমাদের পুরুষমানুষদের অভিশাপ দিতে ইচ্ছা হয়।

খট্ করিয়া প্রভার সাড়াশব্দ বন্ধ হইয়া গেল।

•

ঘরে বসিয়া ভূপেন ভাবিতে থাকে এবার কী করা যায়। কাজ করিতে, বই পড়িতে ভালো লাগে না, বন্ধুদের সঙ্গে গিয়া গল্পগুজবে সময় কাটানোর চিন্তাটাও সে বাতিল করিয়া দেয়। সিনেমায় যাইতে সে ভালোবাসে না।

কিছু ভালো লাগে না। বড়ো একা মনে হয় নিজেকে। সময় বুঝিয়াই যেন অভাববোধের পীড়নটা আরও জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। কাজের মধ্যে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা কবিবে ভাবিয়া কাজের ঘরে যাওয়ার জন্য জোর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার সে মত পরিবর্তন করে। জানালায় দাঁড়াইয়া শহরের আলোকমালার দিকে চাহিতে চাহিতে অল্প দূবে অন্য বাড়ির একটি আলোকিত ঘবের ভিতরে তার চোখ আটকাইয়া যায়। ক্যাম্প চেয়ারে কাত হইয়া একটি লোক চুপ কবিযা পড়িয়া আছে, মেঝেতে পা রাখিয়া খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে একটি মেয়ে। তার প্রসাবিত হাতের কনুই পর্যন্ত দেখা যায়, পুতুলের বালিশের মতো ছোটো একটি বালিশে কনুই রাখিয়া কী যেন করিতেছে মেয়েটি। ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেছে নিশ্চয়। ছোটো বালিশের ও পাশে নিশ্চয় একটি শিশু শুইয়া আছে, পড়িয়া যাওয়ার ভয়ে তাকে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে দেয়ালের দিকে খাটের শেষ প্রান্তে।

কেউ নড়ে না। না পুরুষটি, না তার বউ। আট-দশমিনিট পরে বউটি সোজা হইয়া দাঁড়ায়, ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক একটু নড়াচড়া করিয়া বাহিরে চলিয়া যায়—দুজনের মধ্যে একটি কথাও হয় না। পুরুষটি তেমনিভাবে পড়িয়া থাকে, একটা সিগারেট ধরাইয়া অর্ধেক টানিয়া নিভাইয়া রাখে। কিছুক্ষণ পরে বউটি আসিয়া এক কাপ চা লোকটির হাতে দিয়া আবার চলিয়া যায়, দাঁড়ায় না, গল্প করে না, ফিরিয়া তাকায় না। তারপর বহুক্ষণ সময় কাটিযা যায়, বউটি আসে না। চা শেষ করিয়া পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া লোকটি আবার সেই আধখানা সিগারেট খায়, মাঝে মাঝে উঠিযা খাটে উপুড় হইয়া বোধ হয় ছেলেকেই একটু থাপড়াইয়া আবাব ক্যাম্প চেয়ারে চুপ কবিয়া বসিয়া থাকে। এমন চুপচাপ বিনা কাজে মানুষ একা কী করিয়া বসিয়া থাকিতে পাবে ভাবিয়া ভূপেন অবাক হইযা যায়। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাব পায়ে ব্যথা ধরিয়া যায় তবু সে জানালা ছাড়িযা নড়িতে পাবে না। খারাপ লাগে না লোকটাব ? একা মনে হয় না নিজেকে ? একটা বইয়ের পাতা উলটানোব প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করে না ?

বহুক্ষণ পরে একটা ছোটো বাটি হাতে বউটি ঘরে আসে। ছেলেকে খাওয়ানোব জন্য দুধ আনিয়াছে বুঝিতে কষ্ট হয় না। কী যেন সে বলে লোকটিকে, সে কথা বলে না কিন্তু মুখে তাব হাসি দেখা দেয়।

প্রতিদিন হয়তো এমনিভাবে লোকটি সন্ধ্যা যাপন করে, চুপচাপ একা বসিযা ছেলেকে পাহাবা দিয়া। বন্ধু, কাজ, বই কিছুই তার দরকার হয় না। কেন দবকার হয না এতক্ষণে ভূপেন তা বুঝিতে পারিয়াছে। একাকিত্বের অনুভূতি লোকটির জাগে না। ছেলে তাব সামনে খাটে শুইয়া ঘুমাইতেছে, কখন ঘুম ভাঙিয়া কাঁদিয়া উঠে ঠিক নাই। বউ তার ঘরের কাজ করিতেছে, কখন ঘরে আসে ঠিক নাই। নাও যদি ঘরে আসে, যখন খুশি নাম ধরিয়া ডাকিলেই আসিবে। না ডাকিলেও কাজ শেষ করিয়া বাহিরের সব প্রয়োজন মিটাইয়া সমস্ত রাত্রির জন্য সে তো আসিবেই—যত সময় যায় ততই তার সেই আসিবার সময় কাছে আসে। সারাদিন হয়তো সে আপিসে খাটিয়াছে, ক্যাম্প চেয়ারে গা এলাইয়া মনকে শিথিল করিয়া চুপচাপ পড়িয়া থাকাই লোকটির কাছে পরম উপভোগ্য বিশ্রাম। সময় কাটানোর কোনো উপলক্ষই হয়তো সে চায় না। একাই সে থাকিতে চায়।

তাই বটে। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত সরমা যদি ঘরে না আসিত, এ রকম একা কী মনে হইত তার নিজেকে ? সরমা বাড়িতে আছে, কাজ অথবা গল্পে ব্যস্ত হইয়া আছে, নন্তুকে লইয়া জ্বালাতন হইতেছে, শুধু এইটুকু জানা থাকিলেই কি এই একাকিত্বের ভার অনেক হালকা হইয়া যাইত না ? ওই লোকটির মতো চুপচাপ হয়তো বসিয়া থাকিতে তার ভালো লাগিত না, নন্তুকে পাহারা দিয়াও নয়, কিন্তু এমন ভোঁতা যন্ত্রণাদায়ক বিষাদ তার জাগিত না নিশ্চয়।

ঘরের দেয়ালে সরমার প্রকাণ্ড একটি ফটো টাঙানো আছে। তার পাশে নন্তুর ছোটো একটি ফটো। শোয়ার ঘরে ভূপেন খুব কম আসে। সরমার ফটোর দিকে সে তাকায় না, ইচ্ছা করিয়াই

তাকায় না। আজ জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে বহুক্ষণ সে সরমার ফটোর দিকে চাহিয়া রহিল। না, সরমাকে সত্যই সে ভালোবাসে নাই, প্রভাকে যেমন ভালোবাসে। কিন্তু সরমা তার জীবনের অনেকখানি জুড়িয়া ছিল। তার দৈনন্দিন ধরাবাঁধা জীবনে অতখানি অধিকার বিস্তারের ক্ষমতা প্রভারও কোনোদিন হইবে না।

অনিবার্য অবিরাম মোহের মতো প্রভা তার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, প্রভা আজ মরিয়া গেলে তার জীবনীশক্তি ঝিমাইয়া পড়িবে, চেতনা স্তিমিত হইয়া আসিবে। সরমা মরিয়া যাওয়ায় তার কষ্ট হইতেছে, অসহ্য কষ্ট হইতেছে। দিনান্তে একত্র বসিয়া প্রভার সঙ্গে দু-দণ্ড কথা বলিতে না পারিলে সে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, সরমাকে সর্বদা কাছে না পাওয়ায় জীবনটাই তার দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে।

প্রভা সরমা হইতে পারিবে না। ওই অজানা অচেনা শান্তি মেয়েটি হয়তো সরমাকে নকল করিতে পারে, প্রভা পারিবে না।

কাজের ঘরে যাওয়ার জন্য বারান্দায় আসিতেই সংসারের বিচিত্র কলরব ভূপেনের কানে আসে। পিসি কাকে বকিতেছে। কমলা শিখিতেছে গান। পাশের ঘরে বিমলা আর স্বর্ণ কথা বলিতেছে। নীচের ঘরে ছোটো ছেলেমেয়েরা গোলমাল করিতেছে। মা ঠকঠক করিয়া হামানদিস্তায় গুঁড়া করিতেছেন পানের মশলা। রান্নাঘর হইতে শব্দের বদলে ভাসিয়া আসিতেছে সম্ভারের তীব্র সুবাস। উপেনের সিগারের কড়া গন্ধও সেই ঝাঁঝালো সুবাসের নীচে প্রায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

নিয়ম আছে। সুখের সংসার পাতিবার কতগুলি নিয়ম আছে, চোখ-কান বুজিয়া সেগুলি মানিয়া চলিতে হয়। অজিত এই কথা বলিয়াছিল। বলিয়াছিল, নিয়মগুলি সে সাধনার মতো মানিয়া চলে বলিয়া সে সুখী। সাংসারিক সুখ-শান্তির আতিশয্যে অজিতের যে সত্যই ছোটোখাটো একটি ভুঁড়ি গড়িয়া উঠিতেছে তাও চোখ মেলিয়া চাহিলেই দেখা যায়। তার কথাই কি ঠিক? সুখী হওয়া কি এত কঠিন আর সহজ? আট-নবছর ধরিয়া ভালোবাসার ব্রত পালন করিবার পরেও যাকে ভালোবাসা যায় তাকে লইয়া সংসার পাতিয়া সুখী হওয়া যায় না, অজানা অচেনা শান্তিকে লইয়া অনায়াসে পাতা যায় সুখের সংসার?

হয়তো তাই। সংসারে ভালোবাসার স্থান নাই। সুখশান্তির সঙ্গে সম্পর্ক নাই ভালোবাসার।

হঠাৎ-পড়া গরমের পর দুদিনের জন্য বসন্তের নাতিশীতোষ্ণ বাতাস বহিতে শুরু করিল। যার বসন্ত শুধু তাকে তোলা কাব্যের পাতায় থাকে, তাকেও স্বীকার করিতে হইল বসন্তের বাতাসে দেহমনের কমবেশি কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মন উড়ুউড়ু না করুক, অন্তত ক্ষুধা আর উৎসাহ যে একটু বাড়িয়াছে বেশ বুঝা যায়।

বিকালে প্রভা নিজেই ভূপেনকে তার বাড়ি যাইতে বলিয়াছিল। বিকালে ভূপেন গিয়া শুনিল, দুপুরে সে কোথায় বাহির হইয়াছে, সন্ধ্যার আগেই ফিরিবে।

প্রসন্ন বলিল, তোমায় বসতে বলে গেছে।

ভূপেন বলিল, আসতে না বললেই হত।

প্রসন্নও মুখভার করিয়া বলিল, ওর ওই রকম স্বভাব।

প্রসন্ন নিন্দা করায় ভূপেন তখন প্রভাকে সমর্থন করিয়া বলিল, ডাক এলে না গিয়ে তো উপায় নেই। রোগীর কথা আগে ভাবতে হবে বইকী।

প্রসন্ন একটা নিশ্বাস ফেলিল। সে বড়ো আশ্চর্য নিশ্বাস, এত বেশি ক্ষোভে ভরা যে শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় নিশ্বাসটা ক্ষোভের, হতাশার নয়।

ওকে ডাক্তারি পড়িয়েই ভুল করেছি ভাই। ভাই বিগড়ে যায় সেটা তেমন লাগে না, সে ব্যাটাছেলে। বোন যা খুশি তাই শুরু করলে সয় না। কিছু বলারও উপায় নেই। নিজে রোজগার করে, কারও অধীন তো নয়।

ভূপেন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকে। তার কাছে প্রসন্ন প্রভার সম্বন্ধে এমন কথা বলিতে পারে, কানে শুনিয়াও তার বিশ্বাস হইতে চায় না।

প্রসন্ন ধীরে ধীরে কামানো চিবুকে হাত বুলায়, বিষণ্ণ চিন্তিত মুখে অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলে, ভাবি আর আপশোশ হয়, সময়মতো বিয়ে দিয়ে ওকে যদি সংসার পেতে সুখী হবার সুযোগ দিতাম ! এ সব বিকার জন্মে জীবনটা ওর মাটি হয়ে যেত না। ধীরেন মিত্রের সঙ্গে কী সব কাণ্ড আরম্ভ করেছে আবার। একটা মাতাল গুন্ডা লোক, আত্মীয়স্বজন যাকে বাড়ি ঢুকতে দেয় না, তার সঙ্গে মাখামাখি শুরু করলে দশজনে বলবে না দশকথা ! তোমায় বলব কী ভাই, মানুষকে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা করে।

কী বলছেন প্রসন্নদা ? কিছুই বুঝতে পারছি না তো ?

থাকগে, বলে কাজ নেই। এতকাল চুপ করে আছি, চুপ করে থাকাই ভালো।

প্রসন্নের উদ্দেশ্য ভূপেন বুঝিতে পারে না। এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা না করিলেও প্রসন্ন নিশ্চয় অনুমান করিতে পারিয়াছে অল্পদিনের মধ্যেই প্রভাকে সে বিবাহ করিবে। এ সময় প্রভার বিরুদ্ধে এ সব বিশ্রী কথাগুলি তাকে জানানোর মানে কী ?

প্রভার সম্বন্ধে সে কি তাকে সাবধান করিয়া দিতে চায় ? বলিতে চায়, আমার বোনটি অতি খারাপ মেয়ে, তাকে নিয়ে তুমি বিপদে পড়বে, অতএব বুঝেসুঝে কাজ করো ? নিজের বোনের ক্ষতি করিয়া তার ভালো করার জন্য প্রসন্নের এতখানি আগ্রহ অতি খাপছাড়া মনে হয় ভূপেনের। সে অবশ্য বিশ্বাস করে না এ সব কথা, প্রভার সঙ্গে তার দুদিনের পরিচয় নয়, তবু এই রকম ধারণাই যদি বোনের সম্বন্ধে প্রসন্নের হইয়া থাকে, চুপ করিয়া থাকাই তো তার উচিত ছিল। সময়মতো বিবাহ দিয়া বোনকে সংসারী ও সুখী করে নাই বলিয়া যদি তার আপশোশ, আজ বোনের সংসারী ও সুখী হওয়ার সম্ভাবনা যখন দেখা দিয়াছে, সে সম্ভাবনাকে প্রসন্ন নষ্ট করিয়া দিতে চায় কেন ?

তাছাড়া প্রসন্ন কি ভুলিয়া গিয়াছে আজ কতকাল প্রভার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা, প্রভার সম্বন্ধে কিছুই তার অজানা নাই ?

মুখ গম্ভীর করিয়া ভূপেন বলিল, প্রভার যা প্রফেশন, তাতে ভালোমন্দ সবরকম লোকের সঙ্গেই ওকে মিশতে হয় প্রসন্নদা। কে কেমন মানুষ, অত হিসাব করে ডাক্তারি চলে না।

তা কি আমি জানি না ভাই ? সে রকম হলে তো কথাই ছিল না। পরশু ধীরেন মিত্রের বাগানবাড়িতে রাত একটা পর্যন্ত কাটিয়ে এল।

কী বলছেন পাগলের মতো ?

পাগলের মতোই বলছি ভাই। পাগল না হলে বোনের নামে এমন কথা কেউ বলতে পারে ? তুমি পর নও ভূপেন, তুমিও ওর দাদার মতো। আমায় ও মানে না, কিন্তু তোমায় শ্রদ্ধা করে, তোমার কথা শোনে। তুমি চেষ্টা করে হয়তো ওকে শুধরে নিতে পার।

প্রভা তো ছেলেমানুষ নয় প্রসন্নদা। ওর প্রায় ত্রিশ বছর বয়স হতে চলল।

অ্যাঁ? তা বটে। সে কথা মিথ্যে বলনি। কী জান ভূপেন, কথাটা আমি ভুলেই যাই। এখনও মনে হয় ও যেন ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। যাই হোক, তুমি যেন ওকে বোলো না, আমি তোমায় কিছু বলেছি। রাগ হলে ওর আবার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

প্রসন্ন উঠিয়া যায়। ভূপেন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। প্রভা তাকে শ্রদ্ধা করে, তার কথা শোনে। সে পর নয়, প্রভার সে দাদার মতো। সে চেষ্টা করিলে এখনও প্রভাকে শুধরাইতে পারে। এ সব

ভাবিয়াই কি প্রসন্ন প্রভার সম্বন্ধে বিশ্রী কথাগুলি তাকে জানাইয়াছে ? সে কি তবে জানে না তার আর প্রভার মধ্যে কী বুঝাপড়া হইয়া গিয়াছে ?

আধঘণ্টা পরে প্রভা আসিল, তথাকথিত ধীরেন মিত্রের গাড়িতে স্বয়ং ধীরেন মিত্রের সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যে একেবারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাজির হইবে জানিয়াই যেন প্রসন্ন ঠিক সময় বুঝিয়া প্রভার নামে তার অভিযোগগুলি ভূপেনকে জানাইয়া দিয়াছিল। প্রসন্ন কী জানে না পুরুষের মন কী রকম সন্দেহপ্রবণ ! তার কাছে অত কথা শোনার পর একেবারে চোখের সামনে ধীরেন মিত্রের দামি মোটর গাড়ি হইতে নামিয়া আসিতে দেখিলে ভূপেনের মনটা যদি বিগড়াইয়া যায়, প্রসন্নর বিপদটাও হয়তো ফসকাইয়া যাইতে পাবে।

ধীরেন বলিল, কেমন আছেন ভূপেনবাবু ?

ভালো আছি।

ভূপেনকে প্রভা কিছুই বলিল না। ব্যস্তভাবে ভিতরে যাইতে যাইতে ধীবেনকে শুধু বলিয়া গেল, একটু বসুন ধীরেনবাবু, আসছি।

দুজনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, গায়ে পড়িয়া আলাপ জমানোর চেষ্টা ধীরেন আর করে না। ভূপেন সত্যই বড়ো আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। মনের মধ্যে ক্ষীণ একটা প্রতিবাদ জোরালো হইয়া উঠিয়া ক্রমে ক্রমে প্রভার ব্যবহারের ক্রুদ্ধ অসমর্থনে পরিণত হইয়া যাইতেছিল। সত্যই এটা তো উচিত নয় প্রভার। প্রভাকে সে সন্দেহ করে না বটে কিন্তু ধীরেনের মতো মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করাই তো তার উচিত নয়। এবং কারও বলিয়া দিবার অপেক্ষায় না থাকিয়া নিজেরই তার এটা বুঝা কর্তব্য ছিল। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যাকে এড়াইয়া চলে তার সঙ্গে মোটরে চাপিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে যে মানুষ সত্যসত্যই নিন্দা করিবে এটুকু বুঝিবাব মতো বুদ্ধি প্রভার নিশ্চয় আছে।

প্রভা নামিয়া আসিয়া এক টুকরা কাগজ ধীরেনের হাতে দিল, তারপর মৃদুস্বরে কথা বলিতে বলিতে ধীবেনের সঙ্গে আগাইয়া গেল বাহিরের বারান্দা পর্যন্ত।

ভূপেন জানে এ সব কিছু নয়। কিন্তু জানিয়াও মনটা তার কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠে। ধীবেনকে প্রভাব এমন নির্বিকাবভাবে গ্রহণ করা, ধীরেনের সঙ্গে তার এমন সহজ সম্পর্ক বজায় রাখা তার কাছে প্রভার স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বকে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে থাকে। প্রভাব এই ব্যক্তিত্বই ভূপেনের সবচেয়ে বিপজ্জনক মনে হয। ধীবেনেব দুর্নাম আছে কি নাই প্রভা হযতো তা গ্রাহ্যও করে না। নিজে যদি সে মনে করে ধীরেনের সঙ্গে মেলামেশা চলিতে পারে, ধীরেনের সঙ্গে মেলামেশা সে করিবেই।

ধীবেনেব বাগানবাড়িতে রাত্রিযাপনেব কথাটা ভূপেন মনের তাকে তুলিয়া রাখিযাছিল, কথাটা বিশ্বাস করিবে কী অবিশ্বাস করিবে কিছুই ঠিক করে নাই। কথাটা সত্য হইলেও তার মানে কী দাঁড়ায় ভাবিবার চেষ্টা সে করে নাই। ধীবেনের সম্পর্কে ওদিক দিয়া কোনো পীড়াদাযক চিন্তা মনে আনিবারও যে প্রয়োজন নাই, এ ধারণা ভূপেনের নাড়া খায় নাই। তাব বউ হওযার আয়োজন করিতে করিতে প্রভা আর একজনের বাগানবাড়িতে শখ করিয়া বাত কাটাইতে যাইবে, এ চিন্তা মনে আনাও ভূপেনের হাস্যকর মনে হয়।

তবে প্রভাকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার কী হইয়াছিল। শুধু কৌতূহল মেটানোর জন্য জিজ্ঞাসা করা, আর কিছু নয়।

পরশু রাত্রে কোথায় ছিলে প্রভা ?

একজনকে ছেলে বিয়োতে হেল্‌প করছিলাম। আমার আর কাজ কী ! প্রভা হাসিল, বলিল, চলো, ওপরে যাই।

প্রসন্ন তবে মিথ্যা বলিয়াছে। প্রভা রোগীর বাড়িতে ছিল, ধীরেনের বাগানবাড়িতে নয়। হয়তো কিছু না জানিয়াই প্রসন্ন ধরিয়া লইয়াছে যে রাত্রে প্রভা ধীরেনের বাগানবাড়িতে ছিল। নয়তো প্রভাকে জিজ্ঞাসা করিলেই ধরা পড়িয়া যাইবে জানিয়া তার কাছে সে মিথ্যা বলিবে কেন ?

উপরে গিয়া ভূপেনকে ঘরে বসাইয়া প্রভা হঠাৎ বলিল, পরশু রাত্রির কথা জিজ্ঞেস করলে কেন ? ধীরেনবাবুর বাগানবাড়িতে ছিলাম শুনেছ বুঝি ?

ভূপেন নীরবে সায় দিল।

তবে যে জিজ্ঞেস করলে কোথায় ছিলাম ?

বাগানবাড়িতে ছিলে বিশ্বাস হয়নি।

বিশ্বাস হয়নি ? ও !

প্রভা স্থিরদৃষ্টিতে ভূপেনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, দ্বিধা আর প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে। কী যেন বুঝিতে চাহিয়া সে বুঝিতে পারিতেছে না।

ধীরেনবাবুর বাগানবাড়িতেই ছিলাম।

কোনো কারণ ছিল নিশ্চয়।

কী মানুষ তোমরা ! তবু কিছুতে স্বীকার করবে না মনে খটকা বেধেছে ! আমি পাছে কিছু মনে করি তাই সন্দেহ করতে ভয় হচ্ছে, না ?

অত হিসেব করে কেউ সন্দেহ করে নাকি প্রভা ? সন্দেহ, অবিশ্বাসের কথা আমি ভাবিনি, ও সব বাদ দাও। তবে কাজটা তুমি সত্যি খুব অন্যায় করেছ।

সব না শুনেই বলছ অন্যায় ?

শুনেও তাই বলব।

বেশ, আগে শুনে নাও। ধীরেনবাবু ওখানে একটি মেয়েকে রেখেছেন। ভগবান জানেন কার মেয়ে, কোথা থেকে জুটিয়েছেন। পরশু সারারাত কষ্ট পেয়ে কাল ভোরে ওই মেয়েটার একটি ছেলে হয়েছে। নটা-দশটার সময় আমি গিয়েছিলাম, তারপর আর ফিরে আসার উপায় ছিল না। আমি ফেলে চলে এলে মেয়েটা মরেও যেতে পারত।—অন্যায় করেছি ?

নিশ্চয়। একজন পুরুষ ডাক্তারকে ডাকিয়ে তুমি অনায়াসে চলে আসতে পারতে।

কেন ? নিজের রোগীকে অন্য ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসব কেন ?

সংসারে থাকতে হলে কতগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয় প্রভা। এমনিই কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে দরকার মতো সারারাত থেকে এলে কেউ কিছু বলার সুযোগ পায় না। কিন্তু ধীরেন মিত্তিরের বাগানবাড়িতে তুমি রাত কাটিয়েছ শুনলে লোকে কী বলবে ভেবে দেখেছ ? ব্যাপারটা এমনিই তো কুৎসিত, তাছাড়া চাপা দেবার চেষ্টাও করা হয়েছে নিশ্চয় ? তুমি ছাড়া আর যদি ডাক্তার না পাওয়া যেত তবে অন্য কথা ছিল। ব্যাপারটা যাতে জানাজানি না হয় সেই জন্যই তো ধীরেন তোমাকে নিয়ে গেছে।

আমার অত সব ভাববার তো দরকার নেই। ডাক্তার হিসেবে আমায় ডেকেছে, ডাক্তার হিসেবে আমি গেছি। কে ডেকেছে, কোথায় ডেকেছে, আমার তা দেখবার দরকার নেই।

গয়না কেড়ে নেবার মতলবে একটা গুন্ডা যদি তোমায় ডাক্তার হিসাবে ডাকে, জেনেশুনেও যাবে তুমি ?

ছেলেমানুষের মতো কথা বোলো না।

প্রভা উঠিয়া যায়। ভূপেন জানে, সে এখনই ফিরিয়া আসিবে, শুধু আলোচনাটা বন্ধ করিবার জন্য সে উঠিয়া গেল। আসিয়া হয়তো বলিবে, তোমার জন্য চা আনতে বলেছি, চা খাবে তো এখন ? বলিয়া এতক্ষণের তর্ককে একেবারে বাতিল করিয়া নূতন বিষয়ে কথা আরম্ভ করিবে।

যতক্ষণ প্রভা সামনে বসিয়া কথা বলিতেছিল প্রতি মুহূর্তে তার মনে কী ভাবের উদয় হইতেছে ভূপেন স্পষ্ট অনুমান করিয়া যাইতেছিল। আগেও এটা সে খেয়াল করিয়াছে। প্রভা কী বলিবে, তার কথা শুনিয়া প্রভার মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া জাগিবে, আগে হইতেই সে যেন তা জানিতে পারে। সবদিন নয়, মাঝে মাঝে। যেদিন প্রভার সঙ্গে কোনো বিশেষ কথা আলোচনা করিবার থাকে অথবা যেদিন প্রভাকে দেখিবার জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে, সেইদিন। হয়তো এই সব বিশেষ দিনে তার মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমস্ত জগতের সঙ্গে সম্পর্ক প্রত্যাহার করিয়া শুধু প্রভাকে আশ্রয় করে বলিয়া এটা সম্ভব হয়, প্রভার চোখের পাতা কাঁপিয়া গেলে, অধরোষ্ঠের মিলন রেখার তুচ্ছ একটু ব্যতিক্রম ঘটিলে তাও তার চোখ এড়ায় না, সে মানে বুঝিতে পারে। এমনিভাবে কিছু না জানিয়াও সে জানিতে পারিয়াছিল প্রভা তাকে ভালোবাসে। এমনভাবে জানিতে পারিয়াছিল যে মাঝে মাঝে তার মনে হইত পৃথিবীর সমস্ত মানুষও বুঝি জানিতে পারিয়াছে তার ভালোবাসার কথা, এত স্পষ্ট ছিল প্রভার নিঃশব্দ ভাষাহীন ঘোষণা !

আজ আগাগোড়া ভূপেনের মনে হইতেছিল, প্রভা তাকে কী যেন একটা আঘাত দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। এখন একা বসিয়া এই আশঙ্কাটাই তার প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। কোন দিক দিয়া কীভাবে আঘাতটা আসিবে সে বুঝিতে পারে না, কিন্তু তাকে যে মর্মাহত হইতে হইবে এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইয়া থাকে। অজানা বিপদের প্রতীক্ষা করার মন লইয়া সে প্রভার ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

প্রভা ফিরিয়া আসিয়া বলে, চা আনতে বললাম আর সন্দেশ। বাড়িতে তৈরি।

ভূপেন বলিল, আমিও তাই ভাবছিলাম। সন্দেশের কথাটা বাদে।

প্রভা বলিল, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে আমার।

ভূপেন বলিল, আমি তাও ভাবছিলাম প্রভা।

বাহিরে শান্তভাব বজায় রাখিয়া ভূপেন উদ্‌বেলিত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করে। ছোটো টিপয়টিতে প্রভা হাত রাখিয়াছে, তার হাতের আঙুলগুলি আশ্চর্যরকম কোমল ! কে বলিবে হাতটি একজন ডাক্তারের, অতি অনমনীয় কঠোর প্রকৃতির ডাক্তারের, যে স্ত্রীলোক হইয়াও স্ত্রীলোক নয়।

প্রভা চুপ করিয়া আছে দেখিয়া ভূপেন একটু আশ্চর্য হইয়া গেল। আঘাত দিতে সে তো কখনও ইতস্তত করে না।

কী বলছিলে প্রভা ?

বলছিলাম, আমাদের ওটা ছ-মাস এক বছর পিছিয়ে দেওয়া যাক। তাড়াতাড়ি করার কী আছে !

তাড়াতাড়ি ! আট বছর অপেক্ষা করার পরেও প্রভার আজ তাড়াতাড়ি মনে হইতেছে ! রাগ করিবে ভাবিয়াও কিন্তু ভূপেন রাগ করিতে পারে না। একটু অভিমান পর্যন্ত তার জাগে না। প্রভার কথা শুনিয়া তার অনুভূতির জগতে হঠাৎ এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়া যায়, কতগুলি অনুভূতি যেন বাঁধা তারের মতো অতিরিক্ত মোচড়ে টনটন করিতেছিল, হঠাৎ ঢিল হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন হইতে একটা যে অস্বাভাবিক উত্তেজনা তাকে পীড়ন করিতেছিল, সর্বদা শ্রান্তি আর বিরক্তিবোধ মেজাজ খারাপ করিয়া রাখিয়াছিল, সমস্ত মিলাইয়া গিয়া সে শুধু অনুভব করে অবসন্নতা। বারবার মনে হইতে থাকে, আরও ছ-মাস এক বছর কোনো পরিবর্তন দরকার হইবে না, আরও কিছুকাল প্রভাকে আগের মতো কাছে পাওয়া যাইবে।

সেও কি বিবাহের দিন পিছাইয়া দিতে চাহিয়াছিল ? প্রভা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিয়াছে, সে শুধু ইচ্ছাটা মনের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল ?

বেশ, তাই হবে। ভূপেন বলে।

তুমি এত সহজে রাজি হবে ভাবিনি। রাগ করবে না ?

না। তোমার ওপর কখনও রাগ করেছি প্রভা ?

একটা শুধু ভয় আছে আমার। আবার পাগলামি করবে না তো, যেমন আরম্ভ করেছিলে ?

ভূপেন মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িল।—এই জন্যে তুমি রাজি হয়েছিলে, না ? আমাকে বাঁচাবার জন্যে ?

শুদু ওই জন্যে নয়।

ঠাকুর চা সন্দেশ আর জলের গ্লাস রাখিয়া গেল। ভূপেন খেয়াল করিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল জীবনের এমন গুরুতর ব্যাপারের যখন নিষ্পত্তি হইতে থাকে তখনও পেটের তাগিদ চাপা পড়ে না, তার রীতিমতো ক্ষুধা পাইয়াছে !

মুখে তুলিবাব জন্য সন্দেশের প্লেটেব দিকে সে হাত বাড়াইতে যাইতেছে, প্রভা উঠিয়া আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া নিজেই তার মুখে সন্দেশ তুলিয়া দিল।

ঠাকুর তখন চলিয়া গিয়াছে।

শুধু ওই জন্যে নয়। কী যে হয়েছে আমার, ভালো বুঝতে পাবি না। তোমায় নিয়ে কত রকম স্বপ্ন দেখি, কত কল্পনা করি, কিন্তু সত্যি সত্যি সব ঘটবে ভাবতে গেলেই কেমন ভয় হয়। মনে হয়, যেমন ভাবি সে রকম কিছুই হবে না, বিশ্রী লাগবে শেষ পর্যন্ত।

চেয়ারের পিছনে সরিয়া গিয়া প্রভা ভূপেনের কাঁধে দুটি হাত রাখে। আমি ভাবছি, বিয়েতে কাজ নেই। অত ধরাবাঁধার মধ্যে আমরা যেতে পাবব না। তার চেয়ে বরং—

তাও আমরা পারব না প্রভা।

কপালে হাত রাখিয়া ভূপেনের মাথা নিজেব শবীবে চাপিযা বাখিযা প্রভা অনেকক্ষণ তেমনইভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপব অতি ক্লান্ত অতি মৃদু স্বরে বলিল, তা জানি। কিন্তু থাকতে পারছ না বলে তুমি যে পাগলামি শুরু করে দিয়েছিলে আবার কী ঝোঁক চাপবে তোমাব কে জানে। তার চেয়ে সব কিছুই ভালো।

আর পাগলামি করব না প্রভা।

কানের কাছে মুখ নামাইয়া প্রভা ফিসফিস কবিয়া বলিল, শোনো। তোমায় জানিয়ে রাখি। আজ থেকে আমি তোমার হয়ে রইলাম। যেদিন খুশি, যখন খুশি, আমাকে চাইলেই পাবে। বাত দুটোব সময় তুমি যদি আমায় ফোন করে ডাকো, ট্যাক্সি না পাই পাযে হেঁটে আমি তোমাব কাছে চলে যাব। তুমি কিন্তু শান্ত হয়ে থাকবে, নিজেকে ধ্বংস করতে পাববে না। কেমন ?

ছয়

জীবনে যতদিন স্বাদ-গন্ধ থাকে, মানুষের মনে হয় জীবনকে সে আয়ত্ত করিয়াছে, জীবন-কাব্যের সেই কবি। যে রকম স্বাদ-গন্ধই থাক, কটু অথবা মধুর, পাঁকের অথবা গোলাপের। স্বাদ-গন্ধ যখন উবিয়া যায়, প্রত্যাশা অথবা বিস্ময়ের দিন হয় শেষ, তখন মানুষের খেয়াল হয় জীবন তার অধিকারের বাহিরে, নিজের জীবনে নিজে সে কিছুই নয়।

প্রভার সঙ্গে শেষ বুঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। বুঝিবার বা বুঝাইবার আর কিছুই বাকি নাই। স্বপ্ন আর কল্পনা সৃষ্টির কারখানায় বিচিত্র উপাদান সর্ববারের খেলা পরামর্শ করিয়া দুজনে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। অনির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্ভাবনাকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া দাঁড় করানো হইয়াছে একটি মাত্র বাস্তব ও নির্দিষ্ট সম্ভাবনায়। যেদিন খুশি, যখন খুশি, চাহিলেই প্রভাকে পাওয়া যাইবে। চাহিবার সংকোচ জয় করিতে হইবে না, না পাওয়ার ভয়ে কাতর হইতে হইবে না, প্রতীক্ষায় অধীর হইতে হইবে না, কোনো

আয়োজন করিতে হইবে না। এখন শুধু আছে চাওয়া এবং পাওয়া। তাছাড়া সমস্তই বাহুল্য, অনাবশ্যক। দুজনের মধ্যে সব ব্যবধান সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে ছড়ানো দিগন্তের যেদিকে খুশি মুখ করিয়া রওনা হওয়া, কাছে আসা আর দূরে যাওয়া, পথ ভোলা আর পথ খোঁজা, নদী মাঠ বন উপবন সাগর ও পাহাড় পার হওয়া, এ সবের আর প্রয়োজন নাই, তার আর প্রভার মধ্যে সোজা লাইন পাতা হইয়া গিয়াছে।

ভূপেন ভাবিতেও পারে নাই, এত সব রোমাঞ্চকর সম্ভাবনার এমন ভোঁতা পরিণতি হইবে। তার জানাও ছিল না প্রেম বাড়ে কমে, বাঁচে মরে। সেদিন প্রভার কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিবার সময়ও সে কিছু টের পায় নাই। একটা গুরুতর জটিল সমস্যার অতি সহজ ও সুন্দর মীমাংসা হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া তখন কেবল নিশ্চিন্ত হওয়ার শান্তিই সে অনুভব করিয়াছিল। সেই সঙ্গে ছিল প্রভার সঙ্গে সমস্ত বিরোধের অবসান ও সর্বাঙ্গীণ বুঝাপড়ার আনন্দ। শান্ত মধুর এক অনির্বচনীয় পুলকের মধ্যে কয়েকটা দিন তার কাটিয়া গিয়াছিল, মনে হইয়াছিল পৃথিবী কী সুন্দর, গৃহ কী মনোরম, বাঁচিয়া থাকা কী সুখের। তারপর শীতল জলে স্নানের প্রভাবের মতো কীভাবে যেন উবিয়া যাইতে লাগিল সেই অস্থায়ী আবেশ, ধীরে ধীরে মিথ্যা হইয়া যাইতে লাগিল সাময়িক সত্য। রসালো দিনগুলি হইয়া উঠিল নীরস দীর্ঘ সময়। পাখা মেলিয়া উড়িতে উড়িতে এক সময় তার আকাশটি পর্যন্ত রহিল না, পাখা গুটাইয়া ভারাক্রান্ত দেহে অবসন্ন মনে নামিয়া আসিতে হইল পাথর ঢাকা মাটির প্রলেপ বিছানো কাঁকরে।

ভূপেনের মানসিক স্থবিরত্বের সুযোগে সংসার ধীরে ধীরে তার মনোযোগ নিজের দিকে টানিয়া লইতে লাগিল। এতদিন সংসারের কোনো বিষয়ে কেউ কিছু বলিতে আসিলেই ভূপেন বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, এখন ছোটোবড়ো সব বিষয়েই তার পরামর্শ ও নির্দেশ পাওয়া যাইতে লাগিল। স্বর্ণের সাহস সকলের চেয়ে বেশি, সংসার পরিচালনার দায়িত্বটাও তার, ভয়ে ভয়ে সেই প্রথমে দুটি-একটি সমস্যা তার দপ্তরে হাজির করিতে লাগিল। তারপর জানাজানি হইয়া গেল মেজাজ ভূপেনের ঠান্ডা হইয়া গিয়াছে, কথায় কথায় অকারণে সে আর চটিয়া উঠে না। তখন সাহস পাইয়া সকলে ঘেঁষিয়া আসিল তার কাছে, জানাইতে লাগিল অসংখ্য দাবি ও প্রার্থনা। ভীরু রমলা পর্যন্ত স্বর্ণের রায়ের বিরুদ্ধে তার কাছে আপিল পেশ করিতে গেল, তার গান শেখার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া না দিলে সে কিন্তু প্রয়োপবেশন আরম্ভ করিবে, হ্যাঁ।

বাঁধভাঙা বন্যার মতো স্থগিত করা দায়িত্ব ও কর্তব্য ভূপেনকে ভাসাইয়া নেওয়ার উপক্রম করিল। কত কী যে তাকে করিতে হইবে তার ঠিক ঠিকানা নাই। পিসির বড়ো মেয়েটার বিবাহ না দিলে নয়, পুরী যাওয়ার জন্য মা উতলা হইয়া পড়িয়াছেন, নৃপেন ম্যাট্রিক পাশ করিয়া এবার কোন কলেজে কী পড়িবে ঠিক করা দরকার, বিমলার ফিটের অসুখের বাড়াবাড়ি শুরু হইয়াছে, ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত, বাড়ির প্রায় সকলের জন্য জামাকাপড় কিনিতে এ মাসে বেশি টাকার দরকার, দু-বছর বাড়ির কলি ফিরানো হয় নাই, মন্টুর গায়ে ফোড়া উঠিয়াছে, খুকি সর্বদা নখ কামড়ায়, আরও কত কী।

আগে এ সব সরমার মারফতে তার কাছে পৌঁছিত, এতটুকু ব্যস্ততা বা উদ্‌বেগ সরমার দেখা যাইত না, ধীরে-সুস্থে একে-একে সমস্ত দরকারি-অ-দরকারি খবরগুলি তাকে শুনাইয়া যাইত, যেখানে ব্যাখ্যা প্রয়োজন নিজেই ব্যাখ্যা করিত। কোন বিষয়ের গুরুত্ব কতখানি নিজে নিজে স্থির করিবার কী আশ্চর্য ক্ষমতা সরমার ছিল ! শুধু তার বলিবার ধরনেই সব বিষয়ে ভূপেনেরও স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়া যাইত, মনে হইত কিছু না বলিয়াও সরমাই যেন তাকে বলিয়া দিয়াছে কোন বিষয়ে কী তার কী করা উচিত। এখন সোজাসুজি সংসারের বহুমুখী জটিলতার সংস্পর্শে আসিয়া মাঝে মাঝে ভূপেনের ধাঁধা লাগিয়া যায়, নিজেকে অসহায় মনে হয়। সরমার জন্য তখন মন কেমন করিতে থাকে। সরমা

থাকিলে আজ তার ভাবনা ছিল না। সমস্ত জটিলতা সরমা সরল করিয়া দিত, বসিয়া বসিয়া তার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হইত না।

যে সব ব্যাপারে কর্তব্য ঠিক করিতে তার এত ভাবিতে হয়, ভাবিয়া ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করার পরেও দ্বিধা সন্দেহে মন ভবিয়া থাকে, সরমা কেমন করিয়া সে সব ব্যাপারের মূল কথাটি এত সহজে ধরিতে পারিত ? নিজেদের প্যাঁচালো বুদ্ধিতে জটিল যুক্তিতর্ক খাড়া করিয়া তাবা যে বিষয় ঘোরালো করিয়া তোলে সরমার মতো মেয়েদেব সহজ বুদ্ধিতে বোধ হয় সে সব সহজভাবেই ধরা পড়ে।

অনেক মেয়ের হয়তো এই স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। যেমন শান্তি। বাঙালি পবিবার যেমন এক ছাঁচে ঢালা তাতে শান্তি ও সরমা একই আবেষ্টনীতে মানুষ হইয়াছে মনে করা চলে। সরমার মতো সেও হয়তো পাইয়াছে সহজ সরল বুদ্ধি। তবে সবমার অভিজ্ঞতা তাব নাই, স্বামী-পুত্র আব স্বামীব আত্মীয়-পরিজনের বৃহৎ সংসারে কয়েকটা বছর কাটানোব আগে সে সব বেচারি পাইবেই বা কোথায়। বিবাহের সময় সরমা যেমন ছিল, লাজুক আর দিশেহাবা, ও এখন সেই স্তরে আছে। সরমার মতো হইয়া উঠিতে ওর অনেক সময় লাগিবে, অনেক।

কাজ আর সংসারেব দায়িত্ব আশ্রয় করিয়া ভূপেন নিজেকে ভুলিবার চেষ্টা করে এবং এত সহজে নিজেকে ভোলা যায় দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যায। সে বুঝিতে পাবে মূল্য দিলেই জগতেব তুচ্ছ অবলম্বনও মূল্যবান হইয়া উঠিতে পাবে। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে নিজের বাড়িব মানুষগুলি সম্বন্ধে সে এক নূতন সত্য আবিষ্কার করে, বিভিন্ন স্বার্থ আব প্রকৃতি কতটুকু মমতাকে আশ্রয় করিয়া সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে পারে। হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ-বিবাদ ওই সামান্য প্রীতিব বাঁধনটুকু ছিঁড়িতে পাবে না, কলহের শেষে আবার অনায়াসে গলাগলি ভাব হয়। এটা সম্ভব হয় শুধু বাস্তবতাব ভিত্তিতে তাদেব সম্পর্ক দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া। ছাড়াছাড়ি হওয়াটা তাদের কাছে মর্মান্তিক কিছু নয়, তবু ছাড়াছাড়ি হয় না। কাবণ তার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ মিশিয়া মিশিয়া আনন্দেই সকলে দিন কাটায় !

এভাবে জীবন কাটাইতে দোষ কী ? কাবও সঙ্গে এমন সম্পর্ক গড়িয়া তোলাব প্রয়োজন কী, যে সম্পর্ক চুকিয়া গেলে বাঁচিয়া থাকাটাই ভয়াবহ শাস্তিতে পরিণত হয় ?

যত দিন যায়, প্রভার বিরুদ্ধে একটা জোরালো অভিযোগ ভূপেনের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। দুজনের সম্পর্ক সহজ করিয়া দেওয়ায় প্রথমে প্রভার কাছে তার কৃতজ্ঞতাব সীমা ছিল না, তারপর ভীরু সন্দেহের মতো ক্ষীণ একটা প্রতিবাদ মনে জাগিয়াছিল যে প্রভা কি সত্যই খুব বেশি উদারতা দেখাইয়াছে ? হতাশ অবসন্নতাব ভাব কাটিয়া যাওযার সঙ্গে জীবনের অপার শূন্যতা পীড়ন আরম্ভ করিলে এই প্রতিবাদের ভাষা ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কেবলই মনে হইতেছে, তার দিক ভাবিয়া তো শুধু নয়, নিজেকে মুক্তি দেওযার জন্য প্রভা তাকে মুক্তি দিয়াছে। প্রভা রেহাই চাহিয়াছিল। এমন অন্ধ আবেগেব সঙ্গে রেহাই চাহিয়াছিল যে, ভবিষ্যৎ পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা পর্যন্ত ঘুচাইয়া দিয়া তাদের ভালোবাসাকে সে চিরদিনের জন্য ধ্বংস করিয়া দিয়াছে ! প্রভা জানে বাসন্তী পূর্ণিমা রাত্রের অনির্দিষ্ট কামনা তার নয়, প্রতিদিন সে তাকে চায় জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নাব সাথি হিসাবে। জানিয়া শুনিয়া এ উদারতা দেখানোর কী মানে হয়, আমাকে চাহিলেই তুমি পাইবে ! কী করিয়া প্রভা মনে করিতে পারিল ওভাবে সে তাকে কোনোদিন চাহিতে পারে ?

সমস্ত কী ছল প্রভার, তাকে ঘিরিয়া স্বপ্ন রচনার সেই কথা ? স্বপ্ন কী প্রভা রচনা করিতে জানে ? তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য হয়তো প্রভা ও কথা বলিয়াছে। অনেকদিনের বন্ধু সে, অনেকদিন হইতে তার প্রেমে উন্মাদ, সুতরাং উদারভাবে তাকে কতগুলি রোমাঞ্চকর কথা তো অন্তত বলা উচিত, নিজেকে যখন দেওয়া চলে না ! একটু শান্ত করা উচিত মানুষটার মন, তার জন্যই

মন যখন তার এত উতলা হইয়াছে ! প্রভা ডাক্তার, রোগীকে সে ওষুধ দেয়, আশা দেয়, তারও প্রেমোন্মাদনার চিকিৎসাই হয়তো প্রভা করিয়াছে।

চাহিলেই আমাকে পাইবে, এ কথাও হয়তো প্রভাব মিথ্যা। সে কোনোদিন চাহিবে না জানিয়াই ও কথা প্রভা বলিতে পারিয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে একদিন প্রভাকে আঘাত করিবার দুরন্ত ইচ্ছা জাগে ভূপেনের, কোনোমতে এ ইচ্ছা সে দমন করিতে পারে না। প্রভার মিথ্যা ধবাইয়া দিতে হইবে, বুঝাইয়া দিতে হইবে ছেলেভুলানো কথায় ভুলিয়া থাকিবার মানুষ সে নয়। প্রভাকে এ ভাবে জব্দ করিয়া তার লাভ কী হইবে ভাবিয়া দেখিবার অবসর ভূপেন পায় না, ঝোঁকের মাথায় সন্ধ্যার পর সে প্রভার বাড়ি যাওয়ার জন্য বাহির হইয়া পড়ে। মন তাব ভরিয়া থাকে গভীর বিষাদে কিন্তু প্রত্যাবর্তনের কথা সে ভাবে না।

সারাদিনের গবমের পর এখন পরম উপভোগ্য বাতাস বহিতে শুরু করিয়াছে। ভূপেন হাঁটিয়াই প্রভাব বাড়িব দিকে চলিতে থাকে। তাড়াতাড়ি করিবার কিছু নাই, উৎকণ্ঠিত আগ্রহে প্রতীক্ষা তো কেউ করিতেছে না তার জন্য। ফিবিয়া তার আসিতে হইবে, দু-দণ্ডেব জন্য বিব্রত প্রভার মুখখানি দেখিয়া, প্রভার মনকে শেষ জানা জানিয়া।

বাহিরের বসিবাব ঘরে কেউ ছিল না, একটি স্তিমিত আলো জ্বলিতেছে। উপর হইতে কয়েকটি মানুষের কথা ও হাসি ভাসিযা আসিতেছিল। ভূপেন একটা খালি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। প্রভার কয়েকটি বন্ধু আসিযাছে, দোতলায় প্রভাব ঘরে তারা সানন্দে কলরব করিতেছে। প্রভার গলা শোনা গেল, কথাগুলি বুঝিতে পারা গেল না, তার কানে আসিল প্রভার উচ্ছ্বসিত হাসিব শব্দ। এখনও সে হাসিতে ভুলিয়া যায় নাই। জীবন যাদের আনন্দে ভরপুর, ভিতরের হাসি যাদের শব্দে ফাটিয়া পড়ার জন্য সর্বদা উদ্যত হইযা আছে, তাদেব সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সন্ধ্যাটি প্রভা উপভোগ করিতেছে।

ভূপেন ঈর্ষা বোধ করে না, সে শুধু আশ্চর্য হইয়া যায়। প্রভার জীবনেও হাসি ও আনন্দ আজ এত সুলভ ! নিজে সে তবে হাসিতে ভুলিয়া গিযাছে কেন ? এ দোষ তো তার নিজের। প্রেমকে এত বড়ো করিয়া তুলিবার কোনো প্রয়োজন তো তার ছিল না, ব্যর্থতাকে আঁকড়াইযা ধরিয়া থাকিতে কেউ তো তাকে অনুরোধ করে নাই। সরমা আব নন্তুব জন্য শোক যদি তার হইয়া থাকে, হোক, প্রভা যদি স্বপ্ন আর কল্পনাব জগৎকে অনুর্বর মরুভূমি করিযা দিযা থাকে, দিক। আবও তো অনেক কিছু আছে জীবনে, সে সব অস্বীকার করিবার কোনো কারণ তো নাই। হাতের খেলনা কাড়িয়া নেওয়া হইযাছে বলিয়া অবোধ শিশু ঘবেব আসবাব ভাঙিতে আরম্ভ করে। সে তো শিশু নয়।

প্রভাব সঙ্গে আবাব আর একটা বুঝাপড়ার মতলব ভূপেনেব কাছে হাস্যকব ছেলেমানুষি হইযা যায়. কী হইবে প্রমাণ কবিয়া প্রভাব মনে কী ছিল আর কী ছিল না ? তাব চেয়ে প্রভাকে হাসিতে দেওযাই ভালো।

গ্রন্থপরিচয়

পরিশিষ্ট

জীবনপঞ্জি

গ্রন্থপরিচয়

বর্তমান রচনাসমগ্রের ভিতরে মূলপাঠের ক্ষেত্রে, গল্প বা উপন্যাসের শিরোনামসহ, সর্বত্র বাংলা আকাদেমি-সম্মত বানান অনুসৃত হয়েছে। কেবল গল্প-উপন্যাসের চরিত্রনামের ক্ষেত্রে আদি বানানের রূপান্তর ঘটানো হয়নি। অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থপরিচয় অংশে গল্পসংকলন ও উপন্যাসগুলির শিরোনামের বানান প্রথম প্রকাশকালে যেমন ছিল তেমনি রাখা হয়েছে।

বৌ

'বৌ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চম গল্পসংকলন, একাদশতম মুদ্রিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশক ছিলেন লেখকেরই সহোদর ভ্রাতা সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিপত্র থেকে এই প্রকাশনাসংস্থা গঠনের বিবরণ পাওয়া যায় (দ্রঃ অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ডায়েরি ও চিঠিপত্র, পত্রসংখ্যা ৪, পৃ ২৮৭-৮৮)। উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস নামক উক্ত প্রকাশনা-সংস্থা কর্তৃক ১০ বি জনক রোড, কালিঘাট, কলকাতা ঠিকানা থেকে বৌ যুগপৎ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে প্রকাশকাল উল্লিখিত ছিল না, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যে ১৯৪০ বলে নির্দেশিত। আখ্যাপত্র ব্যতীত পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮১, দাম দেড় টাকা। গ্রন্থ প্রাপ্তিস্থানরূপে ভারতী ভবন, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা এই নামোল্লেখ দেখা যায়।

প্রথম সংস্করণভুক্ত গল্পগুলি যথাক্রমে : দোকানীর বৌ, কেরানীর বৌ, সাহিত্যিকের বৌ, বিপত্নীকের বৌ, তেজী বৌ, কুষ্ঠরোগীর বৌ, পূজারীর বৌ, রাজার বৌ।

প্রথম সংস্করণের অধিকাংশ গল্পের প্রাথমিক প্রকাশসূত্র এইরূপ :

কেরানীর বৌ	উত্তরা	শ্রাবণ, ১৩৪০
পূজারীর বৌ	উত্তরা	আশ্বিন, ১৩৪০
রাজার বৌ	উত্তরা	অগ্রহায়ণ, ১৩৪০
কুষ্ঠরোগীর বৌ	উত্তরা	ফাল্গুন, ১৩৪০
বিপত্নীকের বৌ	উত্তরা	আষাঢ়, ১৩৪২
সাহিত্যিকের বৌ	ভারতবর্ষ	শ্রাবণ, ১৩৪৩
দোকানীর বৌ	প্রবাসী	শ্রাবণ, ১৩৪৩

বৌ গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৩ [১৯ মার্চ ১৯৪৭] সালে। প্রকাশক সুপ্রিয় সরকার, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স লি, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা। দাম দুটাকা বারো আনা। পূর্বসংস্করণভুক্ত আটটি গল্পের সঙ্গে এই সংস্করণে কয়েকটি নতুন গল্প সংযুক্ত হয় : উদার-চরিতানামের বৌ, প্রৌঢ়ের বৌ, সর্ববিদ্যাবিশারদের বৌ, অন্ধের বৌ, জুয়াড়ীর বৌ।

দ্বিতীয় সংস্করণভুক্ত নতুন গল্পগুলির প্রাথমিক প্রকাশসূত্র নিম্নরূপ :

সর্ববিদ্যাবিশারদের বৌ	ভারতবর্ষ	বৈশাখ, ১৩৪৭
উদারচরিতানামের বৌ	ভারতবর্ষ	শ্রাবণ, ১৩৪৭
জুয়াড়ীর বৌ	ভারতবর্ষ	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭
অন্ধের বৌ	ভারতবর্ষ	বৈশাখ, ১৩৪৮
প্রৌঢ়ের দু'নম্বর বৌ	ভারতবর্ষ	কার্তিক, ১৩৪৮

গ্রন্থভুক্তিকালে শেষ গল্পটির শিরোনাম থেকে 'দু'নম্বর' শব্দটি বর্জিত হয়েছে।

বৌ গল্পগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে এই শেষ পাঁচটি গল্প বর্জিত হয়। রবীন্দ্র লাইব্রেরি প্রকাশিত উক্ত তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল আষাঢ় ১৩৭০, লেখকের জীবনাবসানের সাত বৎসর পর। একই প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত পরবর্তী দুটি মুদ্রণের প্রকাশকাল যথাক্রমে মাঘ ১৩৭০ এবং শ্রাবণ ১৩৭০।

দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত ১৩টি গল্পসহ চতুর্থ সংস্করণের প্রকাশক পূর্বোক্ত এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড, প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩৪০। একই প্রকাশক কর্তৃক পঞ্চম বা সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

মানিক রচনাসমগ্রের তৃতীয় খণ্ডে বৌ গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণভুক্ত গল্পগুলির বেশ কিছু মুদ্রণপ্রমাদ পত্রিকার প্রথম এবং দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন করা হয়েছে।

বৌ গল্পসংকলনের প্রথম সংস্করণের গল্পগুলির সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণের গল্পগুলির পাঠে কোনো গুরুতব পার্থক্য লক্ষিত হয় না। তবে প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালে পত্রিকার পাঠ অনেক স্থানে বর্জিত এবং পরিমার্জিত হয়েছে। গ্রন্থে কিছু গুরুতর মুদ্রণপ্রমাদও ঘটেছিল। পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে গ্রন্থভুক্ত পাঠের কিছু পরিবর্তন নির্দেশিত হল :

দোকানীর বৌ :

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
লজেঞ্জুষ এবং মুদীখানা ও মণিহারী দোকানের ..	লজেনজুস এবং মুদিখানা ও মনিহাবি দোকানেব মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ১১
	[কোথাও 'মণিহারী', কোথাও 'মনোহারী' থাকার জন্য রচনাসমগ্রে সর্বত্র 'মনিহারি' পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে]
তার স্বজাতিরাই জিনিস কিনিতে আসে না।	পুবুষেরাই জিনিস কিনিতে আসে না।
কালা কানা বোবা ও আগুন সবলাকে..	কালা, কানা, বোবা ও বিকৃতমুখী সবলাকে মা বচনাসমগ্র ৩ পৃ ১১
জোর বাতাসে টাঙানো বাঁশে সাজানো জামাকাপড়গুলি দুলিতেছে...	টাঙানো বাঁশে সাজানো জামাকাপড়গুলি জোব বাতাসে দুলিতেছে মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ১৯

কেরানীর বৌ :

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
একটা বিশেষ বয়সে দেহের একটা বিশেষ অংশে মাত্র তাদের একটুখানি যৌবনের সঞ্চার হইয়া থাকে, বাকী সবটাই অসামঞ্জস্য। উত্তরা, শ্রাবণ ১৩৪০, পৃ ১২৮	একটা বিশেষ বয়সে মাত্র তাদেব একটুখানি যৌবনের সঞ্চার হইযা থাকে, বাকি সমযেব সবটাই অসামঞ্জস্য। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২২
আত্মীয়-স্বজন যেই বাড়ী আসিল ... পৃ ১২৮	আপনজন যেই বাড়ি আসিল. .. মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৩
সে শুধু সরসীর ওই বস্তুটুকুর কল্যাণে। পৃ ১২৯	সে শুধু সরসীর ওই রংটুকুর কল্যাণে। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৩
একা একা চুপ চাপ বসে থাকবে ? পৃ ১৩০	একা একা চুপ করে বসে থাকবে ? মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৪
কিন্তু এক মিনিটে চোখ বুলানো হয় না। পৃ ১৩১	কিন্তু এক মিনিটে চোখ বুলানো যায় না। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৬

ববং এক মিনিটেব মধ্যে বিহ্বল সরসী সময়ের জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল।

পৃ ১৩১

ইঁটেব স্তূপ জড়ো করিয়া কবিয়া মানুষ এই সহর গড়িয়াছে,
পৃ ১৩১

ইটের স্তূপ জডো কবিয়া মানুষ এই শহর গড়িয়াছে,
মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৬

আকাশের বুড় রৌদ্র লাগানোব এই ব্যাকুল উল্লাস তাব সহ্য হইতেছে না।

পৃ ১৩১

আকাশেব বুড় বৌদ্র লাগানোব উগ্র ব্যাকুল উল্লাস তার সহ্য হইতেছে না।

মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৬

ওই শক্ত বোয়াকটিতে আছড়াইয়া পড়িলেই সবচেয়ে ভাল হয়।

পৃ ১৩২

ওই শক্ত বোযাকটিতে আছডাইযা পডিলে ভালো হয়।
মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৬

আঠাবো বছবেব বালকেব দৃষ্টিপাতে ভয়ে অবশ হইয়া গিয়াছে,

পৃ ১৩২

আঠাবো বছবেব বালকের ভয়ে অবশ হইয়া গিয়াছে,
মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৬

আপনার প্রতি এই তাব শেষ প্রতিশোধ ?

পৃ ১৩২

আপনাব প্রতি তাব এই শেষ প্রতিশোধ।
মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৭

দুই হাত শক্ত কবিয়া মুঠা কবিয়া সবসী
পৃ ১৩২

দুই হাত শক্ত কবিয়া মুঠা কবিযা সবসী
মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৭

ঘষিয়া ঘষিয়া চোখ শুষ্ক কবিয়া উত্তরাভিমুখী হইয়া আলিসায ভব দিয়া চুপ কবিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।
পৃ ১৩২

ঘষিয়া ঘষিয়া চোখ শুষ্ক কবিয়া উত্তবাভিমুখী হইযা আলিসায ভব দিযা দাঁড়াইযা বহিল।
মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৭

জিভে একটা বিশ্রী বিস্বাদ লাগিয়া আছে।
পৃ ১৩৩

জিভে কটু স্বাদ লাগিযা আছে।
মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৭

কাপড়গুলি একটি একটি কবিযা কুঁচাইযা দড়িতে সাজাইযা বাখিল,

পৃ ১৩৩

কাপডগুলি একটি একটি কবিয়া কুঁচাইয়া বাখিল,
মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৭

হাতের কাছে গেলাস ছিল, সবসী দেখিতে পাইল না।
পৃ ১৩৩

হাতেব কাছে গেলাস ছিল, দেখিতে পাইল না।
মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৮

সাহিত্যিকের বৌ :

পত্রিকার পাঠ

তিনখানা নাটক

কেউ আত্মহত্যা পর্যন্ত করে...

গ্রন্থধৃত পাঠ

তিনখানা গল্প সঞ্চয়ন ও একখানা নাটক..
মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৯

কেউ আত্মহত্যা করে
মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৩০

দু'হাত উঁচু করিয়া বিশ্রীভঙ্গিতে গা-মোড়া দিয়াছিল সূর্যকান্ত, আরও বিশ্রীভঙ্গিতে তুলিয়াছিল হাই।	দু-হাত উঁচু করিয়া বিশ্রী ভঙ্গিতে তুলিয়াছিল হাই। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৩১
অমলা হঠাৎ কাতবকণ্ঠে বলে, ঠাকুরপো, শবীরটা বড খাবাপ লাগছে..	অমলা হঠাৎ কাতবকণ্ঠে বলে, শবীরটা বড়ো খাবাপ লাগছে মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৩৫
ছেলেমানুষী, অবাস্তব কল্পনা,	ছেলেমানুষি অবাস্তব কল্পনা, মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৩৯
অমলাব প্রতিবাদ ইহা না মানিযা...	অমলাব মনেব প্রতিবাদ এ সব না মানিযা মা বচনাসমগ্র ৩ পৃ ৪১
ষ্টিমাবে চাপিযা কবে সে একবাব মামাব সঙ্গে ঢাকা গিয়াছিল...	স্টিমাবে চাপিযা কবে সে একবাব ঢাকা গিযাছিল মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৪২
বামধনুব অপর্ণাকে তাব সাধারণ অনুপযুক্ত প্রফেসব স্বামী..	বামধনুব অপর্ণাকে তাব সাধাবণ অনুপযুক্ত স্বামী মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৪৪

কুষ্ঠরোগীর বৌ :

পত্রিকাব পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
ধীবে ধীরে সন্তর্পণে তাহাব চোখে পলক পড়ে। ঘবেব দেওয়ালে ঝাপসা ছবিগুলি মন্থরবেগে তাহাব চাবিদিকে পাক খায। বাহিরেব শব্দগুলি তাহাব কানে আসিযা জমিতে থাকে, সে একটু-একটু কবিযা তাহা অনুভব কবে। মনে হয়, কে যেন কোথায় কাঁদিতেছে। উত্তবা, ফাল্গুন- ১৩৪০, পৃ ৬১৭	ধীবে ধীবে সন্তর্পণে তাহাব চোখে পলক পডে, ঘবেব দেওযালে ঝাপসা ছবিগুলি মন্থবগতিতে তাহাব চাবিদিকে পাক খায়। বাহিবেব শব্দগুলি তাহাব কানে আসিযা বাজিতে থাকে, সে একটু একটু কবিযা তাহা অনুভব কবে। তাহাব মনে হয, কে যেন কোথায কাঁদিতেছে। মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৬৬
প্রিয়কে কারো মনে হয অপ্রিয, জীবনকে কাবো মনে হয সীমাত্তোলিত একটা কৌতুক। পৃ ৬১৮	প্রিযকে কাবও মনে হয অপ্রিয, জীবনকে কাবও মনে হয সীমাত্তোলিত কৌতুক। মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৬৬
কত কথা বুঝিবার চেষ্টা কবিয়া বুঝিতে পাবে না ; সব গোল হইয়া যায়। পৃ ৬১৮	কত কথা বুঝিবাব চেষ্টা কবিযা বুঝিতে পাবে না , সব গোলমাল হইয়া যায। মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৬৭
জীবনের সেই আদিম নিষ্পাপ উৎসব হইতে সে একেবারে উপস্থিত হয় যতীনেব গলিত দেহ ও বিকৃত মনকে কেন্দ্রকরা পচা ভাপসানো জীবনে, যেখানে একটি নবজাত শিশু, একটি পরিপুষ্ট বিস্ময়, জন্মিয়া মরিয়া যায়। পৃ ৬১৮	জীবনেব সেই আদিম নিষ্পাপ উৎসব হইতে সে একেবাবে উপস্থিত হয় যতীনেব গলিত দেহ ও বিকৃত জীবনকে কেন্দ্র কবা পচা ভাপসানো জীবনে, যেখানে একটি নবজাত শিশু, একটি পবিপুষ্ট বিস্ময, জন্মিয়া মবিয়া যায়। মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৬৭
শুধু ভিখারী নয়, ভিক্ষা দেওয়া দেখিতে বাস্তায় লোক জমা হইয়া গিয়াছিল। পৃ ৬১৯	শুধু ভিখারি নয়, ভিক্ষা দেওয়া দেখিতে রাস্তায় লোক জমা হইযা গিযাছিল অনেক। মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৬৮
আমি বাড়ীর মধ্যে পুরে বিপদ আবও কমিয়েছি। পৃ ৬১৯	আমি বাড়িব মধ্যে ভরে বিপদ আবও কমিয়েছি। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৬৮

অমন তেজালো সন্ন্যাসী আমি জীবনে কখনো দেখিনি। পৃ ৬২০	অমন তেজালো সন্ন্যাসী আমি কখনও দেখিনি। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৬৯
যতীন একদিন কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল . 'তুমি খালি ওদেরি সেবা কর শেতা। পৃ ৬২০	যতীন একদিন কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল তুমি খালি ওদের সেবা কর শ্বেতা। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৬৯
এতে জটিল মনোবিজ্ঞান নাই। সহজ যুক্তির অনায়াসবোধ্য কথা। পৃ ৬২০	এতে জটিল মনোবিজ্ঞান নাই। সহজ বুদ্ধির অনায়াসবোধ্য কথা। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৬৯

পূজারীর বৌ :

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
শেষে রাত্রির আগে সে মূর্চ্ছা আর ভাঙে নাই। উত্তরা, আশ্বিন ১৩৪০, পৃ ২৯৮	শেষ রাত্রির আগে সে মূর্চ্ছা আর ভাঙে নাই। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭১
নিকষ কালো পাথর কুঁদিয়া এ মিলন মূর্তি কোন শিল্পী গড়িয়াছিল আজ আর তাহা জানা যায় না। পৃ ২৯৮	নিকষ কালো পাথর কুঁদিয়া এ মিলন মূর্তি কোন শিল্পী গড়িয়াছিল আজ তাহা জানা যায় না। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭১
তারপর ভাবি মাসে মূর্চ্ছোটা হল। পৃ ২৯৮	তারপর ভাবী মাসে মূর্চ্ছাটা হল। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭১
তবু, ভাবিনীর কথায় গুরুপদ ব্যাকুল সাগ্রহে পুনরায় মনের কামনা নিবেদন করিয়া দেবতার পায়ে ফুল ছোঁয়াইয়া নিয়া গিয়াছিল। পৃ ২৯৮	তবু, ভাবিনীর কথায় গুরুপদ ব্যাকুল আগ্রহে পুনরায় মনের কামনা নিবেদন করিয়া দেবতার পায়ে ফুল ছোঁয়াইয়া নিয়া গিয়াছিল। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭১
দুবেলা রান্নার কাজটা মাসীই করিত . পৃ ২৯৮	দু-বেলা রান্নার কাজকর্ম মাসিই করিত... মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭২
জগতের সর্ব্বোত্তম বিস্ময় সূর্য্যের উদয়াস্তে মানুষ বিশ্বাস করে। পৃ ২৯৯	জগতের সর্বোত্তম বিষয় সূর্যের উদয়াস্তে মানুষ বিশ্বাস করে। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭২
তার মাতৃত্ব টিকিবে, ছেলে টিকিবে না, একি আর কাদম্বিনীর বুঝিতে বাকী আছে। পৃ ২৯৯	তার মাতৃত্ব আসিবে, সন্তান থাকিবে না, এ কী আর কাদম্বিনীর বুঝিতে বাকি আছে। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭২
দুটি সন্তানকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রতিরাত্রে মানুষ যে কেমন করিয়া এমন শান্তভাবে ঘুমাইতে পারে সে ভাবিয়া পাইল না। পৃ ২৯৯	দুটি সন্তানকে বিসর্জন দিয়া প্রতিরাত্রে মানুষ কেমন করিয়া এমন শান্তভাবে ঘুমাইতে পারে সে ভাবিয়া পাইল না। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭২
প্রত্যেকটি সজ্ঞান মুহূর্ত স্বামীর সুখ সুবিধার চিন্তায় ব্যয় করিয়াছে। পৃ ২৯৯	প্রত্যেকটি সজ্ঞান মুহূর্তে স্বামীর সুখসুবিধার চিন্তায় ব্যয় করিয়াছে। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭৩

ধার্মিক সংযত দেবপূজক স্বামীর ভালবাসা পাইয়া চিরদিন নিজেকে সে ধন্য মনে করিয়াছে।

পৃ ২৯৯

ধার্মিক সংযত দেবপূজক স্বামীর ভালোবাসা পাইয়া চিরদিন সে নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছে।

মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭৩

এখন বাত্রির অন্ধকারে সেই চিন্তাকেই তার দুঃস্থ উদ্বেগমথিত মন সযত্নে পোষণ কবিয়া রাখিল।

পৃ ৩০০

এখন রাত্রিব অন্ধকাবে সেই চিন্তাকেই তার উদ্‌বেগমথিত মন সযত্নে পোষণ কবিয়া রাখিল।

মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭৩

মনে হইল, যে দুঃখ ভগবানেব দান বলিয়া এতদিন সে জানিয়া বাখিয়াছিল ভগবান তাহা দেন নাই, গুরুপদই তাব দাতা। জানিয়া বুঝিয়া গুবুপদই তাব জীবনে বাব বাব এই সর্ব্বনাশ আনিয়া দিয়াছে।

পৃ ৩০০

মনে হইল, যে দুঃখ ভগবানের দান বলিয়া এতদিন সে জানিয়া বাখিয়াছিল ভগবান তাহা দেন নাই, গুরুপদই তাব জীবনে বারবার এই সর্বনাশ আনিয়া দিয়াছে।

মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭৩

চৌকীতে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে গুবুপদ কবিত শাস্ত্রপাঠ।

পৃ ৩০০

চৌকিতে গুবুপদ কবিত শাস্ত্রপাঠ।

মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭৩

দশ মিনিট পর পর ঘুমন্ত ছেলেকে না দেখিয়া গিয়া সে থাকিতে পারিত না।

পৃ ৩০০

দশ মিনিট পরপব ঘুমন্ত ছেলেকে না দেখিয়া গিযা সে স্থিব থাকিতে পাবিত না।

মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭৩

তার চোখেব জলও মুছাইয়া দিবাব চেষ্টা করিত।

পৃ ৩০০

তাব চোখেব জলও মুছিয়া দিবাব চেষ্টা কবিত।

মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭৩

তাব মত স্বামী যদি তার পুত্রশোকে উন্মত্তপ্রায় হইযা উঠিত,

পৃ ৩০০

তাব মতো তাব স্বামীও যদি পুত্রশোকে উন্মত্তপ্রায় হইযা উঠিত,

মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭৩

তার মনের মধ্যে গুরুপদ মায়ামমতাহীন অত্যাচাবীব রূপ পরিগ্রহ করিয়া রহিল।

পৃ ৩০০

তাব মনেব মধ্যে গুবুপদ মাযা-মমতাহীন অত্যাচাবীর রূপ গ্রহণ কবিয়া রহিল।

মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭৩

আজ আব আশা করিবাবও তাব সাহস ছিল না।

পৃ ৩০১

আজ আব আশা কবিবাবও তাব সাহস রহিল না।

মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭৪

বাঁচিয়া থাকিয়া কাদম্বিনী তাহা সহ্য করিবে কি করিয়া ?

পৃ ৩০১

বাঁচিয়া থাকিয়া কাদম্বিনী তাহা সহ্য কবিবে কেমন কবিযা ?

মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭৪

পুত্রশোক এ পাড়ায় অজ্ঞাত নয়, হযত কোন বাড়ীব অন্ধকার কক্ষে পুত্রশোকাতুরা জননী হয়ত এখন অশ্রুপাত করিতেছে।

পৃ ৩০১

পুত্রশোক এ পাড়ায় অজ্ঞাত নয, হয়তো কোনো বাড়িব অন্ধকাব কক্ষে পুত্রশোকাতুরা জননী এখন অশ্রুপাত করিতেছে।

মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭৫

নিজেকে সে দেখিতে পাইল এই ঘবের মৃত্যুশীতল আবহাওয়ায় প্রাণান্ত স্বামীর বক্ষলগ্না পুত্রহন্ত্রী রাক্ষসীর রূপে।

পৃ ৩০১

নিজেকে সে দেখিতে পাইল এই ঘরেব মৃত্যুশীতল আবহাওয়ায় স্বামীর বক্ষলগ্না পুত্রহন্ত্রী রাক্ষসিব রূপে।

মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭৪

তোমার ক্ষমা চাইনে।

পৃ ৩০২

তোমার ক্ষমা চাই না।

মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭৫

রাজার বৌ :

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
তার ছেলে গণপতির শেষ বয়সে একটা সাধ জাগিল যে শুধু রাজা নয়, সে মহারাজা হইবে। উত্তরা, অগ্রহায়ণ ১৩৪০, পৃ ৪২৪	তার ছেলে গণপতির শেষ বয়সে একটা সাধ জাগিল যে শুধু রাজা নয়, সে মহারাজ হইবে। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭৬
কিন্তু হাজার বনেদী ঘরের মেয়ে হোক, রাজরাজড়ার বাড়ীতে ঠিক রক্তমাংসের মানুষই থাকে কিনা এবিষয়ে তার মনে একটা ক্ষীণ সংশয় বরাবর থাকিয়া গিয়াছিল। পৃ ৪২৫	কিন্তু হাজার বনেদি ঘরের মেয়ে হোক, রাজরাজড়ার বাড়িতে ঠিক রক্তমাংসের মানুষই থাকে কিনা এ বিষয়ে তার মনে একটা সংশয় বরাবর থাকিয়া গিয়াছিল। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭৭
নিজস্ব একটা দামী সম্পত্তির মতো ক্রমে ক্রমে তার প্রতি মায়া জন্মিয়া যায়। পৃ ৪২৬	নিজস্ব একটা দামি সম্পত্তির মতো ক্রমে ক্রমে তার প্রতি মায়া জন্মে। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭৮
ওদিকে দীঘির জলে থাকিত সোনা রঙের চমকিত চাঞ্চল্য। পৃ ৪২৭	ওদিকে দিঘির জলে থাকিত সোনালি রঙের চমকিত চাঞ্চল্য। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৭৯
খোলা ছাদে জ্যোৎস্নালোকে তাদের প্রেম যতই অলৌকিক হোক, সেটা ও বয়সের নয়। পৃ ৪২৭	খোলা ছাদে জ্যোৎস্নালোকে তাদের প্রেম যত অলৌকিক হোক সেটাও বয়সের নয়। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮০
কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের কাছে একথাও শোনা গেল যে এই প্রথম এবং এই শেষ। পৃ ৪২৮	কিন্তু সেই সঙ্গে কানের কাছে এ কথাও বলিয়া গেলেন যে এই প্রথম এবং এই শেষ। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮০
সন্তানের আবির্ভাবে যামিনী ও তাহার মধ্যে যে সাময়িক ছেদ পড়িল সেই সুযোগে ভূপতি তার নিজস্ব জগৎটি সৃষ্টি করিয়া লইল। পৃ ৪২৮	সন্তানের আবির্ভাবে যামিনী ও তাহার মধ্যে যে সাময়িক ছেদ পড়িল সেই সুযোগে ভূপতি তার নিজস্ব জগৎটি তৈরি করিয়া লইল। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮১
যামিনীর কাছে কোন কৈফিয়ৎ দেওয়ারও প্রয়োজন আর রহিল না। পৃ ৪২৮	যামিনীর কাছে কোনো কৈফিয়ত দেওয়ারও প্রয়োজন রহিল না। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮১
অনাবশ্যক উৎসাহের সঙ্গে সে সমস্ত জমিদারী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। পৃ ৪২৮	অনাবশ্যক উৎসাহের সঙ্গে সে তার জমিদারি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮১
মরিতে মরিতে বাঁচিয়া ওঠার ধাক্কায় আর ছেলে পাওয়ার আহ্লাদে যামিনী প্রথমটা বেশ ভুলিয়া রহিল। পৃ ৪২৮	মরিতে মরিতে বাঁচিয়া ওঠার ধাক্কায় আর এক ছেলে পাওয়ার আহ্লাদে যামিনী প্রথমটা বেশ ভুলিয়া রহিল। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮১
তার জন্য সুস্থ ও সবল দুধমা ও ঘুম-পাড়ানো মাসীপিসী ভাড়া করা হইয়াছে। পৃ ৪২৮	তার সুস্থ ও সবল দুধমা ও ঘুমপাড়ানো মাসিপিসি ভাড়া করা হইয়াছে। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮১

তার দিনগুলিকে একেবারে অচল করিয়া দেওয়ার মত দূরেই যে ভূপতি সরিয়া গিয়াছে এটা বুঝিতে যামিনীর সময় লাগিল। পৃ ৪২৯	তার দিনগুলিকে একেবাবে অচল করিয়া দিবার মতো দূরেই যে ভূপতি বসিয়া গিযাছে এটা বুঝিতে যামিনীব সময় লাগিল। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮১
উঠিবাব সময় যামিনী তাকে আর একটু থাকিতে বলিলে খুসী হইয়াই সে আর একটু তার কাছে থাকিত। পৃ ৪২৯	বিদায় নেওয়াব সময় যামিনী তাকে আরও একটু থাকিতে বলিলে খুশি হইয়াই সে আর একটু তাব কাছে থাকিত। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮২
বিনিদ্র যামিনীর সঙ্গে সমানে রাত সে জাগিত না বটে,. পৃ ৪২৯	বিনিদ্র যামিনীব সঙ্গে সমানে সে বাত জাগিত না বটে,... মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮২
স্বামীর নিশ্বাসের শব্দটি কান পাতিয়া শুনিযা শিহবিয়া শিহবিয়া সে নিজের মৃত্যু-কামনা কবিত। পৃ ৪২৯	স্বামীব নিশ্বাসেব শব্দটি কান পাতিযা শুনিয়া শিহরিয়া সে নিজের মৃত্যু কামনা কবিত। মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮২
তাব সীমাহীন দুঃসহ প্রেমের মত অপাব ক্রন্দনাবেগে সে কাঁপিয়া কাঁপিযা উঠিত। পৃ ৪২৯	তাব সীমাহীন দুঃসহ প্রেমেব মতো ক্রন্দনবেগে সে কাঁপিযা কাঁপিয়া উঠিত। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮২
গন্ধতেল মাখিয়া খোঁপা বাঁধিলেই শুধু চলিত না. . পৃ ৪৩০	গন্ধতেলে খোঁপা বাঁধিলেই শুধু চলিত না.. মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮২
ছড়ানো পুতুলগুলিব দিকে চাহিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে সে ঘুমাইয়া পডিবে। পৃ ৪৩০	ছডানো পুতুলগুলিব দিকে চাহিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে ঘুমাইয়া পড়িবে। মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮৩
আবও যাহাতে বেশী ভাল লাগে সেজনা প্রাণপণ চেষ্টাও সে করিত। কিন্তু তখন অনেক দেবী হইযা গিযাছে। পৃ ৪৩০	আবও বেশি ভালো যাতে লাগে সে জনা প্রাণপণ চেষ্টাও সে কবিত। কিন্তু অনেক দেবি হইযা গিযাছে। মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮৩
প্রভুত্ব এখানে হ্রস্ব, বিরক্তি স্বল্প, বৈচিত্র্য অপ্রতুল। পৃ ৪৩১	প্রভুত্ব হ্রস্ব, বিবক্তি স্বল্প, বৈচিত্র্য অপ্রতুল। মা রচনাসমগ্র ৩ পৃ ৮৪
যামিনীকে এখনো চাহিলেই পাওয়া যায কিন্তু সেই সঙ্গে কি যেন পাওয়া যায় না। পৃ ৪৩২	যামিনীকে এখনও চাহিলেই পাওযা যায সেই সঙ্গে কী যেন পাওয়া যায না। মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮৪
কিন্তু ভূপতি তাব নাগাল পাইতেছে না। পৃ ৪৩২	কিন্তু তাব নাগাল পাইতেছে না। মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮৫

উদারচরিতানামের বৌ :

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
বাচবিচারের অভাব .. জুতা সারাইয়া লওয়ার পবে .	বাছবিচাবের অভাব জুতা সারাই করাইয়া নেওয়ার পরে মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮৬
শুনিতে শুনিতে মনে হয় ব্যাপারটা বিশ্বব্যাপীই বুঝি হইবে... চুড়ির সঙ্গে প্রায় মিশ খাইয়া গিয়াছে...	শুনিতে শুনিতে মনে হয় বিশ্বব্যাপীই বুঝি হইবে চুড়ির রঙের সঙ্গে প্রায় মিশ খায় মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮৮
কিন্তু যতীন এত সহজে ভুলিবার ছেলে নয়, সে প্রায় নির্বিকারভাবেই বলে, 'কাঁদুক না...	কাঁদুক না... মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৮৯

প্রৌঢ়ের বৌ :

পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের নাম ছিল 'প্রৌঢ়ের দু'নম্বর বৌ'। গল্পের সূচনা এবং শেষাংশ পত্রিকায় যেমন ছিল গ্রন্থভুক্ত গল্পে তা বর্জিত হয়েছে :

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ

সূচনা

সকলেই জানে এবং মানে যে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করাটা এমন কিছু দোষের ব্যাপার নয়। অনেকেই করে। নিয়তই কানে আসে তোমার পরমায়ু একশো বছর হোক। ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করার চেয়েও এটা যখন বড় আশীর্বাদ, খবরের কাগজে আর মাসিকপত্রের প্রবন্ধে দেশভাইদের গড়পরতা আয়ুর ভীতিকর হিসাবটা চোখে পড়িলেও কে না আশা করিতে পারে যে সে অন্তত ষাটের কোঠা পার হইয়া যাইবে?

এই হিসাবে রসিক অনায়াসেই ভাবিতে পারিত, নতুন বৌটিকে আঠার বছর ধরিয়া স্বামীর আদর যত্ন স্নেহমমতা --ভালবাসা নয়, কারণ যতটুকু ভালবাসা রসিকের ছিল সবটুকুই সে প্রমীলাকে আগেই দিয়া ফেলিয়াছে—ভোগ করিতে দিয়া, ছেলেমেয়ে ঘরবাড়ি, টাকাপয়সা আর মেয়েদের পরম কাম্য সংসারের গৃহিণীপদে স্থায়ী অধিকার দিয়া বিধবা করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলে খুব বেশি অন্যায় করা হইবে না। কিন্তু প্রমীলা মারা যাওয়ার পর হইতে রসিকের কেমন একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে, সেও আর বেশিদিন বাঁচিবে না। বেশিদিন—কত দিন? কে জানে কতদিন, রসিক অত বছর গোনা হিসাব লইয়া মাথা ঘামায় না। সে শুধু জানে, এ পৃথিবীতে সে অল্পদিন থাকিবে—অতি অল্পদিন। নূতন করিয়া জীবন গড়িয়া তুলিতে তুলিতেই সে কটাদিন শেষ হইয়া যাইবে।

[গ্রন্থে এই অংশগুলি বর্জিত]

শেষাংশ

কদিন খুব গরম গিয়াছে। প্রথম বর্ষার গুমোটের সিদ্ধকরা গরম। রসিকের খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই বৃষ্টি নামিল। আজ কি সকাল সকাল ঘুম আসিবে, বৃষ্টি নামিয়া ঠাণ্ডা পড়িয়াছে বলিয়া? কাজের ঘরে গিয়া কয়েক মিনিট তামাক টানিয়া রসিক তাড়াতাড়ি আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল। বিছানায় উঠিয়া গা এলাইয়া দিলে চিরদিন যেমন আরাম বোধ হইয়াছে, আজও তেমনি আরামে কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া থাকা গেল। তারপর যথারীতি ইচ্ছা জাগিল পাশ ফিরিবার এবং কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হইয়া গেল এপাশ ওপাশ করা। ছটফটানি।

উঠিয়া আলো জ্বালিয়া রসিক চেয়ারে বসিয়া টেবিলে পা তুলিয়া দিল। বৃষ্টির ঝমঝমানি ইতিমধ্যে থামিয়া গিয়াছে। ভিতর হইতে ভাঙাভাঙা কথার আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে। কার যেন হাসির শব্দ শোনা গেল। তারপর আসিল ছোটছেলের কান্না—সব শব্দের চেয়ে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট। খোকা কাঁদিতেছে—হয়তো ভয়ে, নয় খিদায়। ওকে দেখিবার তো কেউ নাই।

রাত্রি বাড়ে। ভিতরেব আর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। দেওয়ালের ঘড়িটা শুধু তার জন্য অবিরাম সেকেণ্ড গুনিয়া চলে। ফ্যানটা চালানো হয় নাই, আবার গরম বোধ হইতেছে। প্রমীলার ছবিতে জড়ানো মালার মৃদু গন্ধ আবার যেন অস্তিত্ব জানাইয়া দিতে চায়। চোখের মত মন জ্বালা করে রসিকের।

তখন অন্দরের স্তব্ধতা হইতে ভাসিয়া আসে ফুলের গন্ধের মত এক আশ্চর্য্য মৃদু সুব। কে যেন ঘুম-পাড়ানি গান গাহিতেছে।

উৎকর্ণ হইয়া সে সুব শুনিতে শুনিতে রসিক পা নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়ায। চটি ফেলিয়া রাখিয়া খালি পায়ে ভিতরে যায। তার কেমন ভয় করিতে থাকে, একটু শব্দ হইলেই সুর থামিয়া যাইবে।

ঘরে আজ মেজেতে আব একটি বিছানা পাতা হইয়াছে। কাত হইয়া মাথা উঁচু করিয়া পাশে শুইয়া সুধা ঘুম পাড়াইতেছে খোকাকে।

মুখ তুলিয়া সুধা বলিল, 'চুপ। আস্তে।'

রসিক ততক্ষণে কোন শব্দই কবে নাই। আরও সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া সে খাটের বিছানায গিয়া বসিল। সুধা যেন লজ্জা সংকোচ ভুলিয়া গিয়াছে। আঁচলটা একবার টানিবার চেষ্টাও সে কবে না, অসম্বৃত অবস্থাতেই খোকাকে ধীরে ধীরে থাপড়ায় আর মুখে গুনগুন করিযা গাহিয়া যায় ঘুমপাড়ানি গান।

রসিকের কেমন শ্রান্তি বোধ হয়, সমস্ত শবীব যেন ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া আসে। চোখে ধাঁধা লাগিয়া লাগিয়া সুধা ঝাপসা হইয়া যাইতে থাকে, চোখের পাতা ভারি হইযা বুজিয়া আসে।

জড়ানো গলায় সে ডাকে, 'প্রমীলা ? এসো।'

সুধা চাপা গলায সাড়া দেয়, 'আসছি। খোকা ঘুমোক।'

হরিণীব মত চঞ্চলা যার দশ বছরের একটি মেয়ে আছে, তাব মেয়ের অনুকবণে পা দোলানো কেন ?	হবিণীব মতো চঞ্চলা যে দশ বছবেব মেয়ে, তার অনুকরণে পা-দোলানো কেন ? মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৯৬
হঠাৎ তার মনে হইযাছিল, ফুলের মালা দিযা তাব স্মৃতিব মর্যাদা বজায়..	হঠাৎ তাব মনে হইয়াছিল, ফুলের মালা ঘুষ দিয়া স্মৃতির মর্যাদা বজায়... মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ৯৮
আঙুলে আঁচলেব কোণটা জড়াইযা যাইতে পাবে..	নির্বাক সুধারাণীব আঙুলে আঁচলের কোণটা জড়াইয়া যাইতে থাকে মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৯৯

সর্ববিদ্যাবিশারদের বৌ :

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
রঙ ফর্সা, রাগটাগ হলে আমার মুখ এবকম লাল দেখায়।	রাগটাগ হলে আমার মুখ এ রকম লাল দেখায়... মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ১০৩
সব যেন তার কাছে অপোগণ্ড শিশু।	সব যেন তার কাছে অপোগণ্ড শিশু.. মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ১০৪
অকারণে উপবাস করাইয়া রাখে	অকারণে উপোস করাইয়া রাখে... মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ১০৭

অন্ধের বৌ :

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
চোখে একটু যন্ত্রণা বোধ করিতেছিল, ধীরাজ একটু ঝাপসা দেখিতেছিল। বাহির হইতেও চোখ দুটিকে তার বেশ লাল দেখাইতেছিল। কিন্তু বিবাহের বার্ষিক তিথিকে	ধীরাজ চোখে একটু যন্ত্রণা বোধ করিতেছিল, একটু ঝাপসা দেখিতেছিল। চোখ দুটি বেশ লাল দেখাইতেছিল। কিন্তু বিবাহের তিথিকে মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ১০৯
টকটকে লাল চোখ, চোখের যন্ত্রণা, ঝাপসা দেখা, চোখের মধ্যে আলোর ঝলক-মারা এ সব ধীরাজের একেবারে অন্ধ হইয়া যাইবার ভূমিকা। ও সব তারা পরস্পরকে ভালবাসিয়া রাত জাগার সাধারণ ও স্বাভাবিক লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।	টকটকে লাল চোখে, যন্ত্রণা, ঝাপসা দেখা, চোখের মধ্যে আলোর ঝলক-মারা, এ সব অন্ধ হওয়ার ভূমিকা ! ও সব তারা রাত জাগার ফল বলিয়া ধরিয়া নিয়াছে। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ১০৯
ধীরাজের মধ্যে যতখানি হতাশা জাগা উচিত ছিল, ধীরাজের কাছে আমল না পাইয়া তার সবখানি যেন আশ্রয় করিয়াছে সুনয়নাকে আর সমস্তক্ষণ কাবু করিয়া রাখিয়াছে তাকে, ধীরাজের আফসোস আর হা-হুতাশ যেন মুক্তি পাইয়াছে তার মুখে।	ধীরাজের মনে যতখানি হতাশা জাগা উচিত ছিল, ধীরাজের কাছে আমল না পাইয়া তার সবখানি যেন সুনয়নাকে আশ্রয় করিয়া তাকে আত্মহারা করিয়া দিয়াছে। ধীরাজের আপশোশ আর হাহুতাশ যেন মুক্তি পাইতেছে তার মুখে। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ১১০
কানের মধ্যে তখন ভাঙা কাঁসির ঝমঝমানির শব্দ থামিয়া গিয়াছে।	কানের মধ্যে তখন শব্দ থামিয়া গিয়াছে। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ১১১
সুনয়না চুপ। কি বলিবে সে, তার কি বলিবার আছে ? জীবন আর এখন জীবন নয়, নিছক নাটক। লাগসই অভিনয় করিতে তো সে কোনদিন দেখে নাই। কারও বলার অপেক্ষা না রাখিয়া স্নান করিয়া সুনয়না দুটি ভাত খাইল। গুরুজনদের কাছে প্রয়োজনীয় লজ্জা বজায় রাখিয়া চলিতে লাগিল। নীরবে সকলের স্নেহাত্মক সমবেদনার উচ্ছ্বাসভরা অসহ্য কথা শুনিয়া গেল। আর প্রতি মুহূর্তে অনুভব করিতে লাগিল, ভিতরের বন্দী ব্যাকুলতা আর উচ্ছ্বাস ক্রমে ক্রমে যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে। বিকালে থাকিতে না পারিয়া সে পলাইয়া গেল ছাতে। সেখানে অনায়াসে নিজের মনে পাগলের মত যত ইচ্ছা কাঁদাকাটা করিয়া আর গুড়া শ্যাওলার ধূলাতে গড়াগড়ি দিয়া ভিতরে আটকানো প্রচণ্ড আবেগকে সে কতকটা হাল্কা করিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু নির্জ্জনে হিস্টিরিয়াকে প্রশ্রয় দিতে মেয়েদের ভাল লাগে না। মানুষের সামনে যে অন্ধ উচ্ছ্বাস বাহিরে আসিবার জন্য দুরন্তপনা আরম্ভ করে, নির্জ্জনে সেটা রূপান্তরিত হয় উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনায়। কিছুদূরে পুরানো একটা বাড়ীর পিছনে সূর্য্য আড়াল হইয়া যাওয়ার উপক্রম করিতেছে। সোজাসুজি সূর্য্যের দিকে চাহিয়া ঝলসানো চোখে চারিদিক আবছা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সুনয়নার রীতিমত তৃপ্তি বোধ হয়। এই কি তার শাস্তির সূচনা ? স্বামীকে সে অন্ধ করিয়াছে, তাই সেও অন্ধ হইয়া যাইতেছে ? তাই ভাল, চোখ উপড়াইয়া ফেলার চেয়ে ধীরাজ যেমন ঝাপসা দেখিতে আরম্ভ করিয়া অন্ধ হইয়া গিয়াছে, তারও সেভাবে অন্ধ হওয়াই ভাল। রাতের পর রাত জোর করিয়া জাগাইয়া রাখিয়া ধীরাজের চোখ সে নষ্ট করিয়াছে, তার চোখে জল	[অনুচ্ছেদগুলি বর্জিত]

দেখার ভয়ে নিজের চোখের কথা ধীরাজ ভাবে নাই, আজ ধীরাজ একা সেই রাত জাগার ফল ভোগ করিবে কেন ?

চারিদিক আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সুনয়না গভীর হতাশা বোধ করে। কাল রাত্রে কিছুক্ষণের জন্য যেমন অন্ধকার দেখিয়াছিল নিজের জগতে স্থায়ী ভাবে সেই রকম অন্ধকার টানিয়া আনিবার জন্য মন তার ছটফট করিতে থাকে। চারিদিক অন্ধকার হইয়া যাইবে সে জানে, কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া সে জন্য অপেক্ষা করা তার যেন অসম্ভব মনে হয়। সূর্য্যও বাড়ীটার আড়ালে চলিয়া গিয়াছে, সূর্য্যের দিকে যতক্ষণ পারে তাকাইয়া আবার যে একটু সময়ের জন্যও ঝাপসা দেখিবে তারও উপায় নাই।

সূর্য্য একেবারে ডুবিয়া গিয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসে, কিন্তু অন্ধকার কই ? আকাশে তারা ফুটিয়াছে, চাঁদ উঠিয়াই আছে, নীচে ঘরে ঘরে রাস্তায় ঘাটে হাজার হাজার আলো জ্বলিয়াছে। এখানে ওখানে খণ্ড খণ্ড পাতলা অন্ধকার আর ছায়া লুকাইয়া আছে, আলোময় জগতে অস্তিত্বের লজ্জা রাখিবার ঠাঁই আনাচে কানাচে ছাড়া খুঁজিয়া পাইতেছে না।

বিরাজ আসিল। বৌদির জন্য বেচারার দুর্ভাবনার অন্ত নাই।

'এখানে কি করছ বৌদি ?'

'দাঁড়িয়ে আছি।'

'চলো নীচে যাই।'

সুনয়না মৃদু হাসিয়া বলিল, 'তুমি বুঝি ভাবছ ঠাকুরপো, ছাত থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ব ?'

খুব সম্ভব ওরকম কিছুই বিরাজ ভাবিতেছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি অস্বীকার করিয়া বলিল, 'না না, কি যে বল তুমি !'

'দাদা ডাকছে।'

ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ধীরাজের জন্য নয়, যারা ঘরে আসা যাওয়া করিতেছে তাদের জন্য। ঘরে পা দিয়াই সুনয়নার মনে হইল, আলো যেন অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, বালবটা সূর্য্যের মত তীব্র জ্যোতিতে চোখ ঝলসাইয়া দিতেছে। পরক্ষণে কালরাত্রির মত কানের মধ্যে ঝমঝমানি আরম্ভ হইয়া চারিদিক চটচটে অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল, ঝমঝমানি থামিয়া পৃথিবী ডুবিয়া গেল স্তব্ধতায়।

মিনিট খানেক পরে সে স্বামীকে দেখিতে পাইল, তার কথাও শুনিতে পাইল।

'কে এল ? তুমি নাকি ?—'

সুনয়না আগে আলোটা নিভাইয়া দিয়া বিছানার কাছে গেল। আলো তার সহ্য হইতেছিল না। ধীরাজের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টামাত্র না করিয়া মোটা চাদর মুড়ি দিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

'কি হয়েছে ? শুয়ে পড়লে যে ?'

'শরীরটা খারাপ লাগছে।'

তেমনিভাবে চাদর মুড়ি দিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুনয়না নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিল। ঘরে মানুষের আসা যাওয়া চলিতে লাগিল, মাঝে মাঝে

সুইচ্ টেপার শব্দে সে টের পাইতে লাগিল, আলো জ্বলিতেছে নিভিতেছে। সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া কেউ তাকে ডাকিল না। এক সময় ধীরাজের খাবার আসিল, কাকীমা নিজে কাছে বসিয়া তাকে খাইতে সাহায্য করিলেন। বিরাজের হাত ধরিয়া সে বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিল। চুরুটের গন্ধে সুনয়না বুঝিতে পারিল, বিছানায় ওঠার বদলে সে আরাম কেদারায় বসিয়া চুরুট ধরাইয়াছে।

কাকীমা আস্তে আস্তে তাকে ঠেলিয়া বলিলেন, 'খাবে এসো বৌমা।'

তখনও সুনয়না মুখ তুলিয়া চাহিল না।—'কিছু খাব না। শরীরটা বড় খারাপ লাগছে।'

'একটু গরম দুধ খাও তবে ? বিকেলে চা-ও তো খাওনি।'

'কিছু খেলেই বমি হয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ পরে ধীরাজ তাকে ডাকিল, কিন্তু সে সাড়া দিল না। আরাম কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া ধীরাজ ঘরে হাতড়াইয়া ফিরিতেছে টের পাইয়া তার ইচ্ছা হইতে লাগিল, উঠিয়া গিয়া স্বামীকে বিছানায় শুইতে সাহায্য করে। কিন্তু আজ একদিন সাহায্য করিয়া আর কি হইবে ? আজ-কালের মধ্যে সেও তো অন্ধ হইয়া যাইবে !

হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দরজা দিয়া ধীরাজ শুইয়া পড়িল। ধীরাজ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বুঝিবার পর সুনয়না অনুভব করিতে লাগিল, ইতিপূর্ব্বে দু'বার চোখে অন্ধকার দেখিবার সময় যে দম আটকানো স্তব্ধতা চারিদিকে নামিয়া আসিয়াছিল ঠিক সেইরকম স্তব্ধতা তাকে ঘিরিয়া জমাট বাধিয়া উঠিতেছে। দামী ক্লকটার ঘণ্টা বাজার গম্ভীর আওয়াজ পর্য্যন্ত যেন অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। বমির মত কি যেন ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছিল—কেবল বুক ভাঙ্গিয়া নয়—মাথাটা পর্য্যন্ত যেন চুরমার করিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়।

রাত বারোটা বাজিবার পর সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। বাহিরে গিয়া বমি করিয়া আসিলে ভাল লাগিবে ভাবিয়া সে উঠিয়া পড়িল। ঘর অন্ধকার। ঘরে আলো জ্বলিবার সময় দু'বার মিনিট খানেকের জন্য যেমন গাঢ় চটচটে অন্ধকার দেখিয়াছিল, তার চেয়েও ঘন অন্ধকার। আন্দাজে সুইচের কাছে গিয়া সুইচে হাত দিয়া সে স্তব্ধভাবে খানিকক্ষণ সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

সুইচ নামানোই ছিল।

ধীরাজ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দরজা বন্ধ করিয়াছে, আলো নিভায় নাই। এই অন্ধকার ঘরে এখনো আলো জ্বলিতেছে। সে তবে সত্যই অন্ধ হইয়া গিয়াছে ?

যে স্পেশালিস্ট ধীরাজের চোখ পরীক্ষা করিয়াছিলেন পরদিন তিনিই নানাভাবে সুনয়নার চোখও পরীক্ষা করিলেন। তারপর বিব্রতভাবে আরও একজন বড় চোখের ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিলেন। কিন্তু অনেক রকম পরীক্ষা আর পরামর্শের পরও দুজনে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, সুনয়নার চোখ কেন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া স্পেশালিস্ট মত প্রকাশ করিলেন : এটা অপ্‌টিক্ নার্ভের অসুখ। কদাচিৎ মানুষের এ অসুখ হয়।

দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হয়েছে ভাদ্রের বদলে আশ্বিনে। ১ চলী, দ্বিতীয় পর্বের বদলে পত্রিকায় 'দ্বিতীয় খণ্ড' রূপে চিহ্নিত হয়েছে।

সহরতলী দ্বিতীয় পর্ব গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বে এটি যে পত্রিকা নামক সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, এরূপ তথ্য ইতিপূর্বে মানিক-গবেষকদের কাছে সম্ভবত অজ্ঞাত ছিল। পত্রিকার পাঠ ও গ্রন্থের পাঠে যথেষ্ট পরিবর্তনের উদাহরণ মেলে না। কেবল পত্রিকার পাঠের তুলনায় গ্রন্থে সূচনা থেকেই বহু বর্ণনা, সংলাপ ইত্যাদি যুক্ত করে কাহিনিটিকে লেখক সমৃদ্ধ সংহত ও দীর্ঘতর করেছেন। গ্রন্থে (মানিক রচনাসমগ্র ৩ পৃ ২১৭) আছে :

> যশোদাব লাথিতে তার বান্নাঘবেব উনুন তিনটি ভাঙিয়া গেল। বাড়ি ছাড়িয়া যাওযাব সময নাকি উনুন ভাঙিয়া দিয়া যাইতে হয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে এখান থেকে শুরু হয়েছিল। পরবর্তী পাঠে ভাষাগত-বাক্যগত কিছু সংস্কার উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। তবে পত্রিকার কোনো উল্লেখযোগ্য পাঠ উপন্যাসে বর্জিত হয়নি, বরং বহু নতুন অংশ যুক্ত হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের অন্য কোনো কোনো উপন্যাসের মতো পত্রিকাপাঠ ও গ্রন্থপাঠে এখানেও অধ্যায়-নির্দেশে গোলমাল আছে। পত্রিকাব 'তিন' অধ্যায়ে যশোদার সঙ্গে শ্রমিকনেতা বিধুবাবুর আলাপ, সত্যপ্রিয়-সুব্রতার সম্পর্ক স্থাপনের কথা আছে। গ্রন্থের 'তিন' অধ্যায়ে যশোদার নতুন ভাড়াটে সুব্রতা-অজিতার আগমন এবং তাদের সঙ্গে যশোদার সম্পর্ক গড়ে ওঠার বিবরণ আছে। গ্রন্থের 'চার' অধ্যায়ে যশোদার বাড়িতে সুব্রতাব উদ্যোগে একটি মহিলা-মজলিশ ও সংগীতসভা গড়ে তোলাব বিবরণ আছে। পত্রিকায় এরপর স্পষ্ট করে অধ্যায় নির্দেশিত হয়নি। পত্রিকার 'তিন' অধ্যায় গ্রন্থে 'ছয়' অধ্যায় হয়েছে। কুমুদিনীর স্বামীর নাম রাজেন-এর স্থলে দু-একবার ভ্রান্তিবশত কেদাব লেখা হলেও লেখক পাদটীকায় সে ভুল সংশোধন করেছেন (দ্র পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩৪৬ সংখ্যার কিস্তি, পৃ ৩১২)।

পাণ্ডুলিপিব সাহায্যে গ্রন্থেব কিছু কিছু অংশের পাঠ সংস্কাব কবা সম্ভব হয়েছে (পাণ্ডুলিপি-পরিচয় দ্রষ্টব্য)।

সহরতলী উপন্যাস রচনার পূর্বে 'সহরতলীর উপকথা' এই শিরোনাম ব্যবহারের ইচ্ছাও লেখকের মনে জেগেছিল, পাশের পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠায় তার সাক্ষ্য আছে।

উপন্যাসটির প্রথম পর্ব চতুর্থ পরিচ্ছেদে যশোদার মুখে ব্যবহৃত একটি ছড়া শারদীয় আনন্দবাজার (১৩৪৬) থেকে শুরু করে উপন্যাসটির সর্বশেষ সংস্করণ পর্যন্ত সর্বত্র একইভাবে মুদ্রিত হয়ে এসেছে :

ছদ্মবেশী ভীমকে পেয়ে কীচক খুসী ভারী
ছদ্মবেশী ভীমকে পেয়ে কীচক খুসী, নারী।

বস্তুত পাঠটি অভ্রান্ত নয়। ছড়াটির শুদ্ধরূপ পাওয়া যায় পাণ্ডুলিপিতে :

ছদ্মবেশী ভীমকে পেয়ে কীচক খুসী ভারি,
সৈরিন্ধ্রী লো! এ জগতে তুমিই সেরা নারী।

ছদ্মবেশী ভীমকে পেয়ে কীচক খুসী ভারি
সৈরিন্ধ্রী লো ! এ জগতে তুমিই সেরা নারী।
(দ্র মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ১৬৭)

সহবতলী উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের কথাও বোধ হয় কোনো এক সময়ে লেখক ভেবেছিলেন। অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থে (পৃ ৩৪১) লেখক-প্রস্তাবিত প্লটের উদাহরণস্বরূপ এই তথ্যটি পাওয়া যায় :

সহরতলী — তৃতীয় খণ্ড
নন্দর বাড়ী যাওযাব পব অন্যদিকের সহরতলীতে আধুনিক ধনী মার্জ্জিত শ্রেণীব সংস্পর্শে যশোদা
(১ম খণ্ড — কুলিমজুর ২য় খণ্ড — মধ্যবিত্ত শ্রেণী)

এতদ্‌ভিন্ন ডায়েবিব দু-একস্থানে সহরতলী রচনাসূত্রে লেখকের মৃগী-রোগ সংক্রান্ত উল্লেখও এইসূত্রে স্মর্তব্য (দ্র অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ৩৪৭)।

সহবতলী উপন্যাসেব কোনো পর্বেবই ইংরাজি ব ন্যন্য কোনো ভাষায় অনুবাদ বলে জানা যায়নি।

অহিংসা

'অহিংসা' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্দশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ ও অষ্টম উপন্যাস। অহিংসা-র প্রকাশক গোপালদাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃ ২ + ২৬১, দাম আড়াই টাকা। প্রকাশকাল গ্রন্থে উল্লিখিত আছে শ্রাবণ ১৩৪৮ (জুলাই আগস্ট ১৯৪১)। সজনীকান্ত দাস ভ্রমক্রমে প্রকাশকাল ১৯৪৮ বলে উল্লেখ করেছিলেন। উপন্যাসাকারে প্রকাশের পূর্বে অহিংসা পরিচয় পত্রিকায় মাঘ ১৩৪৫ থেকে পৌষ ১৩৪৭ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। শ্রীসরোজ দত্ত তাঁর ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ থেকে পৌষ এই ছটি সংখ্যায় কোনো কিস্তি প্রকাশিত হয়নি। তথ্যটি সঠিক নয়। কারণ প্রতি সংখ্যাতেই উপন্যাসের কিস্তি বেরিয়েছে। পরিচয়ে অহিংসা প্রকাশের অন্তর্বর্তী সময়েই ১৩৪৬-এর শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় সহরতলী প্রথম প্রকাশিত হয়।

অহিংসা ১৯৫২ সালে বসুমতী সাহিত্যমন্দির প্রকাশিত মানিক গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় ভাগে পুনঃপ্রকাশিত হয় (প্রথম ভাগ ১৩৫৭, দ্বিতীয় ভাগ ফাল্গুন ১৩৫৮)। বসুমতী-র গ্রন্থাবলিভুক্তির কারণে ডি এম লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী বসুমতীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাগ্রহণের কথা ভেবেছিলেন, এই মর্মে মানিক-ডায়েরির ১.১.১৯৫৩ তারিখের পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। সম্ভবত সে ইচ্ছা কার্যসিদ্ধ হয়নি।

অহিংসা উপন্যাসের পরবর্তী দুটি সংস্করণ যথাক্রমে আশ্বিন ১৩৬৮ ও অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, প্রকাশক যথাক্রমে মিত্রালয় ও লেখাপড়া। বসুমতী সংস্করণে মোটামুটি প্রথম সংস্করণের পাঠই গৃহীত হয়েছিল, লেখক কোনো সংস্কার বা পরিবর্তন করেননি, বরং অনবধানতাবশত উপন্যাসভুক্ত কিছু শব্দ বাদ গেছে। যেমন নবম অধ্যায়ের প্রথম বাক্যে 'পিঠাপায়েস' স্থলে বসুমতীর পাঠে শুধু পিঠার উল্লেখ আছে। উনিশ অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্য—

> তা বটে, সুযোগ পাওয়া মাত্র সুযোগের সদ্ব্যবহার করা সদানন্দের পক্ষে অসম্ভব নয়। তবু—। মাথা হেঁট করিয়া মহেশ চুপ করিয়া...

বসুমতী-র পাঠে 'তবু—' শব্দটি বাদ পড়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদের সর্বশেষ বাক্য, উপন্যাসে আছে—

> মাধবীলতাকে হারানোর পর মাধবীলতাকে পাওয়ার চিন্তা ছাড়া সদানন্দের কি অন্য চিন্তা থাকিতে পারে ?

বসুমতী-র পাঠে 'মাধবীলতাকে হারানোর পর' বাক্যাংশটি বাদ পড়েছে। বর্তমান মানিক রচনাসমগ্রে প্রথম সংস্করণের পাঠই গৃহীত হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে লেখক কিছু কিছু সংস্কার করেন। যেমন, পত্রিকায় প্রথম সংখ্যার কিস্তিতে 'প্রথম ভাগ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কোনো সংখ্যায় তার পুনরুল্লেখ নেই, অথবা গ্রন্থপ্রকাশকালে উক্ত শব্দটি ব্যবহার করে পরবর্তী দ্বিতীয় ভাগ রচনার পরিকল্পনাও জ্ঞাপন করেননি। অধ্যায় অর্থে 'প্রথম ভাগ' ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও পরবর্তী কিস্তিগুলিতে অধ্যায় নির্দেশক শব্দরূপে কেবল সংখ্যাবাচক শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। পত্রিকার প্রতি কিস্তিই স্বয়ংসম্পূর্ণ অধ্যায় নয়। পত্রিকার প্রায় প্রতি কিস্তিই 'পূর্বানুবৃত্তি' এই শব্দে সূচিত, কেবল ১৩৪৭ সংখ্যায় পূর্বানুবৃত্তি শব্দটি ছাপা হয়নি।

পত্রিকায় প্রকাশিত কিস্তি অনুযায়ী উপন্যাসের অধ্যায় বিভাগ নিম্নরূপ :

১৩৪৫	মাঘ প্রথম ভাগ	এক		মাঘ (পূর্বানুবৃত্তি)	দশ
	ফাল্গুন (২)	এক		ফাল্গুন (পূর্বানুবৃত্তি)	এগারো
	চৈত্র [কিছু লেখা নেই]	দুই		চৈত্র (পূর্বানুবৃত্তি)	বারো
১৩৪৬	বৈশাখ [কিছু লেখা নেই]	তিন	১৩৪৭	বৈশাখ (পূর্বানুবৃত্তি)	তেরো
	জ্যৈষ্ঠ [কিছু লেখা নেই]	চার		জ্যৈষ্ঠ (পূর্বানুবৃত্তি)	চোদ্দ
	আষাঢ় [কিছু লেখা নেই]	পাঁচ		আষাঢ় (পূর্বানুবৃত্তি)	পনেরো
	শ্রাবণ (পূর্বানুবৃত্তি)	পাঁচ		শ্রাবণ (পূর্বানুবৃত্তি)	ষোলো
	ভাদ্র 'চার'	ছয়		ভাদ্র (পূর্বানুবৃত্তি)	ষোলো ও সতেরো
	আশ্বিন (পূর্বানুবৃত্তি)	ছয়		আশ্বিন (পূর্বানুবৃত্তি)	সতেরো
	কার্তিক (৫)	সাত		কার্তিক (পূর্বানুবৃত্তি)	আঠারো
	অগ্রহায়ণ (পূর্বানুবৃত্তি)	আট		অগ্রহায়ণ [লেখা নেই]	উনিশ
	পৌষ (পূর্বানুবৃত্তি)	আট ও নয়		পৌষ (পূর্বানুবৃত্তি)	কুড়ি

পত্রিকার সঙ্গে প্রকাশিত গ্রন্থের পাঠে কয়েকটি পরিবর্তনের উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রথম পাঠে লেখক ক্রিয়াপদে সম্ভ্রমাত্মক প্রয়োগ রক্ষা করেছিলেন, চরিত্রবিশেষে :

> সদানন্দ বলিলেন...
>
> বয়স্কা মহিলাটি অন্য সব অনুকরণে সায় দেন, গোলমাল করেন কেবল খাদ্যের পরিমাণটা লইয়া। বলেন, মরণ তোমার ।
>
> সন্ধ্যা হইল, রাত্রি বাড়িতে লাগিল, মহেশ চৌধুরী গাছতলায় মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিলেন।...

কিন্তু ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যার কিস্তি অর্থাৎ উপন্যাসের আট অধ্যায় থেকে সম্ভ্রমাত্মক ক্রিয়াগুলি সাধারণ ক্রিয়ায় রূপান্তরিত দেখা যায়। ১৩৪৬ ফাল্গুন সংখ্যায় কিস্তির শেষ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে লেখকের একটি কৈফিয়ত প্রকাশিত হয়েছিল—

'কয়েকজন মুখে এবং তিনজন পত্র লিখে আমায় অনুযোগ করেছেন, প্রথম দিকে সদানন্দ, মহেশ এঁরা সব 'করিলেন' 'বলিলেন'-এর পর্যায়ে ছিলেন, কয়েক সংখ্যা আগে থেকে এঁরা হঠাৎ 'করিল' 'বলিল'-এর পর্যায় নেমে গেলেন কেন ? ব্যাপারটা আমার ইচ্ছাকৃত, অসাবধানতা নয়। 'আপনি', 'তুমি' এবং 'তুই'-এর সুবিধা-অসুবিধার কথা অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম। চিন্তাগুলি এখানে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমার ধারণা হয়েছে, গল্প উপন্যাসের কোন চরিত্রে আপনিত্ব এবং কোন চরিত্রে তুমিত্ব আরোপ না করাই লেখকের উচিত। প্রথমে সদানন্দ 'করিতেন' এবং বিপিন 'করিত'—অর্থাৎ বিপিনের চেয়ে সদানন্দ যেন লেখকের কাছে অধিক সম্মানের পাত্র ! অবশ্য সাধারণের মনে সামাজিক জীবনে কার স্থান কোথায়, কার বয়স কত, এ সম্বন্ধে পাঠকের মনে ধারণা সৃষ্টি করতে 'আপনি' ও 'তুমি'র প্রয়োগ কিছু কাজে লাগে, কিন্তু সেটা খুবই সামান্য। চরিত্রগুলির প্রয়োজনীয় পরিচয় পাঠককে না জানালে তো আর চলে না, 'আপনি' ও 'তুমি'র বদলে কেবল 'তুমি'তেও সে কাজটা অনায়াসে চলে। ভবিষ্যতে আমার সমস্ত লেখার মধ্যেই নরনারীরা 'করিবে', 'বলিবে' ।' লেখক

পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৪৬, পৃ ১৫৪ [পাদটীকা]

উপন্যাসের ষোলো অধ্যায়ে পত্রিকার পাঠের সঙ্গে গ্রন্থের পাঠে সামান্য একটি বাক্য বর্জিত হয়েছে। সেটি লেখকের মন্তব্য। পত্রিকার পাঠটি উদ্ধৃত হল—

'কমে বৈকি, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক ক্ষমা চাইলেই মানুষের রাগ কমে যায়। তখন কি মনে হয় জানিস, মনে হয় এবারকার মতো চুলোয় যাক, আবার যদি লোকটা কিছু করে তো দফা নিকেশ করে দেব। আমি জোর করে ক্ষমা চাওয়ালে কি হবে, নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা তো তাকে সত্যি সত্যি চাইতে হয়েছিল। ক্ষমা চাওয়ার পর আগের মতো জোরালো রাগ পুষে রাখতে মানুষের বড় বিরক্তি বোধ হয়।'

[লেখকের মন্তব্য : কথাটা মিথ্যা নয়।]

বিভূতি বিশ্বাস করিল না।

পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৪৭, পৃ ৪৫

মুদ্রিত উপন্যাসে এই বন্ধনীধৃত লেখকের মন্তব্য-বাক্যটি লেখক বর্জন করেছেন।

পত্রিকার প্রথম দুই কিস্তির পাঠের সঙ্গে মুদ্রিত উপন্যাসের পাঠের দু-একটি গুরুতর পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। পত্রিকার পাঠের কিছু অংশ গ্রন্থে বর্জিত হয়েছে। সেই বর্জিত অংশ পত্রিকা থেকে যথাযথ উদ্ধৃত হল। সূত্ররক্ষার জন্য মুদ্রিত উপন্যাসের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি পূর্বেই দেওয়া হল :

সদানন্দ চুপ। আনমনে কথা বলার চেয়ে নীরবে আনমনা হওয়া ঢের সহজ। একটু অপেক্ষা করিয়া বিপিন কুটিরের দিকে চলিয়া গেল। আর ফিরিয়া আসিল না। সূর্য নামিয়া গেলে তপোবনের গাছের আড়ালে, মেয়েদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল, সকলকে পা ছুঁইয়া প্রণাম করিবার ও প্রণামি দিবার অনুমতি দিয়া সদানন্দ ঠায় বসিয়া রহিল রক্তমাংসের দেবতার মতো। দেবতার মতোই তার মূর্তি, বটতলার ছবির মহাদেবের ছাঁচে ঢালিয়া যেন তার সৃষ্টি হইয়াছে। আসন করিয়া বসায় ভুঁড়ি গিয়া প্রায় ঠেকিয়াছে পায়ে, এবং তাতেই যেন মানাইয়াছে ভালো। নয় তো এই বৃষস্কন্ধ বিশালদেহ পুরুষের চওড়া বুক আর পেশীবহুল সুডৌল বাহু দেখিয়া মনে হইত, দেহের শক্তি ভিন্ন আর বুঝি তার কিছু নাই। কথায় তাহা হইলে মানুষ মুগ্ধ হইত, কারও ভক্তি জাগিত কিনা সন্দেহ। মাথায় জটা নাই বলিয়া ভক্তেরা অনেকে মনে মনে আপশোশ করে। যার সৌম্য প্রশান্ত মূর্তি স্থৈর্যের নিখুঁত প্রতীক, জটা ছাড়া কি তাকে মানায় ?

মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৮০

এরপর উপন্যাসে বর্জিত, পরিচয় পত্রিকার কিস্তিতে মুদ্রিত অংশ উদ্ধৃত হচ্ছে :

সদানন্দের মুখে যে উদ্বেগের ছাপ পড়িয়াছিল, মাথার জটায় হয়ত তা আড়াল হইয়া থাকিত। তবে তার মুখে উদ্বেগের ছাপ দেখিয়াও দেখিবার মত মানুষ এখানে কেউ নাই। প্রণাম করিয়া মাথা তুলিয়া যদি কারও চোখে পড়ে, সাধুজীর মুখে চোখে অস্বস্তির ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া আছে, নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করিবে না, মনে করিবে তারই দৃষ্টিবিভ্রম। সাধুজী নির্বিকার, সাধুজীর স্বস্তি-অস্বস্তি নাই।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতে আসিতে অধিকাংশ দর্শনপ্রার্থী ও প্রার্থিনী বিদায় হইয়া গেল। রহিল কেবল আশ্রমে যারা বাস করে তারা এবং অন্ধকারে তপোবন পাব হইয়া গ্রামে ফিরিবার ভয় জয় করার মত গভীর বৈরাগ্য যাদের জন্মিয়াছে এমন কয়েকজন গ্রামবাসী। আশা তাদের মিটিবার নয়। সংসারে তাদের এমন গভীর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে যে আশ্রমে আসিয়া বাস করিবাব জন্য তারা পাগল, সাধুজীর পদতলে দিবারাত্রি পড়িয়া থাকিবার কামনা ছাড়া আর সব সাধ তারা বিসর্জ্জন দিয়াছে। কিন্তু আশ্রমে বাস করিবার অনুমতি তাবা পায় না। বড গবীব তারা, বিপিন তাদের এ অধিকার দিতে নারাজ। তাদেব ব্যাকুল প্রার্থনার জবাবে সদানন্দকে তাই বলিতে হয়, অধিকার না জন্মালে তো অনুমতি পাবে না বাপু। কেবল দারিদ্র্য নয়, আরও অনেক কারণে বিপিন অনেককে আশ্রমবাসের সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। বাগবাঁদা গায়ের মহেশ চৌধুরীর টাকা আছে যথেষ্ট, কিন্তু তাব উপর বড় রাগ রাজাসায়েবের। মহেশ চৌধুরীর ছেলে খাসমহলেব প্রজাদের তিন বছরের মধ্যে প্রায় ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিল। রাজাসায়েবের এক বিদেশী অতিথিকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করায় ছেলেটা জেলে গিয়াছে তাই বক্ষা, নয় তো কোথাকাব জল কোথায় গিয়া দাঁড়াইত কে জানে।

মহেশ চৌধুরী আজও প্রত্যাশীর ভঙ্গিতে বসিয়া আছে দেখিয়া সদানন্দ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মহেশ চৌধুরী সম্বন্ধে বিপিনের নির্দেশ বড় কঠোর। সকলের সামনে মহেশ চৌধুরীকে অপদস্থ কবিতে হইবে, বলিতে হইবে সে মহাপাপী, সারাজীবন প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তার আশ্রমবাসের অধিকার জন্মিবে না। রাধাই নদীতে ঘোলা জলের স্রোত দেখিতে দেখিতে মনটা আজ কেমন বিগড়াইয়া গিয়াছে, আজ কোন মানুষকে এমন ভয়ানক কথা বলিবার ক্ষমতা সদানন্দের নাই। একদিনে দুবাব বিপিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবাব সাহসও তার নাই। বিশেষতঃ রাজাসায়েব যখন স্বয়ং আশ্রমে হাজিব হইয়াছেন, মহেশ চৌধুরীর আবেদন-নিবেদন এড়াইয়া চলাই আজ ভাল।

পরিচয়, মাঘ ১৩৪৫, পৃ ৪৯-৫০

পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যার পরবর্তী কিস্তির অনেকটা অংশও উপন্যাসে বর্জিত হয়েছে। সেই বর্জিতাংশ নিম্নরূপ :

অহিংসা

(২)

রাধাই নদীর তীর ঘেঁষিয়া একা মন্থব পদে আশ্রমেব দিকে হাঁটিতে আরম্ভ কবিয়াই চোখ মিট মিট কবে সদানন্দেব, অকারণে ঘন ঘন পলক পড়ে। শান্ত নির্ব্বিকাব দৃষ্টিব পলকে পলকে বূপান্তব ঘটিয়া স্বাভাবিক বিষণ্ণ ক্ষোভাতুব দৃষ্টি ফিরিয়া আসিবার ঠিক একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়াব মত। একটু গিয়াই চোখে পড়ে তাঁব নিজেব আশ্রম, লতায় ঢাকা প্রাচীর দিয়া ঘেবা শণের ছাউনি দেওয়া কতকগুলি ঘর। আসন্ন সন্ধ্যাব আবছা আলোয় তপোবনেব সবুজ পটভূমি কালো হইয়া জমাট বাঁধিতেছে,—এদিকে নদীর ওপারে সমতল ক্ষেত গিয়া মিলিয়াছে দিগন্তে, দূরে গ্রামের কুটীরগুলিকে আকাশের বিলীয়মান জ্যোতি আর রঙের ছলনায় কুটীব বলিয়া চিনিয়াও যেন চেনা যায় না। বীভৎসই দেখাইতেছে বটে তার আশ্রমকে।

সাত বছর আগে দেশের নামে যে জেলখানায় অনেকগুলি দিন কাটাইয়াছিলেন, তার দেয়ালে ইটেব উপব মাখানো ছিল মেটে লাল রঙ, মোটা শিক বসানো জানালা ছিল সবুজ, কত পুবু আর উঁচু ছিল সেখানকার বহিঃপ্রাচীর, লতা দিয়া প্রাচীর ঢাকিবার ব্যবস্থা তো সেখানে ছিল না, ঘরের উপর শণের ছাউনি দিবার ব্যবস্থা। আশ্রমকে তবু তার কেন মনে হয় জেলখানা ? কয়েদী কেন মনে হয় নিজেকে ?

প্রয়োজন ছাড়া বিপিন সদানন্দকে সকলের সামনে বাহির করিতে চায় না। তাকে সকলের চোখেব আড়ালে রাখিবার জন্য সে ব্যাকুল। ম্যাজিকওয়ালার কালো পর্দ্দার মত স্পষ্ট আর অস্বাভাবিক ব্যবধান রচনা না করিয়া সহজ সরল উপায়ে এই কাজটা করা সে বড় কঠিন মনে করে। এ বিষয়ে তার সতর্কতারও সীমা নাই, দুশ্চিন্তারও সীমা নাই। প্রথম যৌবনে মেয়েরা যেমন বিপদে পড়ে নিজের নিজের শরীর লইয়া, বিপিনের সমস্যাও তেমনি জটিল। সকলে দেখুক সদানন্দকে, কিন্তু যখন-তখন যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন অবস্থায় কেউ যেন তাকে না দেখে।

সদানন্দ আড়ালেই থাকেন, ধরিতে গেলে একরকম অন্তঃপুরেই। আশ্রমে যারা বাস করে তাদের জন্য ঘর তোলা হইয়াছে তফাতে, সদানন্দের বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে নদীর কাছে খানিকটা স্থান প্রাচীর দিয়া ঘেরিয়া। সদানন্দ আপত্তি করিয়াছিলেন। প্রাচীর কেন ? আশ্রমে কি প্রাচীর মানায়, সাধুসন্ন্যাসীর আশ্রমে ? বিপিন যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছিল, এতো সেকেলে সাধুসন্ন্যাসীর আশ্রম নয়।

'আমার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হলে সকলে কি মনে করবে বিপিন ?'

'মনে করবে কচু। তুই বিশিষ্ট মানুষ, তোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না হলেই লোকের মন খুঁত খুঁত করবে।'

বিপিন তখনও শতকরা নব্বই ভাগ বন্ধু, সবে শিষ্য ও আশ্রমের ম্যানেজার হইয়াছে।

উঠিল প্রাচীর। লতায় পাতায় প্রাচীরকে ঢাকিয়া যতদূর সম্ভব চোখের আড়াল করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে বিপিন কিন্তু ভুলিল না। তারপর প্রাচীরের ভিতরে গাছপালা যতদূর সম্ভব বজায় রাখিয়া বিপিন ঘর তুলিল তিনভাগে। সদর, অন্দর আর অন্তঃপুর ছাড়া সে তিনভাগের ঠিকমত আর কোন সংজ্ঞা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সদরে সকলের প্রবেশাধিকার রহিল, বিনানুমতিতে। অন্দরে ঢুকিবার ও বাস করিবার অধিকার রহিল কেবল বাছা বাছা কয়েকজনের, যারা ভক্ত ও শিষ্যের মধ্যে বিশিষ্ট অথবা যারা দূরদেশ হইতে আগত দুদিনের অতিথিদের মধ্যে বিশিষ্ট, অথবা সদানন্দ ও তার অতিথিদের সেবার জন্য যাদের দরকার। অন্তঃপুরে ঢুকিবার অধিকার রহিল কেবল সদানন্দ আর বিপিনের।

সদানন্দ আপত্তি করিয়াছিলেন। একি গোপনতা, ঢাকাঢাকির ব্যবস্থা ? সাধুসন্ন্যাসীর কি এভাবে ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকা মানায় ?

বিপিন যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছিল, সে তো আর আসলে সাধুসন্ন্যাসী নয়।

'লোকে কি ভাববে বিপিন ?'

'ভাববে তোর মাথা। ভাববে, সাধুজী নির্জনে অহোরাত্র সাধন ভজন করছেন।' আড়ালে বিপিন তখনও বন্ধু।

পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৪৫, পৃ ১৩৭-৩৯

উপন্যাস-গৃহীত পরবর্তী পাঠ এইরূপ :

সদানন্দের কুটিরের সদর আর কিছুই নয়, বড়ো একখানা ঘর। মেঝে লাল সিমেন্ট করা, দেয়াল গেরুয়া রঙের,—বাদামি ভাবটা একটু প্রকট। আশ্রমের ছোটোবড়ো সমস্ত ঘরই এই ধরনের, উপরের ছাউনি ছাড়া বাকি সব চুনসুরকি ইটকাঠের ব্যাপার। কিন্তু বিপিনের ভাষায় এগুলি সব কুটির।

মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৮০

পত্রিকার পাঠে 'সদানন্দের কুটিরের' অংশটি কেবল ছিল না। এই অধ্যায়ে আরও কিছু অংশের পাঠে পত্রিকা ও গ্রন্থে পার্থক্য আছে। উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের শেষাংশে সদানন্দের আশ্রমে মাধবীলতার আবির্ভাবের বিবরণের অংশ এইরূপ :

বলিয়া খিলখিল করিয়া মাধবীলতার কী হাসি। গলায় জড়ানো হাতের বাঁধন খুলিয়া সদানন্দ তাকে ঠেলিয়া দিয়া ঘরে চলিয়া গেল। পড়িয়া গিয়া আঘাতের ব্যথায় মাধবী ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৮২

উপন্যাসে বর্জিত, পত্রিকায় মুদ্রিত পরবর্তী অংশ :

[লেখকের মন্তব্য : রাধাই নদীতে যেদিন প্রথম নববর্ষার জলস্রোত আসিল, সেইদিন মাধবীলতার নাটকীয় আবির্ভাবটা খাপছাড়া ঘটনার পর্য্যায়ে পড়ে সন্দেহ নাই। মাধবীলতা যে আজ সদানন্দের আশ্রমে আসিয়া হাজির হইয়াছে, এ দোষ আর কারও নয়, তাকে যে আশ্রমে আনিয়াছে তারও নয়, দোষ আমার। কারও মন যদি খুঁত খুঁত করে, রাধাই নদীর নবজন্ম আর মাধবীলতার আবির্ভাবের মধ্যে যতদিন খুসী সময়ের ব্যবধান কল্পনা করিয়া লইতে পারেন, হয়তো কালের ব্যবধান সত্যই ছিল, কিন্তু কাহিনীর গতি সে-কালের হিসাব জানে না যে-কালের প্রয়োজন নাই, 'কিছুদিন পরে' দিয়া যে-কালকে পরম অবহেলার সঙ্গে ঠেলিয়া দেওয়া যায়। সত্য কথাটা

বলি। সদানন্দের আশ্রমের বর্ণনা দিবার সময় অন্তঃপুরের উঠানে নিঃসঙ্গ তালগাছের কথাটা লেখার আগে মাধবীলতাকে আশ্রমে আনা দূরে থাক, মাধবীলতা বলিয়া যে কেউ আছে তাও আমি জানিতাম না। হঠাৎ মনে হইল, এরকম একটা খাপছাড়া গাছে একটি মেয়েকে ঠেস্ দিয়া দাঁড় করাইয়া দিলে তো মন্দ হয় না। বাস্ চোখের পলকে মাধবীলতার জন্ম। কিছুই ছিল না তালগাছটার তলায়,—কবে কে দা' কুড়াল কিছু একটা অস্ত্র দিয়া আঘাত করিয়াছিল গাছটার গুঁড়িতে, সেই ক্ষতের চিহ্ন, মাটি ঘেঁষিয়া কয়েকটা সরু সরু শিকড়ের ইঙ্গিত, সিমেণ্টে কখন বিপিন আনমনে পানের পিক ফেলিয়াছিল, তার প্রায় মুছিয়া যাওয়া দাগ, হাত দেড়েক তফাতে নর্দ্দমার কাছে এক বালতি জল আর একটা ঘষামাজা ঘটি,—এই সব খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত মনের ছবিতে এমন স্পষ্ট ভাবে আঁকা হইয়া গিয়াছিল যে মাধবীলতার পা ফেলিবার কয়েক ইঞ্চি স্থানও অবশিষ্ট ছিল না। তবু চাহিয়া দেখি, মাধবীলতা নিমেষের মধ্যে গাছে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, পায়ের জুতার চামড়ায় সেলাই-এর দাগ হইতে গালের চামড়ায় একটিমাত্র ছোট ব্রণের দাগটি পর্য্যন্ত আমার কাছে অস্পষ্ট রাখে নাই। এমনভাবে যে আসে তাকে মারিয়া ফেলার মত নির্ম্মম হওয়া যায় না, আসিতে না দিয়া পারা যায় না। লেখক হিসাবে আমি আমার এ রকম অনেকগুলি চরিত্রের কাছে আগেও হার মানিয়াছি। সকল লেখককেই এ পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। কারও রেহাই নাই।]

পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৪৫, পৃ ১৪২-৪৩

উপন্যাসের পরবর্তী অনুচ্ছেদ থেকে পত্রিকার পাঠের সঙ্গে যথাযথ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় :

মাধবীলতার কান্না শুনিয়া পূবের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল বিপিন আর সাহেবি পোশাক পরা একটি যুবক। দুজনে ধরাধরি করিয়া মাধবীলতাকে লইয়া গেল ঘরে। মাধবীলতা কাঁদিতে কাঁদিতে কেবলই নালিশ করিতে লাগিল, সাধুজী আমায় মেরেছে, ঠেলে ফেলে দিয়েছে আমায়। আমি এখানে থাকব না, আমায় নিয়ে চলো।

মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৮২

অধ্যাপক সরোজ দত্ত তাঁর ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থে অহিংসা উপন্যাস সম্পর্কিত কয়েকটি অসংগতি ও মুদ্রণপ্রমাদের (?) প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন (পৃ ৭২-৭৩)।

এতদ্‌ব্যতীত অহিংসা উপন্যাসটি সম্পর্কে লেখকের একটি অভিমত অন্যত্র প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৩৫০-এর শারদীয় যুগান্তরে লেখকের প্রতিবিম্ব উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। উক্ত উপন্যাসে কোনো 'রাজনৈতিক পার্টি বা প্রতিষ্ঠান বা মতবাদের বিরুদ্ধে' লেখকের 'আক্রমণাত্মক মনোভাব' সম্পর্কে পাঠক মহলে কিছু অভিযোগ উঠেছিল। প্রতিবিম্ব গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে ভূমিকায় লেখক উক্ত অভিযোগ খণ্ডনসূত্রে অহিংসা উপন্যাসটি সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ মতামত প্রকাশ করেন। প্রাসঙ্গিক অংশ প্রতিবিম্বের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত হল :

আমার 'অহিংসা' বইখানা নিয়ে এরকম অভিযোগ উঠেছিল। দেশে অহিংস নীতিতে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে। বইখানার নাম অহিংসা। সুতরাং যদিও বইখানাতে রাজনৈতিক কোন ব্যাপার নেই, তবু ধরে নিতে হবে অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে কাহিনীর সংশ্রব আছে। সোজাসুজি যোগসূত্র খুঁজে না পাওয়া যাক, কাহিনীটিকে 'সিম্বলিক' ধরে নিয়ে—

'কি বলতে চাচ্ছেন ঠিক ধরতে পারছি না মাণিকবাবু।'

'যা বলিনি তা ধরতে চাইছেন কেন ?'

প্রশ্নকারী তিন ঘণ্টা ধরে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন আমার লেখা বইয়ে আমি কি বলেছি আর কি বলিনি ! নীতি বা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করেও সাধারণ মানুষ যে অজ্ঞাতসারেই অনেক অহিংস কাজ করে, হিংসার সঙ্গে অহিংসাও যে মানুষের মধ্যে থাকে এবং এই সাধারণ অহিংসাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ নিয়ে যে উপন্যাস লেখা যায়, এটা তাঁকে কোনমতেই বুঝিয়ে দিতে পারলাম না।...

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অভিলেখাগারে অহিংসা উপন্যাসের একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি আছে। উক্ত পাণ্ডুলিপি-পাঠের সঙ্গে মুদ্রিত উপন্যাসের পাঠের একটি তুলনাত্মক বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ধরাবাঁধা জীবন

'ধরাবাঁধা জীবন' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুদ্রিত গ্রন্থেব সংখ্যায় পঞ্চদশতম গ্রন্থ। সহরতলীর দুই পর্বকে অখণ্ড উপন্যাস ধবে, এটি তাঁর নবম উপন্যাস। এই উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে, প্রকাশক ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ; পৃ ২ + ৯২, মূল্য এক টাকা। উপন্যাসে প্রকাশকাল উল্লিখিত ছিল না। সজনীকান্ত দাস প্রদত্ত পূর্বসূত্রলব্ধ তথ্যানুযায়ী দ্বিতীয় সংস্কবণও প্রকাশিত হয়েছিল একই প্রকাশন সংস্থা থেকে। দাম দেড় টাকা, পৃষ্ঠাসংখ্যা একই। কিন্তু সুনির্দিষ্ট তাবিখ পাওয়া যায়নি। শ্রীসরোজ দত্ত তাঁব ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থে উপন্যাসটির গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত কপি থেকে গ্রন্থভুক্তির তারিখ ও মূল্য পরিবর্তন প্রভৃতি তথ্যের সাহায্যে অনুমান করেছেন যে প্রথম সংস্করণ ১৯৪১-৪২-এর মধ্যবর্তী কোনো সময়ে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৭-এর ডিসেম্বর নাগাদ প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীসরোজমোহন মিত্র প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী উপন্যাসটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্কবণের প্রকাশকের নাম ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস। এব ঠিকানা ৬০ বিডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৬। ১৩৫৮ সালের ফাল্গুনে বসুমতী সাহিত্যমন্দির থেকে প্রকাশিত মানিক গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে অহিংসা উপন্যাস এবং ছোট বড় গল্পসংকলনেব সঙ্গে ধরাবাঁধা জীবন উপন্যাসটিও প্রকাশিত হয। এ ছাড়া গ্রন্থপ্রকাশ নামক প্রকাশনসংস্থা থেকে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দেব আষাঢ়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব চারটি উপন্যাস নামক একটি সংকলন প্রকাশিত হয। তাতে ধরাবাঁধা জীবন, প্রতিবিম্ব, চিন্তামণি ও আদায়ের ইতিহাস এই চাবটি উপন্যাস অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাবটি উপন্যাস-এর সর্বশেষ মুদ্রণ (নতুন চতুর্থ মুদ্রণ) প্রকাশিত হয়েছে আশ্বিন ১৩৫৮-এ।

শ্রীসরোজমোহন মিত্র মানিক গ্রন্থাবলীর গ্রন্থালয় সংস্কবণ ৪র্থ খণ্ডে জানিয়েছেন, ধবাবাঁধা জীবন ১৩৪৮-এর নবনাবী শারদীয়া সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। তথ্যটি সঠিক নয়। আসলে ধবাবাঁধা জীবন উপন্যাসেব কিছু অংশ কিছু অদলবদলসহ ধবাবাঁধা জীবন নামেই গল্পবূপে শাবদীয়া নবনাবী (২য বর্ষ ১০ম সংখ্যা আশ্বিন ১৩৪৮ পৃ ৪৩৪-৪৩৮)-এ প্রকাশিত হয়। এই নামেব গল্পটিও পবে সংযোজন খণ্ডে যুক্ত হবে।

প্রকাশিত উপন্যাসেব অন্তর্গত দু-একটি অসংগতির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয। যথা ৪০৯ পৃষ্ঠার ৩য় পঙ্ক্তিতে আছে,

> বছব দুযেক বযস হইযাছিল ছেলেটাব.

৪১৭ পৃষ্ঠার শেষ থেকে ৫ম পঙ্ক্তিতে আছে

> নন্তু বাঁচিযা থাকিলে এই ফাল্গুনে তাহাব ন বছব বযস হইত।

ধরাবাঁধা জীবনের কোনো পাণ্ডুলিপি সম্ভবত বক্ষিত হয়নি।

সম্পাদকমণ্ডলী

পরিশিষ্ট

পাণ্ডুলিপি-পরিচয়

বৌ : খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি

'সাহিত্যিকের বৌ' গল্পের একাধিক খণ্ডিত পাঠ
'দোকানীর বৌ' গল্পের খণ্ডিত পাঠ
'অবিশ্বাসীর বৌ', 'মোক্তারের বৌ',
'স্নেহপ্রবণের বৌ', 'চোর-বৌ' প্রভৃতি
পরিকল্পিত গল্পের অসম্পূর্ণ পাঠ

সহরতলী (২য় পর্ব) : খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি

অহিংসা : খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি

বৌ

'বৌ' গল্পগ্রন্থের পাণ্ডুলিপির অনেকগুলি পৃষ্ঠা প্রতিলিপি বাংলা আকাদেমি অভিলেখাগারে আছে। বৌ গ্রন্থের পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে গ্রন্থে গৃহীত পাঠের পরিবর্তনের কিছু নমুনা গ্রন্থপরিচয় অংশে প্রদত্ত হয়েছে। পাণ্ডুলিপি-ধৃত কয়েকটি গল্পের পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হল :

> সরলার পায়ে সবসময় মল থাকে, মল বাজাইয়া হাঁটে সরলা—ঝমর্ ঝমর্, নিঃশব্দে হাঁটার দরকার বা ইচ্ছা হইলে সরলা যে মল খুলিয়া ফেলে তা নয়, উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া শক্ত করিয়া পায়ের মাংসপেশীতে আটকাইয়া দেয়, মল আর বাজে না। তাই, আশেপাশে সরলা আছে কিনা অথবা আসিতেছে কিনা এটা ঠিক করিতে সবসময় মলের বাজনার উপর নির্ভর করা যায় না। বৌ এর মল পায়ে এরকম নিঃশব্দে হাঁটিবার কৌশলের জন্য শম্ভু মাঝে মাঝে বিপদে পড়ে বৈকি। পাড়ার দু'চারটি ভদ্রলোকের বাড়ীর ঝি'দের চাল ডাল নুন ওজোন করিয়া দেওয়ার সময় একটু হাসি তামাসা করিতে গিয়া এক একদিন ধরা পড়িয়া যায়। মাটির গামলা, ছোট ছোট অংশে ভাগ করা কাঠের চৌকো খোপ, বারকোস, তেলের কলসী এই সমস্তের মাঝখানে শম্ভুর বসিবার চৌকী, হাত ও হাতা বাড়াইয়া সে বসিয়া বসিয়াই অধিকাংশ জিনিষের নাগাল পায়। পিছনে প্রায় এক মানুষ উঁচু কাঠের তাক, দেশলাই-এর প্যাক, সাবু বার্লির কৌটা ও একদিকে কাঁচ বসানো হলদে রঙের টিন, এলাচ লবঙ্গ প্রভৃতি দামী মসলার নানা আকারের আধার, লণ্ঠনের চিমনি, জুতার কালি, এনামেলের বাসন, এবং মুদীখানা ও মনোহারি দোকানের আরও অনেক জিনিষের সমন্বয় তাকে। শুধু তক্তা বসানো তাক, পিছনটা বন্ধ নয়। তাকের প্রায় তিনহাত তফাতে শম্ভুর শয়নঘরের মাটিলেপা চাঁচের বেড়ার দেয়াল। তাক আর দেয়ালের সমান্তরাল রক্ষণাবেক্ষণে যে অন্ধকার সরু গলিটুকুর সৃষ্টি হইয়াছে সেটা শম্ভুর বাড়ীর মধ্যে যাতায়াত করার পথ, চুপি চুপি আসিয়া সরলা মাঝে মাঝে তাকের জিনিষপত্রের ফাঁকে চোখ পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে গলিতে, স্বামীর দোকানদারী দ্যাখে ও কথাবার্তা শোনে।

'দোকানীর বৌ' শিরোনামায় আরও একটি পাণ্ডুলিপির খণ্ডিত পৃষ্ঠায় ভাষাগত কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়, কিন্তু কোনটি অগ্রবর্তী নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। মনে হয়, উভয় পাণ্ডুলিপির সমবায়েই মুদ্রিত গল্পটির রূপ প্রস্তুত হয়েছে। পাঠকদের কৌতূহল নিরসনার্থে এই দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির প্রাপ্ত অংশ উদ্ধৃত হল .

> সরলার পায়ে সবসময় মল থাকে, মল বাজাইয়া হাঁটে সরলা,—ঝমর্ ঝমর্। চুপি চুপি নিঃশব্দে হাঁটিবার দরকার বা ইচ্ছা হইলেও সরলা মল খুলিয়া ফেলে না, উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া শক্ত করিয়া পায়ের মাংসপেশীতে আটকাইয়া দেয়, মল আর বাজে না। তাই, আশেপাশে সে আছে কিনা অথবা আসিতেছে কিনা এটা ঠিক করিতে সব সময় তার মলের বাজনার উপর নির্ভর করা যায় না। মল পায় বৌ-এর এরকম নিঃশব্দে হাঁটিবার কৌশলের জন্য শম্ভু মাঝে মাঝে বড় বিপদে পড়ে। পাড়ার কয়েকটি ভদ্রলোকের বাড়ীর চেনা ঝি'দের চাল ডাল তেল নুন ওজোন করিয়া দেওয়ার সময় এক একদিন সে ধরা পড়িয়া যায়। প্রায় দু'হাত উঁচু বাঁশের মাচার উপরে শম্ভুর দোকান। মাটির গামলা, কেরাসিন কাঠের তক্তার চৌকো চৌকো খোপ, ছোটবড় বারকোস প্রভৃতিতে রক্ষিত জিনিষপত্রের মাঝখানে শম্ভুর বসিবার ছোট চৌকী ; হাত ও হাতা বাড়াইয়া সে এখানে বসিয়াই অধিকাংশ জিনিষের নাগাল পায়। পিছনে প্রায় এক মানুষ উঁচু পাঁচসারি কাঠের তাক, সাবু বার্লি দানাদার চিনি ভরা একপাশে কাঁচ-বসানো হলদে রঙের টিন, এলাচ লবঙ্গ প্রভৃতি দামী মসলা রাখার নানা আকারের ছোট বড় আধার, লণ্ঠনের চিমনি, জুতার কালি, এনামেলের বাসন, কাপড়কাচা গায়ে-মাখা সাবান এবং মুদীখানা ও মনোহারি দোকানের আরও অনেক বিক্রেয় পদার্থের সমাবেশে তাকগুলি ঠাসা। তাকের পিছনটা তক্তা দিয়ে বন্ধ করা নয়, যদিও ওরকম করিবার ইচ্ছা কিছুদিন হইতে শম্ভু মনে মনে পোষণ করিতেছে। তাকের প্রায় তিনহাত

তফাতে শম্ভুর শয়নঘরের মাটিলেপা চাঁচের বেড়ার দেয়াল। তাক আর দেয়ালের সমান্তরাল রক্ষণাবেক্ষণে যে অন্ধকার সরু গলিটুকু সৃষ্টি হইয়াছে, সেটা শম্ভুর অন্দরে যাতায়াত করার পথ। অন্দরেই অবশ্য সরলার থাকার কথা, কিন্তু মাঝে মাঝে পায়ের মল উপরে ঠেলিয়া তুলিয়া চুপিচুপি সে আসিয়া তাকের জিনিষপত্রের ফাঁকে চোখ পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, স্বামীর দোকানদারী দ্যাখে ও কথাবার্তা শোনে।

শম্ভু এটা জানিতে পারে অন্দরে গিয়া। ভাত ডাল ও ভাত ডালের হাঁড়ি উঠানে গড়াগড়ি দিতে দেখা যায় আর স্বয়ং সরলাকে গড়াগড়ি দিতে দেখা যায় বিছানায়, কালা, কাণা, বোবা ও আগুন সরলা। শম্ভুকে ওজোন করিয়া কথা বলিতে হয়, সোহাগ জানাইতে হয়, সংসারে মানুষ যে মানুষকে অকারণে ভুল বোঝে সে জন্য আপশোষ করিতে হয় আর দোকানে বিক্রীর জন্য রাখা লজেঞ্জুস খরচ করিতে হয়। একপয়সা দুপয়সা তিনপয়সা—কোনদিন চার পয়সার। সরলা একেবারে লজেঞ্জুস খাওয়ার রাক্ষসী, শম্ভুকেও সে ফতুর করিবে নিজেও মরিবে পেটব্যথা হইয়া।

'সাহিত্যিকের বৌ' গল্পেরই দুটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ অথচ শেষ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ পাঠ রক্ষিত হয়েছে। এই দুটি পাঠ পরপর উদ্ধৃত হল :

সাহিত্যিকের বৌ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যিক ? শেষপর্য্যন্ত একজন দেশ-প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের সঙ্গেই তার বিবাহ হইবে নাকি ?—এই বিস্ময় বিবাহের আগে কতদিন অমলাকে অভিভূতা করিয়া রাখিয়াছিল ঠিক করিয়া বলা সহজ—মোটামুটি তিনমাস। কারণ সম্বন্ধ স্থির হওয়ার মোটামুটি তিনমাস পরে শুভ বিবাহটি সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহের পর সত্যসত্যই সে কি স্বনাম-ধন্য সূর্য্যকান্ত সেনগুপ্তের বৌ হইয়াছে ?—এই কথা ভাবিয়া কতদিন পর্য্যন্ত অমলার কতখানি বিস্ময় জাগিত হিসাব করিয়া বলা যায় না। শুধু বিস্মিত হওয়া নয়, বিস্ময়টাকে বাড়ানো কমানো এবং কম অথবা বেশীদিন টিকাইয়া রাখা পর্য্যন্ত নির্ভর করে মানুষের রুচি ও প্রকৃতির উপর। জীবনের অতি তুচ্ছ একটা ঘটনা, যেমন পথে হঠাৎ ছেলেবেলার এক বিস্মৃত-প্রায় বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া যাওয়া, একজনকে সাত সাতটা দিন অবাক করিয়া রাখিতে দেখিয়াছি। আবার বাড়ীর উঠানে মাটির নীচে পোঁতা সাতশ' বছরের পুরাণো মন্দির বাহির হইয়া একজনকে সাতটা ঘণ্টাও আশ্চর্য্য করিয়া রাখিতে পারে নাই তাও দেখিয়াছি। শুধু তাই নয়। বন্ধু ও মন্দিরের আবির্ভাব যে দুটি 'একজনে'র জীবনে ঘটনা হিসাবে এতখানি আশ্চর্য্যজনক ও সাধারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, সে দুজন 'একজন' যে একই জন এটা খেয়াল করিয়া আমি কিছুমাত্র অবাক হই নাই। অথচ আগের লাইন কটি লিখিবার আগে কেন এটা খেয়াল করি নাই ভাবিয়া আমার বিস্ময় এখনো সীমা ছাড়াইয়া আছে।

ফোর্থক্লাস পর্য্যন্ত স্কুলে পড়িয়া তারপর বাড়ীতে লেখাপড়া, গান বাজনা, সেলাইফোঁড়াই, সংসারের কাজকর্ম্ম, ঝগড়া-ঝাঁটির কৌশল ইত্যাদি শিখিতে শিখিতে যে সব মেয়ে আত্মীয় স্বজনের সতর্ক প্রহরা এবং অসতর্ক রক্ষণাবেক্ষণে বড় হয়, অমলা তাদেরি একজন। বলা বাহুল্য, লাইব্রেরী মারফত বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে অমলার ভালরকম পরিচয়ই ছিল। সপ্তাহে খান দুই গল্প-উপন্যাসের বই এবং মাসে তিনচার খানা মাসিকপত্র ঘরের কোণা আশ্রয় করিবার মত বয়স হওয়ার পর হইতেই অমলা নিয়মিতভাবে পড়িয়া আসিতেছে। প্রকৃতপক্ষে, স্কুল ছাড়িয়া বাড়ীতে লেখাপড়া শেখার মধ্যে পড়াটা তার দাঁড়াইয়াছে এই, এবং লেখাটা দাঁড়াইয়াছে চিঠি লেখা। সূর্য্যকান্তের চারখানা উপন্যাস, তিনখানা গল্পসঞ্চয়ণ এবং একখানা নাটক সে তার সঙ্গে ভদ্রলোকের বিবাহের প্রস্তাব হওয়ার অনেক আগেই পড়িয়া ফেলিয়াছিল। তখন কি সে জানিত হৃদয়ের ভাবপ্রবণতাগুলিকে পরম উপভোগ্যভাবে উদ্বেলিত করিয়া রাখা আর কখনো-হাসানো কখনো-কাঁদানো কাহিনীগুলির জন্মদাতা একদিন স্বয়ং তিনটি বন্ধুর সঙ্গে তাকে দেখিতে আসিবে এবং দেখিয়া পছন্দ করিয়া যাইবে।

বড় খাপছাড়া ঠেকিয়াছিল ঘটনাটা অমলার কাছে। সাহিত্যিকেরা বিশেষতঃ সূর্য্যকান্তের মত সাহিত্যিকের কি রামশ্যামের মত এরকম সাধারণভাবে জীবন-সঙ্গিনী খুঁজিয়া নেয় ? তার মত পর্দ্দানশীন সাধারণ মেয়েকে (সাধারণ মেয়ে অবশ্য সে নয় কিন্তু শুধু চোখে দেখিয়া, দু'একটা প্রশ্ন করিয়া, সেলাই-এর কাজের নমুনা দেখিয়া আর একটা গানের সিকি অংশে শুনিয়া তার কি পরিচয় সূর্য্যকান্ত পাইয়াছিল শুনি ?) পছন্দ করে পুরুষ মানুষে

সঙ্গে মেয়ে মানুষের প্রেম তো ধরিতে গেলে একরকম ওরাই ঘটায় এবং শেষপর্য্যন্ত মিলন হোক আর বিচ্ছেদ হোক ওদের ঘটানো প্রেমের অগ্রগতির কাহিনী পড়িতে পড়িতেই শুধু তাদের মত মেয়েদের মন কিভাবে যেন কেমন করে। কয়েকটি ছোটগল্প ছাড়া সূর্য্যকান্তের কোন বইটা সে পড়িতে পারিয়াছিল যার মধ্যে দু'এক জোড়া নরনারীর জটিল সম্পর্ক তাকে দুশ্চিন্তা আবেগ ও সহানুভূতিতে পরবর্ত্তী বইখানা পড়িতে আরম্ভ করা পর্য্যন্ত অন্যমনা ও চঞ্চল করিয়া রাখে নাই? সেই সূর্য্যকান্ত একি করিতে চলিয়াছে! একটা শ্বাসরোধী অসাধারণ ঘটনার ভিতর দিয়া না হোক প্রথম পরিচয় এবং কতগুলি জটিল ও বিস্ময়কর অবস্থার মধ্যস্থতায় প্রেমের জন্ম হইয়া না হোক, অন্ততঃ জানাশোনা মেয়েদের মধ্যে একজনকে খুব সাধারণভাবেই একটু ভালবাসিয়া তারপর তাকে বিবাহ করা তো অন্ততঃ উচিত ছিল সূর্য্যকান্তের? তার বদলে একটা অজানা অচেনা মেয়েকে যে গ্রহণ করিতেছে কোন যুক্তিতে? জীবনে এ অসামঞ্জস্য সে বরদাস্ত করিবে কি করিয়া? ওর বইগুলিতে কত স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে ভালবাসিতে পারে নাই, জীবনটা তাদের ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। নিজের বেলাতেও তার ওরকম কিছু ঘটিতে পারে এ জ্ঞান কি সূর্য্যকান্তের নাই!

এ সব গভীর সমস্যার কথা ভাবিবার সময় অমলা পাইয়াছিল তিনমাস। তিনমাসে উনিশ বছরের একটি মেয়ে যে কত চিন্তা আর কল্পনায় মনটা ঠাসিয়া ফেলিতে পারে, কত ভয় ও রোমাঞ্চ অনুভব করিতে পারে তার সীমা নাই। একটি বিশিষ্ট চিন্তা অমলার মনে অসংখ্য বৈচিত্র্যময় ভাব ও কল্পনার আমদানী করিত নিজের জীবনে প্রেম-সংক্রান্ত বিরাট ব্যাপার কিছু ঘটিয়া না থাকিলে ওসব বিষয়ে এমন গভীর জ্ঞান ও অনুভূতি সূর্য্যকান্ত পাইল কোথায়? আর ওরকম কিছু ঘটিয়া থাকিলে বিবাহে রুচি আসিল কি করিয়া? কখনো অমলার মনে হইত, নিজের বুক ভাঙ্গিবার রোমাঞ্চকর অপূর্ব্ব ইতিহাস যদি সূর্য্যকান্ত ভুলিয়া গিয়া থাকে, এত দুর্ব্বল যদি ওর হৃদয়ের একনিষ্ঠতা হয় যে ইতিমধ্যে ভাঙ্গা-বুকটা আবার লাগিয়া গিয়া থাকে জোড়া, মানুষ হিসাবে লোকটা তবে কি অশ্রদ্ধেয়! ছি! ছি! শেষে এমন একটা স্বামী তার অদৃষ্টে ছিল যে ভালবাসে কিন্তু ভুলিয়া যায়? কখনো মনে হইত, সূর্য্যকান্তের হৃদয়ে কখনো ভালবাসার ছাপ পড়ে নাই, আসলে লোকটা খুব জ্ঞানী আর [অসম্পূর্ণ, পৃষ্ঠাঙ্ক ২]

এখনো মাঝে মাঝে সব যেন কেমন বেসুরো, কৃত্রিম মনে হয়,—কিন্তু বাকী সময়? তখন যে আশ্চর্য্য ব্যাকুলতা সে দেখায়, যে অভূতপূর্ব্ব ভাব ফুটিয়া থাকে তার মুখে চোখে, তা কি বানানো হইতে পারে? কথা বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া সে যখন শুধু চাহিয়া থাকে, শুধু ভাবে, আর মোহগ্রস্ত বিহ্বল মানুষের মত দুটি হাত বাড়াইয়া তাকে স্পর্শ করা মাত্র চমকাইয়া ওঠে এবং ভীত শিশুর মত তাকে জড়াইয়া ধরে, তখনও সে অভিনয় করিতেছে একি ভাবা যায়! অথচ এদিকে স্বামীর প্রকাণ্ড একটা মিথ্যা অমলার কাছে তিনচারদিন আগে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সে বাপের বাড়ী যাওয়ার পর একলাইন লেখাও সে লিখিতে পারে নাই, মাসিকপত্রের উপন্যাসটির এমাসের ইনষ্টলমেন্ট পর্য্যন্ত নয়,—এই কথা তাকে বলিয়াছিল সূর্য্যকান্ত। কদিন আগে সে আপিস চলিয়া যাওয়ার পর বেলা বারোটার ডাকে মাসিকপত্রটি আসিয়াছিল,—তাতে ছিল উপন্যাসটির দশপাতা ইনষ্টলমেন্ট! কৈফিয়ৎ অবশ্য সূর্য্যকান্ত এক ' দিয়াছিল, এ মাসের নয়, সে নাকি বলিয়াছিল আগামী মাসের ইনষ্টলমেন্টের কথা, অন্তত দু'মাস আগে লেখা দিতে হয় অমল, নইলে ওরা সময় পাবে কেন ছাপবার? —তবু অমলার মনের খটকা যায় নাই। দুমাস আগে হোক, চার মাস আগে হোক এ লেখা সে লিখিল কখন? অমলাকে না পড়িতে দিয়া একটা লেখাও তো সে কখনো কোথাও পাঠায় নাই!

আপিসে বসে লিখেছিলাম। দশবারোদিন একদম কাজ ছিল না, সেই সময়। এডিটর তাগাদা দিচ্ছিল তাই আর তোমাকে—

মিথ্যাটা এত বড় মনে হইয়াছিল অমলার যে এসব কৈফিয়তের খোলসে সেটা সম্পূর্ণ ঢাকা যায় নাই। অমলার প্রতিবাদ না মানিয়া একটা অসঙ্গত ব্যথায় পরিণত হইয়া এখনো মনে বাসা বাঁধিয়া আছে, আছে গোপনে। সূর্য্যকান্তের নতুন ধরনের ভালবাসারও যেখানে প্রবেশাধিকার নাই।

বধূত্বের নতুনত্ব অমলার অনেকটা খসিয়া গিয়াছে। বৌ হিসাবে বাড়ীর লোকে তাকে বিশেষ পছন্দ করে না, সূর্য্যকান্তের বৌ হিসাবে সহ্য করে। চাকরী করিয়া এবং লিখিয়া (চাকরীতে লেখার দশগুণ) রোজগারটা সেই করে সব চেয়ে বেশী। পছন্দ করার চেয়ে অমলাকে সহ্য করাটা বড় জা'এরই সকলের চেয়ে বেশী, সে তাই থাকিয়া থাকিয়া [অসম্পূর্ণ পৃষ্ঠাঙ্ক ১৬]

সিদ্ধির সরবতকে মদের মত ফেনিল করিয়া তুলিতে হয় তাকে। নতুবা তাদের নাটক জমে না। নাটক না জমিলে অমলার মত তারও মনে হয় জীবনটা বৃথা হইয়া গেল, বাঁচিয়া থাকার মানে রহিল না।

বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে নয়, পরদিন থিয়েটার দেখিতে গেল সূর্য্যকান্ত। অমলা ও তার সেজননদও অবশ্য সঙ্গে গেল। রাত তিনটায় বাড়ী ফিরিয়া গোটা কত বাক্য বিনিময় করিয়াই দুজনে ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন অমলার সেজননদকে তার শ্বশুর বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে সূর্য্যকান্ত পাটনা চলিয়া গেল। কাজটা অবশ্য অমলার সেজদেবব করিতে পাবিত, শুধু দিন তিনেক তার কলেজ কামাই হইত। তিন দিন তাকে ছাড়িয়া থাকার চেয়ে ভাইএব তিনদিন কলেজ কামাই হওয়াকে কি করিয়া যে সূর্য্যকান্ত বড় মনে করিল অনেক ভাবিয়াও অমলা তা বুঝিতে পারিল না। তার মনে হইতে লাগিল স্বামী যেন তাকে ত্যাগ করিয়াছে। হঠাৎ তাকে তাব বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া একবাব যেমন ত্যাগ করিয়াছিল এবার নিজে বোনের বাপের বাড়ী গিয়া আবার তেমনি ত্যাগ করিয়াছে। কেবল, সেবাব স্বামীকে সে এখানে ফেরামাত্র ফিরিয়া পাইয়াছিল, এবার সূর্য্যকান্ত ফিরিয়া আসিলেও তাকে সে আর ফিরিয়া পাইবে না। অনুপযুক্তা বৌটাকে জীবন হইতে ছাঁটিয়া ফেলার উদ্দেশ্য না থাকিলে এত লোক থাকিতে সে কেন যাচিয়া পাটনা যাইতে চাহিবে, তাব সজল চোখের বাবণ মানিবে না।

[পাণ্ডুলিপিব পার্শ্বরেখায় লেখা আছে '৩ দিনেব বদলে ৭ দিন']

বিরহ-বেদনা নয়, ওসব সাধাবণ মৃদু বেদনা বোধ কবিবাব শক্তি অমলার আব ছিল না, এই চিন্তাটাই অমলা৭ মনকে দখল কবিযা রহিল যে সূর্য্যকান্তের হঠাৎ পাটনা যাওয়া তাকে ত্যাগ করারই ভূমিকা। কামধেনুর অপর্ণাকে তাব সাধারণ অনুপযুক্ত প্রফেসার স্বামী যে কাবণে ত্যাগ করিয়াছিল তাব ঠিক উল্টা কারণে, নিজেব বিবাহিত জীবনকে ও বিবাহিত জীবনের ছোটবড় ঘটনা বাছিয়া বাছিয়া অমলা তার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে খাপ খাওয়ায়। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় সূর্য্যকান্ত তাকে বিবাহ কবিয়াছিল, তাই গতবাব বাপেব বাড়ী যাওয়া পর্য্যন্ত তাকে ভালবাসে নাই, তার বুকে ভালবাসা জাগানোর চেষ্টাও কবে নাই, ববং বাধাই দিয়াছে। তাব ভালবাসা তখন চাহিত না সূর্য্যকান্ত আবেকজনের স্মৃতি (উনিশ বছব বযসে ছেলেমানুষী ভুল কবাব কাহিনীতে সে যাব নাম কবিযাছিল সেই কিনা কে জানে!) বুকে পুষিয়া বাখিয়াছিল, নিজেকে ধবা দেয় নাই। অথবা হয়ত সে অপেক্ষা করিয়া ছিল যে তাকে জয কবিয়া অমলা নিজের উপযুক্ততাব প্রমাণ দিবে মাঝে মাঝে দেখা হইযা নয়, দিবারাত্রি এক সঙ্গে বাস করিয়াও অমলা যদি তার বুকে ভালবাসা জাগাইতে না পারে কোন গুণে তবে সে তার মত বিখ্যাত সাহিত্যিকের বৌ হইয়া থাকিবে? তাবপব তাকে বাপের বাড়ী পাঠানোর নামে ত্যাগ কবিয়া [অসম্পূর্ণ, পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠাঙ্ক ২০]

সাহিত্যিকের বৌ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যিক? শেষপর্য্যন্ত একজন দেশ-প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের সঙ্গেই তার বিবাহ হইবে নাকি—বিবাহেব আগে এই বিস্ময় কতদিন অমলাকে অভিভূতা করিয়া রাখিয়াছিল ঠিক করিয়া বলা যায়. মোটামুটি তিনমাস। কিন্তু বিবাহের পর · সে কি সত্যসত্যই স্বনামধন্য সূর্য্যকান্ত সেনগুপ্তেব বৌ হইয়াছে? ভাবিযা কতদিন পর্য্যন্ত অমলাব কতখানি বিস্ময় জাগিত হিসাব করিযা বলা যায় না। শুধু বিস্মিত হওয়া নয, বিস্ময়টাকে বাড়ানো কমানো এবং কম অথবা বেশি সময় টেকাইয়া রাখা পর্য্যন্ত নির্ভব কবে মানুষের বুচি ও প্রকৃতির উপব। জীবনের অতি তুচ্ছ একটা ঘটনা, যেমন পথে ছেলেবেলার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়া, একজনকে সাত সাতটা দিন অবাক কবিয়া রাখিতে দেখিয়াছি। আবার বাড়ীব উঠানে মাটির নীচে পোঁতা সাতশো বছরের পুরাণো মন্দির বাহিব হইয়া একজনকে পুবা সাতটা ঘণ্টাও আশ্চর্য্য কবিয়া বাখিতে পাবে নাই, তাও দেখিয়াছি। শুধু তাই নয়। বন্ধু ও মন্দিরের আবির্ভাব যে দুটি 'একজনে'ব জীবনে ঘটনা হিসাবে এতখানি আশ্চর্য্যজনক ও সাধারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, সে দুটি একজন যে একইজন এটা খেয়াল কবিয়া আমি এতটুকু অবাক হই নাই। আগে কেন এটা খেয়াল করি নাই ভাবিয়াই আমার বিস্ময় এখনো সীমা ছাড়াইয়া আছে।

ফোর্থক্লাস পর্য্যন্ত স্কুলে পড়িয়া তারপর বাড়ীতে লেখাপড়া গানবাজনা, সেলাই ফোঁড়াই, সংসারের কাজকর্ম্ম, ঝগড়াঝাঁটির কৌশল ইত্যাদি শিখিতে শিখিতে যে সব মেয়ে আত্মীয়স্বজনের সতর্ক প্রহরা এবং অসতর্ক রক্ষণাবেক্ষণে বড় হয় অমলা তাদেরি একজন। বলা বাহুল্য, লাইব্রেরী মারফৎ সাহিত্যের সঙ্গে অমলাব [দুর্বোধ্য] পরিচয়ই ছিল। সপ্তাহে খান দুই গল্প উপন্যাসের বই এবং মাসে তিনচারখানা [দুর্বোধ্য] সে ঘরের কোণা আশ্রয় করার মত বয়স হওয়ার পর হইতে নিয়মিতভাবেই পড়িয়া আসিতেছে। সূর্য্যকান্তের চারখানা উপন্যাস, তিনখানা গল্পসঞ্চয়ন এবং একখানা নাটক সে সূর্য্যকান্তের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব হওয়ার

অনেকদিন আগেই সে পড়িয়া ফেলিয়াছিল। তখন কি সে জানিত ওই কখনো-হাসানো, কখনো-কাঁদানো আর আগাগোড়া হৃদয়ের ভাবপ্রবণতাকে পরম উপভোগ্যভাবে উদ্বেলিত করিয়া রাখা কাহিনীগুলির জন্মদাতা একদিন স্বয়ং কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে তাকে দেখিতে আসিবে এবং দেখিয়া পছন্দ করিয়া যাইবে!

এ ব্যাপারটা বড় খাপছাড়া ঠেকিয়াছিল অমলার কাছে। সাহিত্যিকেরা, বিশেষতঃ সূর্য্যকান্তের মত সাহিত্যিকেরা কি রাম শ্যামের মত এরকম সাধারণভাবে জীবন সঙ্গিনী খুঁজিয়া নেয়? তার মত পর্দ্দানশীন সাধারণ মেয়েকে পছন্দ করে? পুরুষ মানুষের সঙ্গে মেয়েমানুষের প্রেম তো ধরিতে গেলে একরকম ওরাই একমাত্র ঘটায় এবং শেষপর্য্যন্ত মিলন হোক আর বিচ্ছেদ হোক প্রেমের অগ্রগতির কাহিনী পড়িতে পড়িতে মন যে কিভাবে কেমন করিতে থাকে বলা যায় না। কয়েকটি ছোটগল্প ছাড়া সূর্য্যকান্তের কোন বইটা সে পড়িতে পারিয়াছিল যার মধ্যে দু'এক জোড়া নরনারীর জটিল সম্পর্ক তাকে দুশ্চিন্তায় আবেগে সহানুভূতিতে পরবর্ত্তী বইখানা পড়িতে আরম্ভ করা পর্য্যন্ত অন্যমনা ও চঞ্চল করিয়া রাখে নাই? সেই সূর্য্যকান্ত আজ একি করিতে চলিয়াছে। একটা শ্বাসরোধী অসাধারণ ঘটনার ভিতর দিয়া প্রথম পরিচয় এবং কতগুলি জটিল ও বিস্ময়কর অবস্থার মধ্যস্থতায় প্রেমের জন্ম হইয়া না হোক, অন্ততঃ জানাশোনা মেয়েদের মধ্যে একজনকে খুব সাধারণভাবেই একটু ভালবাসিয়া তারপর তাকে বিবাহ করা তো সূর্য্যকান্তের উচিত ছিল। তার বদলে একটা অজানা অচেনা মেয়েকে সে গ্রহণ করিতেছে কোন বুদ্ধিতে? জীবনে এ অসামঞ্জস্য সে বরদাস্ত করিবে কি করিয়া? ওর বইগুলিতে কত স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসিতে পারে নাই, জীবনটা তাদের ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। নিজের বেলাতেও তার সেরকম কিছু ঘটিতে পারে এ ভয় কি সূর্য্যকান্তের নাই?

সম্বন্ধ স্থির হওয়ার তিনমাস পরে বিবাহ হইয়াছিল, এসব গভীর সমস্যার কথা ভাবিবার সময় অমলা পাইয়াছিল তিনমাস। তিনমাসে আঠারো বছরের একটি মেয়ে যে কত চিন্তা আর কল্পনায় মনটা ঠাসিয়া ফেলিতে পারে এবং কত ভয় ও রোমাঞ্চ অনুভব করিতে পারে তার সীমা নাই। নিজের জীবনে কিছু ঘটিয়া না থাকিলে ওসব ব্যাপারে এমন গভীর জ্ঞান ও অনুভূতি সূর্য্যকান্ত কোথায় পাইল?—এই চিন্তাটিই অমলার মনে অসংখ্য বৈচিত্র্যময় ভাব ও কল্পনার আমদানী করিত। কখনো মনে হইত, নিজের বুক ভাঙ্গিবার রোমাঞ্চকর অপূর্ব্ব ইতিহাস যদি সূর্য্যকান্ত ভুলিয়া গিয়া থাকে, এত দুর্ব্বল যদি ওর হৃদয়ের একনিষ্ঠতা হয় যে ইতিমধ্যে বুকটা আবার জোড়া লাগিয়া গিয়া থাকে, মানুষ হিসাবে লোকটা তবে কি অশ্রদ্ধেয়। ছি ছি, শেষকালে এমন একটা স্বামী তার অদৃষ্টে ছিল যে ভালবাসে কিন্তু ভুলিয়া যায়? কখনো মনে হইত, সূর্য্যকান্তের হৃদয়ে কখনো ছাপ পড়ে নাই, আসলে লোকটা খুব জ্ঞানী আর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন বলিয়া অন্যলোকের জীবনের ঘটনা ও মানসিক বিপর্যায় দেখিয়া শুনিয়া অনুমান করিয়া ওসব হৃদয় সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাগুলি সে আহরণ করিয়াছে। ভালবাসিতে গেলে দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী অনিবার্য্য জানে বলিয়াই বোধ হয় ভাল না বাসিয়া বিবাহ করাটা সে মনে করিয়াছে ভাল। তা যদি হয়, তাতেও অমলা ওকে শ্রদ্ধা করিতে পারিবে না। দুঃখ পাইবে বলিয়া যে ভালবাসে না সে আবার মানুষ নাকি। একেবারে অপদার্থ জীব! আবার সময় সময় অমলার মনে হইত, নিজের ভালবাসার নির্ম্মম পরিণতির স্মৃতি ভুলিতে পারিতেছে না বলিয়া অসহ্য মনোবেদনার তাড়নাতেই সূর্য্যকান্ত এমন খাপছাড়া কাণ্ড করিতেছে। অমলা কি পড়ে নাই ওরকম অবস্থায় কতলোকে কত কি অদ্ভুত কার্জ করিয়াছে, কেউ মদ খাইয়া গোল্লায় গিয়াছে, কেউ সন্ন্যাসী হইয়াছে, কেউ হাজার হাজার লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া যশ আর টাকা করিয়াছে, কেউ আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছে? সূর্য্যকান্ত একটা বিবাহ করিবে তা আর বেশী কি। এই কথাগুলি ভাবিবার সময় ভাবী স্বামীর জন্য বড় মমতা হইত অমলার। সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিত, আহা! আমি কি ওকে এতটুকু শান্তি দিতে পারব?

যত পরিবর্ত্তনশীল এলোমেলা কল্পনাই মনে আসুক এ কথা কিন্তু অমলা কখনো ভুলিত না যে সাধারণ উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, চাকরে, ব্যাবসাদার বা ওই ধরণের কারো সঙ্গে তার বিবাহ হইবে না, স্বামী সে পাইবে অসামান্য. দেশশুদ্ধ লোক যার নাম জানে, দেশশুদ্ধ লোক যার লেখা পড়িয়া হাসে কাঁদে। হাসে কাঁদে? কই, সূর্য্যকান্তের বই পড়িয়া সে নিজে অথবা বাড়ীর কেউ তো কখনো হাসিয়া অথবা কাঁদিয়া ফেলে নাই। তা হোক। সে জন্য সূর্য্যকান্তকে অসামান্য মানুষ বলিয়া মনে করিতে অমলার এতটুকু দ্বিধা হইবে না। খিল খিল করিয়া হাসা আর হু হু করিয়া কাঁদাই তো মানুষের আসল হাসি কান্না নয়। মনের গভীরতায় সূর্য্যকান্ত সকলকে হাসায় কাঁদায়। অমলাকেও। অমলার অন্তরেরও যে একটা অন্তর আছে, সূর্য্যকান্ত তার বইএ যার নাম দিয়াছে 'অতল হৃদয়ের তলদেশ', সেখানে বইএর বাহনে চাপিয়া অজানা অচেনা সূর্য্যকান্তের মত কে অত সহজে পৌঁছিতে পারিয়াছিল? বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হওয়া কোন মেয়ের পক্ষেই সহজ ব্যাপার নয়, বিশেষতঃ যাদের কুমারী জীবনের আর কোন পরিণতির সম্ভাবনাই নাই। বিশেষ কারণ থাকিলে ব্যাপারটা যে তাদের কাছে

আরও বিশিষ্ট হইয়া উঠিবে তাও স্বাভাবিক। তবে মুস্কিল এই, অভিজ্ঞতার অভাবে বিশেষ কারণগুলির নিরপেক্ষ সমালোচনা প্রায়ই তারা করিতে পারে না, বৈশিষ্ট্যটুকু সমগ্রভাবে আয়ত্তও করিতে পারে না, ভুল আশা নিরাশায় মনটা বোঝাই করে। যাহা পাইবে না তাহাই পাইবে জানিয়া রাখে এবং হয়ত তার চেয়েও দামী কিছু, যাহা আসল প্রাপ্য, তার অভাব কল্পনা করিয়া দুঃখ পায়। অমলা জানিত জীবনেব চিরস্থায়ী বিবাহ-পূজায় কিছু খাদ কিছু সোনা আর চালকলার প্রচলিত দক্ষিণাই তার জুটিবে। তারপর যখন জানা গেল কিছু নকল ও কিছু আসল জহরত এবং দামী নৈবিদ্য হইবে তাব দক্ষিণা তখন অমলাব হিসাব দাঁড়াইল কাঁচ, মুক্তো আব একডালা সুগন্ধি ফুলের। সে কেমন করিয়া জানিবে ভাগ্য তাব জন্য আসল হীরা, নকল মুক্তা আব রেকাবি ভবা মুখবোচক সুখাদ্যই শুধু সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রায় বত্রিশ বছর বয়স সূর্য্যকান্তের, চেহারা আটাশ বছরেব। ঠিক সুপুরুষ তাকে বলা যায় না, তবে চেহারায় একটা দুর্ব্বোধ্য ব্যক্তিত্বের ছাপ ও আকর্ষণ আছে। কথাবার্ত্তা চলাফেবায় সে অসাধারণ ধীর ও শান্ত,—অনেকটা বৃহৎ সংসারের আকণ্ঠ সংসারী বুড়ো কর্ত্তাদেব মত। কাবো সঙ্গে কথা বলিবার সময় এমনভাবে নিরপেক্ষ নিরুত্তেজ হাসি হাসে আর দাম-কষা যাচাই-কবা সমালোচনাব দৃষ্টিতে তাকায় যে মনে হয় আলাপী লোকটির মত অসংখ্য লোকের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই তার ঘনিষ্ঠ পবিচয হইয়াছে এবং তাব মুখেব কথাগুলি কতবার যে শুনিয়াছে বলিবার নয়। কেবল মানুষ নয়, এ জগতে কিছুই যেন সূর্য্যকান্তেব কাছে মৌলিক নয়, কিছুই তাকে আশ্চর্য্য করিতে পাবে না। পুরাণো জুতাব মত হইয়া গিযাছে মানুষ, ঘটনা, বস্তু, বাস্তবতা, কল্পনা, জীবনের খুঁটিনাটি,—তাব অভিজ্ঞতায় এমন বেমালুম খাপ খায় যে ফোস্কা পড়া দূবে থাক একটু মচমচ শব্দ পর্য্যন্ত করে না। বাহুল্যবর্জ্জিত একটা আরাম বোধ করা ছাড়া বাঁচিয়া থাকাব আব কোন অর্থ যেন সে খুঁজিয়া পায় না।

অমলা তো একেবারে থতমত খাইয়া গেল। গুমোটেব দীঘির মত একি শান্ত সমতল ঠাণ্ডা মানুষ। ভাব কই, উচ্ছ্বাস কই, তীব্রতা কই ? অন্যমনস্কতা, ছেলেমানুষী, খাপছাড়া চালচলন, বহস্যময় প্রকৃতিব ছোটবড় অভিব্যক্তি, এসব কোথায় গেল ? মানুষেব মধ্যে সে যে একজন অত্যাশ্চর্য্য মানুষ দিনে বাত্রে কখনো একটিবারও সে পরিচয় যে দেয় না। সাধাবণ মানুষেব মধ্যেও ববং যতটুকু প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, চবিত্রগত মৌলিকতা থাকে তাও যেন তার নাই। তার অসাধারণত্ব যেন এই যে সে সাধাবণ মানুষেব চেয়েও সাধাবণ। গম্ভীর সে নয়, বেশী কথাও বলে না। বেশভূষাব দিকে বাড়াবাড়ি নজর নাই, অবহেলাও কবে না। সুখসুবিধা [দুর্বোধ্য] কথা না পাইলে বিরক্ত হয়, বেশি পাইলে খুসী হয়, অতিরিক্ত উদারতা [অক্ষর মুছে গেছে] মত ব্যবহারও করে না। ক্ষুধা পাইলে খায়, ঘুম পাইলে ঘুমায, [হাসি] পাইলে হাসে, ব্যথা পাইলে ব্যথিত হয — এমন মানুষ [দুর্বোধ্য] সঙ্গে হাসে, গল্প কবে, বৌকে রাগাইয়া মজা দ্যাখে, বৌকে আদর [অক্ষর মুছে গেছে] সহজ স্বাভাবিক ভাবে।

[পৃষ্ঠাঙ্ক : ৪] তবু কি যেন আছে লোকটাব মধ্যে, অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত, যাব অস্তিত্ব আবিস্কাব কবা যায় না, যাকে প্রমাণ করা যায় না, গ্রহণও করা যায় না। সাফল্য লাভ করিবার আগে প্রতিভাবানেব প্রতিভা যেমন থাকিয়াও থাকে না, তেমনি একটা অস্তিত্বহীন বিপুল ব্যক্তিত্ব যেন সূর্য্যকান্তেব অঙ্গুলিহেলনেব মধ্যেও প্রকাশ পায় না। প্রকাশ পায না : যার মানে, আছে। কারণ, না থাকিলে প্রকাশ না পাইবে কেমন করিয়া ? সাধারণ মানুষের গ্রহণেব অযোগ্য এও একধবণেব প্রমাণ। অমলা অবশ্য এভাবে বিচাব কবিতে পারে না। সে ক্ষমতা তার নাই। তার হৃদয়টা শুধু বিনয়ে এতখানি ভরিয়া আসে যে সূর্য্যকান্তেব কাছে মাথাটা নত করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়, বশ মানিতে সাধ জাগে। এজন্য বড় বিরক্তি বোধ করে অমলা, বড় রাগ হয় তার।

গোড়ার দিকের একটা দিনের কথা অমলার মনে গাঁথা হইয়া আছে, একেবারে গোড়ার দিকেব। সকালের দিকে স্যাণ্ডেল পায়ে, তিনপাক সাড়ী জড়ানো গায়ে, এটাচি কেশ হাতে, আলগা খোঁপা মাথায় একটি শেষ-বয়সী তরুণী আসিয়া তাগিদ দিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যার পর শোবার ঘরে সূর্য্যকান্ত লিখিতে বসিয়াছিল গল্প। বিবাহ উপলক্ষে আসিয়া কিছু নিকট আত্মীয় আত্মীয়া তখনো রহিয়া গিয়াছিল, বাড়ীতে অনেক লোক। কত যে বাধা পড়িতে লাগিল লেখায়, বলা যায় না। এ ডাকে, সে কি জিজ্ঞাসা করে, ছেলেরা ঘরের সামনে বারান্দায় হট্টগোল করে, পাশের ঘরে অমলার সেজ ননদ তারস্বরে গান গায়, রান্নাঘরে ডাল সম্ভার দিবার সময় হাঁচিতে হাঁচিতে সূর্য্যকান্ত বেদম হইয়া আসে। তবু যে সূর্য্যকান্ত লিখিতেছিল, না দেখিয়াও অমলার তা জানিতে বাকী থাকে নাই, কারণ রাত সাড়ে দশটার সময় সে যখন ঘরে গেল তখনো সে লিখিতেছে এবং পাশে জমা হইয়া আছে সাত আটখানা লেখা কাগজ।

কত সন্তর্পণে ঘরে আসিয়াছিল অমলা, লিখিতে লিখিতে তবু তো সূর্য্যকান্ত তা টের পাইল।

—একটুখানি বাকী আছে অমলা, সামান্য একটু।

টেবিল ঘেঁষিয়া গিয়া দাঁড়াইয়াছিল অমলা, বলিয়াছিল, আচ্ছা আপনি কি করে লেখেন? গলার আওয়াজে কৌতুহল ছিল কম। মনে হইয়াছিল, সে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে সূর্য্যকান্তের মত লোক যে লিখিতে পারে এটা সম্ভব হইল কি করিয়া? হয়ত বুঝিতে পারিয়াছিল সূর্য্যকান্ত, হয়ত পারে নাই। কলম রাখিয়া চেয়ার ঘুরাইয়া সে বসিয়াছিল, হাত বাড়াইয়া ধরিয়াছিল বৌএর একখানা হাত, তারপর নিজের চেয়ারে বৌকেও বসাইয়াছিল। সাহিত্যিক বলিয়া নয়, নতুন-বৌ টেবিল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ওরকম একটা খাপছাড়া প্রশ্ন করিলে প্রথম নিঃশব্দ জবাবটা ওরকম ভাবে কোন স্বামী না দিয়া পারে? একটু হাসিয়াছিল সূর্য্যকান্ত, বলিয়াছিল, তুমি যেমন করে লেখো, ঠিক তেমনি করে, কাগজের ওপোর কলম দিয়ে। কিন্তু অমলারাণী, আর কতদিন আমাকে আপনি বলবে? অমলা অস্ফুটস্বরে বলিয়াছিল, বারণ তো করনি আগে।

যে অধিকার হইতে স্বামী তাহাকে প্রায় এক সপ্তাহ বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, সুযোগ পাওয়া মাত্র অমলা তা গ্রহণ করিয়াছিল · স্বরটাও অস্ফুট হইয়াছিল পুলকে, লজ্জায় নয়। একটু যেন অবাক হইয়া গিয়াছিল সূর্য্যকান্ত, কয়েকমুহূর্ত্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া অমলার মুখের মৃদু লালিমার মধ্যে সে যেন পরিমাণ করিতে চাহিয়াছিল তার লজ্জার। কিন্তু সেরকম অতল গভীর লজ্জা কেন আসিবে অমলার, সে কচি খুকী নয়, থিয়োরেটিক্যালি যে সব জানে, স্বামী যার আট ন'দিনের পুরাণো এবং সাধারণ? তার মুখে যা ছিল তার অধিকাংশই শালিতা। এই মোহকরী পদার্থের বাহুল্য কিন্তু সূর্য্যকান্তকে মুগ্ধ করে নাই। স্বামীর সঙ্গে তাড়াতাড়ি জমজমাট ভাব করিয়া ফেলিবার জন্য অমলার ঔৎসুক্য সূর্য্যকান্তের কাছে অল্পে অল্পে ধরা পড়িতেছিল, সে বুঝিতে পারিতেছিল তাদের পরিচয়কে সে যেরকম শ্লথ মন্থর গতিতে আগাইয়া লইয়া লইয়া চলিয়াছে অমলা তা পছন্দ করে না। যতকথা অমলা বলিবে ও শুনিবে, যত কিছু সে বুঝিবে ও বুঝাইবে ইতিমধ্যেই তা যেন পাহাড়-প্রমাণ জমিয়া গিয়াছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ও সমস্তের আদানপ্রদান চলে অবিলম্বে সেটা পূর্ণবেগে আরম্ভ করিয়া না দিলে তার চলিতেছে না।

—তোমার বয়স কত বলত?

[আর একটি ৪ পৃষ্ঠাঙ্ক যুক্ত পাতা]

[তবু কি যেন আছে লোকটার মধ্যে, অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত, যার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায় না, প্রমাণ করা যায় না, গ্রহণ করা যায় না। সাফল্যলাভ করার আগে প্রতিভাবাণের প্রতিভা যেমন থাকিয়াও থাকে না তেমনি একটা অস্তিত্বহীন বিপুল ব্যক্তিত্ব যেন সূর্য্যকান্তের অঙ্গুলি-হেলনের মধ্যেও প্রকাশ পায় না। প্রকাশ পায় না যার মানে, আছে। না থাকিলে প্রকাশ না পাইবে কি করিয়া? এ ভাবে অমলা বিচার করে না। সে ক্ষমতা তার নাই। তার হৃদয়টা শুধু বিনয়ে এতখানি ভরিয়া আসে যে সূর্যকান্তের কাছে মাথা নত করিতে ইচ্ছা হয়, বশ মানিতে সাধ জাগে। এতে অমলা বিরক্তি বোধ করে, বড় রাগ হয় তার।

আচ্ছা, আপনি কি করে লেখেন?—সে জিজ্ঞাসা করে। গলার আওয়াজে কৌতুহল থাকে কম। মনে হয়, সে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে সূর্য্যকান্তের মত লোক যে লিখিতে পারে,—এটা সম্ভব হইল কি করিয়া? হয়ত বুঝিতে পারে সূর্য্যকান্ত, হয়ত পারে না। কলম রাখিয়া চেয়ার ঘুরাইয়া বসে, হাত বাড়াইয়া বৌএর হাতখানা ধরে, তারপর সেই চেয়ারে বৌকেও বসায়। সাহিত্যিক বলিয়া নয়, নতুন বৌ টেবিল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া খাপছাড়া প্রশ্ন করিলে জবাবটা এরকম করে না কোন স্বামী? এটুকু হাসে সূর্য্যকান্ত, বলে, তুমি যেমন করে লেখো ঠিক তেমনি করে, কাগজের ওপোর কলম দিয়ে। কিন্তু অমলারাণী, আর কতদিন আমাকে আপনি বলবে? অমলা অস্ফুটস্বরে বলে, বারণ তো কর নি আগে।

যে অধিকার হইতে সূর্য্যকান্ত তাকে প্রায় একসপ্তাহ অন্যায় করিয়া বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, সুযোগ পাওয়া মাত্র অমলা অবিলম্বে তাহা গ্রহণ করে। সূর্য্যকান্ত যেন একটু অবাক হইয়া যায়, কয়েকমুহূর্ত্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া সে যেন অমলার মুখের লালিমার মধ্যে তার লজ্জার পরিমাণ করে। স্বামীর সঙ্গে ভাবটা তাড়াতাড়ি জমজমাট করিয়া ফেলিবার জন্য অমলার ঔৎসুক্য সে আগেই ধরিতে পারিয়াছিল। তাদের পরিচয়কে সে যেরকম শ্লথ মন্থর ভাবে আগাইয়া লইয়া চলিয়াছে এটা অমলা পছন্দ করে না। যতকথা সে বলিবে ও শুনিবে, যত কিছু বুঝিবে ও বুঝাইবে তা যেন ইতিমধ্যেই পাহাড়-প্রমাণ জমিয়া গিয়াছে, স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ও সমস্তের যে আদানপ্রদান চলে অবিলম্বে সেটা পূর্ণবেগে আরম্ভ করিয়া না দিলে অমলার চলিতেছে না।

তোমার বয়স কত বলত?

রোমান্স জমিতেছিল, হঠাৎ বয়সের প্রশ্নে অমলা ব্যথা পাইল। সংক্ষেপে বলে, উনিশ।

সূর্য্যকান্ত বলে, বিয়ের আগে শুনেছিলাম ষোল।

আশ্বিনের]

[তৃতীয় বন্ধনীভুক্ত উপবের অনুচ্ছেদ কয়টি পাণ্ডুলিপিতে আব একটি ৪ পৃষ্ঠাঙ্ক যুক্ত পাতায় দ্বিতীয়বার লিখিত অবস্থায় পাওয়া যায়।]

[পৃষ্ঠাঙ্ক : ৫] রোমান্স জমিতেছিল, হঠাৎ বযসের প্রশ্নে বড় ব্যথা পাইযাছিল অমলা। সংক্ষেপে বলিয়াছিল, উনিশ।

সূর্য্যকান্ত বলিয়াছিল, বিয়েব আগে শুনেছিলাম ষোল।

আশ্বিনের রাত্রি। আজকালের মধ্যে যখন পূর্ণিমা, আকাশেও নিশ্চয় জোস্নাব ছডাছড়ি। শুধু তাই নয়। প্যাডে সূর্য্যকান্তেব অসমাপ্ত লেখাব শেষ লাইন কটা অমলা আড়চোখে পড়িয়া ফেলিয়াছিল, শশাঙ্ক নামে কে যেন অনুপমা নামে কার ছদ্মবেশ পরাণো গোপণ ভালবাসা জানিতে পাবিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, বিবর্ণ পাংশু হইয়া আসিযাছে তার মুখ আর অনুপমাব অনুপম চোখদুটিতে দীপশিখাব মত দেদীপ্যমাণ হইয়া উঠিযাছে বিদ্রোহ, প্রথাব বিবুদ্ধে, লজ্জাব বিবুদ্ধে, দুর্ব্বলতাব বিবুদ্ধে,—কে জানে আরও কিসেব বিবুদ্ধে ! এমন সময়, শশাঙ্ক ও অনুপমার ওবকম উত্তেজনাময় মুহূর্ত্তগুলির কথা লিখিতে লিখিতে বৌকে বুকে লইয়া, একি বূঢ় বাস্তব মন্তব্য সূর্য্যকান্তেব ! তার বাপ-মা তাব বযস কযেক বছব ভাঁড়াইয়াছিল, এই কি সে কথা তুলিবার সময় ?

জ্যোস্নামযী রাত্রিব জন্য নয, যেমন অনিন্দ্যভাবে সূর্য্যকান্ত আদব আরম্ভ কবিয়াছিল সে জন্যও নয, সূর্য্যকান্তের সে রাত্রির ব্যবহার মনে কবিয়া এখনো অমলার যে ক্ষোভ জাগে তাব কারণ, শঙ্কব ও অনুপমা। গল্পটা অমলা পরে পড়িয়াছে—চাব পাঁচবাব। সেদিন যেখানে সূর্য্যকান্ত লেখা থামাইয়াছিল, প্রথম হইতে পড়িয়া সে পর্য্যন্ত পৌঁছিলে প্রত্যেকবাব অমলার রক্ত চঞ্চল হইয়া ওঠে। ওবকম কাহিনী লিখিতে লিখিতে অমন নিবুত্তেজ আবেগবিহীন অবস্থায় সূর্য্যকান্ত কেমন করিযা ছিল ? কি প্রবঞ্চক সূর্য্যকান্ত ।

কি বিপুল তাব আত্মসংযম ।

স্বামীর প্রবঞ্চনাকে মাঝে মাঝে অমলা আত্মসংযম বলিয়া চিনিতে শিখিয়াছে। বিবাহের সময অমলাব তিন বছব বযস ভাড়াণো হইয়াছিল বলিয়া সূর্য্যকান্ত কোনদিন বাগ করে নাই, অনুযোগ দেয নাই। কে জানে সেদিন বাত্রেও কথাটা সে খোঁচা দিবাব জন্য বলিযাছিল অথবা শুধু বলাব জন্য বলিয়াছিল ! আঘাত কবাব স্বভাব যে সূর্য্যকান্তের নাই এটা অমলা আজকাল স্বীকার করে।

আজকাল মানে বিবাহেব মাস আষ্টেক পবে, বসন্তেব শেষে যখন গ্রীষ্মেব সুবু হইয়াছে। গবমে অমলাব ঘন ঘন পিপাসা পায়, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু সূর্য্যকান্তের অবাস্তব কবিত্বময় ভালবাসাব জন্য তার যে তৃষ্ণা অবিবাম জাগিযা থাকে তার কাবণও গ্রীষ্ম নয, বিশেষ স্বাভাবিকও সেটা নয। একদিন, একটা দিনেব জন্যও সূর্য্যকান্ত যদি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত !—যদি আবোলতাবোল কথা বলিত অমলাকে, আবেগে অদ্ভুত ব্যবহাব কবিত, পাগলেব মত মাতালেব মত এমন ভালবাসিত যে বাস্তব জগতটা আড়াল হইয়া যাইত প্রেমেব বঙীন পর্দ্দায়। কিন্তু সূর্য্যকান্ত এক মিনিটের জন্যও আত্মবিস্মৃত হইতে জানে না। এমন কি, অমলা যদি নিজেই একটু বাড়াবাড়ি উচ্ছ্বাস আবম্ভ কবিয়া দেয়, সৃষ্টি কবিয়া লইতে চায একটি মোহকরী কাব্যময় পরিবেষ্টনী, সূর্য্যকান্ত অসন্তুষ্ট হইযা বলে, এসব ছ্যাবলামি শিখলে কোথায ?

রাগেব মাথায অমলা বলে, তোমাব কাছ থেকে শিখেছি, তোমার বই থেকে।

সূর্য্যকান্ত বলে, তোমায় যখন দেখতে গিয়েছিলাম বিয়েব আগে, মনে হয়েছিল তুমি বুঝি খুব সাদাসিদে সবল—এসব পাকামি জানো না। তুমি যা শিখেছ অমলা, আমাব কোন বইএ তা নেই। যদি কখনো লিখে থাকি ঠাট্টা কবে খোঁচা দেবার জন্য লিখেছি, এবকম কবিত্ব যাবা কবে তাদেব যে মাথাব ব্যারাম থাকে তাই দেখাবাব জন্যে।

ভালবাসা বুঝি মাথাব ব্যাবাম ?

ভালবাসাব তুমি কি বোঝ শুনি ?

অমলা স্তব্ধ হইয়া যায়। বাগে অভিমানে প্রথমটা তার এত কষ্ট হয যে সে ভাবে এব চেয়ে মবিযা যাওয়াও ভাল। তারপর অমলার কান্না আসে। কুঁজোটা হাতখানেক সরানো, টেবিলের গুছানো বই ও কাগজপত্রগুলি সাজানো এই ধরনের অনাবশ্যক খুঁটিনাটি কাজ করিতে কবিতে সে চোখেব জল ফেলিতে থাকে। সূর্য্যকান্ত যে দেখিতে পাইবে সে কাঁদিতেছে তাতে অমলাব সন্দেহ থাকে না।

সূর্য্যকান্ত বলে, একটু জল দাও তো ?

অমলা জল দিলে একচুমুক খাইয়া হাসিয়া বলে, অত কেঁদোনা, জলটা নোনতা লাগছে।

ঠাট্টা ! অমলার কান্নাকে উপলক্ষ করিয়া পর্য্যন্ত তার ঠাট্টা। বিছানায় আছড়াইয়া পড়িয়া এবাব অমলা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে।

সূর্য্যকান্ত বিব্রত হইয়া বলে, তোমার সঙ্গে পেরে উঠলাম না অমলা, সোজা সহজ জীবনে তুমি খালি বিকার টেনে আনছ। এই বয়সে এমন হল কেন তোমার ? অনর্থক দুঃখ টেনে আনো কেন ? তোমার ছেলে

মরেছে না স্বামী ত্যাগ করেছে ? খেতে পরতে পাচ্ছ না তুমি ? সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা সইছে না তোমার ? দিব্যি হেসে খেলে মনের আনন্দে দিন কাটাবে তুমি, তা নয়, সব সময় একটা কৃত্রিম ব্যথায় ব্যথিত হয়ে আছ। বিয়ের, আগে আর কারো সঙ্গে তোমার ভাব হয়ে থাকলেও ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম। তাও তো নয়। তোমার যত ব্যথাবেদনা সব আমাকে নিয়েই। কেন বলত ? তোমাকে আমি অবহেলা করি, আদরযত্ন করি না ? আজ তোমাকে হাসাবার কত চেষ্টা করলাম, হাসলে না, রাগাবার চেষ্টা করলাম রাগলে না, বললাম এসো একটু ব্যাগাটেলি খেলি দুজনে তার বদলে তুমি—

উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে অমলা উঠিয়া বসে, অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা গুঁজিয়া দেয় স্বামীর পায়ের মধ্যে, বলে, আমায় মাপ কর, মাপ কর। আমি তোমার উপযুক্ত নই—

সূর্য্যকান্ত বলে, এই তো ! এই দ্যাখো আবার কি আরম্ভ করলে !

সেদিনকার মত সেইখানেই তাদের দাম্পত্যালাপের একরকম ইতি হয় বটে, অমলার মনের মধ্যে কিন্তু গুমরাইতে থাকে অভিমান। একেবারে গোড়ার দিকে, সূর্য্যকান্ত যখন তার কাছে ছিল সাধারণের চেয়েও সাধারণ মানুষ, তখন তার কাছে মাথা নত করার যে ইচ্ছা অমলার জাগিত, অনেকদিন আগেই সে ইচ্ছার কাছে সে হার মানিয়াছে। কে জানে তারপর স্বামীকে সে সত্যসত্যই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে কিনা ! একটা মানুষের বিরুদ্ধে ক্রমাগত মনের মধ্যে অভিমান গুমরানো, অনন্যমনে দিবারাত্রি তার সমালোচনা করা, তাকে জয় করার ভাবনায় একটু শুকাইয়া পর্য্যন্ত যাওয়া, ভালবাসারই একধরনের লক্ষণ। সংসারের কাজ করিতে করিতে অমলা অন্যমনা হইয়া যায় বড়জা, বিধবা ননদ, ছোট দেবর এবং বাড়ীতে আরও যারা থাকে অমলার বিষণ্ণ ম্লান মুখ দেখিয়া নিজেদের মধ্যে তারা ফিস ফিস করিয়া তার কথা আলোচনা করে। সূর্য্যকান্ত আপিস গেলে অমলা নিজের অজ্ঞাতে এমন ব্যবহার করে বাড়ী যেন খালি হইয়া গিয়াছে। দেবর চন্দ্রকান্ত বলে, মাথা ধরেছে মেজোবৌদি ?

কই না ?

তবে দয়া করে শুয়ে না থেকে উঠে একবার শুনে এসো দিকি দিদি ডাকছে কেন ? এমন সময় মানুষ শোয় ! [পৃষ্ঠাঙ্ক ৬] তখন অমলার মনে পড়িয়া যায় আজ তার রান্নার পালা কিন্তু রান্না সে শেষ করে নাই এবং একঘণ্টা আগে ছিল তার খাওয়ার সময় কিন্তু এখনো সে স্নান পর্য্যন্ত করে নাই। হায়, যে স্বামী পদে পদে অপমান করে, আপিস যাওয়ার সময় জামার বোতাম লাগাইয়া দিয়া কি করে সারা দুপুর কাটার বলার জন্য আজই যার শক্ত কথায় সে মর্ম্মাহত হইয়া গিয়াছিল, বিছানায় শুইয়া বেলা এগারোটা হইতে একটা পর্য্যন্ত শুধু তার কথাই সে ভাবিয়াছে ! কি করা যায় এখন ? সকলের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় শুইয়া থাকার ? অমলা হঠাৎ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলে, ঠাকুরপো, বড্ড খারাপ লাগছে শরীরটা, আমি আজ খাব না।

উপবাসী হৃদয়ের কাণ্ডকারখানায় দিনটা অমলার উপবাসে কাটে। বিকালে সে ক্রমবর্দ্ধনশীল উত্তেজনায় হইয়া থাকে বোমার মত উচ্ছ্বাসের বিস্ফোরক। সূর্য্যকান্ত বাড়ী আসিলেই বলে, শোন, ওগো শোন, কাছে এসো না, এইখানে এসে শোনো। একমাসের ছুটি নেবে ? কোথাও নিয়ে যাবে আমাকে ? যেখানে হোক, যেদিকে দুচোখ যায় চলো আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়ি,—শুধু তুমি আর আমি, আর কেউ নয়। যাবে ? বলো না, যাবে ? তাজমহল দেখে ফিরবো। একদিন তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে অপর্ণার মত তোমাকে আমি শেষবার জিজ্ঞেস করবো—

আপিস ফেরত ঘর্ম্মাক্ত সূর্য্যকান্ত গলা হইতে অমলার হাত দুটি ধীরে ধীরে খুলিয়া দেয়। জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে বলে, অপর্ণা কে ?

ওমা, ভুলে গেছ ? তোমার রামধনু বইএর অপর্ণা।

ও, সে ?—সূর্য্যকান্ত জামা খুলিয়া, জুতা খুলিয়া তফাতে চেয়ারটাতে বসে। বলে, সামনের শনিবার ছুটি নিয়ে তোমাকে বাপের বাড়ী রেখে আসব কিছুদিনের জন্যে।

স্তম্ভিতা অমলা বলে, কেন ?

এখানে থাকলে তুমি ক্ষেপে যাবে।

এ আঘাতে উচ্ছ্বাসের বোমা ফাটিয়া যায়, কান্নার বিস্ফোরণে। সূর্য্যকান্ত নিষ্ঠুর নয়, মিনিটখানের মধ্যে অমলার অশ্রু তার ঘামে ভেজা বুকখানা আরও ভিজাইয়া দিতে থাকে। বড় ম্লান দেখায় সূর্য্যকান্তের মুখখানা। সহানুভূতিতে নয়। শাস্তিতে।

স্ত্রীকে নার্ভটনিক খাওয়ানোর বদলে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ী পাঠানোই সূর্য্যকান্ত ভাল মনে করিল। এখানে থাকিয়াই সে নার্ভটনিক খাইতে পারিবে শুধু এই ভয়ে নয়। অমলা অনেকদিন বাপমাকে দ্যাখে নাই। কুমারী জীবনের আবহাওয়ায় কিছুদিন বাস করিয়া আসিলে হয়ত বিবাহিত জীবন যাপনের কৌশলগুলি সে কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়া আসিতে পারিবে। উনিশটা বছর অমলা সেখানে ছিল, সবগুলি বছর বোধ হয় সে সঙ্গে

আনিতে পাবে নাই, তাই এমন ছেলেমানুষী কবে। হয়ত এবার বযসগুলি সংগ্রহ করিয়াও আনিতে পারিবে ; একটু কমিবে ছেলেমানুষী।

যাইতে রাজী হইল বটে অমলা, সেজন্য কাণ্ড করিল কম নয়। রাজী হওযাব রাত্রে অনেকক্ষণ গুম্ খাইয়া থাকিয়া বলিল, আমাকে সইতে পারছ না বলে পাঠিয়ে দিচ্ছ না ত ?

সূর্য্যকান্ত বলিল, না।

আমার জন্য তোমার মন কেমন করবে ?

কববে না ? তুমি বুঝি [ভাব] তোমাকে আমি ভালবাসি না ? একলা একলা আমাব বিশ্রী লাগবে অমলা। তুমি আমার বুড়ো বয়সের বৌ যে।

তুমি যদি বুড়ো হও, তা হলে আমিও বুড়ী।

এতবড় তোষামোদে সূর্য্যকান্ত হাসিল। বলিল, তা নয় অমল, কলেজের ছেলেব সঙ্গে তোমাব বিয়ে হওয়া উচিত ছিল।

[পাণ্ডুলিপি এখানে খণ্ডিত]

সাতটি বিক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠায় 'অবিশ্বাসীর বৌ' নামক একটি অসম্পূর্ণ গল্পের খসড়া পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে তিনটি পৃষ্ঠার শিরোনামে 'অবিশ্বাসীর বৌ / মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়' লেখা। অপর চারটি পৃষ্ঠায় এই গল্পেরই বিভিন্ন পাঠ দেখা যায় :

একজোড়া বড বড় পটলচেবা চোখ আছে সতীবাণীব। নাবীপুবুষ নির্ব্বিশেষে সকলকে চোখদুটি দেখানোব জন্য বারবার সে সকলের চোখেব দিকে তাকায় আব নারীর বেলায় প্রায় অদৃশ্য একটু হাসি হাসে এবং পুবুষেব বেলায় মৃদু লজ্জার একটা মধুর ভঙ্গিতে চোখ নামাইয়া নেয, স্থান অস্থান সময অসময চেনা অচেনায বাছবিচার করে না। বয়স যখন কম ছিল, পটলচেরা চোখের বিশেষ মূল্য সম্বন্ধে যখন সবে সচেতন হইয়া উঠিতে আবম্ভ করিয়াছে, তখন স্থান কাল পাত্রের কতকটা বিচাব সে কবিত, চক্ষুষ্মানদেব সংখ্যা পাঁচসাতজনেব বেশী হইয়া পড়িলে সকলকে সামলাইতে পারিত না, কারও চোখেব দিকে তাকাইত অনেকবাব কাবও চোখেব দিকে তাকান হইত না একেবারেই। তা ছাড়া চোখ নামানোব সময মেয়েদেব বেলায হাসি আব পুবুষদেব বেলায লজ্জার ভঙ্গীটা হইত বড় বেশী স্পষ্ট আর দৃষ্টিকটু... [দুর্বোধ্য] বেহায়াপণার মত। তাবপব ক্রমে ক্রমে এসব ত্রুটি তার শোধরাইয়া গিয়াছে।

চোখে চোখে তাকান আব সলজ্জভঙ্গীতে চোখ নামানোর কায়দা এখন সতীবাণীব আগাগোড়াই নিখুঁত, এজন্য তাকে চেষ্টাও করিতে হয় না, আপনা হইতে সবটুকু সম্পন্ন হয়। যখন যে অবস্থাতে যতগুলি চক্ষুষ্মানেব সামনেই তাকে হাজির কবিয়া দেওয়া হোক, হাতেব কাজ মুখের আলাপ অথবা নীরব আলস্য যা কিছু লইয়া ব্যাপৃত থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক হোক, এতটুকু অস্বাভাবিকতাব সৃষ্টি না করিয়াই সে অনায়াসে সকলকে নিজের চাউনি ভাগ কবিয়া দিবে, যতটুকু সময চোখে চোখে চাহিলে প্রভাবটা সবচেয়ে জোরাল হয় চাহিবে ঠিক ততটুকু সময়, হাসি ও লজ্জা যতখানি মৃদু হইলে সবচেয়ে মধুর হয় হাসিবে ও লজ্জা পাইবে ঠিক ততটুকু। আর চক্ষুষ্মানদের মধ্যে দেখিবার ক্ষমতাওয়ালা চোখ যদি কারও থাকে হঠাৎ তার মনটা নাড়া খাইয়া করিয়া উঠিবে কেমন কেমন, চোখের সামনে চোখেব পলকে একটা আশ্চর্য্য খণ্ডকাব্যের অভিনয় যেন হইয়া গেল।

এরকম চোখওয়ালা চক্ষুষ্মান সংসারে বেশী নাই, মেয়েরা চোখ না ঠারিলে চোখের ভাষা বোঝে খুব কম লোকেই। কিন্তু সেজন্য সতীরাণীর আপশোষ নাই, ও সব সে নিজেও ভাল বোঝে না, চোখের ওসব ভাষাটাষার ব্যাপার। নিজের পটলচেরা চোখ মানুষকে দেখানোর একটা স্বভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে, এইমাত্র। যারা একেবারে অন্ধ নয় তাদের দিয়াই তার কাজ চলিয়া যায়, মাঝে মাঝে দু'একজন যদি মুখ ফুটিয়া বলে যে....[দুর্বোধ্য] চোখ দুটি ভারি সুন্দর, তাতেই সে খুসী।

অবিশ্বাসীর বৌ

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

একজোড়া বড় বড় পটলচেরা চোখ আছে সতীরাণীর। সকলকে চোখ দুটি দেখানোর জন্য বারবার সে সকলের চোখের দিকে তাকায় আর মৃদুমধুর লজ্জার একটা ভঙ্গি করিয়া চোখ নামাইয়া নেয়। বয়স যখন ছিল কম, পটলচেরা চোখের দাম সম্বন্ধে সবে সচেতন হইয়া উঠিতেছে, তখন স্থান কাল পাত্রের হিসাব সে করিত, আশেপাশে চক্ষুষ্মানদের সংখ্যা বেশী হইয়া পড়িলে সকলকে সামলাইতে পারিত না। কারও চোখের দিকে তাকাইত অনেকবার কারও চোখের দিকে তাকান হইত না একেবারেই। চোখের দিকে তাকাইয়া থাকিবার সময়ের পরিমাণটাও সে সঠিক রাখিতে পারিত না, বেশী কম হইয়া যাইত। তাছাড়া চোখ নামানোর সময় লজ্জার ভঙ্গিটাও হইত অস্বাভাবিক রকমের স্পষ্ট আর দৃষ্টিকটু, বেমানান বেহায়াপণার মত, ক্রমে ক্রমে এসব ত্রুটি শোধরাইয়া গিয়াছে। চোখে চোখে তাকান আর সলজ্জভঙ্গিতে চোখ নামানর কায়দা এখন সতীরাণীর নিখুঁত, এজন্য তাকে চেষ্টাও করিতে হয় না, আপনা হইতে সবটুকু সম্পন্ন হয়। যখন যে অবস্থায় যেখানে যতলোকের সামনেই এখন তাকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া যাক, হাতের কাজ মুখের আলাপ অথবা চুপ করিয়া থাকার মধ্যে যা লইয়া ব্যাপৃত থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক হোক, এতটুকু অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি না করিয়াই সে অনায়াসে নিজের পটলচেরা চোখের চাউনী ভাগ করিয়া দিবে, চোখে চোখে যতটুকু সময় চাহিলে প্রভাবটা সবচেয়ে জোরালো হয় ঠিক ততটুকু সময় চাহিবে, লজ্জার ভঙ্গি যতটুকু মৃদু হইলে সবচেয়ে মধুর হয় ঠিক ততটুকু লজ্জার সঙ্গে চোখ নামাইবে। আর চক্ষুষ্মানদের মধ্যে দেখিবার মত চোখ যদি কারও থাকে মনটা তার করিয়া উঠিবে কেমন কেমন।

মুস্কিলের বিষয়, দেখিবার মত চোখওয়ালা চক্ষুষ্মানও সংসারে বেশী নাই, এরকম চক্ষুষ্মানদের নিজের পটলচেরা চোখদুটি দেখানর সুযোগও সতীরাণী আজকাল বেশী পায় না। চোখে চোখে চাহিয়া চোখ নামানোর সতীরাণীর এই অভ্যাসের মধ্যে খণ্ডকাব্য আবিষ্কার করার ক্ষমতা যাদের চোখের আছে কেবল তারা নয়, বিবাহের বছর তিনেক পরে অতিসাধারণ চোখওয়ালাদেরও হঠাৎ বড় অনটন ঘটিয়াছে সতীরাণীর। তার স্বামী বিভূতি হঠাৎ . .

[অসম্পূর্ণ পৃষ্ঠা]

['৩'-পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া পৃষ্ঠা]

মানুষকে চোখ দেখায় বলে আর কিছু দেখানো সম্বন্ধে সতীরাণী অনেকটা উদাসীন। সাবান পাউডার শাড়ী গয়না ইত্যাদির সাহায্যে রূপ বাড়াবার চেষ্টা যে তার নেই তা নয় কিন্তু .

[অসম্পূর্ণ পৃষ্ঠা]

[আরেকটি '৩'-পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া পৃষ্ঠা]

মানুষকে চোখ দেখায় বলে আর কিছু দেখানো সম্বন্ধে সতীরাণী একান্ত উদাসীন। প্রসাধন যেন তার রূপ বাড়াবার চেষ্টা নয়, রূপ যাতে না নষ্ট হয় শুধু এইটুকু ঠেকিয়ে রাখা। সাজসজ্জা তার এমন অস্বাভাবিক রকমের সাধারণ যে প্রথম দেখলে ফাঁকি বলে সন্দেহ হয় মনে হয় বেশী কুটিল হলে মানুষ যে মানসিক সরলতার ভাণ করে, সেই ভাণটাই সতীরাণী দেহে সাজিয়ে রেখেছে। কিন্তু একবার সতীরাণীর চোখের দিকে তাকালেই এ সন্দেহ মিটে যায়। নিজেকে অবহেলা করার কৈফিয়ৎ এতখানি স্পষ্টভাবে নিজের চোখে সে ফুটিয়ে রেখেছে যে চোখের ভাষা যারা জানেনা তাদেরও সেটা বোধগম্য হয়। 'আমায় দেখোনা, আমার চোখ দ্যাখো'—কারও কাছে এটা ঠেকে মিনতির মত, কারও মনে হয় আদেশ।

বাঁ হাতের একটা আঙ্গুল সতীরাণীর কাটা। অল্পবয়সে তরকারি কাটতে গিয়ে অল্প একটু কেটে যায়, কিন্তু দুদিনের মধ্যে সমস্ত আঙ্গুলটা ভয়ানকরকম ফুলে ফেঁপে ওঠায় ডাক্তার আঙ্গুলটাই কেটে বাদ দিয়ে দেন—পাছে হাতটাই কেটে বাদ দিতে হয়, এই জন্য। বাঁ কাণের তলার দিকের তুলতুলে অংশটুকুও সতীরাণীর চেরা। তার অমন পটলচেরা সজল চোখের মিনতি উপেক্ষা করে পাড়ার এক দুরন্ত ছেলে অল্পবয়সে তার বাঁ কাণটির এই দুর্দশা ঘটিয়েছে। সতীরাণীর পাদুটি সমান অথবা সামান্য একটু ছোট বড় চলন দেখে সব সময় এটা বোঝা যায় না, কখনও সন্দেহ হয়, কখনও মনে হয় চোখের ভুল।

['৪'-পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া পৃষ্ঠা]

এসব খুঁত গোপন করবার চেষ্টাও সতীরাণীব নেই। যাবা জানে তারা তো জানেই, যাবা জানেনা তাদের কাছে আঙ্গুলকাটা হাতটি আঁচলেব নীচে লুকিয়ে, কাণে আরেকটি ফুটোয় পাতলা সোণাব পাতের নতুন ধরণের গয়ণা পরে, চলনকে নিছক দেহের রক্তমাংসে ঢেউ তোলাব কায়দায় পরিণত করে, নিজেকে সে কোনদিন নিখুঁত প্রতিপন্ন করতে চায় না। নিজের উপেক্ষা দিয়ে খুঁতগুলিকে সকলের কাছে তুচ্ছ কবে দেওয়াই তার ইচ্ছা।

সে নিজেই বলে—

'একটা আঙ্গুল নেই কিনা, তাই একটা আঙ্গুলেই দুটো আংটি পরেছি, ছেলেবেলা একটুখানি কেটে গিয়ে সেপ্‌টিক্ হয়ে গিয়েছিল কিনা, ডাক্তাব তাই আঙ্গুলটা কেটে দিয়েছিল। কাণে কোথায় ফুটো করে দুল পবেছি দেখছেন—একটা বজ্জাত ছেলে দিয়েছিল কাণের দফাবফা করে ছেলেবেলায়, ভারি কিছু যে কাণে পরব তাব যো নেই। সেই কবে পা মচকাল সিঁড়ি দিয়ে নামতে ...,

[অসম্পূর্ণ]

['৪'-পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া আরেকটি পৃষ্ঠা]

নিজেই হাতটি মেলে ধবে নতুন লোকেব সামনে, নিজেই বলে . 'একটা আঙ্গুল নেই কিনা, তাই এক আঙ্গুলে দুটো আংটি পরেছি, ছেলেবেলা একটু কেটে গিয়ে সেপ্‌টিক্ হয়ে গিয়েছিল কিনা, তাই ডাক্তাব আঙ্গুলটা কেটে দেন। শুধু নারকেল তেল মাখেন ? কিছু মেশান না ? আমিও তাই মাখি।'

গোপন কবার বদলে নিজের উপেক্ষা দিয়ে খুঁতটি সকলের কাছে তুচ্ছ কবে দেওযা এত সহজ মনে হয় সতীরাণীব যে দেহমনের আরও যে খুঁতগুলি তার আছে সেগুলিকেও প্রয়োজনমত সে এমনিভাবে উপেক্ষা করে,—সকলকে জানিয়ে করে, একরকম স্পষ্টই বলে দেয়, আমার এই খুঁতকে আমি গ্রাহ্য কবি না, বুঝলে ?

পুরুষেরা প্রায় সকলেই বোঝে, কম বোঝে কেবল মেয়েবা। সবচেয়ে কম বোঝে সতীবাণীব স্বামী প্রফুল্লব বোনেবা। সতীরাণীর স্বামীব বোন অনেকগুলি—সংখ্যায মোটে পাঁচটি বটে, কিন্তু ঘরবাড়ী আব পরেব জীবন জুড়ে থাকবার ক্ষমতায় আটদশটির সমান। পয়সা খরচ কবাবাব ক্ষমতায বোধহয তাবও বেশী। এদের মধ্যে এই ক্ষমতাব হিসাবে চবম বলা চলে সেজ বোন অর্জুনাকে। এ নামটা সতীবাণীর দেওযা—বিয়েব পরেই পঞ্চপাণ্ডবেব নামের পিছনে একটি কবে আকাব যোগ দিয়ে পাঁচটি ননদেব নামকবণ কবে। পবিহাসেব বস ফুবিয়ে.

[অসম্পূর্ণ]

অবিশ্বাসীর বৌ

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

একজোড়া বড বড় পটলচেবা চোখ আছে সতীবাণীব। নাবীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকে চোখদুটি দেখানোব জন্য বারবাব সে সকলের চোখের দিকে তাকায় আব নাবীর বেলায প্রায অদৃশ্য একটু হাসি হাসে এবং পুরুষেব বেলায় মৃদু লজ্জার একটা মধুর ভঙ্গিতে চোখ নামাইয়া নেয়।

[এখানেই এই পৃষ্ঠায় লেখা শেষ]

'তেজী বৌ' নামাঙ্কিত গল্পের প্রথম দুটি বাক্য-লেখা একটি পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা থেকে জানা যায় গল্পটির প্রস্তাবিত নাম ছিল 'সুমতি'।

সুমতি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

'মোক্তারের বৌ' আর একটি অসম্পূর্ণ গল্প যার এক পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে :

উনত্রিশ বছর বয়সেই লাবণ্যবতীর বোঁচা নাকটা গিয়াছে মানাইয়া আর নামটা হইয়াছে বেমানান। একদিন এমন লাবণ্য ছিল লাবণ্যবতীর যে বোঁচা কেন নাক না থাকিলেও তার চলিত, তার নাকের পালিশ-করা চকচকে সোণার নাকছাবিটি পর্য্যন্ত নাকি সে লাবণ্য সাগরে হাবুডুবু খাইয়া তলাইয়া যাইত। এখন সে নাক আছে, নাকছাবি আছে, নাম তো আছেই, কিন্তু আর কিছু নাই। ফুঁ দিয়া ফুলাইতে ফুলাইতে খেলনা বেলুন যেমন ফাটিয়া চুপসাইয়া যায় কে জানে খাইয়া খাইয়া ফুলিতে ফুলিতে লাবণ্যবতীর চামড়ার লাবণ্যের আবরণটিরও সেই দশা হইয়াছে কিনা।

অথবা হয়ত রোদে জলে দরজা জানালার রঙের যে অবস্থা হয় সেই উপমাটিই ভাল। সংসারের রোদ আর জল যেন চিরদিন লাবণ্যবতীকে একটু অতিরিক্ত ভালবাসিয়া আসিয়াছে। পূবের জানালায় পশ্চিমের রোদ লাগা ন্যায়সঙ্গত নয়, আর আস্ত ছাদের নীচে আকাশভাঙ্গা বৃষ্টি।

'স্নেহপ্রবণের বৌ' শীর্ষক আর একটি প্রস্তাবিত গল্পের অংশবহ দুটি পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা পাওয়া গেছে :

বিধুবাবুর মন খুব কোমল এবং প্রকৃতি অসামান্য স্নেহপ্রবণ না হইলে প্রমীলা তাহার বৌ হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। বিবাহে বিধুবাবুর রুচি ছিল না বলিয়া শুধু নয়, কলিকাতায় বিধুবাবুর একখানা বড় বাড়ী আছে, ভাল ভাল কোম্পানীতে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার শেয়ার আছে, একটা চাকরীও আছে দুশো টাকার। প্রমীলা গরীব গৃহস্থের মেয়ে, শ্যামবর্ণা এবং সাধারণ, পঞ্চাশ টাকার কেরাণীর উপযুক্ত। তবু, কয়েকটা ছোটবড় ঘটনা ও বিধুবাবুর বিশিষ্ট মানসিক অবস্থার যোগাযোগে বিবাহটা হইয়া গেল।

প্রমীলা সোণাখালির রাজেন্দ্র বসুর বড় মেয়ে। রাজেন্দ্র স্থানীয় জমিদারের কাছারিতে কাজ করেন। সরল ধর্মভীরু মানুষ, ঘরভরা শান্তি, মনভরা সন্তোষ,—এমন নিরীহ যে নেহাৎ অভাব অনটনের সময় ভগবানের কাছে পর্য্যন্ত নালিশ করিতে জানেন না। স্ত্রী সরযূর প্রকৃতিও কতকটা এইরকম। কস্তাপাড় সাড়ী পরে, স্বামী পুত্রের সেবা করে, না আছে গয়ণার বাতিক না আছে আরাম আলস্য বিলাসিতার পিপাসা। দোষের মধ্যে পান দোক্তাটা একটু বেশী খায়। ছায়ায় শীতল, নদীর বাতাসে পবিত্র, ক্ষেত ভরিয়া ফসলের অজস্র ফলনে ধন্য গ্রামটিতে রাজেন্দ্রের গৃহে জীবন সবচেয়ে অনাড়ম্বর সবচেয়ে শান্ত। এই আবেষ্টনীতে মানুষ হইয়া প্রমীলার মনটি হইয়াছিল বড় সরল, স্বভাব হইয়াছিল মিষ্টি।

প্রমীলার বয়স যখন তের বছর একবার তার চোখের ভারি অসুখ হইল। লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল চোখ, অবিরত জল পড়িতে লাগিল, যন্ত্রণায় প্রমীলা অস্থির হইয়া পড়িল। প্রথমে দেওয়া

[অসম্পূর্ণ পৃষ্ঠা]

পরদিন প্রমীলার চোখ দেখানো হইল। অসুখটা [illegible]র বাড়িয়া গিয়াছে, সারিতে সময় লাগিবে, একেবারে না সারিবার সম্ভাবনাও অল্পবিস্তর আছে। মাসখানেক প্রমীলার কলিক [দুর্বোধ্য] না থাকিলেই নয়।

বিধুভূষণ বলিল, বেশ তো, খুকীকে রেখে আপনি ফিরে যান রাজেনদা, রোজ হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আর যেমন যেমন দরকার আমি সব ঠিক করে দেব। বিধুভূষণের বুড়ী মা সায় দিয়া বলিলেন, আহা, থাকবে বৈকি, আর কিছু নয় চোখের অসুখ, ওকি তুচ্ছ করলে চলে ? তুচ্ছ করেই না চোখ দুটো আমার গেল, ভাল দেখতে পাই না, হ্যাঁ বাবা বিধু খুকীর সঙ্গে আমি গেলে তো পারি আমার চোখ দুটো দেখাতে ? চোখের পোড়ানি আমারি কি কম ?

দিনতিনেক পরে প্রমীলাকে রাখিয়া রাজেন্দ্র একাই সোণাখালিতে ফিরিয়া গেল। রাজকন্যার সমাদরে প্রমীলা বাস করিতে লাগিল পরের বাড়ীতে। কোথায় কি অবস্থায় আছে প্রথম সপ্তাহখানেক প্রমীলার তাহা খেয়ালও রহিল না, চোখ লইয়াই সে বিব্রত হইয়া রহিল। তারপর চোখের যন্ত্রণা কমিয়া আসিলে ধীরে ধীরে সে সচেতন হইয়া উঠিল যে এ বাড়ীতে সকলে তাহাকে বড় ভালবাসিতেছে। এদের একজনকেও সাতদিন আগে যে সে চোখেও দ্যাখে নাই এটুকু মনে পড়িলেও মনে রাখা যায় না। বিধুভূষণের স্নেহের আতিশয্যেই প্রমীলা হইয়া পড়িল সবচেয়ে বেশী।

[অসম্পূর্ণ]

'চোর-বৌ' গল্পের দুটি অসম্পূর্ণ খসড়ার দ্বিতীয়টিতে গল্পের নাম কেবল 'চোর'। দ্বিতীয়টিতে নায়িকার নাম সত্যবতী নয়, সাবিত্রী।

চোর-বৌ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যবতী প্রথম চুরি করে সাতবছর বয়সে, একছড়া সোণার হার।

হারছড়া ছিল প্রতিবেশী উকিল রামধনবাবুর একমাত্র ছেলে গোবিন্দপদর ভাবপ্রবণা বৌ অমিতার সম্পত্তি। আনমনে গুণগুণ করার অন্যমনস্কতায় সবসময় অন্যমনস্কা থাকার যথেষ্ট প্রমাণ ছিল সব সময় তার গুণগণ করার মধ্যেই, তবু যে কেন সে দামী জিনিষ হারানোর স্বভাবটি মজ্জাগত করিয়া ফেলিযাছিল তার বিশ্লেষণ নিছক গবেষণা।

একদিন স্নানের ঘরে স্নানের পরে চোখে চশমাটি দেওযার পর বাকী ছিল শুধু হারছড়া গলায় পরা, এমন সময় অমিতার মনে পড়িয়া গেল যে মানুষ বড় সন্দেহপ্রবণ, নয়তো মানুষ কেন মানুষকে বলিবে 'মানুষ তোমরা মানুষ হও' ? মানুষকে মানুষ হইতে বলার স্পর্দ্ধা পর্য্যন্ত যে মানুষের আছে এই দুঃখে সকাতর অবস্থায় হারছড়া স্নানের ঘরে ফেলিযাই অমিতা আসিল বাহির হইযা আর দশমিনিট পরে সেই হার চুরি করিল সত্যবতী।

[অসম্পূর্ণ]

চোর

সাবিত্রী প্রথম চুরি করে সাতবছর বযসে, খেলনা নয়, খাবার জিনিষ নয়, একছড়া হার।

সাবিত্রীর বাবা ছিলেন ডাক্তার, প্রতিবেশী এক উকিলের বাড়ীর লোকেরা সাবিত্রীদের বাড়ীর লোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিত প্রতিবেশীর চেয়েও বেশী। যখন তখন বিনা ফি'তে ডাক্তার ডাকার সুবিধার জন্য অথবা অন্তরের স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতার প্রবৃত্তির জন্য তারা এটা করিত তখন ঠিক বোঝা যাইত না। এখন অবশ্য এ বাড়ীর ডাক্তার-কর্ত্তাও নাই ও বাড়ীর উকীল-কর্ত্তাও নাই, আর নাই দুটি পরিবারের মধ্যে শত্রুতার সীমা। তবে এসব কালের ধর্ম্ম, সময়ে মানুষও যেমন মরে, বন্ধুত্বেরও বিপরীত ইতি হয়।

সাবিত্রী একদিন উকীলবাবুর মেজ বৌএর একছড়া দামী সোণার হার চুরি করিযা আনিয়া হাজির। দামী জিনিষ হারাণোর স্বভাব মেজ বৌটির ছিল মজ্জাগত, অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা বেচারীকে করিয়া রাখিত সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক। স্নানের ঘরে স্নানের সময় গাযে কিছু না রাখার সুবিধাটুকু যতদূর সম্ভব গ্রহণ করার সঙ্গে স্নানের পর আবার গাযে সব চাপানোর সময় অন্যমনস্ক হওযার স্বভাবটুকুর যোগাযোগ ঘটিলে গলার দামী সোণার হারও স্নানের ঘরে পড়িয়া থাকিতে পারে আর প্রতিবেশী পরিবারের সাতবছরের মেয়েও সেটা চুরি করিতে পারে অনাযাসে।

তবে সাতবছরের মেয়ে তো পাকা চোর নয, সোণার হার চুরি করার পর তার বুকটি এমন ধড়পড় করে, চাউনি এমন চপল হয় আর মুখে আসে অমন একটা খাপছাড়া অদ্ভুত ভাব যে দেখিলেই লোকের সন্দেহ জাগে কিছু একটা ঘটিয়াছে।

'দেখি জামার নীচে কি লুকিয়েছিস ?'

'কিছু না মা।'

পালানোর উপক্রম। খপ করিয়া হাত ধরা। সোণার হারের আবিষ্কার। সব জানাজানি। মারাত্মক ফলাফল। সত্যই মারাত্মক। কারণ, সাত বছরের মেয়ে চুরি করিলে কি মারটাই যে সে খায় !

সাত বছরের মেয়ে চুরি করিয়াছে ভাবিতেও কিন্তু মেজ বৌটির ভাবপ্রবণতায় ঘা লাগিয়াছিল। সাবিত্রীকে নিজের ঘরে ডাকিয়া নিয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া সে বলিয়াছিল, 'সাবি, লক্ষ্মী মেয়ে, আমায় একটা সত্যি কথা বলবি ?'

'আমি মিথ্যে বলি নাকি ?'

'না না, তা বলিনি। সত্যি তা বলিনি। আমায় বিশ্বাস কব সাবি, তা বলিনি। এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি, তা বলিনি। বলছিলাম কি, তুই যে হারটা কুড়িয়ে নিয়েছিলি, আমায় ফিবিয়ে দেবার জন্যে ; না ?'

'তা না তো কি ?'

'বাঁচালি ভাই আমাকে। আমার মনের মধ্যে এমন করছিল, বিস্কুট খাবি ? বোস এইখেনে, আনছি।'

মেজবৌ আনিতে গিয়াছিল বিস্কুট আব সেই অবসরে সাবিত্রী চুবি করিয়াছিল

[অসম্পূর্ণ]

'চাষার বৌ' নামক গল্পটির দুটি পাঠসহ খণ্ডিত সাতটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি বাংলা আকাদেমির অভিলেখাগারে রক্ষিত আছে। গল্পটির একটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত পাঠ সম্প্রতি পাওয়া গেছে সেটি সংযোজন খণ্ডে যথাযথ তথ্যসহ মুদ্রিত হবে।

সহরতলী

'সহরতলী' উপন্যাসের মূল পাণ্ডুলিপির বিক্ষিপ্ত কিন্তু সম্পূর্ণ অংশ ঢাকা-র (বাংলাদেশ) বাংলা একাডেমীকে লেখক-পরিবারের পক্ষ থেকে উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হয়েছে।

সহরতলী প্রথম পর্বের পাণ্ডুলিপির কয়েকটি পৃষ্ঠার জেবক্স কপি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি-র অভিলেখাগাবে আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভ্যাস ছিল একটি উপন্যাসের সূত্রপাত অংশ বারবার লিখতেন বিভিন্ন পৃষ্ঠায়। সে ভাবেই একই লেখার বিভিন্ন লেখন পাওয়া গেছে। যতটা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় প্রথম পরিকল্পনার সঙ্গে মুদ্রিত পাঠের কিছু অমিল রয়েছে। মুদ্রিত উপন্যাসেব পরিবেশের পশ্চাৎপট পাণ্ডুলিপিতে একই আছে, প্রায় একই ভাষায় শহরতলিব বিবর্তন ও কলকারখানা গড়ে ওঠার বর্ণনা আছে। ভাষার হেরফের সামান্যই। যেমন কোথাও 'বড় রাস্তা' কোথাও 'বড় বড় রাস্তা' কোথাও 'প্রধান রাস্তা'। তবে পাণ্ডুলিপির দুটি পৃষ্ঠায় উপন্যাসের অন্য প্রকার আরম্ভের একটি খসড়া পাওয়া যায়। যথা—

সহরতলী

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সহরতলীর চেয়ে মজার যায়গা আব নাই। পৃথিবীতে যদি একটিমাত্র সহব থাকিত তবে সেই সহবেব সহবতলীকে অনায়াসে বলা চলিত পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য্য। সহবতলীব পথঘাট বাড়ীঘর পুকুব বাগান গাছপালা মানুষজন সমস্তই এক অভিনব, রহস্যময় ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করিতে করিতে কবে না, ফাঁক ফাঁকা ও ফাঁকি দিয়া নিজেদের সাধারণের পর্য্যায়ে ফেলিয়া বাখে এবং সেইজন্যই স্থান হিসাবে সহরতলী হইয়া থাকে চিরদিনের জন্য অতুলনীয়। যানবাহনের গর্জনের সঙ্গে মিশিয়া জীবনের ভারে নিপীড়িত জনতার আর্ত্তনাদ থাকে সহবের মাঝখানে, যেখানে সাদা লাল বাদামী প্রভৃতি রঙে ঢাকা দেয়ালের শ্বাসরোধী আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করিতে করিতে আকাশের আলো ও বাতাসকে মানুষগুলি যে আলো ও বাতাস বলিয়া চিনিতে পারে মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তা তাহাতেই বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ

হইয়া থাকেন। অকেজো, অব্যবহার্য বিস্তীর্ণতার সঙ্গে মিশিয়া বাঁচিবার চেষ্টায় শ্রান্ত ও জীর্ণ মানুষের মূক স্তব্ধতা থাকে গ্রামে গ্রামে ছড়ানো, যেখানে জীবনধারণের রীতিনীতি সম্বন্ধে মানুষগুলি এত কম জানে যে মানুষের সবজান্তা সৃষ্টিকর্ত্তা পর্যন্ত পশুপাখী কীটপতঙ্গ ছাড়া আর কোন জীব সেখানে থাকে কিনা অনেক সময় তাহা ভুলিয়া যান। সহরতলীতে সহর শেষ হইয়া সুরু হয় গ্রাম। গ্রামও শেষ হয় কিন্তু সহর সুরু হয় না।

সহরতলীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভিনবত্ব এইটুকু। সহরের শেষ, গ্রামের আরম্ভ ও শেষ, না খুঁজিলেও সহরতলীতে আবিষ্কার করা যায় · শুধু সহরের আরম্ভ কোথায় তার সন্ধান কোনমতেই মেলে না। জগতে কতগুলি সত্য আছে, মানুষের সহজ বুদ্ধি শুধু নয় দর্শন বিজ্ঞান অঙ্কশাস্ত্র পর্য্যন্ত যা সত্য বলিয়া মানিয়া লয় : যে বস্তুর যেখানে শেষে তার আরম্ভও সেইখানে। সহরতলী এমন মজার স্থান যে এই অপরিবর্ত্তনীয় নিরেট সত্যটা পর্য্যন্ত সেখানে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। আর একটিমাত্র স্থান আছে যেখানে এমন অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। সেটা নরক। ঈশ্বরের মত বিরাট ও বিপুল একটা মিথ্যা নরকের মত বিপুলতর একটা মিথ্যার সাম্রাজ্যের মত বড় সত্য হইয়া ওঠে কে তা না জানে ! কিন্তু সত্যমিথ্যার রূপান্তর ঘটে বলিযাই একথা মনে করিবার কারণ নাই যে সহরতলী নরক। সহরতলী মজার জায়গা, নরকে এতটুকু মজা নাই। তা ছাড়া নরকের পাশেই স্বর্গ আছে। সহরতলীর ধারে কাছেও যদি একটুকরা স্বর্গ থাকিত !

পাণ্ডুলিপিতে যশোদার ভাড়াটে কেদার নামে একটি চরিত্র আছে। পরে পাণ্ডুলিপিতেই 'কেদার' কেটে 'ধনঞ্জয়' করা হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের ধনঞ্জয় যেমন বিশালদেহ ব্যক্তি, পাণ্ডুলিপির কেদার (পরে ধনঞ্জয়) তেমন নয়, সাধারণ মানুষ।

পাণ্ডুলিপিতে আছে, যশোদা কেদারের কাজ জুটিয়ে দিয়েছে পিঁজরাপোলে। সেখানে গোরু ধরে রাখা ছাড়াও মৃত গোরুর চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ করা হয়। কেদার আছে চামড়া ছাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের দায়িত্বে। এই সূত্রে পিঁজরাপোলের অসুন্দর পরিবেশ, মরা গোরু শকুনের দল ইত্যাদির বর্ণনা আছে।

পাণ্ডুলিপিতে কিষণ নামের এক বিহারি গোয়ালার চরিত্র আছে। সে যাদব। পিঁজরাপোলের পার্শ্ববর্তী আম ও জামের বাগানের একাংশ সে জমা নিয়েছে। সে বাস করে একটি ঘরে স্ত্রী সরস্বতী ও একটি গাভীসহ। গাভীটির সদ্য বাছুর হয়েছে। কেদার কিষণের সঙ্গে পরিচিত হয় ও মাঝে মাঝে তার ঘরে যায়। যুবতি সরস্বতী, সদ্যপ্রসবিনী গাভী ও সদ্যোজাত বাছুর দেখে জীবনের কথা ভাবে কেদার। মনে হতে পারে, গোরু মোটিফটিকে ব্যবহার করবার প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল লেখকের। পরে হয়তো সেটি বর্জিত হয়েছে।

পাণ্ডুলিপিতে মিল-মালিক সত্যপ্রিয়, সত্যপ্রিয়র কর্মচারী জ্যোতির্ময়, জ্যোতির্ময়ের পত্নী অপরাজিতা, যশোদার ভাড়াটে মতি ও সুধীর, যশোদার ভাই নন্দ প্রভৃতি চরিত্রগুলির প্রাথমিক রূপ দেখতে পাই। সেগুলি উপন্যাসেও একই রকম আছে। ধনঞ্জয় ও যশোদার পারস্পরিক আকর্ষণের কিছুটা বর্ণনা উপন্যাসে আছে। যশোদা সেখানে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে সচেতনভাবে। পাণ্ডুলিপিতে ধনঞ্জয়ের প্রতি যশোদার আকর্ষণ আর স্পষ্টভাবে ব্যক্ত।

পাণ্ডুলিপিভুক্ত পাঠ ও গ্রন্থগৃহীত পাঠের এবং গ্রন্থবহির্ভূত অথচ পাণ্ডুলিপিধৃত পাঠের কিছু নিদর্শন উদ্ধৃত হল। প্রথমে গ্রন্থবহির্ভূত পাঠ।

দুই

রাগে কেদারের গা জ্বালা করিতেছিল, পিঁজরাপোলের চাকরী জুটাইয়া দিয়া যশোদা যেন তাব মাথা কিনিয়াছে, যশোদার পাওনার টাকাটা একবার রোজগাব করিতে পাবিলে হয়, তাবপর একটা দিন আব সে যশোদার চিড়িয়াখানায বাসও কবিবে না, পিঁজবাপোলের কাজও কবিবে না। কিভাবে মা বাবা ভাইবোন ছেলেমেয়ে, বৌ-এর কথা যশোদা তাকে বলিয়াছে ! পঞ্চাশ বছর বয়সেব একটা মানুষকে ছোট ছেলের মত বকুনি দেওয়া ! কি ভাবিয়াছে যশোদা তাকে ?

ট্রেনে দশ বার মাইল দূরের ষ্টেশনে নামিতে হয়, তারপর সাইকেলে গোরুর গাড়ীর চাকায় ক্ষতবিক্ষত ধূলাভরা মেটে পথে মাইলখানেক এবং তরুছায়াহীন মেঠোপথে মাইল চারেক পাড়ি দিয়া যাত্রা শেষ। দুখানা টিনের শিটের তলে অথবা গাছতলা যেখানে ইচ্ছা বসিয়া চাকরী কর, কোন বারণ নাই। সেখানে এলোমেলোভাবে ছড়ান আম আব জামগাছের একটা বাগানের মত আছে। শেষ বৈশাখের বোদে পাঁচ মাইল সাইকেল করিয়া গিয়া ছায়া মিলিবে বটে কিন্তু কি দাম আছে ছায়াব দুপুরবেলা প্রান্তর হইতে যখন হু হু করিয়া আগুনের হলকার মত হাওয়া বহিতে থাকে ? ছায়া বটে তার গ্রামের গাছগুলির, গরম যেন টের পাইতে দেয় না, সমস্ত গ্রামটিকে শীতল করিয়া রাখে—যেখানে যে কোন গাছের নীচে কাপড় বিছাইয়া শুইয়া পড়, বৈশাখের দুপুর ঘুমের মধ্যে কখন কাটিয়া গিয়া শেষবেলায় আলস্যমধুর তৃপ্তিভরা জাগরণ আসিবে টেরও পাইবে না।

[অসম্পূর্ণ]

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় অন্যপাঠ]

দুই

রাগে ধনঞ্জয়ের গা জ্বালা করিতেছিল, পিঁজরাপোলের চাকরীটা জুটাইয়া দিয়া যশোদা যেন তার মাথা কিনিয়াছে ! পঞ্চাশ বছর বয়স হইয়াছে তার, দেশে সে আশেপাশের বিশটা গ্রামে পানাতুলীর ভীম বলিয়া পরিচিত, তাকে কিনা ভর্ৎসনা করা পাঁচ বছরের অবাধ্য ছেলের মত ! একবাব যশোদার পাওনা টাকাটা উপার্জন করিতে পারিলে হয়, যশোদাব গায়ে টাকাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে গ্রামে ফিরিয়া যাইবে, একটা রাত্রিও আর বাস করিবে না যশোদাব ওই চিড়িয়াখানায়। কি ভাবিয়াছে যশোদা তাকে ?

বলরামবাবুব কাছে আগের দিনের হিসাবটা দাখিল কবিয়া যাইতে হইবে। বলরামবাবু সহবতলীতেই থাকেন, আবেকটু সহরের গা ঘেঁষিয়া। বলরামবাবু শীর্ণ চেহারার বৃদ্ধ ভদ্রলোক, ব্যস্ত হইয়া আপিস যাইতেছিলেন। ধনঞ্জয়কে দেখিয়াই চটিয়া উঠিলেন। 'দেরী করলে যে এত ? দু'দিন কাজ আরম্ভ করেই গাফিলতি সুরু করলে, তোমাকে দিয়ে তো চলবে না বাপু।'

ধনঞ্জয়ের একটি আঙুলের টিপুনিতেই বোধহয় বলবামবাবুব প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। কিন্তু ধনঞ্জয়েবই কি বিনয় তার কাছে ! 'আজ্ঞে, আমার গাড়ীটা দশটায় ছাড়ে কিনা—' 'তোমাব গাড়ী তো দশটায় ছাড়ে, আমি যে বেরিয়ে যাই ন'টায় ? এক মিনিট দেরী হলে আমায় যে পেতে না, তখন কি হত ?'

'আজ্ঞে আপিসে হিসেবটা দিয়ে আসতাম।'

'জবাব দিতে শিখেছো তো খুব ?' বলিয়া হিসাব লেখা কাগজটা এক হাতে ছিনাইয়া লইয়া অন্য হাতে ছাতির মাঝখানটা মুঠি কবিয়া ধরিলেন। ভদ্রলোকের দেহে জীবনীশক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না, চোখ দুটি এমন স্তিমিত যে দেখিলে মনে হয় না ভিতবে রাগ থাকা সম্ভব। কিন্তু যাওযার আগে যে কথাগুলি বলিয়া গেলেন তাতে ঝাঁঝ ছিল তীব্র।—'নুনটা বড় বেশী খবচ হচ্ছে। পারিনা বাবু আব—গরুব চামড়ায় মাখাবার নুন তা পর্য্যন্ত মানুষ চুরি কববে ! সব বেটা চোব— কোনদিক সামলাই ?'

ধনঞ্জয়ের মনে যশোদাব কথাগুলিই কাটিয়া কাটিয়া ঘা করিয়া দিয়াছিল, বলবামবাবুব কথাগুলি নুনেব ছিটাব মতই লাগিল। নুন ! ধনঞ্জয় কবিবে নুন চুবি ! মুচি ডোমদেব মাপিযা দিবার সময় যে বীভৎস কাজে নুনটা লাগিবে ভাবিলেই নিজেকে যাব অশুচি মনে হয়, চুরি কবার এত জিনিয থাকিতে সে কবিবে সেই নুন চুরি। অভিজ্ঞতা ধনঞ্জয়ের ছিল না, তাছাড়া শবীবটা বড হইলে অভিমানও যেন বেশী হয় মানুষেব, ছেলেমানুষের মত তার যেন স্রেফ কান্নাই আসিতে চায়। সে কেমন করিয়া জানিবে, নুন চুবি হোক বা না হোক, মাঝে মাঝে এবকম বলাটাই নিয়ম। কেবল নুনের ব্যাপারে নয় আবও অনেক ব্যাপাবে উপরওয়ালারা, বলবামবাবুব মতই যারা কোনদিন পিঁজরাপোলের প্রান্তরে পদার্পণ কবেন কিনা সন্দেহ, বলবামবাবুকে এবকম বলিয়া থাকেন, বলরামবাবুও মহাজনের পথ অনুসরণ কবিয়া অধীনস্থ কর্ম্মচারীদেব মাঝে মাঝে সতর্ক কবিযা দেন।

লাইট রেলওয়েতে ঢকস্ ঢকস্ করিয়া গিয়া একটা ষ্টেশনে নামিতে হয়। তাবপর সাইকেলে গবুব গাড়ীব চাকায় ক্ষতবিক্ষত ধূলাভরা মেটে পথে কয়েক মাইল গিয়া আরও কয়েক মাইল পাড়ি জমাইতে হয় তরুছায়াহীন দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরেব মেঠো পথে। প্রান্তবে কয়েক মাইল দূবে দূরে খোঁয়াড ভাগ কবা আছে, ১নং খোঁয়াড়, ২নং খোঁয়াড় ইত্যাদি, স্থানে স্থানে রাখালদের ঘনসন্নিবদ্ধ ঘরগুলি, অধিকাংশ রাখালই এখানে সাঁওতাল, গরু মহিষ মাঠে চড়িয়া ঘাস খাইয়া বেড়ায় আর এখানে ওখানে, কাছে ও দূরে দু'একটি নিঃসঙ্গ তরুমূলে বসিয়া রাখালেবা সত্যই চিরাচরিত প্রথায় বাঁশী বাজায় আর শুনিতে শুনিতে কবিরা যেমন বলেন অবিকল সেইরকম চিরাচবিত প্রথায় ধনঞ্জয়ের মত দানবদেহী মানবের পর্য্যন্ত মনটা উদাস হইয়া কেমন কেমন করিতে থাকে।

ধনঞ্জয়কে যাইতে হয় সবচেয়ে দূরে, একেবারে ভাগাড়ের কাছে। এইখানে কাছাকাছি শেষ খোঁয়াড়, যে গরুমহিষগুলির মরণ ঘনাইয়া আসিয়াছে কেবল সেগুলিকে সেখানে পাঠান হয়। নিজের মনে তারা চরিয়া বেড়ায় আর তিল তিল করিয়া মরিতে মরিতে একদিন চরম মরা মরিয়া যায়।

ষ্টেশনের বাহিরেই ছোট খাবারের দোকানে সাইকেলটি জমা থাকে। পুরানো জোড়াতালি দেওয়া সাইকেল, দুটি টায়ারের রঙ দুরকম, কোনবকমে কাজ চলিয়া যায়। মাঝে মাঝে নামিয়া পিছনের চাকায় বাতাস ভরিতে হয়, এই যা অসুবিধা। এই অসুবিধাটাই ধনঞ্জয়কে আজ যেন পাগল করিয়া দিতে লাগিল। কি তেজ বৈশাখ মাসের রোদের ! গিয়া পৌঁছিতে পারিলে একটা টিনের শেড বা কাছাকাছি এলোমেলোভাবে ছড়ানো

আম আর জামগাছের একটা বাগানের ছায়া মিলিবে বটে, তাছাড়া কি দাম আছে ছায়ার দুপুরবেলা প্রান্তর হইতে যখন হু হু করিয়া আগুনের হলকার মত বাতাস বহিতে থাকিবে ? ছায়া বটে তার গ্রামের গাছগুলির, গরম যেন টের পাইতে দেয় না, সমস্ত গ্রামটিকে শীতল করিয়া রাখে। যেখানে যে কোন গাছের নীচে কাপড় বিছাইয়া শুইয়া পড়, বৈশাখের দুপুরটা ঘুমের মধ্যে কখন কাটিয়া গিয়া অপরাহ্নে আলস্য মধুর তৃপ্তিভরা জাগরণ আসিবে টেরও পাইবে না। খাবার জলের বোতলটাও আজ সে রাগের মাথায় ফেলিয়া আসিয়াছে। ওখানে টিউবওয়েলের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু প্রথম দিনেই কুলীরা তাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল, ভাগাড়ের কাছে টিউবওয়েলের জল যাদের অভ্যাস নাই তারা খাইলেই হু হু করিয়া জ্বর আসিবে। সত্য কি মিথ্যা ভগবান জানেন পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সাহস ধনঞ্জয়ের হয় নাই, প্রত্যেকদিন সে একটা মেথিলেটেড স্পিরিটের বোতলে জল সঙ্গে লইয়া আসে। কিন্তু এই গরমে এক বোতল জলে কি হইবে ? হিসাব করিয়া খরচ করিবে ভাবে কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যে জলের বোতল খালি হইয়া যায়। আরও জল খাইতে ইচ্ছা হয়, তৃষ্ণায় গলা কাঠ হইয়া আসে, গরু-মহিষগুলির জল খাইবার সরু লম্বা চৌবাচ্চাটির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মনে হয়, এই কষ্ট সহ্য করার চেয়ে কি ভাল নয়, কুলীদের বর্ণনা মত যতই বীভৎস হোক সে জ্বর ? আজ যেন রোদের তেজ বাড়িয়াছে। প্রান্তরে গরুর গাড়ীর চাকার দাগ ধরিয়া চলিবার সময় চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়া যাইতে যাইতে থাকে, ঘর্মাক্ত শরীরে একটা অদ্ভুত শিহরণ জাগে, অনেকটা বেশী জ্বরের কাঁপুনির মত। মনে হইতে থাকে, ভিতরে যেন জমাট বাষ্পের আকারে রাশি রাশি ঠাণ্ডা আড়ালে জমা করা ছিল, বাহিরের উত্তাপে গলিয়া গিয়া পাক খাইতে খাইতে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। সেই সঙ্গে মাথার মধ্যে হইতেছে অকথ্য যন্ত্রণা।

সাইকেলটা আছড়াইয়া ফেলিয়া ধনঞ্জয় গাছতলায় পাতা খাটিয়ার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। ডাকিয়া বলিল, 'ওরে কালা, তোরা একজন আমার মাথায় জল ঢাল, একজন বাতাস কর।' একই সময়ে দেহে শীতগ্রীষ্মের সমন্বয়ে বড় কষ্ট হয় তার, বড় আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কি হইয়াছে তার ? সর্দ্দিগর্ম্মি নাকি ? যদি সে মরিয়া যায়, যদি এই খাটিয়া ছাড়িয়া আর তাকে না উঠিতে হয় ? এই নির্জ্জন প্রান্তরে একটা গাছতলায় এইভাবে মরা তার কপালে লেখা ছিল, যেখানে কেবল গরু-মহিষ মরিবার জন্য আসে। মরণের কোল ঘেঁষা একপাল মূক পশুকে এখানে আনিয়া জড়ো করা হইয়াছে, মানুষ যাদের কাছে আর কিছুই প্রত্যাশা করে না, শুধু প্রতীক্ষা করিয়া থাকে বাঁধানো চৌবাচ্চার জলপান করিয়া দুটি ঘাস আর ছায়া খুঁজিবার সমাপ্তি করে ঘটিবে, শেষ নিশ্বাস পড়িতে না পড়িতে কয়েকজন মানুষ আর একপাল শকুনি কি করিয়া যেন টের পাইয়া যায়, মানুষ কয়েকজন চামড়া ছাড়াইয়া চর্ব্বি আর নাড়ীগুলি সংগ্রহ করিয়া সরিয়া দাঁড়ায়, পাখা ঝাপটাইয়া মারামারি করিয়া শকুনিগুলি দেহটি লইয়া টানাছেঁড়া আরম্ভ করিয়া দেয় তারপর পড়িয়া থাকে শুধু একটি কঙ্কাল। ধনঞ্জয় নিজে দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য দেখিয়াছে এবং একটা তীব্র মানসিক ঘূর্ণ্যাবর্ত্তের মধ্যেও বিস্ময়ের সঙ্গে তার মনে হইয়াছে, সমস্ত ব্যাপারটা এত অল্পসময়ের মধ্যে ঘটিল কি করিয়া, অতবড় কঙ্কালটার মেদমাংসের আবরণ চোখের পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল, একি ম্যাজিক ?

হঠাৎ একসময় ধনঞ্জয়ের মনে হইল, আজ যদি সে মরিয়া যায় আর এই ম্যাজিক যদি তারও বেলা ঘটিয়া যায় ? মরণ ঘটিবামাত্র ক্ষুধার্ত্ত শকুনির দল মানুষের নরম ও উপভোগ্য মেদমাংসের লোভে যদি তাকে ছাঁকিয়া ধরে, কুলী আর মুচি ডোমেরা যদি পাখীগুলিকে ঠেকাইয়া রাখিতে না পারে ? ধনঞ্জয় সটান উঠিয়া বসিল। কিছুদূরে সত্য সত্যই শকুনিদের ম্যাজিক ঘটিতেছিল, রক্তবর্ণ চোখ মেলিয়া খানিকক্ষণ সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া জোরে চোখ বন্ধ করিয়া আবার সে শুইয়া পড়িল। এপাশ ওপাশ করিতে করিতে একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

[অসম্পূর্ণ]

নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশে উপন্যাস সূচনার পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থপাঠের তুলনা দ্রষ্টব্য :

পাণ্ডুলিপি	গ্রন্থ
১	এক
বড় রাস্তায় বিদ্যুতের আলো আছে,—অনেকটা দূরে দূরে। ছোট গলিতে কাঠের থামের মাথায় আজও	এদিকে শহরতলীর এই অঞ্চলে বড় রাস্তায় বিদ্যুতের আলো আছে,—অনেকটা দূরে দূরে। ছোটো গলিতে

টিমটিমে তেলের বাতি জ্বলে। এক বাড়ীতে ভাড়াটে কেরাণীবাবুর বৌ অপরিচ্ছন্ন কিন্তু আলোকোজ্জ্বল রান্নাঘরে উনানে ভাতের হাড়ি চাপাইয়া চামচ দিয়া কণ্ঠার নীচের ঘামাছি মারেন, রাত্রে খোকা কাঁদিয়া উঠিলে বেড় সুইচ্ টিপিয়া কাঁথা বদলান। হয়ত ঠিক পিছনে অনেক বড় বাড়ীটির অনেক বেশী বড়লোক কর্ত্তাবাবুর বৌ রান্নাঘরে ডিবরি নেভার জন্য বকেন ঠাকুরকে, আর রাত্রে খোকা কাঁদিলে টর্চ্চ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলেন নিজেও।

নারীকণ্ঠের তীব্র অভিযোগ শোনা যায় : কেন তা হবে শুনি ? তা কেন হবে ? গায়ে গায়ে লাগাও বাড়ী, ও বাড়ীতে আনতে পারে আমরা আনতে পারি না কেন লাইট ? হতাশ কণ্ঠে, হাল ছাড়িয়া দেওয়া হতাশাব সুর যেরকম কণ্ঠে মেশানো থাকে সেই রকম কণ্ঠে জবাব আসে 'ও তুমি বুঝবে না। না হক হাজার বার বলেছি, রাস্তার যে (বিজলা তাই আসে) [দুর্বোধ্য] থেকে কতকটা দূর পর্য্যন্ত নিতে দেয়, তাব পরে আর দেয় না—

একটু বেশী রাত্রে আর রাত্রির শেষভাগে দূরে ট্রাম চলার আওয়াজ কানে আসে, একটা অপ্রীতিকর একটানা আহ্বানের মত, প্রথম শুনিলে ঝড়ের রাত্রে বন্ধ ঘরের বাহিরে জোরালো বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দে কাকুতি মিনতির স্মৃতি মনে [দুর্বোধ্য] মোটরের হর্ণ দূবেও বাজে কাছেও বাজে, সময় অসময় নাই। পথের দুদিকে স্বচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের, স্বাচ্ছন্দ্য ও দুর্ভোগের, বুচি ও অরুচির, সুন্দর ও কুৎসিতের, পরিচ্ছন্নতা ও নোংরামির, সম্মুখ ও পিছনের, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কত যে আশ্চর্য সমন্বয় ও গলাগলি ভাব। নাম লেখা গেট, বাগান ও লন, আধুনিক ফ্যাশনের সুন্দর দোতলা বাড়ী, সুন্দর শাড়ী, সুন্দরী নারী, রেডিওর গান। ইট বার করা পুরানো একতলা বাড়ী, সামনে সিমেন্ট-ফাটা রোয়াকে ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাগজের টুকরা, বিড়ির টুকরা, কোমরে ঘুনসী বাঁধা উলঙ্গ শিশু। পথের এদিকে ছবিব মত সাজানো মনোহারী দোকান, সাবান, কেশতৈল, পাউডার, স্নো, ক্রিম, ...অভাব কিসের ? অপরদিকে কয়লার আড়ৎ।

খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় হয়, মালিক শ্রীমাখনলাল নন্দী। তিনটি মহিষের গাড়ী কয়লা আনিয়া জমা করে, পুরীষ ও পাঁকের পাতলা খিচুড়িতে দেহের ভার নামাইয়া মহিষ তিন জোড়া অবসর সময়টা জাবর কাটে আড়তের ঠিক পিছনে—রাস্তা হইতে আর্দ্ধেকটা দেখা যায়, গন্ধও পাওয়া যায় কিছু কিছু।

কাছেই ডায়মণ্ড রেষ্টুরন্টে—র'য়ে আকার দিতে ভুলিয়া যাওয়ায় সাইনবোর্ড পেন্টারের এক টাকা জরিমানা হইয়াছিল এবং.... ·

আলকাতরা মাখানো কাঠের থামের মাথায় আজও টিমটিমে তেলের বাতি জ্বলে। কোনো বাড়িতে ভাড়াটে কেরানিবাবুর বউ অপরিচ্ছন্ন কিন্তু বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত রান্নাঘরে উনানে ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া চামচ দিয়া কণ্ঠার নীচে ঘামাচি মারেন, রাত্রে খোকন কাঁদিয়া উঠিলে বেড সুইচ্ টিপিয়া বদলান তার কাঁথা ; হয়তো ঠিক পিছনেই আরও বড়ো বাড়ির রীতিমতো বড়োলোক মালিকের রান্নাঘরে ডিবরি বারবার নিভিয়া যায়, রাত্রে খোকা কাঁদিলে টর্চ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া খোকার মা প্রায় কাঁদিয়া ফেলেন নিজেও।

একটু বেশি রাত্রে আর রাত্রির শেষ ভাগে ট্রামেব আওয়াজ কানে আসে, বন্ধ ঘরের বাহিরে ঝড়ের অন্তিম অবস্থার হা-হুতাশ ভরা একটা অস্বস্তিকর একটানা আহ্বানের মতো মোটরের হর্ন দূরেও বাজে কাছেও বাজে, সময় অসময় নাই,—কেবল সময় বিশেষে বাজে বেশি, সময় বিশেষে কম। পথের দুপাশে স্বচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের, স্বাচ্ছন্দ্য ও দুর্ভোগেব, রুচি ও অরুচির, সুন্দর ও কুৎসিতের, পরিচ্ছন্নতা ও নোংরামির, সম্মুখ ও পিছনের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের (যথা—গৃহ-নির্মাণোপকবণের সমাবেশ) কত যে আশ্চর্য সমন্বয় ও গলাগলি ভাব। নাম লেখা গেট, বাগান ও লন, আধুনিক ফ্যাশানেব সুদৃশ্য দোতলা বাড়ি, বিচিত্র শাড়ি, সুন্দরী নাবী, ইট বাহিব করা পুরানো একতলা বাড়ি, সামনে সিমেন্ট-ফাটা রোয়াকে ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাগজের টুকবা, আধপোড়া বিড়ি, কোমরে ঘুনসি বাঁধা উলঙ্গ শিশু। পথের এদিকে ছবির মতো সাজানো মনিহারি দোকান— সাবান, কেশ তৈল, পাউডার, স্নো, ক্রিমে ঠাসা। পথেব অপব দিকে নিছক একটা কয়লার আড়ত, খুচবা ও পাইকারি বিক্রয় হয়, মালিক শ্রীভূষণচন্দ্র নন্দী। তিনটি মহিষের গাড়ি কয়লা আনিয়া আড়তে জমা করে, পুবীষ ও পাঁকের কোমল গভীর স্নেহে দেহেব ভাব নামাইয়া এই তিন জোড়া মহিষ অবসর সময়টা জাবব কাটে আড়তেব ঠিক পিছনে—রাস্তা হইতে অনেকটা চোখে পড়ে, গন্ধও পাওয়া যায় কিছু কিছু, কাছেই ডাইমন্ড র‍্যাস্টুর‍্যান্ট , ফাস্টকেলাস চা রুটি মাখন চপ কাটলেট ডবল ডিমের মামলেট (মাত্র তিন পযসা) ইত্যাদি পাইবেন বলিয়া মালিক রাধানাথ দে স্বহস্তে সাইনবোর্ড লিখিয়া রাখিয়াছে।

মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ১২৩

অহিংসা

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অভিলেখাগারে 'অহিংসা' উপন্যাসের একটি খণ্ডিত অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আছে। পৃষ্ঠাগুলি সংখ্যাচিহ্নহীন, পারম্পর্যহীন এবং একাধিক পৃষ্ঠায় একই অনুচ্ছেদ নানাভাবে লেখার ও বর্জনের উদাহরণ মাত্র। মূল পাণ্ডুলিপির কত পূর্বে এই লেখাগুলি খসড়া আকারে দেখা দিয়েছিল, অনুমান করা যায় না। মূল কাহিনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই জাতীয় খসড়াগুলি লেখকের রচনাশৈলীর বিবর্তন ধারাটিকে ব্যাখ্যা করার পক্ষে প্রয়োজনীয় বিধায় কয়েকটি পৃষ্ঠার উদাহরণ সংকলিত হল। সংকলিত উদাহরণগুলিতে সর্বদা কাহিনির ক্রম রক্ষিত হয়নি।

পাণ্ডুলিপি	গ্রন্থ
সদর, অন্দর ও অন্তঃপুর লইয়া সাধুজীর তিনমহল কুটীর। সদর আর কিছুই নয়, একখানা প্রকাণ্ড ঘর—মেঝে লাল সিমেন্টের দেওয়াল গেরুয়া রঙের, বাদামী ভাবটা বেশী প্রকট। চাল শনের। আশ্রমের সমস্ত ঘরগুলিই এরকম ; উপরের ঢাকনীটা ছাড়া বাকী সব চুণ সুরকি ইঁটকাঠের ব্যাপাব। আশ্রমে যে দালান নাই, সব কুটীর, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলিকে সকলেব উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। সদরের পব অন্দরের উঠান।	সদানন্দের কুটিরের সদর আর কিছুই নয়, বড়ো একখানা ঘর। মেঝে লাল সিমেন্ট করা, দেয়াল গেরুয়া রঙের,—বাদামি ভাবটা একটু প্রকট। আশ্রমের ছোটোবড়ো সমস্ত ঘরই এই ধরনের, উপরের ছাউনি ছাড়া বাকি সব চুন সুরকি ইটকাঠের ব্যাপার। কিন্তু বিপিনের ভাষায় এগুলি সব কুটির। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৮০
[লেখকের মন্তব্য : ভাবিয়া দেখিলাম এইখানে কাহিনীর বাশ টানিয়া মাধবীলতার সম্বন্ধে সদানন্দের আবিষ্কাব ও মনোভাব পরিবর্ত্তনেব কথাটা আমাব বলিয়া দেওয়াই ভাল। গল্পেব মধ্যে ইঙ্গিতে বোধগম্য করিয়া তুলিতে গেলে বড়ই অশ্লীল হইয়া পড়িবে। অশ্লীলতা গল্পের বড় ক্ষতি করে, স্বাদ নষ্ট করিয়া দেয়। আদিবস নয়—অশ্লীলতা। নাবী অঙ্গের সর্ব্বাঙ্গীণ বর্ণনাও ততক্ষণ অশ্লীল নয় যতক্ষণ বক্তমাংসের অঙ্গটি আড়ালেই থাকে, বর্ণনাকারীর মনের আয়নার প্রতিবিম্ব শুধু বূপ গ্রহণ কবে শব্দে।]	[লেখকের মন্তব্য : ভাবিয়া দেখিলাম গল্পের মধ্যে ইঙ্গিতে পরিস্ফুট করিয়া তোলাব পরিবর্তে মাধবীলতা সম্বন্ধে সদানন্দের আবিষ্কার ও মনোভাব পরিবর্তনের কথাটা আমার বলিয়া দেওয়াই ভালো। সংক্ষেপে বলাও হইবে, নীরস অশ্লীলতার ঝাঁঝও এড়ানো চলিবে। সদানন্দের ধারণা হইয়াছিল, মেয়েটি ভালো নয়। মাধবীলতার প্রতিবাদহীন আত্মদানও এই ধারণাকে সমর্থন করিত। কিন্তু সদানন্দ জানিতে পারিল, মাধবীলতা কুমারী।...] মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৮৪
কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হইতে হইল। নিরীহ ও শান্ত মহেশ চৌধুরী যে এমন একগুঁয়ে মানুষ কে তা জানিত ? সমস্ত রাত্রি তিনি গাছতলায় মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিলেন, কাছে তার স্ত্রী আর ভাগ্নেকেও তাই বাত্রিটা কাটাইতে হইল গাছতলায়। মহেশ চৌধুরীকে অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু খাওয়ান গেল না, মাধবীলতা আর বত্নাবলী তার স্ত্রীকে কোনরকমে একটু দুধ খাওয়াইয়া শশধরকে ডাকিয়া নিয়া গেল ভাত খাইতে। আশ্রমেব ভাত পেট ভরিয়া খাইয়া আসিয়া শশধব আবার মামা মামীর কাছে গাছতলায় আসিয়া বসিল। রাত দশটা পর্য্যন্ত আশ্রমে দু'একজনকে সেখানে দেখা গেল, তারপর একজনও রহিল না। আশ্রমের নিয়ম রাত্রি দশটার পর কেহ নিজের কুটীরের বাহিরে থাকিতে পারিবে না—বিপিন আব সদানন্দ ছাড়া।	সন্ধ্যা হইল, রাত্রি বাড়িতে লাগিল, মহেশ চৌধুরি গাছতলায় মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিল। নিরীহ, শান্ত, ভীরু মানুষটা যে আসলে এমন একগুঁয়ে, সদানন্দ ছাড়া এতকাল আর কে তা জানিত। তাকে কিছু খাওয়ানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া গেল। মাধবীলতা আর রত্নাবলী কোনো রকমে তার স্ত্রীকে একটু দুধ খাওয়াইয়া শশধরকে ডাকিয়া নিয়া গেল আশ্রমের রাত্রির আহার্যের ব্যবস্থায় ভাগ বসাইতে, রাত্রে আশ্রমে রান্না হয় না, কিন্তু পেট ভরাইতে শশধরের অসুবিধা হইল না—দুধ ছানা, মিষ্টি, ফলমূল, এসবের অভাব নাই। খাওয়ার পর সে আসিয়া আবার মামা মামির কাছে বসিয়া রহিল গাছতলায়। রাত্রি দশটা পর্যন্ত আশ্রমের দু-একজনকে সেখানে দেখা গেল, তারপর একজনও রহিল না। রাত্রি দশটার পর কারও কুটিরের বাহিরে থাকা বারণ—বিপিন ও সদানন্দ ছাড়া। মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৩০৩

মাধবীলতাকে নিয়া বাহিরে বিশেষ কিছু হৈ চৈ হইল না। রাজপুত্র নারায়ণের ভয়টা দেখা গেল ভিত্তিহীন।

মাধবীলতাকে নিয়া বাহিরে কিছু হইচই হইল না। রাজপুত্র নারায়ণের আশঙ্কাটা দেখা গেল নিছক তার নিজেরই কল্পনা,—অন্যায়ে অনভিজ্ঞ মনের স্বাভাবিক ভীরুতার ফল।

মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৮৯

সদর অন্দর ও অন্তপুব লইয়া তিনমহল কুটীব সাধুজীর। সদর একটিমাত্র ঘব—মস্ত হলেব মত। এখানে সকলের প্রবেশাধিকার আছে—বিনানুমতিতে। সদবেব ঘরখানার পবেই অন্দরের।

সদানন্দের কুটিরের সদর আর কিছুই নয়, বড়ো একখানা ঘর।
[সদর অন্দর ও অন্তঃপুরেব বর্ণনা পূর্বেই উপন্যাসে আছে।]

মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৮০

'আমার জন্য স্পেশাল ব্যবস্থা হলে সকলে কি মনে করবে বিপিন ?'
'মনে করবে কচু। তুই স্পেশাল মানুষ, তোর জন্য স্পেশাল ব্যবস্থাটা না হলেই লোকের মন খুঁতখুঁত করবে। ইংরেজীওয়ার্ড বলাব হ্যাভিটটা তোব গেল না কিন্তু।'

বিপিন তখনও শতকরা নব্বই ভাগই বন্ধু, সবে শিষ্য ও আশ্রমের ম্যানেজার হইয়াছে।

উঠিল প্রাচীর। লতাপাতায় প্রাচীরকে ঢাকিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে বিপিন কিন্তু ভুলিল না। তারপর প্রাচীর অভ্যন্তবে গাছপালা যতদূব সম্ভব বজায় রাখিয়া বিপিন ঘর তুলিল তিন ভাগে। সদর অন্দর আর অন্তপুব ছাড়া সে-তিনভাগের ঠিকমত আর কোন সংজ্ঞা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সদবে সকলের প্রবেশাধিকাব রহিল বিনা অনুমতিতে। অন্দবে ঢুকিবার ও বাস করিবার অধিকাব রহিল কেবল বাছাবাছা কয়েকজনেব, যারা ভক্ত ও শিষ্যেব মধ্যে বিশিষ্ট অথবা যারা দূব দেশ হইতে আগত দুদিনেব অতিথিদের মধ্যে বিশিষ্ট অথবা সদানন্দ ও তাব অতিথিদের সেবাব জন্য যাদেব দরকার। অন্তপুবে ঢুকিবাব অধিকাব রহিল কেবল সদানন্দ আর বিপিনেব।

সদানন্দ আপত্তি করিযাছিল। এ কি গোপনতা, ঢাকাঢাকির ব্যবস্থা ? সাধুসন্ন্যাসীর কি এভাবে ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকা মানায় ?

বিপিন যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছিল, সে তো আর আসলে সাধুসন্ন্যাসী নয়।

'লোকে কি ভাববে বিপিন ?'

'ভাববে তোর মাথা ? ভাববে সাধুজী নির্জনে অহোরাত্র সাধনভজন করছেন।'

আড়ালে বিপিন তখনও বন্ধু। সদর আর কিছুই না, বড় একখানা ঘর। মেঝে লাল সিমেন্ট করা, দেয়াল....

[উপন্যাসে এ অংশ নেই, তবে এ বিষয়ের নির্যাস, খুঁটিয়ে পড়লে প্রথম অধ্যায়েই পাওয়া যায়।]

দুই

আশ্রমের খানিক তফাতে নদীর ধারে বড় একটা কাঠের গুঁড়িতে সদানন্দ মাঝে মাঝে বসিয়া থাকেন। সেইখানে

আশ্রমের খানিক তফাতে নদীর ধারে একটা মোটা কাঠের গুঁড়িতে সদানন্দ মাঝে মাঝে বসিয়া থাকে। সেইখানে

বিপিন তাকে আবিষ্কার করিল। তখনও সূর্য্য আকাশে বেশী উঁচুতে ওঠে নাই।

'মেয়েটি কাল তোর ঘরে ছিল না ?'

সদানন্দ নদীর দিক হইতে মুখ না ফিরাইয়াই জবাব দিল 'হ্যাঁ।' বিপিন তার পাশে বসিল 'ছেলেমানুষ, মাঝরাতে নারাণের সঙ্গে ঝগড়া করে তোর ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ করে দিয়েছিল। তোর ভয়ে নারান ডাকাডাকি করতে ভরসা করেনি। বেশ মেয়েটা, না ?'

অনেক দিন পরে বিপিন বন্ধুর মত কথা আরম্ভ করিয়াছে সদানন্দকে খুসী করিতে চায়। আশ্রম সম্পর্কে বিপিনের সমস্ত ব্যবস্থাই সদানন্দ মানিয়া লয়, কেবল নারীসংক্রান্ত ব্যাপারগুলিতে তার সায় নাই। বিপিন তার সঙ্গে কত তর্ক করিয়াছে, কত বলিয়াছে যে পৃথিবীতে যখন অর্ধেক পুরুষ আর অর্ধেক নারী, প্রকাশ্যে না হোক অন্ততঃ গোপনে দু-চারটা নারীসংক্রান্ত ব্যাপারকে প্রশ্রয় না দিলে চলিবে কেন ! কিন্তু এ বিষয়ে আপোষ করিতে সদানন্দ রাজী হয় নাই। বিপিন খানিকক্ষণ একথা সেকথা বকিল, সদানন্দের ঘরে মাধবীর রাত কাটানো লইয়া বিশ্রী একটা তামাসা করিল, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'কথা বলছিস না যে, রাগ করেছিস বুঝি ?'

সদানন্দ বলিল, 'না।'

'তুই যা ভাবছিস সেরকম নয় সদা, মেয়েটি সত্যি ভাল। ওকে না বলে নারান চলে গেছে তো, সেই থেকে খালি কাঁদছে।'

'নারান আর আসবে না ?'

'আসবে বৈকি, ওবেলা আসবে—নয় তো কাল। চার পাঁচ দিনের মধ্যে একটা ব্যবস্থা করে মাধবীকে নিয়ে যাবে, কটা দিন একটু রয়ে সয়ে কাটিয়ে দে সদা। আর কেউ হলে কি আশ্রমে উঠতে দিতাম—রাজা সায়েবের ছেলে, দুদিন পরে নিজে মালিক হবে, ওকে তো চটান যায় না।

কোন জিনিষ বুঝাইয়া বলিতে বিপিনের কোনদিন ত্রুটি হয় না। জগতের জটিলতম সমস্যার সরলতম ব্যাখ্যাগুলি তার মগজে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধিয়াছে, তার সমস্ত যুক্তি অকাট্য। মেয়েটিকে রাজপুত্র বাহির করিয়া আনিয়াছে বটে, কিন্তু এতো সর্বদাই ঘটিতেছে, রাজরাজড়ার ছেলেরা এ রকম করেই, সংসারে থাকিতে গেলে এ সব ঘটনায় অত বিগলিত হইলে চলিবে কেন ?

[অসমাপ্ত]

বিপিন তাকে আবিষ্কার করিল। তখনও সূর্য আকাশে বেশি উঁচুতে ওঠে নাই। নদীর জল রাতারাতি আরও বাড়িয়াছে, ঘোলাটে জলের স্রোতে এখনও অনেক জঞ্জাল ভাসিয়া যাইতেছে, শুকনো নদীতে অনেকগুলি মাস ধরিয়া যেসব আবর্জনা জমা হইয়াছিল। কাছাকাছি ছোটো একটি আবর্তে কয়েকবার পাক খাইয়া একটা মরা কুকুর ভাসিয়া গেল। বড়ো আপশোশ হইতেছিল সদানন্দের, অনুতাপমিশ্রিত গ্লানিবোধ। তবু শরীর মন যেন হালকা হইয়া গিয়াছে। করুণা ও মমতার ব্যথায় হৃদয় ভারাক্রান্ত, তবু আনন্দের একটা প্রলেপ পড়িয়াছে মৃদু ও মধুর। ব্যাপারটা সদানন্দ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অন্যায়ের শাস্তি ও পুরস্কার কি এমনিভাবে একসঙ্গে আসে ?

বিপিন পাশে বসিতে বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু বিপিন বোঝাপড়া করিতে আসে নাই, ভাব করিতে আসিয়াছে, এ কাজটা বিপিন ভালো পারে না, বন্ধুত্বের ফাটল ঝালাই করার কৌশল তার জানা নাই। রাজপুত্রের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সদানন্দের ঘরে মাধবীলতার রাত কাটানো লইয়া একটু পরিহাস করিতে যায়। তারপর সদানন্দের মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া বলে 'বড়ো ছেলেমানুষ তুই, রাগিস কেন ? তুই ছাড়া আর কারও ঘরে ওকে থাকতে দিতাম ? তোর কাছে ছিল বলেই নারাণ বাবুরও ভাবনা হয়নি আমারও ভাবনা হয়নি।'

এত বড়ো তোষামোদেও সদানন্দ খুশি হইল না দেখিয়া বিপিন মনে মনে রাগিয়া গেল। বিপিন রাগিলেই সদানন্দ সঙ্গে সঙ্গে সেটা টের পায়, দুজনের মধ্যে একটা আশ্চর্য ঘনিষ্ঠতা আছে তাদের, একটা অতীন্দ্রিয় যোগাযোগ আছে, বোধ হয় ইন্দ্রিয়ের যখন বিকাশ হইতে থাকে সেই শৈশব হইতে পরস্পরকে তারা ভালোবাসিয়া আর ঘৃণা করিয়া আসিতেছে এ জন্য। কতবার ছাড়াছাড়ি হইয়াছে জীবনে, কিন্তু এ জগতে নূতন আর একটি বন্ধুও তারা খুঁজিয়া পায় নাই। ছাড়াছাড়ি যখন হইয়াছে, অপর জন মরিয়া আছে না বাঁচিয়া আছে এ খবরও যখন তারা দীর্ঘকাল পায় নাই, কারও মন এতটুকু খারাপ হয় নাই, আবার যখন দেখা হইয়াছে তখনও হয় নাই আনন্দ। কয়েকটা দিনরাত্রি কেবল তখন একসঙ্গে কাটিয়া গিয়াছে—পরস্পরের মধ্যে মশগুল হইয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলিয়া আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করিয়া থাকিয়া। সদানন্দ ঘাড়ে হাত রাখিবামাত্র বিপিন ঘাড় ফিরাইয়া অন্য দিকে তাকায়, একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় বিপিনের এই ভাবপ্রবণতা, তার ক্রোধে অভিমানের এতখানি ভেজাল।

তুই যা ভাবছিলি তা ঠিক নয় সদা, মেয়েটা সত্যি ভালো। ওকে না জানিয়ে নারাণবাবু চলে গেছে বলে সেই থেকে খালি কাঁদছে।

নারান আর আসবে না ?

আসবে, ও বেলা নয়তো কাল সকালে। চার-পাঁচ দিনের মধ্যে একটা ব্যবস্থা করে মাধবীকে নিয়ে চলে যাবে, একটা দিন একটু রয়ে সয়ে কাটিয়ে দে সদা, দোহাই তোর। আর কেউ হলে কি আশ্রমে উঠতে দিতাম ? রাজাসাহেবের ছেলে, দুদিন পরে নিজে সব কিছুর মালিক হবে। ওকে তো চটানো যায় না, তুই বল, যায় ?

মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৮৪

প্রতি বছর মরে আর বাঁচে। যেই বর্ষা ঘনাইয়া আসে, আকাশে কালো কালো মেঘ জমিয়া থমথম করে, রাধাই নদীর বুকে ঘোলাটে জলের স্রোত দেখা দেয়। রৌদ্রতপ্ত বালি যায় ঢাকিয়া, স্থানে স্থানে পচাজল যায় ভাসিয়া। লোকে অবাক হইয়া একবার তাকায় আকাশের দিকে, একবার তাকায় নদীর জীবন সঞ্চারের দিকে। বৃষ্টি আর হইয়াছে কতটুকু, কদিনের ছাড়াছাড়া বর্ষণে মাঠঘাট ভাল করিয়া ভেজে নাই পর্য্যন্ত। যেটুকু জল পড়িয়াছে আকাশ হইতে, রাধাই নদীর ক মাসের তৃষ্ণার্ত্ত বালুকারাশির সেটুকু জল শুষিয়া নেওয়ার কথা।

প্রতি বছব বাঁচে আর মরে। আকাশে যেই কালো কালো মেঘ জমিয়া থমথম করে, লোকে জল আটকানোর জন্য চালের ফুটা আর ছাতির ফুটা মেরামত না করিয়া আর উপায় খুঁজিযা পায না, রাধাই নদীতে অমনি দেখা দেয় ঘোলা জলের স্রোত। ক-মাস ধরিয়া রোদে যে বালি তাতিয়াছে, সে বালি যায় ঢাকিয়া, স্থানে স্থানে যে আবদ্ধ জল পচিয়া উঠিতেছিল সে জল যায ভাসিয়া। সকলে অবাক হইয়া একবার তাকায় আকাশের দিকে, একবার তাকায় রাধাই নদীর দ্রুতবর্ধনশীল জীবনসঞ্চারের দিকে। বড়ো রহস্যময় মনে হয ব্যাপাবটা সকলের কাছে। বৃষ্টি আর হইযাছে কতটুকু কদিনেব ছাডা ছাডা বর্ষণে পথঘাট ভালো করিযা ভেজে নাই পর্যন্ত। কোনো পুকুরে জল বাড়ে নাই। কোনো ডোবায় জল জমে নাই। রাধাই এত জল পাইল কোথায় ?

মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৭৭

সদানন্দ বুঝাইয়া দিবাব চেষ্টা করেন। বিকালের দিকে নদীর ধারে বড় চালাটার নীচে অনেকে সমবেত হয়। আশ্রমের সকলে তো উপস্থিত থাকেই, কাছাকাছি গ্রামগুলি হইতে অনেকে আসে, দূরের গ্রাম ও সহর হইতেও আসে। অহিংসাই যে প্রেম, এইকথা বুঝাইয়া বলিতে বলিতে সদানন্দ হঠাৎ আনমনে চুপ করিয়া যান। দূর আকাশেব দিকে চোখ পাতিয়া পলকহীন চোখে এমনভাবে চাহিয়া থাকেন যে কারও টের পাওয়ার উপায় থাকে না, আনমনা তিনি ইচ্ছা করিয়া হইয়াছেন। কথা আজ জমিতেছিল না। যার কথা মনের মধ্যে কাঁটার মত বেঁধে মধুর মত মাখানো হইয়া যায়। শুনিতে শুনিতে থাকিয়া থাকিয়া রোমাঞ্চ হয়। আজ যেন তার কথায় খোঁচা নাই, রস নাই—নিছক কতগুলি নীরস ভোঁতা শব্দ পরিবেশন করিতেছেন। অস্বস্তি বোধ করিতে করিতে এতক্ষণে সকলে কারণটা পাইয়া স্বস্তি বোধ করে।

নদীর একেবারে ধারে প্রকাণ্ড চালাটায় বিকালেব দিকে সাধুজীর দর্শনকামীদের সমাগম হয়। আশ্রমের সকলে তো উপস্থিত থাকেই, কাছাকাছি গ্রাম হইতে অনেকে আসে, দূরের গ্রাম ও শহর হইতেও আসে। সদানন্দ সকলকে দর্শন দেয, দর্শনের মনোমত ব্যাখ্যাও শোনায়।

এবার যেদিন প্রথম রাধাই নদীর বুকে স্রোত দেখা দিল, সেদিন অহিংসা ও প্রেমের কথা বলিতে বলিতে সদানন্দ হঠাৎ আনমনে চুপ করিয়া গেল। নদীর স্রোতের দিকে পলকহীন চোখে এমনভাবে চাহিয়া রহিল যে, কারও বুঝিবার উপায় রহিল না, অন্যমনস্ক সে ইচ্ছা করিয়া হইয়াছে। আজ কথা জমিতেছিল না। যার কথা মনের মধ্যে কাঁটার মত বেঁধে, মধুর মতো মাখা হইয়া যায়, মধুপের মতো গুঞ্জন করে, শুনিতে শুনিতে থাকিয়া থাকিয়া হয় রোমাঞ্চ, আজ যেন তার কথায় জোর নাই, সুর নাই—নিছক কতকগুলি নীরস ভোঁতা শব্দমাত্র পরিবেশন করিতেছে। অস্বস্তি বোধ করিতে করিতে এতক্ষণে কারণটা টের পাইয়া সকলে স্বস্তি লাভ করে। তাই বটে।

মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৭৭

চারবার বৃষ্টি হওয়া চাই। শুনিয়া সদানন্দ মৃদু মৃদু হাসেন। তিরস্কার করিয়া বলেন এরকম ধারণা পোষণ করা কেন ? এ ধরণের মিথ্যা কুসংস্কার ? ধমক শুনিয়া মনে হয়, এটাই যেন তাদের সকল কুসংস্কারের চরম, মনে মনে এই কুসংস্কার পুষিয়া রাখিয়া ইহকাল পরকাল সব তারা নষ্ট করিয়াছে। তারপর সদানন্দ শুষ্ক নদীতে হঠাৎ স্রোত দেখা দিবার কারণ ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা করিতে করিতে আসে রহস্যময়ী প্রকৃতির কথা। প্রকৃতির আসল রহস্য কোথায় মানুষ নাকি সন্ধান করিতে জানে না, তাই অজানার মধ্যে প্রকৃতিব রহস্যকে খুঁজিয়া মরে। জানা মাত্র যে অজানার সব আবরণ খসিয়া যায়, তার মধ্যে রহস্যময় কি আছে ? কেউ বেশী জানে, কেউ কম জানে, কিন্তু রহস্যের কি তারতম্য হয়—যে রহস্য অনুভূতির জগতের দিগন্ত ? প্রকৃতিকে যে যতটুকু জানে তারই মধ্যে প্রকৃতির সবটুকু রহস্য নিহিত থাকে।

চারবার বর্ষণ হইয়া গেলে নদীতে জল আসিবেই আসিবে। সদানন্দ মৃদু হাসে। জবাব দিয়াছে শ্রীধর। কিন্তু স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলকে তিরস্কার করিয়া বলে, এসব ধারণা পোষণ কবা কেন, এ ধরনের সব কুসংস্কার ? সাধুজীর স্নেহমধুর আবেগভরা ধমক শুনিয়া মনে হয়, আর যে সব কুসংস্কার তাদের আছে, সেসব যেন কিছু নয় ; এটাই তাদের কুসংস্কারের চরম। মনে মনে এই কুসংস্কার পুষিয়া রাখিয়া ইহকাল পরকাল সব তারা নষ্ট করিয়াছে।

তাবপর শুষ্ক-নদীতে হঠাৎ স্রোত দেখা দিবার কারণ সে ব্যাখ্যা করে। ব্যাখ্যা কবিতে করিতে আসে রহস্যময়ী প্রকৃতির কথা। প্রকৃতির আসল রহস্য কোথায়, মানুষ যে তার সন্ধান জানে না, এ কি সহজ আপশোশের কথা ! অজানার মধ্যে মানুষ প্রকৃতিব বহস্যকে খুঁজিয়া মরে—রাধাই নদীতে জলসঞ্চারের কাবণ না জানায় ভাবে এই বুঝি তবে প্রকৃতি দেবীর দুর্বোধ্য লীলার অভিব্যক্তি। জানামাত্র যখন অজানার সমস্ত রহস্যের আবরণ খসিয়া যায়, অজানাব জন্য মাথা ঘামানো কেন ? জানার মধ্যে, যে যতটুকু জানে তাবই মধ্যে প্রকৃতিব সবটুকু রহস্যের খনি নিহিত থাকে। রাধাই নদীতে জলস্রোত আসিবার কারণ নাই বা জানিলে, জলস্রোত যে আসিয়াছে, এইটুকু তো জান ? এই জানাটুকুব মধ্যে সন্ধান কর, বহস্যানুভূতিব অজ্ঞাত জগতেব দিগন্তে আত্মজ্ঞানেব ছায়া নিববচ্ছিন্ন অস্তিত্বেব সংকেতে তোমায় সাড়া দিতেছে দেখিতে পাইবে।

মা বচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৭৯

শুধু বলিবার কৌশলে প্রত্যেকেব মনে হয় দুর্বোধ্য কথাগুলি সে যেন জলের মত বুঝিয়া ফেলিয়াছে। মেয়েদের পর্যন্ত তাই মনে হয়। বড় বড় তত্ত্বকথা শুনিবার বা বুঝিবার জন্য কেউ আসে না, শুধু কথা শুনিবার লোভে আসে। এ সাধটা মিটিয়া গেলেই তাদেব এত আনন্দ হয় যে সদানন্দ কি বলিলেন আব না বলিলেন সেটা বুঝিবার প্রশ্নই জাগে না।

শুধু সদানন্দের বলিবাব কৌশলে প্রত্যেকেব মনে হয় দুর্বোধ্য কথাগুলি যেন জলের মতো বুঝিয়া ফেলিয়াছে। কি বুঝিয়াছে, এ কথা কেউ ভাবে না, বুঝিতে পাবিয়াছে এই ধারণার উন্মাদনায় বিভোব হইয়া থাকে। বিপিনেব শীর্ণ ম্লান মুখে আনন্দের ছাপ পড়ে। আজ প্রণামি জুটিবে ভালো।

মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ২৭৯

[লেখকের মন্তব্য : পুরুষেরা এ রকম, মেয়েরা এ রকম—গল্পে উপন্যাসে এ ধরনের ঝাড়া মন্তব্য থাকা অসঙ্গত, যদি মন্তব্যটা কোন পক্ষের দুর্বলতার পোষাক-পরা সার্কাসের ক্লাউনের পর্যায়ে পড়ে। উপরেব লাইনটা রাখিব না তুলিয়া দিব আমাকে সে জন্য রীতিমত মাথা ঘামাইতে হইয়াছে। কারণ মন্তব্যটা পড়িয়া প্রায় সকলেই ধরিয়া লইবেন যে, আমি মেয়েদের প্রকৃতিগত একটি দুর্বলতার ইঙ্গিত করিয়া একটু জমজমাট রসসৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছি। এ রকম সস্তা প্রচেষ্টা হরদম চলে সুতরাং

[লেখকেব মন্তব্য : কী কথায় কী কথা আসিয়া পড়িল। কিন্তু উপায় নাই, রত্নাবলীকে বুঝিতে হইলে কথাটা মনে রাখা দবকার। কোনো বিষয়ে আগে হইতে মন স্থির করিয়া ফেলিবার ক্ষমতাটাই মনের জোরের চরম প্রমাণ হিসাবে প্রায় সকলেই গণ্য করিয়া থাকে, আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওটা গোঁয়ারতুমিরই রকমফের। ধরাবাঁধা নিয়মগুলি জীবনে কাজে লাগে না। ধরাবাঁধা নিয়ম কী জীবনে বেশি আছে ? সেগুলি অপরিবর্তনীয় নিয়ম বলিয়া মনে হয়, আসলে সেগুলি মানুষের আরোপ করা বিশেষণ

বিনা বিচারে সকলে আমার মন্তব্যটাকেও ওই পর্য্যায়ে ফেলিয়া দিবেন ইহা আশ্চর্য্য নয়। আসলে আমি কিন্তু মেয়েদের প্রশংসাই করিয়াছি। কোন বিষয়ে আগে হইতে মন স্থির করিয়া ফেলিবার ক্ষমতাটাই মনের জোরের চরম প্রমাণ নয়, ওটা বরং গোঁয়ারতুমিরই রকমফের। জীবনের এমন কতগুলি নিয়ম আছে যা দুই আর দুই-এর চার হওয়ার মত অপরিবর্ত্তনীয় ? আমি কি চাই, আমি কি কাজ করিতে চাই, আমাব কি করা উচিত, গোঁয়াবের মত এসব প্রশ্নেব একটা সুনিশ্চিত জবাব অবশ্যই গায়ের জোরে খাড়া করা যায়, কিন্তু কে বলিতে পারে সেই জবাবটিই সঠিক ? মাত্র, উল্টাটাও অনায়াসে ঘটিতে পারিত। মানুষ কী চায়, মানুষ কী করে আর মানুষের কী চাওয়া উচিত আর মানুষের কী করা উচিত ? এর কি কোনো নির্দিষ্ট ফরমুলা আছে ? অন্যের প্রস্তুত করা ফরমুলা চোখকান বুজিয়া অনুকরণ করা হয় বোকামি নয় গোঁয়ারতুমি। মেয়ে এবং পুরুষের মধ্যে যারা সুবিধাবাদী, তারা বোকাও নয়, গোঁয়ারও নয়। এই জন্য তারা আগে হিসাবনিকাশ শেষ করিযা চরম সিদ্ধান্ত করিতে পারে না। দবকার মতো কাজ আবম্ভ করে কিন্তু মন সিদ্ধান্তেব বাঁধনে বাঁধা পড়িতে চায না.. .]

মা রচনাসমগ্র-৩ পৃ ৩১৯

এবার পাণ্ডুলিপি থেকে উপন্যাসে সম্পূর্ণ বর্জিত বা উপন্যাস-বহির্ভূত কিছু বর্ণনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে। এগুলি উপন্যাসের কোন অধ্যায় কোন পরিস্থিতি বা কোন অংশের সঙ্গে যুক্ত হতে পারত, বর্ণিত প্রসঙ্গ থেকে পাঠক তা অনুমান করতে পারেন। কিন্তু বর্জিত অংশগুলি এতই বিচ্ছিন্ন ও পৃষ্ঠাঙ্কহীন যে, সঠিক সিদ্ধান্ত সর্বদা সম্ভব নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্জিত বা অগৃহীত এই পৃষ্ঠাগুলির পাঠান্তরও আছে। একটি পাঠে মনে হয় উপন্যাসটি এখান থেকেই শুরু করার ইচ্ছা ছিল লেখকের :

অহিংসা

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম ভাগ

একদিন মধ্যাহ্নভোজনের সময় বিখ্যাত সাধু সদানন্দের গলায় হাড় ফুটিয়া গেল।

দোষ কাবও নয়। সাধুজীর নিজেরও নয়। এরকম অসাধাবণ ঘটনাও জগতে মাঝে মাঝে ঘটিয়া যায়। সদানন্দ অন্যমনস্ক ছিলেন। দাঁতের চাপে শক্ত হাডটা ভাঙিগয়া মোটা একটা টুকরা গলনালীব মুখেব সামনে গিয়া পড়িল। আনমনে হঠাৎ ঢোক গিলিতে না গেলে কোন হাঙগামাই হইত না।

শেষ পর্য্যন্ত ডাক্তার ডাকিতে হইল। ডাক্তার হাড়েব টুকরাটা বাহির করিয়া দেওয়াব পর দেখা গেল, কিছু খাওয়া তো সম্ভব নযই, কথা বলিতে পর্য্যন্ত কষ্ট হইতেছে। এদিকে তখন বাজে প্রায় তিনটা এবং চাবটাব সময় বিরাট এক সভায় সাধুজীর বক্তৃতা দিবার কথা।

আশ্রমের বাহিরে শোভাযাত্রা প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে বেশ টের পাওয়া যায়। শান্ত তপোবনেব মত আশ্রমের বিস্তীর্ণ সদর অংশ ডিঙগাইয়া এত দূবে মানুষের জনরব ভাসিয়া আসিতেছে। সভার আয়োজন হইয়াছে মেলার একপাশে, প্রায় এক মাইল দূরে। এতটা পথ অতিক্রম করিতে শোভাযাত্রার সময় লাগিবে, এখন রওনা হইলেই হয়। কিন্তু রওনা হইবে কে ? গলায় বেঁধা হাড় বাহির করিতে যার ডাক্তার ডাকিতে হইল, সভায় গিয়া সে করিবে কি !

সদানন্দ চিন্তিত হইয়া বলিলেন, 'কি করা যায় বিপিন ?'

বিপিন বন্ধু, শিষ্য এবং আশ্রমের জেনারেল ম্যানেজার। একদিন সদানন্দের নাম ধরিয়া ডাকিত, হাসিতামাসা করিত। আজও অন্তরালে করিলে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু প্রকাশ্যে হঠাৎ ভুল করিয়া ফেলিবার ভয়ে সব সময়েই সে শিষ্যত্বের খোলসটা বজায় রাখিয়া চলে।

'কথা বলতে খুব কি কষ্ট হচ্ছে প্রভু ?'

'নয়তো কি আবাম হচ্ছে ?'

অনেকদিন পব শীর্ণ মুখেব চামডা কুঁচকাইয়া বিপিন এক গাল হাসিল।

'আরাম হয়ে হয়েই তো তুই বিগড়ে গেলি, আজকেব দিনটা একটু সাবধান থাকলে চলত না ? বলে পাঠাই, সাধুজীর শরীর ভাল নয়।'

'তাও তো বটে।'

বিপিনের এরকম ভুল হওযা আশ্চর্য্য বটে।

এইরূপ আরও কয়েকটি পাণ্ডুলিপিধৃত কিন্তু উপন্যাসবহির্ভূত পাঠ :

বিনয়ে কদমতলার কাদার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াও সেই মহেশ চৌধুরী নিজের যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, আশ্রমের সকলের তাতে ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিযা সদানন্দেব কেবলি মনে হইয়াছে, হায়, সে বিপিনের

দাস—তার স্বাধীনতা নাই। নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নাই। বিপিন তাকে নাকে দড়ি দিয়া টানিয়া নিয়া চলিয়াছে এক অর্থহীন অনির্দ্দিষ্ট পরিণতির দিকে। তার ভক্ত মহেশ চৌধুরী পর্য্যন্ত তার তুলনায় দেবতার সমান। এতবড় একটা আশ্রম করিয়া এত আয়োজন সমারোহ মিথ্যা ভাণ প্রবঞ্চনার পর সে কোথায় আর তার চরণ দর্শনের জন্য পাগল মহেশ চৌধুরী কোথায়। জীবন ও সাধনার ব্যর্থতার জন্য সদানন্দ বিপিনকে দায়ী করিয়াছেন। কেবল তার হাতে ছাড়িয়া দিলে এ আশ্রম সত্যই আশ্রম হইয়া উঠিতে পারিত। দিনের পর দিন কেন তিনি এভাবে নিজেকে প্রতারণা করিতেছেন ? কেন এ বিশ্বাস গায়ের জোরে পোষণ করিতেছেন যে অবস্থার বিপাকে সব রকম অসংযমকে প্রশ্রয় দিতে হইলেও সংযমের তার তুলনা নাই, মানুষের মধ্যে সত্যই তিনি প্রায় দেবতার সমান ?

সব যখন ভাঙিয়া গিয়াছে,—নিজেকে জয় করিবার সব রকম ভাণ—বকধার্ম্মিক সাজিয়া থাকিয়া কি হইবে ? তার চেয়ে সোজাসুজি মাধবীলতাকে ডাকিয়া মন যেমন চায় তেমনিভাবে তাকে উপভোগ করা যাক। মানুষ বা দেবতা সমর্থন না করুন, প্রকৃতি সমর্থন করিবে। তাছাড়া বিপিন আঘাত পাইবে প্রচণ্ড। এইসব ভাবিতেছেন সদানন্দ আর মাধবীলতার জন্য যে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সরস কোমলতা বর্ষার মত মনের মধ্যে সিঞ্চিত হইতেছিল, বর্ষাবিরহী মরুভূমির মত মনের কোথাও তার কোন চিহ্নও খুঁজিয়া পান নাই, কেবল ওই মাধুর্য্যের তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছেন। মাতাল যে নয় তার বোঝাই কঠিন মদের তৃষ্ণায় প্রাণ আকুল হইয়াছে, সদানন্দ তাই বুঝিতে পারেন না তৃষ্ণাটা আসলে মাধবীলতাকে আলিঙ্গন করার কামনাই শুধু নয়। যাই হোক, এমনিভাবে মহেশ চৌধুরীর জনাই সদানন্দ হঠাৎ অভদ্র হইয়া গিয়াছিলেন। রত্নাবলীব প্রতিক্রিয়াটি মজার। অনেকদিন রত্নাবলী আশ্রমে বাস কবিতেছে, মাধবীলতা আসিয়াছে অল্পদিন আগে।

উপন্যাসে মাঝে মাঝে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে 'লেখকের মন্তব্য' বলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কাহিনি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে, সৃষ্ট চরিত্র ও ঘটনাবলি সম্পর্কে পাঠকের সঙ্গে যেন মতবিনিময় করতে চেয়েছেন অথবা কিছু আত্মকৈফিয়ত দিয়েছেন। পাণ্ডুলিপি থেকে এরূপ কিছু বর্জিত অংশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যথা :

[লেখকের মন্তব্য : আপনাদের কাছে গোপন করিয়া যাইব, কিন্তু একটা অক্ষমতাব কথা স্বীকাব করিতেই হইল। একটি সেতু আমি রচনা করিতে পারি নাই। আশ্রমেব একটি কদমগাছের নীচে মহেশ চৌধুবীব মহাযুদ্ধ এবং আশ্রমের নৈতিক জীবনে আকস্মিক আলোড়নেব মধ্যে। আমিই যেন উপবেব অগভীর স্বচ্ছতা তলার পাঁক ঘাঁটিয়া ঘোলাটে করিয়া দিয়াছি।....(অসমাপ্ত)

[লেখকের মন্তব্য : 'তেজস্বীর দুঃখবেদনা সহজে আমল পায় না। তেজস্বী দুঃখবঞ্চিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, তেজস্বীরই দুঃখ বেশী ; দুঃখ জয় করাই তেজস্বিতা। দুঃখ জয় না হইলে বীর্যবান হয় না। মনেব ভিত্তি ও সীমা অতিক্রম করিয়া গেলেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই ; আত্মোপলব্ধির অভাবকে ক্ষয় কবিতে না পারিলে আত্মোপলব্ধি হয় না,—এখানে 'অভাব' বিপরীতার্থে নয় তাও বলিয়া দিই। আত্মোপলব্ধি ভিন্ন অন্য সমস্ত উপলব্ধির সমষ্টিই 'আত্মোপলব্ধির অভাব', কাবণ একের ক্ষয়ে অভাবে অপরের অস্তিত্ব বাধ্যতামূলক ও কালাদিনিরপেক্ষ পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধি মানুষেব আয়ত্তাতীত। আত্মোপলব্ধির অভাবসূচক উপলব্ধিগুলিই দুঃখ।]

উপন্যাসে বর্জিত আরও একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদে মহেশ চৌধুরি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কিছু বিষয়ে রত্নাবলী ও বিপিনের অন্তর্ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। পৃষ্ঠাটি আদ্যন্ত খণ্ডিত ও সংখ্যাচিহ্নহীন :

...আসিয়াই মাধবীলতা যে অনুগ্রহ পাওয়ার ব্যাপারে সকলকে ডিঙাইয়া [যাইবে] সদানন্দ আর বিপিন যে মাধবীলতা বলিতে অজ্ঞান। এটা রত্নাবলীর তবু সহ্য হইয়াছিল—রসে টসটসে কচি আঙুরের মত মেয়ের বেলা এ রকম হয়। কিন্তু মহেশ চৌধুরীর আশ্রমজয়ের ব্যাপারেও যে মাধবীলতার ইচ্ছাই চরম জয় হইবে, এটুকু রত্নাবলী সহ্য করিতে পারে নাই। আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করা নয় শুধু, সদানন্দের আদেশ অমান্য করিয়া কারও পরামর্শ জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজের দায়িত্বে মহেশ চৌধুরীকে সদানন্দের চরণ দর্শন করাইয়া দেওয়া এবং তার ফলে আশ্রম হইতে দূর হইয়া যাওয়ার বদলে আরও বেশি বেশি প্রশ্রয় পাওয়া। বিপিনের মনে হইয়াছিল, সে কি ভুল করিতেছে ? ছলে বলে কৌশলে দিগন্তের কোল হইতে তার আদর্শের সফলতাকে আশ্রমের এই মাটিতে টানিয়া আনিবার সাধনা কি তার ভ্রান্তিবিলাস মাত্র ? নিজের জন্য কোনদিন বিপিন কিছু চায় নাই, তার নিজের ইচ্ছামত পরের জন্য করার মত কিছু একটা করিয়া সে চোখ বুজিতে চায়—

কিন্তু ভুল উপায় অবলম্বন [করার] জন্য তার চেষ্টা আর আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইবে ? আজ পর্য্যন্ত যত কষ্ট সহ্য করিয়াছে আর ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে মনে মনে সে সমস্তের হিসাব করিয়া বিপিন বড় দমিয়া গিয়াছে। কি লাভ হইয়াছে ? কোনদিকে কতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছে ? আশ্রম বড় হইয়াছে—উন্নতি হয় নাই। আশ্রমে ভাল উদ্দেশ্যে যে মিথ্যা আর প্রবঞ্চনা আর ফন্দিবাজিকে যে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, যে সব একান্তভাবে তার নিজস্ব গোপন পরিকল্পনার অঙ্গ, আশ্রমের সঙ্গে যে সমস্তের কোন সম্পর্ক নাই, আশ্রমের জীবনে কি করিয়া সে সমস্তের প্রতিক্রিয়া ফুটিয়া ওঠে ! আর একদিকে মহেশ চৌধুরী—নিরীহ সরল বুদ্ধিহীন মহেশ চৌধুরী ; না চাহিয়া সকলের হৃদয় জয় করিয়াছে, না জানিয়া দুঃখময় ব্যর্থ জীবনকে শান্তি ও সার্থকতায় ভরিয়া তুলিয়াছে। এমন কি মহাপুরুষ মহেশ চৌধুরী যে তার পাগলামি পর্য্যন্ত মানুষকে মুগ্ধ করিয়া দেয় ? আর এমন কি মহাপাপ বিপিন করিয়াছে যে, আজ পর্য্যন্ত সকলে তাকে কেবল ফাঁকিই দিয়াছে, সদানন্দ হইতে মাধবীলতা পর্য্যন্ত ? এইসব ভাবিয়াছে বিপিন আর সঙ্কল্প করিয়াছে যে মহেশ চৌধুরীকে একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। কোন ছুতায় এতদিনের অবজ্ঞা মুছিয়া ফেলিয়া মানুষটার অন্তরঙ্গ হইতে হইবে—কি দিয়া কিভাবে মানুষটা গড়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। মাধবীলতাকে লোকটা স্নেহ করে, কে জানে কি আছে মাধবীলতার মধ্যে ! মাধবীলতার মধ্যস্থতায় হয়তো তাকে জয় করা চলিবে।

উপন্যাসের ঠিক কোন অংশের সঙ্গে এই পাঠ যুক্ত হতে পারত, তা পাঠকদের অনুমানের উপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। আরও একটি মুদ্রিত পাঠের অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি-অংশ উদ্ধৃত হচ্ছে যেখানে সদানন্দের পূর্বজীবনে হাজতবাসের চকিত উল্লেখ আছে। কিন্তু উপন্যাসে তা নেই :

রাধাই নদীর তীর ঘেঁষিয়া একা মন্থরপদে আশ্রমের দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াই সদানন্দ গভীর বিষাদ অনুভব করে। ব্যাপারটা ঘটে বড় অকস্মাৎ। বলা নাই কওয়া নাই মেঘলা মেঘলা মনের আকাশটা যেন চোখের পলকে নিবিড় কালো মেঘে একেবারে আগাগোড়া ছাইয়া গেল। সে না সদানন্দ—মহাজ্ঞানী নির্ব্বিকার মহাপুরুষ ? সত্য সত্য না হোক অনেকগুলি নরনারী তাই তো মনে করে তাকে। চোখ মিট মিট করে সদানন্দের, অকারণে ঘন ঘন পলক পড়ে। শান্ত নির্ব্বিকার দৃষ্টির পলকে পলকে রূপান্তর ঘটিয়া স্বাভাবিক বিষণ্ণ দৃষ্টি ফিরিয়া আসিবার যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মত। একটু গিয়াই চোখে পড়ে তার নিজের আশ্রম, চারিদিকে লতায় ঢাকা প্রাচীর দিয়া ঘেরা শনের ছাউনি দেওয়া কতকগুলি ঘর। আসন্ন সন্ধ্যার আবছা আলোয় তপোবনের সবুজ পটভূমি কালো হইয়া জমাট বাঁধিতেছে,—এদিকে নদীর ওপারে সমতল ক্ষেত গিয়া মিশিয়াছে দিগন্তে, দূরে গ্রামের কুটিরগুলিকে আকাশের বিলীয়মান জ্যোতি আর রঙের পটভূমিতে কুটির বলিয়া চিনিযাও যেন চেনা যায় না। বীভৎসই দেখাইতেছে বটে তার আশ্রমকে।

ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে সদানন্দ থমকিয়া দাঁড়ায় নিজের উপর তার রাগ হয়। সাত বছর আগে দেশের নামে সে যে জেলখানায় অনেকগুলি দিন কাটাইয়াছিল, তার দেয়ালে ইটের উপর ছিল মেটে লাল রঙ মাখানো, মোটা শিক বসানো জানালা ছিল সবুজ, কত পুরু আর উঁচু ছিল সেখানকার বহিঃপ্রাচীর, লতা দিয়া প্রাচীর ঢাকিবার ব্যবস্থা তো সেখানে ছিল না, ঘরের উপর শনের ছাউনি দিবার ব্যবস্থা। আশ্রমকে তবু তার কেন মনে হয় জেলখানা / কয়েদি কেন মনে হয় তার নিজেকে ?

প্রয়োজন ছাড়া বিপিন সদানন্দকে সকলের সামনে বাহির করিতে চায় না। তাহাকে সকলের চোখের আড়ালে রাখিবার জন্য সে ব্যাকুল। ম্যাজিকওয়ালার কালো পর্দ্দার মত স্পষ্ট আর অস্বাভাবিক ব্যবধান রচনা না করিয়া সহজ সরল উপায়ে এই কাজটা করা সে বড় কঠিন মনে করে। এ বিষয়ে তার সতর্কতারও সীমা নাই, দুশ্চিন্তারও সীমা নাই। প্রথমে যৌবনে মেয়েরা যেমন বিপদে পড়ে নিজের নিজের শরীর লইয়া, বিপিনের সমস্যাও তেমনি জটিল। সকলে দেখুক সদানন্দকে, কিন্তু যখন তখন যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন অবস্থায় কেউ যেন তাকে না দেখে। সেটা কি সর্ব্বনাশের সামিল নয় ?

সদানন্দ আড়ালেই থাকে, ধরিতে গেলে একরকম অন্তপুরেই। আশ্রমে যারা বাস করে তাদের জন্য ঘর তোলা হইয়াছে তফাতে, সদানন্দের বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে রাধাই নদীর কাছে খানিকটা স্থান প্রাচীর দিয়া ঘেরিয়া। সদানন্দ আপত্তি করিয়াছিল প্রাচীর কেন ? আশ্রমে কি প্রাচীর মানায়, সাধুসন্ন্যাসীর আশ্রমে ? বিপিন যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছিল, এতো সেকেলে সাধুসন্ন্যাসীর আশ্রম নয়।

অহিংসা পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

অহিংসা পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

অহিংসা উপন্যাসের একটি রচনারীতিগত বৈশিষ্ট্য আছে। মাঝে মাঝেই লেখক কাহিনির মধ্যে ব্যাখ্যাতার ভূমিকায় অনুপ্রবেশ করেছেন এবং তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে তাঁর নিজস্ব ভাবনা যুক্ত করেছেন। পাণ্ডুলিপিতে এই প্রকার আরও কিছু লেখকের মন্তব্য আছে যেগুলি উপন্যাসের মুদ্রিত পাঠে নেই। এইগুলিরও প্রসঙ্গ নির্দেশ নিশ্চিতভাবে করা সম্ভব নয়। যথা :

[লেখকের মন্তব্য . যে কোন আদর্শবাদ সম্বন্ধে যে কেহ যে বকম ভাবেই কথা বলুক তার সম্বন্ধে দু'একবার এরকম খটকা জাগে। বিদ্যার যে জাহাজ, জ্ঞানমার্গে যে প্রায় মোক্ষের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে সারাজীবন আদর্শকে যে পরখ করিয়াছে যতরকম বিশ্লেষণ আছে তার সবগুলি খাটাইয়া যার খ্যাতি পর্য্যন্ত বিখ্যাত, সেও কোন আদর্শবাদের কথা উল্লেখমাত্র করিলে এরকম খটকা জাগা আশ্চর্য্য নয়। আমি যেন বসিয়া আছি আমার কুটিরের দাওয়ায়, আদর্শ যেন আছে দিগন্তে,—সকল আদর্শ। সচেতন অথবা অচেতন আদর্শবাদী হওয়া তো এই জন্য যে আমি চাই না আমাকে কেউ পিছনে ফেলিয়া যায়। আমি হিংসা কবি সকলকে। যে মানুষ হিংসা করে না মানুষকে পার্থিব সুখসম্পদেব জন্য, সে হিংসা করে আদর্শবাদীকে। কুলিমজুরের মধ্যে এই হিংসা দেখিয়াছি, চোর জুয়াচোরদের মধ্যে এই হিংসা দেখিয়াছি, ধনীর মধ্যে এই হিংসা দেখিয়াছি। জ্ঞানীর মধ্যে এই হিংসা দেখিয়াছি, সাধুমহাত্মার মধ্যে এই হিংসা দেখিয়াছি। সমাজ ও ধর্মের ভিত্তি এই হিংসা। এই হিংসার ভিত্তি আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বলিতে আমি ঠিক কচ্ছপের খোলস ধারণের ব্যাপারটি বুঝাইতেছি না, ক্ষুদ্র একটি জীবকে গ্রাস করা বা নিজের মত আরেকটি জীবকে পৃথিবীতে আনিবাব কথাও বলিতেছি না। জীবজগতের প্রাণশক্তির ধর্ম্ম এমন নিয়মে বাঁধা নয় যে শব্দসংজ্ঞা বা উপমা দিয়া সম্পূর্ণ সীমা নির্দ্দেশ করা যায়। দেহবক্ষার সঙ্গে দেহাশ্রয়ী ইন্দ্রিয়াতীত সমূহকে রক্ষা করাও আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির অন্তর্গত। বিষ খাইয়া গলায দড়ি দিয়া আত্মহত্যায় অস্বাভাবিক কিছুই নাই। এও আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিরই অভিব্যক্তি তবে ব্যাপারটা অসাধারণ, অনেকের মধ্যে দু' একজন নাম কবে। অবস্থাবিশেষে অনেকেও করে—যেমন বড় বড় যুদ্ধের সময ঘটে।]

[লেখকেব মন্তব্য : আসলে 'ব্যক্তিত্ব' জীবনযুদ্ধের একটা কৌশল মাত্র, নিত্য ব্যবহার্য্য অস্ত্র। ব্যক্তিত্ব পরাশ্রয়ী, ব্যক্তিত্বের বিকাশে পরধর্মানুশীলন প্রয়োজন, এই জন্য ক্ষমতাটা 'ব্যক্তিত্বযুদ্ধ', ব্যক্তিব পক্ষে ভয়াবহও বটে। যার যত বেশি ব্যক্তিত্ব তাকে তত বেশি পরের ইচ্ছায় চলিতে হয়। নেতার চেয়েও সে পরাধীন। ব্যক্তিত্বেব মূলমন্ত্র পরের মনে ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া সে ছোট, আমি বড়। অংসখ্য ব্যক্তিত্বের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সংসারে নিজের মনে সহজ সরল জীবন যাপন করা বড় কঠিন, মনের মধ্যে কেউ সিঁদ কাটে, কেউ ডাকাতি করে, দুর্গেব মত নিজের একটা ব্যক্তিত্বের খোলস সৃষ্টি করিযা না নিলে আর উপায় নাই। ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সদানন্দের মতামত বিচার করিলে বুঝিতে পাবা যায়, তার আদর্শবাদ এ সম্বন্ধেও তার বিচাববুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। তিনি কেবল সেই ব্যক্তিত্বেই বিশ্বাস করেন, নিজের ভিতব ও বাহির সকলের সামনে মেলিয়া ধরিলেও যার ক্ষয় নাই।]

[লেখকের মন্তব্য : ভাবিয়াছিলাম গোপন করিয়া যাইব, চুপ করিয়া গেলে আপনাদের পক্ষে ধরাও সহজ হইত না, কিন্তু ভাবিযা চিন্তিয়া শেষ পর্য্যন্ত নিজেব এই অক্ষমতাটি স্বীকার করাই ভাল মনে হইল। একটি সেতু রচনা করিতে পাবি নাই—আমারই কল্পনা শক্তির ব্যর্থতায়, কার্য্যকারণের সংযোগ আডালে বহিয়া গিয়াছে। আশ্রমের একটি কদমগাছের নীচে মহেশ চৌধুরীর মহাযুদ্ধ এবং আশ্রমের নৈতিক জীবনে আকস্মিক আলোড়ন এমন এক আশ্লেষনীতির পক্ষপাতী যে এভাবে বলিয়া দেওযা ছাড়া উপায় খুঁজিয়া পাইলাম না, অগভীর হোক....]

[অসমাপ্ত]

সম্পাদকমণ্ডলী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি

১৯০৮ জন্ম, ১৯ মে মঙ্গলবার। বঙ্গাব্দ ১৩১৫, ৬ জ্যৈষ্ঠ। জন্মস্থান সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকা শহর। পৈতৃক নিবাস বর্তমান বাংলাদেশে, ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালপদিয়া গ্রাম।

পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদা দেবী। পিতামাতার পঞ্চম পুত্র—পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাকনাম মানিক।

পিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের গ্র্যাজুয়েট। সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো এবং শেষ পর্যন্ত সাব-ডেপুটি কালেক্টর পদে পিতার চাকরির সূত্রে লেখকের বাল্য-কৈশোর ও ইস্কুলের শিক্ষাজীবন বিক্ষিপ্তভাবে অতিবাহিত হয় উড়িষ্যা, বিহার ও অখণ্ড বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে—প্রধানত দুমকা, আড়া, সাসারাম, সমগ্র মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশ, কুমিল্লার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়া, বারাসত, কলকাতা, ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে।

১৯২৪ ২৮ মে, টাঙ্গাইলে মাতৃবিয়োগ।

১৯২৬ মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতে বিশেষ কৃতিত্বসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৯২৮ বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি এস্‌সি ক্লাসে ভর্তি হন। এই বছরেই কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে তর্কে বাজি ধরে প্রথম গল্প 'অতসী মামী' রচনা করেন এবং বঙ্গাব্দ ১৩৩৫-এর পৌষ-সংখ্যা (ডিসেম্বর ১৯২৮) 'বিচিত্রা'-পত্রিকায় তা ছাপা হয়। প্রথম গল্পের লেখক হিসাবে ডাকনাম 'মানিক' ব্যবহারের কাহিনী নিজেই পরবর্তীকালে 'গল্প লেখার গল্প' নামক রচনায় বলেছেন।

তবে আকস্মিকভাবে প্রথম গল্প লেখার আগেই লিখিত, কৈশোরক কবিতাচর্চার নিদর্শনস্বরূপ প্রায় একশোটি কবিতা-লেখা সম্পূর্ণ একটি খাতা লেখকের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের ভিতর পাওয়া গেছে।

১৯২৯ 'বিচিত্রা'-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় দ্বি[illegible] গল্প 'নেকী' (আষাঢ় ১৩৩৬) ও 'ব্যথার পূজা' (ভাদ্র ১৩৩৬)। প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি রচনা এই বছরেই শুরু হয়। ক্রমে সাহিত্যচর্চায় আগ্রহ পারিবারিক মতবিরোধের কারণ হয়ে ওঠে—শেষ পর্যন্ত কলেজের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে সাহিত্যকর্মেই সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৪ বঙ্গাব্দ ১৩৪১-এর বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকায় 'একটি দিন'-নামক বড়োগল্পের আকারে প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' শুরু হয়, ক্রমে 'একটি সন্ধ্যা', 'রাত্রি', এবং শেষ পর্যন্ত 'দিবারাত্রির কাব্য'-নামে ধারাবাহিক প্রকাশের পর পৌষ ১৩৪১ এ উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হয়। একই বছরে 'পূর্বাশা'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে শুরু হয় 'পদ্মানদীর মাঝি', কিন্তু 'পূর্বাশা'র প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ায় উপন্যাসটির ধারাবাহিক প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকে।

১৯৩৫ পূর্ববর্তী বছরের ডিসেম্বর কিংবা বর্তমান বছরের জানুয়ারি, বঙ্গাব্দ ১৩৪১-এর পৌষ সংখ্যা থেকে, 'ভারতবর্ষ'-পত্রিকায় শুরু হয় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। এই বছরেই গ্রন্থকার হিসাবে লেখকের প্রথম আবির্ভাব। উপন্যাস 'জননী', প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অতসী মামী', এবং গ্রন্থরূপে পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত 'দিবারাত্রির কাব্য', পর-পর প্রকাশিত হয় যথাক্রমে মার্চ, অগাস্ট ও ডিসেম্বর মাসে।

বর্তমান বছরেরই কোনো-এক সময়ে লেখক মৃগীরোগ বা Epilepsy-র আক্রমণে প্রথম আক্রান্ত হন—চিকিৎসার অতীত এই ব্যাধি ছিল তাঁর আমৃত্যু সঙ্গী।

১৯৩৬ একই বছরে প্রকাশিত হয় তিনটি উপন্যাস—'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'জীবনের জটিলতা'।

১৯৩৭ একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রাগৈতিহাসিক', লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড-এর পরিচালনাধীন মাসিক ও সাপ্তাহিক 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-পদে যোগদান, 'বঙ্গশ্রী'-র তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন কিরণকুমার রায়।

বর্তমান বছরের শেষভাগে টালিগঞ্জ, দিগম্বরীতলার পৈতৃক বাড়িতে বসবাস শুরু, পরবর্তী এগারো বছর, পিতা ও অপর তিন ভ্রাতার একান্নবর্তী সংসারে, উক্ত বাড়িতেই বাস করেন।

১৯৩৮ ১১ মে, ২৮ বৈশাখ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, ময়মনসিংহ গবর্নমেন্ট গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং বিক্রমপুর পঞ্চসার নিবাসী, প্রয়াত সুরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় কন্যা শ্রীযুক্তা কমলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ। জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে উপন্যাস 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ও গল্পগ্রন্থ 'মিহি ও মোটা কাহিনী'।

১৯৩৯ ১ জানুয়ারি থেকে 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের চাকরিতে ইস্তফা। প্রায় একই সময়ে, পরবর্তী ভ্রাতা সুবোধকুমারের সহযোগিতায়, 'উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস' নামে ছাপাখানা ও প্রকাশনালয় স্থাপন।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ মাঘ-সংখ্যা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) 'পরিচয়'-পত্রিকায় 'অহিংসা' উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু (সমাপ্তি পৌষ ১৩৪৭)। অগাস্ট মাসে প্রকাশিত হয় চতুর্থ গল্পগ্রন্থ 'সরীসৃপ'।

বর্তমান বছরেব শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সহরতলী'—'সহরতলী' প্রকাশের মধ্য দিয়েই উক্ত পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশের বীতি প্রবর্তিত হয়।

১৯৪০ বর্তমান বছরেব গোড়ার দিকে লেখকের নিজস্ব প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর পঞ্চম গল্পগ্রন্থ 'বৌ' ; সম্ভবত এর পরেই প্রতিষ্ঠানটি উঠে যায়।

জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে 'সহরতলী' ১ম পর্ব। বঙ্গাব্দ ১৩৪৭ কার্তিক-সংখ্যা 'পবিচয'-পত্রিকায় লেখক-সম্পর্কে প্রথম স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪১ প্রকাশিত গ্রন্থ 'সহরতলী' ২য় পর্ব, 'অহিংসা' ও 'ধরাবাঁধা জীবন'—তিনটি উপন্যাস।

১৯৪২ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সহরবাসের ইতিকথা'। ১৫ মে তারিখে প্রকাশিত উপন্যাস 'চতুষ্কোণ', একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ।

১৯৪৩ 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকা থেকে পদত্যাগের পর লেখকের দ্বিতীয় এবং শেষ চাকবিজীবন শুবু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কোনো-এক সময়ে—তৎকালীন ভারত সরকাবের ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টেব প্রভিন্সিয়াল অবগানাইজার, বেঙ্গল দপ্তরে পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে তিনি যোগদান কবেন এবং অন্তত বর্তমান বছরের শেষভাগ পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় থেকেই অল ইন্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ-বিষযক প্রচার ও আবও নানাবিধ বেতার-অনুষ্ঠানে লেখক অংশ নেন।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বাদ'।

বঙ্গাব্দ ১৩৫০ শারদীয যুগান্তর পত্রিকায 'প্রতিবিম্ব'-নামক ছোটো একটি উপন্যাস—সম্ভবত একই বছরে, বা পববর্তী বছর, উপন্যাসটি গ্রন্থবূপেও প্রকাশিত হয।

১৯৪৪ ১৫-১৭ জানুয়ারি তাবিখে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘেব দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। ক্রমে এ-দেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বর্তমান বছরেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টির সাহিত্য-ফ্রন্টেব সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। ২৫-২৭ অগাস্টে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে সাধারণ অধিবেশনের অন্যতম সভাপতি। একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ, গল্পসংকলন 'ভেজাল'।

১৯৪৫ ৩-৮ মার্চে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘেব তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীব অন্যতম সদস্য। বর্তমান সম্মেলনে পুনবায় সর্বভারতীয় সংস্থাব সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংঘের বাংলা শাখাব নাম হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ' এবং এই সম্মেলন থেকে লেখক উক্ত সংঘের পরবর্তী বছবের অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১২ মে তারিখে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে 'গল্প লেখাব গল্প'-পর্যায়ে ভাষণদান।

অক্টোবব-ডিসেম্বরের বিভিন্ন দিনে, আঠারো-উনিশ শতকীয় বাঙালী সঙ্গীতকাব-বিষয়ে পর্যাযক্রমিক বেতাব ভাষণ। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্পগ্রন্থ 'হলুদপোড়া' এবং উপন্যাস 'দর্পণ'।

১৯৪৬ পর-পর প্রকাশিত হয় পাঁচখানি গ্রন্থ ;

ফেব্রুয়ারি-মার্চ, 'সহরবাসের ইতিকথা', উপন্যাস।

এপ্রিল-মে, 'ভিটেমাটি', নাটক।

মে-জুন, 'আজ কাল পরশুর গল্প', গল্পগ্রন্থ।

জুলাই-অগাস্ট, 'চিন্তামণি', উপন্যাস।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 'পরিস্থিতি', গল্পগ্রন্থ।

১৬ অগাস্ট ও পরবর্তী কয়েকটি দিনের ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, দাঙ্গা-বিধ্বস্ত টালিগঞ্জ অঞ্চলে, জীবন বিপন্ন করে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও মৈত্রী প্রয়াসে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

১৯৪৭ প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটি : উপন্যাস 'চিহ্ন' ও 'আদায়ের ইতিহাস' এবং গল্পগ্রন্থ 'খতিয়ান'।

ডিসেম্বরের শেষভাগে বোম্বাই এ অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্যসম্মেলনে গণসাহিত্য শাখার সভাপতি।

১৯৪৮ দুটি গ্রন্থের প্রকাশ : গল্পগ্রন্থ 'ছোটবড়' ও 'মাটির মাশুল'।

১৯৪৯ ৫ ফেব্রুয়ারি, টালিগঞ্জ-দিগম্বরীতলার পৈতৃক বাড়ি থেকে বরানগর, গোপাললাল ঠাকুর রোড-এর ভাড়াবাড়িতে উঠে আসেন এবং অবশিষ্ট জীবন সেখানেই বাস করেন।

৭ ফেব্রুয়ারি, লেখকের পিতা তাঁর টালিগঞ্জের নিজস্ব বাড়ি বিক্রয় কবে দেন এবং ৪ ডিসেম্বর তারিখে স্থায়ীভাবে লেখকের কাছে চলে আসেন। আমৃত্যু তিনি লেখকের সঙ্গেই বরানগরের ভাড়াবাড়িতে বাস করেন—পুত্রের মৃত্যুর দুবছর পর মুমূর্ষু পিতা মারা যান।

এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি। সংঘের পূর্বতন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে লেখক এই সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন—'প্রগতি সাহিত্য'-নামক প্রবন্ধরূপে এই রিপোর্ট লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'লেখকের কথা'য় (১৯৫৭) সংকলিত হয়েছে। চলচ্চিত্রে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'— ২৮ জুলাই মুক্তি পায়।

একমাত্র গ্রন্থ, 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী', গল্পগ্রন্থ।

১৯৫০ জুন থেকে অগাস্টের মধ্যে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'জীয়ন্ত', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির-কর্তৃক প্রকাশিত 'মানিক-গ্রন্থাবলী' ১ম ভাগ।

১৯৫১ বর্তমান বছরের প্রায় শুরু থেকেই দারিদ্র্যে এবং অসুস্থতায় ক্রমাগত আক্রান্ত হতে থাকেন।

'পেশা', 'সোনার চেয়ে দামী' (১ম খণ্ড। বেকার), 'স্বাধীনতার স্বাদ' ও 'ছন্দপতন'—চারখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৯৫২ আর্থিক সংকট চরমে ওঠে—তিন মাসের মধ্যে 'অন্তত পাঁচশত টাকা' সঞ্চয়ের লক্ষ্য নিয়ে সংসার-চালনার 'ত্রৈমাসিক প্ল্যান' নেন মে-জুলাই মাসে, যদিও তা 'প্ল্যান'ই থেকে যায়।

ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে পাঁচখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'সোনার চেয়ে দামী' (২য় খণ্ড। আপোস), 'ইতিকথার পরের কথা', 'পাশাপাশি' ও 'সার্বজনীন'—চারখানি উপন্যাস এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির-কর্তৃক 'মানিক-গ্রন্থাবলী' ২য় ভাগ।

১৯৫৩ দারিদ্র্য এবং অসুস্থতার আক্রমণ অব্যাহত থাকে।

১১-১৫ এপ্রিল, লেখকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চম বা শেষ বার্ষিক সম্মেলন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : 'নাগপাশ', 'আরোগ্য', 'চালচলন', 'তেইশ বছর আগে পরে'—চারখানি উপন্যাস এবং দুটি গল্পগ্রন্থ, 'ফেরিওলা' ও 'লাজুকলতা'।

১৯৫৪ দারিদ্র্য, এবং অসুখ ও আসক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণ আত্মরক্ষার সংগ্রাম—আত্মরক্ষা এবং আত্মহনন ক্রমেই একাকার হয়ে যায়।

বর্তমান বছরের একেবারে গোড়া থেকেই লেখকের ব্যক্তিগত ডায়েরির লেখায় ঘুরে-ফিরে দেখা দেয় একপ্রকার অতিপ্রাকৃত বা অতিলৌকিক প্রসঙ্গ।

প্রকাশিত গ্রন্থ : দুটি উপন্যাস, 'হরফ' ও 'শুভাশুভ'।

১৯৫৫ স্বেচ্ছানির্বাচিত দারিদ্র্য এবং চিকিৎসাতীত ব্যাধির যুগপৎ আক্রমণে অস্তিত্বসুদ্ধ বিপন্ন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত শুভানুধ্যায়ী লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, স্থায়ী চিকিৎসার জন্য ইসলামিয়া হাসপাতালে ভর্তি হন ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে। মাসাধিককাল চিকিৎসাধীন থাকার পর ২৭ মার্চ, চিকিৎসকদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেই নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল ত্যাগ করে বাড়ি চলে আসেন।

বিপর্যস্ত শরীর-মনের শেষ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা হয় লুম্বিনি পার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে—২০ অগাস্ট সেখানে ভর্তি হন এবং দুমাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ২১ অক্টোবর বাড়ি ফেরেন।

একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'পরাধীন প্রেম', উপন্যাস।

১৯৫৬ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'হলুদ নদী সবুজ বন'। বর্তমান বছরের গোড়া থেকেই ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির আক্রমণে একাধিকবার আক্রান্ত হন এবং ২৫ জুন তারিখে প্রায় মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। জুন মাসেই প্রকাশিত হয় জীবিতকালের শেষ গল্প-সংকলন 'স্ব-নির্বাচিত গল্প'। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে, লেখকের জীবিতকালে সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস, 'মাশুল'।

২ ডিসেম্বর, সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে নীত হন।

৩ ডিসেম্বর (বঙ্গাব্দ ১৩৬৩, ১৭ অগ্রহায়ণ), সোমবার অতি প্রত্যূষে উক্ত হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। নিমতলা শ্মশানঘাটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

[অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়েরি ও চিঠিপত্র। ভূমিকা, টীকাভাষ্য ও সম্পাদনা যুগান্তর চক্রবর্তী (১৯৯০) থেকে সংকলিত]

প্রথম খণ্ডের সূচি

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচি